াপিত ১৯১১
৭৩৭৪ তার



সূচনা

১৯৪৪ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টানা পাঁচ মাসের মধ্যে এই বইখানি আমেদনগর দুর্গের কারাশিবিরে আমি লিখি। আমার সহকারী বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ অনুগ্রহ করে এর পান্ডুলিপি পড়ে দেখেন ও এর বিষয়ে নানাবিধ মূল্যবান মন্তব্য প্রকাশ করে আমার সহায়তা করেন। কারাবাসকালে বইখানি পুনর্লিখনের সময় আমি তাঁদের সেইসব মন্তব্যের সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছি ও মূলে লেখায় কিছু কিছু সংযোজন করেছি। বলা বাহুল্য আমি যেসব মতামত প্রকাশ করেছি তার সম্বন্ধে তাঁদের কোনো দায়িত্ব নেই, সকল বিষয়ে তাঁরা যে আমার সঙ্গে একমত তাও নয়। সে যাই হোক, আমেদনগর কারাশিবিরে আমার সহবন্দীদের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ—এই সুযোগে না করে পারছি না। তাঁদের সঙ্গে নানাবিধ আলাপ আলোচনায় ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে আমার ধারণা বহুলাংশে স্পষ্টতর হয়েছে। ছোট মেয়াদের কারাবাসও খুব উপভোগ্য নয়, দীর্ঘ মেয়াদের কারাবাস তো নয়ই। তা সত্ত্বেও এ আমার নিতান্ত সৌভাগ্য যে এবার আমি এমন সব কৃতী ও সংস্কৃতিবান মনস্বীদের নিকট সম্পর্কে এসেছিলাম—যাঁদের উদার মনোবৃত্তি সাময়িক উত্তেজনার ফলেও মোহগ্রস্ত হয়ে যায়নি।

আমেদনগর কারাশিবিরে আমার যে-এগারোজন সঙ্গী ছিলেন, তাঁরা নানাদিক দিয়ে ছিলেন ভারতবর্ষের প্রতিনিধিস্থানীয়—রাজনীতিতে তো বটেই, সংস্কৃতির দিক থেকেও প্রাচীন ও আধুনিকপন্থী মনীষার তাঁরা ছিলেন প্রতিভূস্বরূপ। প্রাচীন ও আধুনিক যেসব ভারতীয় ভাষা অতীত ও বর্তমানকালের জাতীয় জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছে, সেই সকল ভাষারই প্রতিনিধিত্ব করার মত যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্য ছিল এঁদের। প্রাচীন ভাষার মধ্যে ছিল সংস্কৃত ও পালি, আরবী ও ফারসী; এবং আধুনিক ভাষার মধ্যে ছিল হিন্দি, উর্দু, বাংলা, গুজরাতি, মারাঠি, তেলেগু, সিন্ধি ও উড়িয়া। জ্ঞানের এই বিরাট ঐশ্বর্যভাণ্ডার আমার কাছে উন্মুক্ত ছিল, তার যদি সম্পূর্ণ সুযোগ আমি না নিতে পেরে থাকি, তাহলে সে অক্ষমতা আমার নিজেরই। যদিও আমার সঙ্গীদের সকলের কাছেই আমি সমভাবে কৃতজ্ঞ, তবু বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, নরেন্দ্র দেব এবং আসফ আলীর নাম। মৌলানার বিরাট পাণ্ডিত্য আমায় মুগ্ধ করেছে, অভিভূত করেছে।

আজ প্রায় আঠারো মাস হল এই বই লেখা শেষ করেছি, ইতিমধ্যে অনেক অংশই

কালের হিসাবে অবান্তর হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে অনেক কিছু ঘটনা ঘটে অনেকবার লোভ হয়েছে কিছু সংস্করণ কিম্বা সংযোজন করি; সে-লোভ ও সম্বরণ করেছি। অবশ্য তা না করে গত্যন্তর ছিল না। কারাবাসবহির্ভূত জীব চেহারাই আলাদা, সেখানে চিন্তার কিংবা লেখার অবকাশ নেই বললেই চলে। নিজে লেখা পুনরায় পড়তে গিয়ে আমায় যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। গোড়া আদ্যোপান্ত বইখানি নিজের হাতে আমায় লিখতে হয়, কারামুক্তির পর পাণ্ডুলিপি টাইপ করা হয়েছে। টাইপ করা অংশগুলি পড়বার মত সময় আম ছিল না, পুস্তক প্রকাশে তাই বিলম্ব ঘটছিল। এরূপ অবস্থায় আমার কন্যা ইন্দি এসে প্রকাশনের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করে আমায় ভারমুক্ত করেছেন। জে থাকাকালীন যেমন লেখা হয়েছিল বইটি অবিকল তেমনই আছে, এক কেবল শে দিককার 'পুনশ্চ' অংশ ছাড়া আর কোনো অদল বদল করা হয়নি।

অন্যান্য লেখকরা তাঁদের নিজেদের লেখা পড়তে গিয়ে কি ভাবেন—সেকথা আমা জানা নেই। কিছুকাল আগে আমি যা লিখেছি সেসব লেখা পড়তে গেলে আমা নিজের মনে একটা অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হয়। বন্দী অবস্থার রুদ্ধ ও অস্বাভাবি পরিবেশে যা আমি লিখেছি তা যখন মুক্ত অবস্থায় কারাকক্ষের বাইরে পড়তে বসি তখন এই অনুভূতি তীব্রতরভাবে মনের উপর ক্রিয়া করে। এরূপ লেখা, নিজের লেখা বলে চিনে নিতে পারি অবশ্য—কিন্তু সম্পূর্ণত নয়। মনে হয় আমারই নিকট-পরিচিত অথচ আমা হতে পৃথক কারো রচনা পড়ছি। বোধ করি এরূপ অনুভূতি আমারই মানসপ্রকৃতির রূপান্তরের ফল।

এই বই সম্বন্ধেও আমার ঠিক এই রকমই মনে হয়েছে। এ আমারই রচনা, কিন্তু সম্পূর্ণত আমার নয়, এই লেখকের সঙ্গে আমার আজকের আমি-র কালগত ব্যবধান ঘটে গেছে। রচয়িতা যেন আমার ভূতপূর্ব কোনো সত্তা। জন্মজন্মান্তর পরম্পরা আমার যেসব সত্তা রূপ পরিগ্রহ করে কিছুকাল পরে মিলিয়ে গেছে, যে-আমি নিত্য আসে নিত্য যায়, কেবল রেখে যায় তার স্মৃতিটুকু—এ-বইয়ের লেখক তাদেরই একজন।

আনন্দভবন : এলাহাবাদ
২০শে ডিসেম্বর ১৯৪৫

জওহরলাল নেহরু

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ : আমেদনগর দুর্গ

১ : কুড়ি মাস ১
২ : দুর্ভিক্ষ ২
৩ : গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ ৪
৪ : কারাগারে দিনযাপন : কর্মের আহ্বান ৭
৫ : অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্র ১০
৬ : জীবনের আদর্শ ১২
৭ : অতীতের বোঝা ২৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাদেনহুাইলার : লোসান

১ : কমলা ২৯
২ : আমাদের বিবাহ এবং তারও পরে ৩১
৩ : মানব সম্বন্ধের সমস্যা ৩৫
৪ : ১৯৩৫ : বড়দিন ৩৬
৫ : মৃত্যু ৩৭
৬ : মুসোলিনি : প্রত্যাবর্তন ৩৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : অন্বেষণ

১ : অতীত ভারতের ছবি ৪২
২ : জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা ৪৬
৩ : ভারতবর্ষের শক্তি ও দুর্বলতা ৪৮
৪ : ভারতবর্ষের খোঁজ ৫২
৫ : ভারতমাতা ৫৫
৬ : ভারতের বৈচিত্র্য ও একত্ব ৫৭
৭ : ভারতবর্ষ ভ্রমণ ৬০
৮ : সাধারণ নির্বাচন ৬২
৯ : জনগণের সংস্কৃতি ৬৫
১০ : দুই জীবন ৬৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ভারত সন্ধানে

১ : সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা ৬৭
২ : আর্যদের আগমন ৭১
৩ : কি এই হিন্দুধর্ম? ৭৩
৪ : প্রাচীনতম বিবরণ : ধর্মশাস্ত্র এবং পৌরাণিক কাহিনী ... ৭৬
৫ : বেদ ৭৮
৬ : জীবনকে স্বীকার ও অস্বীকার ৮০
৭ : সংশ্লেষণ ও পুনর্বিন্যাস : জাতিভেদের আরম্ভ ... ৮৫
৮ : ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্নতা ৮৮
৯ : উপনিষদ্ ৯০
১০ : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক দার্শনিক মতের সুবিধা ও অসুবিধা ৯৫
১১ : জড়বাদ ৯৯
১২ : মহাকাব্য, ইতিবৃত্ত, ঐতিহ্য ও পুরাণ ১০২
১৩ : মহাভারত ১১০
১৪ : ভগবদ্গীতা ১১৩
১৫ : প্রাচীন ভারতে মানবের জীবন ও কর্ম ১১৫
১৬ : মহাবীর ও বুদ্ধ : জাতিভেদ ১২৪
১৭ : চন্দ্রগুপ্ত এবং চাণক্য : মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ... ১২৮
১৮ : রাজ্যের বিধিব্যবস্থা ১৩০
১৯ : বুদ্ধের উপদেশ ১৩৪
২০ : বুদ্ধের গল্প ১৩৭
২১ : অশোক ১৩৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : যুগের যাত্রা

১ : গুপ্তসাম্রাজ্যে জাতীয়তাবোধ ও সাম্রাজ্যবাদ ... ১৪৩
২ : দক্ষিণ-ভারত ১৪৭
৩ : রাজ্যশাসনে সুব্যবস্থা ও যুদ্ধকৌশল ১৪৮
৪ : স্বাধীনতার জন্য ভারতের সাধনা ১৪৯
৫ : অগ্রগতি বনাম নিরাপত্তাবোধ ১৫১
৬ : ভারত ও ইরান ১৫৫
৭ : ভারতবর্ষ ও গ্রীস ১৬০
৮ : প্রাচীন ভারতে নাট্যশালা ১৬৭
৯ : সংস্কৃতের জীবনীশক্তি ও স্থায়িত্ব ১৭৬
১০ : বৌদ্ধ দর্শন ১৮২
১১ : হিন্দুধর্মের উপর বৌদ্ধধর্মের ক্রিয়া ১৮৭

১২ : হিন্দুধর্ম কিরূপে বৌদ্ধধর্মকে অন্তর্ভুক্ত করে ... ১৯১
১৩ : ভারতীয় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ১৯৪
১৪ : ষড়্দর্শন ১৯৭
১৫ : ভারতবর্ষ ও চীন ২০৬
১৬ : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ ও সংস্কৃতি ... ২১৪
১৭ : বিদেশে ভারতীয় শিল্পের প্রভাব ২২২
১৮ : প্রাচীন ভারতশিল্প ২২৬
১৯ : ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ২৩১
২০ : প্রাচীন ভারতে গণিত ২৩৩
২১ : বৃদ্ধি ও ক্ষয় ২৩৯

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : নূতন নূতন সমস্যা

১ : আরব ও মোঙ্গোল ২৪৬
২ : আরব সংস্কৃতির বিকাশ ও ভারতবর্ষের সঙ্গে সংস্পর্শ ... ২৫১
৩ : ঘজনির মাহমুদ ও আফগান জাতি ২৫৪
৪ : ভারতীয়-আফগান : দক্ষিণ ভারত : বিজয়নগর : বাবর : সামুদ্রিক শক্তি ২৫৮
৫ : মিশ্র-সংস্কৃতির উন্নতি : পর্দাপ্রথা : কবীর : নানক : খুসরু ২৬২
৬ : ভারতীয় সামাজিক সংগঠন : মণ্ডলীর গুরুত্ব ... ২৬৭
৭ : গ্রামিক স্বায়ত্তশাসন : শুক্রনীতিসার ... ২৬৯
৮ : জাতিভেদ—প্রথা ও প্রকাশ : একান্নবর্তী পরিবার ... ২৭২
৯ : বাবর এবং আকবর : ভারতীয়করণ ২৮০
১০ : যান্ত্রিক অগ্রগতি ও সৃষ্টিশক্তি বিষয়ে এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে পার্থক্যের আলোচনা ২৮৩
১১ : সাংস্কৃতিক ঐক্যের উন্নয়ন ২৮৮
১২ : আরঙ্গজেবের প্রগতিপরিপন্থী ব্যবস্থা : হিন্দু জাতীয়তার উদ্ভব : শিবাজী ২৯৫
১৩ : মারাঠা ও ইংরাজের মধ্যে প্রাধান্যের জন্য যুদ্ধ : ইংরাজের জয় ২৯৮
১৪ : সংগঠন ও বিজ্ঞানসম্মত বিধিব্যবস্থায় ভারতের অনগ্রসরতা এবং ইংরাজদের উৎকর্ষ ৩০২
১৫ : রণজিৎ সিংহ এবং জয়সিংহ ৩০৮
১৬ : ভারতের অর্থনৈতিক পটভূমিকা : দুই ইংলন্ড ... ৩১১

সপ্তম পরিচ্ছেদ : অন্তিম পর্যায় : ব্রিটিশ-শাসনের পত্তন ও স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত

১ : সাম্রাজ্যবাদের আদর্শ : নূতন জাতির প্রতিষ্ঠা ... ৩১৭
২ : বঙ্গদেশ লুণ্ঠন ও ইংলন্ডে শিল্পোন্নতির নবযুগ ... ৩২৬
৩ : ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতের শিল্পাদির বিনাশসাধন ও কৃষিকার্যের ক্রম-অবনতি ৩২৯
৪ : ভারত এই প্রথম একটা বিদেশের সংযোজিত অংশমাত্র হয়ে দাঁড়াল ৩৩৪
৫ : দেশীয় রাজ্যব্যবস্থার উদ্ভব ৩৩৯
৬ : ভারতে ইংরাজ-শাসনে বৈপরীত্য : রামমোহন রায় : মুদ্রাযন্ত্র : স্যর উইলিয়ম জোন্‌স্‌ : বাঙলাদেশে ইংরাজি শিক্ষা ৩৪৫
৭ : ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের বিরাট বিদ্রোহ : জাতিবৈরিতা ... ৩৫৬
৮ : ইংরাজের শাসনপদ্ধতি : ভারসাম্যরক্ষা ও ভেদাভেদ সৃষ্টি ৩৬২
৯ : শ্রমশিল্পের উদ্ভব : প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য . ৩৬৭
১০ : হিন্দু ও মুসলমান সামাজে সংস্কারমূলক আন্দোলন ... ৩৭২
১১ : কামাল পাশা : এশিয়া মহাদেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন : ইকবাল ৩৯১
১২ : বৃহদায়তন শ্রমশিল্পের উদ্ভব : তিলক ও গোখলে : পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা ৩৯৫

অষ্টম পরিচ্ছেদ : অন্তিম পর্যায় (২) : স্বাজাত্যবাদ বনাম সাম্রাজ্যবাদ

১ : মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিঃসহায়তা : গান্ধীজির আবির্ভাব .. ৪০০
২ : গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেস ৪০৪
৩ : বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী সরকার ৪১০
৪ : ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রক্ষণশীলতা ও ভারতীয় গতিপন্থার সংঘর্ষ ৪১৫
৫ : সংখ্যালঘু সমস্যা : মুসলিম লীগ : মিস্টার এম. এ. জিন্না ৪২৫
৬ : জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি ৪৪১
৭ : কংগ্রেস ও শিল্প : যন্ত্রশিল্প বনাম কুটির-শিল্প ... ৪৪৯
৮ : সরকার কর্তৃক শিল্পবিস্তার দমন : সমরকালীন উৎপাদন-চেষ্টার ফলে স্বাভাবিক গতির বৈকল্য ৪৫৬

নবম পরিচ্ছেদ : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

১ : কংগ্রেসের পররাষ্ট্র নীতি ৪৬৩
২ : যুদ্ধসম্পর্কে কংগ্রেসের বিশ্লেষণ ৪৭১
৩ : যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ৪৭৬
৪ : কংগ্রেসের নূতন প্রস্তাব : ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক এর প্রত্যাখ্যান : মিস্টার উইনস্টন চার্চিল ৪৮৩

৫ : ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ ৪৯২
৬ : পার্ল হারবারের পর : গান্ধীজি এবং অহিংসানীতি ... ৪৯৫
৭ : উৎকণ্ঠা ৫০৪
৮ : ভারতবর্ষে স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের আগমন ... ৫১০
৯ : হতাশা ৫২৪
১০ : শক্তিপরীক্ষার আহ্বান : ভারত ছাড় প্রস্তাব ... ৫২৯

দশম পরিচ্ছেদ : আবার আমেদনগর দুর্গ

১ : নিরবচ্ছিন্ন ঘটনাপ্রবাহ ৫৪২
২ : দুটি পটভূমিকা : ভারতীয় ও ব্রিটিশ ৫৪৩
৩ : গণ-অভ্যুত্থান এবং তার দমন ৫৪৮
৪ : বিদেশের প্রতিক্রিয়া ৫৫৭
৫ : ভারতের অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়া ৫৬০
৬ : পীড়িত ভারত : দুর্ভিক্ষ ৫৬৩
৭ : ভারতের দুর্বার জীবনীশক্তি ৫৬৮
৮ : ভারতের অগ্রগতি রোধ ৫৭৬
৯ : ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান ৫৮১
১০ : জাতীয় ভাবধারার গুরুত্ব : ভারতে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ৫৮৯
১১ : বিভক্ত ভারত না শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্র : অথবা বহুজাতি সম্মিলিত সংহত রাষ্ট্র? ৬০০
১২ : বাস্তববাদ এবং ভূরাষ্ট্রনীতি : বিশ্altবিজয় না বিশ্বসহযোগিতা : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন ... ৬১৬
১৩ : স্বাধীনতা এবং সাম্রাজ্য ৬৩২
১৪ : জনসংখ্যার সমস্যা : জন্মহারের ক্রমহ্রাস এবং জাতির ক্রমক্ষয় ৬৩৬
১৫ : নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে পুরানো সমস্যা ৬৪৩
১৬ : শেষ কথা ৬৪৮

পুনশ্চ ৬৫৬

"নিভৃত মধুর ভাবনার অবসরে

পুরানো দিনের স্মৃতিরা জমায় ভিড়···"

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমেদনগর দুর্গ

১ : কুড়ি মাস

আমেদনগর দুর্গ : ১৩ই এপ্রিল : ১৯৪৪। এখানে আমাদের আনা হয়েছে আজ কুড়ি মাসের উপর হল। এবারকার এই কুড়ি মাস নিয়ে আমার নয় দফা কারাবাস। এখানে যেদিন এসে পেঁাছাই সেদিন ছিল প্রতিপদের রাত। অন্ধকার আকাশে কেবল এক ফালি চাঁদ ছিল আমাদের অভ্যর্থনা করে নিতে। শুক্লপক্ষ সেদিন সবে শুরু হয়েছে। এক একটা প্রতিপদের রাত আসে, আর আমায় যেন মনে করিয়ে দেয়—আমার মেয়াদ থেকে একটি মাস বাদ পড়ল। গতবারের কারাবাসও ঠিক এমনি এক প্রতিপদের রাত থেকেই শুরু হয়েছিল—ঠিক দেওয়ালির পরের দিন।

কারাবাসের চিরসঙ্গী আমার চাঁদ; দিনে দিনে ওর সঙ্গে আমার সখ্য যেন নিবিড়তর হচ্ছে। চাঁদকে দেখে দেখে কত চিন্তাই না জাগে—বহিঃপ্রকৃতির শোভা, প্রাণশক্তির বৃদ্ধি ও ক্ষয়, অন্ধকারের পর আলোক এবং মৃত্যুর পর অমৃতের আবির্ভাব—ইত্যাদি কত শত কথা মনে হয়। বিচিত্র প্রকাশ এই চাঁদের, তিথিতে তিথিতে কত তার পরিবর্তন, কত বিচিত্র রূপ, কত বিচিত্র ভাব। কখনও চাঁদকে দেখেছি সন্ধ্যার ছায়া যখন দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে থাকে, কখনও বা নিশীথ রাত্রের নীরব অন্ধকারে, কখনও বা অরুণোদয়ের স্তব্ধ মুহূর্তে। ওই একই চাঁদ—অথচ কলায় কলায় তার কত না হ্রাস বৃদ্ধি। চাঁদ দেখে অনেক সময় সঠিক বলে দেওয়া যায় এটা কোন দিন বা কি মাস। খেতের চাষীর কাছে চাঁদ যেন বেশ একটা সহজ দিনপঞ্জী—দিনের প্রবাহ ও ঋতুচক্রের আবর্তন নির্দেশ করতে চাঁদ অদ্বিতীয়।

বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে এখানে আমাদের প্রথম তিনটা মাস কেটে গেল। কোনোপ্রকার যোগ ছিল না—দেখাসাক্ষাৎ নেই, নেই খবরের কাগজ, নেই রেডিও। আমরা যে আমেদনগর দুর্গে বন্দী আছি—সে-খবরটা পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ না কি গোপন রেখেছিলেন। খবরটা অবশ্য নামেই গোপন ছিল, আসলে সারা দেশের লোকই জানত আমরা কোথায় আছি। ক্রমে ক্রমে খবরের কাগজ দেবার হুকুম হল, কয়েক সপ্তাহ পরে নিছক ঘরোয়া খবরসমেত নিকট আত্মীয়দের কাছ থেকে চিঠিও পেতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু ওই পর্যন্ত। এই কুড়িটা মাস বাইরের লোকের মুখ দেখার জো ছিল না।

খবরের কাগজ আসত সেন্সর-এর মারফত, নানারূপ কাটছাঁটের পরে। তবু ওই খবরের কাগজ থেকে যা একটু আভাস পেতাম যুদ্ধের আগুন কি দ্রুতগতিতে গোটা পৃথিবীটাকে ছারখার করতে লেগেছে। দেশের লোকের অবস্থা সম্বন্ধেও কিছু কিছু

জানা যেত। সে খুবই যৎসামান্য জানা। খবর পেতাম যে হাজার হাজার দেশবাসীকে বিনা বিচারে কয়েদ কিম্বা অন্তরীণ করে রাখা হয়েছে, হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী স্কুল ও কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়েছে, হাজার হাজার লোককে গুলি করে মারা হয়েছে। খবর পেতাম যে-বিধানে দেশের শাসন চলছে তার সঙ্গে সামরিক আইনের সামান্যই প্রভেদ। বীভৎস অত্যাচারের আশঙ্কায় দেশের মুখ কালো হয়ে গেছে। এই যে হাজার হাজার লোক আমাদের মত বিনাবিচারে কয়েদ ছিল যারা, তাদের অবস্থা ছিল আমাদের চেয়েও শোচনীয়। বাইরের লোকজনের দেখাসাক্ষাৎ পাওয়া তো দূরের কথা, তাদের বেলা চিঠিপত্র ও খবরের কাগজ পাওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল। এমন কি বই পর্যন্ত তাদের হাতে পৌঁছাত কালে ভদ্রে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে কত জন যে ব্যারামে পড়ল, কত সোনার চাঁদ ছেলেমেয়ে ওষুধপথ্য ও সেবার অভাবে অকালে প্রাণ হারাল।

সে সময় ভারতে অনেক শত্রুসৈন্য বন্দী, তাদের মধ্যে অধিকাংশই ইতালিয়। মনে মনে ইতালিয় বন্দীদের সঙ্গে নিজেদের দেশের বন্দীদের কথা তুলনা করে দেখতাম। শোনা যায় জেনিভার আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে চলতে হত শত্রুসৈন্যের সঙ্গে ব্যবহারের বেলা। কই ভারতীয় বন্দী কিম্বা ডেটিনিউদের বেলা তো কোনো নিয়ম-কানুনের বালাই ছিল না। যা ছিল সে হল অর্ডিনান্স—নিজেদের খেয়াল খুশি মত আমাদের ব্রিটিশকর্তারা যদৃচ্ছা অর্ডিনান্স জারি করে তাঁদের শাসন-ব্যবস্থা চালাতেন।

২ : দুর্ভিক্ষ

এল দুর্ভিক্ষ। অতি করাল অতি কুটিল বর্ণনাতীত বীভৎস দুর্ভিক্ষ দেখা দিল মালাবারে, বিজাপুরে, উড়িষ্যায়। শস্যশ্যামলা বাঙলাদেশ নিদারুণ দুর্ভিক্ষে বিধ্বস্ত হয়ে গেল। কাতারে কাতারে পুরুষ, নারী ও শিশু অন্নাভাবে প্রতিদিন মারা পড়তে লাগল। কলকাতার প্রাসাদোপম অট্টালিকাগুলির সামনে, বাঙলাদেশের গ্রামে গ্রামে পর্ণকুটিরে পথে প্রান্তরে মাঠে ঘাটে হাজার হাজার মৃতদেহ স্তূপাকার হয়ে উঠল। যুদ্ধ চলেছে তখন—পৃথিবীর সর্বত্র চলছে কাটাকাটি হানাহানি—কত লোক মারা পড়ছে প্রতিদিন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে-মৃত্যু আকস্মিক। কখনও বা সে-মৃত্যু বীরের মৃত্যু, তার পিছনে হয়তো রয়েছে একটা কোনো মহান উপলক্ষ্য, একটা নিশ্চিত উদ্দেশ্য। কখনও বা মৃত্যু আসে উন্মত্ত পৃথিবীর যুক্তিহীন ঘটনাবলীর চক্রান্তে—যে-জীবন মনের মত করে গঠিত বা নিয়ন্ত্রিত করতে পারা যায় না, অসময়ে সেই জীবনের সমাপ্তির মত। পৃথিবীর সর্বত্র তখন মৃত্যুর ছড়াছড়ি।

কিন্তু এ কি রকম মৃত্যু! এর মধ্যে অর্থ নেই, যুক্তি নেই, প্রয়োজনের তাগিদ নেই। কতকগুলি হৃদয়হীন অকর্মণ্য মানুষের হাতে-গড়া এই মৃত্যু। মন্থরগতি ভয়াল সরীসৃপের মত মৃত্যু সব গ্রাস করে নিল। জীবন মৃত্যুর মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে বিলীন হয়ে গেছে; প্রাণটা ধুঁকছে আর কঙ্কালসার শরীরের কোটরগত চক্ষু থেকে মৃত্যু যেন তার

দিকে তাকিয়ে রয়েছে একদৃষ্টে। কর্তারা স্থির করলেন—এসব প্রসঙ্গ উত্থাপন করা শিষ্টাচারসঙ্গত হবে না, এসব অশোভন ব্যাপার নিয়ে লেখালেখি বা আলোচনা কুরুচিকর হবে। তা যদি করা হয় তাহলে একটা কদর্য পরিস্থিতি নিয়ে অনর্থক মাতামাতি করা হবে। ওসব 'নাটুকেপনার' প্রশ্রয় দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়। সুতরাং কর্তাব্যক্তিরা ভারতে বিলাতে বাঙলাদেশের দুর্ভিক্ষসম্বন্ধে মিথ্যা বিবরণ প্রচার করতে লাগলেন। কিন্তু স্তূপাকার মৃতদেহগুলি এত সহজে উপেক্ষা করা যায় কি—সেগুলি যে পথ জুড়ে থাকে।

একদিকে বাঙলা ও অন্যান্য দেশের লোক নিদারুণ নরকাগ্নিতে পুড়ে ছারখার হচ্ছে অন্যদিকে উপরওয়ালারা বিবৃতি দিচ্ছেন যে যুদ্ধকালীন আর্থিক অবস্থার উন্নতির ফলে ভারতের সর্বত্র চাষাভুষোশ্রেণীর লোকেদের প্রচুর আহার জুটছে। সেকথা যখন মিথ্যা প্রমাণিত হল তখন তাঁরা সবটুকু দোষ চাপিয়ে দিলেন প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রের উপর। ভারতের কেন্দ্রস্থিত ব্রিটিশ সরকার এবং ওদিকে লন্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস—উভয়েরই কনস্টিটিউশন-প্রীতি এমন সাংঘাতিক যে, প্রাদেশিক ব্যাপারে কিছুতেই তাঁরা হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। অথচ এই নিয়মতন্ত্রই দিনের পর দিন বাতিল হচ্ছে, বদল হচ্ছে, অমান্য করা হচ্ছে। সর্বশক্তিমান বড়লাট বাহাদুর তাঁর প্রভুত্বগৌরবে দিনের পর দিন হুকুম ও অর্ডিনান্স জারি করছেন, আর সমস্ত নিয়মকানুন ভেসে যাচ্ছে। আখেরে দেখা যায় এই কনস্টিটিউশন হল ব্যক্তিবিশেষের বাধাহীন একাধিপত্য। ভারতের কারও কাছে তাঁকে জবাবদিহি করতে হয় না, পৃথিবীর যে-কোনো দেশের যে-কোনো ডিক্টেটর-এর চাইতে তাঁর ক্ষমতা কোনো অংশে কম নয়। সরকারের স্থায়ী গোলাম যাঁরা—বিশেষত সিভিল সার্ভিস ও পুলিশ সার্ভিস-এর লোকেদের হাতে এই শাসনযন্ত্র চালাবার ভার। বড়লাট বাহাদুরের প্রতিনিধি এক লাটসাহেব ছাড়া আর কারও কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হয় না—যে-প্রদেশে নির্বাচিত মন্ত্রী আছেন সেখানে মন্ত্রীকেও তারা উপেক্ষা করতে পারে। লোক ভালো হন বা মন্দ হন, দিনগত পাপক্ষয় করা ছাড়া মন্ত্রীদলের অন্য উপায় নেই। উপরওয়ালার হুকুম অমান্য করা কিংবা তাঁদের তথাকথিত 'আয়ত্তাধীন' সার্ভিস-এর লোকেদের কাজে হস্তক্ষেপ করা—দুইই মন্ত্রীদের পক্ষে দুঃসাহসিকতার নামান্তর।

শেষপর্যন্ত দুর্গতদের সাহায্যকল্পে অল্প কিছু সাহায্য বরাদ্দ হল। কিন্তু ইতিপূর্বেই মৃত্যুকাণ্ডের বীভৎস একটি অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে; ওই কয়েকটা মাসে কত লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষ ও মারীতে প্রাণ দিয়েছে তার হিসাব কেউ রাখে না। কেউ জানে না কত শত শীর্ণদেহ শিশু ও কিশোর তখনকার মত মৃত্যুর কবল এড়িয়ে চিরকালের মত অপরিণত ও ভগ্ন দেহমনের বোঝা বয়ে মৃত্যুর বাড়া জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে। মন্বন্তরের বিষবাষ্প এখনও যেন দেশের হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট-এর চতুর্বর্গের কথা মনে হয়। অভাব অনটনের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ তার মধ্যে অন্যতম। বিত্তশালী ব্রিটেন ও ঐশ্বর্যমদমত্ত আমেরিকা

একটিবার তাকিয়েও দেখল না, আহারের অভাবে হাজার হাজার লোক ভারতবর্ষে মারা পড়ল। যে-স্বাধীনতার ক্ষুধা অনির্বাণ অগ্নিশিখার মত লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে দগ্ধে দগ্ধে মারছে—সেই ক্ষুধার প্রতি ওদের যেমন অবজ্ঞা ভারতবাসীর জঠরের ক্ষুধার প্রতিও তেমন। লোকেরা বলল টাকা চাই না, চাই খাদ্য। কিন্তু যুদ্ধের রসদ ও অস্ত্রশস্ত্রাদি বহন করতেই তখন সমস্ত জাহাজ ব্যস্ত, ক্ষুধিতের ক্ষুধা মেটাবার খাদ্য বহন করে আনবে এমন জাহাজ কোথায়! সরকার তরফের বাধা বিরুদ্ধতা এবং বাঙলার দুরবস্থা তুচ্ছ করে দেখানোর আগ্রহাতিশয্য সত্ত্বেও, ইংলণ্ড আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের হৃদয়বান ও দয়াশীল লোকেরা সাহায্য পাঠাতে লাগলেন। এদিক থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল চীন ও আয়র্লণ্ডের দান। তাঁদের স্ব স্ব দেশের দুঃখ দারিদ্র্য ও দুর্গতি সত্ত্বেও তাঁরা মুক্তহস্তে ভারতের সহায়তায় এগিয়ে এলেন। তাঁদের নিজেদের দরিদ্র দেশের অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁরা জানেন অনশনের জ্বালা কি ভীষণ জ্বালা। এই জন্য তাঁরা বেশ সহজেই বুঝলেন ভারতের দুঃখ কোনখানে।

অতীতের অনেক স্মৃতিবাহিনী আমাদের এই দেশ। এদেশ আর যা কিছু ভুলুক বা স্মরণে রাখুক, চীন আয়র্লণ্ডের সদয় সৌহার্দ্যের কথা কখনও ভুলবে না।

৩ : গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ

জলে স্থলে যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা চলেছে—এশিয়া ইউরোপ আফ্রিকা মহাদেশে; প্রশান্ত, অতলান্তিক ও ভারত মহাসাগরে। সাত বছর ধরে যুদ্ধ চলেছে চীনে, সাড়ে চার বছরের উপর ইউরোপ ও আফ্রিকায়, আর দু বছর চার মাস ধরে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। যুদ্ধ চলেছে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে, পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব বিস্তারের বিপক্ষে। যুদ্ধের এই কয়েকটা বছরের মধ্যে প্রায় তিনটা বছর আমার কারাবাসে কেটেছে আমেদনগর দুর্গে কিছুটা, কিছুটা অন্যত্র।

ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদ যখন প্রথম মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তখন এই দুই রাজনৈতিক মতবাদ সম্বন্ধে, আমার—কেবল আমার কেন ভারতবর্ষের অনেক লোকের—কি প্রকার মনোভাব ছিল, সেই কথা মনে পড়ে। জাপান যখন চীনদেশ আক্রমণ করল তখন সমস্ত দেশ বিচলিত হয়ে উঠেছিল। চীনের সংকটময় মুহূর্তে ভারত তার সঙ্গে যেন পুরাতন সৌহার্দ্য নূতন করে স্থাপন করেছিল। ইতালির দ্বারা আবিসিনিয়ার বলাৎকার সমস্ত দেশের মনে ইতালির প্রতি ঘৃণার সঞ্চার করেছিল। প্রতারিত চেকোশ্লোভাকিয়া যখন শত্রুর হাতে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হচ্ছে, তখন সে লাঞ্ছনা আমরাও যেন মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। প্রচণ্ড সাহস ও বিপুল ধৈর্যের সঙ্গে নানা দুঃখ বরণ করেও যখন গণতান্ত্রিক স্পেন বিরুদ্ধ শক্তির কাছে হার মানল, তখন সে-পরাজয়ের দুঃখ আমার কাছে ও আমার অনেক স্বদেশবাসীর কাছে আত্মীয়-বিয়োগের মত বোধ হয়েছে।

ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের উগ্র পাশবিক শক্তির বিকৃত বীভৎস রূপটা খুবই ভয়ঙ্কর সন্দেহ নেই। তার বাইরের এই রূপ দেখে আমরা ততটা আতঙ্কিত হইনি। এই দুই মতবাদ যে-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, জাতে জাতে সংঘর্ষ বাধাবার যে-দুর্নীতি তারা নির্লজ্জ ভাবে জোরগলায় প্রচার করেছিল—সেই সর্বনেশে মতবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত মন যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। বর্তমানের যা কিছু আমরা শ্রেয় বলে জানি, পুরুষানুক্রমে যা কিছু আমরা কল্যাণকর বলে বিশ্বাস করে এসেছি—এই দুই মতবাদ যেন সে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দেবার জন্য উপস্থিত হল। দেশের সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত হয়ে থাকলেও আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা বেশ বুঝেছিলাম ফ্যাসি মতবাদ আমাদের কোন পথে নিয়ে যাবে। ভারতের শাসনতন্ত্র ওই একই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত; তার বিষময় ফল আমরা মর্মে মর্মে ভোগ করেছি, সুতরাং ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের বিরুদ্ধতা আমাদের যেমন ক্ষিপ্র তেমনি স্বাভাবিক হয়েছিল।

১৯৩৬-এর মার্চ মাসে যখন ইতালিতে ছিলাম তখন সিনর মুসোলিনির নির্বন্ধাতিশয় সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার নিমন্ত্রণ আমি প্রত্যাখ্যান করি। তখনকার দিনে ব্রিটেনের অনেক বড় বড় রাষ্ট্রনেতা ছিলেন মুসোলিনির প্রশংসায় পঞ্চমুখ—তাঁর অধীনে ইতালির শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁরা তখন শতমুখে গুণগান করেছেন। এই সব লোকেরাই ইতালির সঙ্গে যুদ্ধ বাধবার পর হঠাৎ ফ্যাসিস্ট ডুচে-এর নিন্দাবাদ শুরু করলেন।

১৯৩৮ সালে, যে-গ্রীষ্মের মরশুমে ম্যুনিক চুক্তি হয় ঠিক তার এক বছর আগে নাৎসি গভর্নমেণ্ট থেকে আমার জার্মানি দেখবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। আমি যে নাৎসি মতবাদের বিরোধী সেই কথা জেনে শুনেও তারা আমাকে আহবান করল আমি যেন স্বচক্ষে ওদের দেশ দেখে যাই। নাৎসি সরকারের নিমন্ত্রিত অতিথি কিংবা ব্যক্তিগতভাবে, প্রকাশ্যে অথবা ছদ্মনামে—যেমন আমার ইচ্ছা আমি যেতে পারি, সর্বত্র আমার অবাধ প্রবেশাধিকার থাকবে—তারা আমায় এই কথা জানাল। আবার আমি ধন্যবাদের সঙ্গে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করি। এই দুই দেশে না গিয়ে আমি গেলাম 'সুদূর' চেকোশ্লোভাকিয়ায়—এই ছোট দেশটি সম্বন্ধে ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী সে সময় কত সামান্যই খবর রাখতেন সেকথা অবশ্য প্রমাণ হল অনেক পরে।

ম্যুনিক চুক্তির কিছুকাল আগে আমি ইংলণ্ডের মন্ত্রীপরিষদের কতিপয় সদস্য ও নামজাদা কয়েকজন রাজনীতিকের কাছে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদ সম্বন্ধে আমার বিরুদ্ধতা যে কোথায় সে বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেছিলাম। আমার কথাবার্তা শুনে তাঁরা যে খুব খুশি হলেন তা মনে হল না; বললেন আরও অনেক কথা আছে ভেবে দেখবার মত।

চেকোশ্লোভাকিয়ার সংকটময় মুহূর্তে ইঙ্গফরাসী কূটনীতির যে-বিকৃত প্রকাশ আমি প্রাগে, সুদেতেন অঞ্চলে, লণ্ডনে ও প্যারিসে দেখেছি; জেনিভার আন্তর্জাতিক পরিষদে যে-ধরনের যুক্তিতর্ক আমদানি করা হয়েছিল—সেসব দেখে শুনে এই দুটি জাতির প্রতি আমার সমস্ত মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছে। আমি অবাক হয়ে গেছি এদের

আচরণ দেখে। রণোন্মুখ জার্মানিকে প্রশান্ত করা একে বলে না—এর পিছনে ছিল হিটলারের শক্তির প্রতি একটা ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা।

ভাগ্যচক্রের বিবর্তনটা একটু অদ্ভুত বলতে হবে। ঠিক যে-সময় ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছে, সেই সময়টা আমি ও আমার মতাবলম্বী আরো অনেকে কারাগারে দিন যাপন করছি। আর সেই যারা উঠতে বসতে হিটলার মুসোলিনিকে সেলাম ঠুকেছে, চীনদেশে জাপানের ধর্ষণনীতির সমর্থক ছিল যারা আজ তারাই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও প্রজাতন্ত্রের পতাকা উঁচু করে ধরেছে।

ভারতেও এরকম ডিগবাজি খাওয়ার উদাহরণ বিরল নয়। এদেশেও অনেকে আছে সরকারের আঁচলধরা জো-হুকুমের দল, যারা একটুখানি প্রসাদের প্রত্যাশায় তোতা-পাখির মত সরকারের বাঁধাবুলি আওড়ে চলে। এই সেদিন পর্যন্ত তারা হিটলার মুসোলিনিকে আদর্শপুরুষের বেদীতে চড়িয়ে পঞ্চমুখে তাদের প্রশংসা গেয়েছে এবং ঠিক ততখানি উঁচু গলায় সোভিয়েট রাশিয়ার বাপান্ত করেছে। আজ হাওয়া বদলে গিয়েছে। এখন তারা সরকারের উঁচু চাকুরে, বড় বড় দপ্তরের কর্তা, জোরগলায় তারা ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের নিন্দা করে। কখনও বা একটুখানি দম নিয়ে অপেক্ষাকৃত নিচু গলায় প্রজাতন্ত্রের উল্লেখও করে, স্বায়ত্তশাসন যেন একটা সুদূর-পরাহত আশা। ঘটনাচক্র যদি উলটো মুখে ঘুরত, তাহলে এরা কি করত ভেবে পাই না। ভেবে না পাবার অবশ্য কোনো কারণ নেই, কারণ এটা তো জানা কথা যে শক্তিমান যারা তাদের গলায় মালা পরিয়ে অভিনন্দন করতে এরা সর্বদাই পা যেন বাড়িয়ে আছে।

যুদ্ধ বাধবার অনেক দিন আগে থেকেই আমার মন এই অনাগত আতঙ্কের জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল। আলাপে আলোচনায় কথায় বার্তায় আমার অনেক লেখার মধ্যে তার ইঙ্গিতও দিয়েছি। মন আমার প্রস্তুত ছিল। আমার স্পষ্ট ধারণা ছিল যে এ-যুদ্ধ হবে নীতি নিয়ে যুদ্ধ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় শক্তির সংগ্রাম। এই যুদ্ধ ভারত তথা জগতের পক্ষে একটা মহান পরিণামের সম্ভাবনা বহন করে আনবে। তাই আমি চেয়েছিলাম আমাদের দেশ যেন পৃথিবীজোড়া এই কুরুক্ষেত্রে তার সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভারতে বিপদ ঘটতে পারে বা বহিঃশত্রু ভারত আক্রমণ করতে পারে—এ রকম ধারণা তখন আমার মনে উদয় হয়নি। তবু আমি মনে-প্রাণে চেয়েছিলাম ভারত যেন তার আপন দায়িত্ব পুরোপুরি স্বীকার করে নেয়। তবে একটা কথা সম্বন্ধে আমি স্থির নিশ্চিত ছিলাম—ভারত তার দায়িত্ব নেবে অন্যদের সঙ্গে সমান হয়ে—স্বাধীন দেশ হিসাবে, অন্য কোনো ভাবে কখনই নয়।

আমাদের জাতীয় মহাসভা চেয়েছিলেন তাই। ভারতের একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান যা গোড়া থেকেই যেমন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তেমনি ফ্যাসিবাদ নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এসেছে—সে হল কংগ্রেস। এই কংগ্রেসই প্রথম থেকে প্রজাতান্ত্রিক স্পেন, চেকোস্লোভাকিয়া ও চীনের পথ সমর্থন করে এসেছে।

আজ দুবছর হল কংগ্রেসকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তার কার্যকলাপ সব আইন জারি করে বন্ধ। কংগ্রেস আজ কারাগারে। প্রাদেশিক ব্যবস্থা-

পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি যাঁরা, যাঁরা এই সব পরিষদের সভাপতি, দেশের যাঁরা মন্ত্রী ছিলেন, শহরে, গ্রামে ও জেলায় যাঁরা নেতৃস্থানীয় ছিলেন—তাঁরা সবাই আজ কারাগারে বন্দী।

এদিকে প্রজাতন্ত্রের নামে, অতলান্তিক চার্টার ও স্বাধীনতাচতুষ্টয়ের নামে যুদ্ধ চলেছে।

৪ : কারাগারে দিনযাপন : কর্মের আহ্বান

কারাগারে সময়ের গতি ও প্রকৃতি যেন বদলে যায়। যে-সব অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার প্রবাহ নূতনকে পুরাতন থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত করে এখানে সে-সব কিছুই নেই। যাকে আমরা বর্তমান বলি তা যেন এখানে চলৎশক্তিহীন হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে। নানাবিধ কর্মের সংঘাতে বাইরের যে-জগৎটা নিত্য নূতন জন্ম পরিগ্রহ করছে—সেটা যেন স্বপ্নের মত অলীক মনে হয়; মনে হয় সে-জগৎটা যেন জড় অতীতের মত অনড় অটল হয়ে নিঃশব্দে বসে আছে। বাইরের জগতে যাকে আমরা সময় বলে জানি তার অস্তিত্ব এখানে নেই। কালের প্রবহমাণ ধারা সম্বন্ধে মনের ধারণাটাও যেন ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায়। কদাচিৎ এক একটা চিন্তা গা-ঝাড়া দিয়ে জেগে ওঠে, সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে নিঃসাড় মনটাকে বর্তমানের মোহাচ্ছন্ন কারাগার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অতীত কিংবা ভবিষ্যতের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে দেয়। অগস্ত্ কঁত্-এর কথায় আমরা যেন বেঁচে আছি মৃত্যুলোকে—আমাদের অতীত সত্তার শত পাকে আমাদের আজকের জীবন বিজড়িত। কঁত্-এর এই কথার সত্যতা আরো ভাল করে বুঝতে পারি কারাবাসে—সেখানে আমাদের উপবাসজীর্ণ বন্দী মন অতীতের স্মৃতি কিংবা ভবিষ্যতের কল্পনা থেকে তার যৎসামান্য খোরাক সংগ্রহ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

অতীত যেন পটে আঁকা ছবির মত, ব্রোঞ্জ কিংবা মার্বেলে তৈরি মূর্তির মত স্তব্ধ ও সমাহিত। চির পুরাতন অনাদি অতীত—তার কোনো পরিবর্তন নেই। বর্তমানের ঝড় ঝঞ্ঝায় মন যখন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, তখন শ্রান্ত মন অতীতের অতল গভীরে শান্তি খোঁজে। স্তব্ধ গম্ভীর পুরাতনের মধ্যে এমন একটি প্রশান্তির আশ্বাস আছে যে মন যেন সেখানে তার একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পায়, আত্মা পায় মুক্তি।

কিন্তু যে-অতীত বর্তমানের নানা সংঘাত ও সমস্যার সঙ্গে যুক্ত নয়—সে-অতীত মৃত। এ যেন শিল্পের খাতিরেই শিল্প সৃষ্টির মত—এতে প্রাণের উদ্দীপনা নেই—তাগিদ নেই। প্রাণের তাগিদ যদি না থাকে, তা হলে আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রাণশক্তি সমস্তই ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যায়; অস্তিত্বের এমন একটা স্তরে গিয়ে আমরা পেঁছাই যেখানে বেঁচে থাকা নামেই বেঁচে থাকা, যেখানে জীবন অতি সহজেই বিলীন হয়ে যায় মৃত্যুর মধ্যে। অতীতের কারাগারে বন্দী হয়ে আমরা নিজেরাও স্থাণু হয়ে পড়ি। জেলখানার একঘেয়ে জীবনের অকর্মণ্যতায় মন যখন শক্তি হারিয়ে ফেলে, তখন প্রাচীন কালের দিকে মন যেন অতি সহজে তার নিজের অলক্ষ্যে এগিয়ে যায়।

তবু একথা অস্বীকার করার জো নেই যে অতীত সারাক্ষণ আমাদের জীবন বিধৃত করে আছে। আজ আমাদের যা কিছু আছে সে-সব কিছু আমরা পেয়েছি অতীতের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে, আমরা নিজেরা সেই প্রাচীন অতীতের সন্তানসন্ততি। তার থেকে জন্মেছি তার মধ্যেই ডুবে আছি। যদি অতীতকে ঠিক মত বুঝতে না পারি, জীবনের অঙ্গীভূত করে তাকে দেখতে না শিখি—তা হলে নিছক বর্তমানের মধ্যে বেঁচে থাকা আমাদের নিরর্থক। অতীতকে যদি বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত করে ভবিষ্যৎ অবধি প্রসারিত করতে পারি, এবং যোগ করা অসম্ভব হলে যদি অতীতের বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে পারি, যদি অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ এই তিন কালের সমন্বয় সাধন করে বাক্যে চিন্তায় ও কার্যে একটা উদ্দীপনাময় প্রাণের স্পন্দন সঞ্চার করতে পারি—তবে সেটাই হবে সত্যকার জীবন, তাকেই বলে বাঁচার মত বেঁচে থাকা।

সব বড় কাজের উৎস রয়েছে প্রাণের গভীরে। ব্যক্তিবিশেষ কিংবা জাতিবিশেষের ঐতিহ্যপরম্পরায় এই বৃহৎ কাজের পরম লগ্নটুকু—নির্ধারিত হয়ে আসে। একটা জাতির ধারা, ব্যক্তিবিশেষের বংশানুক্রম পারিপার্শ্বিক ও শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব, অবচেতন মনের অন্ধগতি, জন্মাবধি যত কিছু ভাবনা চিন্তা কল্পনা কর্ম—এই সব কিছুর বিরাট সমুদ্র মন্থন থেকে একটি নূতন কাজের প্রেরণা আসে অবশ্যম্ভাবী পরিণতির মত। এই একটি কাজ আবার অন্যান্য নানা কাজের মত ভবিষ্যৎকে প্রভাবান্বিত করে। কেবল প্রভাব বিস্তার করে যে তা নয়, অনেক সময় হয়তো ভবিষ্যতের রূপ নির্ধারণ করে দেয়। তবু এই প্রক্রিয়াকে নিছক অদৃষ্ট বা নিয়তি নাম দেওয়া বোধ করি অনুচিত হবে।

অরবিন্দ ঘোষ কোথায় যেন বর্তমানের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন 'অকলঙ্ক কুমারী মুহূর্ত'। এ হল জীবনের তীক্ষ্ম ক্ষুরধার একটি ক্ষণ যা এই মুহূর্তে ভবিষ্যৎ থেকে অতীতকে বিচ্ছিন্ন করে এবং তার পরমুহূর্তে আবার করে না। 'কুমারী মুহূর্ত' কথাটি শ্রুতিমধুর, কিন্তু এর অর্থ কি? কুমারী মুহূর্ত তার নিষ্কলঙ্ক শুভ্র নগ্নতায় ভবিষ্যতের অবগুণ্ঠন মোচন করে বেরিয়ে আসে। আমাদের সংস্পর্শে আসা মাত্র সে ব্যবহার পর্যুসিত কলঙ্কিত অতীতে পরিণত হয় কেন? আমরা কি তার কৌমার্য অপহরণ করে তাকে কলঙ্কিত করি? অথবা এও কি হতে পারে না যে এর কৌমার্যই মিথ্যা—বর্তমানের এই কুমারী মুহূর্তটি বহুভোগ্যা অতীতের সঙ্গে নিকট আত্মীয়তাসূত্রে বাঁধা!

দর্শনে যাকে আত্মকর্তৃত্ব বলে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অপর পক্ষে আবার অদৃষ্টবাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে থাকতে মন চায় না। অতীতের জটিল ঘটনাবলীর সংঘাতে মানুষের ভাগ্য অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। এর উপর মানুষের হাত নেই। যাকে মানুষ স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিংবা অন্তনিঃসৃত প্রেরণা বলে মনে করে, তাও কার্যকারণসূত্রে অচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা। শোপেনহাওয়ার তো বলেইছেন "মানুষ তার ইচ্ছামত কাজ করতে পারে, কিন্তু ইচ্ছা তার ইচ্ছাধীন নয়।" অদৃষ্টবাদের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে গেলে স্থাণু হয়ে হাত পা গুটিয়ে জীবন্মৃত হয়ে বসে

থাকতে হয়। জীবনকে আমি যেভাবে জেনেছি, তাতে ললাটের লিখনের উপর নির্ভর করে থাকা আমার পক্ষে অসহ্য মনে হয়। মনের এই বিদ্রোহী ভাবটাই আমার হয়তো কার্যকারণসূত্রে অতীত ঘটনাবলীর সঙ্গে বাঁধা—কে জানে।

যেসব দার্শনিক সমস্যার সমাধান হয় না, সেরকম তত্ত্ব নিয়ে আমি সচরাচর মাথা ঘামাই না। কারাবাসের অখণ্ড নীরবতার মধ্যে কখনও আবার নিরবচ্ছিন্ন কর্মব্যস্ততার মধ্যেও এই প্রশ্নগুলি যেন আপনা থেকেই মনে জাগে। এই সব কথা ভাবলে মনটা বেশ নিরাসক্ত হয়ে যায়, দুঃখের দিনে কেমন যেন একটা শান্তি মেলে। সে যাই হোক সাধারণত কাজ এবং কাজ সম্বন্ধে ভাবনা চিন্তা করেই আমার বেশির ভাগ সময় কাটে। হাতে যখন কাজ থাকে না তখন মনে মনে ভেবে নিই যে কাজের জন্য যেন তৈরি হচ্ছি।

অনেক কাল আগে থেকে কাজের ডাক শুনেছি। মনন থেকে বিযুক্ত নয়, মননের উৎস থেকে নিঃসৃত এই কর্মের ধারা। ক্বচিৎ যখন এই দুয়ের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় ঘটে, যখন চিন্তা কর্মের প্রতি ধাবিত হয়ে কর্মের মধ্যে পরিণতি লাভ করে এবং কর্ম পরিপূর্ণ চিন্তা ও জ্ঞানের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়—তখন জীবনের মধ্যে একটা যেন পরম সার্থকতা খুঁজে পাই, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তখন একটি নিশ্চিত উদ্দেশ্য দ্বারা স্পন্দিত হয়ে ওঠে। কালে ভদ্রে আসে এই পরম মুহূর্তগুলি। বেশির ভাগ সময়ে কর্ম ও চিন্তা একে অন্যকে অতিক্রম করে জীবনকে সুরহীন করে ফেলে। বিশেষ চেষ্টা করলেও তখন যেন দুয়ের মধ্যে জোড় মেলে না। অনেক কাল আগে একটা সময় ছিল যখন কর্মের মাদকতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে একটা অদ্ভুত উত্তেজনাময় অবস্থার মধ্যে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিয়েছি। অতীতের সেই দিনগুলির সঙ্গে আজকের আমার মনের অবস্থার কত ব্যবধান, এ-ব্যবধান কেবল কালের নয়—মাঝখানে রয়েছে কত বেদনা, কত ভাবনা, কত অভিজ্ঞতার সুদূর বিস্তৃত সমুদ্র। মনের সেই উদ্বেল অবস্থা আগেকার মত আর নেই; দুর্দম প্রবৃত্তি ও ভাবাবেগ ক্রমেই যেন প্রশমিত ও আয়ত্তীভূত হয়ে এসেছে। চিন্তার বোঝা নিয়ে চলতে গেলে অনেক সময় বাধার সৃষ্টি হয়, ভাবনাহীন মনের নিশ্চিত প্রত্যয়ের স্থানে দ্বিধা সন্দেহ জমে ওঠে। এই যে মানসিক পরিবর্তন হয়তো এটা পরিণত বয়সের লক্ষণ, হয়তো বা এটা নূতন কালের ধারা—কে জানে।

কিন্তু এখনও যখন কর্মের আহ্বান আসে মনের গভীরে যেন একটা দোলা দিয়ে যায়। সুবুদ্ধির সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছা হয়। কর্মের উত্তেজনা-সংকুল আবর্তে, বিপদ-আপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটা চরম দুঃসাহসিকতায় মৃত্যুকে পর্যন্ত উপেক্ষা করতে ইচ্ছা করে। আমি মৃত্যুপ্রেমিক নই তা বলে আমি যে মৃত্যুকে ভয় করি তা নয়। জীবনকে অবহেলা করে বৈরাগ্যসাধন—সে আমার প্রকৃতিগত নয়। জীবনকে আমি বরাবর ভালবেসে এসেছি, এখনও নানাবিধ অদৃশ্য বাধা সত্ত্বেও জীবনকে আমি পুরোপুরি উপভোগ করতে চাই। ভালবাসি বলেই বোধ করি জীবনের সঙ্গে আমার খেলা করতে ইচ্ছা করে, জীবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে উঁকি

মেরে দেখতে ইচ্ছা করে পরপারে কি আছে। ভালবাসি বলেই জীবনের দাসত্ব করতে আমি নারাজ, নিতান্ত অন্তরঙ্গের মত জীবনের সঙ্গে আমার ব্যবহার। হয়তো আমার উচিত ছিল বৈমানিক হওয়া। জীবনের একঘেয়ে মন্থর গতি থেকে মুক্ত হয়ে তা হলে ছিটকে বেরিয়ে পড়তাম ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মেঘলোকে কবির সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে পারতাম—

তুলাদণ্ডে সব কিছু ওজন করে দেখেছি আমি
অর্থহীন অনাগত ভবিষ্যৎ, অর্থহীন অতীতের দিন।
আমার এই তুলাদণ্ডে সবই সমান—
অতীত, ভবিষ্যৎ, জীবন, মৃত্যু—সমমাত্রিক সব কিছু।

৫ : অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্র

আমার সকল ভাবনা সকল কাজের মধ্যে দিয়ে এই একটি ইচ্ছা সকল সময় কাজ করে এসেছে—সে হল কাজের ভিতর দিয়ে জীবনকে উপলব্ধি করার আগ্রহ। আমার একনিবিষ্ট একটানা চিন্তা—সেও এক প্রকার কাজ বিশেষ, অন্ততপক্ষে আগামী কাজের সূচনা আছে তার মধ্যে। শূন্যালোকের ধোঁয়াটে কল্পনা সে নয়, সেই চিন্তার সঙ্গে কর্মময় জীবনের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। অতীত যেন এনে দেয় আমাকে বর্তমান কালের কর্মের আবর্তে—সেখান থেকে ওই একই কর্মের প্রবাহ আমাকে যেন ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত করে। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ-কালের এই ত্রিধারা একই উৎস থেকে বেরিয়ে একই পথে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আমার এই কারাজীবনে কর্মের বালাই নেই। কিন্তু আমার ভাবনা চিন্তা অনুভূতি সবই যেন একটা অনাগত অথচ কল্পিত কাজের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা। কারাজীবনে আমি এই একটা অর্থ খুঁজে পাই, তা যদি না পেতাম তা হলে উদ্দেশ্যবিহীন শূন্যতার মধ্যে বেঁচে থাকা অসহ্য মনে হত। কাজের ক্ষেত্র থেকে অপসৃত হয়ে আছি বলেই হয়তো অতীত ও অতীতের ইতিহাস আমার কাছে প্রকাশ পায় নূতন রূপে। অনেক সময় আমার নিজের জীবনের উপর ইতিহাসের প্রভাব পড়েছে; কখনও বা এমনও ঘটেছে যে আমার ব্যক্তিগত আওতার মধ্যে আমি এমন কিছু কিছু ঘটনা প্রভাবান্বিত করেছি যা পরবর্তীকালে ইতিহাসের বিষয়রূপে গণ্য হয়েছে। সুতরাং ইতিহাসকে জীবনের অঙ্গরূপে প্রত্যক্ষ করা আমার পক্ষে কঠিন ছিল না—বেশ ভাবতে পারতাম যে আমিও তো সেই জীবনপ্রবাহের একটি ঢেউ।

ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করেছি আমি বেশ একটু দেরিতে। ঘটনা তারিখ মুখস্থ করে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ বিবর্জিত কতকগুলি তথ্য সন্ধান করার একটা সদর রাস্তা আছে—সেই পুঁথিপড়া বিদ্যার সদররাস্তা দিয়ে আমি ইতিহাসের রাজ্যে প্রবেশ করিনি। এ যদি করতাম তা হলে ইতিহাস আমার কাছে নিরর্থক হত। অতি প্রাকৃত

বিষয়ে কিংবা পরকালের সমস্যা আমার কাছে ছিল ততোধিক নিরর্থক। আমার যে-সব বিষয়ে সত্যকার আগ্রহ ছিল তা হল বিজ্ঞান; ইহজীবনের ও বর্তমান কালের সমস্যা আমার কাছে ছিল ঢের বড়।

কর্মের প্রেরণা আমি কখনও পেয়েছি বিচারবুদ্ধি থেকে, কখনও আবার নিছক ঝোঁকের মাথায় কাজ করে গেছি। এক একটা কাজের পিছনে মননশক্তি কতটা এবং কতটা অন্ধ আবেগ—সে-কথা বিশ্লেষণ করে বলা শক্ত। তবে একটা কথা ঠিক কর্ম থেকে চিন্তার মধ্যে বার বার ফিরে গেছি বর্তমানকে ভাল করে বোঝবার চেষ্টায়। বুঝতে গিয়ে দেখেছি বাইরে বর্তমানের শাখাপ্রশাখা কিন্তু কালের শিকড় রয়েছে অতীতের গহ্বরে। সুতরাং আমি পাড়ি দিয়েছি—অতীতকে আবিষ্কারের নেশায়, সন্ধান করেছি বর্তমানকে বোঝবার জন্য চাবিকাঠি পাওয়া যায় কি না। বর্তমান এত প্রত্যক্ষ যে তার কড়া শাসন এড়িয়ে যাই সাধ্য কি। এমন অনেক সময় ঘটেছে যে স্থান কাল পাত্র সব কিছু ভুলে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি ইতিহাসের ঘটনা বা ঐতিহাসিক ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে। পরমুহূর্তে বর্তমান তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমায় সজাগ করে দিয়েছে—আমি বুঝেছি আমি যতখানি পুরাকালের, পুরাকাল তার চাইতে অনেক বেশি আমার এই বর্তমান কালের মধ্যে। অতীত ইতিহাস মিশেছে সমসাময়িক ইতিহাসে—অতীতের আশা আনন্দ সুখ-দুঃখ মিলেছে বর্তমান কালের প্রত্যক্ষগোচর ঘটনাবলীর মধ্যে।

অতীত যেমন বর্তমানে রূপান্তরিত হয়, তেমনি কখনও কখনও বর্তমান আবার পিছু হটে চলে যায় দূর অতীতের দিকে, স্থির হয়ে দাঁড়ায় অতীতের স্তব্ধ প্রতিমূর্তির মত। কর্মব্যস্ততার মধ্যে হঠাৎ কেমন একটা অনুভূতি আসে, মনে হয় এ যেন কোন বিস্মৃত দিনের ঘটনার স্মৃতি মনের পর্দার উপর ছবির মত ভেসে আসছে।

পুরাতন কালকে আবিষ্কার ও পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সম্বন্ধ নির্ণয় করতে গিয়ে বারো বছর আগে আমার কন্যার কাছে পত্রাকারে "বিশ্বরূপ দর্শন" ("গ্লিম্পসেস অফ ওয়ার্লড হিসট্রি") বইটি লিখেছিলাম। সে-লেখা নিতান্তই ভাসা ভাসা লেখা—তেরো বছরের মেয়েকে লেখা সহজ সরল বিবরণ। কিন্তু সে-লেখার পিছনে ছিল এই আবিষ্কারের—এই লুপ্তোদ্ধারের নেশা। অভিযান করেছি অতীতের মহাসমুদ্রে—বিভিন্ন কালে বিভিন্ন যুগে বসবাস করেছি, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নরনারীর নিকট প্রতিবেশী হয়ে। জেলে ছিল প্রচুর অবসর। তাড়াহুড়ো ছিল না, নির্দিষ্ট কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার তাগিদও ছিল না। মন চলে গিয়েছিল অবাধ ভ্রমণে। খেয়াল-খুশি মত কোথাও বা বসে একটু জিরিয়ে নিয়েছি। কোথাও বা অতীতের ঘটনা ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য পুরাতনের জীর্ণ কঙ্কালকে রক্তমাংস দিয়ে জীবন্ত করে সাজিয়ে তুলেছি।

পরবর্তী কালে আমি যে আত্মজীবনী লিখেছি তাও ওই একই সন্ধানের ইচ্ছা থেকে লেখা—যদিচ সেখানে আমার অভিযান নিকটতর ও পরিচিত স্থান কাল পাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

এই বারো বছরে আমি বোধ করি অনেকখানি বদলেছি। আমার ভাবনা চিন্তা আগেকার চাইতে অনেক বেশি অন্তর্মুখীন হয়েছে। মনের সেই অস্থির ভাব অনেকটা কেটে গিয়ে একটা স্থৈর্য ও সাম্যাবস্থা এসেছে, বুদ্ধি অনেকটা মোহবিমুক্ত হয়েছে এবং অন্তরের বিরোধ অনেকটা যেন প্রশমিত হয়েছে। আগে শোকে দুঃখে যতটা মুহ্যমান হয়ে পড়তাম আজকাল ততটা উদ্বিগ্ন আর হই না। খুব কঠিন আঘাত পেয়েও মনটা আর আগেকার মত বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয় না—আর হলেও সেটা অল্পক্ষণের জন্য; অনেকবার মনে হয়েছে মনের এরকম অবস্থা কেমন করে হল—একি অদৃষ্টের উপর নির্ভরশীলতা, একি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণশক্তির ক্ষয়। হয়তো ক্রমাগত দুঃখের সংঘাতে অনুভূতির ধারটাই নষ্ট হয়ে গেছে, হয়তো দীর্ঘ কারাবাসের ফলে জীবনের স্রোত ভাটার টানে ক্রমেই সরে সরে যাচ্ছে, তটভূমির উপর তরঙ্গের রেখা রেখে। বেদনাক্ষুব্ধ মন সারাক্ষণ একটা পরিত্রাণের পথ খোঁজে, বোধ করি এইজন্যই অনুভূতিগুলি ক্রমে ক্রমে ভোঁতা হয়ে যায় এবং যতদিন যায় ততই একটা ধারণা মনকে পেয়ে বসে যে পৃথিবীতে এত পাপতাপ—একটু কমবেশি যদি হয় তাতে কিছু আসে যায় না। এই দুঃখ কষ্টের পৃথিবীতে কেবল একটি জিনিস আছে যা কেউ কেড়ে নিতে পারে না—সে হল অবিচলিত সাহসে সগৌরবে নিজের জীবনের আদর্শকে অনুসরণ করে চলা। কিন্তু রাজনীতিকের পক্ষে সে-চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

কিছু কাল আগে কে একজন বলেছিলেন : মৃত্যু সকলের জন্মগত অধিকার। স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে ঘুরিয়ে বলার অদ্ভুত চেষ্টা এটা। আসলে এই জন্মগত অধিকার সম্বন্ধে কারুরই মতদ্বৈধ নেই—থাকতে পারে না—তবে একথাও সত্য যে যতক্ষণ পারা যায় মৃত্যুকে আমরা ভুলে থাকতে ও মৃত্যুর কবল এড়িয়ে চলতে চাই। অদ্ভুত হোক—কথাটা আমার কাছে বেশ নূতন ও মনোজ্ঞ ঠেকেছিল। যারা জীবন নিয়ে নিতান্ত করুণ-ভাবে অনুযোগ করে, তারা তো ইচ্ছা করলেই মুক্তি পেতে পারে। এই মুক্তির রাস্তা সবারই জানা, সবারই আয়ত্তের মধ্যে। জীবনের উপর প্রভুত্ব করতে না পারি, মৃত্যু আমাদের দাস। এই কথাটা মনে ভাবলেও ভাল লাগে, মনের অসহায় ভাবটা কেটে যায়।

৬ : জীবনের আদর্শ

ছ'সাত বছর আগে আমেরিকার একজন প্রকাশক আমাকে ধরেছিলেন তাঁর সংগৃহীত আলোচনা পুস্তকের জন্য—আমি আমার জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখি। প্রস্তাবটা মন্দ লাগেনি, তবে কেমন যেন দ্বিধা বোধ করছিলাম। যত প্রস্তাবটা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি ততই যেন অনিচ্ছার ভাবটা বেড়েছে। শেষ পর্যন্ত সে প্রবন্ধ আর আমার লেখা হয়নি।

আমার জীবনের আদর্শ কি ছিল, আমি জানতাম না। কিছুকাল আগে প্রস্তাবটা এলে হয়তো এমন দ্বিধা বোধ করতাম না। তখন আমার ভাবনা চিন্তা ও লক্ষ্য যেমন সুনির্দিষ্ট ছিল আজ তেমন আর নেই। গত কয়েক বছরে ভারতে, চীনে, ইউরোপে

এককথায় বলতে গেলে সারা পৃথিবীতে যা ঘটে গেছে তা আমার সমস্ত চিন্তাধারাকে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন করে ওলট পালট করে দিয়েছে। পূর্বে আমার মনে ভবিষ্যতের ছবিটা আঁকা ছিল সুস্পষ্ট রেখায়—আজ সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয় সবই যেন ধোঁয়াটে-ঝাপ্সা!

মূলনীতি সম্পর্কে এই যে দ্বন্দ্ব, এটা অবশ্য হাতের গোড়ায় কাজ করবার পথে কখনো বাধা সৃষ্টি করেনি। তবে একথা সত্য যে এই অন্তর্বিরোধের ফলে কাজের মধ্যে যতখানি উৎসাহ পাওয়া উচিত ততটা হয়তো পাইনি। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে উৎসাহ যেন আপনার অমোঘ শক্তিতে এগিয়ে চলত—জ্যামুক্ত তীরের মত সব কিছু উপেক্ষা করে সোজা ছুটত লক্ষ্যের দিকে। তবু কাজের তাগিদেই কাজ করে যেতাম। কখনও সেই কাজের সঙ্গে আমার আদর্শের সত্যকার মিল থাকত, কখনও বা মিল থাকত কল্পনায়। ক্রমেই যেন তখনকার দিনের রাজনীতির প্রতি শ্রদ্ধা কমে যেতে লাগল, জীবনের প্রতি আমার মনোভাবও যেন সেই সঙ্গে বদলে গেল।

কাল যে আদর্শ লক্ষ্য করে মানুষ এগিয়ে চলেছে, আজকের আদর্শও ঠিক তাই। তবু যতদিন যায় ততই যেন সে আলোক নিষ্প্রভ হতে থাকে, যত এগিয়ে চলি ততই যেন সেই জ্যোতির্ময় রূপটি ম্লান হয়ে যায়। অথচ একদিন এই আলোই শরীরে তেজ দিয়েছে, মনে উত্তাপ সঞ্চার করেছে। অধর্মের কাছে বার বার সত্যের আলোক পরাভূত হয়েছে। এর চাইতে মর্মান্তিক হয়েছে যখন স্থূল প্রয়োজনের তাগিদে সত্য বিকৃত হয়েছে। এত দুঃখ এত দুর্গতি—তবু মানুষের শিক্ষা হল না। আজ পর্যন্ত সে শিখতে পারল না লোভ, হিংসা ও প্রবঞ্চনার ঊর্ধ্বে উঠে কি ভাবে মানুষ মানুষের মত ব্যবহার করতে পারে। এজন্য কি যুগযুগান্তের শিক্ষা প্রয়োজন? আর যতদিন না সে-শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, ততদিন কি মানুষের প্রকৃতি বদলে দেবার সব চেষ্টা ব্যর্থ হবে?

কর্ম এবং কর্মফল এদুটো কি অচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা? পরস্পর পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়া করছে। কুকর্মের ফলে কুফল ফলছে। অসদুপায় অবলম্বন করতে গিয়ে সমস্ত লক্ষ্যটাই হয়তো বিকৃত কিংবা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দুর্বল স্বার্থান্ধ মানুষ সদুপায় অবলম্বন করবে এমন ক্ষমতা বা সৎসাহসই বা তার কোথায়? তাহলে কি করা যায়? অন্যায়ের বিরুদ্ধে না দাঁড়িয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা পরাজয় স্বীকারের নামান্তর। আবার কাজ করতে গেলেও অনেক সময় কোনো না কোনো রূপে এই অন্যায়কে মেনে নিতে হয়—এই মেনে নেওয়ার মধ্যে অশেষ দুর্ভোগ।

জীবনের প্রারম্ভে আমি জীবনসমস্যায় সম্মুখীন হয়েছিলাম খানিকটা বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে বিজ্ঞানের যে আশাবাদী দৃষ্টি—সেই দৃষ্টিতে আমি সব কিছু যেন রঙিন করে দেখেছিলাম। নিরাপদ নির্ভাবনার জীবন, শরীর মনে প্রচুর তেজ ও ততোধিক আত্মপ্রত্যয়—সব কিছু মিলে আমার মনে ভবিষ্যতের একটি উজ্জ্বল ছবি জাগিয়েছিল। মানুষের প্রতি একটা প্রীতির ও সৌভ্রাত্রের ভাব এই আদর্শটা আমার খুব ভাল লাগত।

আচারের ভিতর দিয়ে যে-ধর্মের প্রকাশ, যে-ধর্ম অনেক বুদ্ধিমান লোকও বিশ্বাসের বস্তু করে নিয়েছিলেন, সে-ধর্মের প্রতি—তা সে হিন্দুধর্ম, ইসলাম, বৌদ্ধধর্ম বা খৃস্টধর্মই হোক—আমার কোন আস্থা ছিল না। আমার মনে হয় এই প্রকার প্রচলিত ধর্ম কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। জীবনের নানা সমস্যার সম্মুখীন হবার জন্য যে বিচারবুদ্ধি ও সত্যানুসন্ধিৎসা থাকা দরকার এই ধর্ম তা শিক্ষা দেয় না। মানুষকে ইন্দ্রজাল দ্বারা প্রতারণা করে, বিচারবুদ্ধিশূন্য মূঢ়তার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং অতি প্রাকৃতের প্রতি আস্থাবান করে।

সে যাই হোক, একথা না মেনে উপায় নেই যে মানুষের অন্তরের অনেকগুলি দাবী মিটিয়ে এসেছে ধর্ম। একটা কোনো ধর্মবিশ্বাস ব্যতীত পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকের চলে না। একদিকে যেমন ধর্মবিশ্বাসের আওতায় অনেক মহৎচরিত্র নরনারী দেখি, তেমনি আবার দেখি ধর্মের প্রভাবে পড়ে মানুষ অন্ধবিশ্বাসী হয়েছে, এত সংকীর্ণ হয়েছে তাদের মন যে ধর্মের নামে তারা নৃশংস অত্যাচার করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। ধর্ম মানুষকে ভাল মন্দ বিচারের একটা মাপকাঠি দিয়েছে—হতে পারে এ মাপকাঠি অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক যুগে অচল, তবু একথা সত্য যে ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য ও নীতির গোড়াপত্তন হয়েছে এই বিচারের বুদ্ধির উপর।

ব্যাপক অর্থে বলতে যা বুঝি তার কারবার হল মানুষের এমন সব অভিজ্ঞতা নিয়ে যা আধুনিক বিজ্ঞান-কর্তৃক নির্দিষ্ট নয়। জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা পরিমিত জগতের বাইরে এই অভিজ্ঞতার জগৎ—এর রূপ আলাদা, ভাষা আলাদা। এটা বেশ সহজেই বোঝা যায় যে আমাদের চারদিকে একটা অদৃশ্য অজ্ঞাত জগৎ রয়েছে, যার স্বরূপ জানতে বিজ্ঞান অল্পবিস্তর চেষ্টা করেছে কিন্তু জানতে পেরেছে অতি সামান্য। অনেক সত্য বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে সত্য, কিন্তু এখানে তার অনুসন্ধিৎসা কার্যকরী হতে পারেনি। দৃশ্যমান জগতের সঙ্গে, জীবনের বহিঃপ্রকাশের সঙ্গে বিজ্ঞানের পরিচয়। বাঙ্‌মনের অগোচর এই যে একটি অদৃশ্য মানসলোক—একে বৈজ্ঞানিক উপায়ে হৃদয়ঙ্গম করা এক প্রকার অসম্ভব। মানুষের জীবন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির দ্বারা কিংবা দেশে দেশে কালে কালে পরিবর্তনশীল এই বহির্জগতের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। জীবন সর্বদা ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত একটি অদৃশ্য লোককে যেন স্পর্শ করছে। এ-জগৎ যে ধাতু দিয়ে তৈরি তা বহির্জগতের মতই অবস্থাভেদে স্থাণু কিংবা চলমান কি না সেকথা কেউ জানে না। তবে হেন চিন্তাশীল লোক নেই যিনি এই অদৃশ্য জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারেন।

জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞান আমাদের বিশেষ কিছু বলতে পারে না, যা বলে তা অতি যৎসামান্য। আজকাল ক্রমেই বিজ্ঞানের পরিধি বিস্তৃততর হচ্ছে, হয়তো অচিরে একদিন বিজ্ঞান তথাকথিত অদৃশ্য জগতের দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদ করে ঢুকে পড়বে। তখন হয়তো বিজ্ঞানের সাহায্যে জীবনের লক্ষ্য কি সে-বিষয়ে আমরা জানতে পারব, হয়তো বিজ্ঞান অস্তিত্বের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের উপর কিছুটা আলোক-সম্পাত করতে পারবে। বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে বহুকালের বিরোধ

আজ নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছে, এখন বৈজ্ঞানিক উপায়ে ধর্মপ্রভাবিত মানসিক অবস্থা ও অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা চলছে।

ধর্মের সঙ্গে ভক্তিবাদ, আধ্যাত্মিকতা ও দর্শনের খুব নিবিড় সম্বন্ধ। অনেক বড় বড় মরমী সাধু সন্ত জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁদের প্রতি মন অতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। আত্মপ্রবঞ্চনাপরায়ণ নির্বোধ পাগল বলে তাঁদের উপেক্ষা করা চলে না। প্রচলিত অর্থে "মিস্টিসিজম্" বলতে যা বোঝায় তা আমার মনে নিছক বিরক্তির উদ্রেক করে। এর মধ্যে একটা নরম মেদবহুল ধোঁয়াটে রূপের ইঙ্গিত আছে যা আমার রুচিবিরুদ্ধ। কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে না গিয়ে এ যেন মনকে ভাবুকতার রসের সমুদ্রে গা ভাসিয়ে দেওয়া। কখনও কখনও হয়তো মনকে এই ভাবে বন্ধনমুক্ত করার ফলে একটা অন্তর্দৃষ্টির পথ খুলে যায়। কখনও আবার প্রপঞ্চের পথেও তো নিয়ে যেতে পারে।

অধ্যাত্মবাদ ও দর্শন অথবা আধ্যাত্মিক দর্শন—আমার মনকে আকৃষ্ট করে অনেক বেশি। দর্শনের বেলা গভীর মনন-শক্তির প্রয়োজন হয়, প্রয়োগ করতে হয় যুক্তি-তর্কের। এই যুক্তিতর্কগুলি আবার কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বতঃসিদ্ধ বলেই সেগুলি সব সময় সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় কি। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই অধ্যাত্মবাদ ও দর্শন নিয়ে অল্পবিস্তর নাড়াচাড়া করে থাকেন। তা না করলে বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কেউ কেউ অধ্যাত্মবাদ ও দর্শন বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য বেশি আগ্রহ দেখিয়ে থাকেন, যুগে যুগে কালে কালে এই আগ্রহের তারতম্যও ঘটে থাকে। প্রাচীন যুগে এশিয়া ও ইউরোপে উভয় মহাদেশেই বহির্জীবনের চাইতে আত্মিক জীবনকে মানুষ প্রাধান্য দিয়েছে বেশি, এবং তার ফলে অধ্যাত্মবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রের চর্চাও হয়েছে সে যুগে বেশি। আজকালকার মানুষ বাইরের জগৎটা নিয়ে বড় বেশি ব্যস্ত, সংকট ও দুশ্চিন্তার মুহূর্তে মনের জগতে ফিরে গিয়ে তত্ত্বালোচনা করা ছাড়া তার গত্যন্তর নেই।

জীবন দর্শন আমাদের প্রত্যেকেরই একটা না একটা আছে, কারও ক্ষেত্রে সেটা সুনির্দিষ্ট কারও ক্ষেত্রে আবার অনির্দিষ্ট। বেশির ভাগ লোকই আর পাঁচজনের মত মনোবৃত্তি নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়, অত জল্পনা কল্পনার ধার ধারে না। কালের গতি এমন যে আর পাঁচজনের মত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। যে-ধর্মের আওতায় আমরা মানুষ তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত কতগুলি আধ্যাত্মিক মতবাদ আমরা বিনা বিচারে স্বীকার করে নিই। অধ্যাত্মবাদ আমার মনকে তেমন ভাবে কখনও আকৃষ্ট করেনি। সত্যি বলতে কি, ধোঁয়াটে ধরনের জল্পনাবিলাসের প্রতি আমার বরাবরই কেমন একটু অবজ্ঞা ছিল। তা সত্ত্বেও একথা নিশ্চয় বলব যে নিছক জ্ঞানের দিক থেকে প্রাচীন ও আধুনিক আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ভাবধারার অনুসরণ করতে গিয়ে আমি অনেক সময় মুগ্ধ হয়েছি। মুগ্ধ হয়েছি বটে কিন্তু খুশি হতে পারিনি, একটা অপরিচয়ের জড়তা থেকে গেছে। জ্ঞানের ইন্দ্রজাল থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে যেন বেঁচে গেছি।

আসলে আমার কারবার হল আমার এই পরিচিত পৃথিবীটুকু নিয়ে, ইহ জীবন নিয়ে, পরলোক কিংবা পরজন্মের প্রতি আমার কোনো স্পৃহা নেই। আত্মা বা

জন্মান্তর বলে কোনো জিনিস আছে কি না আমি জানি না। এগুলি গুরুতর প্রশ্ন হতে পারে কিন্তু এসব প্রশ্নে আমি বিচলিত হই না। যে পারিপার্শ্বিকে আমি মানুষ হয়েছি সেখানে আত্মা, পরজন্ম, কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ স্বতঃসিদ্ধ বলে স্বীকৃত। এই আবহাওয়া দ্বারা আমার মন প্রভাবিত সুতরাং এগুলি বিশ্বাস করার দিকে আমার একটি স্বভাবসিদ্ধ ঝোঁক আছে। দেহ মরে গেলেও আত্মার বিনাশ নেই, জীবন কার্য কারণ দ্বারা নির্দিষ্ট—এরূপ বিশ্বাস যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হলেও, একথা অস্বীকার করার জো নেই যে সকল কর্মের মূল যে কারণটা রয়েছে তা আমরা কেউ জানি না। সেইখানেই তো যত গোলযোগ। আত্মাকে স্বীকার করলে জন্মান্তর স্বীকার না করে উপায় নেই।

আমি এসব মতবাদ বা অনুমান ধর্মের অনুষঙ্গ বলে মেনে নিতে রাজি নই। আমার কাছে এগুলি নিছক ভাবের খেলা, যে-জগৎ সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না সেই অজানা জগতে স্বেচ্ছা বিচরণের মত। আমার জীবনের উপর এসব মতবাদের সামান্যই প্রভাব, এগুলি সত্য মিথ্যা প্রমাণিত হলেও আমার তাতে কিছু আসে যাবে না।

পরলোকবিদ্যা এবং জীবিত লোকের মাধ্যমে প্রেতাত্মার প্রকাশ প্রভৃতি ব্যাপার নিছক বুজরুকি বলেই মনে হয়। মানস বিজ্ঞান ও পরলোকের নিগূঢ় রহস্য ভেদ করার জন্য এইরূপ ভেল্কিবাজিকে নিন্দা না করে উপায় নেই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে যেসব লোক দুঃখশোকের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য ব্যাকুল তাদের চিত্তদৌর্বল্যের সুযোগ নিয়ে তাদের প্রতারিত করাটাই পরলোকবিদ্যার কাজ। মৃত্যুর পর আত্মা তার প্রকাশের পথ খুঁজে বেড়ায়—একথা সত্য হতেও পারে। কিন্তু আমি কিছুতেই স্বীকার করব না যে পরলোক-বিদ্যার সাহায্যে আত্মাকে উদ্ঘাটিত করা যায়। এই বিদ্যার স্বপক্ষে যেসব সাক্ষ্য প্রমাণ মেলে, আমার তো মনে হয় সেগুলি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য।

অনেক সময়ে এই পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আমি যেন গভীর রহস্য সমুদ্রে ডুবে যাই। নিজের যতটা শক্তি আছে তার সবটুকু প্রয়োগ করে এই দুর্জ্ঞেয় রহস্য ভেদ করতে ইচ্ছা করে। পৃথিবীর সঙ্গে সমান সুরে আমার সমস্ত অনুভূতি বেঁধে, পৃথিবীর পরিপূর্ণ সত্য উপলব্ধি করতে আগ্রহ হয়। আমার মনে হয় এভাবে বুঝতে গেলে বিজ্ঞানের পথে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে অগ্রসর হওয়া ছাড়া অন্য গতি নেই। ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে কেবল বস্তুকে দেখব—এমনটি সচরাচর ঘটে ওঠে না। ব্যক্তিকে বাদ দেওয়া যদি একান্তই অসম্ভব হয়, তাহলে যতটা পারা যায় বিজ্ঞানের দ্বারা ব্যক্তিকে আয়ত্তীভূত করা দরকার। সকল রহস্যের ক্ষেত্রে কি যে আছে তা আমি জানি না। তাকে আমি ঈশ্বর বলি না, কারণ ঈশ্বর বলতে এমন অনেক কিছু বুঝায় যা আমার কাছে অবিশ্বাস্য। দেবদেবী প্রভৃতি বিশ্বাস করা কিংবা অসীম শক্তিসম্পন্ন অজ্ঞাত কোনো পুরুষের প্রতি দেবত্বারোপ করা, দুইই আমার পক্ষে সমান অসাধ্য। লোকে এসব বিশ্বাস কেমন করে মনে স্থান দেয় ভাবলে আমি অবাক হয়ে যাই। ব্যক্তিগত ভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস আমার কাছে ততোধিক অদ্ভুত। বুদ্ধির দিক থেকে অদ্বৈতবাদ

তবু খানিকটা বুঝতে পারি। বেদান্ত দর্শনের গভীর তত্ত্ব ও জটিল যুক্তি সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করা আমার সাধ্যাতীত। তবু বেদান্তদর্শনের অদ্বৈতবাদের প্রতি বরাবরই আমি একটু আকৃষ্ট হয়েছি। অবশ্য একথা সত্য যে নিছক বুদ্ধি দিয়ে তত্ত্বকথা বোঝবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। বেদান্ত এবং ঐ ধরনের অন্যান্য দার্শনিক মতবাদ অবাস্তব ও অস্পষ্ট অনুমানের উপর নির্ভর করে মানুষের মনকে একটা সীমাহীন চিন্তার রাজ্যে পৌঁছে দেয়। এইরকম মানস-অভিযান আমার মনে ভয়ের সঞ্চার করে। এর চাইতে অনেক বেশি আমার মনকে নাড়া দেয় প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও তার স্বয়ম্পূর্ণ সৌন্দর্য। প্রকৃতির সুরের সঙ্গে আমার মনের সুর যেন একতারে বাঁধা। ভারতীয় ও গ্রীক-পুরাণে প্রকৃতির একটি বিশেষ স্থান আছে। আদিযুগে মানুষ জলে স্থলে অন্তরীক্ষে একটি অশরীরী আত্মার প্রকাশ দেখেছে। প্রকৃতি পূজার সেই প্রাচীন যুগটি আমার কাছে খুবই ভাল লাগে অর্থাৎ এককথায় ঈশ্বর বাদ দিয়ে সর্বেশ্বরবাদের আবহাওয়া আমার কাছে বেশ প্রকৃতিসঙ্গত বলে মনে হয়।

যুক্তিতর্ক দিয়ে কারণ বোঝাতে পারব না, তবে একথা সত্য যে আমার জীবন নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আমি সুনীতিকে বরাবর খুব একটা উঁচু স্থান দিয়ে এসেছি। গান্ধীজি সর্বদা যে-সদুপায়ের উপর জোর দেন এটা লক্ষ্য করার বিষয়। আমার মনে হয় রাজনীতির মধ্যে নীতিকে প্রাধান্য দেওয়া এযুগে গান্ধীজির একটি বিশিষ্ট দান। নীতি জিনিসটা নূতন নয়, তবে রাজনীতির বৃহৎ ক্ষেত্রে যেখানে জনসাধারণ নিয়ে কাজ করতে হয় সেখানে সুনীতির প্রয়োগ অভাবিতপূর্ব। খুবই দুঃসাধ্য এই কাজ। আমার তো মনে হয় কর্ম ও কর্মফলের মধ্যে অতি সামান্যই প্রভেদ, সদুপায় অবলম্বন না করলে সুফল ফলে না। পৃথিবীর বেশির ভাগ লোক ফললাভের জন্য উৎসুক। উপায়ের কথা তারা মনে বড় একটা আমল দিতে চায় না। গান্ধীজি এসে সুনীতি ও সদুপায়ের উপর এই যে গুরুত্ব আরোপ করলেন, এটা খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দেশের লোক তাঁর এই নির্দেশ কতখানি মেনে নিয়েছে জানি না। তবে একথা অস্বীকার করার জো নেই যে মহাত্মার মতবাদ বহুলোকের মনের উপর গভীরভাবে রেখাপাত করেছে।

মার্কস্ এবং লেনিনের লেখা আমার মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। এঁদের লেখা পড়ে ইতিহাস ও সমসাময়িক ঘটনার প্রবাহ আমি নূতন চোখে দেখার প্রেরণা পেয়েছি। বুঝতে পেরেছি যে ঐতিহাসিক ও সামাজিক ঘটনা পারম্পর্যক্রমে একই সূত্রে বাঁধা। পরস্পর পরস্পরকে অনুসরণ করে চলেছে, মনে হয়েছে যে অতীতের সঙ্গে বর্তমান, ও বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যৎ অবিচ্ছেদ্যভাবে শৃংখলিত। বাস্তবক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের কীর্তিকলাপ আমার কাছে কম বিস্ময়কর ঠেকেনি! অনেক সময়ে কোনো বিশেষ ঘটনা আমার চোখে ভাল ঠেকেনি অথবা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। মনে হয়েছে সোভিয়েট যেন সুবিধাবাদের পক্ষপাতী, মনে হয়েছে বিভিন্ন রাজশক্তির পরস্পর বিরোধিতার সুযোগ নিয়ে সোভিয়েট দাবাবোড়ের চাল চালছে। এসব ঘটনার দ্বারা হয়তো জনসাধারণের মঙ্গলবিধানের আগ্রহ বিকৃতরূপে

প্রকাশ পেয়েছে। সে যাই হোক, আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে সোভিয়েট বিপ্লব খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে মনুষ্যসমাজকে অনেকখানি উন্নতির পথে অগ্রসর করে দিয়েছে। অন্ধকারের মধ্যে এমন একটি মশাল তুলে ধরেছে যার আলো নেভাতে পাবে এমন সাধ্য কারও নেই। এমন একটি নূতন সভ্যতার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করেছে যার দিকে লক্ষ্য রেখে চলা মানে প্রগতি। আমি নিজে ব্যক্তিত্ববাদী, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি আমার এত বেশি আস্থা যে সকল মানুষকে যূথবদ্ধ করা আমার কাছে অসঙ্গত আতিশয্য বলে মনে হয়। একথা অবশ্য স্পষ্টই বোঝা যায় যে সমাজ ব্যবস্থা যেখানে জটিল সেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব না করে উপায় নেই। সমাজ সীমা টেনে দেয় বলেই হয়তো এরূপ স্বাধীনতা সত্য হয়ে ওঠে। স্বাধীনতাকে বড় করে পেতে হলে ছোটখাট সুযোগ ও সুবিধা বাদ দিতে হয়।

মার্কস্-এর দার্শনিক মতবাদের অনেকখানি আমি বিনা-দ্বিধায় মেনে নিতে পেরেছি। জড়বস্তু ও মনের একত্ব, জড়ের গতি, বিপ্লব ও বিবর্তন, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, কার্য ও কারণ, বিশ্লেষ ও সংশ্লেষের ভিতর দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তনশীলতা—এগুলি স্বীকার করে নেওয়া আমার পক্ষে কঠিন ছিল না। একথা বলা ঠিক হবে না যে এইরূপ মতবাদের মধ্যে আমার সমস্ত সংশয়ের নিরসন ঘটেছিল। একটা কোনো বিশেষ বিষয় সামনে রেখে এই সব নানা সমস্যার সমাধান করতে প্রায়ই ইচ্ছা হত। মনের এই প্রকার অবস্থায় বেদান্তের পথটাই সবচেয়ে প্রশস্ত। মন ও বস্তুর মধ্যে যে ভেদ, সেটা নিয়ে যতটা না মাথা ঘামিয়েছি, তার চেয়ে অনেক বেশি ঘামিয়েছি মনের অতীতে কি আছে তার ভাবনায়। এছাড়া নীতির দিকটাও একেবারে বাদ দেওয়া যেত না। এটা বেশ বুঝতে পেরেছিলাম, যে কালভেদে ও পাত্রভেদে এবং সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় নীতির আদর্শ বদলাতে বাধ্য। বিভিন্ন যুগের মানসিক আবহাওয়ায় এই আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয়। সেই না হয় সত্য হল, কিন্তু সকল যুগেই সকল মানুষ কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে—সেকথা তো না মেনে উপায় নেই। এরূপ কতকগুলি চিরন্তন নীতির সঙ্গে কমিউনিস্টদের কাজের যে বিরোধ দেখা যেত, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা আমার ভাল লাগত না। তা হলেই দেখা যাচ্ছে আমার মনের মধ্যে নানান মতবাদের জগাখিচুড়ি ঘটেছিল। এইসব মূলনীতি সম্বন্ধে বড় বেশি ভাবতে ইচ্ছা হত না, দৈনন্দিন জীবনের আশু সমস্যাগুলিই যেন বেশি বড় হয়ে দেখা দিত। কি করা হবে ও কেমন করে করা হবে এই প্রশ্নটাই বেশি করে মনে জাগত। চূড়ান্ত সত্য যে কি, সম্পূর্ণত বা অংশত সেই সত্য আমরা উপলব্ধি করতে পারব কি না জানি না। কেবল এটুকু জানি যে জ্ঞানলাভের শেষ নেই এবং সেই জ্ঞান মানুষ ও সমাজের কাজে লাগাবার ক্ষেত্রও অসীম।

সকল যুগেই দেখা যায় কয়েকজন লোক থাকেন যাঁরা বিশ্বজগতের হেঁয়ালির একটা সদুত্তরের সন্ধানে মত্ত। এদিকে বেশি মন দেওয়ার জন্য, ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজের ক্ষেত্রে যে নানারূপ সমস্যা দেখা দেয়, সেগুলির প্রতি তাঁরা ততটা নজর দেন না। ওদিকে বিশ্বের সমস্যার সমাধানে ব্যর্থমনোরথ হয়ে তাঁরা অকৃতার্থ তুচ্ছতার মধ্যে

ডুবে থাকেন। মনের দ্বিধা সন্দেহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একটা যুক্তিহীন সহজ প্রত্যয়ের পথ বেছে নেন। সমাজ-জীবনের নানা প্রকার অন্যায় ও পাপ দূর করার চেষ্টা না করে তাঁরা বলেন যে এগুলি পূর্বজন্মের ফল, বলেন যে পাপ জিনিসটার উৎপত্তি মানুষের আদিম প্রবৃত্তির থেকে, এবং মানুষের সেই স্বভাব নাকি কোনো কালেই শোধরাবে না। এইরকম চিন্তার ফলে মানুষ যুক্তি ও বিজ্ঞানের পথ পরিত্যাগ করে নানাবিধ কুসংস্কার মেনে নেয়, সমাজব্যবস্থার অনাচার অবিচার স্বীকার করে নেয়। একথা সত্য যে বিচার ও বিজ্ঞানের পথে আমরা খুব বেশি এগিয়ে যেতে পারি না। এমন অনেক কারণ আছে যার পারম্পর্যে ঘটনাবলী অল্পবিস্তর প্রভাবিত হয়। সবগুলি কারণ আবিষ্কার করে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করা অসম্ভব। যে-কারণগুলি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সেগুলি সন্ধান করে বের করার চেষ্টাটুকু তো করতে পারি, বাস্তবজগতের ঘটনাগুলিও তো ভাল করে পর্যবেক্ষণ করতে পারি। এইভাবে জাগ্রত বুদ্ধি নিয়ে যদি চলতে শিখি তা হলে নানাবিধ পরীক্ষা ও গবেষণার ভিতর দিয়ে ভুলত্রুটি করা সত্ত্বেও আমরা আমাদের জ্ঞান ও সত্যানুসন্ধানের পথ বহুবিস্তৃত করতে পারব। হয়তো ঘন অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়াতে হবে, ঠিক পথটা যদি মিলে যায় তবে হাতড়ে হাড়তে বেড়ালে ক্ষতি কি! এদিক থেকে আমার মনে হয় মার্কসবাদ আমাদের বেশ খানিকটা কাজে লাগতে পারে, এই মতবাদের অনেকখানি আধুনিক কালের বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। মার্কসবাদ না হয় মেনে নিলাম, কিন্তু এই মত অনুসারে অতীত ও বর্তমানের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করা সব সময় সুসাধ্য হয় না। সমাজ-ব্যবস্থার বিবর্তন সম্বন্ধে মার্কস্ মোটামুটি যা বলেছেন তা আশ্চর্যভাবে সত্য, কিন্তু মার্কস্-এর পরবর্তীকালে এমন অনেকগুলি ঘটনা ঘটেছে, যার সঙ্গে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর খুব অল্পই মিল দেখা যায়। তার পরেও সমাজ-ব্যবস্থার কতকগুলি পরিবর্তন কি ভাবে সূচিত হবে সে সম্বন্ধে লেনিন খুব চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন মার্কস্-এর মতবাদ প্রয়োগ করে। লেনিনও কিন্তু ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের আগমন সম্ভাবনার কথা আঁচ করতে পারেননি। শিল্পবিদ্যার দ্রুত উন্নতি ও কার্যকরী ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর ফলিত বিজ্ঞান প্রয়োগের ফলে আজকের পৃথিবী নিত্য নূতন রূপ পরিগ্রহ করছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নূতন সমস্যারও উদ্ভব হচ্ছে। কাজে কাজেই সমাজতন্ত্র-বাদের মূলনীতিগুলি মেনে নিলেও তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বাদবিতণ্ডার মধ্যে কখনও প্রবেশ করিনি। ভারতবর্ষের বামপন্থীদের প্রতি আমার যে বিরাগ তার মস্ত বড় কারণই হল এই যে তারা এমন সব বিষয় নিয়ে তর্ক করে ও পরস্পরের বিরুদ্ধে গালিগালাজ করে যার মধ্যে আমি বিন্দুমাত্র অর্থ খুঁজে পাই না। নীতি নিয়ে চুলচেরা তর্ক আমার আদবেই বরদাস্ত হয় না। বর্তমানকালের জ্ঞানদ্বারা জীবনকে যতটুকু বোঝা যায়, তাতে মনে হয় সে জীবন সমস্যা এত জটিল যে একটা বিশেষ মতবাদ এবং তার যুক্তিতর্কের চতুঃসীমানার মধ্যে সেই সমস্যাকে আবদ্ধ করার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনের সমন্বয়, বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের মধ্যে মিল, ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির সম্বন্ধ নির্ণয়, বৃহত্তর ও উন্নততর জীবনের দিকে মানুষের অগ্রগতি,

সমাজ-ব্যবস্থার সংস্কার, এবং প্রগতির পথে মানুষের অক্লান্ত অভিযান এইগুলি আমার কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন বলে মনে হয়েছে। এই প্রশ্নগুলির সদুত্তর পেতে হলে, বিজ্ঞানের পথ অর্থাৎ পরীক্ষা, সত্যজ্ঞান ও তীক্ষ্ম বিচারশক্তির পথে না এগোলে চলবে না। অবশ্য সকল ক্ষেত্রে এইপথ অনুসরণ করে যে সত্যের সন্ধান মিলবে তা নয়। শিল্পকলা কাব্য এবং মনের কতকগুলি সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতা একটা যেন বিভিন্ন স্তরের জিনিস; বিজ্ঞানের বস্তুতান্ত্রিক প্রণালী দিয়ে তাদের স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। সহজ জ্ঞানের পথে অথবা অন্য উপায়েও সত্য আবিষ্কৃত হতে পারে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যে সহজ জ্ঞানের স্থান নেই—তা নয়। তবে বিচারবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বাস্তবক্ষেত্রে পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত যে-সত্যজ্ঞান, তার উপরেই নির্ভর করা যুক্তিসঙ্গত। তা যদি না করি তাহলে দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যা, মানুষের নানা অভাব অভিযোগ—এসব থেকে দূরে সরে গিয়ে নিছক জল্পনাসমুদ্রে কল্পবিহার করে ঘুরে মরব। প্রাণবন্ত দর্শন তাকেই বলি যা প্রতিদিনকার জীবন সমস্যা সমাধান করতে পারে।

যারা আধুনিক, যারা একালের নানা কীর্তিকলাপ নিয়ে গর্ব করে, তারা এই যুগের চতুঃসীমানার মধ্যে বন্দী। সমসাময়িক কালের সীমানার মধ্যে বন্দীদশাপ্রাপ্ত এরকম অনেক লোকের সন্ধান পাই অতীতের ও মধ্যযুগের ইতিহাসে। পূর্বপুরুষেরা যেমন করে গেছেন, ঠিক তেমনি করেই আমরা মনে করতে পারি যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী এমন যে সব জিনিসের সত্যস্বরূপ আমরা দেখতে পাই। এরূপ বিশ্বাস করা আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর। আসলে আমরা বর্তমানের কারাগারে বন্দী হয়ে আছি, মিথ্যার মায়া পরিত্যাগ করতে পারছি না। বিজ্ঞান যেভাবে মানুষের জীবনে একটা প্রচণ্ড বিপ্লব এনে দিয়েছে, সেরকম পরিবর্তন আর কিছুর দ্বারা সম্ভবপর হত না। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বিজ্ঞান যে কত দরজা খুলে দিয়েছে, কত নূতন নূতন পরিবর্তনের পথ প্রস্তুত করেছে তা গণনার অতীত। অজানা জগতের দেউড়িতে গিয়ে হানা দিয়েছে বিজ্ঞান। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বিস্তর দান তো চোখের সামনেই দেখতে পাই। যেখানে অভাব অনটন—সেখানে ঐশ্বর্যের আমদানি করেছে বিজ্ঞান। অতীতে দর্শন যেসব সমস্যার সমাধান করত আজ তার অনেকগুলি বিজ্ঞানের কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছে। কোয়াণ্টামতত্ত্ব সমস্ত জড়-জগতের চেহারাটাই বদলে দিয়েছে। আধুনিক কালে পদার্থবিদ্যায় যেসব গবেষণা হয়েছে, যথা পরমাণুর গঠন, মৌলিক পদার্থের রূপান্তর, বৈদ্যুতশক্তির ও আলোকের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ—এইসব আবিষ্কার মানুষের জ্ঞানকে অনেকখানি পথ এগিয়ে দিয়েছে। মানুষ প্রাকৃতিক জগৎকে তার নিজের থেকে পৃথক করে আর দেখছে না; মানুষের ভাগ্য যেন প্রকৃতির গতি ও শক্তির সঙ্গে একই ছন্দে স্পন্দিত হচ্ছে।

বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষের চিন্তাজগতে একটি আলোড়ন এসেছে, মানুষ যেন নূতন ও অতি-প্রাকৃত একটি মনোরাজ্যে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। বিজ্ঞানীরা এই নূতন জগৎ সম্বন্ধে নানারূপ পরস্পরবিরোধী মতবাদ পোষণ করে থাকেন।

আকস্মিকতার স্থানে কোনো কোনো বিজ্ঞানী সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাপারে একটি পরম ঐক্যসূত্রের উল্লেখ করেছেন। বার্ট্রান্ড রাসেল-এর মত কেউ কেউ আবার বলেছেন 'সেই পারমেনাইডাস্-এর সময় থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত অনেক শৌখিন দার্শনিকই বিশ্বকে এক বলে দেখতে চেয়েছেন। আমার বিশ্বাস তাঁদের এই সমস্ত ধারণা নিতান্ত উৎকট কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।' অন্যত্র রাসেল বলেছেন, 'এমন কতকগুলি কারণের সমবায়ে মানুষের জন্ম, যার ফলাফল সম্বন্ধে পূর্বদৃষ্ট লক্ষ্যবস্তু কিছু ছিল না। মানুষের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, আশা, আকাঙ্ক্ষা, তার হৃদয়বৃত্তি ও প্রত্যয়—এ সমস্তই কতকগুলি পরমাণুর আকস্মিক সহযোগ থেকে উদ্ভূত।' রাসেল যাই বলুন না কেন পদার্থবিজ্ঞানে নূতন নূতন যেসব সত্য আধুনিককালে আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে আমরা সহজেই দেখতে পাই যে প্রাকৃতিক জগতের মূলে একটি বিশেষ ঐক্য আছে। কার্ল ড্যারো বলেন, 'সকল বস্তুই যে একই উপাদানে গঠিত—এরূপ একটা বিশ্বাস চিরাতীত কাল থেকে চলে আসছে। কিন্তু মানুষের ইতিহাসে সর্বপ্রথম আমাদের এই প্রজন্মে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ঐক্যতত্ত্ব আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি। এই একতাবোধ কোনো একটা অন্ধ বিশ্বাসপ্রসূত যে তা নয়। প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত এই ঐক্যবোধ—এটা বিজ্ঞানের এমন একটি নীতি যে এ নিয়ে আর দ্বিধা সন্দেহ চলে না।'

প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে বিশ্বব্যাপী এই একের লীলার কথা বহুযুগের আস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদান্তের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে বিজ্ঞানের নবতম কয়েকটি সিদ্ধান্তের তুলনা করা যায়। বেদান্ত বলে যে বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একই উপাদানে প্রস্তুত, ক্রমাগত এই উপাদানের রূপান্তর হচ্ছে কিন্তু মূল উপাদান সেই একই। বেদান্ত বলে যে শক্তির কখনও ক্ষয় নেই, বলে বস্তুর প্রকৃতির মধ্যেই তার সত্যকার সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হয়ে আছে। বাইরের কোনো বস্তু বা অস্তিত্ব দিয়ে বিশ্বের গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হয় না। এ থেকে এই প্রমাণ হয় যে বেদান্ত বিশ্বের স্বেচ্ছা বিবর্তনে বিশ্বাসী।

এসব জল্পনা কল্পনায় বিজ্ঞানের খুব বেশি এসে যায় না। নির্ভুল নিরীক্ষা ও গবেষণার উপর নির্ভর করে বিজ্ঞান শতধারে জ্ঞান-ভাগীরথীর পথ কেটে দিচ্ছে, অনির্দেশ অসীমান্ত জ্ঞানসমুদ্রে দিচ্ছে পাড়ি—এবং সেই সঙ্গে মানবজীবনে অভূতপূর্ব কত যে সম্ভাবনা কত যে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। হয়তো বিজ্ঞান একদিন এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছুবে যেখান থেকে তার পক্ষে জীবনের পরম রহস্য সমাধান করা সহজসাধ্য হবে—হয়তো সমাধান করতে সে পারবে না। সে যাই হোক, তার নির্দিষ্ট পথে বিজ্ঞান এগিয়ে যাবেই অবিশ্রান্ত গতিতে, কারণ সে-পথ অন্তবিহীন পথ। দর্শনের 'কেন' প্রশ্নের জায়গায় বিজ্ঞান প্রশ্ন করে 'কেমন করে'। যা ঘটে তা 'কেমন করে' ঘটে, তার সদুত্তর বিজ্ঞান যদি দিতে পারে তবে একদিকে জীবনকে যেমন ব্যাপকভাবে দেখা যাবে অন্যদিকে তেমনিই জীবনের নিগূঢ় নিহিতার্থ পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

হয়তো এই প্রণালীতে একদিন আমরা 'কেন' প্রশ্নটির সদুত্তর দিতে সমর্থ হব।

আবার এমনও হতে পারে যে এই দুটি প্রশ্নের মধ্যেকার ব্যবধান কোনো কালেই অতিক্রান্ত হবে না; যা রহস্যময় তা চিরকালের মত দুর্জ্ঞেয় থেকে যাবে, নানারূপ পরিবর্তনের ভিতর দিয়েও জীবন হয়তো থেকে যাবে কতকগুলি ভাল ও মন্দের সমষ্টি, পরস্পর অনুসারী কতকগুলি দ্বন্দ্ব অথবা পরস্পরবিরোধী কতকগুলি ভাবের সমন্বয়।

অথবা এমনও হতে পারে যে মঙ্গল ও ন্যায়নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে বিজ্ঞান তার বিশ্ববিধ্বংসী মারণাস্ত্র কতকগুলি দুষ্ট, স্বার্থান্ধ ও শক্তিমদমত্ত লোকের হাতে এনে দেবে। তাই যদি হয় তাহলে তার নিজের উদ্ভাবিত শক্তির আগুনে বিজ্ঞানের সমস্ত কীর্তি পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। এইরকম একটা আত্মহননের অপচেষ্টা আমাদের চোখের সামনেই আজ দেখতে পাচ্ছি—বহির্জগতের সংঘাতের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি মানুষের অন্তর্বিরোধের প্রতীক।

কি আশ্চর্য এই মানবপ্রকৃতি! অজস্র দুর্বলতা সত্ত্বেও যুগে যুগে মানুষ তার আদর্শের জন্য, সত্যের জন্য, ধর্ম, জন্মভূমি ও আত্মসম্মানের জন্য, সে যা কিছু ভালবাসে—এমন কি তার প্রাণ পর্যন্ত—বিসর্জন দিয়েছে। আদর্শ বদলাতে পারে কিন্তু আদর্শের খাতিরে আত্মাহুতি দেবার ক্ষমতা মানুষের পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে এখনও। যতদিন তার এই ক্ষমতা থাকবে ততদিন মানুষের শত অপরাধ ক্ষমা করা যেতে পারে, ততদিন তার উপর আস্থা হারানো চলে না। সর্বনাশের মধ্যেও মানুষ তার আত্মসম্ভ্রম, আদর্শের প্রতি তার অবিচলিত শ্রদ্ধা ত্যাগ করেনি। প্রকৃতির প্রচণ্ড শক্তির সামান্য ক্রীড়নক এই মানুষ, বিপুল বিশ্বের সামান্য ধূলিকণার চেয়েও ক্ষুদ্র এই মানুষ—অবহেলাভরে চেষ্টা করেছে প্রকৃতির দুর্জয় শক্তিকে উপেক্ষা করতে, তার বিপ্লবী মনের অমিত বিক্রমে মানুষ চেষ্টা করেছে প্রকৃতির শক্তিকে তার দাসত্বে লাগাতে। দেব দানব আছে কি না জানি না—আমি মানুষের মধ্যেই দেবতা দেখেছি দানব দেখেছি।

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ অন্ধকারে আত্মগোপন করে আছে। পরিণামে যাই থাকুক না কেন, অতীতের বহু সংকট মানুষ যেমন অতিক্রম করে এসেছে, তেমনি সামনের সমস্ত বাধা আজ সে অতিক্রম করে যাবে। এই ভরসায় সামনের রাস্তাটুকু নিঃসংশয়ে স্থির-পদক্ষেপে চলতে চেষ্টা করি। আরও ভরসা পাই যখন ভাবি যে অনেক অপূর্ণতা অনেক ব্যর্থতা সত্ত্বেও জীবনের উপর এখনও আনন্দের ও সৌন্দর্যের আশীর্বাদ ন্যস্ত আছে। যাদের সেই রসজ্ঞান আছে তারা ইচ্ছা করলে এখনও প্রকৃতির এই আনন্দ নিকুঞ্জবনের সন্ধান পেতে পারে।

পরমজ্ঞান বলে কাকে?
মানুষের প্রচেষ্টার মহনীয়তা,
ভগবানের করুণার সৌন্দর্য কোথায়?

শংকা থেকে মুক্তি,
ত্বরাবিহীন জীবন,
ঘৃণার ঊর্ধ্বে দক্ষিণ হাতের বরাভয়,
আর যা সুন্দর
তাকে জন্মজন্মান্তরের ভালবাসা।*

৭ : অতীতের বোঝা

আমার কারাজীবনের একুশ মাস পূর্ণ হতে চলল। পক্ষের পর পক্ষ আসে, তিথির পর তিথিতে চাঁদের কলা হ্রাস বৃদ্ধি পেতে থাকে। দু দুটো বছর ঘুরে যেতে আর বেশি দেরি নেই। আর একটা জন্মদিন এসে আমায় মনে করিয়ে দেবে আমার বয়স বাড়ছে। পর পর আমার গত চারটা জন্মদিন জেলেই কাটল—দেরাদুনে ও এখানে। আরও কত জন্মদিন যে জেলের ভিতর কাটিয়েছি তার ঠিক নেই।

এই কয়েকটা মাস ধরে প্রায়ই মনে হয়েছে লিখি। লিখতে আগ্রহ হয় অথচ ইচ্ছাটা যেন পুরোপুরি জমে ওঠে না। বন্ধুরা তো ধরেই নিয়েছিলেন যে অন্যান্য বারের মত এবারও আমি কারাবাসকালীন একটি বই রচনা করব। এ যেন আমার একপ্রকার বদ অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

সে যাই হোক, এবার লিখতে আমি চাইনি। বৈশিষ্ট্যবর্জিত একটা যা-তা বই বাজারে ছাড়তে আমার ভাল লাগে না। লেখা জিনিসটা সহজ—কিন্তু এমন কিছু লিখতে পারব কি—যা পুরাতন হয়ে যাবে না, যা সময়ের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে। আজ কিংবা কালকের দিনটা নিয়ে ক্ষণিকের কারবার করতে মন সরে না। আমি লিখতে চাই সুদূর অজানা ভবিষ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে। কার জন্য লিখব? কোন কালের জন্য? যা লিখব, তা হয়তো কোনো কালে প্রকাশিতই হবে না কারণ আমার কারাবাসে থাকতে থাকতে পৃথিবীতে একটা বিরাট পরিবর্তন, অভূতপূর্ব একটা বিপর্যয় ঘটবার সম্ভাবনা। ভারতবর্ষের বুকের উপর দিয়েই কি প্রচণ্ড গৃহ-বিবাদের ঝড় বয়ে যাবে—কে জানে!

এসব আসন্ন সংকটের কবল যদিই বা এড়ান যায়, তবু ভবিষ্যতের প্রতি নজর রেখে আজকালকার দিনে কিছু লিখতে যাওয়া—প্রায় বাতুলতার সামিল। আজকের দিনের যা সমস্যা কালকের দিনে তা পুরাতন হয়ে যাচ্ছে—নূতন নূতন সমস্যা এসে পুরাতন সমস্যাকে আমাদের মনের অগোচরে সরিয়ে দিচ্ছে। এই বিশ্বজোড়া যুদ্ধকে আমি নিছক যুদ্ধ হিসাবে দেখতে পারি না। যুদ্ধের প্রারম্ভ থেকেই, এমন কি তার কিছুকাল আগে থেকেই, আমি দেখেছি একটা বিরাট সম্ভাবনা যেন বহু পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে ক্রমেই এগিয়ে আসছে। ভালর জন্যই হোক বা মন্দের জন্যই হোক, নূতন

* গিলবার্ট মারে অনূদিত ইউরিপিডিস-এর "দি ব্যাক্কে" নাটকের সমবেত-সঙ্গীতের বাঙলা অনুবাদ।

একটি পৃথিবী যেন জন্ম পরিগ্রহ করছে। সেই আগামী কালের নূতন পৃথিবীতে আমার পুরাতন কালের এই প্রসঙ্গের কি কোনো কদর হবে?

এইসব নানা ধরনের ভাবনা চিন্তা ভিড় করে আসত আমার মনে। তাছাড়া মনের গভীরে এমন কতকগুলি বাধা ছিল যা অতিক্রম করে ওঠা আমার পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না।

১৯৪০-এর অক্টোবর থেকে ১৯৪১-এর ডিসেম্বর অবধি কিঞ্চিদধিক এক বছর কাল আমি দেরাদুন জেলে আমার পূর্বপরিচিত কারাকক্ষে কাটিয়েছি। সেই সময়েও ঠিক অনুরূপ একটা বাধা মনের মধ্যে অনুভব করেছিলাম। অথচ এই কারাকক্ষেই বসে বছর ছয় আগে আমি আমার "আত্মজীবন কথা" লিখতে শুরু করি। ১৯৪০-৪১-এর সেই একটি বছরের প্রায় মাস দশেক আমার লেখা একপ্রকার বন্ধই ছিল। পড়াশুনা করে, মাটি কুপিয়ে, ফুলগাছের চারা লাগিয়ে বেশির ভাগ সময় কেটেছে। শেষ পর্যন্ত "আত্মজীবন কথা"র পরিপূরক কয়েকটি পরিচ্ছেদ লিখতে পেরেছিলাম। কয়েকটা সপ্তাহ পুরোদমে একটানা কলম চলেছে—কিন্তু হায় লেখা ফুরোবার আগে হঠাৎ আমি খালাশ পেয়ে গেলাম, তখনও আমার চার বছর মেয়াদ ভরতে অনেক বাকি।

ভাগ্য ভাল বলতে হবে, সে-যাত্রা লেখা আমার শেষ হয়নি, শেষ হলে হয়তো প্রকাশকের হাতে তুলে দিতাম। আজকের দিনে সে-লেখা কত পুরাতন হয়ে গেছে তা এখন চোখ বুলিয়ে একবার দেখলেই বুঝতে পারি। যে-সব ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেগুলি তাদের গুরুত্ব হারিয়ে এখন বিস্মৃত পুরাতনের জঞ্জালস্তূপে পরিণত হয়েছে—তার উপর স্তরে স্তরে পড়েছে তার পরেকার কত অগ্ন্যুদগারের ভস্মশেষ। সে পুরাতন ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমি সব উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছি। অবশিষ্ট যা আছে তা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলি—ব্যক্তি বা ঘটনাবিশেষের সঙ্গে আমার যোগাযোগ: ভারতবর্ষের এক অথচ বিচিত্র জনসঙ্ঘের সঙ্গে আমার একাত্মীয়তা: মনের নানাপ্রকার অভিযান: নানা দুঃখ দুর্গতি: বাধা বিপদ অতিক্রম করার আনন্দ এবং কর্মময় জীবনসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার উত্তেজনাময় সুখ। এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বেশির ভাগই ছিল এমন ধরনের যে তার সম্বন্ধে লেখা চলে না। মানুষের আন্তজীবন, তার অনুভূতি ও ভাবনা চিন্তা এমন নিবিড়ভাবে তার নিজস্ব, যে অপরের কাছে সেই অন্তরঙ্গ জীবনটা উদ্ঘাটিত করা চলে না। তবু এসব ব্যক্তিগত যোগাযোগের মূল্যে সামান্য বলে মনে করা ভুল। এই যোগাযোগের ফলেই ব্যক্তি-বিশেষের চারিত্রশক্তি গঠিত হয়। নিজের জীবন নিজের দেশ এমনকি জগৎ সম্বন্ধে মানুষের মনোভাব নানা ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এইসব ঘটনার দ্বারা।

অন্যান্য জেলে যেমন আমেদনগর দুর্গেও তেমনি আমি দিনের অনেকখানি সময় বাগানের কাজ করে কাটিয়েছি। দুপুরের রৌদ্র মাথায় করে আমি মাটি খুঁড়ে ফুলবাগিচার জমি তৈরি করেছি। এখানকার জমি মোটেই সুবিধার নয়, ইটপাটকেলে ভর্তি, খুঁড়তে খুঁড়তে কখনও পুরাতন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ বেরিয়েছে। এ-দুর্গ

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ, বহু যুদ্ধ বহু ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রস্থল ছিল এই আমেদনগর। সে-ইতিহাস খুব পুরাতন নয় এবং ইতিহাসের দিক থেকে তার খুব যে বড় স্থান আছে, তাও নয়। আমেদনগরের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা হল সুন্দরী চাঁদবিবি সুলতানার শৌর্য। মনের চোখের উপর তাঁর কমনীয় মহনীয় ছবিটি এখনও ভেসে ওঠে—তলোয়ার হাতে সৈন্যদলের নেত্রী চাঁদ সুলতানা আকবরের সেনাদলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন—এ-দুর্গটি রক্ষা করার জন্য। শেষ পর্যন্ত তাঁরই একজন অনুচর তাঁকে খুন করে

এই দুঃখের দেশের মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে কখনও আবিষ্কার করেছি প্রাচীন প্রাচীরের ধ্বংসশেষ, ভূগর্ভের মধ্যে সমাধিস্থ অট্টালিকাদির স্তূপাকার ছাদ অথবা সুক্ষ্ম মীনারের শীর্ষদেশ। খুব গভীর অবধি খনন করা সম্ভব হয়নি, কারণ জেলের মধ্যে এ-ধরনের প্রত্নতত্ত্বের চর্চা করা কর্তৃপক্ষ পছন্দ করতেন না, তাছাড়া একাজ করবার মত অর্থসঙ্গতিও আমাদের ছিল না। একদিন আবিষ্কার করলাম প্রাচীরের গায়ে উৎকীর্ণ একটি সুন্দর সুগঠিত পদ্ম—বোধ করি কোনো তোরণের শীর্ষে এ-পদ্মটি খোদিত হয়েছিল। দেরাদুন জেলে যে-জিনিসটা পেয়েছিলাম মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে তার সঙ্গে একটা দুঃখের ইতিহাস বিজড়িত। আমার ছোট্ট বাগানটিতে মাটি খুঁড়ছি, এমন সময় দুটি ধ্বংসাবশেষের স্তূপ দেখা গেল; আমরা উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। পরে জানা গেল যে এগুলি পুরাতন ফাঁসিমঞ্চের অংশবিশেষ। ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে দেরাদুনে ফাঁসি দেবার রেওয়াজ বন্ধ হয়ে যায় এবং তখন হুকুম হয় ফাঁসিকাঠের সমস্তটা নিশ্চিহ্ন করে দিতে। আমরা যে-জিনিস আবিষ্কার করেছি, সে হল পুরাতন ফাঁসিমঞ্চের বুনিয়াদ। আমি ও আমার সহকারী অন্য কয়েদী বন্ধুরা মিলে এই দুর্লক্ষণটিকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছিলাম।

এবার আমি কোদাল ছেড়ে কলম ধরেছি। এবার যা লিখছি তার দশাও হয়তো দেরাদুনের সেই অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপির মত হবে। কাজের ভিতর দিয়ে বর্তমান কালটাকে পুরোপুরি না জানা পর্যন্ত বর্তমানের ইতিহাস লেখা আমার চলবে না। কাজের তাগিদ থেকে বর্তমানের রূপটা আমার কাছে যেন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। তখন আমি বর্তমান সম্বন্ধে বেশ সহজে ও স্ফূর্তির সঙ্গে লিখতে পারি। কারাপ্রাচীরের ব্যবধান থাকার জন্য বর্তমানের চেহারাটা কেমন আবছা মনে হয়, যেন কিছুতেই তাকে আয়ত্তে আনতে পারি না। বর্তমান তখন প্রত্যক্ষগত অভিজ্ঞতালভ্য থাকে না অথচ অতীতের সেই অনড় অটল স্থির পুত্তলিকার ছবিও দেখি না তার মধ্যে।

এদিকে গণৎকারের মত ভবিষ্যদ্বাণী করা সে আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। মনে মনে আমি অনেক সময় অনাগত দিনের কথা ভাবি, ভবিষ্যতের ঘোমটাটুকু সরিয়ে দিয়ে তাকে মনের মত সাজিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সেসব তো নিছক কল্পনা। ভবিষ্যৎ তেমনি অজ্ঞাত অনিশ্চিত থেকে যায়। কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারে না মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা আগামী কালে সফল হবে কিনা। ভবিষ্যৎ এসে হয়তো সমস্ত আশা, সব স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে দেবে—কে জানে!

Kedarnath Sadharan Pathagar
Jhikira, howrah

যে-বিষয়ে লেখা চলে সে হল অতীত। কিন্তু গবেষক বা ঐতিহাসিক যেভাবে অতীতের বিষয়ে লেখেন আমার পক্ষে সেরকম লেখা সম্ভব হবে না। সে-জ্ঞান বা ক্ষমতা আমার নেই। গবেষকের কাজ করতে গেলে যে-ধরনের মনোবৃত্তি প্রয়োজন, তাও আমার নেই। অতীত আমার মনের উপর যেন চেপে বসে থাকে; বর্তমানের মধ্যে যখন সে তার জের টেনে চলে তখন অতীতের সান্নিধ্যগত তপ্তশ্বাস যেন সর্বাঙ্গে অনুভব করি। আর তাই যদি না হত তাহলে সে-অতীত তো জীর্ণ, পুরাতন, মৃত, নিষ্ফল। অতীতের বিষয়ে তখনই আমি লিখতে পারি যখন বর্তমানের ভাব ও কর্মধারার সঙ্গে তাকে যোগযুক্ত করে দেখা সম্ভবপর হয়। একাধিকবার এ-ধরনের ইতিহাস আমি রচনা করেছি। বোধ করি এইরূপে ইতিহাস লেখা সম্বন্ধে বলতে গিয়েই গ্যেটে বলেছেন যে এ হল অতীতের দুঃসহ বোঝা থেকে নিস্তার পাবার উপায় বিশেষ। আমার ধারণা যে এ লেখা আমার একপ্রকার মনঃসমীক্ষণ, তফাৎ কেবল এক জায়গায়—মন এখানে ব্যক্তিবিশেষের না হয়ে সমষ্টির, দেশের, জাতের অথবা সমগ্র মানবসমাজের।

অতীতের এই যে বিরাট ভাল-মন্দ শুভ অশুভের দুঃসহ বোঝা, এ যেন জগদ্দল পাথরের মত মাঝে মাঝে চেপে বসে বুকের উপর—নিশ্বাস দেয় বন্ধ করে। ভারতবর্ষ ও চীনের মত যাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বহু পুরাতন—তাদের পক্ষে এ-বোঝার গুরুত্ব খুব বেশি। নীট্শে এক জায়গায় উত্তরাধিকার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছেন 'বহু শতাব্দীলব্ধ জ্ঞান-বুদ্ধি কেবল নয়, বহু পুরাতন পাগলামিও মানুষকে যেন পেয়ে বসে। উত্তরাধিকার জিনিসটা বড় বেশি নিরাপদ নয়।'

আমার উত্তরাধিকার কি? পুরুষানুক্রমে কি পেয়েছি আমি? হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ যা গড়ে তুলেছে, মানুষের ভাবনা, চিন্তা, অনুভূতি, দুঃখ, আনন্দ, জয়, পরাজয়—যা কিছু মানুষের সেই আদিম অভিযান থেকে আরম্ভ করে আজও তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে আছে—সে সব কিছুরই উপর আমার বংশানুক্রমিক অধিকার রয়েছে। এ ছাড়া আরও অনেক কিছু আছে যা অন্যান্য মানবসাধারণের সঙ্গে সঙ্গে আমিও লাভ করেছি। আমরা যারা ভারতীয়—আমাদের একটি বিশেষ স্বত্বাধিকার আছে। তার মানে এ নয় যে এ-স্বত্বের উপর ভারতীয় ছাড়া আর কারও হস্তক্ষেপ করার জো নেই। অতীত মানবসাধারণের সম্পত্তি—স্থানকালপাত্রের বিচারে তাকে সীমাবদ্ধ করা চলে না। তবু একথা মানতেই হবে যে ভারতের নিজস্ব এই যে সংস্কৃতি, এ যেন ওতপ্রোতভাবে আমাদের অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশে রয়েছে। আমরা আজ যা হয়েছি এবং কাল যা হব, সে সবই নির্দিষ্ট হয়েছে এই বিশেষ সংস্কৃতির দ্বারা।

আমাদের এই বিশেষ উত্তরাধিকার এবং বর্তমানকালীন ভারতবর্ষের উপর এর প্রভাব—এই দুটি বিষয়ে আমি অনেক দিন ধরে ভেবে এসেছি। বিষয়টা যেমন জটিল তেমনি শক্ত। দুরূহ হলেও এই বিষয়ের উপরই আমার লেখবার ইচ্ছা। জানি খুব সম্ভব নিতান্ত মোটামুটিভাবে এই প্রসঙ্গের আলোচনা করতে পারব—সম্পূর্ণ বিষয়টি আমার আয়ত্তের বাইরে। তবু এই লেখার ভিতর দিয়ে আমি নিজের প্রতি একটু সুবিচার করতে পারব বলে আমার বিশ্বাস। লিখতে গিয়ে ভারতের ঐতিহ্য সম্বন্ধে

আমার ধারণা হয়তো স্পষ্টতর হয়ে উঠবে এবং ভবিষ্যতে আমার চিন্তা ও কর্মের ধারা স্থিরীকরণের জন্য এ থেকে একটা নির্দেশ হয়তো পেয়ে যেতে পারি।

আমার এ-লেখা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত হতে বাধ্য। ভারত ইতিহাসের ঐক্যসূত্র সম্বন্ধে কি ভাবে প্রথম আমার মনে ভাবনার উদয় হয়, সে-ভাবনা কি প্রকার রূপ নিল, এবং আমার ও আমার কার্যকলাপের উপর কি ভাবে তার প্রভাব-বিস্তার করল—এইটাই হবে আমার লেখার বিষয়বস্তু। আর থাকবে মূল বিষয়ের সঙ্গে আপাত-সম্বন্ধবর্জিত আমার কতকগুলি নিছক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। এ-অভিজ্ঞতা আমার মনের উপর কেবল যে রেখাপাত করেছে বললে যথেষ্ট বলা হয় না—এগুলি আমায় ভারতের ঐতিহ্য নূতন পরিপ্রেক্ষায় দেখার দৃষ্টি দিয়েছে। বিশেষ বিশেষ দেশ বা জাতি সম্বন্ধে আমাদের বিচার অনেকগুলি কারণের উপর নির্ভর করে। এই বিচার-শক্তি অনেক সময় সেই সকল দেশ বা জাতির সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। যেক্ষেত্রে সেরকম যোগাযোগ ঘটেনি সেসব জায়গায় ভুল ধারণা করে বসাটা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়, কারণ এমনিতেই বিদেশ ও বেজাত সম্বন্ধে মানুষের মনে একটা কুসংস্কার থাকে।

এদেশের দিকে তাকালে দেখি আমাদের ধারণায় দেশের সঙ্গে দেশবাসী যেন একসঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। বহুসংখ্যক যেসব দেশবাসীদের সঙ্গে আমাদের আলাপ পরিচয়, দেখাশোনা বা যোগাযোগ ঘটেছে, তাদের ছবি ও আমাদের স্বদেশের ছবির মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। আর তা থাকবেই বা কেন। দেশের মানুষই তো দেশকে রূপ দান করে। আমার মন যেন বিরাট এক চিত্রপ্রদর্শনী—বহু লোকের ছবি এখানে ভিড় করে আছে। কারও ছবি জীবন্ত হয়ে চোখের উপর জ্বল্ জ্বল্ করছে—বহুকালবিস্মৃত রূপকথায় রাজকুমারের মত এঁরা নিষ্পলক তাকিয়ে থাকেন আমার দিকে। আমি দাঁড়িয়ে থাকি পাহাড়তলীর উপত্যকায় আর তাঁরা তাঁদের তুঙ্গ আসনে আসীন হয়ে জীবনের সু-উচ্চ শিখরের দিকে যেন অঙ্গুলিসঙ্কেত করেন। আরও অনেক ছবি আছে আমার মনের এই চিত্রশালায়। অনেক ছবি আছে সেই তাঁদের যাঁদের সঙ্গে আমার জীবনের অনেক সুখস্মৃতি বিজড়িত, যাদের সখ্য আমার মনে মাধুর্যের সঞ্চার করে। আর আছে দেশের সহস্র সহস্র জনসাধারণের ছবি—ভারতের অসংখ্য নরনারী শিশু সকলে যেন জনতাবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, একদৃষ্টে তাকাচ্ছে আমার দিকে, আর আমিও যেন তাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছি আমার এই অসংখ্য দেশবাসীর কালো চোখের অতলস্পর্শ গভীরতায় সে কোন ভাষাহীন বাণী স্তব্ধ হয়ে আছে।

আমার এই কাহিনী শুরু করব নিতান্ত একটি ব্যক্তিগত কাহিনী দিয়ে। "আত্মজীবন কথা"র শেষ অধ্যায়ের দিকে যে-সময়ের কথা লিখেছি, তার অব্যবহিত পরে আমার মনের অবস্থা যে-প্রকার ছিল, ঠিক সেই অবস্থায় তাহলে ফিরে যাওয়া যাবে। কিন্তু গোড়াতেই বলে রাখি এ-লেখা আমার আর একটি "আত্মজীবন কথা"য় পরিণত হবে না—যদিচ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এ থেকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যাবে না।

সারা পৃথিবী জুড়ে মহাসমরের তাণ্ডবলীলা চলেছে। আমি নিশ্চেষ্টভাবে বসে আছি আমেদনগরের দুর্গে বন্দী। পৃথিবীর সর্বত্র ব্যস্তসমস্ত মানুষ উন্মাদের মত প্রচণ্ড উদ্যমে কাজ করে চলেছে, আমিই কেবল অকর্মণ্য নাচারের মত বসে আছি হাত পা গুটিয়ে। এসব কথা ভাবতে গেলেও মন খারাপ হয়ে যায়। মনে পড়ে বছরের পর বছর ভেবে এসেছি বীরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ব দুঃসাহসিক অভিযানে। বহুবার চেষ্টা করেছি যুদ্ধকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে ভাবতে, মনকে বোঝাতে চেয়েছি এ একটা সর্ববিধ্বংসী ভূমিকম্প অথবা সর্বগ্রাসী বন্যার মত একটা দুর্ঘটনা। বৃথা চেষ্টা—নিজের মনকে মনগড়া চিন্তা দিয়ে প্রবঞ্চিত করতে পারিনি। কিন্তু ভুল না বুঝিয়েই বা উপায় কি? অক্ষম অভিমান, নিষ্ফল আক্রোশ ও বৃথা উত্তেজনা থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে তো! প্রকৃতির ধ্বংসলীলার এই দুর্দম প্রকাশের কাছে আমার ব্যক্তিগত হতাশা বা দুঃখ কত ক্ষুদ্র, কত অকিঞ্চিৎকর। কতটুকু বা তাদের দাম।

মনে পড়ে ১৯৪২-এর ৮ই আগস্টের সেই স্মরণীয় সন্ধ্যা। মহাত্মাজি সেদিন বলেছিলেন: 'যদিচ পৃথিবীর চোখ আজ রক্তবর্ণ, তবু শান্ত অনাবিল দৃষ্টিতে অকুতোভয়ে পৃথিবীর দিকে আমরা ফিরে তাকাব—ভয় পাব না!'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাদেনহ্বাইলার : লোসান

১ : কমলা

১৯৩৫-এর ৪ঠা সেপ্টেম্বর হঠাৎ আমাকে আলমোড়া জেল থেকে খালাস দেওয়া হয়। খবর এসেছে কমলার অবস্থা আশঙ্কাজনক। সে ছিল বহুদূরে—জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্ট অঞ্চলের বাদেনহ্বাইলার নামে একটি গ্রামের স্বাস্থ্যনিবাসে। খানিকটা পথ মোটরে খানিকটা রেলে ভ্রমণ করে, খালাস পাবার পরের দিনই এলাহাবাদ এসে পৌঁছলাম। সেদিনই বিকেলবেলা বিমান পথে ইউরোপ রওনা হয়ে গেলাম। উড়ো জাহাজ আমায় নিয়ে গেল করাচি থেকে বোগ্দাদ, বোগ্দাদ থেকে কাইরো। আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি সী-প্লেন্ চেপে চলে গেলাম ব্রিন্দিসি বন্দর। সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে গেলাম সুইটজারল্যান্ডের বাল শহরে। বাদেনহ্বাইলার পেঁছুলাম ৯ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যে বেলা—এলাহাবাদ ছাড়ার চারদিন পরে এবং আলমোড়া জেল থেকে ছাড়া পাবার পাঁচদিন পর।

প্রথম সাক্ষাতে দেখি কমলার মুখে সেই তার পুরাতন নির্ভীক হাসিটুকু যেন লেগে আছে। শরীর তার খুব দুর্বল. বেদনায় সে খুবই কাতর হয়ে পড়েছে। সেইজন্য কথাবার্তা আমাদের মধ্যে খুব অল্পই হল। আমার আসার জন্যই বোধ করি তার শরীরের কিছু উন্নতি দেখা দিল। আমার আসবার পরের দিন থেকে তার শরীরের ক্রমোন্নতি সবাই লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু এ-উন্নতি নিতান্ত সাময়িক—আসল সমস্যার সমাধান হবে এমন আশা ছিল না। ক্রমেই যেন ওর জীবনীশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। ও যে চলে যাবে—একথা কিছুতেই আমি ভাবতে পারিনি। মনে মনে নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছিলাম যে কমলা ক্রমেই উন্নতির দিকে যাচ্ছে; সঙ্কটের মুহূর্তটা কাটিয়ে উঠতে পারলে এ-যাত্রা সে তার ফাঁড়া কাটিয়ে উঠবে। চিরাচরিত অভ্যাসমত চিকিৎসকেরাও বললেন--একটু যেন উন্নতি দেখা দিয়েছে। সঙ্কট তখনকার মত কাটিয়ে উঠল কমলা, কিন্তু তখনও বিশ্রম্ভালোচনা করার মত অবস্থা তার হয়নি। অল্প দু চারটে কথা হত আমাদের মধ্যে। ক্লান্তির সামান্য আভাস দেখবামাত্র আমি যেতাম চুপ করে। কখনও বা ওকে বই পড়ে শোনাতাম। মনে আছে আমার এই পড়ে-শোনানো বইগুলির মধ্যে একটি ছিল পার্ল বাকের 'দি গুড্ আর্থ'। বই শুনতে কমলার খুব ভাল লাগত, কিন্তু দৈনিক কতটুকুই বা পড়া যেত।

সকাল বিকেল দুবেলা আমার হোটেল থেকে হেঁটে চলে যেতাম স্বাস্থ্যনিবাসে, কিছুক্ষণ কমলার পাশে বসে থাকতে। তার সঙ্গে কত কথা বলবার জন্য মনটা আকুল হয়ে উঠত। কিন্তু উপায় ছিল না, উন্মুখ মনের আগ্রহ রাশ টেনে রাখতে হত।

পুরাতন প্রসঙ্গ, পুরাতন স্মৃতি, আমাদের পরস্পরের পরিচিত আত্মীয়পরিজনের কথা উঠত মাঝে মাঝে। কখনও বা একটু উৎসুকভাবে ভবিষ্যতের কথা এবং ভবিষ্যতে আমরা কি করব—সে-সম্বন্ধেও আলাপ হত। কমলার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত, মুখ উঠত খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে। যেসব বন্ধুরা দৈবাৎ এসে পড়তেন ওর কুশল সংবাদ নিতে, তাঁরা সানন্দ বিস্ময়ে দেখতেন ওর শরীরের অবস্থায় অল্প কয়েকটা দিনের মধ্যেই উন্নতি দেখা দিয়েছে। খুশিভরা চোখ ও হাসিমাখা মুখখানি দেখে তাঁরা ওর শরীরের সত্যকার অবস্থার কথা বুঝতেও পারতেন না।

শরতের সুদীর্ঘ সন্ধ্যা আমি কাটাতাম একা একা—কখনও বা চুপচাপ বসে থাকতাম আমার হোটেলের ঘরটিতে, কখনও পড়তাম বেরিয়ে—মাঠ পার হয়ে চলে যেতাম ব্ল্যাক ফরেস্টে বেড়াতে। এইসব নিঃসঙ্গ মুহূর্তে কমলার ব্যক্তিত্বের বহু বিচিত্র ছবিগুলি আমার মনের পটের উপর যেন ভেসে উঠত। ওর গভীর মনের বিভিন্ন প্রকাশের কথা ভাবতাম তন্ময় হয়ে। প্রায় কুড়ি বছর হল আমাদের বিবাহ হয়েছে, অথচ কতবার ওর মনের অনাবিষ্কৃত গভীরতার পরিচয় পেয়ে আমি বিস্মিত হয়েছি, ওকে যেন দেখতে শিখেছি নূতন করে। ওকে দেখেছি আমি নানা ভাবে। আমাদের বিবাহিত জীবনের শেষ অধ্যায়ে আমি বিশেষ ভাবে চেষ্টা করেছি ওকে বুঝতে। বুঝতে আমি পেরেছি হয়তো, তবু অনেক সময় মনে মনে সন্দেহ জাগত সত্যই কি আমি ওকে জেনেছি বা বুঝেছি। ওর মধ্যে একটি দিক ছিল সে হল ওর অধরা দিক—পরীর মত ও এই আছে পরমুহূর্তে যেন পালিয়ে গেছে ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। মাঝে মাঝে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছে—এ কমলা যেন আমার অজানা, অচেনা।

অল্প কিছু দিন স্কুলে পড়া ছাড়া মামুলি ধরনের শিক্ষা কমলা পায়নি বললেই চলে। শিক্ষার নির্দিষ্ট ধারার মধ্যে দিয়ে ও চলতে শেখেনি। কমলা আসে আমাদের বাড়ি সহজ সরল সাদাসিধে একটি মেয়ে। আজকালকার সুশিক্ষিত আধুনিক মেয়েদের মত ধরনধারন ওর ছিল না। কিশোরী মেয়ের সেই অনাবিল দৃষ্টিটুকু ও কোনো দিন হারিয়ে ফেলেনি। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম ওর সেই সরল দৃষ্টিতে একটা কেমন গভীরতা ঘনিয়ে এসেছে; আর দেখেছি ওর চোখে একটা অভূতপূর্ব দীপ্তি। ওর চোখের দিকে তাকালে একটা ছবি জাগত আমার মনে—সামনে যেন একটা নিথর সায়র, পিছনে তার বিদ্যুতের চমকানি, ঝড়ের মাতামাতি। কমলা আধুনিকাদের মত ছিল না মোটেই—আধুনিক রমণীর স্বভাবসুলভ অস্থৈর্য তার শান্ত সমাহিত প্রকৃতির সঙ্গে একটুও খাপ খেত না। তা সত্ত্বেও আধুনিক কালের ধরনধারন আয়ত্ত করে নিতে ওকে একটুও বেগ পেতে হয়নি। কমলা ছিল সম্পূর্ণ ভাবে ভারতীয়। তার চাইতেও বেশি করে সে ছিল কাশ্মীরি মেয়ে। যেমন গরবিনী তেমনি অভিমানিনী, একাধারে বালিকার মত সরল অথচ পরিণতবয়স্কা নারীর মত ধীর ও শান্ত, একদিকে বুদ্ধিহীনা অপর দিকে প্রখর বুদ্ধিশালিনী ছিল এই কাশ্মীরদুহিতা। যাদের সে জানত না বা অপছন্দ করত তাদের সঙ্গে ব্যবহারের বেলা কমলা বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে চলত। পরিচিত বন্ধুদের সান্নিধ্যে ওর সহজ সরল মাধুর্যটুকু যেন উচ্ছলিত হয়ে উঠত।

তার ভাল লাগা বা ভাল না লাগা ছিল সহজ প্রবৃত্তিগত। চট করে একটা জিনিসের ভাল মন্দ বিচার করত কমলা—বিচারবুদ্ধির ধার ধারত না। অনেক সময় সে ভুল করেছে বা ভুল বুঝেছে, কিন্তু ওর মধ্যে কোনো ঢাকাঢুকি কিম্বা লুকোচুরি ছিল না। যাকে ওর ভাল লাগত না, সে স্পষ্টই বুঝে নিত কমলা তাকে অপছন্দ করে। মনের ভাব লুকিয়ে রাখার ক্ষমতা তার ছিল না। চেষ্টা করে দেখলেও এবিষয়ে ও বোধ করি অকৃতকার্য হত। আমার জানাশোনার মধ্যে আমি খুব অল্প লোকই দেখেছি যাদের সঙ্গে কমলার প্রকৃতিগত এই সরলতার তুলনা করা চলে।

২ : আমাদের বিবাহ এবং তারও পরে

আমাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়েকটি বছরের কথা মনে পড়ে। কমলার প্রতি আমার গভীর আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও আমি সে-সময় তাকে এক প্রকার ভুলেই থাকতাম। আমার প্রতি তার সহজ অধিকার থাকা সত্ত্বেও এখন মনে হয় কত ভাবে আমার সখ্য থেকে তাকে বঞ্চিত করেছি। তখন দেশের কাজ আমায় একেবারে পেয়ে বসেছে; মোহগ্রস্ত লোকের মত আমি তখন যেন স্বপ্নলোকে বিহ্বলের মত ভেসে বেড়াচ্ছি। আমার চতুর্দিকে যে-সব রক্তমাংসের লোক চলাফেরা করত, তাদের দেখতাম যেন ছায়ামূর্তির মতন। আমার সবটুকু শক্তি দিয়ে আমি দেশের কাজ করে যেতাম। কাজের চিন্তায় সমস্ত মনটা সব সময় কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকত। কাজের মধ্যে এমনি মগ্ন ছিলাম যে অন্য দিকে মন দেবার মত অবকাশই ছিল না আমার।

তা সত্ত্বেও কমলাকে একেবারে ভুলে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। বার বার ফিরে আসতাম ওর কাছে, ঝড়ের ঝাপট-খাওয়া জাহাজ যেমন ফিরে আসে নিরাপদ পোতাশ্রয়ে। দুটো দিন দূরে আছি এমনি সময় ওর কথা ভাবলে মনটা যেন জুড়িয়ে যেত, বাড়ি ফিরে আসার জন্য মন উঠত তৃষিত হয়ে। শরীর মনের শক্তির উৎস যখন যেত ফুরিয়ে তখন কমলাই যোগাত মনের উৎসাহ ও শরীরের তেজ। তাকে না হলে আমার কিছুতেই চলত না।

ওর দিক থেকে যতখানি দেবার সেটুকু সবই তো আমি নিয়েছি। মনে মনে প্রশ্ন জাগে : বিবাহিত জীবনের সেই প্রথম ভাগে প্রতিদিন আমি কি দিয়েছি তাকে। বেশি কিছু দিতে পারিনি নিশ্চয়। সেই সব দিনের স্মৃতি কমলা বোধহয় সারাজীবন মনের গভীরে পরম দুঃখের সঙ্গে বহন করে গেছে। ওর যা চাপা অভিমানী স্বভাব—একটি দিনের জন্যও ও আমার কাছে কিছু চাইতে আসেনি, অথচ এক আমিই হয়তো ওর বাঞ্ছিত জিনিসটুকু ওকে দিতে পারতাম। আমি যতটা ওর সহায় ও অবলম্বনস্বরূপ হতে পারতাম, তেমন আর কেইবা হতে পারত। স্বামীর নিছক অনুগামিনী বা ছায়া-স্বরূপ কমলা হতে চায়নি। জাতীয় আন্দোলনে সে যোগ দিয়েছিল তার আপনার দায়িত্বে। সে তার আপনার কাছে তথা সমগ্র জগতের চোখের সামনে তার নিজের সত্য পরিচয়টুকু দিতে চেয়েছিল। তার এই প্রকার আগ্রহ দেখে আমার চেয়ে বেশি খুশি

আর কেউই হত না। কিন্তু তখন তলিয়ে দেখার মত অবকাশ আমার কোথায়—কমলা যে কি সন্ধান করছে, সে যে কি চায়—সেদিকে আমি নজরও দিতে পারিনি। আরও কতকগুলি বাইরের দিক থেকে বাধা ছিল। ঘন ঘন জেলে যাবার দরুন প্রায়ই আমরা থাকতাম পরস্পরের কাছ থেকে দূরে দূরে—এ ছাড়া আর একটা কারণ ছিল কমলার অসুস্থতা।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার মত কমলা আমাকে বলতে পারত :

আমি চিত্রাঙ্গদা,...
নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।
পূজা করি' মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে সে নহি নহি,
হেলা করি' মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখো মোরে সংকটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হোতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।...

এই কথা সে আমায় মুখ ফুটে কখনও বলতে পারেনি। দিন যত যেতে লাগল ততই যেন ওর চোখের ভাষায় এই কথাগুলি প্রকাশ পেতে লাগল আমার চোখে।

১৯৩০-এর গোড়ার দিকে ওর ইচ্ছা যে কি সে-কথা আমি বুঝতে পারি। সে-সময়টা মিলিতভাবে কিছুকাল কাজ করে আমরা প্রভূত আনন্দ পেয়েছিলাম। তখন যেন আমরা জীবনের প্রত্যন্ত সীমায় দাঁড়িয়ে আছি—উপরে দুর্যোগের মেঘ আসছে ঘনিয়ে, ভূমিকম্পের মত সব কিছু কঠিনভাবে আলোড়িত করবার জন্য এগিয়ে আসছে জাতীয় আন্দোলন। সে কয়েকটা মাস আমাদের দুজনের চমৎকার কেটেছিল। কিন্তু অল্প কিছু দিন যেতে না যেতেই সুদিন গেল শেষ হয়ে—এপ্রিলের গোড়ায় শুরু হল অসহযোগ আন্দোলন। সরকারপক্ষ কঠিনভাবে তাঁদের প্রতি-আন্দোলন চালালেন—আবার আমি গেলাম কয়েদখানায়।

বেশির ভাগ পুরুষ কর্মীরা তখন জেলে। ইতিমধ্যে একটা অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটে গেল—আমাদের দেশের মেয়েরা এলেন এগিয়ে, আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন তাঁরা। মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ প্রথম থেকেই এ-আন্দোলনে জড়িত ছিলেন, সেকথা সত্য। এবার কিন্তু তাঁরা এলেন দলে দলে, কাতারে কাতারে, বন্যার মত আকস্মিক ও দুর্বার বেগে। ব্রিটিশ সরকার যতটা আশ্চর্য হলেন তার চাইতে বড় বেশি কম আশ্চর্য হয়নি—এই সব মেয়েদের স্বামী, পিতা ও ভায়েরা। নানা শ্রেণীর মেয়েরা যোগ দিয়েছিলেন এই আন্দোলনে—কেউ তাঁরা অভিজাত কেউ বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। ঘরের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বাইরে তাঁরা কখনও হয়তো বেরোননি। কেউ ছিলেন বা কৃষাণ মজুরের মেয়ে—ধনিদরিদ্রনির্বিশেষে এ'রা সহস্রধারে বেরিয়ে পড়লেন সরকারের ভ্রূকুটি ও পুলিশের লাঠি ডান্ডা উপেক্ষা করে। সাহস তো এ'দের ছিলই, উপরন্তু

আরও একটা আশ্চর্য জিনিস দেখেছি এ'দের মধ্যে—সে হল মেয়েদের সংগঠন ক্ষমতা।

এই নারী অভিযানের কথা প্রথম যখন আমাদের কাছে পেীছল তখন আমরা ছিলাম নৈনি জেলে। ভারতের এই বীরাঙ্গনাদের কথা ভেবে আমরা যে কি-পরিমাণ গর্বে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম, সে কথা বলে বোঝানো শক্ত। বুক ফুলে উঠেছিল গর্বে, আনন্দের অশ্রুতে চোখ উঠেছিল ছলছলিয়ে—মন এমন কানায় কানায় ভরে উঠেছিল যে আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভাষা ব্যবহারের দরকারই হয়নি।

কিছুদিন পরে বাবা নৈনি জেলে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তাঁর কাছ থেকে আমাদের-না-জানা অনেক সব সদ্য সদ্য খবর পাওয়া গেল। জেলের বাইরে থেকে অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব করছিলেন তিনি। মেয়েদের এই প্রকার কার্য-কলাপ মোটেই তাঁর মনঃপূত ছিল না, এবিষয়ে একটু যেন তিনি প্রাচীন-পন্থীই ছিলেন। দুপুরের রৌদ্রে মেয়েরা রাস্তায় রাস্তায় হাবাতের মতন ঘুরে বেড়ায়, পুলিশের কবলে পড়ে লাঞ্ছিত হয়—এ তিনি চাইতেন না। কিন্তু মানুষের মতিগতি তিনি বুঝতেন সুতরাং কাউকে তিনি কখনও বারণ করেননি—এমন কি তাঁর স্ত্রী, কন্যাদের কিংবা পুত্রবধূকেও নয়। দেশময় মেয়েরা যেরকম শক্তি, সাহস ও কর্মদক্ষতা দেখায়—তাতে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। আর তাঁর নিজের বাড়ির মেয়েদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁর গর্বের অবধি ছিল না—অবশ্য এ গর্বটা ছিল তাঁর স্নেহপ্রসূত।

আমার পিতার নির্দেশে একটি স্মারণিক প্রস্তাব গ্রহণের জন্য ভারতের স্বাধীনতা দিবসের বার্ষিকী উপলক্ষ্যে, ১৯৩১এর ২৬শে জানুয়ারি দেশময় সহস্র সহস্র সভা আহূত হয়। এইসব সভা পুলিশ কর্তৃক নিষিদ্ধ হয় এবং অনেক সভাই জোর করে ভেঙে দেওয়া হয়। বাবা তাঁর রোগশয্যা হতে এই সব সভার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর এই কাজ আশ্চর্যরূপে সফল হয়েছিল। খবর-কাগজ, ডাক, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ইত্যাদি প্রচারের বিভিন্ন মাধ্যম থেকে কোনো সাহায্যই আমরা পাইনি। তবু এক নির্দিষ্ট সময়ে, একই দিনে এই সুবিস্তৃত দেশের সর্বত্র, এমন কি শহর থেকে বহু দূরে অবস্থিত নিতান্ত পল্লীগ্রামেও, স্মারণিক প্রস্তাবটি প্রত্যেক প্রদেশে আপন আপন প্রাদেশিক ভাষায় পঠিত ও গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার দশ দিন পরেই পিতার মৃত্যু হয়।

প্রস্তাবটি ছিল দীর্ঘ, প্রস্তাবের এক অংশে ভারতের নারীদের সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ ছিল : "ভারতের নারীদের প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন নিবেদন করি। মাতৃভূমির সংকটের দিনে এ'রা গৃহের আশ্রয় ত্যাগ করে, অদম্য সাহস ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে, ভারতের জাতীয় বাহিনীর পুরোভাগে পুরুষদের সঙ্গে একত্র সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন; সকলের সঙ্গে সমানভাবে ত্যাগ স্বীকার করে সংগ্রামের সফলতায় অংশভাক্ হয়েছিলেন......"

এই বিক্ষোভে নির্ভীকভাবে যোগদান করে কমলা যথেষ্ট কাজ করেছিল। তার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, কিন্তু তবু যে সময় সকল জ্ঞাতনামা কর্মীই কারাগারে আবদ্ধ, সে সময় অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তারই কাঁধে পড়েছিল এলাহাবাদে আমাদের কাজের

সুব্যবস্থা করার ভার। অভিজ্ঞতার অভাব সে পূরণ করেছিল তার মনের তেজোদীপ্ত শক্তি ও উৎসাহে। মাস কয়েকের মধ্যে সে এলাহাবাদের গর্বস্থানীয়া হয়ে ওঠে।

পিতার অন্তিম অসুখ ও আসন্ন মৃত্যুর বিষাদপূর্ণ ছায়ায় আবার আমাদের সাক্ষাৎ হল। এবার আমরা পরস্পরকে যেন নূতন করে বুঝতে শিখলাম, সহধর্মিণী আমার পাশে দাঁড়াল সহকর্মিণীরূপে। কয়েক মাস পরে আমরা কন্যাটিকে সঙ্গে নিয়ে সিংহল যাই সামান্য কয়েকটা দিনের ছুটি উপভোগ করতে। সেই আমাদের প্রথম এবং শেষ একত্র অবকাশ যাপন। এই সুযোগে আমরা উভয়ে উভয়কে যেন নূতন করে আবিষ্কার করলাম। আমাদের অতীতের সান্নিধ্য যেন বর্ষ বর্ষ ধরে এই নূতন ও নিবিড়তর যোগেরই সম্ভাবনা বহন করে আসছিল।

অল্প দিনের মধ্যেই ফিরে আসতে হল। অল্প দিনের মধ্যেই কর্মকবলিত হয়ে পড়লাম—তার পর পড়লাম কারাগারের কবলে। আর পাবো না ছুটি, আর মিলবে না এক সঙ্গে কাজ করার সুযোগ। একত্র কিছুকাল যে থাকব—তাও হল না। দুবছর কারাবাসের দুটো মেয়াদের মাঝখানে অপরিসর একটা অবকাশে আবার দুজনের দেখা হল। দ্বিতীয় মেয়াদ শেষ হবার পূর্বেই খবর এল কমলা মৃত্যুশয্যায় শায়িত।

১৯৩৪এর ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতার একখানা ওয়ারেণ্টে আমাকে গ্রেফ্তার করা হয়। কমলা গেল আমাদের ঘরটিতে আমার জন্য কিছু কাপড়-চোপড় গুছিয়ে দিতে, বিদায় নেবার উদ্দেশ্যে আমিও গেলাম তার পিছু পিছু। আমায় জড়িয়ে ধরে হঠাৎ সে সংজ্ঞা হারাল। এরকমটা আগে কখনও ঘটেনি। কারাগমন ব্যাপারটা হেলাভরে যাতে তুচ্ছ করতে পারি, হাসতে হাসতে যাতে জেলে যেতে পারি—এইরূপভাবে আমরা নিজেদের তৈরি করেছিলাম। সেদিক থেকে এ যেন একটা অঘটন ঘটে গেল। ভবি-তব্যের আশঙ্কায় কমলা অভিভূত হয়ে পড়ল কি? সে কি আগে থেকেই বুঝতে পারল যে এই বিচ্ছেদেই আমাদের সহজ মিলনের পথ শেষ হয়ে গেল?

যখন আমাদের উভয়ের পক্ষে উভয়ের প্রয়োজন সর্বাধিক, যে সময় আমাদের সান্নিধ্য নিবিড়তম, ঠিক সেই সময় দুবছর মেয়াদের দুটি দীর্ঘ কারাবাস আমাদের মধ্যে ব্যবধান রচনা করল। কেন এমন হল এই প্রশ্নটা দিনের পর দিন কারাগারে আমায় ভাবিয়ে তুলত। তবু মনে মনে আশা পোষণ করতাম যে আবার আমরা একত্র হব—আবার মিলব এক সঙ্গে। এই বছরগুলি কমলার কেমন কেটেছে, সে আমি নিজেও জানতাম না। কেবল অনুমান করতে পারি। জেলের মধ্যে দেখা সাক্ষাতের সময় এবং জেলের বাইরে যে সময়টা হাতে পেয়েছিলাম—সে সময়টা এত অল্প যে সাধারণ স্বাভাবিক আচরণের পক্ষে তা একটুও প্রশস্ত ছিল না। আমাদের সব সময় এমন ব্যবহারই দেখাতে হত যা সর্বোচ্চ শ্রেণীর, কারণ তা না হলে একজন দুঃখ প্রকাশ করে অপরজনের ক্লেশের কারণ হতাম। একথা স্পষ্টই বোঝা যেত যে কমলার মন নানাদিক থেকে বহু উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় পীড়িত। তার মনে শান্তি ছিল না। আমি হয়তো তার মনের এই অবস্থায় কমলার সহায়স্বরূপ হতে পারতাম কিন্তু কারাগারের ভিতর থেকে তার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

৩ : মানব সম্বন্ধের সমস্যা

বাদেনহ্বাইলারে নিভৃত অবসরের মুহূর্তগুলিতে নানা চিন্তা আমার মনে উদিত হত। কারাগারের আবহাওয়া আমি সহজে ত্যাগ করতে পারিনি, ওটা আমার এক প্রকার অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাদেনহ্বাইলারের নূতন পরিবেশের সঙ্গে কারাগারের খুব বেশি পার্থক্যও ছিল না। আমি ছিলাম নাৎসি দেশে, এমন সমস্ত ঘটনাপরম্পরার মাঝখানে যা আমার কাছে ছিল অত্যন্ত অপ্রীতিকর। কিন্তু নাৎসিবাদ আমার ব্যক্তিগত জীবনে কোনো বিরক্তিকর ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারেনি। ব্ল্যাক ফরেস্টের এক কোণে অবস্থিত এই শান্তিপূর্ণ পল্লীটিতে নাৎসি নীতির পরিচয় তখনও উগ্রভাবে প্রকাশ পায়নি।

প্রকাশ পায়নি একথা বলা বোধ করি ভুল হবে। এমনও হতে পারে যে তখন আমার মন অন্যান্য বিষয়ে মগ্ন ছিল। আমার চোখের সামনে অতীত জীবনের দৃশ্যপট খোলা, কমলা যেন সকল সময় আমার এই বিগত জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার কাছে সে যেন ভারতের তথা জগতের সমস্ত নারীর প্রতীক হয়ে প্রতিভাত হয়েছে। ভারতের যে-রূপটি আমার কল্পনার রূপ—তার সঙ্গে কমলা যেন অবিকৃত ভাবে মিশে গেছে। সে যেন আমাদের সেই সকল দেশের সেরা দেশ—দোষত্রুটি দুর্বলতা ছাপিয়েও যেন চোখে পড়ে তার সেই ধরা ছোঁওয়ার অতীত মনোমোহন রহস্যময় সত্তা। কমলা কেমন মানুষ ছিল? তাকে কি আমি চিনতে পেরেছি, বুঝেছি কি তার প্রকৃত স্বরূপকে? সেই বা কি চিনেছিল আমাকে, বুঝতে পেরেছিল আমার সত্য স্বরূপকে? আমি নিজেও তো সাধারণ মানুষের মত ছিলাম না; আমার মনের মধ্যেও ছিল রহস্য, ছিল অনির্ণীত গভীরতা যার পরিমাণ আমি নিজেও জানতাম না। এক একবার মনে হয়েছে সে এইজন্যই আমায় যেন একটু ভয় ও সমীহ করে চলত। বিবাহ করবার মত সন্তোষজনক পাত্র আমি কোনো কালেই ছিলাম না। কোনো কোনো বিষয়ে কমলা ও আমার মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য ছিল, আবার অনেক বিষয়ে আমাদের মধ্যে মিলও ছিল। কিন্তু আমরা দুজনে পরস্পরের অনুপূরক ছিলাম না—এরূপ অবস্থায় আমাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হতে পারেনি। ব্যক্তিস্ব শক্তি মিলিত জীবনকে দুর্বল করে দিয়েছিল। আমাদের সম্বন্ধটা ছিল আতিশয্যের সম্বন্ধ—কখনও সম্পূর্ণ বোঝাপড়া, পরিপূর্ণ মনের মিল, আবার কখনও গরমিলজনিত বিবিধ সঙ্কট। মোটকথা সব কিছু মেনে নিয়ে গতানুগতিক ভাবে পারিবারিক জীবন যাপন করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

ভারতের বাজারে বাজারে ক্রেতাদের চোখের সামনে যে-সব ছবি প্রদর্শিত হত, তার একটিতে ছিল পাশাপাশি কমলা ও আমার ছবি; তার উপর লেখা থাকত "আদর্শ জোড়ী" অর্থাৎ আদর্শ দম্পতি। বহু লোকের কল্পনায় আমরা ছিলাম 'আদর্শ' দম্পতি। এরকম আদর্শ কল্পনায় যত সহজ, কাজে তেমনি কঠিন। সিংহলে অবসর-বিনোদনের সময় কমলাকে একবার বলেছিলাম যে নানা বাধা বৈষম্য, জীবনদেবতার নানা বিচিত্র লীলা সত্ত্বেও আমাদের দাম্পত্য-জীবনে আমরা মোটামুটি সুখী ও

সৌভাগ্যবান হয়েছি। বিবাহ জিনিসটাই এক ঝকমারি ব্যাপার, হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও বিবাহিত জীবনের সমস্যা সমস্যাই থেকে গেছে। চোখের সামনে দেখছি কত ভাঙাচোরা জীবনের ধ্বংসাবশেষ, কত সোনার সংসার পুড়ে খাক হয়ে গেছে। সেদিক থেকে আমরা কত বেশি ভাগ্যবান! কমলাকে বলেছিলাম এই কথা—কমলা সায় দিয়েছিল। আমরা কখনও কখনও কলহে লিপ্ত হয়েছি, পরস্পরের প্রতি রাগ বা অভিমান করেছি, কিন্তু অন্তরের মধ্যেকার সেই প্রাণের প্রদীপটিকে আমরা নির্বাপিত হতে দিইনি। এই অন্তরের আলোকে আমাদের উভয়ের মিলিত জীবনে নূতন নূতন উদ্যমের পথ খুলে গেছে, দুজনকে দুজনে যেন নূতন করে পেয়েছি ও বুঝতে পেরেছি।

রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে আমরা এত মত্ত থাকি যে অনেক সময় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ সমস্যার গভীর ও মূলগত তাৎপর্য আমরা বুঝতে চেষ্টা করি না। ভারতবর্ষ ও চীনের প্রাচীন সংস্কৃতি মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে খুবই সচেতন ছিল। এ'রা তাই সামাজিক আচার ব্যবহারের রীতি পদ্ধতি বেঁধে দিতে চেয়েছিলেন। এই সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটি ছিল সত্য, কিন্তু এর ফলে ব্যক্তিবিশেষের জীবন একটা ধীর, স্থির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। এই অস্থৈর্যের যুগে সেরকম জীবনসাম্য আর দেখা যায় না। প্রতীচীর বহু দেশ অন্যদিকে অনেক এগিয়ে গেছে কিন্তু অবিচল ভিত্তির উপর সামাজিক জীবন গড়ে তুলতে পেরেছে কি? এই যে দেহ মনের একটা শান্ত সমাহিত অবস্থা—এটা কি বিশেষভাবে স্থিতিশীলতার উপরেই নির্ভর করে, প্রগতি ও পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে তা হলে কি এর বিরোধ আছে? একটি চাইলে আর একটি কি তা হলে পরিহার করতে হবে? তা কেন হবে। আমার তো মনে হয় অন্তর ও বাহিরের অগ্রগতির সঙ্গে এই শান্ত ভাবের সমাবেশ ঘটানো অসম্ভব নয়। পুরাতন দিনের ভূয়ো দর্শনের সঙ্গে নূতন দিনের শক্তিমত্তা ও বিজ্ঞানের পরিণয় ঘটানো সম্ভব হবে। জগতের ইতিহাসে আমরা এমন একটা সন্ধিক্ষণে এসে পেণছেছি যে এই সমন্বয় সাধন করতে না পারলে উভয় দিকেই সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

৪ : ১৯৪৫ : বড়দিন

কমলার অবস্থা একটু ভালর দিকে ফিরেছে। এ-ভাবটা তেমন কিছু স্পষ্ট নয়—তবু গত কয়েক সপ্তাহের দুশ্চিন্তার পর আমরা অনেকটা নিরুদ্বিগ্ন বোধ করলাম। সে সংকট উত্তীর্ণ হয়েছে এবং উন্নতির অবস্থা একটু স্থায়ী হয়েছে—এটাই আমাদের পক্ষে পরম লাভ। এইভাবে এক মাস কাটল। আমি এই সুযোগে ইন্দিরাকে নিয়ে অল্প দিনের জন্য ইংলন্ড গেলাম। আট বৎসর আমি সেখানে যাইনি, বহু বন্ধুবান্ধবের সনির্বন্ধ অনুরোধে আমার যেতে হল।

বাদেনহ্বাইলারে ফিরে এসে আবার সেই পুরাতন জীবনযাত্রার সূত্র ধরে চলেছি। শীত পড়েছে—বহির্দৃশ্য তুষারশুভ্র। বড়দিন যত এগিয়ে আসছে ততই যেন কমলার

অবস্থা মন্দের দিকে চলেছে। আবার এল সংকটময় অবস্থা, ভয় হল জীবনের অতি ক্ষীণ ডোর আর বুঝি এ-টান সইতে পারবে না। ১৯৩৫-এর সেই অন্তিম দিনগুলি তুষারাচ্ছন্ন পথে আধগলা বরফ ভেঙে আনাগোনা করে কাটিয়েছি। কয়টা দিন, কিম্বা কয়টি ঘণ্টা মাত্র কমলা জীবিত থাকবে—তাও জানি না। শুভ্র হিম বস্ত্রে আবৃত শীতের দৃশ্য দেখে মনে হত হিমশীতল মৃত্যু এনেছে তার চরম প্রশান্তি। আমার মন থেকে পূর্বেকার সমস্ত আশা ভরসা নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেল।

আশ্চর্য জীবন শক্তির পরিচয় দিয়ে কমলা এই বিপদও কাটিয়ে উঠল। সে একটু ভাল হয়ে উঠল, মনের প্রফুল্লতাও বাড়ল। এমন কি বাদেনহ্বাইলার থেকে অন্য জায়গায় তাকে নিয়ে যাবার কথাও বলল সে। এ-জায়গাটা আর তার ভাল লাগছিল না। তা ছাড়া অপর একটি কারণে এ-জায়গার প্রতি তার বিরাগ বেড়ে গেল। এই আরোগ্যসদনের একটি রোগী তাকে মধ্যে মধ্যে ফুল পাঠাতেন—দু একবার তিনি দেখতেও এসেছিলেন কমলাকে। তিনি মারা গেলেন। এই রোগীটি ছিলেন আয়ার্লণ্ড-বাসী একটি যুবক। তার শরীরের অবস্থা ছিল কমলার অপেক্ষা অনেক ভাল—মাঝে মাঝে তিনি বাইরে হেঁটে চলে বেড়াবারও অনুমতি পেতেন। ছেলেটির আকস্মিক মৃত্যুর খবর কমলা যাতে টের না পায় সে-চেষ্টা আমরা করেছিলাম—কিন্তু কৃতকার্য হইনি। রুগ্ন যাঁরা এবং বিশেষত আরোগ্যসদনে থাকার দুর্ভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁদের খারাপ খবর বলে দিতে হয় না; এমন একটা সুক্ষ্ম বোধশক্তি তাঁদের জন্মায় যে তাঁরা সে কথা কেমন করে যেন জেনে ফেলেন।

জানুয়ারি মাসে আমি দিন কয়েকের জন্য প্যারিস যাই, সেখান থেকে ফের লণ্ডনে কিছু দিন কাটিয়ে আসি। জীবনের ডাক আবার যেন টানছে আমায়। লণ্ডনে পেঁছে খবর পেলাম যে দ্বিতীয়বারের জন্য আমাকে ভারতের জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি পদে নির্বাচন করা হয়েছে। সভা বসবে আগামী এপ্রিল মাসে। খবরটা অপ্রত্যাশিত নয়। এর আগেই বন্ধুগণ আমায় শাসিয়ে রেখেছিলেন—এমন কি কমলার সঙ্গে এ-ব্যাপার নিয়ে ইতিপূর্বে আমার আলোচনা হয়ে গেছে। এখন উভয় সংকট উপস্থিত। কমলা যেমন আছে তেমনি অবস্থায় তাকে রেখে যাব না সভাপতিত্ব প্রত্যাখ্যান করব। কমলা ইস্তফা দেবার ঘোর বিরোধী। এখন তো সে অপেক্ষাকৃত ভালই আছে, সুতরাং কাজকর্ম সেরে তার কাছে ফিরে আসতে পারব—এই সে বলল।

১৯৩৬-এর জানুয়ারি মাসের শেষাশেষি কমলা বাদেনহ্বাইলার ত্যাগ করল। সুইটজারল্যাণ্ডে লোসানের নিকটবর্তী একটি আরোগ্যসদনে তাকে স্থানান্তরিত করা হল।

৫ : মৃত্যু

কমলা ও আমি সুইটজারল্যাণ্ডে আসাটা পছন্দই করলাম। সে আগের থেকে অধিক প্রফুল্ল হয়ে উঠল; আর আমিও এদেশের এই অংশটুকুর সঙ্গে পূর্বপরিচিত ছিলাম বলে, অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগলাম। যদিও কমলার অবস্থার বিশেষ কিছু

পরিবর্তন দেখা গেল না, তবু মনে হল আসন্ন সংকটের সম্ভাবনা সে কাটিয়ে উঠেছে। হয়তো এইভাবেই চলবে বেশ কিছুদিন এবং হয়তো মন্থর গতিতে সে ভাল হওয়ার দিকে অগ্রসর হবে।

ইত্যবসরে ভারতের ডাক ঘন ঘন আসতে লাগল, বন্ধুরা দেশে ফিরে যাবার জন্য আমায় তাগিদ পাঠাতে লাগলেন। চঞ্চল হল মন, স্বদেশের সমস্যাগুলির চিন্তা আমায় যেন পেয়ে বসল। কয়েক বৎসর কারাবাস ও অন্যান্য নানা কারণে দেশের কাজে তেমন-ভাবে যোগ দিতে পারিনি। এখন আর নিশ্চেষ্ট বসে থাকতে ভাল লাগছে না। লন্ডন ও প্যারিস ঘুরে এসেছি, দেশ থেকে অনেক সংবাদ আসছে—সব কিছু মিলে যেন আমার নেপথ্য থেকে আমায় টেনে বের করেছে, আর সেই পুরাতন খোলসে আমার ফিরে যাবার জো নেই।

কমলার সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করলাম এবং ডাক্তারের পরামর্শ নিলাম। উভয়েই আমার দেশে ফিরে যাওয়া বিষয়ে একমত হলেন। কে. এল. এম. বিমানে যাত্রার ব্যবস্থা হল। আটাশে ফেব্রুয়ারি লোসান ছাড়তে হবে। এদিককার সমস্ত ব্যবস্থা প্রস্তুত, ইতিমধ্যে দেখি যে কমলা একেবারেই চায় না যে আমি তাকে ছেড়ে যাই, অথচ সমস্ত ব্যবস্থা বদলে দেওয়ার কথাও বলতে চায় না। তাকে বললাম দেশে দীর্ঘকাল আমি থাকব না হয়তো মাস দু-তিনের মধ্যেই ফিরে আসতে পারব। তার যদি তেমন ইচ্ছা হয় তাহলে আগেও ফিরতে পারি। দরকার হলে সে তার করবে আর আমি হপ্তা-খানেকের মধ্যেই বিমানযোগে উপস্থিত হতে পারব।

আর চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই আমায় যাত্রা করতে হবে। ইন্দিরা কাছেই বেক্স নামে একটা জায়গায় স্কুলে পড়ছিল; সেও আসছে এই কটা দিন আমাদের কাছে কাটিয়ে যাবে। ডাক্তার এসে বললেন দেশে ফেরা আমি যেন দিন দশেকের মত স্থগিত রাখি। এর বেশি তিনি কিছু বলতে চাইলেন না। আমি তখনই রাজি হলাম এবং পরবর্তী আর একখানা কে. এল. এম. বিমানে স্থানের ব্যবস্থা করলাম। এই শেষের দিনগুলি যতই কেটে যাচ্ছে ততই যেন কি এক রহস্যময় পরিবর্তন দেখা যেতে লাগল কমলার মধ্যে। শারীরিক অবস্থায় কোনো পরিবর্তন দেখতে পাইনি কিন্তু মনে হল যে চারি-দিকের বাহ্যিক ঘটনার প্রতি তার মনোযোগ যেন কমে গেছে। প্রায়ই বলত কে যেন তাকে ডাকছে, কে যেন মূর্তি ধরে তার ঘরে প্রবেশ করছে।

আটাশে ফেব্রুয়ারি ভোর বেলা কমলা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। ইন্দিরা ছিল সেখানে, আর ছিলেন আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু এবং এই কয়মাসের নিত্যসঙ্গী ডক্টর অটল।

সুইটজারল্যান্ডের কয়েকটি প্রতিবেশী শহর থেকে আমাদের কতিপয় বন্ধু এলেন এবং কমলার দেহ লোসানের দাহগৃহে নিয়ে যাওয়া হল। তার সেই গৌর তনু, মধুর হাসিতে ভরা তার সুন্দর মুখখানি কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। জীবনশক্তিতে সমুজ্জ্বল তার সেই প্রাণময় দেহের ভস্মশেষ ইহজীবনের শেষ চিহ্নরূপে একটি সামান্য পাত্রে রক্ষিত হল।

৬ : মুসোলিনি : প্রত্যাবর্তন

যে-বন্ধন লোসান ও ইউরোপ ধরে রেখেছিল সে-বন্ধন টুটে গেছে; আর এখানে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। বস্তুতপক্ষে আমার মনের মধ্যে আরও এমন কিছু ভেঙে গেছে যা তখন আমি বুঝতে পারিনি। কারণ সে সময়টা আমার পক্ষে ছিল অন্ধকারময়, আমার মন যেন বিকল হয়ে পড়েছিল। কয়েকটা দিন নিরিবিলি ও শান্তিতে কাটাবার জন্য ইন্দিরা ও আমি গেলাম মন্ট্রিয়ো শহরে।

মন্ট্রিয়োয় থাকতে ইতালি দেশের লোসানস্থিত কন্সাল আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন; সিনর মুসোলিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন আমার পত্নীবিয়োগে তাঁর গভীর সহানুভূতি জানাবার জন্য। আমি একটু আশ্চর্যই হলাম কারণ ইতিপূর্বে সিনর মুসোলিনির সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয়নি, তাঁর সঙ্গে কোনো যোগাযোগও ছিল না। কন্সালকে বললাম তিনি যেন মুসোলিনির কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

এর কয়েক সপ্তাহ পূর্বে রোম থেকে একজন বন্ধু লিখেছিলেন যে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সিনর মুসোলিনি খুশি হবেন। তখন আমার রোমে যাবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না ও বন্ধুকে আমি সেই মত জানিয়েছিলাম। পরে যখন বিমানপথে ভারতে ফেরার কথা ভাবছি, আবার আমন্ত্রণ এল; মনে হল এবারকার অনুরোধে একটু যেন আগ্রহাতিশয্য আছে। এরূপ সাক্ষাৎকার আমি এড়িয়ে চলতেই চেয়েছিলাম অথচ অসৌজন্য প্রকাশেও আমার অনিচ্ছা ছিল। ডুচে লোকটি কেমন জানবার জন্য আমার কৌতূহল ছিল। অন্য সময় হলে বিতৃষ্ণা দমন করেও সাক্ষাৎ সেরে নিতে পারতাম। কিন্তু সে সময় আবিসিনিয়ায় ইতালিয় অভিযান চলেছে সুতরাং তখন দেখা করতে গেলে নিশ্চয়ই নানা কথা উঠত। আমাদের সাক্ষাতকারের কথা ফ্যাসিস্টদের প্রচারকার্যে অবশ্যই ব্যবহৃত হত তখন আপত্তি করলেও কিছু ফল হত না। এর অল্পদিন আগেও এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যাতে ইতালিপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্র ও অন্যান্য ব্যক্তিদের কথা, তাঁদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবং কখনও কখনও তাঁদের অজ্ঞাতে ফ্যাসিস্টদের প্রচারকার্যে ব্যবহৃত হয়েছে। তা ছাড়া আর একটি ঘটনার কথা আমার মনে ছিল সে হল "জিওর্নালে দিতালিয়া" পত্রিকায় ১৯৩১ অব্দে প্রকাশিত মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের এক সর্বৈব ভুয়ো খবর।

সুতরাং অক্ষমতাজনিত খেদ প্রকাশ করে বন্ধুকে চিঠি লেখা গেল। ভুল বোঝার সম্ভাবনা এড়িয়ে যাবার জন্য তাঁকে পুনরায় চিঠি লিখি ও টেলিফোন করি। এসমস্তই হল কমলার মৃত্যুর আগেকার কথা। মৃত্যুর পরে আবার লিখে পাঠালাম যে অপরাপর কারণ ছাড়াও এ-সময় দেখাসাক্ষাৎ করার মত মনের অবস্থা আমার নয়।

এত কান্ড করতে হল তার কারণ এই যে কে. এল. এম. বিমানে গেলে আমার রোম হয়ে যেতে হবে এবং সেখানে রাত্রিবাসও করতে হবে। এই জন্যই পূর্ব থেকেই সাবধান হওয়ার প্রয়োজন ছিল। রোমে একটি রাত কাটানো আমি তো এড়াতে পারতাম না। মন্ট্রিয়োতে কিছুদিন কাটাবার পর জেনিভা হয়ে মার্সেইলে গেলাম এবং

সেখানে পূর্বদেশগামী কে. এল. এম. বিমানপোতে চড়ে বসলাম। সন্ধ্যার দিকে রোমে পৌঁছাতেই একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী সিনর মুসোলিনির প্রধান পরিষদের লিখিত একখানি পত্র আমার হাতে দিলেন। চিঠিতে লেখা ডুচে আমার সাক্ষাৎ পেলে সুখী হবেন এবং সন্ধ্যা ছটার সময় সাক্ষাৎকারের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। একথা শুনে বিস্মিত হলাম এবং সাক্ষাৎ করাটা কেন যে আমার অভিপ্রেত নয় সে সম্বন্ধে পূর্বে যেসব কথা লিখেছি সে বিষয় উল্লেখ করলাম। কর্মচারীটি বেশ একটু জোর করতে লাগলেন, বললেন সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেছে এখন বদলানো আর যাবে না। এমন কি এই সাক্ষাৎ যদি না ঘটে তবে নাকি তাঁর বরখাস্ত হবারও সম্ভাবনা। আমাকে ভরসা দেওয়া হল যে ডুচের সঙ্গে কয়েক মিনিটের জন্য দেখা করলে চলবে এবং সাক্ষাৎকারের কথা সংবাদপত্রে কিছুই বের হবে না। ডুচে নাকি আমার সঙ্গে কেবল করমর্দন করতে চান আর স্বয়ং আমার স্ত্রীবিয়োগে শোকপ্রকাশ ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করতে চান। পুরো এক ঘণ্টা তর্ক চলল—অবশ্য ভদ্রতা রক্ষা করে। আমার পক্ষে এই একটি ঘণ্টা বড়ই ক্লান্তিকর হয়েছিল, কর্মচারীটির অবশ্য অস্বস্তির সীমা ছিল না। তখন সাক্ষাতের জন্য নির্দিষ্ট সময় এসে পড়েছে সুতরাং আমারই হল জিত। ডুচের প্রাসাদে টেলিফোন করে খবর গেল যে আমি যেতে পারলাম না।

সন্ধ্যাবেলা সিনর মুসোলিনিকে একখানা চিঠি লিখে এই বলে দুঃখ প্রকাশ করলাম যে তিনি অনুগ্রহ করে ডাকলেন কিন্তু সে-আমন্ত্রণের সুযোগ নিতে পারলাম না। তাঁর সহানুভূতিসূচক বার্তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম।

বিমানপথে চলেছি। কাইরোতে কয়েকজন পূর্বপরিচিত বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। তারপর আরও এগিয়ে চললাম পূর্ব এশিয়ার মরুভূমির উপর দিয়ে। এ পর্যন্ত বিবিধ ঘটনা এবং যাত্রাসংক্রান্ত নানাবিধ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার মধ্যে আমার মন ব্যাপৃত ছিল। কাইরো ত্যাগ করে জনশূন্য মরুপ্রদেশের উপর দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উড়ে যাবার সময় একটা নিঃসঙ্গতার ভাব মনকে যেন আচ্ছন্ন করে নিল। মনে হল সবই যেন ফাঁকা, সবই যেন উদ্দেশ্যবিহীন। আমি একলা ফিরছি আপন গৃহে। কিন্তু তা আমার কাছে আর গৃহ নয়। আমার পাশে রয়েছে শুধু একটি বেতের বাক্স, আর সেই বাক্সের মধ্যে একটি অকিঞ্চিৎকর ভস্মাধার। কমলার ঐটুকুই অবশিষ্ট আছে আমাদের সোনার স্বপ্ন যেন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সে আর নেই, কমলা আর নেই—আমার মন বার বার এই কথাই বলে চলেছে।

আমার আত্মজীবনীর কথা ভাবছিলাম। কমলা যখন ভাওয়ালি আরোগ্যশালায় তখন তার সঙ্গে এই বই সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। বই লিখতে লিখতে মাঝে মাঝে দুই এক অধ্যায় তাকে পড়ে শুনিয়েছি। সে এই আত্মজীবনীর অংশমাত্র দেখেছিল, বাকিটুকু তার আর দেখা হল না। জীবনগ্রন্থেও আমাদের সম্মিলিত জীবনের আর কোনো অধ্যায় রচিত হবে না। লণ্ডনের যে-প্রকাশক আমার আত্মজীবনী বের করার ভার নিয়েছিলেন বোগ্দাদে পৌঁছে তাঁদের কাছে আমার এই পুস্তকের উৎসর্গপত্র পাঠিয়ে দিলাম : 'লোকান্তরিতা কমলাকে'।

করাচিতে এসে পেঁছিলাম, জনতা এল ভিড় করে, অনেকগুলি পরিচিত মুখ একত্র দেখতে পেলাম। তারপর এল এলাহাবাদ। সেই মহার্ঘ পাত্রটি খরস্রোতা গঙ্গার তীরে নিয়ে গিয়ে এই পুণ্যতোয়া নদীর বক্ষে ভস্মাবশেষ ঢেলে দেওয়া হল। আমাদের কত পূর্বগামীকে গঙ্গা এমনি করে সাগরের শান্তিপারাবার অভিমুখে নিয়ে গেছে। পশ্চাৎগামী আরও কত লোক অন্তিম যাত্রাকালে এই গঙ্গার পুণ্যপ্রবাহে গা ভাসিয়ে দেবেন—তার ইয়ত্তা নেই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অ ন্বে ষ ণ

১ : অতীত ভারতের ছবি

চিন্তাবহুল ও কর্মময় এই ক'বৎসর আমার মন ভারতবর্ষের কথায় পূর্ণ হয়ে আছে; প্রয়াস চলেছে তাকে বুঝে নিতে, দেশের প্রতি আমার মনের প্রক্রিয়াটা বিশ্লেষণ করে দেখতে। শৈশবের দিনে ফিরে গিয়ে এ বিষয়ে তখনকার অনুভূতি স্মরণ করতে চেষ্টা করেছি, বুঝতে চেষ্টা করেছি দেশাত্মভাব আমার বিকাশমান মনে কি রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এই ভাব মাঝে মাঝে পশ্চাতের পটভূমিকায় আত্মগোপন করেছে। কিন্তু মনের মধ্যে এ ছবি সর্বক্ষণই আছে। পুরাণ, ইতিকথা এবং আধুনিক তথ্যের একটা জটিল সংমিশ্রণে এই ভাবের রূপান্তর ঘটেছে সত্য, কিন্তু মন থেকে কখনও মুছে যায়নি। দেশের যে-ছবি আমি মনের মধ্যে গ্রহণ করেছিলাম তাতে যতটা না গৌরব বোধ করেছি তার চেয়ে অনেক বেশি বোধ করেছি লজ্জা। চারিদিকের অনেক কিছু দেখে লজ্জা হত। কত কুসংস্কার, কত পুরাতন শতচ্ছিন্ন মতবাদ, আর সর্বোপরি কি দীন দরিদ্র আমাদের এই পরাধীন দেশ। বড় হয়ে যখন দেশ স্বাধীন করার চেষ্টায় ব্রতী হলাম তখন ভারতের ভাবময় রূপের চিন্তায় বিহ্বল বোধ করেছি। মনকে-আচ্ছন্ন-করা মনভোলান এই দেশ সদাসর্বদা আমায় যেন হাতছানি দিয়ে ডাকত, এমন কিছু করার প্রেরণা দিত যা থেকে অন্তরের একটি অস্পষ্ট অথচ গভীর আকাঙ্ক্ষা সার্থক করতে পারি। আমার মনে হয় এই প্রারম্ভিক প্রেরণাটি এসেছিল ব্যক্তিগত ও জাতীয় এই উভয়বিধ গর্বের মধ্য দিয়ে। আর ছিল অন্য সাধারণের মত পরের প্রভুত্ব প্রতিহত করে স্বাধীন জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করার ইচ্ছা। সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের কাছে আমাদের এই বিরাট ও অতীত-গৌরবোজ্জ্বল দেশ অসহায় হয়ে বাঁধা পড়ে থাকবে, আর সেই দ্বীপের অধিবাসীরা এদেশের উপর যথেচ্ছাচার চালাবে—একথা ভাবলেও অতি উৎকটভাবে বিসদৃশ ঠেকত। আরও উৎকট হল এই যে, এই জুলুমের বন্ধন আমাদের দেশে অপরিমেয় দারিদ্র্য ও অধঃপতন এনেছে। দেশের কাজে নেমে পড়ার জন্য এতটুকু কারণই যথেষ্ট।

কিন্তু আমার মনে যে-সব প্রশ্ন জাগত সেগুলির পক্ষে এই কারণটুকু যথেষ্ট নয়। প্রশ্ন ছিল এই যে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক রূপের অতীতে ভারতে যে ভাবরূপ রয়েছে, সেটা কি। তার অতীত গৌরব ও বৈশিষ্ট্যের পিছনে কি শক্তি কাজ করেছে? সে-শক্তি সে হারালো কি করে? হারিয়েই যদি থাকে তবে সবটুকুই কি হারিয়ে বসেছে? বহুসংখ্যক মানুষের বাসভূমি ছাড়া ভারতবর্ষে আর কোনো গুরুত্ব আছে কি? এমন কিছু আছে কি তার মধ্যে যাতে সে সাম্প্রতিক জগতে স্বকীয় স্থান নিতে পারে?

সমস্যাটা তলিয়ে দেখতে গিয়ে ব্ঝলাম যে আজকের জগতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলা সম্ভব তো নয়ই, বাঞ্ছনীয়ও নয়। এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাটির বিস্তৃততর আন্তর্জাতিক দিক আমার মনকে অভিভূত করে নিল। যে ভবিষ্যৎ রূপটি এই চিন্তার ফলে আমার মনে রূপ নিল তা আর কিছু নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতের অন্তরঙ্গ সাহচর্যের রূপ। কিন্তু সে হল ভবিষ্যতের কথা। আপাতত বর্তমানের সমস্যাটাই সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য। এই বর্তমানের পিছনে রয়েছে প্রাচীন অতীতের অতি জটিল সূত্র। এই সূত্র ধরেই ইতিহাস অতীত থেকে বর্তমানে, ও বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায়। সুতরাং বুঝতে পারলাম যে দেশকে বুঝতে হলে দেশের অতীতকে বুঝতে হবে।

ভারতবর্ষ রয়েছে আমার রক্তপ্রবাহে। আমার ধমনীর চাঞ্চল্যে তার সেই নাড়ির টান আনন্দরসে প্রবাহিত। তবু একজন বিদেশী সমালোচকের মত তাকে বুঝতে অগ্রসর হলাম। মনে রয়েছে অতীত ও বর্তমানের অনেক কিছুর প্রতি বিতৃষ্ণামিশ্রিত অশ্রদ্ধা। আমি এগিয়েছি যেন পশ্চিম হয়ে। সদ্ভাব নিয়ে পশ্চিমদেশীয় কোনো ব্যক্তি এদেশকে যেভাবে দেখবেন সেই দৃষ্টি নিয়ে স্বদেশকে দেখতে চেয়েছি। দেশের চেহারা ও মনোবৃত্তি বদলে দিয়ে তাকে আধুনিকতার পোশাক পরাব, মনে আমার এই আগ্রহ এবং সেইজন্য ব্যস্ততা। ইতিমধ্যে সংশয় জাগল মনে। যে-ভারতবর্ষের অতীত দিনের সঞ্চয় থেকে অনেকখানি আমি বাদ দিতে চাই আমি কি সেই ভারতকে সত্য করে চিনি? এটা অবশ্য স্বীকার্য যে অনেক কিছুই বাদ দেওয়ার আছে, অনেক কিছু আছে যা ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এও স্বীকার করতে হবে যে ভারতের মধ্যে জীবনীশক্তিসম্পন্ন, স্থায়ী এবং মানবের কল্যাণকর এমন একটা কিছু আছে, যা না থাকলে ভারতের মহত্ত্বের পরিচয় এমন নিঃসন্দেহরূপে পাওয়া যেত না। তা যদি না থাকত তাহলে হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় সংস্কৃতি বেঁচে থাকতে পারত না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই কিছুটা কি?

ভারতের উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধু উপত্যকায় মোহেঞ্জোদারোর একটি স্তূপের উপর দাঁড়িয়েছি। আমার চারিদিকে এই প্রাচীন নগরীর ঘরবাড়ি পথ ঘাট দেখা যাচ্ছে। শোনা যায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বের এই শহরটি সেই সুপ্রাচীন কালেই এক প্রাচীন ও উন্নত ধরনের সভ্যতার পরিচয় দিয়েছে। অধ্যাপক চাইল্ড্ লিখেছেন—"এই সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতাটি পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রা নিখুঁতভাবে মিলিয়ে নেবার একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত। বহু বছর অপরিসীম ধৈর্য ও চেষ্টার ফলে এরূপ সভ্যতা গড়ে ওঠে। মোহেঞ্জোদারোর সভ্যতার আর একটি বিশেষ গৌরব এই যে তা স্থায়ী হয়েছে। এ সভ্যতা বিশেষভাবে ভারতের সভ্যতা এবং আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি এখানেই।" পাঁচ-ছ'হাজার বৎসর কি আরও দীর্ঘকাল অবিচ্ছেদ্য-ভাবে একটা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা চলে এসেছে, একথা ভাবলেও বিস্ময় লাগে। আরও আশ্চর্য এই যে তা চলেছে দেশের পরিবর্তন ও অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে। এই হাজার হাজার বছর ভারতবর্ষ এক জায়গায় স্থির হয়ে তো থাকেনি, ক্রমাগত নানা

পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে। তখন ইরান, মিশর, গ্রীস, চীন, আরব, মধ্য এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরের পার্শ্ববর্তী সমস্ত দেশের সঙ্গে ভারতের অন্তরঙ্গ যোগাযোগ ছিল। যদিচ ঐসব দেশের উপর ভারতবর্ষ আপন প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং নিজেও তাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল, তার সংস্কৃতির ভিত্তি সুদৃঢ় ছিল বলে ভারতবর্ষ তার স্বকীয়তা হারায়নি। এই শক্তির গোপন উৎসটি কোথায়? এল কোথা থেকে? ভারতের ইতিহাস আমি পড়েছি—তার বিরাট প্রাচীন সাহিত্যের কিছুটা কিছুটা পড়তে পেরেছি। এইসব গ্রন্থের মধ্যে চিন্তার সবলতা, ভাষার প্রাঞ্জল্য এবং বিদগ্ধ মনের পরিচয় আমার মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। প্রাচীনকালে চীন, পশ্চিম-এশিয়া ও মধ্য-এশিয়া থেকে যে-সকল অকুতোভয় পরিব্রাজক ভারতে এসেছিলেন এবং ভারতে তাঁদের ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখে রেখে গেছেন তাঁদের পথ অনুসরণ করে তাঁদের সঙ্গীরূপে আমি এদেশ দেখেছি। পূর্ব-এশিয়ায় আংকোর, বোরোবুদুর এবং অন্যান্য অনেক স্থানে ভারতবর্ষ তার যে কীর্তি রেখে গেছে তা নিয়ে বহু জল্পনা করেছি। যে-হিমালয়ের সঙ্গে আমাদের দেশের পৌরাণিক ও জনশ্রুতিমূলক কাহিনী-গুলি বিশেষভাবে যোগযুক্ত, আমাদের দেশের চিন্তাধারা ও সাহিত্যের উপর যার বিরাট প্রভাব—সেই হিমালয়ের পাহাড়ে পাহাড়ে কতবার ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি। পাহাড় পর্বতের প্রতি আমার স্বাভাবিক আকর্ষণ এবং কাশ্মীরের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা আমায় বারবার টেনে নিয়ে গেছে হিমালয়ের পথে। এই হিমালয় আমায় যেন বর্তমানের সমতটভূমি থেকে অতীত গৌরবের উচ্চশিখরে তুলে নিয়ে গেছে। হিমাচল-নিঃসৃত নদনদী স্মরণ করিয়ে দিয়েছে অতীত ইতিহাসের বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহের কথা। ইণ্ডাস বা সিন্ধু নদের নাম থেকেই আমাদের দেশের নাম হয়েছে ইণ্ডিয়া এবং হিন্দুস্থান। এই সিন্ধুনদ পার হয়ে কত জাতি, কত মানবগোষ্ঠী, কত যাত্রী, কত সৈন্যদল এদেশে প্রবেশ করেছে। আমাদের দেশের মূল ধারার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হলেও পুরাণগ্রন্থে ব্রহ্মপুত্রের বিশিষ্ট স্থান আছে। উত্তর-পূর্ব পর্বতমালা ভেদ করে এই নদী, পর্বত ও বনসমাকীর্ণ সমতলভূমির মধ্য দিয়ে মনোহর বক্রপথে প্রবাহিত হয়েছে। যমুনা নামের সঙ্গে মিশে রয়েছে কত কাহিনী, কত নৃত্য, কত কৌতুকলীলা। আর রয়েছে গঙ্গা, ভারতের সেরা নদী। ভারতের হৃদয়ের সঙ্গে গঙ্গার ধারা মিশেছে যেন এক হয়ে, ইতিহাসের প্রাক্কাল থেকেই অগণিত মানবসন্তান গঙ্গার তীরে তীরে আকৃষ্ট হয়েছে। গোমুখীনিঃসৃত গঙ্গার আসমুদ্র ধারার মধ্যে ভারত ইতিহাসের একটি যেন রূপকের সন্ধান পাই। অতীত, বর্তমান, সাম্রাজ্যের উত্থান পতন, গর্বোদ্ধত কত মহানগরী, কত দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা, মনোরাজ্যে কত চিন্তার অভিযান, জীবনের পরিপূর্ণতা ও ঐশ্বর্য, ত্যাগ ও সংযম, উন্নতি অবনতি, বৃদ্ধি ক্ষয়, জীবন মৃত্যু—এই সব কিছুর ইতিহাস যেন গঙ্গার ধারার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে প্রবাহিত।

দেখে এসেছি অতীতের স্মৃতিবাহী কত মন্দির, কত ধ্বংসাবশেষ, কত প্রস্তরমূর্তি, প্রাচীরগাত্রে আঁকা কত ছবি—অজন্তা, ইলোরা, হস্তীগুম্ফা ও অন্যান্য স্থানে। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের আগ্রা ও দিল্লীস্থিত সুন্দর সুন্দর সৌধগুলি দেখেছি।

এই সব অট্টালিকার প্রতিটি প্রস্তর যেন ভারতের অতীত সম্বন্ধে সাক্ষ্য বহন করছে।

আমাদের আপন শহর প্রয়াগে (এলাহাবাদে) ত্রিবেণীর স্নানযাত্রার সময়ে এবং হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় বার বার গিয়েছি। দেখেছি পূর্ববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সহস্র বৎসরের পুরাতন প্রথামত অগণিত লোক এসেছে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ থেকে পুণ্যতোয়া গঙ্গায় অবগাহনের জন্য। মনে পড়েছে যে ঠিক এই সকল উৎসবের বর্ণনা তেরোশো বছর আগে চীনদেশীয় পরিব্রাজকেরা লিখে রেখে গেছেন। তখনও এই সকল উৎসব অতি প্রাচীনকাল হতে চলে এসেছে বলে বোঝা যায়। কোনো অজ্ঞাত পুরাকালে এই সকল অনুষ্ঠানের শুরু তা কে জানে? মনে মনে বিস্ময় মেনেছি ধর্মবিশ্বাসের এই বিপুল শক্তি দেখে। এই শক্তি পুরুষপরম্পরায় আমাদের অগণিত দেশবাসীকে টেনে এনেছে এই সব স্বনামধন্য নদীর তীরে তীরে। অধ্যয়নের ফলে আমার মনে দেশাত্মবোধের একটি যেন পটভূমিকা রচিত হয়েছিল। অধ্যয়ন, ভ্রমণ, দর্শন ইত্যাদি থেকে ভারতের অতীত সম্বন্ধে আমি যেন খানিকটা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করলাম। বুদ্ধির সাহায্যে নিছকমাত্র জ্ঞান লাভ করেছিলাম, এখন তার সঙ্গে যুক্ত হল ভাবের সাহায্যে গুণগ্রহণের ক্ষমতা। এমনিভাবে ধীরে ধীরে ভারতের সত্য রূপটি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। মনে হল পিতৃপুরুষের এই দেশ যেন জীবন্ত লোকের দ্বারা অধ্যুষিত; তারা হাসে, কাঁদে, ভালবাসে, দুঃখ পায়। এদেরই মধ্যে আবার কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা জীবনকে বুঝেছেন ও জেনেছেন; যাঁরা তাঁদের জ্ঞানবলে এমন একটি দীপ্তি রচনা করে গেছেন যা সহস্র সহস্র বছর ধরে ভারতবর্ষের নিজস্ব সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অতীতের এসব শত শত প্রাণময় ছবিতে আমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠল। এই ভাবরূপের সঙ্গে বাস্তব রূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠত যখন কোনো ইতিহাসবিখ্যাত জায়গায় যেতাম। বারাণসীর নিকটবর্তী সারনাথের উদ্যানে স্বয়ং বুদ্ধদেবকে দেখেছি যেন তাঁর ধর্মচক্র প্রবর্তন করতে। বহুযুগের ওপার থেকে তাঁর উপদেশবাণী ভেসে আসত সুদূরাগত প্রতিধ্বনির মত। অশোকস্তম্ভে উৎকীর্ণ অনুশাসনগুলি আমায় যেন এমন এক সম্রাটের কাহিনী শোনাত যিনি যে-কোনো রাজাধিরাজের চেয়ে মহত্তর ছিলেন। ফতেপুর সিক্রিতে দেখতাম আকবর যেন তাঁর সাম্রাজ্য ভুলে ইবাদৎখানায় বসে আছেন, বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতদের সঙ্গে ধর্ম আলোচনা করছেন। নূতন কিছু জানবার জন্য অসীম তাঁর আগ্রহ, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ঘোচাতে কি গভীর তাঁর আকাঙ্ক্ষা! এমনি করে ধীরে ধীরে ভারত ইতিহাসের আবহমান দৃশ্যপট আমার চোখের সামনে যেন খুলে গেল। তার সমস্ত গৌরব ও গ্লানি, জয় ও পরাজয় এই সব কিছু নিয়ে অতীত ভারতের একটা যেন পরিচয় পেলাম। কত বহিঃশত্রুর আক্রমণ, কত বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েও এই পাঁচ হাজার বৎসর ধরে একই সংস্কৃতি চলে এসেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ একটি আশ্চর্য ও অনন্যসুলভ ঘটনা। এই সংস্কৃতির ধারা সমাজের উপরের স্তরের মধ্যে কেবল যে আবদ্ধ ছিল তা নয়, সমস্ত জনসাধারণের জীবন এই একই সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। আমাদের দেশ ছাড়া এক কেবল চীনের ইতিহাসে দেখতে পাই যে দেশের

সাংস্কৃতিক জীবন অতীত থেকে বর্তমানে একই মূলে ধারায় জের টেনে চলেছে। দেখতে পাই প্রাচীন কালের এই ছবি কেমনভাবে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেছে যেন নিরানন্দ বর্তমানে। অতীতের বনিয়াদি সভ্যতা ও গৌরব সত্ত্বেও ভারত পরিণত হয়েছে ক্রীতদাসের দেশে। আজ যখন পৃথিবীর বুকে বিশ্ববিধ্বংসী যুদ্ধের তাণ্ডব চলেছে তখন ভারত রয়েছে ব্রিটেনের অনুচর হয়ে। পাঁচ হাজার বৎসরের ইতিহাসের কথা ভাবতে গিয়ে আমি যেন নূতন পরিপ্রেক্ষায় ভারতকে দেখতে শিখেছি। এই দৃষ্টি দিয়ে দেখতে গেলে বর্তমানের বোঝা যেন হাল্কা হয়ে যায়। বিগত একশত আশি বছরের ইংরাজশাসন ভারতবর্ষের দীর্ঘ ইতিহাসের একটি ক্ষুদ্র অধ্যায় ছাড়া আর কিছুই নয়। এ অধ্যায় দুঃখের, সন্দেহ নেই; কিন্তু কালের পরিমাপে নগণ্য। ভারতবর্ষ আবার নিজেকে ফিরে পাবে। ব্রিটিশ অধ্যায়ের শেষ পৃষ্ঠা লেখা হয়ে এল বলে। কেবল ভারত নয়, সমস্ত পৃথিবীও যুদ্ধকালীন এই বীভৎস অবস্থা উত্তীর্ণ হবে এবং নিজেকে আবার গড়ে তুলবে নূতন ভিত্তির উপর।

২ : জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা

ভারতবর্ষের প্রতি আমার মনোভাব অনেক পরিমাণে বিচারসাপেক্ষ থাকায় কখনও নিছক উচ্ছ্বাসের পর্যায়ে পেঁছতে পারেনি। ভাবোচ্ছ্বাসই অনেক সময় বিচার বা সীমা অতিক্রম করে সংকীর্ণ জাতীয়তার রূপ গ্রহণ করে থাকে। আমাদের সমকালীন ভারতবর্ষে জাতীয় ভাবের উন্মেষ অবশ্যম্ভাবী; এটা স্বাভাবিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচায়ক। প্রত্যেক পরাধীন দেশেই জাতীয় স্বাধীনতা প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হতে বাধ্য। ভারতের পক্ষে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য কারণ তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও পুরাতন গৌরব এই দুটিই আছে।

আন্তর্জাতিকতা ও শ্রমিক আন্দোলনের ফলে জাতীয়তার ভাব ক্রমশ ক্ষয় পাচ্ছে অনেকের এই অভিমত। পৃথিবীর সর্বত্র বহু আধুনিক ঘটনার দ্বারা প্রমাণ হয়েছে যে এই বিশ্বাস পুরোপুরি সত্য নয়। এখনও দেখতে পাওয়া যায় যে যা-কিছু কোনো জাতিকে অগ্রসর হতে প্রেরণা দেয় তার মধ্যে জাতীয়তাবোধ অন্যতম। এই এক-জাতীয়তার চারিদিকে জমে ওঠে প্রীতির অনুভূতি, নানারূপ জাতীয় প্রথা ও সংস্কার এবং একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে সমস্ত জাতির জীবনকে এক সূত্রে গাঁথবার ইচ্ছা। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিদগ্ধ সম্প্রদায় যতই জাতীয় ভাব হতে দূরে সরে যাচ্ছে ততই দেখা যাচ্ছে যে নিম্নশ্রেণীর শ্রমিকসম্প্রদায় ক্রমশই যেন জাতীয়তার দিকে এগিয়ে চলেছে অথচ শ্রমিক আন্দোলনের গোড়াকার কথাই হল বিশ্বনৈতিকতা। শ্রমিক নেতারা বিশেষ যত্নসহকারে আন্তর্জাতিকতার উপর তাঁদের আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। যুদ্ধ এসে পড়ায় সকল দেশে সকল লোকে নির্বিচারে জাতীয়তার জালে ধরা পড়েছে। জাতীয়তাবোধের একটা যেন অভূতপূর্ব পুনরুত্থান ঘটেছে। স্বাজাত্য-বোধ যেন পুনরাবিষ্কৃত হয়েছে। এমন একটা নূতন শক্তি জেগে উঠেছে যে

পুরাতনের সমস্যাগুলি রূপান্তরিত হয়ে পৃথিবীময় নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্কারগুলি সহজে বাদ দেওয়া চলে না। সঙ্কটের দিনে সেগুলি যেন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং মানুষের মনকে অধিকার করে বসে। দেখতে পাই যে মানুষের মনে কর্মপ্রচেষ্টা ও স্বার্থত্যাগের ভাবকে উচ্চ গ্রামে তুলে দেবার জন্য অনেক সময় এই সব প্রথা ও সংস্কারের সুযোগ নেওয়া হয়। সত্য কথা বলতে কি, সংস্কারকে অনেক পরিমাণে স্বীকার করে নেওয়াই উচিত। অবশ্য নূতন অবস্থা ও নূতন চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য এগুলি প্রয়োজনমত পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত করে নেওয়া দরকার। সঙ্গে সঙ্গে দরকার নূতন নূতন সংস্কার গড়ে তোলা। জাতীয়তাবোধের মত শক্তিশালী ভাব খুব কমই আছে। এই বোধ একেবারে মনের গভীরে গিয়ে নাড়া দেয়। সুতরাং একে ভবিষ্যসূচনাহীন অতীতের জীর্ণ কুসংস্কার বলে উপেক্ষা করাটা ভুল। অন্য আদর্শও গড়ে উঠেছে। বিশেষভাবে বর্তমানকালের ঘটনাবলীর উপর এদের প্রতিষ্ঠা। ইতিহাসের ধারায় এ আদর্শগুলি এমনভাবে এসেছে যে আজ আর তাদের অস্বীকার করার জো নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আন্তর্জাতিকতার আদর্শ ও শ্রমিক সঙ্ঘের ঐক্যবদ্ধতার আদর্শের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আমরা যদি বিশ্বব্যাপী সাম্যের অবস্থা পেতে চাই, যদি জীবন থেকে দ্বন্দ্বের সংঘাত বাদ দিতে চাই তবে এই সমস্ত বিভিন্ন আদর্শকে মিলিয়ে মিশিয়ে এক করে নিতে হবে। জাতীয়তার চিরন্তন আকর্ষণ স্বীকার করতেই হবে এবং তার জন্য যে ব্যবস্থার প্রয়োজন তাও করণীয়, কিন্তু তার যথানির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সে যাতে আয়ত্তীভূত থাকে সেটুকুও দেখা দরকার। জাতীয়তার প্রভাব পৃথিবীর সর্বত্র কাজ করছে। যে-সব দেশ নূতন আদর্শ ও আন্তর্জাতিকতার প্রেরণা লাভ করেছে, সেখানেও দেখতে পাই জাতীয় ভাব গভীরভাবে উদ্দীপ্ত। সুতরাং ভারতের মনের উপর জাতীয় ভাব প্রবলভাবে কাজ করবে—এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কখনও কখনও আমাদের বলা হয় যে আমাদের স্বাজাত্যবোধ ভারতের অনুন্নত অবস্থার পরিচায়ক, এমন কি আমাদের স্বাধীনতার দাবিও নাকি ভারতীয় মনোবৃত্তির সঙ্কীর্ণতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। যারা একথা বলে তারা হয়তো মনে করে যে সত্যকার আন্তর্জাতিকতা জয়যুক্ত হবে যদি আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তথা মিলিত-জাতি-সঙ্ঘের কমনওয়েল্‌থ্‌ অফ নেশান্‌স্‌-এর ছোট অংশীদাররূপে থেকে যেতে রাজি হই। তারা একথা বোঝে না যে এই বিশেষ ধরনের তথাকথিত আন্তর্জাতিকতা ক্ষুদ্রনৈতিক ব্রিটিশ জাতীয়তার ক্ষেত্রবিস্তারের নামান্তর মাত্র। ইঙ্গ-ভারতীয় ইতিহাসের অশুভ ফল এরূপ সম্ভাবনা নির্মূল করে ফেলেছে। ইতিহাসের নজির যাই হোক না কেন এমনিতেও বড়র পীরিতি আমাদের ধাতে সইত না। একথা মানতেই হবে যে গভীর জাতীয়তাবোধ সত্ত্বেও ভারত অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিকতর আগ্রহে বিশ্বমৈত্রীর ভাবকে স্বীকার করে নিয়েছে। কর্মের ক্ষেত্রে সহযোগিতা তো করেইছে, আন্তর্জাতিকতা স্থাপনের জন্য তার স্বাধীন অবস্থা কিছু পরিমাণে ক্ষুন্ন করতেও স্বীকৃত হয়েছে।

Kedarnath Sadharan Pathagar.
Jhikira Howrah
Accession No ...... Call No ......

৩ : ভারতবর্ষের শক্তি ও দুর্বলতা

ভারতবর্ষের শক্তির উৎস কোথায়? কেমন করেই বা তার অবনতি ও ক্ষয় ঘটল তার কারণ নির্ধারণ করা সময়সাপেক্ষ, কারণ এই প্রসঙ্গটি খুবই জটিল। তবে ভারতের *শক্তিক্ষয়ের সাম্প্রতিক কারণগুলি অতি সহজেই প্রতীয়মান হয়। কারণটা আর কিছুই নয় বিজ্ঞানসম্মত কার্যপদ্ধতিতে ভারতবর্ষ পিছিয়ে পড়েছিল;* আর ইউরোপ অন্যান্য বহু বিষয়ে বহুকাল অনগ্রসর থাকলেও এইরূপ কার্যপদ্ধতির অনুশীলনে সকলের আগে আগে এগিয়ে গিয়েছিল। এই অগ্রগতির মূলে আছে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি এবং প্রাণের প্রাচুর্য। এই প্রাণময় স্ফূর্তি নানারূপ কর্মতৎপরতায় প্রকাশ পেয়েছিল। এরই ফলে তরুণ ইউরোপ একদিন নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারের জন্য অকুতোভয় হয়ে মহাসমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল। বিজ্ঞানসম্মত কার্যপ্রণালী পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিকে এমন শক্তিশালী করে যে তারা অতি সহজে প্রাচ্যদেশে তাদের ক্ষমতা বিস্তার করে সে-সব দেশকে নিজেদের আয়ত্তাধীনে আনতে পেরেছিল। এ কেবল ভারতের অবনয়নের কথা নয়, সমস্ত এশিয়াখণ্ডেই এইরূপ ঘটেছিল। কেন যে এমন ঘটল তা নির্ণয় করা কঠিন, কেননা পুরাকালে ভারতের মানসিক তৎপরতা ও বিজ্ঞানসম্মত নৈপুণ্যের অভাব ছিল না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ধীরে ধীরে ক্রম-অবনতির পথে ভারত এগিয়ে গিয়েছিল। যখন জীবনে প্রয়াসের প্রেরণা হ্রাস পায় তখন সৃজনীশক্তি লুপ্ত হয়ে যায় ও তার স্থান জুড়ে বসে অনুকরণের ব্যর্থ প্রবৃত্তি। যেখানে একদিন বিজয়গর্বে বিদ্রোহী মানুষ আপন মননশক্তির বলেই বিশ্বপ্রকৃতির নিহিত সত্যকে উদ্ঘাটিত করবার প্রয়াস পেয়েছে সেখানে উপস্থিত হয় বাক্‌সর্বস্ব টীকাকার তার টিপ্পনী ও সুদীর্ঘ ব্যাখ্যাসম্ভার নিয়ে। শিল্প ও স্থাপত্যের মহৎ পরিকল্পনার জায়গায় দেখা দেয় সূক্ষ্ম অলঙ্করণের কারুচাতুর্য; তাতে নৈপুণ্য যদিবা থাকে, বৃহৎ কল্পনার পরিচয় থাকে না। শক্তিসম্পন্ন, সারবান, সরল ভাষার স্থানে দেখা যায় অলঙ্কারবহুল জটিল শব্দপ্রয়োগ। যে-ভারত একদিন তার প্রাণের প্রাচুর্যে বহু দূরদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, আপন সংস্কৃতি বিস্তারের বিরাট সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিল, সে সমস্ত কোথায় মিলিয়ে গেল। তার জায়গায় এল এমন এক সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি যার ফলে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া পর্যন্ত অশাস্ত্রীয় বলে নিষিদ্ধ হয়ে গেল। বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভরশীল যে অনুসন্ধিৎসা প্রাচীন ভারতের বৈশিষ্ট্য ছিল কালে তাই হয়তো বিজ্ঞানের পথে অধিকতর উন্নতির সহায়ক হতে পারত। কোথায় গেল সেই বিচারবুদ্ধি! অন্ধ কুসংস্কার ও যুক্তিহীন পুরাতনপ্রীতি দখল করল তার স্থান। ভারতের জীবনধারা পুরাতনের পঙ্কাধিক্যে নদীর মত ধীরমন্থর গতিতে বহুশতাব্দীর জঞ্জাল বহন করে এগিয়ে চলল। অতীত একটা বিরাট বোঝার মত ভারতের বুকের উপর চেপে বসেছে, তার চেতনা যেন অভিভূত করে দিয়েছে। এরূপ যখন মোহগ্রস্ত ও অবসন্ন অবস্থা তখন ভারত যে অচল অনড় হয়ে অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের পিছনে পড়ে রইবে—এতে আর আশ্চর্য কি?

তবু বলব আমার এই বিচার সম্পূর্ণ বা নির্ভুল বিচার নয়। যদি সত্যই একটা দীর্ঘকালব্যাপী একান্ত অনড় অচল অবস্থা আসত, তাহলে এর ফলে পুরাতনের সঙ্গে সকল যোগ হয়তো নিঃশেষে বিচ্ছিন্ন হতে পারত, অবসান হত একটা যুগের এবং তার ধ্বংসশেষের উপর একটা নূতন কিছু গড়ে তোলাও যেত হয়তো। এরূপ বিচ্ছেদ কিন্তু ঘটেনি, যোগসূত্র স্পষ্টত অবিচ্ছিন্ন আছে। এ ছাড়া অনেকবার পুরাতনকে ফিরিয়ে আনার সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে, অতীত গৌরবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রদীপ্ত উৎসাহের লক্ষণ দেখা গেছে। নূতনকে বুঝে নেবার চেষ্টা এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনমত তার অদলবদল ঘটিয়ে প্রাচীনকালের যা ভাল তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার একটা প্রয়াস লক্ষিত হয়েছে। অনেক সময় পুরাতনের বাহ্য রূপটুকুই একটা প্রতীকের মত অপরিবর্তিত থেকে গেছে আর তারই অন্তরালে নূতন ভাবের প্রকাশ হয়েছে। বোধহয় তাদের অজানিতেই ভারতবাসী এমন একটা প্রেরণা পেয়েছে যার ফলে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগ অব্যাহত থেকে গেছে। এই প্রচেষ্টাকে আমরা প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের সমন্বয় সাধনের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা বলতে পারি। এই আকাঙ্ক্ষাই তাকে আগে-চলার পথে এগিয়ে দিয়েছে এবং পুরাতনের অনেক সংরক্ষণ করেও নূতনকে গ্রহণ করার শক্তি দিয়েছে। কখনও প্রাণময় উৎসাহে, কখনও আতঙ্কিত নিদ্রাহীনতায়, শয়নে ও জাগরণে, যুগ যুগ ধরে ভারত যেন এই একটা সমন্বয়ের স্বপ্ন দেখেছে। প্রত্যেক দেশেই এইরূপ একটা জাতিগত নিয়তির উপর লোকের বিশ্বাস থাকে। সব ক্ষেত্রে সে-বিশ্বাস অহেতুক বলে উপেক্ষা করা যায় না। আমি ভারতবাসী বলেই হয়তো ভারতের এই জাতিগত নিয়তির দ্বারা প্রভাবান্বিত। আমার এ-বিশ্বাস সত্য হোক বা না হোক, আমি এটা অনুভব করি যে যে-শক্তি শত শত প্রজন্ম ধরে একটা জাতির জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে সে-শক্তির নিশ্চয় একটা অক্ষয় উৎস আছে। এই আন্তর শক্তি যুগে যুগে ভারতকে নূতন উৎসাহ দান করেছে। সত্যই কি এরূপ কোনো শক্তির গভীর উৎস ছিল? ছিল যদি, তবে তা কি কখনও শুকিয়ে যায়নি? অন্তরের গোপন স্তর থেকে নিত্য নূতন শক্তি উৎসারিত হয়ে এই উৎস কি পূর্ণ রেখেছিল? আজ এর কি অবস্থা? এখনও কি আমরা উৎসনিঃসৃত শক্তির রসে অভিসিঞ্চিত হয়ে পুনরায় নূতন বল লাভ করতে পারি? আমরা একটি প্রাচীন জাতি, বহু প্রাচীন জাতির সহযোগে আমাদের জন্ম। আমাদের জাতিগত স্মৃতি ইতিহাসের প্রারম্ভ পর্যন্ত বিস্তৃত। আমাদের দিন কি ফুরিয়েছে? আমরা কি অস্তিত্বের অপরাহ্ণে কিংবা সন্ধ্যার শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছি? দিনগত পাপক্ষয় ছাড়া আমাদের আর কি গত্যন্তর নেই? আমাদের সভ্যতা কি জীবনীশক্তিশূন্য সৃজনক্ষমতাহীন শান্তশিষ্ট জরার পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে? অতিবৃদ্ধ জরদ্গবের মত নির্ঝঞ্ঝাট নিদ্রা ছাড়া আর কিছুই কি আমাদের কাম্য নেই?

কোনো দেশ বা জাতি চিরকাল অপরিবর্তিতভাবে থাকতে পারে না। সর্বদাই অন্য দেশ বা জাতির সংস্পর্শে আসার ফলে একটু আধটু অদলবদল হতেই থাকে। কতবার দেখা গেছে মৃতকল্প জাতি আবার নূতন হয়ে জন্মপরিগ্রহ করেছে অথবা দেখা

দিয়েছে পুরাতনেরই একটা ভিন্ন রূপ নিয়ে। একই জাতের প্রাচীন ও নবীন রূপের মধ্যে একটা বিশেষ তারতম্য থাকা বিচিত্র নয়। আবার দেখা যায় যে চিন্তা ও আদর্শের সূত্রে নূতন ও পুরাতন যোগযুক্ত থাকে, দেশ বা জাতির ইতিহাসের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে।

অনেক প্রাচীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত সভ্যতা ধীরে ধীরে কালের কবলে বিলীন হয়ে গেছে, অকস্মাৎ অন্তিম দশাপ্রাপ্ত হয়ে। তাদেরই স্থান নবীন বলে নূতন সংস্কৃতি অধিকার করে নিয়েছে এমন অনেক ঘটনা ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে মনে হয় যে একটা বিশেষ সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে প্রয়োজন হয় প্রাণবান শক্তির ও অন্তর্নিহিত তেজের। এ না থাকলে কিছুতেই কিছু হয় না। বৃদ্ধের পক্ষে যুবজনোচিত শক্তি প্রকাশ করতে যাওয়ার মত তখন সব চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আধুনিক কালের পৃথিবীতে যে তিনটি দেশের মধ্যে আমি এই প্রাণবান শক্তির প্রকাশ দেখেছি তারা হল আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনদেশ। এ এক অতি অদ্ভুত সংমিশ্রণ বলতে হবে। যদিচ পৃথিবীর পুরাতন গোলার্ধের মাটিতেই মার্কিন সংস্কৃতির শিকড়, তবু বাস্তবিকপক্ষে দেখা যায় তারা একটা নূতন জাতিতেই পরিণত হয়ে গেছে। পুরাতন জাতির বাধ্যবাধকতা ও সংস্কারগত জটিলতা এই নূতন জাতির জীবনে দেখা যায় না। সুতরাং তাদের জীবনীশক্তির উদ্দাম প্রাচুর্যের কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যান্ডবাসীদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা চলে। এরা সকলেই অনেক পরিমাণে পুরাতন জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ নূতন জীবনের সম্মুখীন হয়েছে।

রাশিয়াবাসীরা নূতন জাতি নয় কিন্তু পুরাতনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক তারা একেবারে চুকিয়ে দিয়েছে। প্রাগ্-বিদ্রোহ রাশিয়ার সঙ্গে আজকের রাশিয়ার জীবনমৃত্যু ব্যবধান। মৃত্যুসাগর পার হয়ে রাশিয়া যেন নূতন জন্ম পরিগ্রহ করেছে। মানুষের ইতিহাসে এমন আর একটি ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায় না। রাশিয়া নূতন জীবন, নূতন যৌবন লাভ করেছে; তার মধ্যে দেখা দিয়েছে একটা বিস্ময়কর শক্তি। যদিচ এখানে ওখানে তারা পুরাতনের যোগসূত্র কিছু কিছু সন্ধান করছে, কার্যত কিন্তু তারা একটা নূতন জাতিতেই পরিণত হয়ে গেছে, তারা গড়ে তুলেছে এক নূতন সভ্যতা।

যদি কোনো জাতি যথোপযুক্ত স্বার্থত্যাগ ও ক্লেশ স্বীকার করতে রাজি হয় অর্থাৎ উচিত মূল্য যদি দিতে পারে, এবং জনসাধারণের মধ্যে যে শক্তি ও তেজ লুকিয়ে থাকে তার উৎসমুখ যদি খুলে দিতে সমর্থ হয়, তাহলে কেমন করে সে-জাতি পুনরায় জীবনীশক্তিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং যৌবনের বল ফিরে পায়--রাশিয়ার দৃষ্টান্তে এইটিই আমরা দেখি। আজ যে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে একটা সর্বনাশা ও বীভৎস ধ্বংসলীলা চলছে তার ফলেও কোনো কোনো জাতি হয়তো আবার যৌবনের বলে বলীয়ান হয়ে উঠবে; যদি অবশ্য তারা প্রলয়ান্তকাল অবধি টিকে থাকতে পারে। চীনদেশের কথা স্বতন্ত্র। তারা নূতন জাতি নয়। পরিবর্তনের ধাক্কায় চীনের জাতীয় জীবন উপর থেকে নিচে অবধি বিধ্বস্ত হয়নি। রাশিয়ার মত অগ্নি-

পরীক্ষায় চীনদেশকে উত্তীর্ণ হতে হয়নি। সাত বছর একাদিক্রমে তাদের যে ভীষণ যুদ্ধ চালাতে হচ্ছে তাতে তারা বদলে যেতে বাধ্য। জানি না এই পরিবর্তন কতটা হয়েছে যুদ্ধের মত আকস্মিক কারণে এবং কতটা অন্যান্য স্থায়ী কারণের ফলে। কারণ যাই হোক না কেন, চীনবাসীদের প্রাণশক্তির পরিচয় পেয়ে আমি বিস্মিত হয়েছি। যে জাতির চিত্তশক্তি এরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তার যে কখনও পতন ঘটবে, এ আমি কল্পনাই করতে পারি না।

চীনদেশে এই যে শক্তির পরিচয় পেয়ে এসেছি সেই একই শক্তি কখনও কখনও ভারতবাসীদের মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে; তবে সকল সময়ে নয়। পেয়ে থাকলেও সে-বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে আমার মত ভারতবাসী স্পষ্টত বলতে পারে না। হয়তো আমার মনের বাসনা অনেক সময় কল্পিত সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে। আমার স্বদেশবাসীদের মধ্যে এই শক্তির পরিচয় পাবার জন্য উৎসুক হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। এ যদি তাদের থাকে তবে দেশের মঙ্গল হবেই, আমাদের চেষ্টা সার্থক হবেই। আর যদি শক্তির অভাব থাকে তাহলে আমাদের সমস্ত রাজনীতিক প্রচেষ্টা ও শ্লোগান নিয়ে চীৎকার আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর হবে; এর দ্বারা আমরা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারব না। একটা যেমন তেমন রাষ্ট্রীয় বোঝাপড়া হবে, এবং আমরা গতানুগতিক-ভাবে জীবন চালিয়ে যাব, হয়তো এদিকে ওদিকে কিছু সুবিধা পাব এরূপ অবস্থা আমার কাম্য ছিল না। আমি অনুভব করেছি আমার দেশবাসীর মধ্যে বিপুল শক্তি ও কর্মক্ষমতা বাইরের চাপে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। এই শক্তির উৎস খুলে দিয়ে আমার দেশবাসীকে পুনরায় নবীন ও প্রাণময় করে তুলব এই ছিল আমার ইচ্ছা। ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক দিক থেকে ভারতবর্ষ এমনভাবে গঠিত যে জাগতিক ব্যাপারে আমরা অপ্রধান ভূমিকা নিয়ে চলতে পারি না। হয় সে বহু যোগ্যতার জন্য মুখ্যভাবেই গণনীয় হবে নতুবা গণনায় আসবেই না। একটা মাঝামাঝি অবস্থা আমায় আকৃষ্ট করতে পারেনি। ভারতের পক্ষে এরূপ মধ্যবর্তী স্থান গ্রহণ করা আমার কাছে অসম্ভব মনে হয়েছে।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা চলেছে। এই দীর্ঘকাল ধরে আমরা ইংরেজ প্রভুদের সঙ্গে অনেক বিসংবাদ চালিয়েছি। আমি ও দেশের আরও অনেকে এই আন্দোলনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। আমাদের সকল চেষ্টার অন্তরালে রয়েছে দেশকে পুনর্জীবিত করে তোলার আকাঙ্ক্ষা। আমাদের মনে হয়েছে যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কৃচ্ছ্রসাধন ও ত্যাগস্বীকার করলে, অবিচলিতভাবে শঙ্কা ও বিপদের সম্মুখীন হতে পারলে, অন্যায় ও অবিচারকে মেনে না নিলে, আমরা ভারতের অন্তর্নিহিত তেজকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে পারব। দীর্ঘকাল-ব্যাপী তার সুপ্তির অবসান ঘটিয়ে দেশকে আবার জাগিয়ে তুলতে পারব। অনবরত ভারতস্থিত ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চালাতে হয়েছে সত্য, কিন্তু আমাদের দৃষ্টি সকল সময় নিবদ্ধ ছিল স্বদেশবাসীর দিকে। রাজনৈতিক সুবিধা যা আমরা পেয়েছি তার ততটুকুমাত্র মূল্য দিয়েছি যে-পরিমাণে সে-সুবিধা আমাদের

মূল উদ্দেশ্যের সহায়ক হয়েছে। আমাদের সকল চেষ্টা নিয়ন্ত্রিত করেছে এই একটি পরম সংকল্প। এই কারণে কূটনীতিবিশারদদের মত আমরা নিছক রাজনীতির সংকীর্ণ ক্ষেত্রে নিজেদের আবদ্ধ রাখিনি। আমরা যে কোনোপ্রকার আপোষ নিষ্পত্তি স্বীকার করিনি, ন্যায্য প্রাপ্য থেকে এতটুকুও নড়চড় হতে দিইনি, এতে অনেক স্বদেশী ও বিদেশী সমালোচক আমাদের মূঢ়তা ও 'গোঁয়ার্তুমি'র প্রতি বক্রদৃষ্টিক্ষেপ করেছেন। আমরা সত্যসত্যই মূঢ়ের মত কাজ করেছি কিনা, আগামী কালের ঐতিহাসিক সে-কথা বিচার করবেন। আমাদের লক্ষ্য ছিল উঁচু ও দৃষ্টি ছিল বহুদূর-প্রসারিত। সুবিধাবাদী রাজনীতির তরফ থেকে বিবেচনা করলে হয়তো মনে হবে যে আমরা সুবুদ্ধির পরিচয় দিইনি। তবে একটা কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে তা হল এই—আমরা স্বপ্নেও ভুলিনি যে ভারতবাসীর জীবনকে সমগ্রভাবে উন্নত করাই আমাদের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য। এ উন্নতি হবে চিত্তের দিক থেকে, আত্মার দিক থেকে: রাজনীতি ও অর্থনীতির দিক থেকে তো বটেই। দেশবাসীর আত্মিক শক্তিকে ভিতর থেকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম আমরা; কারণ আমরা জানতাম যে এই বুনিয়াদ গড়লে আর সব উন্নতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে আসবে। পরানুগত্য স্বীকার করার লজ্জা, দাম্ভিক বিদেশী শক্তির কাছে ভীরুতার সঙ্গে আত্মবিক্রয়—এই যে একটি অবস্থা কয়েক প্রজন্ম ধরে ভারতের ইতিহাস কলঙ্কিত করেছে, সেই কলঙ্ক আমাদের মুছে ফেলতে হয়েছে।

৪ : ভারতবর্ষের খোঁজ

ইতিহাস গ্রন্থাদি পড়ে, প্রাচীন ভারতের শিল্পকুশলতার নিদর্শনাদি দেখে এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতের কীর্তিকলাপের কথা জেনে, আমি দেশকে যতটুকু বুঝতে পেরেছি তাতে আমার মনের তৃপ্তি হয়নি। আমি যে-প্রশ্নের উত্তরটি খুঁজছিলাম এ থেকে আমি তার উত্তর পাইনি। আর তা পাবার কথাও নয়, কারণ আমি তো কেবল অতীতকে খুঁজিনি, আমি জানতে চেয়েছি যে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সত্যকার একটা কোনো যোগসূত্র আছে কিনা? আমার কাছে এবং আমার সমধর্মী আরও অনেকের কাছেই বর্তমান যুগটাকে বিসদৃশ বিষয়ের একটা সংমিশ্রণ বলে বোধ হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে মধ্যযুগের নানাবিধ কুসংস্কার, নিদারুণ দুঃখ ও দারিদ্র্য এবং তারই উপরে মধ্যবিত্তশ্রেণীর আধুনিকত্বের নিতান্ত বাহ্যিক প্রলেপ। আমি যে-শ্রেণীতে জন্মেছি তার প্রতি আমার কোনো শ্রদ্ধা বা অনুরাগ ছিল না কিন্তু বরাবর বিশ্বাস করে এসেছি যে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীতেই মুক্তিসংগ্রামের অগ্রদূত ভারতের ভবিষ্যৎ ত্রাণকর্তা জন্ম নেবেন। নানাদিক থেকে বাধাক্রান্ত এই শ্রেণী তার চারিদিককার পিঞ্জর ভেঙে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে, নিজেকে বড় করে গড়ে তুলতে চেয়েছে। ইংরেজ শাসনতন্ত্রের সংকীর্ণ কাঠামোর মধ্যে এই উদ্দেশ্য সাধিত করতে না পারায় মধ্যবিত্তশ্রেণীর মনে জমে উঠেছে একটা বিদ্রোহ ও বিরুদ্ধতার ভাব। কিন্তু যে বিধি-১

ব্যবস্থা আমাদের পোষণ করেছে তার বিরূদ্ধে এই বিদ্রোহের ভাবটি প্রযুক্ত হয়নি। মধ্যবিত্তশ্রেণী ব্যবস্থাটিকে রক্ষা করে, ইংরেজদের সরিয়ে দিয়ে নিজেরাই নিয়ন্ত্রণের ভার নিতে চেয়েছে। এই শাসনব্যবস্থারই সৃষ্টি হল মধ্যবিত্তশ্রেণী সুতরাং তারা এই ব্যবস্থার বিরূদ্ধাচরণ করে, একে সম্পূর্ণ নির্মূল করবে এটা আশা করা যেত না। নূতন একটা গতিবেগ এসে আমাদের নিয়ে গেল গ্রামবাসী জনসাধারণের মধ্যে। এই প্রথম দেশের তরূণ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্মুখে ভারত একটা নূতন রূপ নিয়ে দেখা দিল। এ-ভারতের কথা তাদের মনে ছিল না, একে তারা যথোচিত গুরূত্বও দেয়নি। এই গ্রাম্য-জীবনের দৃশ্যে মন বিক্ষুব্ধ হল। দারূণ দুর্গতি ও ততোধিক নিদারূণ সমস্যা তাদের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হল। নূতন অভিজ্ঞতার ফলে আমাদের পূর্বের সিদ্ধান্তগুলি সমস্ত যেন ওলটপালট হয়ে গেল। এইভাবে ভারতের প্রকৃত স্বরূপটি আমরা আবিষ্কার করতে শুরূ করলাম। সত্যকার ভারতকে জানতে শেখার সঙ্গে সঙ্গে মনে নানারূপ দ্বন্দ্বের উদয় হল। সকলের মনে একই রকমের প্রতিক্রিয়া হল না। পারিপার্শ্বিক ও অভিজ্ঞতাভেদে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে সমস্যাটি ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দিল। এর মধ্যে কেউ কেউ পল্লীর জনসাধারণের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন যে তাঁদের মনে নূতন কোনো প্রশ্ন জাগল না। তাঁরা যেন পল্লীজীবনকে স্বীকার করেই নিয়েছিলেন কিন্তু আমার মনে হল আমি একটা নূতন দেশ আবিষ্কারের জন্য যেন যাত্রা শুরূ করেছি। অনেক ত্রুটি ও দুর্বলতা সত্ত্বেও ভারতের পল্লীবাসীদের মধ্যে আমি এমন কিছু দেখেছি যা আমার চিত্তকে নিবিড়-ভাবে আকর্ষণ করেছে। এটা যে কি তা প্রকাশ করে বলা কঠিন। এটুকু কেবল বলতে পারি যে এই জিনিসটি আমি মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে দেখতে পাইনি। জনসাধারণ-সম্বন্ধীয় ধারণাকে আমি অবাস্তবরূপে বিচার করি না। জনসাধারণ আমার কাছে যাতে নিছক ভাববিলাসের বস্তু না হয়ে ওঠে তার জন্য আমি সবিশেষ সাবধান। বহুবিচিত্র এই ভারতের জনগণ আমার কাছে খুব বড় একটি সত্য। অগণিত এদের সংখ্যা তবু তাদের অনির্দিষ্ট মণ্ডলীমাত্র মনে না করে স্বতন্ত্র ব্যক্তিবিশেষরূপে দেশবাসীকে আমি দেখতে চেষ্টা করেছি। তাদের কাছ থেকে বেশি কিছু প্রত্যাশা করিনি বলেই হয়তো আমি আশাহত হইনি, বরঞ্চ আশাতিরিক্ত অনেক কিছু পেয়েছি। এদের মধ্যে একটি যে প্রতিষ্ঠা ও অন্তর্নিহিত শক্তির আভাস দেখতে পাওয়া যায় তার কারণ বোধ হয় এই যে এই দেহাত দেশের লোকেরা আজ অবধি ঈষৎপরিমাণে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির ধারাটিকে নিজেদের মধ্যে রক্ষা করেছে। গত দুই শতাব্দীব্যাপী প্রচণ্ড আঘাতের ফলে অনেক কিছু লয় পেয়েছে বটে, তবু অনেক আবর্জনা ও অকল্যাণের মধ্যেও কিছুটা ভাল অবশিষ্ট থেকে গেছে।

এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের অধিকাংশ সময় আমার কাজ আমার নিজের প্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই সময়ে আমি আগ্রা ও অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশের আটচল্লিশটি জেলার বহু শহর ও পল্লীগ্রামের ভিতর দিয়ে বিস্তৃতভাবে ও বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে ভ্রমণ করেছি। এই প্রদেশকে এতদিন হিন্দুস্থানের মর্মস্থল বলা

হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল এখানেই; বহু জাতি ও বহু সংস্কৃতির সংহতি ঘটেছে এই প্রদেশে। এখানেই ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহ প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল এবং সর্বপ্রথম নির্দয়ভাবে সেই বিদ্রোহকে প্রশমিত করা হয়েছিল এই প্রদেশেই। উত্তর ও পশ্চিম খণ্ডের অধিবাসী শক্ত সমর্থ জাটদের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। এরা যেন একেবারে দেশের মাটির আপন সন্তান। চেহারায় এদের বীর্যবত্তা ও আত্মকর্তৃত্বের ভাব যেন পরিস্ফুট। জাটদের সাংসারিক অবস্থাও অপেক্ষাকৃত ভাল। রাজপুত চাষী ও ছোটোখাটো ভূস্বামীদের সঙ্গেও দেখা হল। এদের কেউ কেউ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু সকলেই এখনও জাতগোষ্ঠী ও বংশমর্যাদার গর্ব রাখে। অনেক কৌশলী ও নিপুণ কারিগর এবং কুটীর-শিল্পীর সাক্ষাৎ পেলাম—এদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই লোক আছে। অযোধ্যায় ও পূর্ব ভাগের জেলাগুলিতে বহুসংখ্যক দরিদ্র চাষী ও প্রজাসাধারণের দেখা পেলাম—তারা পুরুষানুক্রমে অভাব ও নির্যাতনে এমন নিষ্পেষিত হয়েছে যে এখন বুক বেঁধে আশাই করতে পারে না যে দেশের অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে, আবার সুদিন ফিরে আসবে। তবু যেন এরা নিরাশ হয় না, বুকের মধ্যে বিশ্বাসটুকু জিইয়ে রাখতে চায়।

এর পর তৃতীয় দশকে কারাজীবনের বাইরে যেটুকু সময় পেয়েছি তারই ফাঁকে ফাঁকে এবং বিশেষভাবে ১৯৩৬-৩৭-এর নির্বাচন অভিযানের সময় সমগ্র ভারতময় আরও বিস্তৃতভাবে ঘুরে বেড়িয়েছি এবং সমানে শহর, নগর ও পল্লীগ্রাম দেখেছি। দুঃখের বিষয় বাঙলাদেশের পল্লী অঞ্চলে সামান্যই গিয়েছি। দেহাত বাঙলা বাদ দিলে আমি অন্যান্য সকল প্রদেশেই ভ্রমণ করেছি এবং পল্লীর অন্তঃস্থলে প্রবেশ করেছি। এই সময়টা আমার কেটেছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে। শুধু আমার বক্তৃতার বিষয় নিয়ে বিচার করলে মনে হবে যে তখন আমার মন নিছক রাজনীতি ও সভ্য নির্বাচন ব্যাপারেই নিমগ্ন ছিল। কিন্তু এই সময়টিতে আমার মনের গভীরে এমন একটি ভাব বাসা বেঁধেছিল যার সঙ্গে নির্বাচনদ্বন্দ্ব কিংবা প্রাত্যহিক উত্তেজনার কোনো সম্পর্কই ছিল না। একটি নূতন উদ্দীপনা আমায় যেন পেয়ে বসল। মনে হল আমি যেন আবার চলেছি আবিষ্কারের যাত্রায়। মহাদেশ ভারতবর্ষ ও তার বিচিত্র অধিবাসীরা যেন ছড়িয়ে আছে আমার দৃষ্টির সম্মুখে। অফুরন্ত এদেশের সৌন্দর্য—বিচিত্র এর রূপ। আমার চিত্ত উঠল অভিভূত হয়ে—যত দেখলাম ততই যেন বুঝতে পারলাম যে এ দেখার শেষ নেই। ভারতের অন্তরে যে-সকল ভাব নিহিত আছে, আমার কি আর কারো পক্ষে তা বোধায়ত্ত করা অসম্ভব। বিস্তৃতি নয়, বৈচিত্র্য নয়—যা আমার কাছে অনধিগম্য থেকে গেল তা হল এই দেশের আত্মা। আমি এই আত্মার গভীরতায় থৈ পেলাম না। মাঝে মাঝে এই অন্তররূপের আভাস পেয়েছি, প্রলুব্ধ হয়েছি, কিন্তু সবটুকু বুঝে উঠতে পারিনি। ভারতবর্ষ যেন একটা সুপ্রাচীন পাণ্ডুলিপি—এর পাতায় পাতায় একটা লেখার উপর যেন আর একটা লেখা, একটি সাধনার উপর অন্য একটি সাধনা যেন উৎকীর্ণ হয়ে আছে। বহু চিন্তা বহু কল্পনা স্তরে স্তরে অঙ্কিত হয়ে আছে এই পাণ্ডুলিপির পাতায়। পরের লেখা পূর্বের

লেখাটিকে সম্পূর্ণ আবৃত করেনি, অবলুপ্ত করেনি। এই বিভিন্ন যুগের বিচিত্র সাধনার অস্তিত্ব আমাদের কাছে পরিজ্ঞাত না হলেও, আমাদের সচেতন ও অবচেতন সত্তার মধ্যে এরা বর্তমান আছে। এই নানা বিচিত্র ভাবের সংমিশ্রণেই ভারতবর্ষের রহস্যময় জটিল স্বরূপটি গড়ে উঠেছে। দেশের সর্বত্র যেন দেশাত্মার এই রূপটুকু দেখা যায়। মুখে যেন তার আমাদের বোধের অগম্য প্রহেলিকাময় হাসি ফুটে রয়েছে; মনে হয় সে-হাসি বিদ্রূপের হাসি।

যদিচ বাহ্যত আমাদের দেশবাসীর মধ্যে বহু বৈচিত্র্য অসংখ্য ভিন্নতা—তবু সর্বত্র সেই প্রবল একত্বের লক্ষণ পরিস্ফুট। এই ঐক্যই রাজনৈতিক দুর্গতির মধ্যেও আমাদের যুগ যুগ ধরে একত্র মিলিত রেখেছে। ভারতবর্ষের এই অবিভক্তরূপ আমার কাছে এবার আর যুক্তিযুক্ত ধারণামাত্র রইল না, একটা আবেগময় অভিজ্ঞতায় দাঁড়াল—আনন্দে আমি যেন আপনাকে হারিয়ে ফেললাম। এই অপরিহরণীয় একত্বের এমনই শক্তি যে রাজনৈতিক বিভাজন কিংবা অন্যবিধ যে-কোনো দুর্বিপাক ও দুর্ঘটনা এই ঐক্যভাবকে কোনো দিন অতিক্রম করতে পারেনি।

ভারতবর্ষ হোক অন্য কোনো দেশই হোক—তাতে মানবত্ব আরোপ করা অসঙ্গত। আমি এরূপ করিনি। ভারতে বহু ভিন্নতা ও বিভাগ, তার অনেক শ্রেণী, জাতি, ধর্ম, গোষ্ঠী—বিভিন্ন তাদের সাংস্কৃতিক স্তর—এই সব বিষয়ে আমার মন সম্পূর্ণ সজাগ ছিল। এই সব বিভেদ বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও দীর্ঘকালের সংস্কৃতি থেকে দেশজীবনের একটা সাধারণ পটভূমিকা, দেশের জনসাধারণের মধ্যে একটা সাধারণ লক্ষ্য গড়ে ওঠে। তখন তার নিজস্ব একটি অনুপ্রাণনা জাগে যার ছাপ গিয়ে পড়ে দেশের সকল সন্তানের উপর—নানা ভিন্নতা সত্ত্বেও। চীনদেশেও এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তা আমরা পুরাতনপন্থী মান্ডারিনকেই দেখি, কিংবা দেশের অতীতের সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে এমন একজন কমিউনিস্টকেই দেখি। ভারতের এই অনুপ্রাণনার উৎসটি কোথায়, আমি তারই সন্ধানে ছিলাম। এটা অহেতুক কৌতূহলবশত শুধু নয়, যদিচ কৌতূহল আমার যথেষ্টই ছিল। আমার এই সন্ধানের পিছনে ছিল দেশকে ও দেশবাসীকে জেনে নেবার ইচ্ছা, তাদের চিন্তা ও কর্মকে বুঝে নেবার আগ্রহ। রাজনীতি ও সভ্য নির্বাচনের ব্যাপারে আমরা উত্তেজনার সৃষ্টি করি—কিন্তু সে তো দিনগত পাপক্ষয়। আমরা যদি অনাগত ভারতের সৌধটিকে সুদৃঢ়, স্থায়ী ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে চাই, তবে সেই ভারতের ভিত্তি আমাদের গভীর করেই খুঁড়তে হবে।

৫ : ভারতমাতা

প্রায়ই যখন এক সভা থেকে আর এক সভায় ঘুরে বেড়িয়েছি তখন আমাদের এই দেশের কথা, হিন্দুস্থানের কথা, পুরাণে কীর্তিত আমাদের জাতির পিতা ভরতের নামানুসারে পরিচিত এই ভারতের কথা—আমার শ্রোতৃবর্গকে শুনিয়েছি। কিন্তু শহরে নগরে আমি এরকম বড় একটা করিনি, তার কারণ সেখানকার শ্রোতাদের মন

তো সহজ সরল নয়, তারা কেবল জোরের কথাই শুনতে চায়। কৃষাণের লক্ষ্য বেশি দূরে যায় না, তাকে আমি বেশ খোলাখুলি ভাবে বলেছি আমাদের এই বিশাল দেশের কথা—যার স্বাধীনতার জন্য আমরা আন্দোলন করে চলেছি; বলেছি যদিচ দেশের এক ভাগের সঙ্গে অন্য ভাগের প্রভেদ আছে, তবু সবটা মিলেই আমাদের ভারতবর্ষ; বলেছি কৃষকদের অনেক সমস্যা দেশের উত্তর থেকে দক্ষিণে এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে একই ধরনের; আর বলেছি স্বরাজ্য যখন আসবে তখন তা হবে দেশের সর্বসাধারণের জন্য—বিশেষ শ্রেণীর জন্য নয়; সকল প্রদেশের জন্য—স্থানবিশেষের জন্য নয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের খাইবার-গিরিসংকট থেকে আরম্ভ করে সুদূরে দক্ষিণের কন্যাকুমারিকা অবধি প্রসারিত আমার ভ্রমণ বৃত্তান্তের কথা তাদের শুনিয়েছি। বলেছি সকল স্থানেই কৃষকেরা আমায় একই প্রকারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে কারণ তাদের সবারই দুঃখ যে একই প্রকৃতির। দারিদ্র্য, ঋণ, অর্থবান ব্যবসায়ী, জমিদার, মহাজন, উচ্চ হারের কর ও খাজানা, পুলিশের অত্যাচার—ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রে আশ্রিত এই সমস্যাগুলি যে সারা ভারতের সমস্যা। এই সমস্ত থেকে দেশের সবাইকে নিষ্কৃতি দিতে হবে। ভারতকে অখণ্ডরূপে গ্রহণ করবার শিক্ষা তাদের দিতে চেষ্টা করেছি—আমাদের এই দেশ যে সারা পৃথিবীর অংশবিশেষ সেই ধারণা তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছি। চীন, স্পেন, আবিসিনিয়া, মধ্য ইউরোপ, মিশর ও মধ্য-এশিয়ায় যেসব আন্দোলন চলছে—তার কথা উপস্থিত করেছি। তাদের বলেছি বিজ্ঞানের সাহায্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও আমেরিকায় কি আশ্চর্য পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। এ-কাজ সহজসাধ্য ছিল না, তবু এটা যত কঠিন হবে বলে আশঙ্কা করেছিলাম কার্যত ততটা হয়নি। আমাদের দেশের মহাকাব্য ও নানাবিধ পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে পরিচয় থাকায়, এরা সহজেই স্বদেশ সম্বন্ধে মনে মনে একটা ধারণা করতে পারে—তাছাড়া প্রায় সর্বত্র এমন লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছি—যারা ভারতের চতুর্দিকে অবস্থিত সুদূর তীর্থগুলি পরিক্রমা করে দেশের বিষয়ে চাক্ষুষ জ্ঞান লাভ করেছে। কখনও দেখা পেয়েছি বৃদ্ধ সৈনিকদের—যারা প্রথম মহাসমরে অথবা অপর কোনো অভিযানে যুদ্ধ করতে গিয়ে দরিয়া পারের বিদেশ দেখে এসেছে। এমন কি, বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে পৃথিবীময় যে অর্থসংকট দেখা দিয়েছিল তার কুফলের প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে বিদেশ সম্পর্কে আমার বক্তব্য বুঝিয়ে দেওয়া সহজ হয়েছে। কখনও কখনও কোনো সভায় উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে স্বাগতধ্বনি শুনেছি "ভারতমাতা কি জয়!" আমি আমার শ্রোতৃবর্গকে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রশ্ন করেছি এই চীৎকার দ্বারা তারা কি বলতে চায়, কে এই ভারতমাতা যার জয়ধ্বনি তারা করছে? আমার প্রশ্নে তারা আমোদ পেয়েছে, বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়েছে, আর তারপর কি জবাব দেওয়া যায় তা জানা না থাকায় পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে আমার দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকিয়েছে। আমি আমার প্রশ্নটি পুনঃ পুনঃ তুলেছি। অবশেষে এক বলিষ্ঠদেহ জাট—পুরুষানুক্রমে জমির সঙ্গে যার জীবন জড়িত—জবাব দিয়েছে যে ভারত হল মা 'ধরিত্রী, কল্যাণময়ী জীবধাত্রী বসুন্ধরা'। ধরিত্রী—মাটি? কোন জমি এই ভারতমাতা? এ কি তাদের স্বগ্রামের

ভূমিখণ্ড, না তাদের জেলা কিংবা প্রদেশের সবটুকু জমি। এ ধরিত্রী কি সমগ্র ভারতভূমি? এইভাবে প্রশ্ন ও উত্তর চলেছে এবং পরিশেষে তারা ব্যাকুলভাবে বলেছে ভারতমাতা বিষয়ে সবকথা বলবার জন্য। আমি তখন বুঝিয়ে বলতে চেয়েছি যে তারা যাকে ভারতমাতা মনে করেছে—ভারতমাতা তাই—অথচ তার চেয়েও বড়। ভারতের পাহাড়, পর্বত, নদ, নদী, অরণ্য, প্রান্তর—এরা সবাই আমাদের অনুবিধান করছে—তাই এরা আমাদের প্রিয়। কিন্তু এদের চাইতেও প্রিয় হল ভারতের ভারতবাসী মানুষ—যারা তাদেরই মত, আমার মত, যারা এই বিরাট দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এই কোটি কোটি ভারতসন্তানই আসলে হল ভারতমাতা—'ভারতমাতা কি জয়'এর অর্থ এইসব কোটি কোটি মানুষের জয়। তাদের বলেছি যে তোমরা হলে ভারতমাতার অংশবিশেষ, কেবল অংশ কেন তোমাদের সবাইকে মিলে ভারতমাতা। এই ধারণা ধীরে ধীরে তাদের মনের গভীরে প্রবেশ করে, তাদের চোখ যেন একটা নূতন আবিষ্কারের আনন্দে জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে।

৬ : ভারতের বৈচিত্র্য ও একত্ব

ভারতের বৈচিত্র্যের তুলনা হয় না, স্বয়ম্প্রকাশ তার এই বিচিত্র রূপ—কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে এ দেখাতে হয় না। বাইরের আকৃতিতে তো বটেই, প্রকৃতির দিক থেকেও স্বভাবে চরিত্রে এই বিচিত্র ভারতের পরিচয় আছে। বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাঠান ও দূর দাক্ষিণাত্যের তামিলের মধ্যে খুব কমই মিল। তারা এক জাতের লোক নয়, মুখের চেহারা ও শরীরের গঠনে, আহারে বিহারে, পোশাকে পরিচ্ছদে এবং বিশেষত ভাষার দিক থেকে, দুয়ের মধ্যে অনেকখানি ব্যবধান। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মধ্য-এশিয়ার স্পর্শ স্পষ্টত অনুভব করা যায়, ওদেশের এবং কাশ্মীরের আদবকায়দা দেখলে মনে হয় যেন হিমালয়ের ওদিককার দেশের সঙ্গে এদের মিল বেশি। পাঠানদের লোকনৃত্য আর রাশিয়ায় কাজাকদের নাচ—প্রায় একই ধরনের। তবু প্রভেদ যতই থাকুক না কেন, যেমন তামিলের উপর তেমনি পাঠানের উপরেও ভারতবর্ষের ছাপটুকু খুব সহজেই দেখতে পাই। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই সীমান্ত প্রদেশগুলি এমন কি আফগানিস্থানও হাজার হাজার বৎসর ধরে ভারতবর্ষের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিল। ইসলামধর্ম আসার আগে আফগানিস্থান ও মধ্য-এশিয়া নিবাসী তুর্কি ও অন্যান্য জাতিদের অধিকাংশ লোকই ছিল বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী; তারও পূর্বে রামায়ণ মহাভারত রচনার যুগে তারা ছিল হিন্দু। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলির মধ্যে সীমান্ত প্রদেশ ছিল অন্যতম। এখনও এই প্রদেশে প্রাচীনকালের বহু অট্টালিকা ও বৌদ্ধ মঠের ধ্বংসাবশেষ ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে দেখতে পাওয়া যায়—সুবিখ্যাত তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসশেষ সেদিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় দু হাজার বৎসর পূর্বে এই বিশ্ববিদ্যালয় গৌরবের মধ্যগগনে জ্যোতির্ময় হয়ে বিরাজিত ছিল—সারা ভারত থেকে, সমগ্র

এশিয়া থেকে তখন এই তক্ষশিলায় ছাত্রসমাবেশ ঘটত। ধর্মান্তরের দরুন পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে সত্য, কিন্তু বহু শতাব্দীব্যাপী যে মানস পটভূমি গড়ে উঠেছে তাকে এখনও সীমান্ত দেশবাসীরা বদলে দিতে পারেনি।

পাঠান ও তামিল এরা উভয়েই অন্তেবাসী, সুতরাং দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বিরাট। অন্যান্য জাতিরা এদের মাঝামাঝি কোথাও না কোথাও স্থান পেয়েছে। প্রত্যেকেরই আপন বৈশিষ্ট্য আছে—একথা সত্য, কিন্তু ততোধিক সত্য হল এই যে এরা সকলেই ভারতীয়। বাঙালি, মারাঠি, গুজরাটি, তামিল, অন্ধ্র, উড়িয়া, অসমীয়া, কানাড়ি, মালয়ালি, সিন্ধি, পাঞ্জাবি, পাঠান, কাশ্মীরি ও রাজপুত এবং মধ্যপ্রদেশের হিন্দুস্থানীভাষী নানা সম্প্রদায় শত শত বৎসর ধরে তাদের আপন আপন বিশিষ্টতা রক্ষা করে এসেছে। পুরাতন পুঁথিপত্রে, ইতিহাসে, সাহিত্যে, এই সকল বিভিন্ন জাতিব যে-সব দোষগুণের উল্লেখ দেখি, আজও সেই দোষগুণ এদের মধ্যে বর্তমান। ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে প্রদেশভেদে নানা বিভিন্নতা থাকলেও তারা যুগ যুগ ধরে ভারতীয়ত্ব বজায় রেখেছে—তারা সকলে একই সংস্কৃতির গৌরবে সমৃদ্ধ একই প্রকার মানসিক ও নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আমাদের এই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে এমন একটা কিছু আছে যার জন্য একে জীবন্ত আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। আমাদের সংসারযাত্রায়, জীবন ও জীবনের বিচিত্র সমস্যার সমাধানে আমরা যে-দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করি তা এই জাতীয় ঐতিহ্যপ্রসূত। প্রাচীন চীনের মত প্রাচীন ভারতবর্ষও তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে একটি নিজস্ব জগৎ রচনা করেছিল। বিদেশী প্রভাব সে-সংস্কৃতিতে প্রবেশ করেছে, তাকে অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিতও করেছে—কিন্তু পরিশেষে নিজেই তার মধ্যে লীন হয়ে গেছে। বিভেদ বিচ্ছেদের কোনো সম্ভাবনা প্রকাশ পেলেই তৎক্ষণাৎ সংশ্লেষণের দ্বারা তাকে আত্মীভূত করার প্রয়াস দেখা দিয়েছে। সভ্যতার শুরু থেকে আরম্ভ করে একটা পরম একত্বের স্বপ্ন যেন ভারতমানসকে অধিকার করে ছিল। এই ঐক্যবোধ বাহির থেকে আমদানি করা একটা চাপানো জিনিস নয়, এর মধ্যে লোকাচার কিংবা ধর্মবিশ্বাসকে জোর করে বিশেষ কোনো একটা ছাঁচে ঢালবার চেষ্টা দেখি না। এই ঐক্যবোধ আরো গভীর। বিচিত্র বিশ্বাস ও প্রথাকে ধৈর্যের সঙ্গে স্বীকার করা, গ্রহণ করা ও উৎসাহিত করা—এরই ব্যাপক প্রচেষ্টা দেখা যায় ভারতবর্ষে।

একটা জাতীয়তাবদ্ধ গোষ্ঠীতে যত নিবিড় বাঁধুনিই থাক না কেন, বৃহৎ হোক ক্ষুদ্র হোক কিছু পার্থক্য দেখা দেয়ই। অন্য একটি জাতীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে তুলনা করে দেখলে এরূপ জাতিগত একতার মূল কারণ সহজেই বোধগম্য হতে পারে। পাশাপাশি দুটি জাতির পার্থক্য প্রায়ই ধীরে ধীরে লোপ পায় ও উভয়ের মধ্যে একটা মিলন ঘটে। আধুনিক কালের ধরনটাই এমন যে সর্বত্র সকল দেশ ও জাতিকে একই ছাঁচে ঢালবার একটা প্রচ্ছন্ন চেষ্টা চলছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বর্তমান কালের মত জাতিগঠনের কৌশল জানা ছিল না—তখন সামন্ততন্ত্রের বন্ধন কিংবা ধর্ম, গোষ্ঠী ও সংস্কৃতিগত বন্ধনকেই প্রধান স্থান দেওয়া হত। তবু একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে

যে ভারতের ইতিহাস যে সময় থেকে লেখা শুরু হয়েছে সেই যুগ থেকে আজ অবধি, হেন কাল ছিল না যখন যে-কোনো ভারতবাসী ভারতবর্ষের যে-কোনো অঞ্চলে স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারেনি। তেমনি নিঃসন্দেহে বলা চলে যে তারা ভারতবর্ষের বাইরে যে-কোনো জায়গায় বহিরাগত বিদেশীরূপে পরিচিত হয়েছে। যে সকল দেশে তার ধর্ম বা সংস্কৃতি অন্তুতপক্ষে অংশতও স্বীকৃত হয়েছে, সে দেশে সে নিশ্চয় এতটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করত না। যে-সব ধর্মের উৎপত্তি ভারতে নয়, এরূপ ধর্মে বিশ্বাসী হয়েও যারা ভারতে এসেছে ও স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করেছে, তারাও কয়েক পুরুষের মধ্যে ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতীয় খৃস্টান, ইহুদী, পারসী ও মুসলমানদের কথা উল্লেখ করা চলে। ভারতবাসীদের মধ্যেও যারা এই সকল ধর্মের কোনো না কোনো ধর্ম গ্রহণ করেছে, ধর্মান্তর সত্ত্বেও তারা অ-ভারতীয় বলে পরিগণিত হয়নি। ধর্মের যোগ থাকা সত্ত্বেও এই সকল ধর্মান্তরিত ভারতবাসী বিদেশের চোখে ভারতবাসী ও বিদেশীই থেকে গেছে।

আজ জাতীয়তার ধারণা অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছে বলেই হয়তো বিদেশে ভারতীয়েরা—তাদের পারস্পরিক বিভেদ সত্ত্বেও—নিজেদের একটি জাতীয় সম্প্রদায় গড়ে নেয় ও নানা উপলক্ষ্যে একত্র মিলিত হয়। একজন ভারতীয় খৃস্টান সর্বত্র ভারতীয়রূপেই পরিচিত হয়ে থাকে, তা সে যেখানেই যাক না কেন। একজন ভারতীয় মুসলমান, তুরস্ক, আরব কিংবা ইরান প্রভৃতি মুসলিম ধর্মপ্রধান দেশে ভারতীয়রূপে স্বীকৃত হয়।

আমার মনে হয় স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের মনে যে-ছবি জাগে তার একটার সঙ্গে অন্যটার মিল নেই। কোনো দুই ব্যক্তির মানসপটে একই ছবি প্রতিফলিত হতে পারে না। আমি যখন ভারতের কথা ভাবি অনেক কিছু জড়িয়ে ভাবি। উদার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড; মাঝে মাঝে ছোটোবড় অসংখ্য গ্রাম, শহর, নগর; বর্ষাসমাগমে শুষ্ক তৃষার্ত ভূমি, প্রাণরসে সরস ও সবুজ; জলভরা নদ ও নদী; খাইবার গিরিসংকট ও তার ধূসর পরিবেশ; দেশের সর্বদক্ষিণ অন্তরীপ; ভারতের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জনগণ—এই ছবিগুলি আমার মনে ভেসে ওঠে। আর দেখি তুষারকিরীট হিমালয়ের ছবি—দেখি বসন্তসমাগমে নবপুষ্পে শোভিত কাশ্মীরের কোনো উপত্যকা; তার মধ্য দিয়ে যেন ছোট্ট একটি পাহাড়িয়া নদী কলধ্বনি তুলে ঝরঝর ধারে ছুটে চলেছে। আমরা যে-ছবিটি ভালবাসি সেইটিকে কল্পনা করে মনের মধ্যে পোষণ করি। বোধ করি এইজন্যই আমাদের উষ্ণ অর্ধগ্রীষ্মমণ্ডলস্থ দেশের স্বাভাবিক ছবির পরিবর্তে, পার্বত্য প্রদেশের এই রূপটিকে আমি মনের পটে এঁকেছি। ভারতের এই দুটো রূপই তার যথার্থ রূপ, কারণ ভারতবর্ষ গ্রীষ্মমণ্ডল হতে নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে, বিষুবরেখার কাছ থেকে আরম্ভ করে দূরে এশিয়ার শীতল অন্তঃকরণটিকে স্পর্শ করেছে।

৭ : ভারতবর্ষ ভ্রমণ

১৯৩৬-এর শেষ দিকে ও ১৯৩৭-এর প্রথম কয়েকমাস আমার ভারত-ভ্রমণের গতি উত্তরোত্তর দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠল, অবশেষে এমন হল যাকে প্রায় পাগলের মতন অস্থিরভাবে ছুটোছুটি বলা চলে। এই বিশাল দেশের বুকের উপর দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি প্রচণ্ডগতি ঝঞ্ঝার মত, রাত্রিদিন কেবলই ঘুরে চলেছি, কোথাও বড় একটা থাকিনি বা বিশ্রাম নিইনি। সকল দিক থেকে ক্রমাগত তাগিদ আসছে, সময় সংক্ষেপ অথচ নির্বাচনের দিন আগতপ্রায়। সবাই ধরে নিয়েছিলেন যে অন্যদের জন্য ভোট-সংগ্রহে আমার যথেষ্ট পটুতা। বেশির ভাগ পথ অতিক্রম করেছি মোটরগাড়িতে, কিছুটা বিমানযোগে কিংবা রেলপথে। মাঝে মাঝে অল্প দূরের পথ হাতি, উট কিংবা ঘোড়ার পিঠে চেপে গেছি; কখনও গেছি লগিঠেলা নৌকা অথবা ডোঙায় চড়ে আর তাছাড়া সাইকেলে কিংবা পায়দল চলা তো ছিলই। পাকা রাস্তা থেকে দূরবর্তী জায়গায় এই সকল বিভিন্ন ও বিচিত্র যানবাহন ছাড়া অন্য গতি ছিল না। যেখানেই যেতাম সঙ্গে নিতাম দুই প্রস্থ মাইক্রোফোন ও লাউড স্পীকার। এ-দুয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে গলার স্বর বাঁচিয়ে বিপুল জনসঙ্ঘকে আমার বক্তব্য শোনানোর উপায় ছিল না। এই দুটি যন্ত্র আমার সঙ্গে সঙ্গে নানান্ জায়গায় গিয়েছে—তিব্বতের সীমান্ত থেকে বেলুচীস্তানের ধার পর্যন্ত। এসব জায়গায় এমন জিনিস আগে কেউ দেখেওনি শোনেওনি।

ভোরবেলা থেকে অনেক রাত্রি পর্যন্ত এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়েছি। বিভিন্ন জায়গায় হাজার হাজার লোক জড়ো হয়েছে আমার অপেক্ষায়। পথে যেতে যেতে বহুবার থামতে হয়েছে—প্রতীক্ষমান পল্লীবাসীর দল আমায় আপ্যায়ন করবার জন্য ঘিরে দাঁড়িয়েছে। এই সবের জন্য পূর্ব হতে প্রস্তুত থাকা যায় না। আমার পূর্বনির্দিষ্ট কর্মসূচী বদলাতে হয়েছে বাধ্য হয়ে; দিনক্ষণ ঠিক রেখে যথাসময়ে সভাসমিতিতে উপস্থিত হতে পারিনি কখনও কখনও। কিন্তু পথিপার্শ্বের এই দীন জনগণকে উপেক্ষা করে, তাদের দিকে দৃক্‌পাত না করে, কেমন করে আমি পাশ কাটিয়ে ছুটে যাব? কেবলই বিলম্ব ঘটেছে—এমন কি বক্তৃতার জায়গায় পৌঁছাবার পরেও। খোলা আকাশের তলায় বিরাট জনতা—সেখানে ভিড় ঠেলে বক্তৃতামঞ্চে যাওয়াও যেমন সময়-সাপেক্ষ ফিরে আসাও তেমনি। যেখানে প্রত্যেক মিনিট মূল্যবান, সেখানে মিনিটের পর মিনিট পরস্পরযুক্ত হয়ে ঘণ্টায় গিয়ে ঠেকেছে। এমনি করে যখন সন্ধ্যাবেলা বক্তৃতার জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছি তখন দেখা গেছে নির্দিষ্ট সময়ের কয়েক ঘণ্টা পরে হাজির হয়েছি। শীতকাল, বেশির ভাগ লোকের যথেষ্ট পরিমাণে কাপড়চোপড় নেই, খোলা জায়গায় বসে বসে তারা কাঁপছে—কিন্তু তা সত্ত্বেও জনসঙ্ঘ পরম সহিষ্ণুতায় আমার অপেক্ষায় থেকেছে। এমনি করে আমার একটা দিনের কাজে আঠারো ঘণ্টার খাটুনি দাঁড়িয়ে যায়। আমি হয়তো সেদিনকার শেষ গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌঁছাই মাঝ রাতে কিংবা তারও পরে।

কর্ণাটকে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি একদিন এমন দেরি হয়ে গেল যা পূর্বের সমস্ত রেকর্ড অতিক্রম করল—নিজেরাই যেন নিজেদের কাছে হার স্বীকার করলাম সেদিন। সেদিনকার কার্যসূচী ছিল ভারি, যাচ্ছিলাম সুদৃশ্য একটা পার্বত্য অরণ্যের ভিতব দিয়ে। রাস্তা গেছে এঁকে বেঁকে—ভাল রাস্তাও নয়, সুতরাং বাধ্য হয়ে যেতে হচ্ছিল মন্থর গতিতে। সেদিন ছিল গোটা ছয়েক যাকে বলা চলে মহতী জনসভা—ছোটোখাটো সভাও ছিল অনেকগুলি। সেদিনকার কাজ আরম্ভ করা গেল সকাল আটটায় একটা সভা দিয়ে, শেষ কাজটা মিটল ভোর চারটায়—নির্দিষ্ট সময়ের সাত ঘণ্টা পরে! অতঃপর সে রাত্রির বিশ্রামের জায়গায় পোঁছাতে গিয়ে আরও সত্তর মাইল অতিক্রম করতে হল। দিন ও রাত মিলিয়ে চারশো পনেরো মাইল অতিক্রম করে সকাল সাতটায় বাড়ি পোঁছালাম। সেদিন অনেকগুলি সভার কাজ সারতে হয়েছে আর মোটামুটি খাটুনি গেছে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তেইশ ঘণ্টা! ঠিক ঘণ্টাখানেক পরেই আবার দিনের কাজ শুরু।

একজন আপন খেয়ালে হিসাব করে দেখেছেন যে এই কয়মাসে আমি যে-সব সভায় বক্তৃতা করেছি তাতে মোট হিসাবে অন্ততপক্ষে এক কোটি লোক উপস্থিত হয়েছে। তাছাড়া পথ চলতে আরও বহু লক্ষ লোক কোনো না কোনোরূপে আমার সংস্পর্শে এসেছে। বড় বড় সভাগুলিতে লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ ঘটেছে; বিশ হাজার লোকের সমাগম তো প্রায়ই দেখা যেত। কোনো কোনো সময় ছোটো শহরের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে বিস্মিত হয়ে দেখেছি শহর প্রায় জনশূন্য—দোকান-পাট সব বন্ধ। এর কারণ জানতে বিলম্ব হয়নি কারণ অচিরেই দেখা গেল সমস্ত শহর—স্ত্রীপুরুষ শিশু নির্বিশেষে—ভেঙে এসেছে শহরের অপর প্রান্তে সভাস্থলে। সবাই একত্র হয়ে ধৈর্য ধরে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

কেমন করে একেবারে অবসন্ন না হয়ে এইভাবে আমি দিনের পর দিন কাজ চালিয়ে গেছি—আজ সেকথা আমি বুঝে উঠতে পারি না। সে সময়টা যেন শারীরিক সহনশক্তির চূড়ান্ত দেখানো হয়েছিল। বোধ করি ক্রমে ক্রমে আমার শরীরযন্ত্র এইরূপ ভবঘুরে জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। দুটো সভার মাঝখানে এক আধঘণ্টা আমি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়েছি—চোখ যেন জড়িয়ে এসেছে। তবু আমার জেগে উঠতে হয়েছে। কিছুক্ষণ পরেই আনন্দোৎফুল্ল জনতা দেখে ঘুমের ঘোর একেবারে কেটে গেছে। খাওয়া-দাওয়া যতদূর সম্ভব কম করে দিয়েছিলাম। প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা আহারের পাট একপ্রকার উঠিয়েই দিয়েছি—এবং তাতে শরীর বেশ ঝরঝরে বোধ হয়েছে। যেখানেই গেছি সেখানেই উৎসাহী জনতার গভীর স্নেহ ও প্রীতি আমায় যেন ঘিরে থেকেছে। এই থেকেই আমি শক্তি সঞ্চয় করেছি ও কাজ করতে পেরেছি। উৎসাহী জনগণের এই স্নেহ পাওয়া আমার পক্ষে নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তবু এই পাওয়াটা আমার সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত হয়ে যায়নি। লক্ষ লক্ষ মানুষের এই অনুরাগ প্রতিদিন যেন নূতন নূতন বিস্ময় বহন করে উপস্থিত হত।

৮ : সাধারণ নির্বাচন

সাধারণ নির্বাচনের দিন আগতপ্রায়—এই নির্বাচনসূত্রেই আমার ভারত পরিক্রমা। নির্বাচনসংক্রান্ত প্রচারের কাজে যে সকল উপায় বা পদ্ধতি সাধারণত অবলম্বন করা হয়, সেগুলি আমার মনোমত ছিল না। নির্বাচনপ্রথা সাধারণতন্ত্রের একটা অপরিহার্য অঙ্গ—এরূপ শাসন-ব্যবস্থায় নির্বাচন বাদ দেওয়া চলে না। তবু প্রায়ই দেখা যায় যে নির্বাচনের ব্যাপারে মানুষের মন্দ দিকটা প্রকাশ পায়। একথাও সত্য যে নির্বাচনে সকল সময় অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত লোকেরই জয় হয় না। যাঁদের সংবেদনশীল মন, যাঁরা রূঢ় কিংবা অমার্জিত উপায়ে এগিয়ে যেতে চান না—নির্বাচনব্যাপারে তাঁরা খুবই অসুবিধা ভোগ করেন। সুতরাং নির্বাচনদ্বন্দ্ব তাঁরা এড়িয়েই চলতে চান। স্থূলচর্ম যাদের. যারা গলা ফাটিয়ে চীৎকার করতে পারে এমন সব সুবিধাবাদীরাই কি তাহলে সাধারণ-তন্ত্রের শাসনব্যবস্থায় একচেটিয়া অধিকার লাভ করবে?

নির্বাচনের এই সমস্ত দোষত্রুটি সবচেয়ে বেশি দেখা যায় যেখানে নির্বাচকের সংখ্যা অল্প। যেখানে নির্বাচকের সংখ্যা খুব বেশি, তেমন জায়গায় এইসব দোষত্রুটি অনেকাংশে লোপ পায় অথবা বাইরের থেকে এতটা প্রকট হয় না। এইরকম বড় বড় কেন্দ্রে মিথ্যা হুজুগ কিংবা ধর্মের নামে নির্বাচন পাওয়া সম্ভব হয় হয়তো; কিন্তু কোথাও এমন একটা ভারসাম্য থাকে যার ফলে অনেক ইতর ব্যাপার থেকে রেহাই পাওয়া যায়। নির্বাচন অধিকার সম্প্রসারিত করায় আমার বরাবর একটা আস্থা আছে! এবারকার অভিজ্ঞতায় সেই বিশ্বাস সমর্থন পেল। সম্পত্তি কিংবা শিক্ষার মাপকাঠিতে যেখানে ভোটের অধিকার সাব্যস্ত হয়, সেখানে নির্বাচকসংখ্যা ছোটো হতে বাধ্য। এই সব ক্ষুদ্র গণ্ডীর উপর আমার ততটা আস্থা নেই. আমার মনে হয় বৃহত্তর ক্ষেত্রে নির্বাচন বহুল পরিমাণে যথাযথ হতে পারে। সম্পত্তি থাকলেই ভোট দেবার অধিকার থাকবে এটা ভাল কথা নয়, তবে শিক্ষার যোগ্যতায় ভোটের অধিকার দেওয়া বাঞ্ছনীয়ও বটে আবশ্যকও বটে। অবশ্য একথাও সত্য যে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন বা অল্পবিদ্যাবিশিষ্ট তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তির বিচারবুদ্ধি এমন কিছু তীক্ষ্ণ নয় যার জন্য তার মতামত অধিকতর শ্রদ্ধার চোখে দেখা যেতে পারে। একটি নিরক্ষর অথচ সহজজ্ঞানসম্পন্ন সবল-দেহ কৃষকের মতামত তার চেয়ে অনেক বেশি অবধানযোগ্য হবে বলে আমার মনে হয়। সে যাই হোক না কেন, যেখানে প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি কৃষকদেরই বিষয়, সেখানে তাদের মতকেই অধিকতর মূল্য দেওয়া সমীচীন। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্কমাত্রেরই ভোট দেবার অধিকার থাকা একান্ত উচিত। এ বিষয়ে যে-সব বাধা আছে তার কথা আমি ভাল করেই জানি। তা সত্ত্বেও আমার মনে হয় যে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার নীতি এদেশে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি প্রয়োগ করা হয়, সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুয়ো যুক্তি। এতদিন ধরে যারা সুখসুবিধা নির্বিবাদে ভোগ করে এসেছে, যারা স্বার্থের বন্ধনে অনেক কিছু বেঁধে রেখেছে—তাদের অমূলক আশঙ্কা থেকে এই সব বিরুদ্ধ যুক্তির উৎপত্তি।

১৯৩৭-অব্দে প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য নির্বাচনে ভোট দেবার অধিকার মোট লোকসংখ্যার শতকরা ১২জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পূর্বের অবস্থার তুলনায় এটাকে উন্নতিই বলতে হবে। এই ব্যবস্থার ফলে দেশীয় রাজ্যগুলি বাদে সমগ্র ভারতের প্রায় তিন কোটি লোক ভোট দেবার অধিকার পেয়েছিল। এই নির্বাচনপ্রথার ফলে প্রত্যেক প্রদেশ আপন আপন প্রতিনিধি সভা গঠন করেছিল—যেসব প্রদেশে দুটি করে আইনসভা সেখানে দুই প্রস্থ নির্বাচন পরিচালনা করতে হয়। সভ্যপদপ্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল বহু হাজারের কোঠায়।

আমি এবং অধিকাংশ কংগ্রেসকর্মী নির্বাচন বিষয়ে অগ্রসর হয়েছিলাম চিরাচরিত রীতি পরিহার করে ভিন্ন পথে। কোনো নির্বাচনপ্রার্থী সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমার কিছু করণীয় ছিল না। স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস দেশব্যাপী যে-আন্দোলন চালাচ্ছিল—এবং নির্বাচন বিষয়ে কংগ্রেস যে কর্মপদ্ধতি স্থির করেছিল—আমাদের কাজ ছিল তারই স্বপক্ষে দেশে একটা অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করা। আমি জানতাম এই কাজটি করতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে; আর তা যদি না সম্ভব হয় তাহলে কোনো ব্যক্তিবিশেষ নির্বাচিত হল কি না হল তাতে কিছু যায় আসে না।

আমি নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে যে-আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম তা ছিল আদর্শের দিক থেকে। নির্বাচনপ্রার্থী আমাদের এই অভিযানের অগ্রগামী সেনা ছাড়া আর-কিছু নয়—এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছি। তাদের অনেককে আমি চিনতাম অনেককে আবার জানতামই না। এতগুলি লোকের নাম দিয়ে আমার স্মরণশক্তিকে ভারাক্রান্ত করার কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না। আমি ভোট চেয়েছি কংগ্রেসের জন্য, ভারতের স্বাধীনতার জন্য, স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য। স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত অক্লান্ত সংগ্রাম চলবে—এ ছাড়া তাদের কাছে আর কোনো প্রতিশ্রুতি দিইনি। সকলকে বলেছি যে আমাদের উদ্দেশ্য ও কার্যসূচী যদি তারা বোঝে ও স্বীকার করে এবং তদনুসারে কাজ করতে রাজি থাকে, তবেই যেন তারা আমাদের স্বপক্ষে ভোট দেয়। বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছি কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবিত কার্যপদ্ধতি যদি তাদের অনুমোদিত না হয় তবে যেন তারা কংগ্রেসকে ভোট না দেয়। আমরা মিথ্যা ভোট চাইনি, ব্যক্তিবিশেষকে পছন্দ করে বলে সে-ব্যক্তিকে ভোট দিক এমনটাও চাইনি। আসলে ভোট ও নির্বাচন আমাদের বেশি দূর নিয়ে যেতে পারে না, আমাদের সুদীর্ঘ যাত্রার পথে কয়েকটা ধাপ এগিয়ে দেয় মাত্র। কংগ্রেসকে ভোট দেবার অর্থ কি না বুঝে, আসল কর্মক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে যোগ রক্ষার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও যারা আমাদের ভোট দিয়ে প্রবঞ্চিত করেছে—তারা আমাদের প্রতি মিথ্যাচার তো করেইছে, দেশের কাছেও তারা নিজেদের অবিশ্বাসী প্রতিপন্ন করেছে। এটা ব্যক্তিবিশেষের ব্যাপার নয়—যদিচ আমরা ভাল লোকই চাই আমাদের প্রতিনিধিরূপে। আমাদের দাবিটাই হল আসল বস্তু। যে প্রতিষ্ঠান এই দাবি খাড়া রেখেছে এবং সর্বোপরি যে দেশের স্বাধীনতার জন্য এই দাবি—সেই দেশ ও প্রতিষ্ঠানই মুখ্য—ব্যক্তি গৌণ। আমি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি কোটি কোটি দেশবাসীর কাছে এই স্বাধীনতা কি

প্রকার রূপ পরিগ্রহ করে আসা উচিত। শ্বেতাঙ্গ প্রভুর জায়গায় কালা আদমী প্রভু হোক—এ-পরিবর্তন আমরা চাইনি। আমরা চেয়েছি এমন একটি শাসনব্যবস্থা—যেখানে জনগণ নিজেদের স্বার্থে নিজেদের শাসন করবে, যেখানে আমাদের চিরাতীত দারিদ্র্য ও দুঃখের অবসান ঘটবে।

এই ছিল আমার বক্তৃতাবলীর মূল কথা। ঘুরে ফিরে আমি বার বার এই কথাটিই বলেছি। এই নৈর্ব্যক্তিক ভাবটা রক্ষা করতে পেরেছিলাম বলে নির্বাচন অভিযানে আমার যোগদান করা সম্ভব হয়েছিল। বিশেষ কোনো নির্বাচনপ্রার্থীর হারজিত নিয়ে আমি অনর্থক মাথা ঘামাতে চাইনি, কারণ আমার মন ছিল একটা বৃহত্তর উদ্দেশ্যে নিবদ্ধ। বস্তুত কোনো বিশেষ নির্বাচনপ্রার্থীর উদ্দেশ্যসিদ্ধির সংকীর্ণ দিক থেকে বিচার করলেও বোঝা যাবে আমার এই পথটাই ছিল ঠিক পথ। এইভাবে তাঁকে ও তাঁর নির্বাচনের ব্যাপারকে একটা উচ্চতর আদর্শে উন্নীত করে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের এই বিশাল জাতির স্বাধীনতালাভের সংগ্রাম ও দারিদ্র্যের অভিসম্পাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ দীন জনগণের অক্লান্ত প্রচেষ্টার সঙ্গে নির্বাচনের ব্যাপার যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে উঠেছিল। এই ধরনের উচ্চস্তরের কথা কংগ্রেসকর্মীদের মুখে মুখে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল, সমুদ্র থেকে সদ্য-আগত এই নূতন ভাবের ঝড়, যত কিছু তুচ্ছ ক্ষুদ্র ভাবনা, নির্বাচনের সমস্ত কূটকৌশল—এক নিমিষে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল। আমার দেশের লোককে আমি চিনি, আমি তাদের ভালবাসি—তাদের লক্ষ লক্ষ চক্ষু আমার জনমনস্তত্ত্বের অনেক গভীর রহস্য শিখিয়েছে।

দিনের পর দিন আমি নির্বাচন সম্বন্ধে বলে চলেছি, কিন্তু নির্বাচনের প্রশ্ন আমার মনকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি—ভাসা ভাসা ভাবে মনের উপরিতলে ছিল এই প্রশ্নের স্থান। নির্বাচকমণ্ডলীর কথাও আমি বেশি করে ভাবিনি। আমি যে বৃহত্তর মহত্তর একটা কিছুর স্পর্শ লাভ করেছি। যদি আমার কিছু বলবার মত থাকে তবে সে-বাণী আমার পেঁছে দিতে হবে স্ত্রীপুরুষশিশু নির্বিশেষে ভারতের অগণিত জনসাধারণের মধ্যে—তা তাদের ভোটাধিকার থাক বা নাই থাক। দেশের এই জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগের ফলে একটা নূতন উৎসাহ যেন আমায় পেয়ে বসল। জনতার পাঁচজনের মধ্যে একজন হয়ে তাদেরই গতিবেগে যন্ত্রচালিত হবার যে-অনুভূতি তার সঙ্গে এই উদ্দীপনার কোনো সংস্রব নেই। মনে হচ্ছে লক্ষ লক্ষ চক্ষুর দিকে আমি যেন তাকিয়ে আছি—অজানা লোকের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ এ নয়। আমি যেন এদের চিনি জানি, কিন্তু এ-পরিচয় কেমন করে ঘটল সে-কথা আমি জানি না। আমি নমস্কার করে এদের সামনে দাঁড়াতাম আর লক্ষ লক্ষ হাত উত্তোলিত হত প্রতি-নমস্কারের ভঙ্গীতে। এদের মুখে ফুটে উঠত বন্ধুর উদ্দেশে বন্ধুর হাসি, একটা অস্ফুট স্বাগত-ধ্বনি ভেসে আসত সেই জনসংঘ থেকে—তাদের স্নেহ যেন গভীর আলিঙ্গনের মত আমায় আবেষ্টন করে থাকত। তাদের জন্য আমি যে-বাণী বহন করে এনেছি তারই কথা আমি বলতাম আমার বক্তৃতায়। সে কথা তারা কতখানি বুঝত—তার অন্তর্নিহিত ভাবটুকু কতখানি গ্রহণ করতে পারত, সে আমি জানি না। কিন্তু তাদের চোখ একটা

গভীর অনুভূতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠত—তারা যেন শোনা কথার চেয়েও গভীর একটা কিছুর সন্ধান পেয়েছে মনে হত।

৯ : জনগণের সংস্কৃতি

এমনি করে ভারতবাসীর জীবননাট্যের বর্তমান অঙ্ক দেখে চলেছি। তাদের দৃষ্টি যদিচ ভবিষ্যতের দিকে নিবদ্ধ, তবু যেন দেখতে পেতাম তাদের জীবন দূর অতীতের সঙ্গে অসংখ্য যোগসূত্রে যোগযুক্ত। সর্বত্র লক্ষ্য করতাম তাদের জীবনের উপর একটি সাংস্কৃতিক ধারার গভীর প্রভাব। এই সাংস্কৃতিক পটভূমিটি প্রাকৃত দর্শন, প্রাচীন আচার, ব্যবহার, ইতিবৃত্ত, পৌরাণিক ও অন্যান্য নানা কাহিনীর সংমিশ্রণে তৈরি। এর কোনো উপাদানটাই পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। নিতান্তই অশিক্ষিত ও নিরক্ষর যে-লোক তার উপরেও এর প্রভাব দেখতে পেয়েছি। ভারতের দুটি প্রাচীন মহাকাব্য—রামায়ণ ও মহাভারত—এবং অন্যান্য গ্রন্থগুলি লোকসাধারণের বোধগম্যরূপে ভাষান্তরিত ও ভাবার্থসম্বলিত হয়ে সাধারণ্যে প্রচারিত হয়েছে। এই গ্রন্থগুলির প্রত্যেক ঘটনা, প্রতি কাহিনী ও তার নীতি-উপদেশ যেন জনসাধারণের মানসপটে মুদ্রিত হয়ে তাকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে রেখেছে। নিরক্ষর পল্লীবাসীদের মধ্যেও দেখি যে শত শত শ্লোক তাদের কণ্ঠস্থ। তাদের কথাবার্তায় আলাপে আলোচনায় এইসব গ্রন্থের নীতিগর্ভ গল্পের উল্লেখ হামেশাই দেখা যায়। বর্তমান সময়ের কোনো একটা বিষয় নিয়ে হয়তো সাধারণভাবে আলোচনা চলছে, একদল পল্লীবাসী তাতে সাহিত্য-রসের অবতারণা করে দিল—এরূপ ঘটনা আমি দেখেছি এবং দেখে বিস্মিত বোধ করেছি। লিখিত ইতিহাস ও অল্পবিস্তর প্রমাণিত ঘটনাবলীর উপর স্থাপিত একটা অতীতের ছবি রয়েছে আমার মনের চিত্রশালায়। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে একজন নিরক্ষর কৃষকের মনেও একটা চিত্রশালা আছে। তফাৎ এই যে তার ছবি অনেকখানি পুরাণ অথবা কিংবদন্তী কিংবা মহাকাব্য থেকে নেওয়া—সত্যকার ইতিহাসের সঙ্গে সে ছবির হয়তো অল্পই সম্বন্ধ। কিন্তু তার কাছে এ-ছবি অতি স্পষ্ট।

আমি এদের মুখ ও দেহের গড়ন, চলাফেরার ভঙ্গী লক্ষ্য করে দেখেছি। অনেক মুখ দেখেছি যাতে সহজেই মনের ভাব ফুটে উঠেছে। অনেক সবল সতেজ সাবলীল দেহসৌষ্ঠব দেখেছি এদের মধ্যে। মেয়েদের মধ্যে দেখেছি কমনীয় দেহভঙ্গের সঙ্গে একটা যেন মহিমা, গঠনসৌষ্ঠবের সঙ্গে একটা স্থৈর্যের ভাব। আর দেখেছি মেয়েদের মুখে একটা প্রচ্ছন্ন বিষাদের ছাপ। অপেক্ষাকৃত উচ্চবর্ণের লোকেদের মধ্যেই এই আকারসৌষ্ঠব সচরাচর বেশি দেখা যায়—তারা ওরই মধ্যে সচ্ছলতর অবস্থার লোক। কখনও কখনও পল্লী অঞ্চলের রাস্তা দিয়ে কিংবা গ্রামের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে চমকে উঠেছি। চোখের সামনে দিয়ে চলেছে কোনো পুরুষ বা রমণী যাদের দেহসৌষ্ঠব প্রাচীন যুগের প্রাচীর চিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। বিস্ময় লেগেছে এই ভেবে যে এত বিভীষিকা ও দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও এ-দেশে এমন

সুপুরুষ বা রূপসী যুগ যুগ ধরে বর্তে থাকল কি করে! দেশের অবস্থা যদি ভাল হত, এই সব লোকেরা যদি আরও সুযোগ-সুবিধা পেত তাহলে এই জনসাধারণ নিয়ে আমরা কি-ই না করতে পারতাম।

সকল দিকে সকল স্থানেই দেখেছি দারিদ্র্য অথবা দারিদ্র্য থেকে উদ্ভূত অন্যান্য অসংখ্য দুঃখ। সকলের ললাটেই এই প্রাণঘাতী পশুর নখরচিহ্ন। এই দারিদ্র্যের চাপে মানুষের জীবন নিষ্পেষিত হয়েছে, বিকৃত হয়েছে, কলুষিত হয়েছে। নিরন্তর অভাব ও তজ্জনিত দুশ্চিন্তার ফলে অনেক পাপ জমেছে জনগণের জীবনে। এ-দৃশ্য সুখের দৃশ্য নয়—কিন্তু তাহলে কি হয়, এটাই যে ভারতের সত্যকার চেহারা! দাবি-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে, যতটুকু পাওয়া যায় তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার মত একটা বৈরাগ্যের ভাব এদেশে খুব বেশি দেখা যায়। কিন্তু সেই সঙ্গেই দেখতে পাই যে পুরাতন সংস্কৃতির উত্তরাধিকার মনের দিক থেকে এমন একটা সুপরিণত শান্তভাব এনে দিয়েছে যা দুঃখ দুর্গতির অজস্র আঘাত সত্ত্বেও নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যায়নি।

১০ : দুই জীবন

এইভাবে ও অন্যান্য নানাভাবে আমি প্রাচীন ও বর্তমান ভারতবর্ষের সত্য স্বরূপটিকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছি। জীবিত লোকদের দেখে ও পরলোকগতদের স্মরণ করে আমার অন্বেষ্টা মনে বহু ভাব এসেছে, বহু চিন্তার তরঙ্গ। মনে মনে ভেবেছি যেন অগণিত জনগণের এক অবিরাম মিছিল চলেছে—আমিও আছি এই শোভাযাত্রীদের সবার পিছনে। কখনও আবার নিজেকে দেখেছি পৃথক করে—আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি একা—পর্বতের শিখরে—সেখান থেকে তাকিয়ে দেখছি নিচের উপত্যকার দিকে।

কি উদ্দেশ্যে এই দীর্ঘ শোভাযাত্রা—কি জন্য এই অন্তহীন মিছিল? মাঝে মাঝে শ্রান্তি ও হতাশায় অভিভূত হয়ে পড়েছি। নিজেকে এই সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে মুক্তি খুঁজেছি। ধীরে ধীরে আমার মন নিজেকে এই মুক্তির জন্য তৈরি করে নিয়েছে, নিজের উপর দরদ আর নেই, আমার কি হল না হল সে চিন্তাও যেন অনেক অংশে লোপ পেয়ে গেছে। আমি ভাবতে চেয়েছি নিজেকে এইরূপ বিরাগীভাবে—কথঞ্চিৎ কৃতকার্যও হয়তো হয়েছি। কিন্তু সে-বিরাগ স্বল্পক্ষণ স্থায়ী কারণ আমার মনের মধ্যে রয়েছে এমন একটা আগ্নেয়গিরি যা যে-কোনো ধরনের নির্লিপ্ততা উড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। যতই চেষ্টা করি না কেন আমার আত্মরক্ষার সব চেষ্টা ভেসে যায়; আবার ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হয় কর্মের সমুদ্রে।

তবু এই স্বল্পক্ষণস্থায়ী বৈরাগ্যসাধনেও কাজ হয়েছে। কাজের মধ্যেই কখনও কখনও একটু সরে দাঁড়িয়ে যেন অসংলগ্ন হয়ে তাকে পরখ করে দেখতে পেরেছি। কখনও কখনও দৈনন্দিন কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি—চুরি করে যেন দু'এক ঘণ্টার মত আমার গহন মনের গোপন প্রকোষ্ঠে আর এক জীবন যাপন করেছি। এমনি করেই, একই সঙ্গে এগিয়ে চলেছে এই দুটি জীবন, পরস্পর অবিচ্ছিন্ন অথচ এক নয়

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভা র ত স ন্ধা নে

১ : সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা

সিন্ধুপ্রদেশের মোহেঞ্জোদারো ও পশ্চিম পাঞ্জাবের হরপ্পাতে যে-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে তাকেই ভারতবর্ষের প্রাচীনতম রূপ বলা যায়। এই আবিষ্কারের ফলে প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের ধারণা একেবারে বদলে গেছে। দুঃখের বিষয় এই অঞ্চলে খনন কার্য আরম্ভ হওয়ার কয়েক বৎসর পরেই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়, গত তেরো বৎসর এদিক থেকে বিশেষ কিছু করা হয়নি। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের গোড়ায় যে অর্থসংকট দেখা দেয়, প্রথমত তারই দরুন কাজ বন্ধ হয়। অর্থের অপ্রতুলতার ওজর তোলা হয়েছিল কিন্তু রাজকীয় সমারোহের বেলা অর্থের অভাব কোনো দিনই ঘটেনি। তারপর দ্বিতীয় মহাসমর শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়; এমন কি মাটি খুঁড়ে যে-সব জিনিস উদ্ধার করা হয়েছিল সেগুলিকে রক্ষা করার কর্তব্যটাও উপেক্ষিত হয়েছে। মোহেঞ্জোদারো দেখতে গেছি আমি দুবার—প্রথম ১৯৩১-এ ও দ্বিতীয়বার ১৯৩৬-এ। দ্বিতীয়বার লক্ষ্য করেছি যে বৃষ্টিতে ও শুষ্ক বালুকণাময় বায়ুর আঘাতে খননে আবিষ্কৃত বাড়ির অনেক-গুলিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বালুকা ও মৃত্তিকার আচ্ছাদনে পাঁচ হাজার বছরেরও অধিককাল রক্ষা পাওয়ার পর অনাবৃত অবস্থায় এগুলি দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। প্রাচীন-কালের এই অমূল্য স্মৃতিচিহ্নগুলিকে রক্ষা করার জন্য কোনো চেষ্টাই এক প্রকার করা হচ্ছে না। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের যে-কর্মচারীটিকে এই স্থানটি রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া হয়েছে, তাঁর অভিযোগ এই যে এই সমস্ত বাড়িগুলি রক্ষা করার জন্য অর্থ কি অন্য সাহায্য কিংবা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বলতে গেলে কিছুই তাঁকে দেওয়া হয় না। এই আট বছরে কি ঘটেছে জানি না, তবে অনুমান হয় যে ক্ষয়ের মাত্রা বেড়েই চলেছে এবং আর কয়েক বৎসরের মধ্যে মোহেঞ্জোদারোর বৈশিষ্ট্য অনেক অংশে লোপ পাবে।

যা হারালে ফিরে পাওয়া যাবে না এমন সব জিনিস নষ্ট হতে চলেছে—এটা ভারি আক্ষেপের বিষয়। এই নিদারুণ অবহেলার স্বপক্ষে কোনো যুক্তিই খাটে না। এর পর কি যে ছিল তা স্মরণ করার জন্য থাকবে কয়েকখানা ছবি মাত্র আর কয়েকটা লিখিত বিবরণ।

মোহেঞ্জোদারো থেকে হরপ্পা বেশ কিছু দূরে। এই দুই জায়গায় ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার দৈবাৎই ঘটেছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এই দুই ভূখণ্ডের মধ্যে বহু প্রাচীন নগর, পুরাতন যুগের বহু কীর্তিকলাপের চিহ্ন লোকচক্ষুর অগোচরে প্রোথিত হয়ে আছে। এই প্রাচীন সভ্যতা উত্তর-ভারতে তো নিশ্চয়ই, এদেশের অন্য

অঞ্চলেও বিস্তারলাভ করেছিল। আশা করা যায় যে এমন সময় আসবে যখন প্রাচীন অতীতের অবগুন্ঠন অনাবৃত করার কাজে পুনরায় হাত দেওয়া হবে এবং সুদূর-প্রসারী আরও অনেক আবিষ্ক্রিয়া ঘটবে। ইতিমধ্যেই এই সভ্যতার চিহ্ন পশ্চিমে কাথিয়াওয়াড়ে এবং দূরে পাঞ্জাবের আম্বালা জেলায় দেখা গেছে। এ-সভ্যতা যে গঙ্গা-তটবর্তী সমস্ত ভূখণ্ডে বিস্তৃত ছিল এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে এই সভ্যতা কেবল যে সিন্ধুনদ উপত্যকায় আবদ্ধ ছিল তা নয়। মোহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত লিপিগুলির পাঠোদ্ধার এখনও সম্পূর্ণরূপে হয়নি।

তবু এপর্যন্ত যা জানা গেছে তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সিন্ধুনদ উপত্যকার সভ্যতার পরিচয় যতটুকু পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয় যে এই সভ্যতা খুবই উৎকর্ষ লাভ করেছিল। এই উন্নতি ঘটতে নিশ্চয়ই বহু সহস্র বৎসর লেগেছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এ-সভ্যতা ছিল প্রধানত ঐহিক—এতে ধর্মনৈতিক সূত্র কিছু থাকলেও তা তেমন জোর পায়নি। এখানেই ভারতের পরবর্তী যুগের সংস্কৃতির পূর্বসূচনা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য কবা যায়।

স্যার জন মার্শাল বলেন : 'একথা নির্ভুলভাবেই প্রকাশ পেয়েছে যে মোহেঞ্জো-দারো ও হরপ্পা এই উভয় স্থানের সভ্যতা বহু দিন পূর্বেই তার প্রাথমিক অবস্থা অতিক্রম করে এসেছে। তখনই তা যুগযুগ ধরে বর্ধিত হয়ে ভারতের মাটিতে একটা অপরিবর্তনশীল নির্দিষ্ট আকার ধারণ করেছিল। এই অবস্থায় পৌঁছাতে তার পিছনে বহু সহস্রব্যাপী মানবপ্রচেষ্টার প্রয়োজন ঘটেছিল। যে-সকল বিশেষ বিশেষ ভূখণ্ডে সভ্যতার উন্মেষ ও পরিবর্ধন ঘটেছে সে সব দেশের নাম করতে হলে এতকাল ইরাণ, মেসোপোটেমিয়া ও মিশরের নাম উল্লিখিত হত। এখন থেকে ভারতবর্ষের নাম এদের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।' অন্যত্র মার্শাল বলেছেন : 'পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশ এবং সম্ভবত ভারতের অন্যান্য স্থানেও একটি উন্নত এবং বিশেষভাবে একভাবাত্মক সভ্যতার উদয় হয়েছিল। এ-সভাতা সমসাময়িক মেসোপোটেমিয়া ও মিশর হতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং কোনো কোনো বিষয়ে অধিকতর সমৃদ্ধ ছিল।'

এই সিন্ধুনদ প্রদেশের লোকেরা নানা দিক থেকে তদানীন্তন কালের সুমেরিয় সভাতার সংস্পর্শে এসেছিল; এমন কি আক্কাদে যে একটি ভারতীয় (সম্ভবত বণিক-দের) উপনিবেশ ছিল, তারও প্রমাণ কিছু কিছু পাওয়া যায়। 'সিন্ধুনদ তীরবর্তী শহর থেকে শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার পৌঁছাত গিয়ে তাই গ্রিস ও ইউফ্রেটীস নদীতীরস্থ বাজারগুলিতে। অপর দিকে আবার সুমেরিয় শিল্পকৌশলজাত দ্রব্যাদি, মেসোপোটে-মিয়ার প্রসাধনপাত্র এবং সমবর্তুলাকার এক ধরনের সীলমোহর—এই সকল বস্তুর অনুরূপ কিছু কিছু জিনিস প্রস্তুত হত সিন্ধুতীরের শহরগুলিতে। বাণিজ্য যে কেবল কাঁচা মাল বা বিলাসদ্রব্যের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল তা নয়। আরব সাগরের তীর হতে নিয়মিত মাছ আমদানি হত, মোহেঞ্জোদারোর আহার্য-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য।' *

* গর্ডন চাইল্ড : হোয়াট হ্যাপেন্‌ড্‌ ইন হিস্ট্রি : ১১২ পৃঃ (পেলিকান বুক্‌স)।

সেই অতি প্রাচীন কালেও ভারতে বস্ত্রের জন্য তুলার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। মার্শাল সিন্ধুনদ প্রদেশের সভ্যতার সঙ্গে সমসাময়িক মিশর ও মেসোপোটেমিয়ার তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন : 'এইরূপে, কেবল বিশেষ লক্ষণীয় কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করতে গেলে বলা আবশ্যক যে এই যুগে বস্ত্রের জন্য তুলার ব্যবহার একমাত্র ভারতেই হত। পশ্চিম ভূভাগে এর প্রচলন হয় আরও দুই কি তিন হাজার বৎসর পরে। এ ছাড়া, প্রাগৈতিহাসিক মিশর কিংবা মেসোপোটেমিয়া অথবা পশ্চিম এশিয়ার অন্য কোনো স্থানে এমন কোনো জিনিসের কথা জানা যায় না যার সঙ্গে মোহেঞ্জোদারোর সুনির্মিত স্নানাগার কিংবা সুপরিসর বাসগৃহগুলির তুলনা করা যেতে পারে। ঐ সব দেশে দেবমন্দির, রাজপ্রাসাদ কিংবা সমাধিমন্দির গঠনে অতিরিক্ত পরিমাণে অর্থ ব্যয় করা হত, এবং সেদিকেই মনোনিবেশ করা হত বেশি। অনুমিত হয় যে অপর সাধারণকে বাধ্য হয়ে অকিঞ্চিৎকর আবাসগৃহেই সন্তুষ্ট থাকতে হত। সিন্ধুনদ প্রদেশের যে-ছবি আমরা পাই—তা ছিল ঠিক এর উলটো। সেখানে সর্বোৎকৃষ্ট ইমারতগুলি নির্মিত হত নাগরিক-সাধারণের সুবিধার জন্য।' মোহেঞ্জো-দারোয় সাধারণের জন্য আবার গৃহস্থদের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য—বহু স্নানাগার ছিল, আর ছিল জলনিষ্কাশনের জন্য উৎকৃষ্ট পয়ঃপ্রণালী। এরূপ পূর্ত ব্যবস্থা জগতে প্রথম আবিষ্কৃত হয় এই দেশেই। কাঁচা ইঁট দিয়ে তৈরি গৃহস্থদের দ্বিতল বাড়ি দেখা গেছে—তার সঙ্গে আছে গৃহস্থের নিজস্ব স্নানাগার এবং দ্বারপালের জন্য বহির্বাটি। এছাড়া অনেকগুলি পরিবার যাতে একই বাড়িতে অথচ নিজেদের আব্রু রেখে থাকতে পারে—সেরকম ফ্ল্যাট-ওয়ালা বাড়িও দেখা যায়।

মার্শাল সিন্ধুনদ প্রদেশের সভ্যতা বিষয়ে বিশেষজ্ঞরূপে স্বীকৃত; তিনি স্বয়ং মোহেঞ্জোদারোর খননকার্য পরিচালনা করেছেন। এঁর লেখা থেকে আর একটি অংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তিনি বলেন : 'এখানকার শিল্পকলায় ও ধর্মে একটা স্বকীয় বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। সমসাময়িক যুগে অন্যান্য দেশে অনুরূপ শিল্পবস্তু সম্বন্ধে যতটুকু জানা গেছে তা থেকে বোঝা যায় যে এখানকার মৃৎপাত্র, ভেড়া, কুকুর ও অন্যান্য জন্তুর প্রতিকৃতিতে কিংবা সীলমোহরের উপর উৎকীর্ণ কাজে যে-শিল্প পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে, তার কোনো সাদৃশ্য কোথাও দেখা যায় না। বিশেষত সীল-মোহরের উপর কুব্জপৃষ্ঠ হ্রস্বশৃঙ্গবিশিষ্ট ষণ্ডের যে-আকৃতি পাওয়া গেছে তাতে কল্পনার প্রসার, রৈখিক অনুভূতি ও মূর্তির নমনীয় ভঙ্গী এমন একটি বৈশিষ্ট্য দান করেছে যে পাথর খোদাই-এর কাজে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। হরপ্পাতে সুন্দর দেহভঙ্গী-বিশিষ্ট যে-দুটি ক্ষুদ্রাকার মানুষের মূর্তি পাওয়া গেছে গ্রীস ভাস্কর্যের গৌরবো-জ্জ্বল যুগের পূর্বে এর অনুরূপ কোনো মূর্তি অন্য কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। ......এখানকার ধর্মে অবশ্য এমন অনেক কিছুই ছিল যার সঙ্গে অন্য দেশের ধর্মের সঙ্গে তুলনা করা যায়।......তবু সব কথা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে সিন্ধুনদ প্রদেশের ধর্ম এতদূর ভারতীয় ভাবাপন্ন ছিল যে আজকের প্রচলিত হিন্দুধর্ম থেকে তার সামান্যই পার্থক্য।'

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিন্ধুসভ্যতা সমকালীন পারস্য, মেসোপোটেমিয়া ও মিশরের সভ্যতা অপেক্ষা কোনো কোনো বিষয়ে উন্নত ছিল। বাণিজ্য ব্যাপারে এই দেশগুলির মধ্যে একটা পারস্পরিক যোগও ছিল। এই ভারতীয় সভ্যতাকে নাগরিক সভ্যতা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। বিত্তশালী লোক ও বণিকদেরই এতে প্রাধান্য ছিল বেশি। রাস্তাগুলির দুই পাশে ছিল সারবাঁধা ছোটোবড় নানা রকম দোকানপাট—দেখলে মনে হয় আজকালকার ভারতীয় বাজারের মতোই ছিল এর চেহারা। অধ্যাপক চাইল্ড্ বলেন : 'সিন্ধুনদতীরস্থ শিল্পীরা তাদের বেশির ভাগ পণ্য উৎপাদন করত বিদেশী বাজারের চাহিদা মেটাবার জন্য। পণ্য বিনিময়ের জন্য নির্দিষ্ট মূল্যে জ্ঞাপক কোনো মুদ্রা বা অন্য কিছু ব্যবহৃত হত কি না নিশ্চয় করে বলা যায় না। বহু সুপ্রশস্ত বসতবাড়ির সংলগ্ন গুদামঘর দেখে বোঝা যায় ঐসব বাড়ির মালিকেরা বণিক ছিল। গুদামঘরগুলির আয়তন ও সংখ্যাধিক্য দেখলে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এদেশে বিত্ত ও প্রতিপত্তিশালী একটা বৃহৎ বণিক সম্প্রদায় বসবাস করত।' 'অধিকাংশ ধ্বংসাবশেষ থেকে এত ধনরত্ন ও বস্তুসম্ভার সংগৃহীত হয়েছে যে দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। এই সব জিনিসের মধ্যে আছে সোনা ও রূপার এবং মহার্ঘ্য প্রস্তর ও মিনাকরা অলঙ্কার, তামার পাত পিটিয়ে তৈরি তৈজসপত্র এবং ধাতুনির্মিত যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র-শস্ত্র।' চাইল্ড্ আরও বলেছেন : 'যত্নপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত পথঘাট, জলনিষ্কাশনের জন্য উৎকৃষ্ট পয়ঃপ্রণালী এবং তা নিয়মিত পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা ইত্যাদি দেখে একটা সুবিহিত নগরশাসন প্রতিষ্ঠান বা মিউনিসিপ্যালিটির কথা মনে হয়। এ-প্রতিষ্ঠান এমন শক্তিশালী ছিল যে শহর পরিকল্পনা সংক্রান্ত নিয়মকানুন কেউ ভাঙতে পারত না। অনেকবার বন্যার জলে শহর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও পুনর্গঠনের সময় ছোট বড়ো কোনো রাস্তাই তার নিজস্ব স্থান থেকে চ্যুত হতে দেওয়া হয়নি।'*

সিন্ধুসভ্যতার যুগ ও বর্তমান কালের মধ্যে এমন অনেক যুগ গেছে যার সম্বন্ধে আমরা এখনও সামান্যই জানতে পেরেছি। একটা যুগের সঙ্গে পরবর্তী যুগের যোগ সব সময় তেমন স্পষ্ট নয়; বোঝা যায় যে ফাঁকে ফাঁকে অনেক কিছুই ঘটেছে, অনেক পরিবর্তনই সাধিত হয়েছে। তবু এই বিভিন্ন যুগের মধ্যে একটা নিরবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ স্পষ্টই অনুভূত হয়, মনে হয় যে সেই ছয়-সাত হাজার বছর আগেকার সুদূর কালে যখন সিন্ধু জনগণের সভ্যতার শুরু—তখনকার ভারতের সঙ্গে আধুনিক ভারত যেন একটা অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খলে আবদ্ধ। মোহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় এমন অনেক কিছু দেখা যায় যা ঐতিহ্যগত ও অভ্যাসগত অনেক কিছুর সঙ্গে মেলে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, পূজা পদ্ধতি, শিল্পকলা—এমনকি পোশাক পরিচ্ছদের ধাঁচধরনেরও উল্লেখ করা চলে। এই সব কেবল পরবর্তীকালের ভারতে নয়, পশ্চিম এশিয়ার নানাস্থানে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ভারতসভ্যতার এই প্রথম প্রত্যুষেই সে তার অসহায় শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে

* গর্ডন চাইল্ড : হোয়াট হ্যাপেন্ড্ ইন হিস্ট্রি : ১১৩-১৪ পৃঃ।

নানা দিক দিয়ে একটা পরিণত অবস্থায় পোঁছেছিল। জীবনধারণের নানাবিধ পন্থার সঙ্গে তার ইতিপূর্বেই পরিচয় ঘটে গেছে। অবোধ্য ও অস্পষ্ট জগতের সম্মুখীন হয়ে আদিম জাতির যে একটা স্বপ্নবিহ্বল অভিভূত অবস্থা হয়—সে-অবস্থা সে পূর্বেই অতিক্রম করে এসেছে। সেই সুদূর অতীত কালেই জীবনের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞানসম্মত নানা উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় ভারত দিতে পেরেছে। সে যে কেবল সুন্দর ও শৌখিন শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত করতে পেরেছিল এমন নয়—প্রাত্যহিক জীবনের নানাবিধ নিত্য ব্যবহারের উপকরণ তৈরি করতেও তার প্রচেষ্টা দেখি। এর মধ্যে এমন কতকগুলি জিনিস আছে যাকে আধুনিক সভ্যতার নিদর্শনরূপে উপস্থিত করা যেতে পারে—দৃষ্টান্তস্বরূপ স্নানাগার ও জলনিষ্কাশনের সুন্দর ব্যবস্থার উল্লেখ করা যায়।

২ : আর্যদের আগমন

এই সিন্ধুনদ প্রদেশের সভ্যতা বিকাশের মূলে যারা ছিল—তারা কে? কোথা থেকে এ-জাতি সে দেশে এসেছিল? এরূপ প্রশ্নের উত্তর আমরা এখনও জানি না। খুব সম্ভব এই সংস্কৃতি ছিল দেশজ এবং সন্ধান করলে এই সভ্যতার মূল ও শাখা একদিন হয়তো দক্ষিণ ভারতে আবিষ্কৃত হতে পারে। কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি সিন্ধুনদ জনপদের লোকের সঙ্গে দ্রবিড়জাতি ও দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতির মধ্যে একটা মূলগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। যদি অন্যত্র থেকে এদেশে বসবাসের জন্য লোক এসেও থাকে, তা মোহেঞ্জোদারোর নির্দিষ্ট কালের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বেই হয়েছে। সুতরাং কার্যত এই সকল লোককে ভারতের অধিবাসী বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।

এখন প্রশ্ন ওঠে, এই প্রাচীন সভ্যতার অবসান ঘটল কি কারণে ও কেমন করে। গর্ডন চাইল্ড্ এবং আরো অনেকে বলেন হঠাৎ এই সভ্যতার শেষ হয় কোনো দারুণ ও আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে—যদিচ তার কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ মেলে না। সিন্ধুনদ অতি প্রবল বন্যার জন্য খ্যাত। এই বন্যায় বহু নগর বহু পল্লী নিশ্চিহ্ন হয়ে ভেসে যায়। অথবা আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে ক্রমে ক্রমে মাটি গুঁড়ো হয়ে ক্ষয় পেতে থাকে ও আবাদী জমি গ্রাস করে ফেলে মরুভূমির বালুরাশি। মোহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ থেকেই আমরা দেখতে পাই যে স্তরের পর স্তর বালি জমা হওয়ার ফলে বাড়ির ভিত্তিরেখা ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠেছে। অধিবাসীরা পুরাতন ভিত্তির উপর অধিকতর উঁচু করে বাড়িঘর তৈরি করতে বাধ্য হয়েছে। খননের পর কতকগুলি বাড়ির আকার দেখে মনে হয় সেগুলি হয়তো দ্বিতল কিংবা ত্রিতল ছিল—আসলে ভিত্তিরেখা যতই উচ্চতর হয়েছে দেওয়ালগুলিকে ততই উঁচু করে গেঁথে তোলা হয়েছে। একথা সুবিজ্ঞাত যে প্রাচীনকালে সিন্ধুপ্রদেশ উর্বর ও সমৃদ্ধ ছিল, কিন্তু মধ্যযুগ থেকে দেখা যায় যে এ প্রদেশের অধিকাংশ ভাগই মরুভূমি।

আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে অধিবাসীদের স্বভাব ও জীবনযাত্রা বদলে যাওয়া বহুলাংশে সম্ভব। কিন্তু এই অদল বদল চট করে আকস্মিকভাবে ঘটে না—ক্রমশই ঘটে।

অনেক কারণে মনে হয় এদেশের বহুবিস্তৃত নাগরিক সভ্যতা গঙ্গার মালভূমি কিম্বা তার থেকেও দূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। আবহাওয়া অদল বদলের ফলে এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের সামান্য অংশেই কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে থাকতে পারে। এবিষয়ে স্থির নিশ্চয় হবার মত কোনো তথ্য আমরা এখনও পাইনি। একদিকে যেমন এরূপ কয়েকটি নগর বালুকাস্তূপের নিচে প্রোথিত হয়েছে, অন্য দিকে তেমনি বালিতে চাপা পড়ে থাকার দরুনই এগুলি অবিকৃতভাবে রক্ষা পেয়েছে। অন্য অঞ্চলের শহরগুলি তাদের প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন সমেত কালে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। হয়তো ভবিষ্যতে যে পুরাতত্ত্ববিষয়ক আবিষ্ক্রিয়া ঘটবে তাতে এই লুপ্ত সভ্যতার সঙ্গে পরবর্তীকালের যোগ আরও নানাভাবে প্রকাশ পাবে।

সিন্ধুনদ প্রদেশের সভ্যতা ও পরবর্তীকালের ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা অব্যাহত অনুবর্তনের আভাস আছে কিন্তু মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে ছেদও আছে। এই যে ফাঁক এটা কেবল কালের দিক থেকে নয়, পরবর্তী যুগের সভ্যতার প্রকৃতির দিক থেকেও এই ছেদ একটা যেন পার্থক্যের সূচনা করেছে। গোড়াতেই লক্ষ্যগোচর হয় যে এই নূতন সভ্যতায় কৃষি একটা বড় স্থান পেয়েছিল, যদিচ শহরের অস্তিত্ব ছিল এবং এক প্রকার নাগরিক জীবনেরও পরিচয় মেলে। খুব সম্ভব কৃষির উপর এই প্রাধান্য দিয়েছিল নবাগত আর্য জাতি। বিদেশীয় আর্যরা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দলে দলে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে।

সিন্ধুসভ্যতার সময় থেকে প্রায় হাজার বছর পরে আর্যরা ভারতে এসেছিল—এইরূপ অনুমান করা হয়। সম্ভবত এই হাজার বছর কালের মধ্যেও উত্তর পশ্চিম দিক থেকে আর্যদের অনেক জাতি ও গোষ্ঠীর লোক মাঝে মাঝে ভারতে এসেছে। পরবর্তী-কালেও তারা এমনি ভাবেই এসেছে এবং প্রদেশের বিরাট মানবপরিবারের সঙ্গে একীভূত হয়ে মিশে গেছে। একথা বলা যেতে পারে সর্বপ্রথম আর্যদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংযোজন ঘটে দ্রাবিড়দের সঙ্গে—সিন্ধুনদ প্রদেশের সভ্যতা খুব সম্ভব এই দ্রাবিড়দেরই আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। এই সংযোজন বা সংশ্লেষণের ফলে ভারতীয় জাতিগুলি উদ্ভূত হয় এবং উভয় জাতির বিশেষত্বের যোগে মূলগত ভারতীয় সংস্কৃতি রূপ গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে আরো অনেক জাতি এসেছে এদেশে যেমন ইরানী, গ্রীক, পার্থিয়ান, ব্যাকট্রিয়ান, সীথিয়ান, হূণ, তুর্কি (ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে) আদিম খৃস্টান, ইহুদী ও জরথুস্ত্রপন্থীরা। এরা এসেছে, হয়তো জাতীয় জীবনে যৎসামান্য পরিবর্তনের সূচনা করেছে এবং শেষ পর্যন্ত দেশের লোকের সঙ্গে মিশে গেছে। ডড্ওয়েল বলেন : 'ভারতবর্ষ মহাসমুদ্রের মত সর্বগ্রাসী।' বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা ও পরধর্ম পরিবর্জনের মনোভাব সত্ত্বেও ভারতের একটা আশ্চর্য ক্ষমতা—সে ক্ষমতা হল বিদেশীয় জাতি ও সংস্কৃতিকে আপন করে নেবার আশ্চর্য ক্ষমতা। হয়তো এই কারণেই ভারত তার আপনার জীবনী শক্তিকে অব্যাহত রাখতে পেরেছে এবং পুনঃ পুনঃ নবযৌবনশক্তি জাতির জীবনে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে। মুসলমানেরাও এদেশে এসে এর প্রভাবে পড়ে অনেকখানি বদলে গেছে। ভিন্সেন্ট স্মিথ বলেন : 'পূর্বগামী

শক ও ইউয়েচি জাতির মত এই বিদেশীরা (মুসলমান তুর্কি) হিন্দু ধর্মের নিজস্ব করে নেবার আশ্চর্য শক্তির কাছে বার বার আত্মসমর্পণ করেছে এবং দ্রুত হিন্দু-ভাবাপন্ন হয়েছে।'

৩ : কি এই হিন্দুধর্ম ?

ভিনসেণ্ট স্মিথ থেকে যে-টুকু উপরে উদ্ধৃত হয়েছে তাতে তিনি যে বিশেষ শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন তাদের আমরা অনুবাদ করেছি, 'হিন্দুধর্ম' ও 'হিন্দুভাবাপন্ন'। আমার মনে হয়, এ-দুটি শব্দকে এভাবে ব্যবহার করা উচিত নয় যদি 'ভারতীয় সংস্কৃতি এই ব্যাপকতম অর্থে প্রয়োগ অভিপ্রেত না হয়। আজকাল এই শব্দ দুটি সঙ্কীর্ণতর অর্থে, বিশেষত ধর্ম সম্বন্ধে, প্রযুক্ত হয় বলে ভুলের সৃষ্টি করে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে 'হিন্দু' শব্দ একেবারেই পাওয়া যায় না। আমি শুনেছি, ভারতীয় পুস্তকের মধ্যে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর একখানি তান্ত্রিক গ্রন্থে এই শব্দের সর্ব-প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। সেখানে 'হিন্দু' একটি জাতিকে বুঝিয়েছে, কোনো ধর্মাবলম্বী লোকসংঘকে বোঝায়নি। শব্দটি অবশ্য বহু পুরাতন, কারণ আবেস্তা ও প্রাচীন পারস্য ভাষার গ্রন্থে এটিকে পাওয়া গেছে। তখন, এবং তার পরে হাজার বছর কি আরও দীর্ঘকাল ধরে, পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার লোকেরা ভারতবর্ষকে, বিশেষত সিন্ধু-নদের অপর দিকের অধিবাসীদিগকে, উল্লেখ করতে এই শব্দটি ব্যবহার করত। এটি যে 'সিন্ধু' শব্দ থেকে উৎপন্ন তা দেখেই বোঝা যায়, আর এই 'সিন্ধু' শব্দ যেমন পুরাতন কালে তেমনি আজও 'ইন্ডাস' নদের ভারতীয় নাম। এই 'সিন্ধু' শব্দ থেকেই হিন্দু ও হিন্দুস্থান, ইন্ডোস ও ইন্ডিয়া, শব্দগুলি পাওয়া গেছে। বিখ্যাত চীন দেশীয় পরিব্রাজক ই-সিং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখে গেছেন যে উত্তরখণ্ডের, অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার লোকেরা ভারত-বর্ষকে হিন্দু (সিন্-টু) বলত এবং তিনি আরও বলেছেন, "এ নামটি সাধারণভাবে প্রচলিত নয়; ভারতবর্ষের যোগ্যতম নাম হল 'আর্যদেশ'।" কোনো একটি বিশেষ ধর্মের আখ্যায় 'হিন্দু' শব্দের ব্যবহার অনেক পরে ঘটেছে।

আর্যধর্ম শব্দটি ভারতবর্ষে ধর্মের ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হত। ধর্ম বলতে সাধারণত যা বোঝায় প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ তার থেকে অনেক বেশি। এই শব্দ যে ধাতু থেকে উদ্ভূত তার অর্থ এক করে রেখেছে যে অন্তর্নিহিত যোগসূত্র, যে বিধানে তার অন্তর্বর্তী সত্তা সুসম্বন্ধ আছে, এ তাই। সেই আত্মপ্রতীতিকে ধর্ম বলা যায় যাতে নৈতিক বিধিনিষেধ, ন্যায়নিষ্ঠা এবং মানুষের সকল কর্তব্যবোধ এবং দায়িত্বজ্ঞান অন্তর্ভূক্ত হয়ে আছে। আর বৈদিক হোক বা না হোক, ভারতে উদ্ভূত সকল মতই আর্যধর্মের অন্তর্গত। যেমন বৌদ্ধেরা এবং জৈনেরা, তেমনি যারা বেদকে গ্রহণ করেছে তারাও, এই আর্যধর্মেরই অনুশীলন করেছে। বুদ্ধ তাঁর নির্বাণের পথকে 'আর্যপথ' আখ্যা দিয়েছিলেন।

প্রাচীন কালে, সেই সকল দর্শন, নৈতিক উপদেশ, এবং অনুষ্ঠানাদি, যা-কিছু

বেদ হতে গৃহীত বলে লোকে মনে করেছিল, বিশেষভাবে তাকেই বৈদিক ধর্ম নাম দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং যারা সাধারণভাবেও বেদ মানত তাদের ধর্মকে বৈদিক ধর্মের অন্তর্গত বলে মনে করা হত।

সনাতন ধর্ম বললে প্রাচীন ধর্ম বোঝায়। যে-কোনো পুরাতন ভারতীয় ধর্মমত, এমন কি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মও, সনাতন ধর্ম নামে অভিহিত হতে পারত কিন্তু এই আখ্যাটি বর্তমান সময়ে হিন্দুদের মধ্যেকার কয়েক সম্প্রদায় প্রাচীনপন্থীদ্বারা একরূপ একচেটিয়াভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে নিশ্চয়ই হিন্দুধর্ম, এমন কি বৈদিক ধর্মও বলা যায় না। এ-দুটিও ভারতে উদ্ভূত, এবং ভারতীয় জীবন, সংস্কৃতি ও দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। একজন ভারতীয় বৌদ্ধ অথবা জৈন সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় চিন্তা ও সংস্কৃতি থেকে সৃষ্ট, কিন্তু তবু বিশ্বাসে হিন্দু নয়। সুতরাং ভারতীয় সংস্কৃতিকে হিন্দু সংস্কৃতি বলা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। পবরর্তীকালে এই সংস্কৃতি ইসলামের সংস্পর্শে এসে পূর্বের মত আর নেই, কিন্তু তবু মূলত এবং বৈশিষ্ট্যে ভারতীয়ই আছে। বর্তমান সময়ে, এটি বহু দিকে পশ্চিম দেশের শ্রমশিল্পপ্রধান সভ্যতার প্রভাব অনুভব করছে; এখন ঠিক করে বলা যায় না এর ফলে কি দাঁড়াবে।

ধর্মবিশ্বাস হিসাবে হিন্দুধর্ম অস্পষ্ট; অনির্দিষ্ট এর রূপ, বহুমুখীন এর গতি। এর সংজ্ঞা নির্দেশ করা দুরূহ ব্যাপার। ধর্ম শব্দে যা বোঝায় সে অর্থে একে ঐ নাম দেওয়া যায় কি না সেকথা বলা কঠিন। এর অতীত ও বর্তমান রূপে বহু মত ও আচারাদি স্থান পেয়েছে। এগুলি এসেছে সমাজের উপর-নিচ সকল স্থান থেকেই, আর এদের মধ্যে কখনও কখনও বিরোধও দেখা গেছে। এর মূলগত কথাটা যেন, 'তুমিও বাঁচো আমিও বাঁচি।' মহাত্মা গান্ধী এর একটা সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করেছেন : আমাকে যদি কেউ হিন্দুধর্ম মত যে কি তা জিজ্ঞাসা করে তা হলে বলি, নির্বিরোধ উপায়ে সত্যের অনুসন্ধান কর। কোনো লোকের ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকতে পারে তবু সে নিজেকে হিন্দু বলতে পারে। অবিচলিতভাবে সত্যের অনুসরণ করাই হিন্দুধর্ম। হিন্দুধর্ম সত্যের ধর্ম। সত্যই ঈশ্বর। ঈশ্বরে অবিশ্বাস দেখা গেছে কিন্তু সত্যে অবিশ্বাস দেখা যায়নি।' গান্ধীজি বলেন সত্য ও নির্বিরোধিতার কথা। কিন্তু যাঁরা নিঃসন্দেহ রূপে হিন্দু এমন অনেকে বলেন যে নির্বিরোধ বলতে গান্ধীজি যা বোঝেন তা হিন্দুমতের অপরিহার্য কোনো অংশ নয়। তাহলে এই দাঁড়াল যে সত্যই হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক চিহ্ন। কিন্তু এও একেবারেই সংজ্ঞা হল না।

যদিচ পুরাকালের অনেক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ বহু চিন্তা ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষত্বের পরিচয় দেয়, তবু সেইকালের আলোচনায় এই সংস্কৃতিকে বোঝাতে 'হিন্দু' কি 'হিন্দুধর্ম' শব্দ ব্যবহার করা ভুল এবং অবাঞ্ছনীয়। বর্তমান সময়ে এই ব্যবহার আরও ভ্রমাত্মক। প্রাচীন ধর্মমত ও তত্ত্ববিদ্যা যতদিন মানুষের জীবন ব্যাপার হতে দূর না হয়ে তার সঙ্গে মিলিতভাবে ছিল এবং জগৎকে প্রত্যক্ষ করার বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গীরূপে কাজ করত, ততদিন এগুলি এবং ভারতীয় সংস্কৃতি একার্থবোধক ছিল।

কিন্তু যখন সকল প্রকার আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি নিয়ে ধর্ম অনমনীয় আকার ধারণ করল তখন তা সংস্কৃতি থেকে একদিকে একটু বেশিই হল এবং আর অন্যদিকে অনেকখানি কম হয়ে পড়ল। খৃষ্টধর্মাবলম্বী কি মুসলমান কেউ এ দেশে এলে নিজেকে ভারতীয় জীবনধারা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিল খাইয়ে নিত, কিন্তু ধর্মমতে অপরিবর্তিতভাবে খৃস্টান কি মুসলমানই থাকত। অর্থাৎ সে তখন নিজেকে ভারতীয় ভাবাপন্ন করে নিত, এবং ধর্ম পরিবর্তন না করে ভারতীয় হত।

আমাদের দেশ, সংস্কৃতি এবং আমাদের ঐতিহাসিক জীবনধারাকে 'ভারতীয় না বলে 'হিন্দী' বললেই ঠিক বলা হয়। হিন্দুস্থান শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ 'হিন্দ' হতে এই শব্দটি উৎপন্ন। পশ্চিম এশিয়ার দেশ, ইরান ও তুর্কি, ইরাক ও আফগানিস্থান, মিশর এবং অন্যত্রও ভারতবর্ষকে সকল সময়েই হিন্দ বলা হয়েছে, এবং এখনও বলা হয়, আর ভারতীয় সকল বিষয় ও বস্তুকে হিন্দী আখ্যা দেওয়া হয়। ধর্মের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই; একজন ভারতবর্ষীয় মুসলমান কি খৃস্টান, একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বীর মত হিন্দী নামের সমান অধিকারী। আমেরিকানরা সকল ভারতীয়কে 'হিন্দু' বলে, বেশি ভুল করে না; 'হিন্দী' শব্দ ব্যবহার করলে সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল হত। আক্ষেপের বিষয়, আমাদের দেশে 'হিন্দী' শব্দটি সংস্কৃত ভাষার দেবনাগরী অক্ষরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে আছে, সুতরাং একে এর স্বাভাবিক ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। হয়তো বর্তমান বাদানুবাদ যখন থেমে যাবে তখন এই শব্দটিকে পুনরায় এর মৌলিক অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারবে। আজকাল ভারতবর্ষীয়কে 'হিন্দুস্থানী' বলা হয়, আর এই শব্দটি অবশ্য হিন্দুস্থান শব্দ থেকে এসেছে। এ যেন একটা 'গালভরা' শব্দ—দীর্ঘ, কিন্তু 'হিন্দী' শব্দের মত ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে এর তেমন সম্পর্ক নেই। ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতিকে হিন্দুস্থানী আখ্যা দিলে সেটা অদ্ভুত শোনাবে।

আমাদের পরম্পরাগত সংস্কৃতিকে উল্লেখ করতে ভারতীয়, হিন্দী কি হিন্দুস্থানী, যে কোনো শব্দই ব্যবহার করা হোক না কেন, আমরা দেখতে পাই যে অতীতকালে, বিশেষভাবে ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞানসম্ভূত দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে, মানুষের মনে বহুকে সংশ্লেষণের দ্বারা এক করে নেবার গভীর আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছিল। এই আকাঙ্ক্ষাই ভারতের সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় উৎকর্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ পেয়েছে। বৈদেশিক কোনো কিছু এদেশে প্রবেশলাভ করলেই এখানকার সংস্কৃতি সতর্কতার সঙ্গে তার সম্মুখীন হয়ে নবতর সংশ্লেষণ দ্বারা তাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে নিয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় বারবার তার শক্তি নবীভূত হয়েছে; সংস্কৃতিতে নূতন সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে, যদিচ তার আপন মূলগত বৈশিষ্ট্যে বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এ-বিষয়ে সি. ই. এম. জোড লিখেছেন, 'ভারতবর্ষীয়েরা যে-কারণেই হোক, বরাবর বহু মানব ও তাদের বহু চিন্তাকে সংশ্লিষ্ট করে বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের সৃষ্টি করবার শক্তি ও স্পৃহা দেখিয়েছে। এইটিই বাস্তবিক মানবসমাজের কাছে ভারতবর্ষের বিশেষ দান।'

৪ : প্রাচীনতম বিবরণ : ধর্মশাস্ত্র এবং পৌরাণিক কাহিনী

সিন্ধুনদ জনপদের সভ্যতা আবিষ্কৃত হবার আগে বেদগুলিকেই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতম বিবরণ বলে মনে করা হত। বৈদিক যুগের তারিখ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক বিরোধ আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা পরের তারিখ দেন, আর ভারতীয় পণ্ডিতেরা অনেক আগেকার তারিখ দিয়ে থাকেন। এটা আশ্চর্য যে ভারতীয়েরা যতদূর সম্ভব প্রাচীন কালের দিকে পিছিয়ে গিয়ে আমাদের সংস্কৃতির গুরুত্ব বাড়াতে চান। অধ্যাপক উইণ্টারনিটস মনে করেন বৈদিক সাহিত্যের আরম্ভ অনুমান ২,০০০ কি ২,৫০০ খৃস্টপূর্ব অব্দে হয়ে থাকবে। এই তারিখটা মোহেঞ্জোদারো যুগের বেশ কাছাকাছি।

অধিকাংশ পণ্ডিতদের মতে ঋগ্বেদের সূক্তগুলি খৃস্টপূর্ব ১,৫০০-এর কাছাকাছি রচিত হয়েছিল, কিন্তু মোহেঞ্জোদারোর খননের পর থেকে এই সকল প্রাচীন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রগুলির অনুমিত তারিখ আরও পিছিয়ে দেবার সংকল্প লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যথার্থ তারিখ যাই হোক না কেন, এটা সম্ভব যে এই সাহিত্য গ্রীক কি ইহুদীদের সাহিত্য অপেক্ষা পুরাতন। মানবমনের সর্বাপেক্ষা পুরাতন কথা যা আমরা পাই তার কিছু কিছু আমাদের দেশের ধর্মগ্রন্থে আছে। ম্যাক্স্ মুলার একে বলেছেন, 'আর্য মানবের প্রথম উচ্চারিত বাক্য।'

আর্যেরা যখন উর্বর ভারতভূমিতে পৌঁছেছিলেন তখন তাঁদের আনন্দ প্রকাশ পেয়েছিল বৈদিক গানে। ইরানের আবেস্তা যে ভাব-ভাণ্ডার থেকে উৎপত্তি লাভ করেছিল, আর্যেরা তাঁদের ধারণাগুলিকে আমাদের দেশে নিয়ে এসেছিলেন সেখান হতেই, আর এখানে সেগুলিকে বিশদভাবে রচনা করে নিয়েছিলেন। বেদের ভাষায় আবেস্তার ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। এরূপ মতও প্রকাশ করা হয়েছে যে, ভাষায় বেদকে মহাকাব্য রচনার সংস্কৃতের যতটা কাছাকাছি বলে মনে হয় আবেস্তা বেদের তার থেকেও বেশি কাছে। ভক্তেরা আপন আপন ধর্মশাস্ত্রের অনেকাংশকে অভ্রান্ত আপ্ত বাক্য বলে মনে করেন। এরূপ অবস্থায় বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্রগুলির আলোচনা কেমন করে করা চলে? কোনো শাস্ত্রকে বিশ্লেষণ করলে কি সমালোচনা করলে, অথবা মানবীয় গ্রন্থ বলে বিবেচনা করলে সেই ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তি আমাদের অপরাধী করতে পারেন। তবু অন্য কোনো উপায়ে এ আলোচনা সম্ভব নয়।

আমি সর্বদাই ধর্মপুস্তক পড়তে ইতস্তত করেছি। এদের সম্বন্ধে দাবি করা হয় যে এরা প্রত্যেকটি সমগ্রভাবেই অভ্রান্ত। এ-কথায় আমার আস্থা নেই। ধর্মাচরণের বাইরের রূপ যা দেখেছি তারপর তার উৎপত্তিবিষয়ে আলোচনা করার আগ্রহ অনুভব করিনি। তবু আমাকে এই সকল পুস্তক নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়েছে, কারণ এ-বিষয়ে অজ্ঞতা তো গুণ বলে বিবেচিত হতে পারে না; তা ছাড়া, অনেক সময় এ অজ্ঞতাটাকে একটা অন্তরায় বলে অনুভব করতে হয়েছে। আমার জানা ছিল যে এই পুস্তকগুলির মধ্যে কোনো কোনোটি মানবসমাজে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে। এরূপ

যাদের প্রভাব তাদের নিশ্চয়ই কোনো নিজস্ব গুণ ও শক্তি আছে—কোনো জীবনপ্রদ উৎস হতে তারা শক্তিলাভ করেছে। ঐগুলির অনেক অংশ আমার কাছে দুরূহ বলে বোধ হয়েছে;—যতই চেষ্টা করি না কেন মনে তেমন আগ্রহ জাগাতে পারিনি। তবু কোনো কোনো অংশের মনোহারিত্ব আমাকে অধিকার করে রেখেছে। কখনও কখনও একটা কথা কি একটা বাক্য হঠাৎ চোখে পড়ায় আমার মনে বিদ্যুৎ খেলে গেছে, আর আমি তখন প্রকৃত মহত্ত্বের সান্নিধ্য অনুভব করেছি। বুদ্ধ কি খৃস্টের কোনো কোনো কথা গভীর অর্থসম্পদ নিয়ে আমার কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং মনে হয়েছে, দু হাজার বছর কি আরও অধিক কাল পূর্বে, প্রথম ব্যক্ত হবার সময়ে এগুলি যেমন উপযোগী ছিল আজও তেমনি আছে। তাদের মধ্যে সত্যের যে রূপ দেখেছি তা না দেখে উপায় ছিল না, তা চিরন্তন, স্থান-কাল তাকে স্পর্শ করতে পারে না। যখন কিছু পড়েছি সক্রেটিসের বিষয়ে, কিম্বা চীনের দার্শনিকদের কথা, যখন উপনিষদ্‌গুলি কি ভগবদ্‌গীতায় মন দিয়েছি, তখনও সময়ে সময়ে এই প্রকার অনুভূতি লাভ করেছি; তত্ত্বকথায় কি ক্রিয়াকর্মে আমি আগ্রহ অনুভব করিনি; অন্যান্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে আমার সমস্যাগুলির কোনো যোগ ছিল না, সুতরাং সেগুলিও আমার আলোচ্য হয়নি। অনেক কিছুই পড়েছি, হয়তো তাদের অন্তর্নিহিত অর্থ আমার কাছে বোধগম্যই হয়নি, এবং অনেক সময় দ্বিতীয়বার পড়ার পর তা বুঝতে পেরেছি। গূঢ় অংশগুলি বুঝতে তেমন চেষ্টাই করিনি, আর আমার কাছে যেগুলির বিশেষ কোনো অর্থ নেই সেগুলিকে এড়িয়ে গেছি। দীর্ঘ টীকা-টিপ্পনী এবং শব্দার্থ প্রকাশ বাদ দিয়েছি। কোনো গ্রন্থ পরম পবিত্র, একেবারে অভ্রান্ত, এরূপ ভাব নিয়ে তা পড়তে পারিনি। বাস্তবিক, এরূপ ক্ষেত্রে সে গ্রন্থের বিষয়বস্তু আমার মনে স্থান পায়নি। যখন কোনো গ্রন্থ কোনো বহুদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তি লিখেছেন বলে ধরে নিয়েছি, অর্থাৎ যে-ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার মনে জ্ঞান কি নিশ্চয়তা নেই, তাঁরই কোনো অবতার বা মুখপাত্রের লেখা মনে করে নেওয়ার কথা ওঠেনি, তখন শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে তা পড়তে পেরেছি।

এরূপ যদি দেখা যায় যে, একজন মানুষ মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উচ্চ শিখরে উঠে কোনো ঐশ্বরিক শক্তির মুখপাত্র মাত্র না হয়ে, অন্য সকলকেও উচ্চে তুলে নেবার চেষ্টা করছেন, তাহলে এর থেকে সুন্দর আর কিছু নেই। কোনো কোনো ধর্মসংস্থাপক পুরুষের কথায় মনে বিস্ময় জাগে, কিন্তু আমার চোখে তাঁদের গৌরব লোপ পায় যদি তাঁরা যে মানব এ কথা ত্যাগ করি। প্রতিভূ হয়ে অন্যের কথা প্রচার করার বদলে, মানুষকে চিত্তে ও তেজে উন্নতিলাভ করতে দেখলে আমার অন্তর উৎসাহিত ও আশান্বিত হয়।

পৌরাণিক কাহিনী সম্বন্ধেও আমার মনের প্রতিক্রিয়া এইরূপ। এগুলিকে প্রকৃত ঘটনা বলে বিশ্বাস করলে ব্যাপারটা অসঙ্গত ও হাস্যকর হয়ে উঠবে। আর এই বিশ্বাস-টুকু ত্যাগ করলে, এই কাহিনীগুলিকে নূতন আলোয়, নূতন এক সৌন্দর্যে দেখা যাবে—যেন সুসমৃদ্ধ কল্পনা অপরূপ শোভায় পুষ্পিত হয়ে উঠেছে। মানুষ আর

গ্রীক দেবদেবীর গল্পে বিশ্বাস করে না, সেইজন্যে আমরা তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারি—এইসব গল্প আমাদের মানসিক উত্তরাধিকারের অন্তর্গত। আর যদি এগুলিকে বিশ্বাস করতে হত তাহলে কি বোঝাই না হয়ে দাঁড়াত। এই বোঝার চাপে পীড়িত হয়ে আমরা অনেক সময় কাহিনীগুলির সৌন্দর্য দেখতে পেতাম না। আমাদের পুরাণ অধিকতর সমৃদ্ধ, বিশাল, সৌন্দর্যশালী ও অর্থপূর্ণ। আমি অনেক সময়ে ভাবি, কি আশ্চর্য ছিলেন তাঁরা যাঁরা এই সকল উজ্জ্বল স্বপ্ন ও মনোরম কল্পনাকে রূপ দান করেছেন; আরও ভাবি, মনন ও উদ্ভাবনী শক্তির কোন সুবর্ণ খনি থেকে এগুলিকে তাঁরা খনন করে তুলেছেন।

শাস্ত্র মানবমন হতেই উৎপন্ন, এই বিচারে স্মরণ করতে হবে সেই যুগকে যখন তা লেখা হয়েছিল, কি পরিবেষ্টন ও মানসিক আবহাওয়ায় তা বৃদ্ধি পেয়েছে, আর আমাদের থেকে কতদূর তার যুগ চিন্তা ও অভিজ্ঞতা। যে-সকল আচার অনুষ্ঠান এবং ধর্মাচরণের রীতিপদ্ধতিদ্বারা শাস্ত্র আচ্ছন্ন হয়ে আছে সেগুলিকে ভুলতে হবে, আর যে সামাজিক পটভূমিকায় তা বিস্তৃতি লাভ করেছে তাকে মনের পথে আনতে হবে। মানবজীবনের অনেক সমস্যাকে চিরস্থায়ী বলে মনে হয়, যেন অনন্তের স্পর্শ আছে সেগুলিতে, আর এই কারণে প্রাচীন গ্রন্থ সম্বন্ধে স্থায়ী আগ্রহের প্রয়োজন আছে। এ-ভিন্ন আরও অনেক সমস্যা আছে যা গ্রন্থ লিখিত হবার কালেই আবদ্ধ, সুতরাং সেগুলির সঙ্গে আমাদের জীবনের বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই।

৫ : বেদ

অনেক হিন্দু বেদগুলিকে প্রত্যাদিষ্ট আপ্তবাক্য বলে মনে করেন। এ একটা পরিতাপের বিষয়, কারণ এজন্যেই তাদের ভিতরকার কথাটি ধরা পড়ে না। সেটি হল, কেমন করে মানুষের মন চিন্তনের সূত্রপাতের পর ধাপেধাপে বিকশিত হয়েছে তারই কথা। আর কি আশ্চর্যই ছিল এই মানুষগুলির মন! বেদ শব্দ পাওয়া গেছে 'বিদ্' ধাতু থেকে, যার অর্থ 'জানা'। বেদগুলির উদ্দেশ্য ছিল তখনকার দিনে যা-কিছু জানা গিয়েছিল, অর্থাৎ যে-জ্ঞান লাভ করা হয়েছিল, তা একত্র সংগ্রহ করে রাখা। তাতে আমরা অনেক কিছুই মিশ্রিতভাবে পাই, যেমন স্তোত্র, প্রার্থনা, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান পদ্ধতি, যাদুবিদ্যা আর চিত্তাকর্ষক প্রকৃতিগাথা। বেদে পৌত্তলিকতা নেই, দেবদেবীর মন্দিরেরও কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। বেদগুলি ব্যাপ্ত হয়ে আছে আশ্চর্য শক্তি ও জীবনের পরিচয়ে। বৈদিক যুগের প্রথম দিকে জীবন উপভোগ করার উপরে মানুষের এতই ঝোঁক ছিল যে আত্মার প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া হয়নি। মৃত্যুর পরে কোনো না কোনো প্রকারের অস্তিত্ব আছে তখনকার লোকের মনে এইরূপ একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল।

তারপর ক্রমে ক্রমে ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা বিকাশলাভ করেছে। প্রথমে পাওয়া যায় গ্রীকদের অলিম্পিয়া নামে কাল্পনিক স্বর্গলোকের অধিবাসীদের ন্যায় শক্তিশালী,

বীরভাবাপন্ন দেবতাদের; তারপর আসে একেশ্বরবাদ; আর তারও পরে, কতকটা একেশ্বরবাদের সঙ্গে মিশ্রিতভাবে, অদ্বৈতবাদের ধারণা প্রকাশ পায়। মননপ্রভাবে বেদকারগণের চিত্ত ঘুরে বেড়ায় বহু অজ্ঞাত ও অদ্ভুত রাজ্যে; এরপর চলে প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে গভীর চিন্তা; তারপর আসে জিজ্ঞাসা, প্রকৃত জ্ঞান লাভ করার আকাঙ্ক্ষা। এই ক্রমবিকাশে শত শত বৎসর কেটে যায়, আর যখন আমরা বেদের শেষে, অর্থাৎ বেদান্তে, পেঁছাই- তখন পাই উপনিষদ্ দর্শনশাস্ত্র—বেদান্ত দর্শন।

বেদগুলির প্রথমটির নাম ঋগ্বেদ। এই গ্রন্থখানি সম্ভবত সমগ্র মানবসমাজের প্রাচীনতম পুস্তক। এতে আমরা পাই মানবমনের প্রথম উচ্ছ্বাস, কবিতার দীপ্তি, আর প্রকৃতির সৌন্দর্যে ও রহস্যে মানবের উল্লাস। ডক্টর ম্যাক্‌নিকলের মতে, 'এই আমাদের জগৎ, আর এতে মানুষের জীবনযাত্রা চলছে— এ সব কিসের ব্যঞ্জনা দিচ্ছে, কি প্রকাশ করতে চায়, তা আবিষ্কার করার জন্যে লোকে বহু যুগ ধরে বহু প্রয়াস দেখিয়ে এসেছে। ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলিতে আমরা এই সকল উদ্যমের বিবরণ লিপিবদ্ধ দেখতে পাই।......ভারতবর্ষ এই যে অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েছে, কোনো দিন তাতে বিরত হয়নি।'

এই ঋগ্বেদ লেখা হবার আগে সভ্যতার অনেক যুগ কেটেছে, আর সেই সময়ে সিন্ধুনদ জনপদ ও মেসোপোটেমিয়ার সভ্যতা গড়ে উঠেছে। সুতরাং ঋগ্বেদের উৎসর্গপত্রে যদি লেখা থাকে, 'নম ঋষিভ্যঃ পূর্বজেভ্যঃ পথকৃৎভ্যঃ'—'আমাদের সত্যদ্রষ্টা, পথপ্রদর্শক পূর্বপুরুষগণের উদ্দেশ্যে' তা হলে যথাযোগ্য হয়।

এই বৈদিক স্তোত্রগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "আপন অস্তিত্বকে মানব বিস্ময় ও সম্ভ্রমের সঙ্গে দেখেছে, আর এই ভাব কবিতায় প্রকাশ পেয়ে এই সকল স্তোত্রে সংগৃহীত হয়েছে। সভ্যতার সূত্রপাতে, মানবের সবল ও সরল চিত্ত জেগে উঠে জীবনে নিহিত অন্তহীন রহস্য সকল অনুভব করেছিল। এই সকল লোকেরা যে সর্বভূতে ও নৈসর্গিক শক্তিতে দেবত্ব আরোপ করেছিলেন তা সরল বিশ্বাসেরই ফল, আর এই বিশ্বাসে যে সাহসের ও আনন্দ উপভোগের পরিচয় ছিল তা হতে বোঝা যায় যে রহস্যের অনুভূতি জীবনকে মুগ্ধই করেছিল, তার উদ্ভেদসাধন করতে না পারার অকৃতকার্যতায় মানুষ মুহ্যমান হয়নি। একটা জাতির ধর্মবিশ্বাস বাস্তব জগতের বিসংবাদপূর্ণ বিভেদে আচ্ছন্ন না হয়ে আলোক লাভ করেছে আপন বোধজাত অভিজ্ঞতায় যেমন 'সত্য এক, (যদিচ) জ্ঞানীরা তাকে বহুনামে অভিহিত করেন'— 'একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'।"

এই অন্বেষী মনোবৃত্তির পরাকাষ্ঠা দেখি যখন বেদরচয়িতা তাঁর জ্ঞানপ্রসূত দ্বিধা-সন্দেহ থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রার্থনা জানান "শ্রদ্ধে শ্রদ্ধাপয়ে হ নঃ"—"হে শ্রদ্ধা আমার চিত্তে শ্রদ্ধার বোধ জাগ্রত কর।" আরও গভীর প্রশ্নের অবতারণা দেখি সৃষ্টির সূচনা সম্বন্ধে লিখিত কয়েকটি সূক্তে। ম্যাক্‌স্ মুলার এই সৃষ্টি-সংগীতের নাম দিয়েছেন—"অজানিত দেবতার প্রতি"—"অজ্ঞাতে পরব্রহ্মাণি"। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল থেকে এই সূক্তগুলি এখানে উদ্ধৃত করছি।

১। তখন যা নেই, তাও ছিল না, যা আছে তাও ছিল না। পৃথিবী ছিল না, দূরবিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কার আশ্রয় ছিল? অতল গভীর জল কি তখন ছিল?

২। তখন মৃত্যু ছিল না অমরত্বও ছিল না। রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুরসহকারিতা ব্যতিরেকে নিশ্বাস প্রশ্বাস-যুক্ত হয়ে জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

৩। সর্বপ্রথম অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও চতুর্দিক জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তুদ্বারা সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মালেন।

৪। সর্বপ্রথম মনের উপর কামের প্রভাব হল, তা থেকে সর্বপ্রথম উৎপত্তি কারণ নির্গত হল। বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধি দিয়ে আপন হৃদয়ে পর্যালোচনার সাহায্যে অবিদ্যমান বস্তুকে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি স্থান নিরূপণ করলেন।

৫। হয়তো ধা পুরুষেরা উদ্ভূত হলেন, মহিমা সকল উদ্ভূত হল। তাঁদের রশ্মি বামে দক্ষিণে ঊর্ধ্বে নিম্নে বিস্তারিত হল। নিম্নদিকে থাকল স্বধা, প্রয়তি থাকলেন ঊর্ধ্বদিকে।

৬। কেই বা প্রকৃত তথ্য জানে? কেই বা বর্ণনা করবে কোথা হতে এ সকল জন্ম নিল, কোথা হতে এই সব বিচিত্র সৃষ্টি সম্ভূত হল। দেবতারা এই সব নানা সৃষ্টির পর আবির্ভূত হয়েছেন। কোথা হতে এ সব সম্ভব হল তা কেই বা জানে?

৭। এই বিচিত্র সৃষ্টি যে কোথা থেকে হল, কি হতে হল, কে সৃষ্টি করেছেন কিংবা করেননি—এই সব প্রশ্নের উত্তর তিনিই জানেন যিনি এই সৃষ্টির প্রভু স্বরূপ হয়ে পরমধামে বিদ্যমান। হয়তো তিনিও জানেন না।

৬ : জীবনকে স্বীকার ও অস্বীকার

এই হল প্রাচীনকালে মানবমনের নানা প্রচেষ্টার আরম্ভ। এ হতেই নিঃসৃত হয়ে প্রবাহিত হয়েছে চিন্তা ও দর্শন, জীবন, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের স্রোতস্বতীগুলি; তাদের বিস্তৃতি ও আয়তন দিনদিন বৃদ্ধি পেয়েছে, কখনও বা দেশকে প্লাবিত করে

যেন উৎকর্ষ বিছিয়ে দিয়েছে। যে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে তার মধ্যে কখনও কখনও তাদের গতির দিক পরিবর্তন ঘটেছে, কখনও বা সেগুলি ক্ষীণও হয়েছে, তবু তাদের বিশেষ পরিচয়টি অক্ষুণ্ণ থেকে গেছে। এ হতেই পারত না যদি টিকে থাকার শক্তি তাদের নিজেরই না থাকত। অবশ্য এই বর্তে থাকাটাকে যে একটা সদ্গুণের লক্ষণ বলে ধরে নিতেই হবে তা নয়; এটা অবরুদ্ধ শক্তি ও হীনতা প্রাপ্তির লক্ষণ হতে পারে, আর এরূপটা ভারতে অনেকদিন ধরেই ঘটছে। এটা অবশ্য একটা গুরুতর বিষয়, এবং একে গুরুতর ভেবেই আমাদের এর সম্মুখীন হতে হবে, বিশেষত বর্তমান সময়ে যখন মনে হয় আমরা চোখের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি, যুদ্ধ ও সঙ্কট বারবার উপস্থিত হয়ে একটি উন্নত ও গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতার সর্বনাশ সাধন করছে। যুদ্ধ একটা ধাতু গলাবার মুচির মত; আজ তাতে বহু বিষয় নিক্ষেপ করে গলান চলছে। আমরা আশা করছি এর থেকে, কি পশ্চিম কি পূর্ব উভয়ের জন্যেই কল্যাণকর কিছু পাওয়া যাবে, কিছু যাতে মানবজাতি এখন পর্যন্ত যে সাফল্য অর্জন করেছে তা রক্ষা পাবে, আর সেগুলির সঙ্গে মিলিত হয়ে দেখা দেবে এতদিন আরও যা পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পাওয়া হয়নি। কিন্তু এই যে বারংবার বহুদেশব্যাপী ধ্বংসকার্য চলছে কেবল মানুষের প্রাণ ও সম্পত্তির নয়, তার জীবনের গূঢ় অর্থ ও মর্যাদায়ও যে অবসান ঘটছে, সর্বনাশেই এর শেষ হবে না, আরও কিছু সূচনা এর আছে। বহুদিকে যে উন্নতি দেখা গেছে তা বিস্ময়ের বিষয়, এবং পূর্বে যা সম্ভব বলে স্বপ্নেও ভাবা যায়নি এমন সব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, সেইভাবেই, শ্রেষ্ঠতা বিচারের মাপকাঠিটাও বড় হয়েছে। তবুও যখন ধ্বংসকার্য চলছে, এ প্রশ্ন মনে আসে, এই যে সভ্যতা, শিল্প যাতে এতই উন্নতিলাভ করেছে, এতে কি এমন কোনো অপরিহার্য উপকরণের অভাব আছে যে কারণে আত্মঘাতনের বীজ এর মধ্যেই থেকে গেছে?

বিদেশীর প্রভুত্বাধীনে যে দেশ এসেছে সেখানকার লোকেরা বিগতদিনের স্বপ্ন দেখে বর্তমানকে এড়াতে চায়, আর পুরাতন গৌরব স্মরণ করে সান্ত্বনা লাভ করে। আমাদের অনেকেই এই অতিশয় ক্ষতিকর খেলা খেলে বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দেয়। ঠিক এমনতর আর একটা আপত্তিকর অভ্যাস আমাদের আছে, সে হল এই যে আমরা মনে করি অন্য সকল বিষয়ে অবনত হলেও আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমরা এখনও বহু উচ্চ স্থান অধিকার করে আছি। আধ্যাত্মিকই হোক, বা আর যে কোনো প্রকারেই হোক, কোনো মহত্ত্বকেই স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধার অভাবের উপর অথবা অনাহার ও দুঃখ-দারিদ্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করা যা না। আমার মনে হয়, সকল দেশেই, দরিদ্র ও ভাগ্যহীনেরা যদি বিপ্লববাদী হয়ে না ওঠে তাহলে পরলোকের চিন্তা করতে থাকে, কারণ এ জগৎটা বাস্তবিক তাদের জন্য নয়। পরাধীন লোকদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা খাটে।

কোনো মানুষ যখন পরিণত অবস্থা লাভ করে তখন কেবল বাইরের জগতে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়ে তৃপ্তিলাভ করতে পারে না। সে এ ছাড়া মানসিক সন্তোষ চায় এবং সে সন্তোষ মনস্তত্ত্বসম্মত হওয়াও আবশ্যক। একথা যেমন পরিণত ব্যক্তি সম্বন্ধে

সত্য, তেমনি সেইরূপ জাতি এবং সভ্যতা সম্বন্ধেও সত্য। প্রত্যেক সভ্যতা ও প্রত্যেক জাতিতে এই বাহির ও ভিতরের দুটি জীবনধারা পাশাপাশি বহমান দেখা যায়। যে-ক্ষেত্রে এই ধারা দুটি মিলিত হয়ে চলে কিংবা কাছাকাছি প্রবাহিত হতে থাকে, সে-ক্ষেত্রে একটা বিশেষ সামঞ্জস্য ও স্থায়িত্বের পরিচয় মেলে। কিন্তু এদের মধ্যে দূরত্ব উপস্থিত হলে যে বিরোধ ও সংকট দেখা দেয় তাতে মন ও আত্মা গভীর পীড়া লাভ করে।

ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলির সময় হতে জীবনযাত্রার ও চিন্তার ধারা দুটির ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে দেখি, এ-দুটি বহির্জগতের বিষয়ে পূর্ণ, প্রকৃতির সৌন্দর্য ও রহস্যে ভরপুর, প্রাণে উৎফুল্ল ও শক্তিতে উচ্ছল। অলিম্পাসের দেবদেবীদের মত এখানকার দেবদেবীরাও চরিত্রে মানবীয়; তাঁরা স্বর্গ থেকে নেমে এসে মানব-মানবীর সঙ্গে মেলামেশা করেন, দেবতা ও মানুষের কোনো বাঁধাবাঁধি পার্থক্যের রেখা টানা হয়নি। তারপর মননের পালা; এইবার জিজ্ঞাসা জাগল, আর অতীন্দ্রিয় লোকের রহস্য ঘনিয়ে এল। জীবনে এখনও প্রাচুর্যের লক্ষণ বিদ্যমান, কিন্তু বাইরের বিষয় থেকে দৃষ্টি ফিরতে আরম্ভ করেছে; ততই অনাসক্তি আসছে যতই এমন বিষয়ে মন আকৃষ্ট হচ্ছে যা দেখা যায় না, শোনা যায় না, অনুভবও করা যায় না। এমন কেন হচ্ছে? বিশ্বের মধ্যে কি একটা উদ্দেশ্য নিহিত আছে? যদি থাকে, কেমন করে তার সঙ্গে মানুষের জীবনকে একসুরে বাঁধা যায়? আমরা কি দৃশ্য জগৎ ও অদৃশ্য জগতের মধ্যে ঐক্যের সম্বন্ধ ঘটিয়ে তুলতে পারি, এবং তার দ্বারা কি সত্যভাবে জীবন যাপন করার উপায় লাভ করতে সমর্থ হওয়া যায়?

ভারতবর্ষে, এবং অন্যত্রও, আমরা দেখতে পাই, এই দুটি কর্ম ও চিন্তার ধারা—একটি জীবনকে গ্রহণ করার, অপরটি জীবন থেকে বিরতির—পাশাপাশি বিকাশলাভ করেছে, এবং বিভিন্ন যুগে কখনও বা একটির উপর, কখনও বা অপরটির উপর, জোর দেওয়া হয়েছে। তবু এই সংস্কৃতির মূলের কথাটি এ নয় যে পরলোকই সব কিংবা ইহলোক সারহীন। দার্শনিক ভাষায় এই জগৎকে 'মায়া', অর্থাৎ সাধারণের ভাষায় ভ্রান্তি, আখ্যা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু শব্দটি নিরপেক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, চরম সত্য সম্বন্ধে যে-ধারণা আছে (কতকটা প্লেটোর 'সত্যের ছায়া'র মত) তার সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, এবং জগৎকে বাস্তবিক, অর্থাৎ তা যেমনটি তেমনি ভাবেই গ্রহণ করা হয়েছে—তাতে জীবনযাপন করা, ও জীবনের বহু সৌন্দর্য উপভোগ করা, সবই স্বীকৃত হয়েছে। সেমেটিক সংস্কৃতির যতটুকু আমরা তা থেকে উদ্ভূত ধর্মের রূপ দেখে জানতে পারি, তাতে মনে হয় এই সংস্কৃতিতে বিশেষভাবে পরলোকবাদ প্রকাশ পেয়েছে। আদি খৃস্টীয় ধর্মে তো তা স্পষ্টই দেখা যায়। টি. ই. লরেন্স্ বলেন, "সেমেটিক ধর্মমতগুলি, টিকুক বা না টিকুক তাদের মূলের কথাটি ছিল জগতের অসারতা।" আর এজন্যই চলত কখনও বা প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া, আবার কখনও বা তাকে দমন করা।

ভারতবর্ষে, যখনই তার সভ্যতা বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে, তখনই প্রকাশ পেয়েছে

প্রাণে ও প্রকৃতিতে নিবিড় আনন্দ, জীবনযাপনে সুখ এবং শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য, গীত, নৃত্য, কলা অভিনয় প্রভৃতির উন্নতি; এমন কি যৌনসম্বন্ধ বিষয়ের তথ্য সংগ্রহে অতিরিক্ত আগ্রহও দেখা গেছে। এ-কথা ভাবাই যায় না যে একটা সংস্কৃতি পরকালের সারবত্তা বা ইহকালের অসারবত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েও এই সকল সতেজ ও বৈচিত্র্যময় জীবনের পরিচয় দিতে পারে। বাস্তবিক, পরলোকের চিন্তার ভিত্তিতে গঠিত সংস্কৃতি হাজার হাজার বছর ধরে বর্তে থাকতে পারত না।

তবে কতকগুলি লোক ভেবেছেন যে ভারতীয় চিন্তা ও সংস্কৃতিতে ইহজীবন অস্বীকৃতই হয়েছে, স্বীকৃত হয়নি। আমার মনে হয়, সকল পুরাতন ধর্ম ও সংস্কৃতিতে এই দুটি কথা অল্পাধিক পরিমাণে আছে। ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমগ্রভাবে বিচার করলে মনে হয় তাতে জীবনকে অস্বীকার করার কথা কখনওই জোর পায়নি, যদিচ তার কোনো কোনো দর্শনশাস্ত্রে এরূপ হয়েছে বলে দেখা যায়। কিন্তু খৃস্টধর্মে যতটা হয়েছে তত নয়। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে এ-কথা জোর পেয়েছিল। ভারতেতিহাসের কোনো কোনো ভাগে দেখতে পাই যে সংসার থেকে বহু লোক সরে গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বহু সংখ্যক ব্যক্তির বৌদ্ধ বিহারে যোগ দেওয়ার কথা উল্লেখ করা চলে। জানি না, কি কারণে এটা ঘটেছিল। মধ্য যুগে, ইউরোপে, যখন এই বিশ্বাস প্রসার লাভ করেছিল যে জগতের ধ্বংস নিকট হয়েছে তখন এমন ঘটনা ঘটেছে যাতে সংসার-বিমুখতা এদেশের মতই কি তার থেকেও বেশি প্রকাশ পেয়েছে। হয়তো রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে মন যখন ব্যর্থতায় ভরে ওঠে তখন সংসারবিরতি কিংবা সংসার ত্যাগের ভাব জাগ্রত হয়, অথবা বল পায়।

বৌদ্ধধর্ম আপন অনুমানপ্রধান মতবাদ সত্ত্বেও কার্যত সকল বিষয়েই চরম পথ এড়িয়ে চলে। এ মত মধ্যপথ নেবার পরামর্শ দেয়। নির্বাণকে অনেকেই একপ্রকার শূন্যতার ভাব বলে মনে করেন, কিন্তু এ আদৌ তা নয়। নির্বাণ যে অবস্থার নাম তা সদর্থক, কিন্তু মানব মনের অগম্য হওয়ায় নঙর্থক শব্দের দ্বারা তাকে প্রকাশ করতে হয়। বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় চিন্তা ও সংস্কৃতি থেকে ভারতীয় আদর্শেই উদ্ভূত। এ যদি জীবনকে অস্বীকার করার মতমাত্র হত তাহলে পৃথিবীতে যে বহু কোটি বৌদ্ধধর্ম-বিশ্বাসী লোক আছে তাদের জীবনে সেই ধরনের পরিণতি দেখা যেত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে, বৌদ্ধধর্মপ্রধান দেশগুলিতে এর বিপরীত প্রমাণ বহুলপরিমাণে দেখা যায়; জীবনকে স্বীকার করাটা কতদূর ফলপ্রসূ হতে পারে তারই দৃষ্টান্ত দেখি চীনদেশের লোকের মধ্যে।

ভারতীয় চিন্তায় সকল সময়েই জীবনের পরম উদ্দেশ্যটির উপর জোর দেওয়া হয়ে আসছে। এদেশের সংস্কৃতি কোনো দিন জীবনের অতীন্দ্রিয় দিকটি ভুলতে পারেনি, এবং সেইজন্যেই জীবনকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করলেও তার দাস হতে বরাবরই অস্বীকার করেছে। আমাদের যেন বলছে, কর্মে তোমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে আনন্দ লাভ কর, কিন্তু নিজেকে এই সবের উর্ধ্বে রেখ, আর ফলের জন্য ব্যাকুল হয়ো না। এই প্রকারে, জীবনে এবং কর্মে লিপ্ত থেকেও আসক্তিশূন্য

হওয়ার উপদেশ আমরা পেয়েছি, সেগুলি হতে বিরত থাকার উপদেশ নয়। এই আসক্তিশূন্যতার ভাব ভারতীয় চিন্তা ও দর্শনে, যেমন অন্যান্য দর্শনেও, ছড়িয়ে আছে। এই কথাটির আর একটা অর্থ হল এই যে দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের মধ্যে সমতা ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হবে, কারণ যদি দৃশ্য জগতের কর্মে অতিরিক্ত আসক্তি জন্মে, তাহলে অন্য জগৎকে ভুলে যেতে হয়—তার কথা মনে থাকে না—আর এ-অবস্থায় যে-কাজ করা হয় তাতে কোনো পরম উদ্দেশ্য থাকতে পারে না।

ভারতীয় মন তার এই আদিকালের প্রচেষ্টায় সত্যের উপর জোর দিয়ে গভীর অনুরাগের সঙ্গে তাতে আত্মসমর্পণ করেছে। মতবাদ ও প্রত্যাদেশকে পাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে, কারণ এ-দুটি কেবল সেই সকল দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিদের জন্য যারা এদের উপরে উঠতে পারে না। প্রথমে এটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা মাত্র ছিল। সকল হৃদয়াবেগঘটিত এবং মানসিক অভিজ্ঞতার মতই অদৃশ্য জগৎ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা তা দৃশ্য বহির্জগতের অভিজ্ঞতা হতে ভিন্ন। তিনটি পরিমাপের সাহায্যে জাগতিক বস্তুর আয়তন স্থির করা হয়ে থাকে। এখানে যে অভিজ্ঞতার কথা বলা হচ্ছে তা ত্রি-পরিমাপ জগতের বাইরের বিষয়। এ এক অন্যবিধ, বিশালতর জগতের কথা, সুতরাং তিনটি পরিমাণদ্বারা একে বোঝানো যায় না। বলতে পারি না কি এই অভিজ্ঞতা—এটা একটা স্বপ্ন, কি সত্যেরই কোনো এক দিকের উপলব্ধি, কিংবা কল্পনাপ্রসূত ছায়ামাত্র। হয়তো অনেক সময় এটা আত্ম-প্রবঞ্চনা। যা আমার চিত্তকে আকর্ষণ করেছে তা এর প্রারম্ভটি—এ উদ্যোগ মতবাদ-প্রসূত নয়, কোনো শক্তিমান ব্যক্তি কর্তৃক আদিষ্টও নয়। এ হল জীবনের বহিরাবরণের অন্তরালে কি লুকিয়ে আছে নিজের জন্য নিজেই তা আবিষ্কার করার প্রচেষ্টা।

আমাদের মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষে দর্শনের আলোচনা কেবল দার্শনিক ও পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। দর্শন জনসাধারণের ধর্মমতের একটি বিশেষ অংশরূপে ছিল; একটা সহজ আকারে তাদের কাছে পৌঁছাত, এবং চীনদেশে যেমন দেখা গেছে, তেমনি ভারতবর্ষেও, সাধারণের মধ্যে একটা দার্শনিক দৃষ্টি এনে দিয়েছিল। কারও কারওর কাছে এই দর্শন বলতে বোঝাত সকল বিচিত্র প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য গভীর চেষ্টা, এবং জীবনের পরম উদ্দেশ্যটির অনুসন্ধান। মানুষকে যে বহু বিপরীত ভাবাত্মক বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয় কোথায় তাদের মধ্যে ঐক্য আছে তা খুঁজে বের করার প্রয়াসও এর অন্তর্গত ছিল। অনেকের কাছে অবশ্য দর্শন তার সরল সহজ রূপেই গৃহীত হত, তবু তাতে জীবনের যে একটা কোনো উদ্দেশ্য আছে—সে-কথা, এবং কার্যকারণের কথাও, থাকত। এই কারণে—এই সকল লোকেরা সাহসের সঙ্গে সংগ্রাম ও পরীক্ষা এবং দুঃখ বেদনার সম্মুখীন হতে পারত, প্রফুল্ল এবং শান্ত ভাবও হারাতো না। রবীন্দ্রনাথ ডক্টর তাই চি-তাওকে লিখেছিলেন, 'তাও' বা সত্যপথ চীন ও ভারতের প্রাচীন সাধনার ফল; এর অর্থ পূর্ণতার অনুসরণ, জীবন উপভোগের

আনন্দের সঙ্গে সংসারের বৈচিত্র্যময় কর্মের সুবিন্যস্ত মিলন। এর কিছু কিছু নিরক্ষর, জ্ঞানহীন লোকদের মনেও কাজ করেছে। আমরা দেখেছি যে চীনদেশীয়েরা সাত বছরব্যাপী ভীষণ যুদ্ধের পরও তাদের বিশ্বাসের বল এবং মনের প্রফুল্লতা হারায়নি। ভারতে আমাদের দুঃখকষ্ট আরও দীর্ঘকাল ধরে চলেছে, এবং দারিদ্র্য ও দুর্দশা দেশবাসীর চিরসঙ্গী হয়ে আছে। তবু ভারতের লোক তাদের নৃত্যগীত হাস্যপরিহাস পরিবর্জন করেনি—তবু তারা মনের মধ্যে আশা জীইয়ে রেখেছে।

৭ : সংশ্লেষণ ও পুনর্বিন্যাস : জাতিভেদের আরম্ভ

আর্যদের ভারতবর্ষে আগমনে জাতিগত ও রাজনৈতিক উভয়বিধ নূতন সমস্যা উপস্থিত হল। পরাজিত দ্রাবিড়রা একটি বহুকালের সভ্যতার অধিকারী ছিল, কিন্তু এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে আর্যেরা আপনাদের তাদের অপেক্ষা বহুলপরিমাণে শ্রেষ্ঠ মনে করত, এবং এই কারণে এই দুইয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এ-ছাড়া, কয়েকটি অনগ্রসর যাযাবর অথবা অরণ্যবাসী আদিম জাতির লোকও ছিল। এই সকল দলের মধ্যে যে বিরোধ এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলতে লাগল তা থেকে ক্রমে ক্রমে জাতিবিভাগ গড়ে উঠল। এই জাতিবিভাগ পরবর্তী বহু শতাব্দী ধরে ভারতীয় জীবনে গভীর পরিবর্তন এনেছে। সম্ভবত এই শ্রেণীবিভাগ আর্য কি দ্রাবিড় কারও ছিল না। নানা জাতির মধ্যে একটা সামাজিক শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা থেকে এটা এসেছিল, আর তখনকার দিনের নানা বিষয় নিয়ে একটা যুক্তিযুক্ত সুব্যবস্থা দাঁড় করানোর প্রয়োজনও এর আর একটা কারণ। পরে এই জাতিবিভাগ আমাদের অবনতি এনেছে, এবং এখনও একটা বোঝা, একটা অভিসম্পাত হয়ে আছে। কিন্তু পরবর্তীকালের মাপকাঠিতে এর বিচার করা উচিত হবে না। তখনকার দিনের মানুষের মনোভাব অনুসারে এটা ঠিকই ছিল, এবং এই প্রকারের বিভাগের কথা অধিকাংশ পুরাতন সভ্যতার ইতিহাসে পাওয়া যায়, যদিচ চীনদেশে এটা দেখা দেয়নি। আর্যদের অন্য শাখা ইরানীদের মধ্যে, সুসান রাজাদের সময়ে (খৃস্টীয় ৩য় হতে ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগ), চারভাগে বিভাগের ইতিহাস পাওয়া যায়, কিন্তু তা প্রাণহীন হয়ে জাতিভেদে পরিণত হয়নি। অনেক পুরাতন সভ্যতা, মায় গ্রীসের সভ্যতা, সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের দাসত্বের উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করত। ভারতবর্ষে এরূপ বৃহৎভাবে শ্রমিক দাসত্বের চলন ছিল না, যদিচ গৃহকর্মের জন্য অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক দাস রাখা হত। প্লেটো তাঁর 'রিপাব্লিক' গ্রন্থে চারটি প্রধান জাতিবিশিষ্ট একপ্রকার শ্রেণীবিভাগের কথা বলেছেন। মধ্যযুগের ক্যাথলিক খৃস্টীয় সম্প্রদায়েও এইরূপ বিভাগ কিয়ৎ পরিমাণে ছিল।

জাতিভেদ আরম্ভ হয় আর্য এবং অনার্যদের মধ্যে একটা কড়াকড়ি বিভেদ নিয়ে। অনার্যেরা আবার বিভক্ত হয় দ্রাবিড় জাতি এবং আদিম জাতিতে। প্রথমে আর্যেরা নিজেদের একটি জাতি গঠন করে নেয়, এবং তখনও বৃত্তিনির্দেশ একরূপ ঘটেনি

বলা যায়। আর্য শব্দ যে ধাতু হতে নিষ্পন্ন তার অর্থ কর্ষণ করা। আর্যেরা সকলেই কৃষিজীবী ছিল, এবং কৃষিকার্যকে সম্মানজনক বৃত্তি বলে মনে করা হত। কর্ষণকারী পুরোহিত, সৈন্য ও ব্যবসায়ীর কাজও করত, এবং বিশিষ্ট অধিকার দিয়ে পুরোহিত শ্রেণী তখনও সৃষ্ট হয়নি। প্রথমত জাতিবিভেদের উদ্দেশ্য ছিল আর্য-অনার্যদের পৃথক করে রাখা, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল আর্যদের উপরেই আর যখন কর্মভেদ ও বৃত্তিনির্দেশ বেড়ে উঠল নূতন শ্রেণীগুলি এক একটি জাতি হয়ে দাঁড়াল।

এইভাবে যে-কালে রীতি ছিল এই যে বিজেতারা বিজিতদের সমূলে বিনাশ করত অথবা দাস করে নিত, সেই সময় জাতিবিভেদ সমস্যাটার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান এনে দিল আর এই সমাধানটি ক্রমবর্ধমান, বৃত্তিভেদ ও কর্মভেদেরও উপযোগী হল। সামাজিক জীবনে এবার উঁচু নিচু ধাপ দেখা দিল। প্রথমে ছিল সকলেই কৃষিজীবী, এখন বৈশ্যদের উদ্ভব ঘটল, তারা কৃষক, কারিগর এবং ব্যবসায়ী; ক্ষত্রিয়েরা উদ্ভূত হয়ে শাসন ও দেশরক্ষার ভার নিল; আর ব্রাহ্মণেরা, অর্থাৎ পুরোহিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা, রাজনীতি সমাজনীতি বিষয়ে নির্দেশ দেবে এবং জাতির আদর্শগুলিকে রক্ষা করবে ও পোষণ করবে এইরূপ ব্যবস্থা হল। এই তিনটির নিচে থাকল শূদ্রেরা; কৃষিজীবীরা ছাড়া আর যে-সকল শ্রমিক ও অনিপুণ-কর্মী ছিল এরা তারাই। দেশীয় লোকদেরও নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করার কাজ চলছিল; তাদের সমাজে সব নিচে স্থান দেওয়া হল শূদ্রদের সঙ্গে। জাতিবিভাগ তরল অবস্থাতেই ছিল, কড়াকড়ি অনেক পরে এসেছে। সম্ভবত শাসকশ্রেণীর লোকদের অনেক সুবিধা দেওয়া হত। কোনো ব্যক্তি যদি যুদ্ধজয় কি অন্য কোনো উপায়ে প্রভুত্ব লাভ করতে ইচ্ছা করলে সে ক্ষত্রিয় আখ্যা নিয়ে শক্তিমানদের দলে যোগ দিতে পারত, আর পরে পুরোহিতদের দ্বারা কোনো পুরাতন আর্যবীরের নামের যোগে একটা প্রয়োজনানুরূপ বংশাবলী তৈরি করিয়ে নিত।

আর্য শব্দটির জাতিগত কোনো অর্থ আর রইল না, এখন সম্ভ্রান্তবংশীয় বোঝাতে এই শব্দ ব্যবহৃত হতে লাগল, যেমন অনার্য শব্দে সাধারণত যাযাবর, অরণ্যবাসী প্রভৃতি লোকদের বোঝাত এবং এর অর্থ করা হত নীচজাতীয়।

ভারতীয় মন অত্যধিক পরিমাণে বিশ্লেষণ প্রিয়—ভাব, ধারণা, এমন কি কর্মকেও পৃথক পৃথক কোঠায় রাখতে চায়। আর্যেরা কেবল যে সমাজকে চার ভাগে ভাগ করেছিল তা নয়, ব্যক্তিগত জীবনকেও চারভাগে ভাগ করেছিল। প্রথমটি হল কৈশোর ও যৌবন, অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণের কাল—ছাত্রাবস্থা—যখন জ্ঞানলাভ এবং নিয়মানুবর্তিতা, আত্মসংযম ও ব্রহ্মচর্য পালনের সময়; দ্বিতীয়টি গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের জন্য নির্দিষ্ট; তৃতীয়টি বয়োবৃদ্ধদের কাল, যখন তাঁরা বৈষয়িক ব্যাপারে স্থৈর্য লাভ করেছেন, এবং লাভের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে দশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন; আর শেষেরটি সংসারবিরত ব্যক্তিদের জন্য। এরূপে, মানুষের মনে জীবনকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা অথবা তাকে অস্বীকার করার যে পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তি আছে তাদের মানিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

চীনদেশের ন্যায় ভারতবর্ষে বিদ্যা ও শিক্ষা সাধারণের কাছ থেকে বিশেষ শ্রদ্ধা লাভ করে, কারণ বিদ্যা থাকলেই উচ্চশ্রেণীর জ্ঞান এবং সদ্গুণও থাকে এইরূপ ধারণা এই দুই দেশে পোষণ করা হয়। পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছে রাজারা এবং যোদ্ধারা সর্বদাই মাথা নত করেছে। আমাদের দেশের একটি পুরাতন মত এই যে শক্তির ব্যবহার যাদের কাজ তারা সম্পূর্ণ নির্বিকারভাবে বাহ্যবিষয়কে গ্রহণ করতে পারে না। একদিকে তাদের আপন স্বার্থ ও ইচ্ছা, আর অন্যদিকে জনসাধারণের প্রতি তাদের কর্তব্য এই এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। এই কারণে কোনো বিষয়ের কি বস্তুর, কি গুরুত্ব এবং মূল্য তা নির্ধারণ করার, এবং নৈতিক আদর্শগুলিকে অবিকৃত রাখার ভার এক শ্রেণীর ব্যক্তিদের উপর দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের সাংসারিক উদ্বেগ থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হত, এবং যতদূর সম্ভব তাঁদের কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না, সুতরাং মানবজীবনের সমস্যাগুলিকে তাঁরা নির্লিপ্তভাবে বিচার করতে পারতেন। এই চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বা দার্শনিকেরা সমাজ-অঙ্গের শীর্ষদেশে স্থান পেতেন এবং সকলের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করতেন। কর্মী ব্যক্তিদের, অর্থাৎ রাজা ও যোদ্ধাদের, স্থান তাঁদের পরেই ছিল, এবং যতই শক্তিমান হোক তাঁদের মত সম্মান লাভ করত না। এখনও পর্যন্ত, ধন থাকলেই কেউ শ্রদ্ধা বা সম্মানের যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। সকলের উপরে না হলেও, যোদ্ধৃশ্রেণীর ব্যক্তিরা সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করত, এবং চীনদেশের মত এখানে তাদের প্রতি অবজ্ঞা দেখান হত না।

এই হল সমাজগঠনের প্রকরণ এবং আরম্ভের কথা। অন্যত্রও এটা দেখা যায়, যেমন মধ্যযুগে ইউরোপে খৃস্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে। এই যুগে রোমীয় সম্প্রদায় সমস্ত আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিষয়ে, এমন কি দেশ-শাসনের সাধারণ বিধি সম্বন্ধেও নির্দেশ দেবার ভার গ্রহণ করেছিল। কার্যত, রোম অত্যধিক পরিমাণে ঐহিক শক্তিতে আগ্রহ অনুভব করেছিল এবং ধর্ম সমাজের নিয়ন্তারা আপন অধিকারেই শাসনভার নিয়েছিল। ভারতে ব্রাহ্মণদের মধ্যে থেকে ভাবুক ও দার্শনিক অনেক জন্মেছেন, আবার এই ব্রাহ্মণদের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে একটা শক্তিশালী, সুরক্ষিত পুরোহিত সম্প্রদায়। তবু এই প্রকরণটি অল্পবিস্তর গভীরভাবে ভারতীয় জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এই কারণে, ভারতে আদর্শ পুরুষ বললে বোঝায় এমন ব্যক্তিকে যিনি পাণ্ডিত্য ও দাক্ষিণ্যে পূর্ণ, সৎ, আত্মসংযমশীল এবং অন্যের জন্য স্বার্থত্যাগ করতে সমর্থ, যারা সমাজে বিশেষ সুবিধা পায়, কিংবা ব্যূহবদ্ধ সাম্প্রদায়িক জীবনের সুযোগে স্বার্থরক্ষা করে চলে তাদের মধ্যে অনেক প্রকারের দোষ দেখা যায়। ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই সকল দোষ দেখা গেছে, এবং তাদের অনেকের না আছে বিদ্যা, না আছে গুণ। তবু তারা সাধারণের কাছ থেকে এখনও সম্মান পেয়ে আসছে। তাদের লোকবল কি ধনবল আছে বলে এটা হয়েছে তা নয়, এর কারণ এই যে অনেক পুরুষ ধরে এদের মধ্যে বুদ্ধিমান লোক জন্মেছেন, এবং তাঁরা যে সাধারণের সেবা করেছেন ও স্বার্থত্যাগ

দেখিয়েছেন তা ভুলবার নয়। সমগ্র ব্রাহ্মণ জাতিটা সকল যুগে তার অগ্রবর্তী ব্যক্তিদের সুদৃষ্টান্তের কল্যাণে লাভবান হয়েছে, তবু লোকে যে সম্মান দেখিয়েছে তা গুণের প্রতি। আমাদের দেশের চিরাচরিত প্রথাই হল যে-ব্যক্তি বিদ্বান ও সৎ তাঁকে সম্মান করা। অব্রাহ্মণ এমন কি অনুন্নত জাতির লোকও এরূপ সম্মান পেয়েছে, আর কখনও কখনও সাধু আখ্যাও লাভ করেছে। উচ্চপদ কিংবা সামরিক শক্তিকে লোকে ভয় করে থাকতে পারে, কিন্তু শ্রদ্ধা ও সম্মানের দিক থেকে আদর্শ ব্রাহ্মণ বরাবর রাজশক্তি ও ক্ষাত্রশক্তির চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়ে এসেছে।

আজও, এই অর্থের প্রাধান্যের দিনেও, এই চিরাগত রীতির প্রভাব স্পষ্টই দেখা যায়। এই কারণে গান্ধীজি ব্রাহ্মণবংশীয় না হয়েও সর্ববিষয়ে ভারতের নেতারূপে কোটি কোটি লোককে প্রেরণা দিতে পারেন, যদিচ বল, কি রাজকর্মচারীর পদমর্যাদা কি অর্থ তাঁর নাই। কিরূপ দেশনায়কের প্রতি আমরা আনুগত্য প্রকাশ করে থাকি তা থেকেই বেশ স্পষ্টরূপে বোঝা যায় কেমন আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক পটভূমিকা, সজ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞানিক ধারণায় এ-দেশে কি মনোবৃত্তি গড়ে উঠেছে।

ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার, অর্থাৎ ভারতীয় আর্য সংস্কৃতির, কেন্দ্রস্থানীয় ভাবটি 'ধর্মের', আর এই 'ধর্ম', আমরা যাকে ধর্ম কি ধর্মমত বলি তা অপেক্ষা অনেকখানি বেশি কিছু। ধারণাটিতে যেন ঋণ-পরিশোধের ভাব আছে। এই ধর্মের নিহিতার্থ হচ্ছে নিজের কাছে এবং অপরের কাছে যা কিছু কর্তব্য তার পালন। এই ধর্ম ঋতের অংশ, আর ঋত হল সেই মূলগত নৈতিক বিধি যা বিশ্ব এবং বিশ্বস্থ সমস্তের কার্য নিয়ন্ত্রিত করছে। এরূপ বিধান যদি থাকে মানুষ তাতে মানিয়ে যাবে, এবং তখন সে সেইভাবে চলবে যাতে বিশ্ববিধানের সঙ্গে জীবনকে একসূত্রে বেঁধে নিয়ে থাকতে পারে। মানুষ যদি আপন কর্তব্য করে চলে, এবং তার কাজ যদি নীতির বিচারে ঠিক হয়, তাহলে নিশ্চিতরূপে যথাযথ ফলও তার মিলবে। অধিকারের ভাব এদেশে জোর পায়নি ধর্মের ভাব সর্বত্রই কতকটা পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গীরূপে ছিল। এখন লোকে অধিকারের দাবি নিয়ে জোর করছে—ব্যক্তির অধিকার, দলের অধিকার, জাতির অধিকার, এই অধিকারের দাবির মাঝে ধর্ম লক্ষণীয় হয়ে দেখা দিচ্ছে।

৮ : ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্নতা

আদিকালে সংস্কৃতি ও সভ্যতার আরম্ভ আলোচিত হল। এগুলি পরবর্তীকালে বহু সৌন্দর্যে ভূষিত হয়ে পুষ্পিত হয়েছে, এবং আজও, অনেক পরিবর্তন সত্ত্বেও অনুবর্তিত হচ্ছে। মূলগত আদর্শগুলি আকার নিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে, এবং সাহিত্য ও দর্শন, কলা ও নাটক, এবং জীবনের অন্যান্য কার্য এই সকল আদর্শ ও দৃষ্টি-ভঙ্গীদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এ ছাড়া, আমরা দেখি, অপরকে দূরে রাখার, অপরের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলার, যে বীজ ছিল তা অংকুরিত হয়েছে, এবং বর্ধিত হয়ে হয়ে দৃঢ়ভাবে

অক্টোপাসের মত সকল বিষয়কে আঁকড়ে ধরেছে। এটাই হল বর্তমান সময়ের জাতিভেদ। একটা বিশেষ কালে, তখনকার দিনের সমাজ ব্যবস্থাকে সবল ও অবিচল করার প্রয়োজনে, যে-উপায় উদ্ভাবিত হয়েছিল তা সমাজবিধি ও মানুষের মনের পক্ষে কারাগারের ন্যায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। চরম প্রগতির পরিবর্তে নির্বিঘ্নতা ক্রয় করা হয়েছে।

তবু আমাদের দেশের সংস্কৃতি বহু যুগ ধরে চলেছে। প্রারম্ভেই সকল দিকে অগ্রসর হবার গতি ও বল তার এত অধিক ছিল যে আমরা যে-সমাজ ব্যবস্থার কথা বলে এলাম তার কাঠামোর মধ্যে থেকেও, এই সংস্কৃতি ভারতের সর্বত্র এবং পূর্ব-সাগরেও প্রসারিত হয়েছিল, এবং পুনঃ পুনঃ আগত বহু আঘাত ও আক্রমণেও এর স্থায়িত্বকে টলাতে পারেনি। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস পুস্তকে বলেন যে 'মোটের উপর, ভারতীয় সাহিত্যের মৌলিকতাই তার প্রধান বিশেষত্ব। খৃস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীর শেষাশেষি, যখন গ্রীকেরা এদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশ আক্রমণ করেছিল, তার আগেই ভারতীয়েরা নিজেদের একটা জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল এবং তাতে কোনো বিদেশীয় প্রভাব ছিল না। তারপর, পারস্যদেশ-বাসী, গ্রীক, সীথিয়ান ও মুসলমানদের কাছ থেকে, ক্রমান্বয়ে আক্রমণের ঢেউ এসেছে এবং তারা জয়লাভও করেছে, কিন্তু ভারতীয় আর্য জাতির জীবন ও সাহিত্যের ক্রমোন্নতি ইংরাজ অধিকারের যুগ পর্যন্ত কোনো বাধাই পায়নি এবং বাইরের কোনো প্রভাবে তাকে পরিবর্তন স্বীকার করতে হয়নি। কোনো ভারতীয়-ইউরোপীয় দল অনন্যপ্রভাবে এরূপ ধারাবাহিক উন্নতি লাভ করেনি। চীনদেশ ছাড়া, আর কোনো দেশ, তার ভাষা ও সাহিত্য, ধর্মমত ও আচার-অনুষ্ঠান, নাটকাদি এবং সামাজিক প্রথা বিষয়ে তিন হাজার বছর ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে উন্নতি লাভ করে চলছে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবে না।'

তবু ভারতবর্ষ অন্যান্য দেশ হতে পৃথক হয়ে একক জীবন যাপন করেনি, কারণ ইতিহাসের এই এতগুলি যুগ ধরে ইরান, গ্রীস, চীন, মধ্য-এশিয়া এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে তার জীবনের সংস্পর্শ ক্রমাগতই ঘটেছে। তার মূলগত সংস্কৃতিকে যখন এত সংস্পর্শেও অবিকৃত থাকতে দেখা গেছে তখন বুঝতে হবে যে তাতে এমন কিছু আছে—এমন জীবনীশক্তি, এতই জীবনের উপলব্ধি, এবং এগুলি থেকে পাওয়া এমন দক্ষতা—যেজন্য এতটা সম্ভব হয়েছে। এই যে তিন চার হাজার বছর ধরে সংস্কৃতির ধারাবাহিক গতি ও উন্নতি দেখা যায় তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। ম্যাক্‌স্‌ মুলার এই কথাতেই জোর দিয়ে বলেছেন, 'তিন হাজার বছরেরও অধিক কাল ধরে অতি আধুনিক ও অতি প্রাচীন হিন্দু চিন্তার মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্নতা রক্ষিত হয়েছে।' অত্যধিক উৎসাহের বশবর্তী হয়ে, ১৮৮২ খৃস্টাব্দে, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতায় বলেছেন, 'যদি সারা পৃথিবী খুঁজে দেখা হয় কোন দেশকে প্রকৃতি সর্বাপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য, শক্তি ও সৌন্দর্য দিয়ে সাজিয়েছে, কোথায় স্থানে স্থানে ভূপৃষ্ঠে স্বর্গের শোভা ফুটে উঠেছে, আমি ভারতবর্ষকে দেখিয়ে

দেব। যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে কোন দেশের আকাশের তলে মানুষের মন সর্বশ্রেষ্ঠ ভাব সকল সঞ্চয় করেছে, জীবনের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি গভীর চিন্তার বিষয় হয়েছে, এবং তাদের কোনো কোনোটির এরূপ মীমাংসাও নির্ণীত হয়েছে যে যাঁরা প্লেটো এবং কান্ট-এর দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত তাঁদের পক্ষেও সেগুলিকে বিবেচনা করে দেখার প্রয়োজন হয়, তাহলে আমি ভারতবর্ষকেই নির্দেশ করব। ইউরোপ এতকাল ধরে গ্রীক, রোমান ও সেমেটিক সভ্যতার আওতায় প্রতিপালিত হয়েছে। ইউরোপের মানসরাজ্যে ইহুদীসুলভ সঙ্কীর্ণ ভাবধারার স্বাক্ষর অতি প্রত্যক্ষ। যদি আমি নিজেকে প্রশ্ন করি কোন দেশের সাহিত্য হতে সেই পরিশোধন আমরা পেতে পারি যা নিতান্তই আবশ্যক যদি আমাদের অন্তরকে আরও পূর্ণ, আরও সর্বাঙ্গীন, আরও সার্বজনীন করতে চাই, বস্তুত, যদি পূর্ণতর মানবজীবন পেতে চাই কেবল ইহকালের জন্য নয়, আমাদের দেহান্তর এবং অনন্ত জীবনের জন্য, তাহলে আমি পুনরায় ঐ ভারতবর্ষের দিকেই দৃষ্টি ফেরাব।'

প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে রোমাঁ রোলাঁ ঐ একই সুরে বলেছেন, 'যদি পৃথিবীপৃষ্ঠে এমন কোনো স্থান থাকে যেখানে আদিকালে মানুষ যে অস্তিত্বের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিল তখন থেকে তার সমস্ত স্বপ্ন আশ্রয় পেয়েছে, সে ভারতবর্ষ।'

৯ : উপনিষদ্

উপনিষদ্‌গুলির তারিখ আরম্ভ হয়েছে খৃস্টপূর্ব ৮০০ অব্দের কাছাকাছি। এগুলি পাঠ করলে আর্য-ভারতীয় চিন্তাধারার বিকাশ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বেশ একটু স্পষ্ট হয়। আর্যেরা অনেককাল হল এদেশে বসবাস করছে, একটা স্থায়ী এবং সচ্ছল সভ্যতা গড়ে উঠেছে; মোটের উপর, অতি পুরাতন পূজাপদ্ধতির পটভূমিকায়, পুরাতন ও নূতনের সংমিশ্রণে, আর্যদের চিন্তা ও আদর্শের প্রভাবের মধ্যে এইটি ঘটেছে। এখন লোকে বেদের নাম করে শ্রদ্ধার সঙ্গেই, কিন্তু তাতে একটুখানি শ্লেষের ভাবও যে না থাকে তা নয়। বৈদিক দেব-দেবীতে সন্তোষ মেলে না, আর পুরোহিতদের পদ্ধতিগুলি এখন হাসির বিষয়। তবু পুরাতনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ির চেষ্টা নেই, বরঞ্চ মনে করা হয় সেখান থেকেই অধিকতর উন্নতির সূরু।

জিজ্ঞাসাই উপনিষদ্‌গুলির অনুপ্রাণনা—সত্যের অনুসন্ধানে পরম আগ্রহে মানবমনের যাত্রা। এই অনুসন্ধান অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে বাস্তবভাবে হবার নয়; কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে অগ্রসর হওয়ার একটা চেষ্টা উপনিষদ্‌গুলিতে দেখতে পাই। যাতে মতবাদ এ-চেষ্টায় ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে সেজন্য সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে। অনেক ছোটখাটো এবং অনাবশ্যক বিষয় এইসকল গ্রন্থে নজরে পড়ে। আধুনিক কালে আমাদের কাছে সেগুলির কোনো মূল্য নেই। উপনিষদে যে-তথ্যের উপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে সে হল আত্মোপলব্ধি এবং মানসাত্মা ও পরমাত্মা বিষয়ক জ্ঞান। উপনিষদে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে একই সত্তার বিভিন্ন

প্রকাশরূপে স্বীকার করা হয়েছে। বাইরের বাস্তব জগৎকে অসার বলে মনে করা হয়নি, বরঞ্চ তা অন্তর্জগতের সত্তার একটা দিক, এই কথা বলে তার অস্তিত্বকে আপেক্ষিকভাবে স্বীকার করা হয়েছে।

উপনিষদের অনেকস্থানের অর্থ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না, এবং সেই সব স্থানের বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। দার্শনিক ও পণ্ডিতেরা এসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামান। মোটের উপর বলা চলে যে উপনিষদে অদ্বৈতবাদের দিকেই ঝোঁক দেওয়া হয়েছে। মনে হয় এই উপায়ে তখনকার দিনের মতানৈক্য কমিয়ে আনার চেষ্টা হয়েছিল, কারণ এই অনৈক্য ভীষণ বাদানুবাদ সৃষ্টি করত। এটি সংশ্লেষের পথ। ইন্দ্রজাল কিংবা ঐরূপ অলৌকিক বিষয় প্রশ্রয় পেত না এবং যে সমস্ত অনুষ্ঠানাদি হতে জ্ঞানালোক লাভের সম্ভাবনা ছিল না সেগুলিকে বৃথা, অসার, এইরূপ আখ্যা দেওয়া হত। বলা হয়েছে, 'যারা এই সমস্ত নিয়ে থাকে তারা নিজেদের বুদ্ধিমান ও বিদ্বান বলে মনে করে, কিন্তু অন্ধের দ্বারা চালিত অন্ধের ন্যায় লক্ষ্যহীন বিপর্যস্তভাবে চলে, এবং যথাস্থানে পৌঁছতে পারে না।' এমনকি বেদকেও নিম্নতর জ্ঞান বলা হয়েছে—আত্মার জ্ঞানই হল উচ্চজ্ঞান, 'পরাবিদ্যা'। উপনিষদে আছে, আচরণ নিয়ন্ত্রিত না করে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করা অনুচিত। সামাজিক কর্মের সঙ্গে আধ্যাত্মিক প্রয়াসকে সুচারুরূপে মিলিয়ে নেবার জন্য ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা করা হয়েছে। এই অনুশাসনটি দেখা যায় যে সংসারযাত্রার ভিতর দিয়ে যে সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য উপস্থিত হয় সেগুলি নির্লিপ্ততার সঙ্গে পালন করা উচিত।

সম্ভবত ব্যক্তিগত জীবনে পরিপূর্ণতা লাভের প্রয়োজনের উপর অতিরিক্ত মাত্রায় জোর দেওয়া হত, এবং এই কারণে সামাজিক বিষয়ে মনোযোগ শিথিল হয়েছিল। উপনিষদে আছে, 'ব্যক্তি হতে উচ্চতর আর কিছুই নেই।' সমাজের ভিত্তি স্থায়ীভাবে গঠিত হয়ে গেছে এইরূপ মনে করে সমাজের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে মানুষ সর্বদাই ব্যক্তিগত পূর্ণতার কথা চিন্তা করত। তার মন এই পূর্ণতার সন্ধানে আকাশে ও অন্তরের গভীরতম প্রদেশে বিচরণ করত। প্রাচীন ভারতের এই আত্মজ্ঞানলিপ্সা সংকীর্ণ জাতীয়-ভাবপ্রসূত ছিল না। অনেকেই হয়তো ভাবত যে ভারতবর্ষ সংসার-চক্রের নাভি। চীন, গ্রীস এবং রোমেও বিভিন্ন সময়ে এইরূপ ধারণার পরিচয় পাওয়া গেছে। কিন্তু মহাভারতে আছে, 'এই সমগ্র নশ্বর জীবজগৎ পরস্পর নির্ভরশীল বিষয়ের সমষ্টি।'

উপনিষদে নানা প্রশ্নের যে আধ্যাত্মিক দিক বিবেচিত হয়েছে তা আমার পক্ষে সম্যকরূপে বোঝা কঠিন, কিন্তু কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য উপনিষদ্‌কারেরা যেভাবে অগ্রসর হয়েছেন তাতে আমি বিশেষ আগ্রহ অনুভব করেছি। অনেক সময়ে মতবাদ ও অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা সমস্যাকে আচ্ছন্ন করায় তা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। উপনিষদের পদ্ধতি হল দর্শনশাস্ত্রসম্মত, ধর্মনৈতিক নয়। আমি চাই চিন্তার সবলতা, চাই যে প্রশ্ন উঠুক, আর চাই যুক্তির পটভূমিকা। অনেক স্থানে উপনিষদের রচনা-রীতিতে সংক্ষেপে লেখার পরিচয় দেখা যায়; গুরুশিষ্যের কথোপকথনে এটা বিশেষ-

ভাবে বেশি লক্ষণীয়। অনুমান করা হয়েছে যে উপনিষদ্‌গুলি গুরুরা উপদেশ দেবার আগে স্মরণের সুবিধার জন্য যা কিছু লিখে রাখতেন, অথবা উপদেশ শোনবার সময় ছাত্রেরা যা কিছু লিখে নিত তারই সংগ্রহ। অধ্যাপক এফ্‌. ডব্লিউ. টমাস তাঁর "দি লেগ্যাসি অফ্‌ ইণ্ডিয়া"তে বলেছেন, 'উপনিষদ্‌গুলির সুরটি অকপট, অধ্যয়নে মনে হয় যেন বন্ধুরা একত্র হয়ে গম্ভীর বিষয়ে আলোচনা করছেন। এ গুণের পরিচয় আর কোনো গ্রন্থে মেলে না, আর এইজন্যই এগুলিতে মানুষের মনে এত আগ্রহ উদ্রেক করার শক্তি দেখা যায়।' চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী এই গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষণী ভাষায় বলেছেন, 'উপনিষদের শিক্ষক এবং তাঁদের ছাত্রেরা সত্যের অদমনীয় পিপাসায়, অবাধ কল্পনা এবং আশ্চর্য চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়ে, নির্ভয়ে অনুসন্ধানস্পৃহার সঙ্গে বিশ্বের রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করেন, আর সেই জন্য জগতের এই প্রাচীনতম ধর্মপুস্তকগুলিকে আজও অতিশয় আধুনিক বলা চলে, এবং এখনও তারা যারপরনাই তৃপ্তি দান করে।'

সত্যের উপর নির্ভর উপনিষদ্‌গুলির সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বিশেষত্ব। 'সত্য সর্বকালে জয়যুক্ত হয়, মিথ্যার জয় নেই। ঈশ্বর সন্নিধানে যাবার পথ প্রস্তুত হয় সত্যে।' সুবিখ্যাত বৈদিক প্রার্থনাটি আলোক ও জ্ঞানলাভের প্রার্থনা : 'অসত্য হতে আমাকে সত্যেতে নিয়ে যাও; অন্ধকার হতে আমাকে জ্যোতিতে নিয়ে যাও; মৃত্যু হতে আমাকে অমৃতেতে নিয়ে যাও।'

মানুষের চঞ্চল চিত্ত ঘুরে ফিরে দেখতে চায়, জানতে চায়—তার জিজ্ঞাসার অন্ত নেই; 'কার আদেশে মন আপন স্থানে এসে বসেছে? কার ভয়ে প্রথম জীবনটি অগ্রসর হয়েছে? মানুষ যে তার বাক্যকে প্রেরণ করে এ কার আদেশে? কোন দেবতা চক্ষু ও কর্ণের দিক-নির্দেশ করেন?' আবার : 'বায়ু কেন স্থির হয়ে থাকতে পারে না? মানুষের চিত্ত কেন স্থির নয়? কেন, কিসের সন্ধানে, জল নির্গত হয়ে মুহূর্তের জন্যও আপন বেগ থামাতে পারে না?' মানুষ অহরহ শুনছে তার যাত্রার ডাক, না আছে পথে বিশ্রামের স্থান, না আছে পথের শেষ। আমাদের এই যে সীমাহীন যাত্রায় বের হতেই হবে—এই অন্তহীন পথচলার কথা বলা হয়েছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি স্তোত্রে। প্রত্যেক শ্লোকের শেষে এই দুটি শব্দ ফিরে ফিরে এসেছে, 'চরৈবেতি, চরৈবেতি'—'ওগো যাত্রি, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল!'

ধর্মে আছে সর্বশক্তিমান দেবতার কাছে নতি স্বীকার, কিন্তু যে-অনুসন্ধানের কথা বলা হল তাতে কোনো নতি মেনে নিতে হয় না। পারিপার্শ্বিক বিষয়ের উপর মনের জয়লাভ এই সন্ধানের ফল। 'আমার শরীর পুড়ে ছাই হবে, আমার শ্বাসবায়ু মিশবে চঞ্চল এবং মৃত্যুহীন বায়ুমণ্ডলে, কিন্তু আমার এবং আমার কর্মের অন্ত নেই। মন, স্মরণ রেখো এ-কথা স্মরণ রেখো।' একটি প্রভাতকালীন প্রার্থনায় সূর্যকে আহ্বান করে বলা হয়েছে, 'হে দীপ্তিমান সূর্য, আমি সেই পুরুষ যিনি তোমাকে এইরূপ করে সৃষ্টি করেছেন।' কি চমৎকার দৃঢ়বিশ্বাস!

আত্মা কি? নঞবাচক শব্দ ভিন্ন এর বিবরণ কি সংজ্ঞা দেওয়া যায় না : 'এ নয়,

এ নয়।' কিংবা একপ্রকার সদর্থকভাবে : 'সে তুমি'—'তত্ত্বমসি'! পৃথগাত্মা একটি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় শুদ্ধাত্মার জ্বলন্ত অগ্নি হতে প্রক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় তাতে মগ্ন হয়। 'অগ্নি যেমন, এক হয়েও, সৃষ্টিতে প্রবেশ করে যা দগ্ধ করে তারই আকার গ্রহণ করে, তেমনি সকল পদার্থের অন্তরস্থ আত্মা পৃথক বস্তুতে প্রবেশ করে পৃথক আকার গ্রহণ করে, কিন্তু তার নিজের কোনো আকার নেই।' যখন উপলব্ধি করা যায় যে সকল বস্তুর মধ্যে একই সারাংশ বর্তমান, আমাদের এবং অপর সকলের মধ্যে সকল ব্যবধানই দূর হয়, এবং সর্বমানব ও প্রকৃতির সঙ্গে একত্বের ভাব জেগে ওঠে। বাহ্য জগতের বৈচিত্র্য এবং বহুত্বের অন্তরালে এই একত্ব বিদ্যমান আছে। 'যিনি সকল পদার্থকে আত্মা বলে জানেন, তাঁর পক্ষে কোথায় দুঃখ, কোথায় মোহ যখন তিনি এককে দেখেন?' 'যিনি সকল পদার্থকে আত্মাতে দেখেন, এবং সকল পদার্থে আত্মাকে দেখেন, আত্মা হতে তিনি আর প্রচ্ছন্ন থাকেন না।'

আর্য-ভারতীয়দের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং অপরকে দূরে রাখার অভ্যাস দেখা যায়; আবার দেখি, জাতি কি শ্রেণীর সকল বাধা একেবারে ভেঙে দিয়ে, ভিতর ও বাইরের সকল পার্থক্য মুছে ফেলে, সকলকে গ্রহণ করে অগ্রসর হওয়ার ভাব। এই দুটি মনোভাবের তুলনামূলক আলোচনায় কৌতুক অনুভূত হয়। দ্বিতীয় দিকটি এক-প্রকার আধ্যাত্মিক গণতন্ত্র। 'যিনি সকলের মধ্যে একক দেখেন, এবং সকলকে একের মধ্যে দেখেন, তিনি আর কদাপি কোনো জীবকে ঘৃণা করেন না।' যদিচ এটা ভাবমাত্র ছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে জাতির জীবনে এর প্রভাব ঘটেছে। এই কারণে চীনদেশের ন্যায় এদেশের সংস্কৃতিতেও সহনশীলতা প্রকাশ পেয়েছে এবং যুক্তির হাওয়া বয়েছে, মতে স্বাধীনচিন্তা স্বীকৃত হয়েছে, নিজে বাঁচা এবং অপরকে বাঁচতে দেওয়ার ইচ্ছা ও ক্ষমতা জাগ্রত হয়েছে। এগুলি এই দুটি সংস্কৃতিরই প্রধান বৈশিষ্ট্য। ধর্মে কি সংস্কৃতিতে, এমন কোনো একাধিপত্য ছিল না যাকে সমগ্রভাবে স্বীকার করতেই হত। এই সমস্ত হতে একটি পুরাতন জ্ঞানগর্ভ সভ্যতার অফুরন্ত মানসিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

উপনিষদে একটি প্রশ্নের গভীর অর্থপূর্ণ উত্তর দেওয়া হয়েছে। "জিজ্ঞাসা এই: কি এই বিশ্ব? কি হতে এর উৎপত্তি? কোথায় তা চলেছে? আর উত্তরটি এই: আনন্দে এর উৎপত্তি, আনন্দে এর স্থিতি, আর আনন্দেই এর লয়।"* এর ঠিক কি অর্থ আমি তা বুঝতে অক্ষম, তবে এইটুকু বুঝি যে উপনিষদ্‌কারগণ অতিশয় স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন এবং সমস্ত বিষয়কে স্বাধীনতার দিক থেকে দেখতে চাইতেন। স্বামী বিবেকানন্দও এই দিকে জোর দিয়ে গেছেন।

আমাদের পক্ষে নিজেদের এই সুদূর অতীতের লোক বলে কল্পনা করা সহজ

* যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্য। তদ্‌ব্রহ্ম। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

নয়; তখনকার দিনের মানসিক আবহাওয়ার অভিজ্ঞতাও আমাদের আয়ত্তীভূত নয়। সে সময়ের লেখার অক্ষরেরও আকার-প্রকার আমাদের অপরিচিত—দেখতেই অদ্ভুত, পড়ে অনুবাদ করা কঠিন—আর তখনকার জীবনের পটভূমিকা এখনকার মত আদৌ ছিল না। যে সমস্ত বিষয় ও বস্তুতে আমরা অভ্যস্ত, যেমনই হোক সেগুলিকে আমরা বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করে থাকি। যাতে আমরা অভ্যস্ত নই সেগুলির দোষগুণ বিচার করা দুরূহ ব্যাপার। এই সমস্ত দুরতিক্রম বাধা সত্ত্বেও উপনিষদের বাণী এদেশে সকল কালে শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে, এবং জাতীয় চিত্ত ও চরিত্রকে সবল করে গঠন করেছে। ব্লুমফিল্ড্ বলেন, 'উপনিষদের ভিত্তিতে গঠিত নয় এমন কোনো সারবান হিন্দুমত নেই; এমনকি বৌদ্ধধর্ম যদিচ পুরাতন মতের বিরোধী তবু তার সম্বন্ধেও একথা বলা যায়।'

প্রাচীন হিন্দুচিন্তাগুলি ইরানের মধ্যে দিয়ে গ্রীসেও পোঁছেছিল এবং সেখানকার দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। অনেক পরে, প্লটিনাস্ ইরানী ও ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য প্রাচ্যদেশে এসেছিলেন ও উপনিষদের মরমিয়া অংশের প্রভাব বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন। অনেকে বলেন যে প্লটিনাসের কাছ থেকে এই ভাব সেণ্ট্ অগাস্টিনের কাছে পৌছেছিল, এবং সেণ্ট্ অগাস্টিনের মধ্যে দিয়ে এই সকল ঔপনিষদ্ভাব তখনকার খৃস্টধর্মেও প্রবেশ করেছিল।*

গত দেড়শত বছরের মধ্যে ইউরোপবাসীরা ভারতীয় দর্শনের পুনরাবিষ্কার ঘটায় ইউরোপীয় দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনের উপর একটা গভীর ছাপ পড়েছে। শোপেনহাওয়ারকে 'নিন্দাবাদী' বলা যায়, তিনি কিছুই যেন ভাল দেখতেন না। উপনিষদ্ সম্বন্ধে প্রায়ই তাঁর কথা উদ্ধৃত হয়ে থাকে। তিনি বলেছেন, 'উপনিষদের প্রত্যেক বাক্যটি হতে গভীর, মৌলিক এবং উন্নত চিন্তা লাভ করা যায়, আর গ্রন্থগুলিকে উচ্চ, পবিত্র ও আন্তরিকভাবে পরিব্যাপ্ত বলে মনে হয়।......জগতে উপনিষদের মত এমন আর কোনো গ্রন্থ নেই যা পাঠ করে এত কল্যাণ, এত উৎকর্ষ লাভ করা যেতে পারে।......এগুলি সর্বোচ্চ জ্ঞানের ফল।......এই সমস্ত একদিন না একদিন মানবের ধর্মবিশ্বাসে দাঁড়াবেই দাঁড়াবে।' আবার বলেছেন, 'উপনিষদ্ পাঠ করে আমি জীবনে সান্ত্বনা পেয়েছি, মৃত্যুতেও এই উপায়ে সান্ত্বনা পাব।' এই কথাগুলি সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে ম্যাক্স্ মুলার বলেছেন, 'শোপেনহাওয়ার আদৌ এমন লোক ছিলেন না যে এলোমেলো ভাবে কিছু বলবেন, কিংবা তথাকথিত মরমিয়া এবং অব্যক্ত চিন্তা নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবেন। একথা বলতে আমার ভয়

* রোমাঁ রোলাঁ তাঁর বিবেকানন্দের জীবনী পুস্তকের পরিশিষ্টে 'প্রথম শতাব্দীর হেলেনিক-খৃস্টীয় মরমিয়া তত্ত্বের সঙ্গে হিন্দু মরমিয়া তত্ত্বের সম্বন্ধ' বিষয়ক দীর্ঘ মন্তব্যে দেখিয়েছেন যে 'বহু তথ্য থেকে জানা যায় খৃস্টীয় অব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রীক (হেলেনিক) চিন্তার সঙ্গে কত অধিক পরিমাণে প্রাচ্য ভাব মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল।'

কি লজ্জার কোনো কারণই নেই যে বেদান্ত সম্বন্ধে তিনি যে অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করেছেন আমিও তা অনুভব করি, আর আমি যে আমার মানবজীবন অতিবাহিত করে চলেছি, তার পথে এই শাস্ত্রগ্রন্থ হতে বহু সহায়তা পেয়ে কৃতজ্ঞতা অনুভব করি।'

আর একস্থানে ম্যাক্স্ মুলার বলেছেন, 'বেদান্ত দর্শনের উৎপত্তি উপনিষদে, আর এই পদ্ধতিতে মানুষের কল্পনা যতদূর উঠতে পারে উঠেছে।' 'যখন আমি বৈদান্তিক গ্রন্থ পাঠ করি তখনই হল আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা সুখকর সময়। এই সকল গ্রন্থ আমার কাছে প্রভাতের আলোর মত, নির্মল পার্বত্য বায়ুর মত। একবার বুঝতে পারলে, এত সহজ, এত সত্য।'

আইরিশ কবি এ. ই. (জি. ডব্লিউ. রাসেল) উপনিষদ্গুলি ও পরবর্তীকালের গ্রন্থ ভগবদ্গীতার প্রতি যে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য প্রদান করেছেন তা বড়ই চিত্তাকর্ষক। তিনি একস্থানে বলেছেন, 'গ্যেটে, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, ইমার্সন ও থোরো, এই আধুনিক কবিরা বিশেষ শক্তি ও জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা যা কিছু বলেছেন সে সমস্ত, এবং তার থেকেও অনেক বেশি আমরা প্রাচ্যের ধর্মগ্রন্থগুলি হতে পাই। ভগবদ্-গীতা ও উপনিষদ্গুলি এরূপ সর্ববিষয়ের জ্ঞানের আধার, যেন পূর্ণতায় এক একটি দেবতার সঙ্গে তুলনীয়। আমার মনে হয় এগুলির রচয়িতৃগণ যেন ছায়ার জন্য ছায়ার সঙ্গে সংগ্রামে সহস্রজন্ম পরমোৎসাহে যাপন করে শান্তভাবে পিছনে ফিরে, এই জন্ম সকলের সত্য অভিজ্ঞতা স্মৃতিপথে এনেছেন। তবে এমন নিশ্চয়তার সঙ্গে নানা বিষয়ে তাঁরা লিখতে পেরেছেন যা পড়ে মনে হয় এই হল চরম সত্য—এর মধ্যে দ্বিধা সন্দেহের অবকাশ নেই।'*

১০ : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক দার্শনিক মতের সুবিধা ও অসুবিধা

উপনিষদে বরাবর জোরের সঙ্গে শরীরের সুস্থতার ও মনের নির্মলতার প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে। প্রকৃত উন্নতি লাভ করতে হলে আগে শরীর ও মনকে নিয়মানুবর্তী করতে হবে। জ্ঞান হোক কি অন্য কোনো সফলতা হোক তা লাভ করতে হলে আত্মসংযম, আত্মনিগ্রহ ও আত্মত্যাগ আবশ্যক। এদেশে সমাজের উপরের অংশের চিন্তাশীল লোক এবং নিচের সাধারণ লোক, সকলেরই মনে প্রায়শ্চিত্ত, তপস্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে এরূপ একটা জন্মগত সংস্কার আছে। এটা আজও তেমনি আছে যেমন

* ছান্দোগ্য উপনিষদে একটি অদ্ভুত ও আশ্চর্য অংশ আছে : 'সূর্য কখনও অস্ত যায় না, উদিতও হয় না। লোকে যখন মনে করে যে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, তখন তা কেবল দিনের শেষে পৌঁছে পথবদল করে, আর তখন তার নিচে হয় রাত্রি, আর অন্যদিকে দিন। তারপর যখন লোকে মনে করে যে সূর্য প্রাতে উঠছে, তখন তা কেবল রাত্রির শেষে পৌঁছে দিক পরিবর্তন করে, এবং নিচে দিন ও অপরদিকে রাত্রি হয়। বস্তুত সূর্য কখনই অস্ত যায় না।'

ছিল হাজার হাজার বছর আগে; আর গান্ধীজির নেতৃত্বে দেশকে আলোড়িত করে যে জন-আন্দোলন দেখা দিয়েছে তার মূলগত মনস্তত্ত্ব বুঝতে হলে এই সংস্কারটিকে হৃদয়ঙ্গম করে নিতে হবে।

এটা দেখা যায় যে গভীর বিষয় সকল আয়ত্ত ছিল উপনিষদ্‌কারদের, কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় অল্প ছিলেন এবং পরিশুদ্ধ মানসিক পরিস্থিতির মধ্যে ছোট ছোট মণ্ডলী গঠন করে বাস করতেন। জনসাধারণ তাঁদের জীবন বুঝে উঠতে পারত না। তাঁদের ন্যায় সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন লোক সংখ্যায় অবশ্য অল্পই হয়ে থাকেন। যদি তাঁরা সমাজের অধিকাংশ লোকের সঙ্গে একমন হয়ে তাদের উপরের দিকে তুলতে ও উন্নত জীবন-লাভের জন্য প্রস্তুত করতে তৎপর হন তাহলে এই দুই শ্রেণীর লোকদের মধ্যেকার ব্যবধানটা কমে আসে, আর তখন একটি স্থায়ী এবং উন্নতিশীল সংস্কৃতি জন্মলাভ করে। সংখ্যায় অল্প হলেও, এইরূপ ক্ষমতাশালী লোক না থাকলে সভ্যতার পতন অবশ্যম্ভাবী। এরূপ ক্ষতি আরও এক কারণে হয়; যদি সংখ্যালঘিষ্ট উন্নত ব্যক্তি-দের ও সাধারণ লোকদের মধ্যেকার যোগ ছিন্ন হয়, এবং সমাজের সমগ্রতা ভেঙে যায়, তাহলে ঐ নেতৃবর্গ তাঁদের সৃষ্টিশক্তি হারিয়ে বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হন। অথবা, এমনও হতে পারে যে, সমাজবক্ষ হতে আর একটি সৃষ্টিশীল প্রবল শক্তি উত্থিত হয়ে তাঁদের স্থান গ্রহণ করে।

উপনিষদের কালের কোনো কাল্পনিক ছবি মনে আনা, অথবা তখনকার দিনে সমাজে যে সমস্ত শক্তি কাজ করছিল সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখা, আমার পক্ষে, এমন কি অধিকাংশ লোকের পক্ষেই একটা কঠিন কাজ। যাহোক আমার মনে হয় সে-সময়ের অল্পসংখ্যক চিন্তাশীল লোক এবং চিন্তালেশহীন জনসাধারণের মধ্যে বহুল পরিমাণে মানসিক এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্য থাকলেও একটা যোগও ছিল। তা না হলেও, ব্যবধানটা তেমন সুস্পষ্ট ছিল না। তখন সমাজে উঁচুনিচু ক্রম রক্ষিত হত, এবং মানসিক বিষয়েও একটা ক্রমবিন্যাস ছিল। এই ক্রমটিকে সকলেই স্বীকার করে নিয়েছিল, এবং তদনুসারে সমাজের মধ্যে প্রয়োজনানুরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই প্রকারে সামাজিক শান্তি রক্ষিত হত এবং বিরোধ এড়িয়ে চলা যেত। এমনকি উপনিষদের নবতর চিন্তাগুলিকেও লোকসাধারণের উপযোগী করে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হত যে তাদের ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কারের সঙ্গে মানিয়ে যেত। এতে অবশ্য চিন্তাগুলি যথাযথ থাকত না, তাদের অর্থ অনেক পরিমাণেই ক্ষুণ্ণ হত। এই সামাজিক ক্রমবিন্যাসে হস্তক্ষেপ না করে বরঞ্চ তাকে রক্ষাই করা হত। অদ্বৈতবাদ ধর্মাচরণের জন্য একেশ্বরবাদে পরিণত হয়েছিল, আর এর থেকে অনতিশুদ্ধ, কি নিম্নতর মত ও পূজাপদ্ধতিকে যে কেবল সহ্য করা হত তা নয়, ক্রমোন্নতির বিশেষ স্তরের উপযোগী বলে সেগুলি সম্বন্ধে লোককে উৎসাহিত করাও চলত।

এই সব থেকে বোঝা যায় যে উপনিষদের আদর্শতত্ত্ব জনসাধারণের কাছ পর্যন্ত তেমন পৌঁছয়নি, এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সৃষ্টিশীল লোক এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বিভেদ ঘটেছিল। কালক্রমে এর থেকে নূতন নূতন

আন্দোলন উপস্থিত হল—প্রবলভাবে দেখা দিল জড়বাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ, নিরীশ্বরবাদ। তারপর, এই সব আন্দোলনেরই ফলে বৌদ্ধধর্ম এবং জৈনধর্ম উদ্ভূত হল, আর রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্যদুটিতে বিরোধযুক্ত মতবাদ ও চিন্তাধারা-গুলিকে একসূত্রে গেঁথে নেবার জন্য আর একবার সংশ্লেষণের চেষ্টা করা হল। এইকালে, জাতির সৃজনশক্তির, অর্থাৎ সংখ্যালঘিষ্ঠ সৃষ্টিশীলদের শক্তির, কাজ বিশেষভাবে দেখা গিয়েছিল এবং পুনরায় ছোট ও বড় দুইদলের মধ্যে যোগও ঘটেছিল, এবং তারা মিলেমিশেই চলত।

এইভাবে যুগের পর যুগ কেটেছে, আর চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে, সৃজনশক্তি যেন সাহিত্য ও নাটকে, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যে, ভারতের সীমান্ত হতে দূরে সংস্কৃতি ও ধর্মপ্রচারের চেষ্টায় এবং উপনিবেশ স্থাপনের উদ্যমে ফুটে বের হয়েছে। মাঝে মাঝে আভ্যন্তরীণ কারণে এবং দেশের বাহির থেকে ব্যাঘাত আসায় অনৈক্য ও বিরোধ ঘটেছে; তবে এসব প্রশমিত হয়েছে এবং আবার সৃষ্টিশক্তির কাজ চলেছে। খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এই প্রকার যুগের শেষ পর্যায় আরম্ভ হয়, এবং বিভিন্ন দিকে তার প্রভাব দেখা যায়। খৃস্টীয় ১০০০ অব্দের কাছাকাছি, কি আরও আগে, ভারতের মানসিক জীবনে ক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পায়। শিল্পকৌশল তখনও অক্ষুণ্ন ছিল এবং সুন্দর সুন্দর দ্রব্য তখনও প্রস্তুত হত। নূতন নূতন জাতি জীবনের পৃথক পৃথক পটভূমিকা নিয়ে এদেশে উপস্থিত হয়ে যেন ভারতের ক্লান্তচিত্তে নূতন বল সঞ্চার করল, আর এরই ঘাতপ্রতিঘাতে নূতন নূতন সমস্যা দেখা দিল, আর সেগুলির সমাধানের জন্য নূতন প্রয়াসও জেগে উঠল।

আর্য-ভারতীয়দের গভীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্য তাদের সংস্কৃতিতে ভাল মন্দ দুই-ই দেখা দিয়েছিল। এর ফলে শুধু কোনো একটা যুগে নয়, বারবার, যুগে যুগে, অতি উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিরা আবির্ভূত হয়েছিলেন। আর এঁদেরই জন্য সমগ্র সংস্কৃতিতে গভীর আদর্শের ধারা বরাবর বয়ে এসেছে, এবং এখনও বয়, যদিচ ব্যবহারিক জীবনে তার তেমন পরিচয় না থাকতে পারে। তবু এই ধারা এবং অগ্রবর্তীগণের সৎ দৃষ্টান্তের জোরে সমাজকে অখণ্ড অবস্থায় রাখা গিয়েছিল, আর সমাজশৃঙ্খলা বারবার দুর্বল হয়ে পড়লেও তাকে প্রতিবারই পুনরায় সুগঠিত করে নেওয়া হয়েছিল। সভ্যতা ও সংস্কৃতি আশ্চর্যভাবে নানারূপে যেন পুষ্পিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে এবং এই উৎকর্ষ প্রধানত সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও জনসাধারণের মধ্যেও কতক পরিমাণে প্রসারিত হয়েছিল। সমাজের নেতাদের মধ্যে অপরের ধর্মমত ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে সহনশীলতা থাকায় তাঁরা, সমাজকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে, এমন অনেক বিরোধই এড়িয়ে চলতে পেরেছেন এবং সকল সময়েই একপ্রকার সাম্যাবস্থা রক্ষা করেছেন। সমাজের বৃহত্তর গণ্ডীর মধ্যে মানুষকে আপন পছন্দমত স্বাধীনভাবে বাস করার অনেক সুযোগ দিয়ে তাঁরা একটি পুরাতন জাতির উপযুক্ত সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। এই সব বিবেচনা করলে তাঁরা যে কতদূর সাফল্য লাভ করেছিলেন তা বেশ বোঝা যায়।

কিন্তু এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্যই আবার মানুষের সামাজিক দিকটাতে তাঁরা একপ্রকার জোর দেননি বললেই হয়, অর্থাৎ সমাজের প্রতি কর্তব্য তেমন মনোযোগ পায়নি। গুরুপুরোহিতদেরও একটা উঁচুনিচু ক্রমবিন্যাস ছিল। তাদের প্রত্যেকের জীবন আপন ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে নানাভাবে বিভক্ত হয়ে একরকম গতিহীন অবস্থা লাভ করত, আর তার কর্তব্য ও দায়িত্ব সেই সামান্য সমাজ-অংশের মধ্যে আবদ্ধ থাকত। সমগ্র সমাজের প্রতি তার কোনো কর্তব্য ছিল না, এমনকি সমাজের সমগ্রতার কোনো ধারণা তার থাকত না, আর এর মধ্যে যে তার একটি বিশেষ স্থান আছে একথা তাকে বুঝিয়ে দেবার কোনো চেষ্টাও হত না।

মানুষের পক্ষে সমাজের মধ্যে আপনাকে অনুভব করার ভাবটা হয়তো আধুনিক কালের, কোনো প্রাচীন সমাজে এটা ছিল না, সুতরাং পুরাতনকালের ভারতবর্ষে এর পরিচয় পাবার আশা করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর এবং জাতি-ভেদের উপরে যে ভারতবর্ষ জোর দিয়েছে তা সব সময়েই স্পষ্টরূপে দেখা গেছে। পরবর্তী কালে এটা মানুষের মনের পক্ষে কারাগারবিশেষ হয়েছে এবং তাতে যে কেবল নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা নয়, উচ্চজাতির লোকদেরও কম ক্ষতি হয়নি। আমাদের ইতিহাসে দেখা যায়, বরাবর এই কারণে দুর্বলতা এসেছে। এ-কথাও বলা যায় যে জাতিভেদ যতই কঠোর হয়েছে, মানুষের মনও ততই কঠিন হয়ে উঠেছে এবং জাতির সৃষ্টিশক্তিও ক্রমে লোপ পেয়েছে।

আর একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সকল রকম মত ও আচারব্যবহার, সকল রকম কুসংস্কার ও নির্বুদ্ধিতা অতিরিক্ত মাত্রায় সয়ে চলার কুফলও ফলেছে, কারণ অনেক কুপ্রথা এতে চিরস্থায়ী হয়েছে, আর অনেক পুরাতন রীতির বোঝা উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে আছে, কিন্তু মানুষ সেগুলিকে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। পুরোহিত-সম্প্রদায় যত বড় হয়েছে, তত সমাজের এই অবস্থা হতে স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ নিয়ে ও জনসাধারণের কুসংস্কারগুলিকে ভিত্তি করে তারা আপনাদের অধিকার গড়ে তুলেছে। এরা সম্ভবত খৃস্টীয়দের কোনো কোনো শাখার পুরোহিতদের মত অতটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি, কারণ সকল সময়েই ভারতে আধ্যাত্মিক নেতারা জন্মেছেন যাঁরা এরূপ কাজের নিন্দা করতেন। আর তা ছাড়া এদেশে অনেক প্রকারের ধর্মমত থাকায় লোকে আপন ইচ্ছামত তা বেছে নিতে পারত। তবু এদেশে পুরোহিতেরা এতটা শক্তিশালী ছিল যে সাধারণ লোকদের আয়ত্তে রেখে তারা নিজেদের সুবিধা করে নিত।

এইভাবে সমাজে একদিকে স্বাধীনচিন্তা আর অন্যদিকে পুরাতন পন্থা পাশাপাশি চলেছে। বিদ্যাভিমান ও নীতিবাগীশতা ও তদনুরূপ প্রথাপদ্ধতি বেড়ে উঠেছিল। সকল সময়েই পুরাতন জ্ঞানী ব্যক্তিদের নজির দেখান হত, কিন্তু তাঁদের সত্যবাণী-গুলির অর্থ পুরাতনভাবেই করা হত, অর্থাৎ যে-সমস্ত পরিবর্তন এসেছে তারই দিক থেকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা ছিল না। সৃজনশক্তি ও আধ্যাত্মিক বল কমে গিয়েছিল, আর পড়ে ছিল কেবল খোলাটা। একদিন এই খোলাই জীবন ও তাৎপর্যে পূর্ণ

ছিল। অরবিন্দ ঘোষ লিখেছেন, 'যদি উপনিষদের অথবা বুদ্ধের সময়ের কিংবা পরবর্তী প্রাচীনকালের কোনো ব্যক্তিকে বর্তমান ভারতে আনা যায়......তিনি দেখবেন যে তাঁর জাতি পুরাকালের বাইরের চেহারাটা, খোলাটা, যেন তার জীর্ণ কাপড়ের টুকরোটা ধরে আছে, আর তার মহত্ত্বের প্রায় সবই—দশভাগের নয় ভাগও বলা যায়—হারিয়েছে। তিনি দেখে বিস্মিত হবেন কতটা দুর্গতি এসেছে ভারতে—কত তার মনের দৈন্য, কতই পুরাতনের গতিহীন পুনরাবৃত্তি, বিজ্ঞান ও শিল্পের হীনতা আর সৃজনশক্তির অত্যধিক দুর্বলতা।'

১১: জড়বাদ

আমাদের অনেক দুর্ভাগ্য। এই দুর্ভাগ্যের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল এই যে, গ্রীস, ভারতবর্ষ ও অন্যস্থান হতে জগতের প্রাচীন সাহিত্যের অনেকাংশ হারিয়েছে। সম্ভবত'এসব হারাতই, কারণ এগুলি প্রথমত তালপাতা কিংবা ভূর্জপত্রে লেখা হয়েছিল, এবং পরে কাগজে লেখা হয়। কোনো একখানা গ্রন্থের কয়েকখণ্ড মাত্র তৈরি হত, সুতরাং সেগুলি হারিয়ে গেলে অথবা নষ্ট হলে, গ্রন্থখানি অদৃশ্য হত, আর তখন অন্য গ্রন্থে তার কোনো অংশ উদ্ধৃত হয়ে থাকলে, কিংবা সে-সম্বন্ধে আলোচনা পাওয়া গেলে কিছু পুনরুদ্ধার সম্ভব হত। তবু পঞ্চাশ-ষাট হাজার হাতে-লেখা সংস্কৃত পুঁথি, আসল অথবা পরিবর্তিত আকারে, খুঁজে পাওয়া গেছে এবং সেগুলির তালিকা প্রস্তুত হয়েছে। এখনও আরও পুঁথি আবিষ্কার করা চলছে। ভারতের অনেক প্রাচীন গ্রন্থ ভারতে পাওয়া যায়নি, কিন্তু চীন ও তিব্বতের ভাষায় সেগুলির অনুবাদ আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্ভবত, ধর্মপ্রতিষ্ঠানের ও মঠের এবং অপরাপর গ্রন্থশালায় সুব্যবস্থার সঙ্গে অনুসন্ধান করলে বহু মূল্যবান পুঁথি পাওয়া যেতে পারে। আমাদের শৃংখল ভেঙে ফেলতে পারলে যখন আমরা নিজেরা নিজেদের কাজ করতে পারব, এই প্রকারে পুঁথি সংগ্রহ করে সেগুলিকে বিচার করে দেখা, এবং আবশ্যক বোধ করলে সেগুলিকে প্রকাশ করা ও অনুবাদ করা আমাদের প্রধান প্রধান কাজের অন্তর্গত হবে। এই সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে, এবং এইগুলি নিয়ে আলোচনা করলে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেক অংশ আমাদের কাছে সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হবে, বিশেষত গুরুতর ঘটনাগুলি যা ঘটেছে ও মানুষের অনেক ধারণা যা বদলেছে এ সকলের সামাজিক পটভূমিকাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বহু পুঁথি অনেক দুর্ঘটনায় নষ্ট হয়েছে, এবং সুব্যবস্থিতভাবে পুরাতন পুঁথি আবিষ্কার করার চেষ্টাও হয়নি, তবু যে পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক পুঁথি পাওয়া গেছে এই থেকে বোঝা যায় প্রাচীনকালে কি অসামান্যরূপে প্রচুর পরিমাণে সাহিত্য, নাটক এবং দর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধীয় ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করা হয়েছিল। অনেক আবিষ্কৃত পুঁথি এখনও ভাল রকম পরীক্ষা করে দেখা হয়নি।

উপনিষদ্‌গুলির যুগ আরম্ভ হবার পরেই জড়বাদ বিষয়ে যে-সকল গ্রন্থ প্রস্তুত

হয়েছিল সেগুলি অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে সবই হারিয়েছে। এখন সেগুলি সম্বন্ধে যা কিছু জানা যায় তা জড়বাদের সমালোচনা থেকে, আর একে অপ্রমাণ বলে প্রতিপন্ন করার জন্য যে ফলাও রকমের চেষ্টা হয়েছিল সেই সমস্ত থেকে। যাই হোক, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে অনেক শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষে জড়বাদ প্রচলিত ছিল এবং তখন দেশবাসীর উপর তার প্রভাবও অতিশয় ছিল। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাবিষয়ে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' নামক গ্রন্থ খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে লিখিত হয়েছিল, এবং এখনও উচ্চশ্রেণীর দর্শন বলে এর উল্লেখ হয়ে থাকে।

আমাদের তাহলে সমালোচকদের এবং যারা এই দর্শনের নিন্দা করতে চেয়েছে তাদের উপরেই নির্ভর করতে হয়। এই সকল ব্যক্তিরা একে বিদ্রূপ করেছে এবং অসঙ্গত বলে প্রমাণ করতেও চেয়েছে। এই দর্শন আসলে কি ছিল তা জানবার জন্য যে এরূপ উপায় গ্রহণ করতে হয় তা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়। কিন্তু তারা যে এর প্রতি অনাস্থা দেখাতে এত আগ্রহ প্রকাশ করেছে এই থেকেই বোঝা যায় যে তাদের চোখে বিষয়টি গুরুতরই ছিল। সম্ভবত, জড়বাদবিষয়ের অধিকাংশ গ্রন্থই পুরোহিতেরা এবং অন্যান্য পুরাতনপন্থীরা পরবর্তীকালে নষ্ট করে ফেলেছে।

জড়বাদীরা প্রভুত্বপরায়ণ ব্যক্তিদের এবং চিন্তা, ধর্ম কি ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে যারা অধিকার বিস্তার করে বসেছিল তাদের বিরুদ্ধাচরণ করত। তারা বেদ এবং পৌরোহিত্য এবং বিশ্রুতিমূলক বিশ্বাসকে অস্বীকার করেছে, আর এই কথাও ঘোষণা করেছে যে বিশ্বাস স্বাধীন হওয়া আবশ্যক; পূর্বেই অনুমিত কোনো ধারণা কিংবা অতীতের কোনো মতের উপরে তাকে দাঁড় করান হলে চলবে না। সকলপ্রকার ইন্দ্রজাল ও কুসংস্কারকে তারা প্রকাশ্যে, উচ্চকণ্ঠে নিন্দা করত। তাদের সাধারণ মনোভাবকে আধুনিক জড়বাদীদের মতবাদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তারা চাইত, অতীতের বন্ধন, অতীতের বোঝা, যা দেখা যায়না তাই নিয়ে কল্পনা, আর কাল্পনিক দেবতার পূজা, এই সব থেকে মুক্তি। তাদের মতে যা কিছু সাক্ষাৎভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কেবল তারই অস্তিত্ব আছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, তাছাড়া সমস্ত অনুমান সমানে সত্যও হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে। সুতরাং বিচিত্র বস্তুসকল ও জগৎই প্রকৃতপক্ষে আছে এইরূপ বিবেচনা করাই ঠিক। আর কোনো জগৎ নেই, স্বর্গ কি নরক নেই, শরীর থেকে পৃথক কোনো আত্মাও নেই। মূলগত বস্তু হতেই মন, বুদ্ধি এবং আর সমস্ত উদ্ভূত হয়েছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য কি ঘটনাগুলির সঙ্গে মানুষ তাদের কি মূল্য নিরূপণ করে না করে তার কোনো সম্পর্কই নেই, আর মানুষের বিচারে কি ভাল কি মন্দ সে-বিষয়েও তারা উদাসীন। নৈতিক নিয়মকানুন মানুষের মনগড়া—সকলে মেনে নিয়েছে তাই আছে।

এসবই আমরা স্বীকার করি। আশ্চর্য, মনে হয় এগুলি যেন আমাদেরই সময়কার, দুহাজার বছর আগেকার দিনের নয়। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়, এই সকল ভাবনা সন্দেহ ও বিরোধ উঠল কেমন করে, এবং বহুকাল ধরে যে সকল অনুশাসন মানুষের

মনের উপর আধিপত্য করে এসেছে তাদের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ এল কোথা থেকে? তখনকার দিনের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আমরা জানি না, তবে খুব মনে হয় সে সময়টায় রাজনৈতিক বিরোধ ও সামাজিক বিভ্রাট চলছিল এবং ধর্মমতও ভেঙে ভেঙে পড়ছিল, আর এই অবস্থা হতে সন্তোষজনকভাবে নিষ্কৃতি পাবার উপায় সম্বন্ধে মনোরাজ্যে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে অন্বেষণ আরম্ভ হয়েছিল। এই মানসিক বিপর্যয় এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা হতে নূতন নূতন পথের উদ্ভব হয়েছে, এবং নূতন নূতন দার্শনিক তত্ত্ব রূপ গ্রহণ করেছে। উপনিষদ্ অগ্রসর হয়েছে মানুষের বোধের ভিত্তিতে; এখন নৈয়মিক দর্শন পাওয়া গেল নানা আকারে। এই নূতন দার্শনিক মতবাদ নিবিড়ভাবে যুক্তি ও তর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত—যেমন জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন এবং যাকে বলা যায় হিন্দু দর্শন। অবশ্য হিন্দু শব্দ ব্যবহার করছি অধিকতর উপযোগী শব্দ জানা নেই বলে। মহাকাব্য দুটি এবং ভগবদ্গীতাও এই সময়ের। এই যুগের ঘটনাগুলি কোনটির পর কোনটি ঘটেছে তার নির্ভুল পারম্পর্য স্থির করা সহজ নয়, কারণ চিন্তা ও অনুমান কখনও বা পৃথক পৃথক এসেছে, কখনও বা একত্র মিলে, আর এদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও ঘটেছে। বুদ্ধ এসেছিলেন খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে। কোনো কোনো ঘটনা তাঁর আগমনের পূর্বে ঘটেছে, কোনো কোনোটি পরে, অথবা একসঙ্গে পাশাপাশিও ঘটেছে।

বৌদ্ধধর্ম যখন প্রচলিত হয় প্রায় সেই সময়ে পারস্য সাম্রাজ্য সিন্ধুনদ পর্যন্ত পেঁাছেছিল। এত বড় শক্তি নিজ-ভারতবর্ষের সীমান্ত পর্যন্ত আসায় মানুষের মনে একটা প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই ঘটেছিল। খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে আলেক্‌জাণ্ডারের স্বল্পকালস্থায়ী আক্রমণ ঘটে। এটা বিশেষ কিছু ঘটনা নয়, কিন্তু এই থেকে ভারতে সুদূরপ্রসারিত অনেক পরিবর্তন আসতে আরম্ভ হল। আলেক্‌-জাণ্ডারের মৃত্যুর পরেই চন্দ্রগুপ্ত তাঁর বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য গড়ে তুললেন। ইতিহাসের দিক থেকে বলতে গেলে এই হল ভারতে প্রথম সুবিস্তৃত কেন্দ্রীভূত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। কিংবদন্তী হতে এরূপ অনেক রাজা ও সম্রাটের কথা জানা যায়, আর একখানি মহাকাব্যে ভারতবর্ষের—সম্ভবত উত্তর-ভারতের—সার্বভৌমত্বের জন্য যুদ্ধবিগ্রহের কথা আছে। কিন্তু মনে হয় প্রাচীন গ্রীসের ন্যায় প্রাচীন ভারত কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্যের সমষ্টি ছিল। কতকগুলি আয়তনে বৃহৎ গোষ্ঠীগত গণতন্ত্র এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যও ছিল। আর এ ছাড়া, গ্রীসের মতন শক্তিশালী বণিকসঙ্ঘসমন্বিত পৌররাজ্যও যে এদেশে ছিল তাও জানা যায়। বুদ্ধের সময়ে অনেকগুলি গোষ্ঠীগণতন্ত্র ও মধ্য-ভারত এবং গান্ধার বা আফগানিস্থানের অংশ অন্তর্ভুক্ত করে চারটি প্রধান রাজ্য ছিল। রাজ্যের গঠন যেমনই হোক, নগর ও পল্লীর স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পুরুষপরম্পরাগত বিধি অনুসারে সবল ছিল, এবং যেখানে উপরিতন কোনো শক্তিকে মানতে হত সেখানেও আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় বাইরে থেকে কেউ হস্তক্ষেপ করত না। একপ্রকারের আদিম জাতিদের ন্যায় প্রজাতন্ত্রও ছিল, যদিচ যেমন গ্রীসে তেমনি এখানেও কেবল উচ্চশ্রেণীর লোকেদের মধ্যেই তা চলত।

প্রাচীন ভারতবর্ষে এবং গ্রীসে অনেক বিষয়েই প্রভেদ থাকলেও তাদের মধ্যে সাদৃশ্যও এত ছিল যে আমার মনে হয়েছে যে এই দুই দেশে জীবনের পটভূমিকাও একই প্রকারের ছিল। অ্যাথেন্সের প্রজাতন্ত্র ভেঙে যায় পিলোপোনেশিয়ার যুদ্ধে; এর সঙ্গে মহাভারতে বর্ণিত প্রাচীন ভারতের মহাযুদ্ধের তুলনা করা যেতে পারে। গ্রীসের সংস্কৃতির এবং স্বাধীন পৌররাজ্যের পতনে সন্দেহ ও নৈরাশ্যের উদয় হল, মানুষ তখন রহস্য আর প্রত্যাদেশের উপর জোর দিতে লাগল, ফলে এই জাতির পূর্বের আদর্শ খাটো হয়ে গেল। এই জগৎ হতে পরজগতে বেশি ঝোঁক দেওয়া হতে লাগল। এর পর নূতন ধরনের তত্ত্ব প্রকাশ পেল—একদিকে বিষয়-বৈরাগ্য, অন্যদিকে ভোগবিলাস।

সামান্য সামান্য, এবং কখনও কখনও পরস্পর-বিরুদ্ধ, বিষয় কি তথ্য নিয়ে তুলনা-মূলক ঐতিহাসিক আলোচনায় ভ্রম উপস্থিত হয়, সুতরাং তাতে বিপদ আছে। তবু লোভ হয়। মহাভারতের যুদ্ধের পর দেশের মানসিক আবহাওয়া বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল। এই কথা আলোচনা করলে গ্রীসের সাংস্কৃতিক অধোগতির পরবর্তী কালের কথা মনে হয়। প্রথমেই হয়েছিল আদর্শের অধঃপতন, আর তারপর নূতন নূতন তত্ত্বের জন্য লক্ষ্যহীনভাবে অন্ধের মত হাতড়ে বেড়ান চলেছিল। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে এইরকম পরিবর্তন ভিতরে ভিতরে আসছিল। গোষ্ঠীগণ-তন্ত্র ও পৌররাজ্য ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল, আর কেন্দ্রীয় তন্ত্রের দিকে ঝোঁক দেখা দিয়েছিল বেশি।

কিন্তু এইপ্রকার তুলনায় বেশি দূর এগোন যায় না। গ্রীস এই যে আঘাত পেয়েছিল তা আর সামলে উঠতে পারেনি, যদিচ তার সভ্যতা ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে আরও কয়েক শতাব্দী ধরে জোরের সঙ্গেই কার্যকরী ছিল, এবং রোম ও ইউরোপে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভারত কিন্তু আশ্চর্যরূপে সামলে উঠেছিল, আর মহাকাব্যের যুগ হতে হাজার হাজার বছর, আর বুদ্ধের সময় হতে বরাবর, সৃষ্টিশক্তির পরিচয়ে পূর্ণ ছিল। দর্শন, সাহিত্য, নাটক, গণিত এবং শিল্প, এই সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা দেখিয়েছেন এমন অসংখ্য ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। খৃস্টীয় অব্দের প্রথম দিকে এদেশের লোকে শক্তিশালী হয়ে ওঠে ও উপনিবেশ স্থাপনের জন্য বিধিবদ্ধভাবে চেষ্টা করতে থাকে। এইরূপে পূর্বসমুদ্রের দ্বীপগুলিতে ভারতের লোক ও তাদের সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল।

১২: মহাকাব্য, ইতিবৃত্ত, ঐতিহ্য ও পুরাণ

প্রাচীন ভারতের দুই মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত। গ্রন্থরূপে এ দুটি মহাকাব্যকে গ্রথিত করতে কয়েক শতাব্দী লেগেছিল, এবং পরেও কিছু কিছু অংশ সংযুক্ত হয়েছিল। এ দুটিতে আর্য-ভারতীয়দের প্রথম দিকের কথা আছে—যখন তারা বিস্তৃতিলাভ করছিল এবং নিজেদের শক্তিকে ব্যূহবদ্ধ করে নিচ্ছিল তখনকার কথা।

কিন্তু মহাকাব্য দুটি রচিত ও সঙ্কলিত হয়েছিল এই সময়ের পরে। এই দুখানি গ্রন্থ যেমন জনসাধারণের মনের উপর ক্রমাগত ব্যাপ্তভাবে প্রভাব রক্ষা করে চলেছে কোনো স্থানের এমন আর কোনো গ্রন্থের কথা আমার জানা নেই। কোন অত্যাতিপ্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত এ দুখানি গ্রন্থ ভারতবাসীর কাছে জীবন্ত শক্তির উৎস হয়ে আছে। কয়েকজন পন্ডিত ব্যক্তি ব্যতীত অপরের কাছে সংস্কৃতভাষায় গ্রন্থ দুখানির চল নেই, কিন্তু ভাষান্তরিত ও লোকসাধারণের উপযোগী পরিবর্তিত আকারে এবং কিংবদন্তী ও কাহিনী যেভাবে ছড়িয়ে পড়ে সেইভাবে, বই দুটি দেশবাসীর জীবনের অপরিহার্য অংশবিশেষ হয়ে উঠেছে।

সংস্কৃতিতে কোনো দেশের সকল লোক সমানভাবে উন্নত হতে পারে না। একদিকে উচ্চশ্রেণীর বিদ্বান লোক দেখা যায়, অন্যদিকে নিরক্ষর ও অশিক্ষিত পল্লীবাসীদের মেলে, আর এদের মাঝামাঝি উন্নতির বিভিন্ন স্তরে বহু ব্যক্তি থাকে। মহাকাব্য দুটি যে ভাবে ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করেছে তা সকল প্রকার লোকের প্রয়োজন একসঙ্গে মেটাবার যে ভারতীয় বিশেষ পদ্ধতিটি আছে তদনুসারেই ঘটেছে। এ হতে আমরা সেই গূঢ় রহস্যটির কতকটা বুঝতে পারি যার জোরে অতীতের ভারতীয়েরা বৈচিত্র্যময়, নানাপ্রকারে বিভক্ত এবং জাতিভেদের জন্য নানা ধাপে বিন্যস্ত সমাজকে অখন্ডভাবে রাখতে পেরেছিলেন। তাঁরা বহু অসামঞ্জস্যকে সহজ করে এনে সকলকে যে জীবনের পটভূমিকাটি দিয়েছিলেন তাতে ছিল চিরাগত বীরত্বের ভাব আর নৈতিক আদর্শ। সমস্ত বিভিন্নতা সত্ত্বেও, সেসব ছাপিয়ে, এদেশের লোকের দৃষ্টি-ভঙ্গীতে যে ঐক্য দেখা যায় তা অনেক বিবেচনার পর চেষ্টা করেই আনা হয়েছে।

আমার শৈশবের সর্বাপেক্ষা পুরাতন স্মৃতি হল এই যে ইংলন্ড ও আমেরিকায় যেমন শিশুরা পরীদের উপকথা কি সাহসিকদের গল্প শোনে আমিও তেমনি আমার মা কি তাঁর অপেক্ষাও অধিকবয়স্কা বাড়ির মহিলাদের কাছে এই মহাকাব্য দুটির গল্প শুনতাম। এ ছাড়া, প্রতি বৎসর মুক্ত আকাশের নিচে লোকপ্রিয় রামায়ণী কথা অভিনয়ের সময়ে আমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হত। বহু লোক তা দেখতে আসত এবং মিছিলে যোগ দিত। যা হত তাকে অমার্জিত বলতে হয়, কিন্তু তাতে কি আসে যায়, কারণ গল্পটি সকলেরই জানা, আর সময়টা উৎসবের, আমোদের।

এইরূপে ভারতবর্ষের পৌরাণিকী কথা ও চিরাচরিত রীতিনীতি ধীরে ধীরে আমার মনে প্রবেশ করে কল্পনাপ্রসূত অনেক কিছুর সঙ্গে মিশে গেল। আমার মনে হয় না যে আমি কোনোদিন এই সকল গল্পগুলিকে প্রকৃত বলে মনে করেছি, বরঞ্চ সেগুলিতে যে ইন্দ্রজাল কি অলৌকিক অংশ থাকত তার সমালোচনা করতাম। কিন্তু কল্পনার রাজ্যে সেগুলি আমার কাছে তেমনি সত্য ছিল, যেমন ছিল আরব্যোপন্যাসের গল্প কিম্বা পঞ্চতন্ত্রের* উপকথা। এই পঞ্চতন্ত্র জীবজন্তুর গল্পের ভান্ডার এবং

* এশিয়া ও ইউরোপের বহু ভাষায় পঞ্চতন্ত্রের অসংখ্য অনুবাদ হয়েছে, আর এগুলির বিবরণ দীর্ঘ ও কৌতূহলকর। প্রথম অনুবাদ সম্বন্ধে জানা যায় যে তা হয়েছিল সংস্কৃত

এ থেকে পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপ অনেক নিয়েছে। যতই বড় হতে লাগলাম, আমার মনে আরও অনেক ছবি ভিড় করে আসতে লাগল, যেমন ভারতীয় এবং ইউরোপীয় উপকথা, গ্রীকদের পৌরাণিক কাহিনী, জোন্ অফ আর্ক-এর গল্প, অ্যালিস ইন্ ওয়ান্ডারল্যান্ড্, আকবর ও বীরবলের গল্পগুলি, শার্লক হোম্‌সের গল্প, রাজা আর্থার ও তাঁর নাইট্‌দের গল্প, সিপাহী বিদ্রোহের তরুণী বীরাঙ্গনা ঝাঁসির রানীর কথা, রাজপুতদের শৌর্য ও বীরত্বের কাহিনী। এইগুলি এবং আরও অনেক গল্প মিশ্রিত হয়ে আমার মনে একটা আশ্চর্য রূপ ধারণ করল, কিন্তু এই সবের পশ্চাতে রইল আমাদের দেশের যে পৌরাণিকী কথা শৈশবে শুনেছি, তারই পটভূমিকা।

আমি মানুষ হয়েছি অনেক প্রকারের প্রভাবের মধ্যে, তবু যখন পৌরাণিকী কথা প্রভৃতি আমার মনের উপর এইভাবে কাজ করেছে, সহজেই অনুমান করতে পারলাম, অন্য লোকের, বিশেষত অশিক্ষিত সাধারণ লোকের, মনের উপর তাদের প্রভাব কতদূর হয়েছে। এই প্রভাব সাংস্কৃতিক ও নৈতিক উভয় প্রকারে কল্যাণকর। এগুলিতে গল্পের আকারে বহু বিষয়ের নিদর্শন কাল্পনিক প্রতীকরূপে আছে, আর মোটের উপর এগুলি সুন্দর। এগুলিকে নষ্ট হতে দিলে তা বড়ই পরিতাপের বিষয় হবে।

ভারতের এই গল্পগুলি কেবল মহাকাব্যেই আছে এমন নয়। কিছু কিছু বৈদিক যুগ থেকে চলে আসছে, আর সংস্কৃত সাহিত্যে নানা রূপে এবং নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কবি এবং নাটকরচয়িতারা এগুলিকে ব্যবহার করে এদেরই চারদিকে আপনাদের মনোহর কল্পনা সাজিয়ে তুলেছেন। অশোকগাছ নাকি সুন্দরী নারীর পাদস্পর্শে পুষ্পিত হয়ে ওঠে। আমরা পড়ি কামদেবের কার্যকলাপের কথা, পত্নী রতিদেবীর ও বন্ধু বসন্তের সাহচর্যে। কামদেব অসমসাহসে তাঁর পুষ্পশর নিক্ষেপ করলেন শিবের উপর, আর শিবের তৃতীয় চক্ষু হতে প্রক্ষিপ্ত অগ্নিতে ভস্মীভূত হলেন। তারপর অতনু হয়ে অনঙ্গ নাম পেলেন।

থেকে পহ্লবীতে, খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি, পারস্যের সম্রাট খস্রু অনুশীরওয়ান-এর ইচ্ছানুসারে। এর অল্পকাল পরে (৫৭০ খৃস্টাব্দ) একটি সীরীয় ভাষায় অনুবাদ দেখা দেয়, এবং তার পরেই আরব্য ভাষায়। একাদশ শতাব্দীতে সীরীয়, আরব্য ও পারস্য ভাষায় নূতন অনুবাদ পাওয়া যায়; এরই শেষেরটি 'কালীয় দমন' নামে বিখ্যাত হয়েছিল। পঞ্চতন্ত্র এই সকল অনুবাদরূপে ইউরোপে পৌঁছেছিল। একাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি সীরীয় ভাষা হতে গ্রীক ভাষায় এবং তার অল্প পরে হিব্রুভাষায় এর অনুবাদ হয়েছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে অনেকগুলি অনুবাদ ও পরিবর্তিত আকারের গল্প বের হয় ল্যাটিন, ইতালীয়, স্প্যানিশ, জার্মান, সুইডিশ, দিনেমার, ডাচ্, আইসল্যান্ডিশ, ফরাসী, ইংরাজি, হাঙ্গেরিয়, তুর্কি এবং আরও অনেক স্লাভ ভাষায়। এইরূপে পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলি এশিয়া ও ইউরোপের সাহিত্যগুলিতে মিশে গিয়েছিল।

অধিকাংশ পৌরাণিকী কথা ও গল্প বীরত্বব্যঞ্জকরূপে কল্পিত হয়েছে। অধিকাংশই সত্যানিষ্ঠা ও ফল সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষার শিক্ষা দেয়। মৃত্যু পর্যন্ত, এবং তার পরেও, বিশ্বস্ত থাকার, সাহসের আর সর্বসাধারণের কল্যাণে পরিশ্রম ও আত্মোৎসর্গের শিক্ষাও সেগুলি হতে পাওয়া যায়। কখন কখনও গল্প নিছক কল্পনা, কখনও বা প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে মিশ্রিত—কোনো ঘটনার কিংবদন্তী থেকে পাওয়া অত্যুক্তিপূর্ণ বিবরণ। পৃথক ঘটনা ও কল্পনা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনভাবে পরস্পর বিজড়িত যে তাদের পৃথক করা যায় না, আর শেষে এই মিশ্রণটি কাল্পনিক ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সব থেকে অবশ্য বোঝা যায় না ঠিক কি ঘটেছিল, কিন্তু সমানই মূল্যবান আর কিছু পাওয়া যায়। জানতে পারি, যা ঘটেছে সে সম্বন্ধে লোকে কি বিশ্বাস করত, তাদের বীর পূর্ববর্তীদের কত শক্তি ছিল এবং কি আদর্শসকল তাঁদের অনুপ্রাণিত করত। এইরূপে, প্রকৃত হোক কাল্পনিক হোক, এই মিশ্রিত কথা লোকসাধারণের জীবনে জীবন্তভাবে কাজ করেছে। সকল সময় তাদের দৈনন্দিন জীবনের কঠিন পরিশ্রম এবং কদর্যতা থেকে উন্নত ক্ষেত্রে টেনে তুলতে চেয়েছে, এবং আদর্শ দূরবর্তী এবং দুরূহ হলেও সকলকে প্রচেষ্টা ও প্রকৃত জীবনের পথ দেখিয়েছে।

যারা রোমের প্রাচীন বীরদের গল্প, লুক্রেশিয়া ও অন্যান্য গল্পকে কৃত্রিম ও মিথ্যা বলেছে, গ্যেটে তাদের অত্যন্ত নিন্দা করেছেন বলে শোনা যায়। তিনি বলেছেন, যা কিছু মূলত অপ্রকৃত ও মিথ্যা তা কেবল অসঙ্গত ও নিষ্ফলই হতে পারে, কখনই সুন্দর হয় না, কোনো অনুপ্রাণনাও দিতে পারে না। আরও বলেছেন, 'রোমানরা যখন এতই মহান ছিলেন যে এইসকল রচনা করতে পেরেছিলেন, আমাদেরও উচিত ততখানি মহান হওয়া যে এইগুলিকে বিশ্বাস করতে পারি।'

এই আনুমানিক ইতিহাস তাহলে প্রকৃত ঘটনা ও কল্পনার মিশ্রণে পাওয়া, অথবা কেবল কল্পনায় তৈরি, কিন্তু তবু প্রকৃত বিষয়ের নিদর্শন এতে আছে, কারণ এই থেকে তখনকার দিনের লোকেদের মন, অন্তঃকরণ ও উদ্দেশ্যের বিষয়ে আমরা জানতে পারি। আর এক ভাবে এটা সত্য, তা এই যে ভবিষ্যতের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হবার মত চিন্তা ও কর্মের মূলও এতেই আছে। তত্ত্ব ও ধর্মের মধ্যে কল্পনা ও নীতির দিকে যে ঝোঁক দেখা গিয়েছিল ভারতের প্রাচীনকালের ইতিহাসের ধারণাতেও তা ছিল। কেবলমাত্র বিবৃতি কিংবা ঘটনার বিবরণী সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হত না। যা জোর পেত সে হল, সেইরূপ তথ্য যা হতে জানা যায় মানবজীবনের ঘটনা-পরম্পরা কিভাবে বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষের কার্যকলাপের উপর ও তার আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। গ্রীকদের ন্যায় তারা অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ ছিল, আর তাদের ছিল শিল্পী-মনের দক্ষতা। অতীতের ঘটনা নিয়ে আলোচনার সময় এই দক্ষতা ও কল্পনার রাস ছেড়ে দিত, লক্ষ্য থাকত ভবিষ্যতের জন্য নীতি কি শিক্ষা লাভ করার উপর।

গ্রীকেরা, চীনবাসীরা এবং আরবেরা ইতিহাস রক্ষায় তৎপর ছিল, কিন্তু ভারতীয়েরা

তা ছিল না। এটা বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা, কারণ আমাদের পক্ষে ঐতিহাসিক তারিখ স্থির করা কিংবা ঘটনার নির্ভুল পারম্পর্য নির্দেশ করা কঠিন হয়ে উঠেছে। এইজন্য অনেক ঘটনা নিয়ে আলোচনার সময় একটার মধ্যে আর একটা প্রবেশ করে, অথবা একটার উপর আর একটা চড়ে বসে, এবং শেষে জটলার সৃষ্টি হয়। বর্তমান সময়ে পণ্ডিতেরা সহিষ্ণুভাবে ধীরে ধীরে এই ভারতেতিহাসের গোলকধাঁধার পথ আবিষ্কার করছেন। প্রকৃতপক্ষে খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে লেখা কাশ্মীরের ইতিহাস কহ্লনকৃত 'রাজতরঙ্গিণী'ই একমাত্র পুরাতন গ্রন্থ যাকে ইতিহাস বলা যেতে পারে। বাকি ইতিহাসের জন্য মহাকাব্যে কি অন্যান্য পুস্তকে কল্পনার সঙ্গে মিশে যা কিছু আছে তাই নিয়ে কাজ চালাতে হয়, কিংবা তখনকার দিনের কোনো লিখিত বিবরণ, ক্ষোদিত লিপি, শিল্প এবং স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ, পুরাতন মুদ্রা অথবা সুবিপুল সংস্কৃত সাহিত্য হতে মাঝে মাঝে যা ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে তারই সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। তাছাড়া অবশ্য বিদেশী ভ্রমণকারীদের, বিশেষত গ্রীস ও চীন থেকে, এবং পরবর্তী কালে আরব থেকে, যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের লিখিত বিবরণ হতেও সাহায্য মেলে।

ইতিহাস রক্ষা করা সম্বন্ধে দৃষ্টির অভাবে আমাদের জনসাধারণের কিন্তু কোনো অনিষ্ট হয়নি, কারণ তারা অন্যদেশের ন্যায় এদেশেও, আর মনে হয় বেশি করেই পুরুষপরম্পরায় যে সমস্ত কিংবদন্তী, পুরাণ কি কাহিনী পেয়েছিল সেই সমস্ত হতে অতীতকাল সম্বন্ধে তাদের ধারণা গড়ে নিত। এই আনুমানিক ইতিহাস—প্রকৃত ঘটনা এবং কাহিনীর মিশ্রণ—সাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করে জীবনের একটা শক্তিশালী ও স্থায়ী পটভূমিকা রচনা করে দিত। তবু ইতিহাস উপেক্ষিত হওয়ায় যে কুফল ফলেছে তা আমরা এখনও ভোগ করছি। এই থেকে এসেছে দৃষ্টিভঙ্গীতে অস্পষ্টতা, প্রকৃত জীবন সম্বন্ধে ধারণার অভাব, আর এরই জন্য আমাদের মন অত্যন্ত বিশ্বাসপ্রবণ, এবং প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে তার এমন এলোমেলো ভাব—যেন সম্বদ্ধভাবে বিবেচনা করার শক্তির অভাব আছে। কিন্তু এই মনই দর্শনশাস্ত্রের ক্ষেত্রে এরূপ ভাবের কোনো পরিচয় দেয়নি, যদিচ এ ক্ষেত্রটি বহুলপরিমাণে দুরূহ, স্বভাবত অস্পষ্ট এবং অনিশ্চিত। এখানে এই মন বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ এই দুয়েরই শক্তি দেখিয়েছে, প্রায়ই গভীরভাবে পরীক্ষা না করে কিছু গ্রহণ করেনি, আর সময়ে সময়ে সংশয়বাদেরও পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু ঘটনা সম্বন্ধে এরূপ পরীক্ষার ভাব ছিল না, বোধ হয় যা কেবলমাত্র ঘটনা তাতে গুরুত্বই আরোপ করা হত না।

বিজ্ঞানের প্রভাব আর বর্তমান জগতের ধারা দুয়ে মিলে আমাদের জীবনে কতকগুলি পরিবর্তন এনেছে। যা ঘটে তাকে এখন যোগ্যভাবেই বিবেচনা করা হয়, আমাদের চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা না করে কিছু গ্রহণ করে না, এখন সকল কিছুই বিচার করে দেখা হয় এবং বহুদিন ধরে কোনো কিছু চলে এসেছে বলে তাকে স্বীকার করতেই হবে এ-নীতি এখন গ্রাহ্য নয়। বহু সুযোগ্য ঐতিহাসিক আজকাল কর্মে নিযুক্ত আছেন; তাঁরা আবার অন্যদিকে অতিরিক্তরকম গিয়ে থাকেন, এবং সেইজন্য

তাঁদের কাজ যতটা ঘটনার নির্ভুল বিবরণ হয়ে দাঁড়ায় ততটা জীবনের পরিচয়ে পূর্ণ ইতিহাস হয় না। তবু এ বড় আশ্চর্য যে আজও আমাদের মন হঠাৎ চিরাচরিত রীতিনীতিতে আচ্ছন্ন হয়, আর আমাদের বিচারশক্তি অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। এর একটা কারণ। এই হতে পারে যে আমাদের পরাধীন অবস্থায় জাতীয়তা আমাদের গ্রাস করেছে। যখন আমরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন হব তখন আমাদের মন স্বাভাবিকভাবে, সুযুক্তির সঙ্গে কাজ করবে।

অল্পকাল আগে, একদিকে বিচার ও যুক্তির দৃষ্টিভঙ্গী, আর অন্যদিকে ঐতিহ্যের অনুকূল জাতীয়তা, এই দুয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তার একটা তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়েছিল, এই দৃষ্টান্ত থেকে পার্থক্যের বিষয়টি বেশ বোঝা যায়। ভারতের অধিকাংশ অংশে বিক্রমসম্বৎ পঞ্জিকা চলে; এই পঞ্জিকা সৌর বৎসর অনুসারে গণনা করা হয়, কিন্তু মাসগুলি চান্দ্র। এই পঞ্জিকা অনুসারে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দুহাজার বছর পূর্ণ হয়ে তৃতীয় হাজার বছর আরম্ভ হয়েছে। এই উপলক্ষে ভারতবর্ষের সর্বত্র উৎসব-অনুষ্ঠান পালিত হয়েছে, আর এর স্বপক্ষে এই দুই যুক্তি দেখান হয়েছে যে এটা সময়ের গণনায় একটা বিশেষ ক্ষণ, আর যাঁর নামের সঙ্গে এই পঞ্জিকা যুক্ত, বিক্রম বা বিক্রমাদিত্য, তিনি জনশ্রুতিতে লোকসাধারণের কাছে বীরত্বের জন্য বিখ্যাত। তাঁর নামের সঙ্গে বহু গল্প জড়িত। মধ্যযুগে এই সকল গল্পের অনেকগুলি বিভিন্ন আকারে এশিয়ার বহু অংশে, এবং পরে ইউরোপেও, প্রচারিত হয়েছিল।

বিক্রমকে বহুদিন ধরে আমাদের জাতির রাজাদের মধ্যে আদর্শ পুরুষ বলে বিবেচনা করা হয়ে আসছে। বিদেশী আক্রমণকারীদের তিনি বিতাড়িত করেছিলেন বলে তাঁর প্রসিদ্ধি আছে। তবে তাঁর খ্যাতি তাঁর রাজসভার সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎকর্ষের জন্যই বেশি, কারণ তিনি সেখানে কতকগুলি বিখ্যাত গ্রন্থকার, শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞদের সংগ্রহ করেছিলেন; 'নবরত্ন' নামে তাঁরা পরিচিত। তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত অধিকাংশ গল্পে বর্ণিত আছে যে প্রজাদের কল্যাণে তাঁর প্রভূত আগ্রহ ছিল, এবং অপরের উপকারে তিনি আপন সুবিধা, এমনকি নিজেকেও, উৎসর্গ করতে সকল সময়েই প্রস্তুত ছিলেন। দাক্ষিণ্য, পরসেবা, সাহস এবং অহমিকাশূন্যতার জন্যে তিনি বিখ্যাত। মূলত, তিনি সৎলোক ছিলেন এবং সদ্‌গুণের ও জ্ঞানের পোষকতা করতেন বলে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। এইসকল গল্পে তাঁর যুদ্ধে বীরত্ব ও জয়ের কথা বড় বিশেষ পাওয়া যায় না। এই যে তাঁর মহত্ত্ব ও আত্মত্যাগের উপর জোর দেওয়া হয়েছে এটা ভারতীয় মন এবং ভারতীয় আদর্শের বিশেষত্বের জন্যই। সীজারের মত বিক্রমাদিত্য নামটিও একপ্রকার প্রতীক ও উপাধিবিশেষ হয়ে উঠেছিল, এবং তার পরবর্তী বহু রাজ্যশাসক এই উপাধি আপনাদের নামে যোগ করে নিয়েছিল। এতে গোলমালেরই সৃষ্টি হয়েছে, কারণ ইতিহাসে বহু বিক্রমাদিত্যের নাম পাওয়া যায়।

এই বিক্রম কে ছিলেন এবং কবে রাজত্ব করেছিলেন? ঐতিহাসিকভাবে, সবই

অস্পষ্ট। বিক্রমসম্বতের আরম্ভ ৫৭ খৃস্টপূর্ব অব্দে, কিন্তু এর কাছাকাছি এই নামের কোনো রাজার সন্ধান পাওয়া যায় না। উত্তর-ভারতে খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে একজন বিক্রমাদিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তিনি হূন আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করেছিলেন। অনেকের মতে এ'রই রাজসভায় 'নবরত্ন' ছিলেন, আর গল্পগুলি তাঁরই বিষয়ে। এখন প্রশ্ন দাঁড়াল কিরূপে এই খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে যে অব্দ খৃঃ পূঃ ৫৭-তে আরম্ভ হয়েছে তার যোগ সম্ভব? একটা উত্তর এই হতে পারে যে মধ্যভারতের মালব রাজ্যে খৃস্টপূর্ব ৫৭-তে আরব্ধ একটি অব্দ প্রচলিত ছিল এবং বিক্রমের সময়ের অনেককাল পরে এই অব্দটি তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ও তার নূতন নাম দেওয়া হয়েছিল বিক্রমসম্বৎ। কিন্তু এ সমস্তই অস্পষ্ট এবং অনিশ্চিত।

এ বড়ই আশ্চর্য যে আমাদের দেশের বিশেষ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ২০০০ বছর আগে যে-অব্দের শুরু হয়েছে তার সঙ্গে জনশ্রুতির এই বীরনায়কের নাম যোগ করার জন্য ইতিহাস নিয়ে একটু খেলাই খেলেছেন। এ কথাটাও জোরের সঙ্গেই বলা হয়েছে, তিনি বিদেশী শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং একটি জাতীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ভারতে ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, বিক্রমের রাজ্য উত্তর ও মধ্যভারতের বাইরে বিস্তৃত হয়নি।

একথা ঠিক নয় যে কেবল ভারতীয়েরাই জাতীয়তার প্রেরণা লাভ করে ইতিহাস লেখায় ও ইতিহাসের আলোচনায় জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। সুবিধা নেওয়ার জন্য নিজেদের অতীতকে একটু সোনার জলে রঙ করে সাজিয়ে একটু বা ইতরবিশেষ করে প্রকাশ করার চেষ্টা সকল জাতির লোকেদের মধ্যে দেখা গেছে। ভারতের যে ইতিহাস আমাদের অধিকাংশকেই পড়তে হয়েছে তা বেশির ভাগই ইংরাজদের লেখা; তাতে পাওয়া যায় ইংরাজশাসনের প্রয়োজন ও তার উপযোগিতা সম্বন্ধে দীর্ঘ বাগাড়ম্বর; আর পাওয়া যায় তাদের এদেশে আসার আগের হাজার বছরে যা ঘটেছিল সে সম্বন্ধে একপ্রকার খোলাখুলিভাবেই অবজ্ঞাপ্রকাশ। বাস্তবিকই, ইংরাজদের কাছে ভারতের প্রকৃত ইতিহাসের শুরু তাদের এদেশে আসার সঙ্গে সঙ্গে; তার আগেকার যা কিছু তা জগদীশ্বরের এই ইচ্ছা যাতে পূর্ণ হয় যেন সেই কারণে একপ্রকার অব্যক্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার জন্যই ঘটেছে! এমনকি, ইংরাজ-অধিকারকালের ইতিহাসকেও এরূপে বিকৃত করা হয়েছে যাতে ইংরাজশাসনের গৌরব ও ইংরাজের সদ্গুণ প্রকাশ পায়। অত্যন্ত ধীরে হলেও, এখন অধিকতর নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গী উন্মেষিত হচ্ছে। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য, কিংবা কারও শখ কি পক্ষপাতিত্বের কারণে, ইতিহাসে যে-সমস্ত অদলবদল করা হয়েছে তার দৃষ্টান্তের জন্য অতীতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। বর্তমান সময়েই তার নিদর্শন যথেষ্ট মেলে; আমরা যে কালকে জানি, দেখেছি, এবং যার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তাকেই যখন এতটা বিকৃত করা হয়েছে, অতীতের কথায় আর কাজ কি? তবু এটা সত্য যে বিচার না করে এবং ভাল করে না জেনে জনশ্রুতিতে আস্থা স্থাপন করার আর তাকে

ইতিহাস আখ্যা দেওয়ার দিকে আমাদের দেশের লোকের ঝোঁক আছে। এইরূপ শিথিল চিন্তা ও অসাবধানভাবে সিদ্ধান্ত করার অভ্যাস আমাদের ছাড়তে হবে।

কিন্তু আমি অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছি। আমাদের আলোচনা চলছিল দেবদেবী সম্বন্ধে আর পুরাণ, কাহিনী, এই সব যখন আরম্ভ হয়েছিল সেই কালের বিষয়ে। এ সেই কাল যখন জীবন ছিল পূর্ণ, প্রকৃতির সঙ্গে একসুরে বাঁধা, যখন মানুষের মন বিস্ময়ে ও আনন্দে বিশ্বের রহস্যের দিকে তাকিয়ে থাকত, যখন স্বর্গ ও পৃথিবীকে পরস্পরের অতি নিকট বলেই মনে হত, আর দেবদেবীরা কৈলাস থেকে, কিংবা হিমালয়ে তাঁদের অন্যান্য আবাসস্থান থেকে, নেমে আসতেন। ঠিক এমনি করেই অলিম্পাসের দেবতারা নেমে এসে নরনারীর সঙ্গে খেলা করতেন, কখনও বা তাদের শাস্তিবিধানও করতেন। জীবনের এই প্রাচুর্য হতে, সমৃদ্ধ কল্পনা হতে, কত পুরাণের গল্প, কত কাহিনী পাওয়া গেছে, কত শক্তিশালী ও সুন্দর দেবদেবী উদ্ভূত হয়েছেন, কারণ প্রাচীন ভারতের অধিবাসীরা, গ্রীকদের মতই, জীবন ও সৌন্দর্যকে ভালবাসত। অধ্যাপক গিলবার্ট মারে অলিম্পিয়ার দেবদেবীসমূহের নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্যের কথা বলেছেন। তিনি যা বলেছেন তা ভারতবাসীর প্রাচীন মানসসৃষ্টি সম্বন্ধেও খাটে। এই দেবদেবী শিল্পীর স্বপ্ন, আদর্শীভূত গুণাবলীর প্রকাশ ও রূপকের ব্যঞ্জনা; তাঁরা যেন তাদেরও অতীত কিছুর অর্ধত্যক্ত ঐতিহ্যের, অজ্ঞানকৃত ছলনার, মানবের উচ্চাভিলাষের প্রতীক। তাঁরা সেই দেবতা, সন্দিগ্ধ তাত্ত্বিক তাঁর সমস্ত তাত্ত্বিকসুলভ সাবধানতার সঙ্গে যাঁদের অর্চনা করতে পারেন, যেন অন্তরকে জানার জন্য যে উজ্জ্বল অনুমিতিগুলি গ্রহণ করা হয়েছে তারই পূজা চলেছে। এ'রা তেমন দেবতা নন যাঁদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্যের মত স্বীকার করে নিতে হয়।* অধ্যাপক মারে আরও যা বলেছেন তাও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খাটে। 'মানুষ যদি একটি অতীব সুন্দর প্রতিমা ক্ষোদিত করে, তাকে দেবতা বলা যায় না, সেটি একটি প্রতীকমাত্র, দেবতার ধারণা লাভের জন্য ঐরূপে ক্ষোদিত হয়েছে; তেমনি কোনো দেবতার ধারণা মনে এলেই তা সত্য হয় না কিন্তু তাও প্রতীক, সত্যের প্রত্যয় লাভের সহায়।......তাঁরা এমন কোনো মতবাদ প্রচার করেননি যা জ্ঞানের বিরুদ্ধ, এমন কোনো অনুশাসনও দেননি যা পালন করতে আপন অন্তরের আলোককে অস্বীকার করে অপরাধী হতে হয়।'

ধীরে ধীরে বৈদিক এবং অন্যান্য দেবদেবীর দিনগুলি পিছনের পটভূমিকায় মিলিয়ে গেল, এবং দুরধিগম্য দর্শনশাস্ত্রের দিন এসে পড়ল। কিন্তু মানুষের মনে দেবপ্রতিমাগুলি এখনও ভেসে বেড়ায়—তাদের আনন্দের সাথী, বিপদের বন্ধু, এবং তাদের অস্পষ্টভাবে অনুভূত আদর্শ ও উচ্চাভিলাষের প্রতীক। আর তাদের চারিদিকে কবিরা তাঁদের কল্পনা সাজিয়ে নিলেন, তাঁদের স্বপ্নসৌধ গড়ে তুললেন—কত তাতে

* এইটি ও পরবর্তী উদ্ধৃতি গিলবার্ট মারের "ফাইভ স্টেজেস্ অফ গ্রীক রিলিজন" পুস্তকের ৯৬ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া হয়েছে।

শিল্পনৈপুণ্য, কত কল্পনার সৃষ্টিমাধুর্য। এই সমস্ত কল্পকথা ও কবিকল্পনার অনেকগুলি এফ্. ডাব্লিউ. বেইন্ তাঁর ভারতীয় পুরাণ-কথার ছোট ছোট পুস্তক-গুলিতে মনোরম করে সাজিয়েছেন। এদেরই একখানিতে নারী সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে: 'সৃষ্টির আরম্ভে যখন ত্বষ্টা (বিশ্বকর্মা) নারী সৃষ্টি করতে উদ্যত হলেন তখন দেখলেন যে পুরুষের সৃষ্টিতে সমস্ত উপাদান নিঃশেষ হয়েছে. কঠিন পদার্থ আর অবশিষ্ট নেই। এই সমস্যায় পড়ে গভীর ধ্যানের পর, তিনি এইভাবে অগ্রসর হলেন; তিনি নিলেন, চন্দ্রের বর্তুলতা, লতার বঙ্কিম রেখা, তৃণের কম্পন, বেণুর কৃশতা, পুষ্পের সৌন্দর্য, পত্রের লঘুতা, হস্তীশুণ্ডের ক্ষীণাগ্র আকৃতি, হরিণের চাহনি, মধুমক্ষিকার সম্মিলিত জীবন, সূর্যকরের উল্লাস, মেঘের অশ্রু, বায়ুর চাঞ্চল্য, শশকের ভিরুতা, ময়ূরের অহঙ্কার, পক্ষী-বক্ষের কোমলতা, হীরকের কাঠিন্য, মধুর মিষ্ট স্বাদ, ব্যাঘ্রের ক্রূরতা, অগ্নির উষ্ণ দীপ্তি, তুষারের শীতলতা, কর্কশকণ্ঠ পক্ষীর কলরব, কোকিলের মধুর স্বর, বকের কপটতা এবং চক্রবাকের একনিষ্ঠ প্রেম; এখন এই সমস্তকে একত্র করে তিনি নারী সৃষ্টি করলেন ও পুরুষকে উপহার দিলেন।'*

১৩ : মহাভারত

মহাকাব্যের সময় নিরূপণ করা কঠিন। তাতে আছে সেই পুরাতন যুগের কথা যখন আর্যেরা ভারতে বসবাসের ব্যবস্থা করতে ও সমস্ত গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত। সহজেই জানা যায় যে বহু লেখক এগুলিতে কিছু কিছু করে লিখেছেন, কিংবা কালে কালে আপনাদের রচনা যোগ করে দিয়েছেন। রামায়ণ মহাকাব্যের বিশেষত্ব এই যে এর রচনায় একটা ঐক্য দেখা যায়। মহাভারত একখানি বিরাট গ্রন্থ, নানা বিষয়ের প্রাচীন কথার সমষ্টি। এই দুখানি গ্রন্থই নিশ্চয় বৌদ্ধযুগের আগেই রূপ গ্রহণ করেছিল, যদিচ বুদ্ধপরবর্তীকালে কিছু কিছু অংশ এই বই দুটিতে যোগ দেওয়া হয়েছে।

ফরাসী ঐতিহাসিক মিশেলে ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে বিশেষভাবে রামায়ণ সম্বন্ধে লিখেছেন : 'যে কেউ অনেক কিছু করেছেন কিংবা করতে চেয়েছেন, এই সুগভীর পাত্র হতে জীবন ও যৌবন আকন্ঠপান করুন.........পশ্চাত্যে সবই সঙ্কীর্ণ—গ্রীস ক্ষুদ্র, সেখানে আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে: জুড়িয়া শুষ্ক, সেখানে আমি হাঁপিয়ে উঠি। মহিমান্বিত এশিয়ার দিকে, গম্ভীর প্রাচ্যের দিকে, কিছুক্ষণের জন্য তাকাতে চাই। সেখানেই আছে আমার মহান কাব্য, ভারতমহাসাগরের ন্যায় বিশাল, ধন্য, সূর্যকরে স্বর্ণাভ, মাধুর্যপূর্ণ, দিব্য সঙ্গীতের গ্রন্থ, তাতে বেসুরো কিছু নেই। নির্মল শান্তি সেখানে, বিরোধের মধ্যে অফুরন্ত মধুরতা, অসীম ভ্রাতৃত্ব ছড়িয়ে আছে সর্বজীবে—প্রেম, দয়া, দাক্ষিণ্যের অতল, অসীম মহাসমুদ্র।'

* 'দি ডিজিট অফ দি মুন্'।

রামায়ণ যদিচ মহাকাব্যরূপে মহান এবং জনপ্রিয়, মহাভারতই জগতের সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলির একটি। বিরাট এ গ্রন্থ জনশ্রুতি, কাহিনী, প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন প্রভৃতির বিশাল বিশ্ব-কোষ। মহাভারতের যে সকল বিভিন্ন পাঠ পাওয়া গেছে অনেক বছর ধরে বহু সুযোগ্য ভারতীয় পণ্ডিতেরা সেগুলির পরীক্ষা এবং যথাবিহিত ব্যবহারের কাজে নিযুক্ত আছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য, এই গ্রন্থের একখানি প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করবেন। তাঁরা কয়েক খণ্ড ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু কাজ এখনও অসম্পূর্ণ আছে, যদিচ চলছে। এ কথা উল্লেখযোগ্য যে এই সর্বগ্রাসী ভীষণ যুদ্ধের দিনেও রাশিয়ার প্রাচ্যবিদ্যার পণ্ডিতেরা রাশিয়ান ভাষায় মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশ করেছেন।

মহাভারত রচনার সময়েই সম্ভবত বিদেশীয়েরা ভারতে আসছিল এবং নিজেদের আচার-ব্যবহার এদেশে আমদানি করছিল। এইসকল আচার-ব্যবহারের অনেক কিছু আর্যদের থেকে অন্যরূপ ছিল এবং সেইজন্য তখনকার দিনের বিবরণে অদ্ভুত সংমিশ্রণ এবং বিসংবাদী প্রথাদি লক্ষিত হয়। আর্যদের মধ্যে এক স্ত্রীর বহুস্বামিত্ব ছিল না, তবু মহাভারতে একটি প্রধান নায়িকাকে পাঁচ ভাইয়ের সাধারণ স্ত্রীরূপে দেখা যায়। এইকালে ক্রমে ক্রমে দেশের লোকের ও নবাগতদের আচরণাদি মিলিত হয়ে গৃহীত হতে থাকে এবং বৈদিকধর্মও সেই অনুসারে পরিবর্তিত হয়। এই যুগেই ধর্ম নানাবিষয়কে অন্তর্গত করে নিয়ে সেই রূপটি গ্রহণ করতে লাগল যা পরে আধুনিক হিন্দুধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইরূপ যে ঘটতে পেরেছে তার কারণ মনে হয়, সত্য যে কারও একলার নয় এবং তা দেখার কি পাওয়ার পথ অনেক, এই মূল কথাটি এদেশে গৃহীত হয়েছিল, সুতরাং সকলরকমের বিভিন্ন, এমনকি বিরুদ্ধ মত সম্বন্ধে সহনশীলতা ছিল।

আমাদের জাতির প্রতিষ্ঠাতা নাকি ভরত রাজা, আর তাঁরই নাম অনুসারে আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ। মহাভারতে এ দেশের ভিত্তিগত ঐক্যের উপর বিশেষভাবে ঝোঁক দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষের পূর্বের একটি নাম আর্যাবর্ত—আর্যদের দেশ, কিন্তু এ নাম কেবল বিন্ধ্যাচল পর্যন্ত দেশের উত্তর অংশকেই দেওয়া হয়েছিল; সম্ভবত তখনও পর্যন্ত আর্যেরা এই পর্বতের দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়েনি। রামায়ণের কাহিনী আর্যদের দাক্ষিণাত্যে প্রসারলাভের বিবরণ। যে অন্তর্বিপ্লব এর পরে ঘটেছিল তা মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে, আবছাভাবে মনে করা হয় যে খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ঘটেছিল। এই যুদ্ধ হয়েছিল ভারতবর্ষের (সম্ভবত উত্তরভারতের মাত্র) একচ্ছত্রত্বের জন্য, আর এই হতেই ভারতবর্ষের একত্বের ধারণা আরম্ভ হয়। এই ধারণায় আধুনিক আফগানিস্তানকে এদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে ধরা হত। এই আফগানিস্তানের নাম ছিল গান্ধার, আর এই নাম থেকে কান্দাহার নগরের নাম পাওয়া গেছে। মহাভারতের সর্বপ্রধান রাজার রাজ্ঞীর নাম ছিল গান্ধারী—গান্ধারের কন্যা। বর্তমান দিল্লী নগরের নিকটেই পুরাকালে ছিল হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থ, আর এই দিল্লীই এখন ভারতবর্ষের রাজধানী।

ভগিনী নিবেদিতা (মার্গারেট নোব্‌ল্‌) মহাভারত সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছেন, 'বিদেশী পাঠক দুইটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন। একটি হল বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য; আর একটি হল এর মধ্যে বরাবর পাঠকের মনে ভারতের একত্বের ধারণা জাগাবার চেষ্টা করা হয়েছে, আর দেশের বীরত্বব্যঞ্জক ঐতিহ্য সকল সময়ে সংগঠন এবং একতার প্রেরণা দান করেছে।'*

মহাভারতে কৃষ্ণের কাহিনী এবং জগদ্বিখ্যাত রচনা ভগবদ্‌গীতা আছে। গীতায় আলোচিত দর্শন ছাড়া তাতে রাজ্যশাসন বিষয়ের এবং জীবনযাপনের নৈতিক মূলতত্ত্ব ও উপদেশ পাওয়া যায়। এই নীতিস্থান হল ধর্মের ভিত্তি, আর এ না হলে প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায় না এবং সমাজও সুসম্বদ্ধ থাকতে পারে না। সমাজের কল্যাণ এর লক্ষ্য; কেবল কোনো একটি দলের কল্যাণ নয়, সমগ্র জগতের কল্যাণ আবশ্যক, কারণ 'নশ্বর জীবের বাসভূমি এই অখণ্ড জগৎ একটি আত্মনির্ভরশীল দেহের ন্যায়।' ধর্ম কিন্তু আপেক্ষিক, এবং কাল ও তৎকালীন অবস্থার উপর নির্ভর করে; তার মূলতত্ত্ব টিকে থাকে—সত্যনিষ্ঠা, অহিংসা প্রভৃতিতে কোনো পরিবর্তন আসে না—কিন্তু যে ধর্ম কর্তব্য ও দায়িত্বের সংমিশ্রণ মাত্র তা কালের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়। এখানে এবং অন্যত্রও অহিংসার উপরে যে জোর দেওয়া হয়েছে তা লক্ষ্যণীয়। অহিংসা ও ন্যায়সঙ্গত কারণে যুদ্ধের মধ্যে কোনো সুপ্রতিপন্ন বিরোধ নেই। সমগ্র মহাকাব্যটি একটি মহাযুদ্ধকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। বেশ বোঝা যায় যে এর উদ্দেশ্যে অহিংসার ভাব অনেকখানিই ছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহ অপরিহার্য ও আবশ্যক হলেও তা হতে বিরত থাকতে হবে এ কথা না বলে, মানসিক উত্তেজনা হতে বিরত থাকা, আত্মসংযম রক্ষা করা এবং ক্রোধ ও ঘৃণা দমিত রাখার কথা বলা হয়েছে।

মহাভারত একটি ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার; এর মধ্যে আমরা সকল প্রকারের রত্ন আবিষ্কার করতে পারি। বৈচিত্র্যময়, উচ্ছ্বসিত জীবনের প্রভূত পরিচয়ে পূর্ণ এই মহাকাব্য—ভারতের চিন্তায় সন্ন্যাস ও ত্যাগ যে উচ্চস্থান লাভ করেছে তার অন্যদিকের কথা পাওয়া যায় এখানে। এর মধ্যে নীতি উপদেশ অনেক আছে, কিন্তু এরূপ উপদেশের গ্রন্থ এখানি নয়। মহাভারতের শিক্ষা এই একটি বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে, 'তোমার কাছে যা অপ্রীতিকর অন্যের প্রতি তা প্রয়োগ কর না।' একটা কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে এই গ্রন্থে সমাজের কল্যাণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যদিচ মনে করা হয় যে এদেশের লোকেরা সমাজের কল্যাণ অপেক্ষা ব্যক্তিগত পূর্ণতা অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলে বিবেচনা করে। বলা হয়েছে, 'যা সমাজের মঙ্গল বিধান করে না, কিংবা যার জন্য তোমার লজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এমন কাজ কখনই কর না।'

আরও বলা হয়েছে: 'সত্য, আত্মসংযম, বৈরাগ্য, দাক্ষিণ্য, অহিংসা এবং নিষ্ঠা—

* সার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের 'ইণ্ডিয়ান ফিলসফি' গ্রন্থ হতে এই উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়েছে। আমি এ'র কাছে আরও অনেক উদ্ধৃতি ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য ঋণী।

এইগুলি সার্থকতালাভের উপায়, জাতি কি উচ্চ পারিবারিক পরিচয়ে তা পাওয়া যায় না।' 'জীবন ও অমরত্ব অপেক্ষা ধর্মই শ্রেষ্ঠতর।' 'প্রকৃত আনন্দ পেতে হলে দুঃখবরণ আবশ্যক।' যারা অর্থের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত তাদের সম্বন্ধে একটু উপহাস আছে এখানে—'রেশম-কীট আপন ঐশ্বর্যের জন্যই মরে।' শেষে প্রাণবন্ত ও অগ্রগতি-সম্পন্ন জাতির যোগ্য উপদেশটি পাওয়া যায়, 'অসন্তোষ উন্নতির উদ্দীপনা আনে।'

মহাভারতে আমরা পাই, বেদের বহুদেববাদ, উপনিষদের অদ্বৈতবাদ, এবং এ ছাড়া ঈশ্বরবাদ, দ্বৈতবাদ ও একেশ্বরবাদ। এই কাব্য যখন লেখা হয়, নূতন নূতন সৃষ্টির দিকে তখনও দৃষ্টি ফিরে ছিল, যুক্তি শ্রদ্ধা লাভ করত, এবং অপরকে দূরে রাখার প্রবৃত্তি সীমাবদ্ধ থাকত। এ ছাড়া, জাতিভেদ কঠোরতা লাভ করেনি। তখনও মানুষের মনে নির্ভরের ভাব বর্তমান ছিল, কিন্তু যখন বাইরের শক্তি দেশকে আক্রমণ করল এবং পুরাতন ব্যবস্থাকে আর নির্বিঘ্ন মনে করা চলল না, নির্ভরের ভাবও কমে এল। এই অবস্থার উদয় হওয়ায় সমাজের মধ্যে একতাবন্ধনের দ্বারা শক্তিসঞ্চয়ের প্রয়োজন অনুভূত হল, এবং সেইজন্য পূর্বাপেক্ষা অধিকতর অভেদের ভাবও জাগ্রত হল। এখন নূতন নূতন বিধিনিষেধ এসে পড়ল। গোমাংস আহারে পূর্বে তেমন আপত্তি উঠত না, এখন তা একেবারেই নিষিদ্ধ হল। সম্মানিত অতিথিকে গোমাংস ও গোবৎসের মাংস খেতে দেওয়ার উল্লেখ মহাভারতে আছে।

১৪ : ভগবদ্‌গীতা

ভগবদ্‌গীতা মহাভারতের অংশবিশেষ—ঐ বিরাট নাটকের একটি ঘটনা অবলম্বনে লিখিত, কিন্তু তবু মূল গ্রন্থ হতে একটু পৃথক এবং আপনাতেই সম্পূর্ণ। এই কাব্যে ৭০০ শ্লোক আছে। উইলিয়াম ফন্ হুম্‌বোল্‌ট বলেন, 'অতি সুন্দর; সম্ভবত যত ভাষা জানা আছে তার মধ্যে এই একমাত্র দার্শনিক গীত।' বৌদ্ধ যুগের আগেই গীতা লিখিত হয়, এবং তারপর এর জনপ্রিয়তা ও প্রভাব কিছুমাত্র কমেনি, এবং ভারতে পূর্বের ন্যায় এর আজও মানুষকে অনুপ্রাণিত করার শক্তি সমান আছে। সকল সম্প্রদায়ের চিন্তাশীল ও দার্শনিক ব্যক্তিরা এই গ্রন্থ শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করেন ও এর ব্যাখ্যা দেন। সংকটের সময়, মানুষের মন দ্বিধাক্লিষ্ট অথবা কর্তব্য নিরূপণে অক্ষম হয়ে পথ পাবার জন্য গীতার শরণাপন্ন হয়েছে, কারণ এই কাব্য সংকটের কাব্য; রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংকটে, বিশেষত মানুষের চিত্তক্ষেত্রের সংকটে, গীতাই পথ দেখাতে পারে। অতীতে গীতার অগণিত টীকা প্রকাশিত হয়েছে, এবং এখনও প্রায় নিয়মিত ভাবে হচ্ছে। এমনকি বর্তমান কালের চিন্তা ও কর্মের নেতারাও—যেমন তিলক, অরবিন্দ ঘোষ ও গান্ধী—গীতার সম্বন্ধে লিখেছেন এবং তাঁদের আপন আপন ব্যাখ্যা প্রকাশ করেছেন। গীতাই গান্ধীজির অহিংসায় দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তি, আর অন্যেরা যে ন্যায়সঙ্গত কারণে যুদ্ধবিগ্রহ ও প্রচণ্ড উপায় অবলম্বন করা সমর্থন করেন, তাও গীতার ভিত্তিতে।

গীতার আরম্ভে আমরা পাই মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে যুদ্ধক্ষেত্রেই অর্জুন ও কৃষ্ণের মধ্যে কথোপকথন। অর্জুনের মন পীড়িত হয়েছে, তাঁর অন্তরাত্মা যুদ্ধ, যুদ্ধের আনুষঙ্গিক অসংখ্য মৃত্যু এবং বন্ধু ও আত্মীয়জনের হত্যার সম্ভাবনায় বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। এসব কিসের জন্যে? কি সে লাভ করবে যার জন্যে এই ক্ষতি, এই পাপও স্বীকার করা যেতে পারে? পুরাতন নীতির এইসকল চিন্তায় তাঁর মন ভেঙে পড়ল, এবং পুরাতন আদর্শ অকর্মণ্য হয়ে গেল। অর্জুন প্রতীক হলেন সেই দারুণ দুঃখের, যুগে যুগে যা কর্তব্যের সঙ্গে নীতির সংঘর্ষে উদ্ভূত হয়েছে এবং মানুষের অন্তরাত্মাকে ছিন্নভিন্ন করেছে। এই ব্যক্তিগত কথোপকথন থেকে ধাপে ধাপে আমরা ব্যক্তিগত কর্তব্য ও সামাজিক ব্যবহারের, মনুষ্যজীবনে নীতিতত্ত্বের প্রয়োগ এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর উচ্চতর নৈর্ব্যক্তিক ক্ষেত্রে নীত হই। গীতায় অবশ্য আধ্যাত্মিক অনেক কিছু আছে, আর আছে মানবজীবনের উন্নতির যে তিনটি পথ আছে সেগুলিকে মিলিয়ে নিয়ে তাদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করার কথা; এই পথ তিনটির একটি হল বুদ্ধি বা জ্ঞানের পথ, অপর দুটি কর্মের পথ ও বিশ্বাসের পথ। সম্ভবত, অন্যগুলি অপেক্ষা বিশ্বাসের উপরেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে, এমন কি সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসও এসে পড়েছে, যদিচ একে নির্গুণ ঈশ্বরের প্রকাশরূপে বিবেচনা করা হয়েছে। গীতার বিশেষ আলোচ্য বিষয় হল মানব অস্তিত্বের আধ্যাত্মিক পটভূমিকা। দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের সমস্যাগুলি এরই সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে বিবেচিত হয়েছে। গীতায় মানবজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্যপালনে সকলকে আহ্বান করা হয়েছে, কিন্তু সকল সময়েই এই মূলগত আধ্যাত্মিক দিকটিকে এবং বিশ্বের পরম উদ্দেশ্যকে লক্ষ্যপথে রাখা হয়েছে। কর্মহীনতাকে নিন্দা করা হয়েছে, এবং আদর্শ যুগেযুগে বদলাতে পারে বলে এই কথাটি জোর পেয়েছে, যেন কর্ম ও জীবন যুগের শ্রেষ্ঠ আদর্শ অনুসরণ করে। যুগধর্মকে, অর্থাৎ যুগের আদর্শকে সকল সময়েই দৃষ্টিপথে রাখতে হবে।

আধুনিক ভারতবর্ষ ব্যর্থতায় পূর্ণ, আর বহুদিন ধরে অত্যন্ত অধিক নীরব ও চেষ্টাহীন হয়ে আছে। এইজন্য কাজের উদ্দেশ্যে গীতার যে ডাক তাতে ভারতবাসীর মনে বিশেষভাবে সাড়া জাগবার কথা। এই কাজকে বর্তমান কালের ভাষায় বলা যায়, সামাজিক উন্নতির চেষ্টা, এবং সমাজসেবা—বাস্তবক্ষেত্রে, পরার্থে, দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের সঙ্গে। গীতার শিক্ষা অনুসারে এরূপ কাজ বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এর ভিতরে আধ্যাত্মিক আদর্শ রক্ষিত হওয়া আবশ্যক। কাজ নির্লিপ্তভাবে করতে হবে, তার ফলের জন্য অধিক ব্যস্ত হলে চলবে না। কাজ যথার্থ হলে যথার্থ ফলও পাওয়া যাবে, যদিচ সে ফল অব্যবহিতরূপে দেখা নাও দিতে পারে; মনে রাখতে হবে যে কার্যকারণের নিয়ম সকল অবস্থাতেই বলবৎ থাকে।

গীতার শিক্ষা সাম্প্রদায়িক নয়, এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কোনো বিশেষ দলের জন্যেও নির্দিষ্ট হয়নি। এ শিক্ষা সকলের পক্ষে সার্বজনীনভাবে অগ্রসর হওয়ার শিক্ষা, সে ব্রাহ্মণই হোক বা জাতিহীনই হোক। গীতায় আমরা পাই, 'সকল পথেই

আমাকে পাওয়া যায়।' এই সার্বজনীনতার জন্যই সকল শ্রেণী ও সকল চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের লোকেরা গীতাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন। এর মধ্যে এমন কিছু আছে যাকে মনে হয় অবিরত নূতন করে নেওয়া যায়, কালক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তা পুরাতন কি সেকেলে হয়ে যায় না। সে এর অন্তরস্থ সেই গুণটি যেজন্য এই গ্রন্থ পাঠ করলে মনে গভীর জিজ্ঞাসা জাগে এবং অন্বেষণে আগ্রহ জন্মে। এই কারণে ধ্যান-ধারণা এবং কর্ম চলেছে, স্থৈর্য এবং সাম্যবস্থাও রক্ষিত হয়েছে, যদিচ বিরোধ ও সংঘর্ষ বিরত হয়নি। নানা পার্থক্যের মধ্যে একটি অচঞ্চল অবস্থা, একটি ঐক্যের ভাব এর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আর দেখা যায়, পরিবর্তনশীল আবেষ্টনের ঊর্ধ্বে মানবপ্রকৃতি স্থান গ্রহণ করেছে, একে এড়িয়ে গিয়ে দূরে রেখে নয়, এর সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিয়ে। গীতার রচনার পর যে দুহাজার পাঁচশো বছর কেটেছে, ভারতবর্ষের মানুষ সে-সময়ে নানা পরিবর্তন, উন্নতি ক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে এসে বর্তমান কালে পেঁৗছেছে। পরীক্ষার পর পরীক্ষা চলেছে, চিন্তার পর চিন্তা, কিন্তু সকলসময়েই সে গীতায় প্রাণময় কিছু না কিছু লাভ করেছে—কিছু না কিছু যা তার উন্নতিপরায়ণ চিন্তার সঙ্গে মিলেছে, তাকে সতেজ করেছে, তার মনের আধ্যাত্মিক সমস্যাগুলির সমাধানেও প্রযোজ্য হয়েছে।

১৫ : প্রাচীন ভারতে মানবের জীবন ও কর্ম

ভারতে প্রাচীনকালে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা যেভাবে উন্নতিলাভ করেছিল তার তথ্য পণ্ডিত ও দর্শনশাস্ত্রজ্ঞেরা অনেকটা সংগ্রহ করেছেন। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সময়ক্রম নির্ণয়ের এবং সেই সময়কার দেশের রাজনৈতিক অবস্থার মোটামুটি মানচিত্র অংকনের কাজও অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু তখনকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিচার করে দেখার কাজ তেমন হয়নি, অর্থাৎ তখন মানুষ কিভাবে জীবন যাপন করত, কি বস্তুসম্ভার কিরূপে প্রস্তুত হত, আর কেমন করেই বা ব্যবসা-বাণিজ্য চলত, এই সকল বিষয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধান হয়নি। এখন অবশ্য এই সমস্ত অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার অধিকতর মনোযোগ লাভ করছে, আর এ বিষয়ে কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিতের লেখা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, এবং একজন আমেরিকান পণ্ডিতের লেখা পুস্তকেও পাওয়া গেছে। এখনও অনেক কাজ বাকি আছে। এক মহাভারতই সমাজনৈতিক এবং অন্যান্য তথ্যের ভাণ্ডারবিশেষ, আর অন্য বহু গ্রন্থ হতেও অনেক কথাই জানা যেতে পারে। অবশ্য এ সমস্তই বিশেষ বিবেচনা করে গ্রহণ করা আবশ্যক। খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে লেখা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এ বিষয়ের একটি অমূল্য গ্রন্থ, কারণ মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সৈন্যবিভাগীয় বিধিব্যবস্থার খুঁটিনাটি সকল কথাই এই পুস্তকে পাওয়া যায়।

এ ছাড়া, আরও আগেকার যুগের কথা, অর্থাৎ বুদ্ধেরও আগেকার কালের কথা, জাতকের গল্পসংগ্রহ হতে পাওয়া যায়। এই জাতকগুলিকে বর্তমান আকারে গ্রন্থন

করে তোলা হয়েছিল বুদ্ধের তিরোধানের পরে। অনেকে মনে করেন যে এগুলিতে বুদ্ধের আগেকার জন্মগুলির বিবরণ আছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে এগুলি বিশেষ স্থান লাভ করেছে। গল্পগুলি অবশ্য অত্যন্ত পুরাতন। বুদ্ধপূর্ব যুগের বিষয়ে অনেক মূল্যবান তথ্য এগুলিতে মেলে। অধ্যাপক রাইস্ ডেভিড্‌স বলেছেন, এগুলি লোক-সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা পুরাতন. সম্পূর্ণ ও অতি প্রয়োজনীয় সংগ্রহ। অনেক জীবজন্তু বিষয়ক গল্প ভারতবর্ষে লিখিত হয়ে পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে। সেগুলিও জাতক থেকে পাওয়া।

যে সময়ে দ্রাবিড় ও আর্যদের মিশ্রণ সম্পূর্ণ হয়ে উঠছিল জাতকগুলিতে সেই সময়ের কথা আছে। 'একটা বহুরূপ বিশিষ্ট অগোছালো সমাজের কথা এই সকল গল্প থেকে জানা যায়; সে সমাজকে কোনো বিশেষ কোঠায় ফেলা যায় না, আর জাতি বিভাগেরও কোনো লক্ষণ তখনও দেখা দেয়নি।'* একদিকে ছিল পুরোহিত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শ্রেণীর, অন্যদিকে শাসক শ্রেণীর প্রথাপদ্ধতি, আর এই জাতকগুলি হতে পাওয়া যেতে পারে সাধারণ শ্রেণীর লোকদের জীবন যে পদ্ধতিতে চলত তার বিবরণ।

এই সকল গল্প থেকে বিভিন্ন রাজ্য ও শাসকদের কালানুক্রম ও বংশাবলীর কথা জানা যায়। রাজারা প্রথমে নির্বাচিত হতেন, পরে জ্যেষ্ঠপুত্রের মধ্যে দিয়ে উত্তরাধিকারক্রমে রাজ্য পেতে থাকেন। দুএকটা ব্যতিক্রম ভিন্ন এই উত্তরাধিকারে স্ত্রীলোকদের স্থান ছিল না। চীন দেশের ন্যায় এদেশেও রাজাকে সকল বিপদের জন্য দায়ী করা হত; কিছু অঘটন ঘটলে সেটা রাজার দোষেই ঘটেছে লোকে এইরূপ ধরে নিত। মন্ত্রিসভা ছিল, আর শাসনসংক্রান্ত বৃহত্তর সভারও কথা জানা যায়। তবু রাজা স্বেচ্ছাচারীই ছিলেন, যদিচ তাঁকে কয়েকটা বাঁধা নিয়ম মেনে চলতে হত। রাজসভায় রাজপুরোহিতের পদটি ছিল উচ্চ; তিনি পরামর্শ দিতেন ও ধর্মানুষ্ঠানের ভার তাঁর উপরেই থাকত। অত্যাচারী ন্যায়হীন রাজার বিরুদ্ধে প্রজাবিদ্রোহের কথাও এই সকল গল্পে আছে। কখনও কখনও এরূপ রাজাকে অপরাধের জন্য মেরে ফেলাও হত।

পল্লীসভার স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার ছিল। রাজস্ব প্রধানত ভূমি থেকে পাওয়া যেত। জমিতে উৎপন্ন বস্তুর রাজার অংশই ছিল ভূমিকর, এবং এটা সাধারণত উৎপন্ন বস্তু দিয়ে আদায় দেওয়া হত। তবে এরও ব্যতিক্রম ছিল। সম্ভবত এই কর উৎপন্ন বস্তুর ছয় ভাগের একভাগ ছিল। তখন ছিল কৃষিসভ্যতার দিন, আর এতে প্রত্যেক স্বয়ংশাসিত পল্লীকেই গণনায় নেওয়া হত। এই সকল পল্লীকে দশ থেকে একশো সংখ্যায় গোষ্ঠীবদ্ধ করে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হত। ব্যাপকভাবে

* রিচার্ড ফিক্: 'দি সোশাল অর্গ্যানাইজেশন ইন নর্থ-ইস্ট ইণ্ডিয়া ইন বুদ্ধ'স টাইম' (কলিকাতা ১৯২০): ২৮৬ পৃঃ। রতিলাল মেহতা'র পুস্তক 'প্রি-বুদ্ধিস্ট ইণ্ডিয়া' (বোম্বাই ১৯৩৯) এ-বিষয়ের আরও আধুনিক গ্রন্থ। আমি এই দ্বিতীয় গ্রন্থখানি হতে অনেক তথ্য নিয়েছি বলে ঋণ স্বীকার করছি।

নানারূপ কৃষি, গৃহপালিত জন্তুর ব্যবসায়, গোপালন প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। বাগান ও অন্যপ্রকারের উপবন প্রায়ই দেখা যেত, এবং ফল ফুলের আদর ছিল। যে সকল ফুলের নাম পাওয়া যায় সেগুলি সংখ্যায় অনেক; আর যে সমস্ত ফল লোকের খুব প্রিয় ছিল তা হল আম, ডুমুর, আঙুর, কলা ও খেজুর। শহরে অনেক সবজি ও ফলের দোকান থাকত, ফুলের দোকানও ছিল। এখনকার মত তখনও ফুলের মালা ভারতবাসীর প্রিয় ছিল।

প্রধানত আহার্যের জন্যে শিকার নিয়মিত কর্মের মধ্যে গণ্য ছিল। আমিষ আহার ব্যাপকভাবে চলত, আর পাখির মাংস এবং মাছেরও প্রচলন ছিল; হরিণের মাংস উপাদেয় বলে বিবেচিত হত। মাছধরার বিশেষ আয়োজন থাকত আর কশাইখানাও ছিল। মানুষের প্রধান খাদ্য অবশ্য ছিল চাল, গম, দাল ও জনার। আখ থেকে চিনি তৈরি হত। দুধ, আর দুধ থেকে প্রস্তুত নানাপ্রকারের খাদ্য এখনকার মত তখনও আদর লাভ করত। মদের দোকানও ছিল। আর মদ তৈরি হত চাল, ফল এবং আখ থেকে।

খনি থেকে মূল্যবান পাথর ও ধাতু তোলা হত। ধাতুর মধ্যে সোনা, রূপা, তামা, লোহা, সীসা, রাং এবং পিতলের নাম পাওয়া যায়; মূল্যবান পাথর ছিল হীরা ও চুনি। প্রবাল এবং মোতির নামও পাওয়া যায়। সোনা, রূপা ও তামার মুদ্রার প্রচলন ছিল। ব্যবসায়ে যৌথ কারবার চলত এবং সুদের চুক্তিতে ঋণ দেওয়া হত।

রেশম, পশম ও সুতার কাপড় তখন প্রস্তুত হত, আর হত মোটা গরম আচ্ছাদন, কম্বল ও গালিচা। বিস্তৃতভাবে সুতা কাটার কাজ, বোনানি, ও রঙ করার কাজ চলত। ধাতু থেকে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রাদি তৈরি করা হত। পাথর, কাঠ ও ইটে বাড়ি তৈরি হত, আর ছুতোরেরা নানা প্রকারের আসবাবাদি প্রস্তুত করত, যথা গাড়ি, রথ, জাহাজ, খাট, কুর্সি, বেঞ্চি, সিন্দুক, খেলনা ইত্যাদি। বেতের কারিগরেরা চাটাই, পাখা, ছাতা প্রভৃতি প্রস্তুত করত। সকল গ্রামেই কুমারেরা ছিল। ফুল এবং চন্দন কাঠ হতে অনেক প্রকারের তেল ও প্রসাধন বস্তু, চন্দন কাঠের গুঁড়ো প্রভৃতি প্রস্তুত করা হত। অনেক প্রকারের ঔষধাদি তৈরি হত এবং মৃতদেহকেও ঔষধাদি দ্বারা রক্ষা করার ব্যবস্থা ছিল।

অনেক প্রকারের কারিগর ও শিল্পী ছাড়া আরও বহু বৃত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা শিক্ষক, চিকিৎসক, অস্ত্রোপচারক, বণিক, ব্যবসায়ী, সঙ্গীতকারী, জ্যোতিষী, সবজিব্যবসায়ী, অভিনেতা, নৃত্যবিদ, ভ্রমণকারী, বাজিকর, কসরৎকারী, পুতুল বাজিকর, ফেরিওয়ালা প্রভৃতি।

গৃহের কাজের জন্য একপ্রকার ক্রীতদাসপ্রথা ব্যাপকভাবেই চলত, কিন্তু চাষের কাজ ও অন্যান্য কাজ মজুরি দিয়ে করান হত। তখনও কতকগুলি অস্পৃশ্য লোক ছিল, তাদের বলা হত চণ্ডাল, আর তাদের প্রধান কাজ ছিল মৃতদেহের সৎকার করা।

ব্যবসায়ী ও কারিগরদের নানা সমিতি তখন শক্তিলাভ করেছিল। ফিক্ বলেন, ভারতের সংস্কৃতির প্রাক্কালেই বণিকসমিতি যে গড়ে উঠেছিল এরূপ জানা যায়। এগুলি অর্থনৈতিক কারণে, অর্থের ব্যবহার, নিজেদের মধ্যে আদান প্রদান ও আলাপ-

পরিচয়ের সুবিধার জন্য এবং অংশত তাদের স্বার্থরক্ষার কারণে জন্মলাভ করেছিল।' জাতকে পাওয়া যায় যে আঠারোটি ব্যবসায়ী-সমিতি ছিল, কিন্তু চারটির মাত্র উল্লেখ আছে: কাঠের ও ইটের কারিগরেরা, কামারেরা, চামড়ার কারিগরেরা ও চিত্রকরেরা।

মহাকাব্যেও ব্যবসায়ী ও কারিগরদের সমিতির উল্লেখ আছে। মহাভারতে পাওয়া যায়, 'দলবদ্ধতাদ্বারা সমিতিগুলি আত্মরক্ষা করতে পারে।' আরও পাওয়া যায়, ব্যবসায়ী সমিতিগুলি এতই শক্তিশালী ছিল যে রাজাও তাদের পরিপন্থী কোনো আইন প্রচলন করতে পারতেন না। যাদের সম্বন্ধে রাজাকে সাবধান হয়ে চলতে হত তাদের মধ্যে পুরোহিতদের পরেই সকল সমিতির অগ্রণীদের স্থান ছিল।'* বণিকদের প্রধানকে বলা হত শ্রেষ্ঠী (এখন শেঠ), আর তিনি বেশ প্রধান স্থানই অধিকার করে থাকতেন।

জাতকে একটা অসাধারণ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ হল বিশেষ বিশেষ বৃত্তিধারীর জন্য পৃথক পৃথক গ্রামের প্রতিষ্ঠা। একটি ছুতারের গ্রামের কথা আছে, তাতে হাজার ঘর ছুতার বাস করত। এইরূপ কামারের গ্রাম ছিল। আরও ছিল অন্য ব্যবসায়ীদের। এইরূপ বিশেষ গ্রামগুলি সাধারণত কোনো নগরের নিকটে থাকত; এই নগর ব্যবসায়ীদের উৎপন্ন দ্রব্যাদি নিয়ে তাদের প্রয়োজন মতো দ্রব্যাদি দিত। মনে হয় সমস্ত গ্রামটি সমবেতভাবে কাজ করত ও একসঙ্গে অধিক পরিমাণের কাজ নিয়ে ব্যবসায় চালাত। সম্ভবত এইরূপ পৃথকভাবে বাস করার জন্যই জাতিভেদ গড়ে উঠেছিল ও বিস্তৃতিলাভ করেছিল। ব্রাহ্মণেরা ও সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিল তাই-ই ক্রমে ক্রমে ব্যবসায়ী ও কারিগরদের দলেও গৃহীত হয়েছিল।

উত্তর-ভারতে অনেক বড় বড় রাস্তা নির্মাণ করে দেশের দূরবর্তী স্থানগুলিকে যোগযুক্ত করা হয়েছিল। এই সকল রাস্তায় মাঝে মাঝে পথিকদের জন্য বিশ্রাম স্থান (পান্থনিবাস) ও কোথাও কোথাও আরোগ্যশালাও ছিল। বাণিজ্য যে কেবল দেশের মধ্যেই উন্নতি লাভ করেছিল তা নয়, ভারতবর্ষ ও অনেক বিদেশের মধ্যেও তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মিশরের মেম্‌ফিস্‌-এ যে ভারতীয়দের মাথার প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে তা থেকে অনুমান হয় খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে সেখানে ভারতবর্ষীয় বণিকদের একটা উপনিবেশ ছিল। সম্ভবত ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপ-গুলির মধ্যে বাণিজ্য চলত। সমুদ্রপারের বাণিজ্যে জাহাজের প্রয়োজন হ'ত; আর এটা স্পষ্টই জানা যায় যে দেশের নদীপথ এবং বাইরে সমুদ্রপথের জন্য এদেশে জাহাজ হত। দূর দেশে থেকে আগত বণিকেরা যে জাহাজে মাল চলাচলের শুল্ক দিত তার উল্লেখ মহাকাব্যে আছে।

জাতকে বণিকদের সমুদ্রযাত্রার কথা অনেক পাওয়া যায়। যাত্রীরা দলবদ্ধ হয়ে মরুপথে পশ্চিমে ব্রোচের বন্দরে এবং উত্তরে গান্ধার ও মধ্য এশিয়ায় যেত। ব্রোচ্‌ থেকে জাহাজ পারস্যোপসাগর হয়ে ব্যবিলনে যাত্রা করত। নদীপথেও অনেক গমনাগমন

* অধ্যাপক ই. ওঅশবার্ন-হপকিন্‌স : 'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া' : ১ম খণ্ড, ২৬৯ পৃঃ।

চলত। জাতকে পাওয়া যায় যে জাহাজ বারাণসী, পাটনা, চম্পা (ভাগলপুর) ও অন্যান্য স্থান হতে যাত্রা করে দক্ষিণের বন্দরগুলিতে এবং লঙ্কা ও মালয়ে যেত। তামিল ভাষায় লিখিত কবিতা হতে জানা যায় যে দক্ষিণে কাবেরী নদীকূলে কাবেরীপট্টিনাম্ নামে একটি সমৃদ্ধ বন্দর ছিল এবং সেখানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালিত হত। এই জাহাজগুলি নিশ্চয়ই বৃহদাকার ছিল, কারণ জাতকে বলা হয়েছে যে শতশত বণিক ও যাত্রী এক একটি জাহাজে যাত্রা করতে পারত।

'মিলিন্ডা'য় (গ্রীসের ব্যাক্‌ট্রিয়াবাসী এক রাজার নাম মিলিন্ডা, ইনি খৃস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে উত্তর-ভারতে রাজত্ব করেছিলেন ও উৎসাহশীল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন) পাওয়া যায়, 'জাহাজের মালিক সমুদ্রোপকূলস্থ নগরে মাল চলাচল করে এবং ভাড়া আদায় করে ধনী হলে সমুদ্র যাত্রা করতে পারে; বঙ্গ, টক্কালা, চীন, সোবিরা, সুরাট, আলেক্‌জান্দ্রিয়া, করোমাণ্ডাল উপকূল কিংবা ভারতবর্ষের আরও দূরবর্তী স্থানে, এবং এ ছাড়া আরও যে যে স্থানে বহু জাহাজ একত্র হয় সেখানেও যেতে পারে।'*

ভারতবর্ষ হতে বাইরে রপ্তানি হত, 'রেশম, মসলীন, অন্য সূক্ষ্ম বস্ত্র, ছুরি, বর্ম, কিংখাব, সূচিশিল্প, গন্ধদ্রব্য, ঔষধ, গজদন্ত, গজদন্তে প্রস্তুত দ্রব্যাদি, অলঙ্কার ও সোনা (রূপা কদাচিত বাইরে যেত), আর এইগুলিই বণিকদের প্রধান পণ্যদ্রব্য ছিল।'†

ভারত—বলা উচিত উত্তর-ভারত—যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রাদির জন্য, বিশেষত তার উচ্চ-শ্রেণীর ইস্পাত, তলোয়ার ও ছোরার জন্য বিখ্যাত ছিল। খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে একটি ভারতীয় সুবৃহৎ অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদল পারস্য বাহিনীর সঙ্গে গ্রীসে গিয়েছিল। পারস্য ভাষার মহাকাব্য ফারদৌসী লিখিত শাহনামায় আছে যে আলেক্‌জাণ্ডার যখন পারস্য আক্রমণ করেন তখন পারস্যবাসীরা ভারতবর্ষ হতে অবিলম্বে অস্ত্রশস্ত্র পাবার জন্য লোক পাঠিয়েছিল। ইসলামের আগে আরবভাষায় তলোয়ারকে বলা হত মুহন্নদ্; এর অর্থ 'হিন্দ্ হতে' অর্থাৎ ভারতবর্ষীয়। এই শব্দ এখনও সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

লোহার কাজে প্রাচীন ভারতবর্ষ বিশেষ উন্নতি করেছিল বলে জানা যায়। দিল্লীর সন্নিকটে একটি বিশাল লৌহস্তম্ভ আছে, কি প্রক্রিয়ায় এইটি এমনভাবে প্রস্তুত হয়েছিল যে বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তনে এর কোনো ক্ষতি হয়নি এবং মরচেও পড়েনি, তা এখনও আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের কাছে একটা সমস্যা হয়ে আছে। এর উপর যে লিপি ক্ষোদিত আছে তার অক্ষর গুপ্ত রাজাদের সময়ের, খৃস্টীয় চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন স্তম্ভটি এই লিপি অপেক্ষাও অনেক পুরাতন; এগুলি পরে ক্ষোদিত হয়েছে।

* 'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া'র ১ম খণ্ড, ১২২ পৃষ্ঠায় মিসেস সি. এ. এফ্. রাইস ডেভিড্স কর্তৃক উদ্ধৃত।

† রাইস ডেভিড্স : 'বুদ্ধিস্ট ইণ্ডিয়া' : ৯৮ পৃঃ।

[redacted] Kedarnath Sadharan Pathagar.

সামরিক দিক থেকে বিচার করলে খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে আলেক্জাণ্ডার কর্তৃক ভারত আক্রমণ তেমন গুরুতর কোনো ব্যাপারই নয়। সীমান্ত পার হয়ে কতকটা লুণ্ঠন করে নেওয়ার মতই হয়েছিল এ কাজ, আর এও আলেক্জাণ্ডারের পক্ষে তেমন সফল হয়নি। সীমান্তের একজন রাজার কাছ থেকে এমন কঠিন বাধা তাঁকে পেতে হয়েছিল যে ভারতবর্ষের ভিতরে অগ্রসর হওয়ার অভিপ্রায়টাকে পুনরায় বিবেচনা করে দেখার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। যদি একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসকই এমন যুদ্ধ করতে পারল, আরও দক্ষিণে যে অধিকতর শক্তিশালী রাজ্য আছে তারা কেমন করবে। হয়তো এই কারণেই তাঁর সৈন্যবাহিনী ফিরে যেতে জিদ দেখিয়েছিল।

আলেক্জাণ্ডারের ফিরে যাওয়া এবং তাঁর মৃত্যুর অল্প পরেই ভারতের সামরিক শক্তির গুণাগুণ দেখা গিয়েছিল যখন সেলিউকস আর একটা আক্রমণের চেষ্টা করলেন। চন্দ্রগুপ্ত তাঁকে পরাস্ত করে হাঁকিয়ে দিলেন। ভারতীয় বাহিনীর তখন একটা সুবিধা ছিল যা আর কারও ছিল না। ভারতের ছিল যুদ্ধের জন্য উপযুক্তরূপে শিক্ষিত হাতি, আর এগুলিকে বর্তমান কালের ট্যাঙ্কের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সেলিউকস নিকেটর খৃস্টপূর্ব ৩০২ অব্দে এশিয়া মাইনরের অ্যান্টিগোনাসের বিরুদ্ধে অগ্রসর হবার জন্য ভারতবর্ষ হতে পাঁচশত শিক্ষিত হাতি সংগ্রহ করেছিলেন। সামরিক ঐতিহাসিকেরা বলেন, বিশেষভাবে এই হাতিগুলির জন্যই এই যুদ্ধযাত্রা এমনভাবে সফল হয়েছিল যে অ্যান্টিগোনাসের মৃত্যু হয় এবং তাঁর পুত্র ডিমিট্রিয়াসকে পলায়ন করতে হয়।

হাতিকে শিক্ষা দেবার এবং ভাল ভাল ঘোড়া উৎপাদন বিষয়ের পুস্তক আছে, আর এগুলির প্রত্যেকটিকে শাস্ত্র বলা হয়। এই শব্দটি ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে ব্যবহার করা হয় এবং এই অর্থেই এর চলন। আগে সকল প্রকার জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে, গণিত হতে নৃত্য পর্যন্ত, এই শব্দ ব্যবহৃত হত। বস্তুত তখন ধর্মনৈতিক কি ঐহিক জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যের রেখা কঠোরভাবে টানা হত না। একটার সঙ্গে অন্যটা মিশে যেত, আর যা কিছুকে প্রয়োজনীয় বলে মনে হত তাকেই জিজ্ঞাসার বিষয় বলে ধরা হত।

লিপি ব্যবহারের পদ্ধতি ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। প্রস্তর যুগের শেষ অংশের পাত্রাদির উপর ব্রাহ্মী অক্ষর ক্ষোদিত পাওয়া গেছে। মোহেঞ্জোদারোতে ক্ষোদিত লেখা দেখা গেছে; এগুলির পাঠোদ্ধার এখনও হয়নি। ভারতের সর্বত্র যে ব্রাহ্মী অক্ষর পাওয়া গেছে তাই যে দেবনাগরী ও ভারতের অন্যান্য অক্ষরের মূল রূপ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অশোকের কোনো কোনো ক্ষোদিত অনুশাসন ব্রাহ্মী অক্ষরে, আর উত্তর-পশ্চিমের অন্যগুলি খরোষ্ঠী অক্ষরে দেখা যায়।

খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ কি সপ্তম শতাব্দীতেই পাণিনি তাঁর বিখ্যাত সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন।* তিনি এরও পূর্বে রচিত ব্যাকরণের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর সময়েই

* কীথ এবং আরও কারও কারও মতে পাণিনির সময় হল খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী, কিন্তু অধিকাংশের মতে তিনি বৌদ্ধযুগের পূর্বে জন্মেছিলেন ও তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

সংস্কৃত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল এবং একটি উন্নতিশীল ভাষায় পরিণত হয়েছিল। পাণিনির গ্রন্থ কেবলমাত্র ব্যাকরণ নয়—অনেক বেশি কিছু। লেনিনগ্রাডের সোভিয়েট অধ্যাপক শ্চেরবাট্স্কি এই গ্রন্থের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, 'এখানি মানব মনজাত মহত্তম বস্তুগুলির একটি।' এখনও পাণিনি সংস্কৃতভাষার প্রামাণিক ব্যাকরণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে, যদিচ পরবর্তী ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতেরা এতে কিছু কিছু যোগ করেছেন, এবং এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পাণিনি গ্রীসদেশীয় বর্ণমালার উল্লেখ করেছেন, এবং এই থেকে মনে হয় আলেক্জাণ্ডার পূর্বদেশে আসার আগে ভারতবর্ষ ও গ্রীসের মধ্যে কোনো কোনো যোগাযোগ ছিল।

জ্যোতির্বিদ্যা বিশেষভাবে অধীত হত, তবে প্রায়ই তা ফলিত জ্যোতিষের সঙ্গে মিশে যেত। চিকিৎসা শিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক এবং আরোগ্যশালা ছিল। ধন্বন্তরীকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। চিকিৎসা গ্রন্থগুলি খৃস্টাব্দের প্রথম কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই লেখা হয়েছিল। চরক লিখে গেছেন ভেষজ চিকিৎসার উপর, আর সুশ্রুত অস্ত্রচিকিৎসার উপর। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে কণিষ্কের রাজধানী ছিল; অনেকে মনে করেন যে চরক তাঁরই সভায় রাজকবিরাজ ছিলেন। গ্রন্থগুলিতে বহু রোগের নাম দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলির নিদান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা দেওয়া আছে। অস্ত্রোপচার, প্রসববিজ্ঞান, স্নান, পথ্য, স্বাস্থ্য, শিশুপালন ও চিকিৎসাবিদ্যা এই সকল গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। অস্ত্রোপচার শিক্ষার জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালী গ্রহণের ও শবব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল। সুশ্রুত বহুপ্রকার অস্ত্রের কথা বলেছেন। এ ছাড়া, তাঁর গ্রন্থে নানাপ্রকার অস্ত্রোপচারের কথা আছে, যেমন অঙ্গচ্ছেদ, উদরের উপর অস্ত্র-চিকিৎসা, এবং সেই উপায়ে সন্তান প্রসব করান (সীজারিয়ান সেক্শন), ছানির জন্য চোখে অস্ত্রের সাহায্যে চিকিৎসা ইত্যাদি। রাসায়নিক ধোঁয়ার সাহায্যে ক্ষতস্থান নির্দোষ করা হত। খৃস্টপূর্ব তৃতীয় কি চতুর্থ শতাব্দীতে পশুদের জন্যও আরোগ্যালয় ছিল। জৈন ও বৌদ্ধেরা অহিংসার উপরে জোর দিত, সম্ভবত তাদেরই প্রভাবে এইগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অঙ্কশাস্ত্রে ভারতীয়েরা এরূপ অনেক আবিষ্কার করেছিলেন যে তাতে এই শাস্ত্রের নূতন যুগ প্রবর্তিত হয়েছিল বলা যায়। শূন্যের ব্যবহার, বীজগণিতে অনির্ণীত রাশির স্থানে বর্ণমালার অক্ষরের ব্যবহার, এইগুলি অঙ্কশাস্ত্রে ভারতীয় গণিতজ্ঞদের দান। এগুলির তারিখ স্থির করা যায় না, কারণ সকল ক্ষেত্রেই আবিষ্কার ও তা কাজে খাটানর মধ্যে খানিকটা সময় ব্যয় হত। তবে এ কথা ঠিকই যে এদেশে পাটিগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতির আরম্ভ অতি প্রাচীনকালেই ঘটেছিল। ঋগ্বেদের সময়েও এদেশে গণনার জন্য দশ-কে মূল সংখ্যা ধরে নেওয়া হত। সময় ও সংখ্যা বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয়েরা অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। অনেক বড় বড় সংখ্যার জন্য বিশেষ বিশেষ পারিভাষিক শব্দ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। গ্রীক, রোমান, পারস্য দেশবাসী ও আরবদের হাজার কি দশ হাজারের বেশি বড় সংখ্যার জন্য কোনো শব্দ ছিল না। ভারতে আঠারো শক্তিবিশিষ্ট সংখ্যার ($১০^{১৮}$) ব্যবহার ছিল, এবং কারও

কারও মতে আরও বৃহত্তর সংখ্যারও প্রচলন ছিল। বুদ্ধের প্রথম বয়সের শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিবরণীতে তিনি পঞ্চাশ শক্তিবিশিষ্ট সংখ্যার ($১০^{৫০}$) উল্লেখ করেছেন বলে পাওয়া যায়।

অন্যদিকে, সময়ের মাপে যে ক্ষুদ্রতম নিরিখ ব্যবহৃত হত তা এক সেকেণ্ডের প্রায় এক-সপ্তদশ অংশ মাত্র ছিল, আর দৈর্ঘ্যের মাপের ক্ষুদ্রতমটি ছিল এক ইঞ্চির প্রায় $১·৩×৭^{-১০}$ এর সমান। অবশ্য এই সমস্ত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সংখ্যাগুলি অনুমিত মাত্রই ছিল এবং কেবল দার্শনিক আলোচনায় ব্যবহৃত হত। প্রাচীন ভারতীয়দের স্থান ও কাল সম্বন্ধে সুবিশাল ধারণা ছিল। এরূপ আর কোনো দেশের প্রাচীন কালের লোকদের মধ্যে দেখা যায়নি। তাঁদের চিন্তার ধারাই ছিল বিরাট। তাঁদের পুরাণেও কোটিকোটি বছরের কথা বলা হয়েছে। আধুনিক ভূতত্ত্বে কাল নির্দেশের জন্যে যে বিশাল বিশাল সংখ্যা ব্যবহার করা হয়—তাতে, আর তারাগুলির মধ্যেকার জ্যোতির্বিদ্যায় উক্ত দূরত্বের অঙ্কেও প্রাচীনকালের ভারতবাসী আশ্চর্য হতেন না। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডারউইনের তথ্য এবং ঐরূপ আরও অনুমান প্রচারিত হলে ইউরোপে অন্তরে বাইরে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়েছিল। ভারতবর্ষে তা হতে পারত না। ইউরোপে সময়ের ধারণা সাধারণত কয়েক বছরের বেশি ছিল না।

খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে উত্তর-ভারতে যে ভার দৈর্ঘ্যের পরিমাণ ব্যবহৃত হত অর্থশাস্ত্রে তার উল্লেখ আছে। বাজারে এই সব পরিমাণগুলির উপর নজর রাখা হত।

মহাকাব্যের সময়ে অরণ্যের মধ্যে অনেক তপোবনের মত শিক্ষায়তন ছিল। এগুলি কোনো না কোনো নগরের অনতিদূরেই স্থাপিত হত এবং ছাত্রেরা এগুলিতে সুবিখ্যাত পণ্ডিতের কাছে নানাপ্রকার শিক্ষার জন্য আসত। বহু বিষয়ের এমনকি যুদ্ধ-বিদ্যারও শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। বনের মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা এই কারণে করা হত যেন নাগরিক জীবনের বিক্ষিপ্ততায় ছাত্রদের মনে চাঞ্চল্য না আসে এবং তারা সংযতভাবে ও সন্তুষ্টচিত্তে শিক্ষালাভ করতে পারে। কয়েক বছর এইভাবে শিক্ষা পাওয়ার পর তারা গৃহে ফিরে গিয়ে গার্হস্থ্য ও পৌর জীবন যাপন করবে এইরূপ মনে করা হত। সম্ভবত এই সকল বিদ্যায়তনে অল্পসংখ্যক ছাত্রই থাকত, যদিচ কোনো কোনো সুবিখ্যাত শিক্ষকের কাছে বহুসংখ্যক ছাত্র আকৃষ্ট হয়ে আসত।

বারাণসী বরাবর বিদ্যার কেন্দ্র হয়ে আছে, এমনকি বুদ্ধের সময়েই এ স্থান পুরাতন হয়ে উঠেছিল ও এইভাবে প্রসিদ্ধ ছিল। বারাণসীর সন্নিকটে সারনাথ নামক স্থানে বুদ্ধ তাঁর প্রথম উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের অনেক স্থানে তখন এবং পরে যেরূপ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল বারাণসী কোনো দিনই এরূপ একটা শিক্ষায়তনে পরিণত হয়নি। এখানে অনেক মণ্ডলী ছিল, প্রত্যেকটিতে একজন শিক্ষক ও তাঁর ছাত্রেরা থাকতেন, এবং প্রায়ই প্রতিদ্বন্দ্বী মণ্ডলীর মধ্যে ভীষণ বিতর্ক উপস্থিত হত।

উত্তর-পশ্চিমে, বর্তমান সময়ের পেশোয়ারের সন্নিকটে, তক্ষশীলায় একটি প্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এটি বিজ্ঞান, বিশেষত চিকিৎসা-বিজ্ঞান, এবং নানা বিদ্যার জন্য খ্যাতিলাভ করেছিল। ভারতের বহু দূরদূর অংশ হতে লোকে এখানে

আসত। জাতকের গল্পে প্রায়ই পাওয়া যায়, সম্ভ্রান্ত লোকের সন্তান ও ব্রাহ্মণেরা একলা একলা নিরস্ত্রভাবে শিক্ষার জন্য তক্ষশীলায় চলেছে। সম্ভবত মধ্য-এশিয়া ও আফগানিস্তান হতেও এখানে ছাত্র আসত। তক্ষশীলার শিক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াকে বিশেষ সম্মানের বিষয় বলে মনে করা হত। এখানকার চিকিৎসা বিভাগে শিক্ষিত চিকিৎসকেরা বহু সমাদর লাভ করতেন। কথিত আছে, বুদ্ধ যখনই অসুস্থ হতেন তাঁর অনুরাগীরা তক্ষশীলায় শিক্ষিত একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসককে তাঁর কাছে নিয়ে আসতেন। খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ কি সপ্তম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিত পাণিনি এখানকার ছাত্র ছিলেন বলে কথিত আছে।

তক্ষশীলা বুদ্ধপূর্ব কালের বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রাহ্মণ্যবিদ্যার আয়তন। বৌদ্ধযুগে এইস্থান বৌদ্ধবিদ্যার কেন্দ্র হয়েছিল, এবং তখন ভারতের সকল স্থান থেকে, ও সীমান্তের অপর দিক থেকেও, বৌদ্ধ ছাত্রেরা এখানে শিক্ষার জন্য আসত। তক্ষশীলা মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের প্রধান নগর ছিল।

মনু ছিলেন আইনের সর্বাপেক্ষা পুরাতন ব্যাখ্যাতা। তিনি যে সকল নির্দেশ দিয়ে গেছেন তদনুসারে স্ত্রীলোকের আইনসঙ্গত অধিকার একেবারেই মন্দ ছিল। সকল সময়ে কারও না কারও আশ্রয়ে তাদের থাকতে হত—পিতা, কি স্বামী, কি পুত্রের আশ্রয় ভিন্ন তাদের গতি ছিল না। আইনে তাদের প্রায় তৈজসপত্রের সামিল করে রেখেছিল। তবু মহাকাব্যে বর্ণিত বহু কাহিনী থেকে জানা যায় যে এই আইন কঠোরতার সঙ্গে প্রয়োগ করা হত না, এবং নারীরা গৃহে ও সমাজে সম্মানের স্থান লাভ করতেন। মনু স্বয়ং বলেছেন, 'যেখানে নারী সম্মান পান সেখানে দেবতারা বাস করেন।' তক্ষশীলা কি অন্যান্য কোনো পুরাতন শিক্ষায়তনে ছাত্রীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু ছাত্রীরাও কোনো না কোনো স্থানে নিশ্চয়ই শিক্ষা পেতেন, কারণ সুশিক্ষিতা ও বিদ্যাবতী নারীর বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালেও অনেক খ্যাতিমতী বিদুষী নারী ছিলেন। প্রাচীন ভারতে নারীর অবস্থা আইনে যদিচ ভাল ছিল না, আধুনিককালের আদর্শে বিবেচনা করলে দেখা যায় তাঁদের এই অবস্থা প্রাচীন গ্রীসের, কি পুরাতন খৃস্টীয় ধর্মাবলম্বীদের অথবা ইউরোপের মধ্যযুগের ধর্ম-সম্প্রদায়ের আইনে যা নির্দিষ্ট ছিল তা অপেক্ষা, এমনকি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অপেক্ষাকৃত আধুনিককাল পর্যন্ত যা ছিল, তা হতেও অনেক ভাল ছিল।

ব্যবসায়ে যৌথ ব্যবস্থার কথা মনু ও তাঁর পরবর্তী আইনের ব্যাখ্যাতারা বলেছেন। মনু প্রধানত পুরোহিতদের কথাই লিখেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য ব্যবসায় এবং কৃষির কথাও বলেছেন। এঁদের পরবর্তী লেখক নারদ বলেন, 'প্রত্যেক অংশীদারের ক্ষতি, ব্যয় কি লাভ তার প্রদত্ত মূলধন অনুসারে অন্যান্য অংশীদারের সমান কি তার অপেক্ষা কম কি বেশি হয়ে থাকে। সর্ত অনুসারে, ভাণ্ডারে দ্রব্য সঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা, আহার্য, অন্যান্য খরচ, ক্ষতি, ভাড়া প্রভৃতির জন্য ব্যয়ের ভাগ প্রত্যেক অংশীদারেরই দেয়।'

মনুসংহিতায় যে রাষ্ট্রব্যবস্থার উল্লেখ দেখি, তা থেকে মনে হয় তাঁর ধারণা ছোট রাষ্ট্রের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। এই ধারণা ক্রমে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং বৃহৎ রাজ্য

সম্বন্ধেও ধারণা জন্মে। এইরূপে খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে, এবং গ্রীকদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধও স্থাপিত হয়।

মেগাস্থিনিস খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে গ্রীক রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তিনি বলেছেন যে এদেশে ক্রীতদাস একেবারেই ছিল না। তাঁর ভুলই হয়েছিল, কারণ গৃহ-কার্যের জন্য যে ক্রীতদাস ছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই, আর তখনকার দিনের এদেশে লেখা পুস্তকে এই সকল ক্রীতদাসদের অবস্থার উন্নতি করার প্রস্তাব আছে। তবে একথা জানা যায় যে অন্যান্য দেশে যে ব্যাপকভাবে ক্রীতদাসপ্রথা ছিল, শ্রমসাধ্য কাজের জন্য যেমন ক্রীতদাস দল ব্যবহৃত হত, ভারতবর্ষে তেমন ছিল না। এইটা লক্ষ্য করেই মেগাস্থিনিসের ধারণা হয়ে থাকতে পারে যে এদেশে ক্রীতদাস ছিলই না। আইন ছিল, 'কোনো আর্যকে ক্রীতদাস করতে পারা যাবে না।' কে যে আর্য ছিল, কে ছিল না, একথা ঠিক করে বলা কঠিন, তবে সেই সময়ে আর্য বলতে মূলগত শ্রেণী চারটির লোকদের বোঝাত, আর শূদ্ররাও তাদের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু অস্পৃশ্য জাতির লোকেরা তা ছিল না।

চীন দেশেও, হ্যান্ বংশীয় রাজাদের রাজত্বকালের প্রথমভাগে, ক্রীতদাসদের মূলত গৃহকার্যে নিযুক্ত করা হত। চাষের কাজে, কিংবা বহুশ্রমিকসাধ্য কোনো সুবৃহৎ কাজে তাদের প্রয়োজন হত না। ভারতবর্ষ ও চীন উভয় দেশেই অধিবাসীদের অতি সামান্য অংশই ক্রীতদাস ছিল, এবং এই বিষয়ে চীন ও ভারতের সমাজ আর সেই সময়ের গ্রীক ও রোমান সমাজের মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল।

সেই প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের লোকেরা কিরূপ ছিলেন? এত পুরাতন এবং আমাদের হতে এত বিভিন্ন একটা সময় সম্বন্ধে কোনো অনুমান করা বড়ই শক্ত, তবু বহু প্রকারের যে সকল তথ্য আমরা জানতে পেরেছি তা থেকে একটা অস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। সেইকালের ভারতীয়েরা একটি আমোদপ্রিয় জাতি ছিল; তারা ছিল তাদের চিরাচরিত প্রথাগুলিতে বিশ্বাসবান, আর সেগুলি সম্বন্ধে তাদের একটা গর্বের ভাবই ছিল; তারা রহস্যময় গূঢ়তথ্যের খোঁজে ফিরত, আর তাদের মন ছিল প্রকৃতি ও মানবজীবন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসায় পূর্ণ; সকল বিষয়ে যে ধারণা, যে আদর্শ তারা স্থির করে নিয়েছিল তাকে জোরের সঙ্গেই ধরে থাকত, সহজ আনন্দে জীবন যাপন করত আর মৃত্যুর সম্মুখীন হতেও বিশেষ উদ্বেগ অনুভব করত না। আরিয়ান্ ছিলেন গ্রীক ঐতিহাসিক, উত্তর-ভারতে আলেক্জান্ডারের আক্রমণের ইতিহাস লিখে গেছেন। ইনি এই জাতির আমোদপ্রিয়তা দেখে লিখেছেন, 'ভারতবাসী অপেক্ষা অধিক সঙ্গীত ও নৃত্যপ্রিয় কোনো জাতি নেই।'

১৬ : মহাবীর ও বুদ্ধ : জাতিভেদ

উপরে উল্লিখিত বিবরণ হতে যেরূপ জানা যায় এরূপ পটভূমিকা উত্তর-ভারতে মহাকাব্যগুলির সময় থেকে বৌদ্ধযুগের প্রথমাংশ পর্যন্ত ছিল। রাজনৈতিক ও

অর্থনৈতিক দিকে এটা সকল সময়েই পরিবর্তিত হচ্ছিল, এবং নানাভাবে নানা বিষয়ের সংশ্লেষণ ও যোগাযোগ ঘটছিল। শ্রমজীবীদের মধ্যেও আপন আপন নির্দিষ্ট কর্মে বিশেষ যোগ্যতা লাভের উপর ঝোঁক দেখা যাচ্ছিল। ভাব ও ধারণার ক্ষেত্রেও ক্রমোন্নতি এবং প্রায়ই বিরোধও প্রকাশ পাচ্ছিল। উপনিষদ্‌গুলির প্রথম কয়েকটি রচিত হবার পর নানাদিকে মানুষের চিন্তা ও কর্ম প্রসার লাভ করেছিল। একে পুরোহিতদের ও তাদের কঠোর অনমনীয় প্রথাপদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া বলা যেতে পারে। মানুষের মন অনেক বিষয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে আরম্ভ করল আর এই বিদ্রোহ হতেই প্রথমদিকের উপনিষদ্‌গুলি পাওয়া গেল। অল্পকাল পরেই এল জড়বাদ এবং জৈন-ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের প্রবল স্রোত। ভগবদ্‌গীতায় যে বিভিন্ন মত পাওয়া যায় সেগুলিকে সংশ্লিষ্ট করে নেবার চেষ্টাও জাগল। এই সমস্ত হতেই উদ্ভূত হল ভারতীয় দর্শনের ছয়টি দিক—ষড়্‌দর্শন। এসব সত্ত্বেও, এই মানসিক বিরোধ ও বিদ্রোহের অন্তরালে ছিল সুস্পষ্ট এবং বর্ধমান জাতীয় জীবন।

একভাবে দেখতে গেলে, জৈনধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম বৈদিকধর্ম থেকে উদ্ভূত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুটিতে বৈদিক ধর্ম ও তার শাখাপ্রশাখাগুলি হতে বিচ্ছিন্ন হওয়াটাই লক্ষণীয়। এই দুই ধর্ম বেদ মানে না এবং বিশ্বের মূলগত কারণ স্বীকার করে না, বা সে-বিষয়ে কোনো কথা বলে না। এই উভয় ধর্মেই অহিংসার উপর জোর দেওয়া হয় এবং চিরকুমার সন্ন্যাসী ও পুরোহিতদের প্রতিষ্ঠান, মঠাদি স্থাপনের ব্যবস্থা আছে। এই দুই ধর্মে যেভাবে বিষয় সকলের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয় তাতে যাথার্থ্য ও যুক্তিযুক্ততার প্রতি দৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু এই উপায়ে অদৃষ্ট জগৎ সম্বন্ধে আলোচনায় বেশিদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। জৈনধর্মের একটা মূলগত মত হল এই যে সত্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে আপেক্ষিক। এই ধর্মে কঠোরভাবে নীতিশাস্ত্র অনুসরণ করা হয়, এবং অতীন্দ্রিয় বিষয়কে স্বীকার না করে জীবনে ও চিন্তায় বৈরাগ্যের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়।

জৈনধর্মের প্রবর্তয়িতা, মহাবীর, এবং বুদ্ধ সমসাময়িক ছিলেন, এবং উভয়েই ক্ষত্রিয় যোদ্ধৃবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধ ৮০ বছর বয়সে খৃস্টপূর্ব ৫৪৪ অব্দে দেহ-ত্যাগ করেন এবং তখন থেকে বৌদ্ধ অব্দ আরম্ভ হয়। (এই তারিখটা বরাবর গৃহীত হয়ে আসছে, কিন্তু ঐতিহাসিকেরা আরও পরের তারিখ দেন, খৃস্টপূর্ব ৪৮৭; তবে এখন তাঁরাও পূর্বের তারিখটাই স্বীকার করার দিকে ঝুঁকেছেন।) এ বড় আশ্চর্য যে আজই আমি এ বিষয়ে লিখছি, কারণ আজ ২৪৮৮ বৌদ্ধ অব্দের নববর্ষের দিন —বৈশাখী পূর্ণিমা। বৌদ্ধ সাহিত্যে লিখিত আছে যে গৌতম বৈশাখের পূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এই তিথিতে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং শেষে এই দিনেই দেহত্যাগ করেছিলেন।

বুদ্ধ সাহসের সঙ্গে বহুলোক আচরিত ধর্ম, কুসংস্কার, অনুষ্ঠানাদি ও পৌরোহিত্য এবং এইগুলির সঙ্গে যাদের স্বার্থ বিজড়িত ছিল তাদের আক্রমণ করেছিলেন। আধ্যাত্মিক ও দেববাদ বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গী, অলৌকিকত্ব, অতিপ্রাকৃত প্রত্যাদেশ প্রভৃতির

নিন্দাও তিনি করেছিলেন। তিনি লোকের চিত্তকে আকর্ষণ করেছিলেন বিচার, যুক্তি ও প্রকৃত অভিজ্ঞতার দিকে; তিনি জোর দিয়েছিলেন নীতির উপর; আর তাঁর পদ্ধতি ছিল মানসিক বিশ্লেষণ—মনস্তত্ত্ব—তাতে আত্মার কথা ছিল না। আধ্যাত্মিক কাল্পনিকতার বদ্ধ বায়ুর পরে নির্মল ও মুক্ত পার্বত্য হাওয়ার মত ছিল তাঁর শিক্ষা।

বুদ্ধ সাক্ষাৎভাবে জাতিভেদকে আক্রমণ করেননি, কিন্তু আপন সম্প্রদায়ে একে স্বীকারও করেননি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সমাজ-বিষয়ে তাঁর মনোভাব এবং তাঁর কার্যকলাপ জাতিভেদকে দুর্বল করেছিল। সম্ভবত, তাঁর সময়ে, এবং পরেও কয়েক শতাব্দী ধরে, জাতিবিভাগ আলগাভাবেই ছিল। একথা সহজেই বোঝা যায় যে সমাজ জাতিভেদগ্রস্ত হলে বৈদেশিক বাণিজ্যে এবং দেশের বাইরে যাতায়াতে অসুবিধা হয়, তবু বুদ্ধের পরে পনেরো শতাব্দী কি আরও দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষ ও নিকটবর্তী দেশগুলির মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যে ক্রমশই উন্নতিলাভ করেছিল, এবং ভারতবাসীর উপনিবেশগুলিরও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। বিদেশীয়েরা ক্রমাগত উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে এদেশে এসেছে এবং এখানকার লোকদের সঙ্গে মিশে গেছে।

এই মিশে যাওয়াটা সমাজের উপর-নিচ দুই ধারেই ঘটেছিল। নিচের দিকে নূতন জাতি তৈরি হত, আর কোনো শক্তিমান বৈদেশিক আক্রমণকারী জয়লাভ করলে শীঘ্রই ক্ষত্রিয়দের শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়ত। খৃস্টীয় অব্দের আরম্ভের অল্প পূর্বে ও পরে যে-সমস্ত মুদ্রা প্রচলিত হয়েছিল তা হতেও দু তিন পুরুষের মধ্যে এই প্রকার পরিবর্তনের কথা জানা যায়। দেখা গেছে, প্রথম শাসনকর্তার নাম বিদেশী, কিন্তু তাঁর পুত্র কি পৌত্র সংস্কৃত নাম গ্রহণ করেছেন এবং ক্ষত্রিয়দের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়েছে।

খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে শক ও সীথিয়ান দ্বারা ভারত-আক্রমণ ঘটতে থাকে। অনেক রাজপুত ক্ষত্রিয় বংশ এই সময়, ও শ্বেত হূনদের শেষের আক্রমণগুলির সময় হতে চলে আসছে বলে জানা যায়। এই সকল বংশ এ দেশের ধর্মমত এবং প্রচলিত প্রথাদি স্বীকার করেছিল, এবং মহাকাব্যগুলির সুবিখ্যাত বীরদের ভাব ও পরিচয় গ্রহণ করেছিল। এইরূপে ক্ষত্রিয়েরা বংশানুক্রম অপেক্ষা কার্যকলাপ ও পদমর্যাদার উপরে বেশি নির্ভর করেছে, এবং এই কারণে বিদেশীয়দের পক্ষে তাদের দলে মিশে যাওয়া সহজ হয়েছে।

ভারতের বহু যুগের ইতিহাসে জ্ঞানী ও মহৎ ব্যক্তিরা বারবার পৌরোহিত্য এবং জাতিভেদের কঠোরতার বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন। এ বড় আশ্চর্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ যে, এসব সত্ত্বেও জাতিভেদ ধীরে, অনেকটা অগোচরে, যেন অপরিহার্য নিয়তির মত বিস্তৃতিলাভ করেছে এবং সকল দিকে বজ্রমুষ্টিতে ভারতীয় জীবনকে শ্বাস রোধ করে ধরেছে। জাতিভেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অনেকবার অনেক লোকে যোগ দিয়েছে, কিন্তু শেষে এই বিদ্রোহীরাই নূতন জাতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। জৈনধর্ম মূল হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে, এবং তা থেকে অনেক বিষয়ে অন্য রূপ নিয়েই দাঁড়িয়েছিল, তবু জাতিভেদকে কতকটা স্বীকার করে নিয়েছিল। এইভাবে

জৈনধর্ম এখনও হিন্দুধর্মেরই একটি শাখারূপে চলে আসছে। বৌদ্ধধর্ম জাতিভেদ স্বীকার করেনি এবং চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীতে অধিক স্বাধীনতার পরিচয় দিয়েছে, কিন্তু শেষে এদেশ ছেড়েই চলে গেছে, যদিচ এখনও ভারতবর্ষ এবং হিন্দুধর্মের উপর তার প্রভাব গভীরভাবেই কাজ করছে। খৃস্টধর্ম আঠারোশো বছর আগে এদেশে এসে স্থায়ী হয়েছে, এবং ধীরে নিজেদের জাতিভেদ গড়ে নিয়েছে। এদেশে মুসলমানদের সমাজব্যবস্থাতেও এই প্রভাব আংশিকভাবে দেখা যায়, যদিচ আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভেদের মত যে কোনো বেড়াকে তারা অতিশয় কঠিন ভাষাতেই নিন্দা করে থাকে।

আমাদের কালেও জাতিভেদের জুলুম দূর করার জন্য মধ্যবিত্তদের মধ্যে বহু আন্দোলন হয়েছে, কিন্তু তাতে যা পার্থক্য দাঁড়িয়েছে জনসাধারণের মধ্যে তা বেশি-দূর অগ্রসর হয়নি। এই সকল আন্দোলনে আক্রমণটা সাক্ষাৎভাবেই করা হয়েছিল। তারপর গান্ধীজি সমস্যাটি হাতে নিয়ে চিরাচরিত ভারতীয় পদ্ধতিতে পরোক্ষভাবে অগ্রসর হলেন—তাঁর দৃষ্টি লোকসাধারণের উপর। তাঁর চেষ্টা যথেষ্ট পরিমাণে সাক্ষাৎভাবেও যে হয়নি তা নয়, জোরের সঙ্গেও হয়েছে, আর তিনি প্রধান চারিবর্ণের মূলগত বৃত্তিনির্দেশক উদ্দেশ্যটিকে আক্রমণ না করে এই দোষের নিরাকরণে দৃঢ়নিষ্ঠ-ভাবে তৎপর হয়েছেন। তিনি আক্রমণ করেছেন এর অতিবর্ধমান আগাছাগুলিকে কিন্তু মনে মনে জানেন যে সমগ্র জাতিভেদ ব্যাপারটাকেই ভিতরে ভিতরে ধ্বংস করছেন।* ইতিমধ্যে তিনি এর ভিত্তিতে নাড়া দিয়েছেন এবং জনসাধারণের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। এখন তাঁর অপেক্ষাও বিপুলতর শক্তি কাজ করছে; সে হল বর্তমানকালের জীবনের ধারা। মনে হয়, অবশেষে অতীতের এই অতিবৃদ্ধ অভিজ্ঞানটির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে।

আমরা ভারতে জাতিভেদ নিয়ে বিব্রত আছি; এর উৎপত্তি হয়েছিল গায়ের রঙে।

* জাতিভেদ সম্বন্ধে গান্ধীজির কথা ক্রমশই বল পাচ্ছে এবং স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তিনি একথাটি বারবার পরিষ্কার করে বলেছেন যে একে সম্পূর্ণরূপে দূর করতে হবে। তিনি আমাদের দেশের লোকের কাছে যে গঠনমূলক কার্যতালিকা উপস্থিত করেছেন তাতে বলেছেন, 'স্বাধীনতা—রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা,—এই কার্যতালিকার লক্ষ্য। এ হল একটি বিশাল জাতির সকল দিকের নৈতিক, অহিংস বিপ্লব। এর অন্তে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা এবং এইরূপ অন্যান্য কুসংস্কারগুলি লুপ্ত হবে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যেকার বিরোধ অতীতের বিষয় হয়ে উঠবে, আর ইংরাজ ও অন্যান্য ইউরোপবাসীদের প্রতি যে শত্রুতা পোষণ করা হয় তা সকলে ভুলে যাবে।' এ ছাড়া, তিনি সম্প্রতি বলেছেন, 'আমরা যে জাতিভেদ জানি তা এ-যুগের অযোগ্য। হিন্দুধর্ম ও ভারতবর্ষকে যদি বর্তে থাকতে হয়, এবং দিন দিন উন্নতিলাভ করতে হয়, তাহলে একে যেতেই হবে।' এ ছাড়া, তিনি সম্প্রতি বলেছেন, 'আমরা যে জাতিভেদ জানি তা এ-যুগের অযোগ্য।। হিন্দুধর্ম ও ভারতবর্ষকে যদি বর্তে থাকতে হয়, এবং দিন দিন উন্নতিলাভ করতে হয়, তাহলে একে যেতেই হবে।'

পাশ্চাত্যে দেখি একটা নূতন এবং উদ্ধত প্রকৃতির জাতিভেদ মাথা তুলেছে, আর তাতে লক্ষ্য করা যায় এক একটা মানব-সমষ্টি অপরগুলিকে দূরে ঠেলে রাখতে চাচ্ছে; তারা আপন আপন কথা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিভাষায় সাজিয়ে নিয়েছে, এমন কি মাঝে মাঝে গণতন্ত্রের বুলিও আওড়ায়।
বৌদ্ধধর্ম ভারতে ক্রমে ক্রমে বিস্তৃতিলাভ করে। যদিচ এটা মূলত ক্ষত্রিয় আন্দোলন, ভারতীয় মহাপুরুষ, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য, বলেছিলেন : 'ধর্ম কিংবা ত্বকের বর্ণ সাধুতা উৎপন্ন করতে পারে না—সাধুতার অনুশীলন আবশ্যক। সুতরাং কেউ যেন পরের সম্বন্ধে এমন কিছু না করে যা সে নিজের সম্বন্ধে করতে চায় না।'

১৭ : চন্দ্রগুপ্ত এবং চাণক্য : মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

বৌদ্ধধর্ম ভারতে ক্রমে ক্রমে বিস্তৃতিলাভ করে। যদিচ এটা মূলত ক্ষত্রিয় আন্দোলন, শাসকশ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে পুরোহিতদের প্রাধান্য ও প্রথাপদ্ধতির বিরোধিতা, ও গণতান্ত্রিক দিকটি, বিশেষত পুরোহিতদের প্রাধান্য ও প্রথাপদ্ধতির বিরোধিতা, লোকসাধারণের সহযোগিতা আকর্ষণ করেছিল। এ ধর্ম সাধারণের কাছে একটি সংস্কারের আন্দোলন হয়ে দাঁড়াল, কয়েকজন চিন্তাশীল ব্রাহ্মণও এতে যোগ দিলেন। কিন্তু মোটের উপর ব্রাহ্মণেরা এর বিপক্ষতাই করেছিলেন এবং বৌদ্ধগণকে ধর্মদ্রোহী বলেছেন। বাইরে যা ঘটছিল তা থেকে বেশি হচ্ছিল ভিতরে ভিতরে। বৌদ্ধধর্ম ও পুরাতন ধর্মের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ক্রমাগত ব্রাহ্মণদের সমূহ ক্ষতি হতে লাগল। আড়াইশো বছর পরে, সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে দেশে এবং বিদেশে শান্তি-পূর্ণভাবে এই ধর্মপ্রচারের জন্য নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন।

এই দুই শতাব্দীতে ভারতবর্ষে অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল। অনেকদিন ধরে দেশের নানা জাতির লোককে মিলিত করার এবং ছোট ছোট রাজ্য ও গণতন্ত্রগুলিকে একত্র করে নেবার চেষ্টা চলছিল। একটি কেন্দ্রীভূত রাজ্য স্থাপনের জন্য পূর্বেই যে প্রেরণা এসেছিল, তা ভিতরে ভিতরে কাজ করছিল। এই সমস্ত হতে একটি শক্তিমান ও উন্নত সাম্রাজ্য গড়ে উঠল। উত্তর-পশ্চিমে আলেক্জান্ডারের আক্রমণের ফলে এই কাজটি শেষের দিকে একটু তাড়াতাড়ি অগ্রসর হয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে, দুজন এরূপ শক্তিমান ব্যক্তির অভ্যুদয় হল যাঁরা এই পরিবর্তনের নাড়াচাড়ার সুযোগ নিয়ে আপনাদের ইচ্ছামত রাজ্য গুছিয়ে নিলেন। এ'রা হলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, আর তাঁর বন্ধু, অমাত্য ও উপদেষ্টা, ব্রাহ্মণ চাণক্য। এই দুজন ভালই মিলেছিলেন। উভয়েই মগধের পরাক্রান্ত নন্দ রাজ্য হতে নির্বাসিত হয়েছিলেন। এ রাজ্যের রাজধানী তখন ছিল পাটলিপুত্রে—বর্তমান পাটনায়। এরপর তাঁরা তক্ষশীলায় যান এবং সেখানে আলেক্জান্ডার যে সকল গ্রীকদের রেখেছিলেন তাদের সংশ্রবে আসেন। চন্দ্রগুপ্ত আলেক্জান্ডারের দেখা পেয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে তাঁর দেশজয় ও গৌরবের কথা শুনে সেই প্রকারের কীর্তির জন্য চন্দ্রগুপ্তের অন্তঃকরণও উচ্চাভিলাষে পূর্ণ

হয়। তাঁরা তাঁদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে অনেক পরিকল্পনা তৈরি করেন এবং সেগুলি কাজে খাটাবার সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন।

শীঘ্রই সংবাদ এল যে ব্যাবিলনে আলেক্জান্ডারের মৃত্যু হয়েছে (খৃস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দ)। অবিলম্বে চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য জাতীয়তার পুরাতন, অথচ চিরনূতন, রব তুললেন এবং দেশের লোককে বিদেশী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করলেন। গ্রীক সৈন্যদল বিতাড়িত হল এবং তক্ষশীলা পাওয়া গেল। জাতীয়তার আহ্বানে চন্দ্রগুপ্তের দলে বহু লোক যোগ দিল এবং তখন তিনি এই মিত্রবর্গকে নিয়ে উত্তর-ভারতের মধ্য দিয়ে পাটলিপুত্রে যাত্রা করলেন। আলেক্জান্ডারের মৃত্যুর পর দু বছরের মধ্যে তিনি ঐ নগর ও মগধ রাজ্য অধিকার করলেন। মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল।

আলেক্জান্ডারের সেনাপতি সেলিউকস তাঁর প্রভুর মৃত্যুর পর এশিয়া মাইনর হতে ভারতবর্ষ পর্যন্ত এই সমস্ত অংশের অধিকার লাভ করেছিলেন। তিনি উত্তর-ভারতে অধিকার পুনঃস্থাপন করবার জন্য সৈন্য নিয়ে সিন্ধুনদ পার হয়েছিলেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হন, এবং চন্দ্রগুপ্তকে কাবুল ও হীরাট্ পর্যন্ত আফগানিস্তানের অংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। চন্দ্রগুপ্ত সেলিউকসের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য, দাক্ষিণাত্য ছাড়া, আরব সাগর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত, এবং উত্তরে কাবুল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। লিখিত ইতিহাসে এই প্রথম ভারতবর্ষে একটি বিশাল কেন্দ্রীভূত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল। এই বিপুল সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র নগরে।

এই রাজ্যটি কিরূপ আকার নিয়েছিল তা জানা আবশ্যক। সৌভাগ্যক্রমে ভারতীয় ও গ্রীক উভয় দিক থেকে এর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। সেলিউকস-প্রেরিত রাষ্ট্রদূত, মেগাস্থিনিস অনেক কথাই লিখে গেছেন, আর আমরা পাই আগেই উল্লিখিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। চাণক্যেরই আর এক নাম কৌটিল্য। এই রাষ্ট্রব্যবস্থাবিষয়ক গ্রন্থটি কেবল যে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি লিখে গেছেন তা নয়, লেখক স্বয়ং এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, উন্নতি ও রক্ষায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন। চাণক্যকে ভারতীয় ম্যাকিয়াভেলি বলা হয়। কতকাংশে এ তুলনাটা ঠিকই। কিন্তু তিনি সর্বাংশে আরও বড় ছিলেন, আরও বুদ্ধিমান এবং আরও উচ্চশ্রেণীর কর্মবীর। চাণক্য কোনো রাজার অনুগামী মাত্র, পরাক্রান্ত কোনো সম্রাটের উপদেষ্টা মাত্র, ছিলেন না। মুদ্রারাক্ষস আমাদের দেশের একখানি পুরাতন নাটক; এই নাটকে তখনকার দিনের কথা আছে, এবং এতে চাণক্যের জীবনালেখ্য পাওয়া যায়। নির্ভীক, চক্রী, অহঙ্কৃত, ও প্রতিহিংসাপরায়ণ চাণক্য অবজ্ঞা কখনও ভোলেন না। তাঁর মন সর্বদাই আপন সঙ্কল্পে নিবদ্ধ, শত্রুকে প্রতারিত ও পরাজিত করার জন্য সকল প্রকার উপায় তিনি গ্রহণ করেছেন। সম্রাটকে প্রভুরূপে নয়, প্রিয় ছাত্ররূপে বিবেচনা করে সাম্রাজ্যের পরিচালনা নিজের হাতে নিয়ে বসে ছিলেন। অনাড়ম্বর ও কঠোরচিত্ত ব্রাহ্মণ উচ্চপদের সমারোহে স্পৃহাহীন; তাঁর পণ উদ্‌যাপিত এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধ হতেই তিনি কর্মক্ষেত্র

থেকে বিদায় নিয়ে ব্রাহ্মণোচিত ধ্যান-ধারণায় তাঁর শেষ জীবন অতিবাহন করতে চেয়েছিলেন।

আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য চাণক্য করতে পারতেন না এমন কিছুই ছিল না। বহুল পরিমাণে তিনি অবিবেকী ছিলেন। তবু তাঁর এ-জ্ঞান ছিল যে কোনো উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অনুপযোগী পন্থা অবলম্বন করলে সেই উদ্দেশ্যেরই হানি হতে পারে। ক্লজ-উইট্জের বহুকাল আগে তিনি বলে গেছেন যে যুদ্ধ অন্য উপায়ে রাজনীতিরই অনুবর্তন মাত্র। আরও বলেছেন, যুদ্ধই যুদ্ধের উদ্দেশ্য হতে পারে না, রাজ্যের কাজে আসা চাই। রাজনীতিকের লক্ষ্য এরূপ হওয়া আবশ্যক যে যুদ্ধ হতে যেন রাজ্যের উন্নতি ঘটে, তা যেন কেবলমাত্র শত্রুর পরাজয় কি ধ্বংসের জন্য না হয়। যুদ্ধে যদি উভয়পক্ষেরই নাশ ঘটে তাহলে বুঝতে হবে রাজনীতি সেখানে দেউলিয়া হয়েছে। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে হয়, কিন্তু এসব অপেক্ষা বেশি প্রয়োজন যুদ্ধকৌশলের, যেন অস্ত্রশক্তি ব্যবহারের আগে শত্রুর মন দুর্বল হয়, তার শক্তি ভেঙে যায় এবং সে অবসন্ন অথবা অবসন্নপ্রায় হয়। চাণক্য আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে অবিবেকী ও কঠোর ছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি কোনোদিনই ভোলেননি যে বুদ্ধিমান, উচ্চাশয় শত্রুকে দলন করা অপেক্ষা তাকে স্বপক্ষে আকর্ষণ করা ভাল। তাঁর শেষ বিজয় তিনি শত্রুসৈন্যদের মধ্যে অশান্তির বীজ বপন করে লাভ করেছিলেন, এবং কথিত আছে যে এই জয়ের সময়েই বিপক্ষ রাজার প্রতি উদারতা দেখাবার জন্য চন্দ্রগুপ্তকে প্ররোচিত করেছিলেন। শোনা যায়, চাণক্য নিজের উচ্চপদের পরিচায়ক দণ্ডটি স্বয়ং এই বিপক্ষ রাজার মন্ত্রীর হাতে তুলে দেন, কারণ এই মন্ত্রীর বুদ্ধিমত্তা ও বৃদ্ধ প্রভুর প্রতি অনুরক্তি দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। এইভাবে পরাজয়ের মালিন্যে ও অবমাননায় এই ঘটনার পরিসমাপ্তি হয়নি, হয়েছিল পুনরায় হৃদ্যতা-স্থাপনে। এর ফলে, প্রধান শত্রুকে কেবলমাত্র পরাজিত না করে তাকে বন্ধুভাবে লাভ করায় রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় ও স্থায়ী হয়েছিল।

মৌর্য সাম্রাজ্য গ্রীক জগতে সেলিউকস, তাঁর উত্তরবর্তিগণ ও টোলেমি ফিলাডেল-ফাসের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগ রক্ষা করেছিল। এই যোগের দৃঢ় ভিত্তিটি ছিল উভয় পক্ষের বাণিজ্য-ঘটিত স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত। স্ট্র্যাবো বলেন যে ক্যাস্পিয়ান ও কৃষ্ণসাগরের পথে ভারতীয় পণ্য যে ইউরোপে যেত তাতে মধ্য-এশিয়ার অক্সাস নদী যোগ রক্ষা করত। খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এই পথটা ব্যবসায়ীদের পছন্দ ছিল। মধ্য-এশিয়া তখন উর্বর ও সমৃদ্ধ ছিল। এর সহস্রাধিক বছর পরে এ স্থান শুকিয়ে যেতে শুরু করে। অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ পাওয়া যায় যে রাজার অশ্বশালায় আরবদেশীয় ঘোড়া থাকত।

১৮ : রাজ্যের বিধিব্যবস্থা

এখন প্রশ্ন এই, খৃস্টপূর্ব ৩২১ অব্দে এই যে সাম্রাজ্যটি গড়ে উঠে ভারতের অধিকাংশে, মায় উত্তরে কাবুল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, কি ছিল তার রূপ? অন্যান্য সমস্ত সাম্রাজ্য

তখন যেমন ছিল, এবং এখনও যেমন, এইটিও তেমনি স্বেচ্ছাচার-শক্তিসম্পন্ন অধি-নায়কদ্বারা শাসিত হত। শহরে ও পল্লী সমিতিগুলিতে অনেক পরিমাণে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ছিল, এবং নির্বাচিত প্রবীণ ব্যক্তিরা স্থানীয় বিষয়ের বিধি-ব্যবস্থা করতেন। এইরূপ অধিকারকে লোকে মূল্যবান মনে করত, আর রাজাও এতে বড় একটা হাত দিতেন না। তথাচ, কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার বহুমুখীন কার্যাবলীর প্রভাব সর্বত্রই প্রসারিত হত। কোনো কোনো বিষয়ে মৌর্য রাজ্যের ব্যবস্থা বর্তমান সময়ের অধিনায়কশাসিত রাজ্যের (ডিক্টেটরশিপ্) কথা মনে করিয়ে দেয়। তখন ছিল কৃষি-যুগ, সুতরাং সেকালে বর্তমান সময়ের ন্যায় রাজশক্তিদ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ সম্ভব ছিল না। তবু সীমাবদ্ধভাবে হলেও রাজ্যমধ্যে জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা ছিল। রাজশক্তি কেবলমাত্র পুলিশরাজের ন্যায় দেশের বাইরে ও ভিতরে শান্তিরক্ষা করে ও রাজস্ব আদায় করে ক্ষান্ত হত না।

দৃঢ় আমলাতন্ত্র দেশময় ছড়িয়ে ছিল, আর গুপ্তচর ব্যবহারের কথাও জানা যায়। কৃষি বিধিবদ্ধ ছিল, আর সুদের হারও নিয়মাধীন ছিল। খাদ্য, বাজার, কারখানা, কশাইখানা, পশুর ব্যবসায়, জলসরবরাহ, খেলা এমনকি গণিকা ও মদ্যপানের স্থান-গুলিও মাঝে মাঝে পরিদর্শন ও বিধিবদ্ধ করার ব্যবস্থা ছিল। ওজনের বাটখারা ও অন্যান্য মাপ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। বাজার হতে খাদ্যশস্য সরিয়ে নেওয়া এবং ভেজাল দেওয়ার জন্য কঠিন শাস্তি দেওয়া হত। ব্যবসায়ের উপর কর আদায় করা হত, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মের ব্যবহারের উপরেও কর ধার্য ছিল। নিয়ম ভাঙলে কিংবা অন্য কোনো অসদাচরণ দেখা গেলে মন্দিরে সংগৃহীত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হত। যদি কোনো ধনী ব্যক্তি তহবিল ভাঙার জন্য দোষী সাব্যস্ত হত, কিংবা দেশবাসীর কোনো বিপদের সুযোগে অর্থ সংগ্রহ করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যেত তাহলে তার সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করার বিধি ছিল। স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, এবং চিকিৎসালয় স্থাপিত ছিল, আর প্রত্যেক প্রধান প্রধান কেন্দ্রে চিকিৎসক রাখা হত। রাজভাণ্ডার থেকে বিধবা, অনাথ, রুগ্নব্যক্তি ও আতুরদের দুঃখ দূর করার আয়োজন ছিল। দুর্ভিক্ষে সাহায্য দান রাজশক্তির বিশেষ দায়িত্ব বলে গৃহীত হত, এবং এইরূপ সাহায্য দেবার জন্যই রাজকীয় শস্যভাণ্ডারের অর্ধেক শস্য পুঁজি করা থাকত।

এই সকল বিধিব্যবস্থা সম্ভবত পল্লী অপেক্ষা শহরেই অধিক প্রযুক্ত হত, আর এও সম্ভব যে আসল কাজ আদর্শের পিছনে পড়ে থাকত। তবু আমাদের পক্ষে এই আদর্শটি কম আগ্রহের বিষয় নয়। পল্লীর লোকেরা কার্যত স্বায়ত্তশাসনের দ্বারা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করতে পারত।

চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে বহুবিধ বিষয়ের এবং রাজ্যশাসনের প্রত্যেক দিকের মত ও ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা আছে। রাজা, তাঁর অমাত্য ও উপদেষ্টা, ব্যবস্থাপক সভা, শাসনের বিবিধ বিভাগ, এই সকলের কর্তব্য ও কার্য সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বিচার করা হয়েছে; কূটনীতি, যুদ্ধ ও শান্তি সম্বন্ধেও আলোচনা এতে আছে। চন্দ্রগুপ্তের

বিপুল সৈন্যবাহিনী, এর অন্তর্গত পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য, রথ ও হাতি,* এই সমস্তের বিবরণ গ্রন্থখানি হতে পাওয়া যায়। চাণক্য তবু বলেছেন যে কেবল সংখ্যায় বেশি কিছু হয় না; নিয়মানুবর্তিতা ও যথোপযুক্ত নেতৃত্ব না থাকলে সংখ্যা ভার হয়ে ওঠে। তাঁর গ্রন্থে আত্মরক্ষা এবং দুর্গাদিদ্বারা সুরক্ষণের ব্যবস্থার কথাও আছে।

এই গ্রন্থে আর যে যে বিষয়ের বিবরণ আছে তার মধ্যে আমরা পাই, ব্যবসায় ও বাণিজ্য, আইন ও বিচারালয়, পৌর শাসন, সামাজিক রীতিনীতি, বিবাহ ও বিবাহভঙ্গ, নারীর অধিকার, কর ও রাজস্ব, কৃষি, খনি ও কারখানার কার্যপ্রণালী, শ্রমশিল্পী, বাজার, ফলোৎপাদন, শ্রমশিল্প, জলসেচনের ব্যবস্থা ও জলপথ, জাহাজ ও জলপথে যাতায়াত, সমিতি, আদমসুমারি, মাছধরার ব্যবস্থা, কশাইখানা, বিদেশে যাবার অনুজ্ঞা-পত্র এবং কারাগার। বিধবা বিবাহ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বিবাহ বন্ধন ছেদনও অনুমোদিত ছিল।

চীনদেশে প্রস্তুত রেশমের কাপড়, চীনাপট্টের উল্লেখ পাওয়া যায়; তখন এ দেশের রেশমজাত কাপড় এবং চীনাপট্টের মধ্যে পার্থক্য করা হত। সম্ভবত এ দেশের রেশমী কাপড় মোটা ছিল। চীন থেকে যে কাপড় আসত এ কথায় বোঝা যায় খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতেও চীনদেশের সঙ্গে এদেশের বাণিজ্যচুক্তি চলত।

রাজাকে অভিষেকের সময়ে শপথ নিতে হত, 'আমি যদি তোমাদের উপর অত্যাচার করি তাহলে যেন স্বর্গ, প্রাণ ও সন্তান হারাই।' 'প্রজার সুখেই রাজার সুখ, প্রজার কল্যাণেই তাঁর কল্যাণ; যাতে তিনি নিজে খুশি হন তাকে তিনি ভাল বলে মনে করবেন না, যাতে তাঁর প্রজারা সুখী হয়, তাকেই তিনি ভাল বলে গণ্য করবেন।' রাজা যদি কর্মঠ হন তাঁর প্রজারাও সমান কর্মঠ হবে।' সাধারণের কাজের ক্ষতি হতে পারত না এবং তা রাজার খুশির উপর নির্ভর করত না, রাজাকে সকল সময়ে সেরূপ কাজের জন্য প্রস্তুত থাকতে হত। রাজা যদি অন্যায় কাজ করতেন, তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে অন্য একজনকে তাঁর স্থানে অভিষিক্ত করতে প্রজাদের অধিকার ছিল।

দেশে অনেক খনিত জল-প্রণালী ছিল, আর এইগুলির তত্ত্বাবধানের জন্য পূর্ত-বিভাগ ছিল; এ ছাড়া বন্দর, খেয়াঘাট, সেতু এবং অসংখ্য নৌকা ও জাহাজের জন্য নৌ-বিভাগ ছিল। জাহাজগুলি দেশের নদীতে যাওয়া আসা ছাড়া সমুদ্র পার হয়ে ব্রহ্মদেশ ও আরও দূরেও যেত আসত। মনে হয়, সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে একযোগে কাজ করার জন্য এক প্রকারের নৌ-বহরও ছিল।

সাম্রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্য উন্নতিলাভ করেছিল, এবং বড় বড় রাস্তা দূরবর্তী স্থানগুলিকে যুক্ত করে রেখেছিল, আর এই সকল রাস্তার উপর পথিকদের জন্য অনেক

* দাবাখেলা ভারতবর্ষে উদ্ভাবিত হয়েছিল, আর সম্ভবত চতুর্মুখীন সৈন্যবাহিনীর ধারণা থেকে এর সৃষ্টি ঘটে। এর নাম ছিল চতুরঙ্গ, আর এই নাম থেকে পরে আসে শতরঞ্জ নাম। ভারতে যে চারজনে দাবাখেলা হয় অ্যাল্‌বেরুনী তার বিবরণ দিয়েছেন।

পান্থশালা নির্মিত ছিল। প্রধান রাস্তার নাম ছিল 'রাজপথ', আর এই রাস্তা রাজধানী হতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত দেশের এধার থেকে ওধারে গিয়েছিল। বিদেশী বণিকদের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল, এবং তারা রাজ্যের মধ্যে থেকেও স্থানীয় বিষয়ে এক প্রকারের স্বাধীনতা উপভোগ করত। কথিত আছে প্রাচীনকালে মিশরবাসীরা ভারতীয় মসলিনে তাদের ম্যামিগুলিকে জড়িয়ে রাখত, আর তাদের বস্ত্রাদি ভারতে উৎপন্ন নীল দিয়ে রঙ করত। পুরাতন ধ্বংসাবশেষগুলিতে কাচও আবিষ্কার করা গেছে। গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিস বলেছেন যে ভারতীয়েরা বিলাসদ্রব্য এবং সুরূপ ভালবাসত, এবং এও বলেছেন যে দেহের উচ্চতা বাড়াবার জন্য জুতা ব্যবহার করত।

মৌর্য সাম্রাজ্যে শৌখিনতার বৃদ্ধি ঘটেছিল। জীবন পূর্বাপেক্ষা অধিক জটিল, কিন্তু সুব্যবস্থিত হয়েছিল। 'পান্থনিবাস, সরাই, সাধারণের আহারের স্থান, জুয়া-খেলার আড্ডা অনেক স্থাপিত হয়েছে। নানাজাতি ও শিল্পের লোকেরা মেলামেশার জন্য আপন আপন জায়গা করে নিয়েছে; শিল্পীরা সাধারণ ভোজেরও ব্যবস্থা করেছে। আমোদ প্রমোদের আয়োজনে অনেক শ্রেণীর নর্তক, গায়ক ও অভিনেতারা জীবিকা অর্জন করে, এবং পল্লীতেও তারা যায়। অর্থশাস্ত্র পড়ে মনে হয়, গ্রন্থকার আমোদ প্রমোদের জন্য সাধারণের পৃথক বারোয়ারি ঘর থাকা পছন্দ করতেন না, কারণ এ ব্যবস্থায় সংসার ও চাষের ক্ষেত হতে লোকের মন বিক্ষিপ্ত হত। আবার সাধারণের আমোদ প্রমোদের আয়োজনে সাহায্য না করলে শাস্তির ব্যবস্থাও আছে। রাজা বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে গোলাকৃতি নাটমন্দির তৈরি করিয়ে নাটক, মুষ্টিযুদ্ধ, মানুষ ও জন্তুর অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং কৌতূহলকর বিষয়ের চিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন।......প্রায়ই পর্বোপলক্ষে রাস্তা আলোকিত করা হত।'* এ ছাড়া রাজা মিছিল নিয়ে বের হতেন এবং মৃগয়ায় যেতেন।

এই বিশাল সাম্রাজ্যে অনেকগুলি জনাকীর্ণ নগর ছিল, রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল তাদের মধ্যে প্রধান। শোন নদী যেখানে গঙ্গায় মিশেছে সেখানে এই চমৎকার নগরটি গঙ্গার তীরে বিস্তৃত হয়ে গড়ে উঠেছিল। এখন এর নাম পাটনা। মেগাস্থিনিস এর বিবরণ দিয়েছেন, এই নদী (গঙ্গা) ও আর একটি নদীর সঙ্গমস্থলে পালিবোথ্রা নগর, দৈর্ঘ্যে ৮০ স্ট্যাডিয়া (৯·২ মাইল) এবং প্রস্থে ১৫ স্ট্যাডিয়া (১·৭ মাইল)। এই নগর আকৃতিতে একটি সমান্তর ক্ষেত্রের ন্যায়, কাঠের প্রাকারে পরিবেষ্টিত; আর এতে তীর ছোড়বার অনেক ছিদ্র করা আছে; এর সম্মুখভাগে একটা পরিখা, আত্ম-রক্ষার জন্য, আর শহরের ময়লা জল এসে পড়বে বলে। তা ছাড়া যে পরিখা এই শহর ঘিরে আছে তা ৬০০ ফুট প্রশস্ত, ৩০ ফুট গভীর; আর দেওয়ালে আছে ৫৭০টি উচ্চ বুরুজ এবং ৬০টি ফটক।

কেবল এই দেওয়ালটাই কাঠের ছিল তা নয়, অনেক বাড়িও কাঠে তৈরি হয়েছিল।

* ডক্টর এফ্· ডব্লিউ· টমাস : 'দি কেম্ব্রিজ হিসট্রি অফ ইন্ডিয়া' : ১ম খণ্ড, ৪৮০ পৃঃ।

মনে হয় এই অঞ্চলে প্রায়ই ভূমিকম্প হয় বলে বাড়িগুলি কাঠেরই হত। ১৯৩৪এ বিহারে ভীষণ ভূমিকম্প হওয়ায় একথাটা আবার মনে পড়েছে। কাঠের বাড়িতে আগুনের ভয় ছিল বলে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হত, নিয়ম ছিল যে প্রত্যেক বাড়িতে মই, আঁকশি ও জলপূর্ণ পাত্র থাকবে।

পাটলিপুত্রে অধিবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত মিউনিসিপ্যালিটির উপর শহরের ব্যবস্থার ভার ছিল। এতে ৩০ জন সভ্য ছয় ছয় জন করে পাঁচটি সমিতিতে গঠিত হয়ে শ্রমশিল্প ও অন্যান্য ছোটখাটো শিল্প, জন্ম ও মৃত্যু, পণ্যদ্রব্য উৎপাদন, সাধারণ যাত্রী ও তীর্থযাত্রী প্রভৃতির ব্যবস্থা করত। সমগ্র সমিতিটি অর্থ, স্বাস্থ্য, জল সরবরাহ, সাধারণের ব্যবহার্য গৃহ ও বাগান প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করত।

১৯ : বুদ্ধের উপদেশ

এই সকল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব যে সময়ে চলছিল সেই সময়ে এই সমস্তের অন্তরালে বৌদ্ধধর্মের উত্তেজনাও কাজ করছিল। তা থেকে এসেছিল পুরাতন ধর্মমতের উপর বৌদ্ধধর্মের সংঘাত, আর লোকসাধারণের ধর্মাচরণের সঙ্গে যাদের স্বার্থ বিজড়িত ছিল তাদের সঙ্গে বিরোধ। ভারত চিরদিন তর্কবিতর্কে আগ্রহ দেখিয়ে এসেছে; কিন্তু এখন এক প্রতিভাশালী পুরুষের দীপ্যমান জীবনের পরিচয় পেয়েছে। এই স্মৃতি এখনও সতেজ আছে; এর প্রভাব তর্কবিতর্ক হতে অনেকগুণ বেশি। যাঁরা সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বিষয়ে নিমগ্ন থাকেন তাঁদের কাছে বুদ্ধের বাণী পুরাতন; কিন্তু তবু নূতন এবং মৌলিক বলে অনুভূত হল, আর দেশের ধীমান ব্যক্তিদের চিত্ত তার দ্বারা আকৃষ্ট হল; এ ছাড়া সাধারণ লোকেরাও এই বাণীতে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হল। বুদ্ধ তাঁর শিষ্যবর্গকে বলেছিলেন, 'যাও সকল দেশে, এই সত্য প্রচার কর। বল সকলকে, দরিদ্র কি দুর্বল, ধনী কি শক্তিমান সকলেই এক, আর বহু নদী যেমন সাগরে মিলিত হয় তেমনি এই ধর্মে সকল জাতি মিলিত হয়ে এক হয়।' তাঁর বাণী বিশ্বজনীন করুণার বাণী, সর্বভূতে প্রেমের বাণী। 'এই জগতে ঘৃণার দ্বারা ঘৃণার শেষ হয় না, ঘৃণা দূর হয় প্রেমে।' 'দয়া দিয়ে ক্রোধ জয় কর, কল্যাণ দিয়ে অকল্যাণকে জয় কর।'

এ হল সততা ও আত্মসংযমের আদর্শ। 'কেউ যুদ্ধে হাজার লোককে পরাস্ত করতে পারে, কিন্তু সেই-ই জয়ী যে নিজেকে জয় করেছে।' 'জন্মে নয়, কিন্তু কর্মে ও ব্যবহারে নীচজাতীয় মানুষ ব্রাহ্মণ হয়।' একজন পাপীকেও নিন্দা করা উচিত নয়, কারণ 'কে ইচ্ছা করে যে ব্যক্তি পাপ কাজ করেছে তার বিরুদ্ধে কঠিন ভাষা ব্যবহার করবে; সে হবে তাদের দোষের ক্ষতের উপর নুন ছড়িয়ে দেওয়ার মত।' একজনের উপর অন্য একজনের জয়লাভে অসুখকর ফল উৎপন্ন হয়—'জয়লাভ থেকে ঘৃণার উৎপত্তি ঘটে, কারণ যে বিজিত সে অসুখী।'

এই সমস্ত তিনি প্রচার করেছিলেন, কিন্তু কোনো ধর্মের নামে নয়; এতে ঈশ্বরের

নামও নেওয়া হয়নি, অন্য কোনো জগতের কথাও বলা হয়নি। তিনি নির্ভর করেছেন যুক্তি, ন্যায় ও অভিজ্ঞতার উপর, আর সকলকে উপদেশ দিয়েছেন আপন আপন মনে সত্যের অনুসন্ধান করতে। শোনা যায় যে তিনি বলেছিলেন, 'আমার প্রতি শ্রদ্ধাবশত কেউ যেন আমার বিধান গ্রহণ না করে, যেন আমার কথা প্রথমে পরীক্ষা করে নেওয়া হয়, যেমন আগুনে সোনার পরীক্ষা হয়ে থাকে।' সত্য সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবই সকল দুঃখের কারণ। ঈশ্বর আছেন কিনা, কোনো পরম পুরুষ আছেন কিনা তিনি বলেন না—হ্যাঁ না কোনো মতই প্রকাশ করেন না। যেখানে কোনো বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নয় সেখানে মত প্রকাশ করা চলবে না। শোনা যায়, একটি প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ বলেছেন, 'যদি পরমপুরুষ বলতে আমাদের জ্ঞানগোচর সকল বস্তু কি বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধবিরহিত কিছুকে বোঝায় তাহলে তার অস্তিত্ব প্রমাণ করবার মত কোনো যুক্তি আমাদের জানা নেই। কোনো কিছু অন্য কিছুর সঙ্গে অসম্পর্কিত হয়েও যে আছে এ আমরা কেমন করে জানব? আমরা যতদূর জানি, সমগ্র বিশ্ব সম্বন্ধনিবদ্ধ-ভাবে আপেক্ষিকতার শৃংখলা: নিরপেক্ষ কোনো কিছুর কথা আমরা জানি না।' সুতরাং আমরা যা প্রত্যক্ষ করতে পারি, যার সম্বন্ধে আমরা সুস্পষ্ট জ্ঞান পেতে পারি তারই মধ্যে আমরা সীমাবদ্ধ।

এই প্রকারে, আত্মা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নের উত্তর বুদ্ধ স্পষ্টভাবে দেন না। তিনি আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকারও করেন না, স্বীকারও করেন না। এ বিষয়ের বিচারও তিনি করতে চান না। এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়, কারণ তাঁর সময়ে ভারতে মানুষের মন পৃথগাত্মা, পরমাত্মা, অদ্বৈতবাদ, একেশ্বরবাদ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক অনুমিতিতে পূর্ণ ছিল। তবু বুদ্ধ সকল প্রকার আধ্যাত্মিকতার বাইরে থাকতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু তিনি একটা প্রাকৃতিক নিয়মের—কার্যকারণের নিয়মের অক্ষয়ত্বে বিশ্বাস করতেন—পরবর্তী অবস্থা পূর্ববর্তী অবস্থার উপর নির্ভর করে, সাধুতা ও সুখ, পাপ ও দুঃখ পরস্পর আপেক্ষিকভাবে সম্বন্ধযুক্ত।

যে জগৎ সম্বন্ধে আমরা নানা অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তার বিষয়ে বলতে আমরা অনেক শব্দ ব্যবহার করি, বলি, 'এইটি' কি 'এইটি নয়'। কিন্তু যদি বিষয়ের বাইরের দিক ভেদ করে তার ভিতরে প্রবেশ করি তবে হয়তো দেখব এদুটি কথার কোনোটিই ঠিক নয়, যা ঘটছে আমাদের ভাষারই হয়তো তাকে প্রকাশ করার মত শক্তি নেই। যা সত্য হয়তো তা এই দুটির মাঝামাঝি কোথাও, বা এদের ছাড়িয়ে আছে। নদী বহে যাচ্ছে অবিচ্ছিন্ন গতিতে, আর মুহূর্তে মুহূর্তে তাকে একই বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু তার জল সর্বদাই বদলে যাচ্ছে। আগুনেও হচ্ছে তাই। অগ্নিশিখা দেখা যাচ্ছে, তার আকারের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না, কিন্তু শিখাটি তো সকল সময় এক নয়, তা প্রতি মুহূর্তেই বদলাচ্ছে। এইভাবে সবই ক্রমাগত বদলায়। জীবন তার সকলরূপে 'হওয়ার' একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা। বাস্তব সত্য অক্ষয় কি অপরিবর্তনশীল কিছু নয়; তা এক বিকিরণশীলা শক্তি, বল ও গতি হতে উদ্ভূত, অনুক্ষণ চলেছে পরম্পরাক্রমে তার পরিবর্তন। সময়ের ধারণা 'একটা ভাব যা নানা ঘটনার যোগে ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে

পাওয়া গেছে।' একটা বিষয় আর একটার কারণ এরূপ আমরা বলতে পারি না, কেননা এমন কোনো অবিনশ্বর সারবস্তু নেই যা পরিবর্তনশীল। কোনো বস্তুর সারাংশ তার অন্তরস্থ সেই বিধি যা তাকে অন্য বস্তুসকলের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে রেখেছে। আমাদের দেহ ও আত্মা প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে। তাদের শেষ আসে, আবার অন্য কিছু হয়, তাদেরই মত, তবু ভিন্ন-প্রকাশ পায়, আবার চলে যায়। একভাবে বলতে গেলে আমরা সকল সময়েই মরছি, এবং পুনরায় জন্মলাভ করছি, আর এই পরম্পরা থেকে অবিচ্ছিন্ন একত্বের ধারণা জন্মাচ্ছে। 'এটা সদাপরিবর্তনশীল একেরই অনুবর্তন।' সবই প্রবাহ, গতি, পরিবর্তন।

আমাদের মন চিন্তায় ও বাস্তব বিষয়ের ব্যাখ্যায় বাঁধা পথে অভ্যস্ত, সুতরাং এই সমস্ত আলোচনা সম্যকরূপে বুঝতে অক্ষম। তবু এটা লক্ষ্য করার বিষয়, আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানসম্ভূত প্রত্যয়ের কয়েকটির এবং বর্তমান দার্শনিক চিন্তার কত কাছে এনে দেয় বুদ্ধের এই তত্ত্ব।

বুদ্ধের কর্মপ্রণালী ছিল মনস্তত্ত্ব-অনুযায়ী বিশ্লেষণে প্রতিষ্ঠিত—মনঃসমীক্ষণ—আর এও এক আশ্চর্য বিষয় যে এই আধুনিকতম বিজ্ঞানে যে সকল তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে তাতেও তাঁর দৃষ্টি কত গভীর ছিল। কোনো নিরবচ্ছিন্ন সত্তার সঙ্গে সম্বন্ধ-বিশিষ্টভাবে মানব জীবনকে বিচার করা হয়নি, কারণ এরূপ সত্তা যদি থাকেও তা আমাদের জ্ঞানগম্য নয়। মনকে শরীরেরই একটি অংশরূপে দেখা হত, শরীরকে মানসিক শক্তিসকলের সমবায়ে সৃষ্ট বলে ধরা হত। তা হলে ব্যক্তি হল বহু মানসিক অবস্থার সমষ্টি, আর তার আত্মা ধারণাগুলির প্রবাহ। 'আমরা যা তা আমাদের চিন্তারই ফল।'

বৌদ্ধধর্মে জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণার আলোচনায় জোর দেওয়া হয়েছে, এবং ক্লেশ ও তার কারণ সম্বন্ধে উপদেশ, সেগুলিকে যে দূর করা যায়, আর সেই দূর করার উপায় সম্বন্ধে নির্দেশ আমরা বুদ্ধের কাছ হতে পেয়েছি। এই হল তাঁর 'চার মহাসত্য।' শোনা যায়, তাঁর শিষ্যবর্গকে উদ্দেশ করে তিনি বলেছিলেন, 'চারটি মহাসমুদ্রে যত জল আছে তার থেকেও বেশি জল পড়েছে অশ্রুরূপে তোমাদের চক্ষু থেকে, যখন যুগ যুগ ধরে এই শোকদুঃখ তোমরা ভোগ করেছ, জীবনের তীর্থযাত্রায় পথ ভুলে ঘুরে বেড়িয়েছ, ক্লেশ পেয়েছ, কেঁদেছ, যা পেয়েছ তা চাওনি, যা চেয়েছ তা পাওনি।'

এই দুঃখময় অবস্থার শেষে মেলে 'নির্বাণ'। নির্বাণ যে কি সে সম্বন্ধে সকলে একমত নন। আমাদের ভাষার দৌড় যথেষ্ট নয়, আর আমাদের সীমাবদ্ধ মনের প্রতীতিগুলি যে পরিভাষায় ব্যক্ত হয় তার সাহায্যে অতীন্দ্রিয় অবস্থার বিবরণ দেওয়া যায় না। কেউ কেউ বলেন নির্বাণ বিলুপ্ত হওয়া, একেবারে নিভে যাওয়ারই নাম। কিন্তু বুদ্ধ এর প্রতিবাদ করে বলেছেন, নির্বাণ নিবিড়ভাবে সক্রিয় অবস্থা। এ লোপ পাওয়া নয়, এ হল আমাদের মিথ্যা আকাঙ্ক্ষাগুলির পরিসমাপ্তি, কিন্তু আমরা নঞর্থক পদ ব্যবহার করা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে এর ব্যাখ্যান দিতে পারি না।

বুদ্ধের পথ মধ্যপথ—অতিরিক্ত অসংযম ও আত্মপীড়নের মাঝামাঝি। তিনি নিজের কৃচ্ছ্রসাধনের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছিলেন যে কোনো ব্যক্তি শক্তি হারালে যথার্থ পথে চলতে পারে না। এই মধ্যপথটি আর্যদের উপায়াষ্টক : যথার্থ বিশ্বাস, যথার্থ অভিলাষ, যথার্থ বাক্য, যথার্থ ব্যবহার, যথার্থ জীবিকা, যথার্থ চেষ্টা, যথার্থ মতি এবং যথার্থ আনন্দ। এ সমস্তই আত্মোন্নতির কথা, দয়ালাভের ব্যাপার নয়। মানুষ যদি এই পথে উন্নতি করতে পারে এবং নিজেকে জয় করতে পারে, কিছুতেই তার পরাজয় নেই—'কোনো ব্যক্তি নিজেকে দমন করে যে বিজয় লাভ করে কোনো দেবতাও তাকে পরাভবে পরিণত করতে পারে না।'

বুদ্ধ তাঁর শিষ্যবর্গকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, কতদূর অগ্রসর হতে পারে তাদের বোধ, আর জীবনে কি উন্নতি তারা লাভ করতে পারে। তাঁর উপদেশে সকল বিষয়েরই ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে, জগতের সকল রহস্য উদ্ঘাটিত হবে, এমন কথা তিনি বলেননি। শোনা যায়, একবার তিনি নিজের হাতে কতকগুলি শুকনো পাতা নিয়ে তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেগুলি ছাড়া আরও পাতা আছে কি না। আনন্দ উত্তর করেছিলেন, 'শরতের শুকনো পাতা চারিদিকেই স্খলিত হয়ে পড়ছে, তা গণনায় শেষ করা যায় না।' তখন বুদ্ধ বলেছিলেন, 'এমনি ধারা, আমি তোমাদের যে সত্য দিয়েছি তা মুষ্টিমেয়; এ ছাড়া সহস্র সহস্র আরও সত্য আছে, তার সংখ্যা করা যায় না।'

২০: বুদ্ধের গল্প

আমার বাল্যকালেই আমি বুদ্ধের গল্পে আকৃষ্ট হয়েছিলাম, আর আমার মন তরুণ সিদ্ধার্থের দিকে ছুটেছিল। এডুয়িন্ আরনল্ডের লেখা 'লাইট অফ এশিয়া' পুস্তকখানি আমার খুব প্রিয় ছিল। পরবর্তীকালে আমাদের নিজের প্রদেশে অনেক ঘুরে বেড়িয়েছি। তখন বুদ্ধের গল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব জায়গাগুলিই দেখেছি, আর কখনও কখনও আমার গন্তব্য পথ ছেড়ে একটু ঘুরে গিয়েও সেরূপ কোনো কোনো স্থান দেখে এসেছি। এই জায়গাগুলির অধিকাংশই আমাদেরই প্রদেশে কি তারই কাছাকাছি অবস্থিত। নেপালের সীমান্তে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ঘুরে বেড়িয়েছেন, বিহারের অন্তর্গত গয়ায় বোধিদ্রুমের ছায়ায় বসে, বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন, সারনাথে তাঁর প্রথম উপদেশ দান করেছেন, কুশীনগরে দেহ ত্যাগ করেছেন : আমি এসব জায়গায় গিয়েছি।

যে সকল দেশে বৌদ্ধধর্ম এখনও বলবৎ সেই সকল দেশে যখন গেছি, মন্দির ও মঠে গিয়ে ভিক্ষু ও অন্যদের সঙ্গে আলাপ করে এই ধর্ম থেকে লোকে কি পেয়েছে তা জানবার চেষ্টা করেছি। কিরূপ প্রভাব তাদের উপর বিস্তার করেছে এই ধর্ম, তাদের চিত্তে ও মুখমণ্ডলে কি চিহ্ন ফুটিয়ে তুলেছে, আধুনিক জীবনকে তারা কিভাবে গ্রহণ করেছে, এই সব জানতে চেয়েছি। অনেক কিছুই দেখেছি যা আমার কাছে ভাল বলে মনে হয়নি। যুক্তিপূর্ণ নৈতিক মতবাদ বুদ্ধের উপদেশ সত্ত্বেও বাগাড়ম্বরে

ঢাকা পড়েছে—বহু অনুষ্ঠান, বহু বিধি, আধ্যাত্মিক মত, এমনকি ইন্দ্রজাল দ্বারাও আচ্ছন্ন হয়েছে। বুদ্ধের সাবধানবাণী উপেক্ষা করে লোকে তাঁকে দেবতা করে নিয়েছে, তাঁর সুবৃহৎ প্রতিমূর্তিকে নানা মন্দিরে এবং অন্যত্রও আমার দিকে নিম্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি। তখন ভেবেছি, এসব দেখলে তিনি কি মনে করতেন। ভিক্ষুদের মধ্যে অনেককেই অজ্ঞ বলে মনে হয়েছে, তা ছাড়া তাদের দেখেছি অহমিকায় পূর্ণ, তারা প্রণাম চায়। ভিক্ষুর বেশ ধারণ করে তারা যেন পূজনীয় বলে পরিগণিত হতে চায়। সকল দেশেই দেশবাসীর জাতীয় বিশেষ লক্ষণগুলির প্রভাব ধর্মের উপরেও পড়েছে এবং তাকে সে দেশের রীতিনীতি অনুসারে গড়ে নিয়েছে।

তবে আমি এমনও অনেক কিছু দেখে এসেছি যা আমার ভাল লেগেছে। কোনো কোনো মঠ ও তৎসংলগ্ন বিদ্যালয়ে শান্তিতে পাঠ ও সাধনের অনুকূল অবস্থা লক্ষ্য করেছি। অনেক ভিক্ষুর মুখে শান্ত স্নিগ্ধভাব দেখেছি, তাতে মর্যাদাবোধ ও মাধুর্য লক্ষ্য করেছি, বৈরাগ্য ও সংসারচিন্তাবিরহিত নির্লিপ্ততাও প্রকাশ পেয়েছে। বর্তমান কালের জীবনের সঙ্গে এগুলি কি মিল খায়? এগুলি কি তা হলে জীবন থেকে অব্যাহতি নেওয়ারই লক্ষণ, আর এদের সঙ্গে মানুষের অবধিহীন জীবন-সংগ্রামের কি কোনো যোগই সম্ভব নয়? মানুষের মধ্যে যে ইতরতা, যে হিংসা ও লোভ দেখা যায়, এদের সাহায্যে তা কি একটুও কমান যায় না?

আমি যে ভাবে জীবনের ব্যাপারে অগ্রসর হতে চাই বৌদ্ধধর্মের দুঃখবাদের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই, জীবন ও তার সমস্যা থেকে সরে যাওয়াও আমার পথ নয়। এ বিষয়ে আমাকে অশিক্ষিত যুগের লোক বলা চলে। সে কালের লোকের মতই আমি জীবন ও প্রকৃতির উন্দামতার ভক্ত, এবং জীবনে যে সকল বিরোধের সম্মুখীন হতে হয় আমি সেগুলিতেও পরাঙ্মুখ নই। আমার অভিজ্ঞতা এবং আমার চারিদিকে অনেক কিছু যা দেখেছি তা ক্লেশকর, কিন্তু কিছুতেই আমার স্বভাব বদলায়নি।

বৌদ্ধধর্ম কি সত্যই নিশ্চেষ্টতার ও দুঃখবাদের ধর্ম? এর ব্যাখ্যাতারা তাই বলেন সত্য, এবং এতে বিশ্বাসী কোনো কোনো সাধক এমন অর্থই করেন। এর সূক্ষ্ম-দিকগুলি, এর জটিলতা ও আধ্যাত্মিক বিকাশ নিয়ে বিচার করার যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু আমি যখন বুদ্ধের কথা ভাবি তখন এরূপ ভাব আমার মনে আসে না। আমি ভাবতেই পারি না এ ধর্ম যদি নিষ্ক্রিয়তা ও দুঃখবাদেই প্রতিষ্ঠিত তবে কেমন করে অসংখ্য লোকের চিত্ত অধিকার করেছে, আর এঁদের মধ্যে অনেক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিও তো আছেন।

বুদ্ধসম্বন্ধে ধারণাটিকে বহু শ্রদ্ধাবান শিল্পী গভীর প্রেমের সঙ্গে রূপ দান করেছেন ক্ষোদিত প্রস্তরে, মর্মরে ও ব্রোঞ্জে। এগুলিকে ভারতীয় চিন্তার মর্মটির প্রতীক মনে করা যেতে পারে—অন্তত এর সারাংশের প্রতীক বলতেই হবে। মূর্তি-গুলিতে দেখি, বুদ্ধ পদ্মাসনে বসে আছেন শান্ত-উদাসীন, অনুরাগ ও আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে জগতের সকল সংগ্রাম ও ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে—এত দূরে যে আমাদের নাগালের বাইরে। তবু আমরা তাকিয়ে থাকি, আর দেখতে পাই মূর্তির স্থির রূপটির অন্তরালে

আমাদের অনুরাগ ও আবেগ অপেক্ষা বহুগুণ প্রবল অপূর্ব ভাবসমাবেশ। চক্ষু তাঁর মুদ্রিত, কিন্তু তবু মনে হয় তাঁর আত্মা তাকিয়ে আছে, এবং সমস্ত মূর্তিটি শক্তিমান হয়ে উঠেছে। তখন কালের ব্যবধান কেটে যায়, বুদ্ধকে আর তো দূর বলে মনে হয় না; তাঁর কথা অতি চুপিচুপি আসে আমাদের কানে; শুনি তিনি বলছেন, যেন সংগ্রাম ছেড়ে না পালাই, যেন শান্ত অচঞ্চল দৃষ্টিতে তার সম্মুখীন হই, আর জীবনকে যেন দেখি উন্নতি ও অগ্রগতির সহায়ক রূপে।

ব্যক্তিত্ব চিরদিন মর্যাদা পেয়ে এসেছে। যিনি মানুষের ভাবরাজ্যে এমন প্রভাব বিস্তার করেছেন যে আজও তাঁর চিন্তা প্রাণময়, তিনি বিস্ময়ের হেতু। বার্থ বলেছেন, 'তিনি ছিলেন শান্ত ও মধুরভাবের আধার, প্রাণীমাত্রেরই প্রতি অপার স্নেহ এবং ক্লিষ্টের প্রতি অনন্ত করুণা ছিল তাঁর অন্তরে, মনের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার এবং সকল প্রকার কুসংস্কার হতে মুক্তির আদর্শ ছিলেন তিনি।' আর যে মানব সমষ্টিতে, যে জাতিতে, এইরূপ একটি মহিমময় পুরুষ জন্মলাভ করেছেন মনীষা ও অন্তরস্থ শক্তির সঞ্চয় যে তার প্রচুর, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

২১ : অশোক

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য প্রতীচ্য জগতের সঙ্গে যে যোগস্থাপন করেছিলেন তাঁর পুত্র বিন্দুসারের রাজত্বকাল পর্যন্ত তা চলেছিল। মিশরের টলেমি এবং পশ্চিম-এশিয়ার সেলিউকস নিকেটরের পুত্র ও স্বত্বাধিকারী অ্যান্টিয়োকাসের কাছ থেকে পাটলিপুত্রের রাজসভায় রাষ্ট্রদূত এসেছিল। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক, এই সকল যোগ আরও অধিক স্থাপিত করেন। তাঁর সময়ে ভারতবর্ষ, বৌদ্ধধর্মের দ্রুত বিস্তৃতি-লাভের কারণে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

খৃস্টপূর্ব ২৭৩ অব্দের কাছাকাছি অশোক এই বিপুল সাম্রাজ্য লাভ করেন। এর পূর্বে তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে রাজ প্রতিনিধির কাজ করেছিলেন, আর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কেন্দ্র তক্ষশীলা তখন এই প্রদেশের রাজধানী ছিল। এইকালে সাম্রাজ্যটিতে ভারতবর্ষের অধিকাংশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, আর এর অধিকার ওদিকে মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করেছিল। ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ এবং দক্ষিণের কতকাংশ এর বাইরে ছিল। সমস্ত ভারতবর্ষকে এক সার্বভৌম শাসনের অন্তর্গত করার আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নের মত বহুদিন ধরেই ছিল। অশোক পরম উৎসাহে এই আকাঙ্ক্ষা পূরণে যত্নবান হলেন এবং অবিলম্বে পূর্ব-উপকূলে কলিঙ্গ জয় করার সঙ্কল্প করলেন। এই প্রদেশটি বর্তমান উড়িষ্যা ও অংশত অন্ধ্রপ্রদেশ নিয়ে তখন গঠিত ছিল। কলিঙ্গের অধিবাসীদের নিরতিশয় বাধাদান সত্ত্বেও অশোকের বাহিনী জয়লাভ করে। এই যুদ্ধে অতি ভয়াবহ হত্যা ঘটেছিল, এবং সে সংবাদ যখন অশোকের কাছে পৌঁছাল তিনি অনুশোচনায় পীড়িত হলেন এবং যুদ্ধের উপর তাঁর দারুণ ঘৃণার উদয় হল। ইতিহাসে বহু বিজয়ী রাজা এবং সেনানায়কের নাম শোনা যায়, কিন্তু

যখন জয়ের পর জয় স্রোতের মত আসছে তখন অশোকই সর্বপ্রথম যুদ্ধ-বিগ্রহ ত্যাগ করার সংকল্প করে জগতে এক অসামান্য নরপতির স্থান অধিকার করলেন। সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁর আধিপত্য স্বীকার করেছিল, কেবল সর্ব-দক্ষিণের ক্ষুদ্র অংশটি ছাড়া, আর এও তিনি ইচ্ছা করলেই নিতে পারতেন, কিন্তু আক্রমণ তিনি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করলেন। বুদ্ধের প্রচারিত সত্যের প্রভাবে তাঁর মন ফিরলো অন্যরূপ জয়ের দিকে, অন্যরূপ ক্ষেত্রে।

অশোক বহু নির্দেশ, বহু অনুশাসন প্রচারিত করেছিলেন, সেগুলি পাথরে ও ধাতুতে ক্ষোদিত হয়ে ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে। এগুলিতে যে কেবল তাঁর প্রজাদের মধ্যেই তাঁর বাণী প্রচারিত হয়েছিল তা নয়, উত্তরবর্তীয়েরাও তা এগুলি হতেই পেয়েছে। একটিতে আছে: 'সুপবিত্র এবং দয়ার্দ্রচিত্ত সম্রাট অভিষেকের আট বছর পরে কলিঙ্গ জয় করেন। এখান হতে দেড় লক্ষ বন্দী নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এক লক্ষ লোককে হত্যা করা হয়েছিল, আর এর বহুগুণ লোকের মৃত্যু ঘটে।

'কলিঙ্গ জয়ের অব্যবহিত পরে সম্রাট সাগ্রহ অনুরক্তির সঙ্গে পুণ্যধর্মের রক্ষণের ভার গ্রহণ করলেন· এই ধর্মে তাঁর প্রেম জাগ্রত হল, তিনি এই ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করলেন। এইভাবে কলিঙ্গ জয় করার জন্যে পবিত্রাত্মা মহারাজের অনুশোচনার উদয় হল, কারণ পূর্বে অজিত কোনো দেশকে জয় করতে হলে বহু হত্যা, মৃত্যু এবং বহু বন্দীকে অপসারিত করা আবশ্যক হয়। এ বিষয়টি সম্রাটের গভীর শোক এবং খেদের কারণ হল।'

এই অনুশাসনে আরও পাওয়া যায় যে সম্রাট অশোক বলেছেন হত্যা কি বন্দীগ্রহণ করা আর হতে দেবেন না, এমনকি কলিঙ্গে যা ঘটেছে তার শতাংশ কিংবা সহস্রাংশেও নয়। প্রকৃত জয় হল কর্তব্য ও ধর্মের বিধিতে মানুষের হৃদয়কে জয় করা, আর অশোক বলেছেন যে এরূপ প্রকৃত জয়লাভ তাঁর ঘটেছে, কেবল আপন রাজ্যে নয়, দূর রাজ্যেও। অনুশাসনে আরও আছে:

'পবিত্রাত্মা সম্রাটের প্রতিও যদি কেউ অন্যায় কি ক্ষতিকর কিছু করে তা যতদূর সহ্য করা যায় তা করা হবে। সম্রাট তাঁর রাজ্যের অরণ্যবাসীদের উপরেও কৃপার সঙ্গে দৃষ্টিপাত করেন এবং তাদের যথার্থভাবে চিন্তা করবার জন্য শিক্ষা দিতে প্রয়াস পান, কারণ যদি তিনি এরূপ না করেন তা হলে তাঁকে অনুতপ্ত হতে হবে। পুণ্যাত্মা সম্রাটের ইচ্ছা যেন সকল প্রাণী নিরাপদে, সংযতভাবে, শান্তিতে ও আনন্দে বসবাস করে।'

এই অনন্যসাধারণ সম্রাটের কথা স্মরণ করে সমগ্র ভারত তথা এশিয়াখণ্ডের নানা দেশের লোক আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের মাথা নত করে। বুদ্ধদেব প্রবর্তিত সত্যধর্ম ও মৈত্রীর সাধনা দেশময় তিনি প্রচার করে গেছেন, অক্লান্তভাবে চেষ্টা করেছেন প্রজা-সাধারণের মঙ্গল সাধনের জন্য। নিভৃতে ধ্যানধারণা করে, ঘটনাচক্র থেকে দূরে থেকে তিনি নিজের মুক্তির সন্ধান করতে যাননি। দেশের ও দশের সেবার কাজে তাঁর ক্লান্তি ছিল না, তিনি বলতেন: 'আহারে বিহারে শয়নে ধ্যানে রথে বা রাজোদ্যানে—যেখানেই

আমি অবস্থান করি না কেন, স্থানকালনির্বিশেষে রাজকর্মচারীরা রাজ্যের খবরাখবর সম্বন্ধে আমাকে অবহিত রাখবেন। সর্বকালে সর্বস্থানে আমি সর্বসাধারণের সেবার জন্য প্রস্তুত থাকব।'

সীরিয়া, মিশর, ম্যাসিডোনিয়া, সাইরীন, এপিরাস প্রভৃতি দেশে অশোক তাঁর দূত পাঠিয়েছিলেন। বুদ্ধের বাণী ও তাঁর অভিনন্দন বহন করে দেশবিদেশে দূতেরা গিয়েছিল—মধ্য এশিয়া, ব্রহ্মদেশ ও শ্যামদেশে। তাঁর নিজের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে পাঠিয়েছিলেন দক্ষিণে সিংহলদ্বীপে। তিনি ছিলেন ধর্মবিজয়ী—শক্তি দিয়ে জয় তিনি করতে চাননি, চেয়েছিলেন মন দিয়ে মন জয় করতে। নিজে যদিও তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি প্রগাঢ়ভাবে অনুরাগী ছিলেন তবু অন্যান্য ধর্মের প্রতি কখনও তিনি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেননি। তাঁর একটি শিলালিপিতে তিনি বলেছেন :

'প্রত্যেক ধর্মের একটি এমন বৈশিষ্ট্য আছে যা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। যথাস্থানে শ্রদ্ধা প্রকাশ করে মানুষ স্বীয় ধর্মের মহিমা কেবল প্রকাশ করে যে তা নয়, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেদেরও সেবা করার সুযোগ পায়।'

উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণের সুদূর সিংহল অবধি বুদ্ধের ধর্ম অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নেপাল থেকে তিব্বত ও তিব্বত থেকে চীন ও মঙ্গোলিয়াতেও এই ধর্ম প্রসারিত হয়। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের ফলে ভারতের লোক আমিষ-ভোজন ও মাদকদ্রব্য বর্জনের শিক্ষা পায়। তার পূর্বে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয় জাতির লোকই মাংসভক্ষণ ও মদ্যপান করত। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে প্রাণিহত্যা ও বলিদানপ্রথাও রহিত হয়।

ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বহির্জগতের সঙ্গে এই যোগাযোগের ফলে ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। মধ্য এশিয়ার সিংকিয়াং প্রদেশের খোটান্ নামক স্থানে একটি ভারতীয় উপনিবেশের উল্লেখ পাই প্রাচীন ইতিহাসে। ভারতের বিদ্যায়তনগুলিতে, বিশেষ করে তক্ষশীলায়, বহু বিদেশী ছাত্র আসত অধ্যয়ন করতে।

স্থপতিশিল্পের একজন খুব বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন অশোক। অনেকে অনুমান করেন যে তাঁর সময়কার অতিকায় অট্টালিকা ও স্তূপাদির নির্মাণকার্যে সাহায্য করার জন্য তিনি অনেক বিদেশী শিল্পী নিয়োগ করেছিলেন। কতকগুলি স্তম্ভের আকার ও নির্মাণকৌশল পার্সেপোলিস-এর স্থপতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই অনুমান যে কতটা সত্য তা ঠিক করে বলা যায় না, তবে এ কথা ঠিক যে এই সুপ্রাচীন কালের ধ্বংসাবশেষগুলিতেও আমাদের দেশের শিল্পকলার বিশিষ্ট রীতিপদ্ধতির পরিচয় দেখতে পাই।

প্রায় ত্রিশ বছর হল প্রত্নতত্ত্ববিদদের চেষ্টায় পাটলিপুত্রে অবস্থিত অশোকের রাজপ্রাসাদ আংশিকভাবে খুঁড়ে বের করা হয়েছে। এই প্রাসাদের বহুস্তম্ভশোভিত একটি কক্ষের কথা বলতে গিয়ে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ডক্টর স্পুনার তাঁর সরকারী রিপোর্টে বলেছেন: 'এই কক্ষটি এমন অবিকৃতভাবে রয়েছে যে দেখলে মনে হয় এই সেদিনমাত্র যেন স্তম্ভগুলি স্থাপিত হয়েছে; দু হাজার বছর আগেকার এই কাঠের

থামগুলি আজও তেমনি মসৃণ ও সুগঠিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।' আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন : 'স্তম্ভগুলি দেখলে বিস্ময় মানতে হয়; এত নিপুণ কাঠের কাজ, এমন চমৎকার জোড়মেলানো সচরাচর দেখা যায় না। এক একটি স্তম্ভ আশ্চর্য শিল্প-দক্ষতার পরিচয় দেয়—আজকের দিনের অতি দক্ষ দারুশিল্পীও এই কাজের কাছে হার মানতে বাধ্য হবে। এক কথায় বলতে গেলে কাঠের কাজের এ একটি অতুলনীয় অদ্বিতীয় নিদর্শন।'

পাটলিপুত্রের নিকটবর্তী স্থানে অন্যান্য যেসব অট্টালিকাদি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেখানেও দেখতে পাওয়া যায় কাঠের কড়িবরগা প্রভৃতি অতি সুন্দর অবিকৃত অবস্থায় রক্ষিত আছে। দু হাজার বছরের পুরাতন এরকম কাঠের কাজ পৃথিবীর খুব অল্প জায়গাতেই দেখা যায়। এদেশে তো এটা এক প্রকার অভাবনীয় ব্যাপার বললেই চলে। আবহাওয়া ও উই প্রভৃতি পোকার উপদ্রবে এখানে কোনো জিনিসই রক্ষা করা যায় না, কাঠ তো দূরের কথা। এই সব বিরুদ্ধতার প্রকোপ থেকে বাঁচবার কোনো একটা বিশেষ উপায় নিশ্চয়ই প্রাচীনকালে জানা ছিল, সে পদ্ধতিটি যে কি তা এখনও অজ্ঞাত থেকে গেছে।

পাটনা ও গয়ার মধ্যবর্তী জায়গায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ। এই নালন্দা এককালে বিশ্ববিদ্যাপীঠ হিসাবে সমস্ত জগতে সেরা স্থান অধিকার করেছিল। নালন্দা ঠিক কোন সময়ে স্থাপনা করা হয় সেসম্বন্ধে সঠিক জানা যায় না। অশোকের সমসাময়িক কোনো লেখায় এর উল্লেখ মেলে না।

দীর্ঘ একচল্লিশ বৎসর অক্লান্তভাবে রাজ্য চালনা করে খৃস্টজন্মের দুশোবত্রিশ বছর আগে অশোক দেহরক্ষা করেন। এইচ· জি· ওয়েল্‌স্‌ তাঁর লিখিত 'আউটলাইন্‌ অফ হিস্ট্রি' বইয়ে অশোক সম্বন্ধে লিখেছেন : 'বহুসহস্র রাজ-রাজন্যবর্গের নাম ইতি-হাসের পাতায় পরিকীর্ণ হয়ে আছে। সেই সমস্ত ছাপিয়ে একটি মাত্র নাম আপন মাহাত্ম্যের দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে আছে—সে নাম হল অশোকের। ধূসর আকাশে একটি তারার মত এই নামটি আজও যেন উজ্জ্বল হয়ে শোভা পাচ্ছে। ভলগা থেকে জাপান অবধি বহুদেশের লোক অশোকের নাম আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। ভারত তাঁর ধর্মনীতি পরিহার করেছে সত্য, কিন্তু চীন, তিব্বত ও ভারতবর্ষে তাঁর গৌরব আজ অবধি অক্ষুন্ন। কনস্টান্টাইন বা শার্লামেনের নাম শোনেননি এমন বহু লোক আজও অশোকের স্মৃতির প্রতি পূজা নিবেদন করে।'

যুগের যাত্রা

১ঃ গুপ্তসাম্রাজ্যে জাতীয়তাবোধ ও সাম্রাজ্যবাদ

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর সুঙ্গবংশীয় রাজারা প্রাধান্য লাভ করে। তাদের সাম্রাজ্য এত বিস্তৃত ছিল না। এই সময়ে দক্ষিণ-ভারতের কয়েকটি বড় বড় দেশ মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়িয়েছে, উত্তর-ভারতে রাষ্ট্রিয় অর্থাৎ ভারতীয় গ্রীকেরা কাবুল থেকে পাঞ্জাব অবধি এগিয়ে এসেছে। মেনান্দরের নেতৃত্বে তারা পাটলিপুত্র পর্যন্ত হানা দেয়—যুদ্ধে তারা অবশ্য পরাস্ত হয়ে হটে যায়। ভারতের আবহাওয়ায় এসে মেনান্দর বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী কালে রাজা মিলিন্দ নামে বিখ্যাত হন। বৌদ্ধদের পুরাকাহিনীগুলিতে প্রায়ই মিলিন্দের উল্লেখ মেলে, পড়ে মনে হয় তাঁকে লোকে সপ্তপদবাচ্য বলে মনে করত। আফগানিস্থান ও সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্বর্ত্তী যে গান্ধর্ব স্থপতির নিদর্শন দেখা যায় তার উদ্ভব হয়েছিল গ্রীক ও ভারতীয় সংস্কৃতির সম্মেলনের ফলে।

মধ্য-ভারতে সাঁচির কাছে বেশনগর বলে একটি জায়গায় একটি গ্র্যানাইট স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে খৃস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে। এই স্তম্ভের নাম হেলিয়োডোরাস স্তম্ভ—এর গায়ে সংস্কৃত হরফে একটি লিপি উৎকীর্ণ আছে। সীমান্তবর্তী গ্রীকেরা কিভাবে ধীরে ধীরে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়—এই স্তম্ভটি তারই নিদর্শন। সংস্কৃত লিপিটি এভাবে অনুবাদ করা হয়েছে: 'দেবাদিদেব বাসুদেবের (বিষ্ণুর) বাহন এই গরুড়স্তম্ভ নির্মাণ করেন বিষ্ণু উপাসক হেলিয়োডোরাস। ডিয়নের পুত্র তক্ষশীলা-নিবাসী এই হেলিয়োডোরাস মহারাজ অ্যান্টিআলসিডাসের দূত হয়ে এসেছিলেন প্রজাপুঞ্জের ত্রাণকর্তা মহারাজা কাশীপুত্র ভগভদ্রের রাজত্বের একাদশ বর্ষে।

'নিষ্ঠাসহকারে সংযম, নিঃস্বার্থপরতা ও ন্যায়নিষ্ঠার শাশ্বত নিয়মত্রয় পালন করলে স্বর্গলাভ হয়।'

মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ অক্সাস্ মালভূমি ছিল শক অর্থাৎ সীথিয়ানদের (সীস্তান=শকস্তান) অধীন। অক্সাসের পূর্বভাগ থেকে ইউয়েচি নামে একটি জাতি শকদের সীস্তান থেকে হটিয়ে দেয়, পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত শকেরা উত্তর-ভারতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই শকেরা বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হয়। ইউয়েচি জাতির কুশাণবংশ পরাক্রান্ত হয়ে ক্রমে ক্রমে উত্তর-ভারত অবধি তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। কুশাণেরা শকদের পরাজিত করে দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য ও কাথিয়াওয়াড় অবধি হটিয়ে দেয়। অতঃপর সমগ্র উত্তর-ভারত ও মধ্য এশিয়ার অনেকখানি অংশের উপর কুশাণেরা বহুদিন অবধি নির্বিবাদে রাজত্ব করে। কেউ কেউ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে, কিন্তু কুশাণেরা

বেশির ভাগ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। বৌদ্ধ-উপাখ্যানে কণিষ্করাজার কীর্তি-কলাপ ও প্রজাসাধারণের উপকারার্থ তাঁর নানারূপ প্রচেষ্টার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই কণিষ্ক ছিলেন কুশাণবংশের সবচেয়ে বড় রাজা। রাজা কণিষ্ক নিজে যদিও বৌদ্ধ ছিলেন তাঁর রাজত্বে দেখতে পাই অনেকগুলি ধর্মবিশ্বাসের, এমনকি জরথুস্ত্র প্রবর্তিত অগ্নি-উপাসনারও—সমন্বয় ঘটেছিল। ভারতের সীমান্তবর্তী এই কুশাণ সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল পেশোয়ারের কাছে, পেশোয়ারের নিকটবর্তী তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা জাতির নানা ধর্মের লোক আসত বিদ্যার্জনের উদ্দেশ্যে। ভারতের লোক এই তক্ষশীলায় সীথিয়ান, ইউয়েচি, ইরানীয়, বাক্‌ট্রিয় গ্রীক, তুরানীয় ও চৈনিক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংস্পর্শে আসত। এইভাবে পরস্পরের সংস্কৃতি পরস্পর কর্তৃক প্রভাবিত হয়। এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফলে একটি বিশিষ্ট স্থাপত্য ও শিল্পরীতির উদ্ভব হয়। ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখতে গেলে এই প্রথম ভারতের সঙ্গে চীনের যোগাযোগ—খৃস্টজন্মের চৌষট্টি বৎসর পরে ভারতে চীনদেশের একটি রাজদূতাবাস স্থাপিত হয়। এই সময়ে চীনদেশের কয়েকটি ফলের গাছ এদেশে আমদানী হয়। গোবী মরুভূমির সীমান্তে তুরফান ও কুচা প্রদেশে, ভারতীয়, চৈনিক ও পারসীক সংস্কৃতির একটি চমৎকার সমন্বয় ঘটে।

কুশাণবংশের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের দুইটি মতবাদের মধ্যে বিভেদ ঘটে। এই দুই মতবাদের নাম মহাযান ও হীনযান। ভারতের চিরাচরিত রীতি অনুসারে এই বিরোধ নিরসনের জন্য একটি বিরাট সভা আহূত হয়। কুশাণসাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কাশ্মীরে এই সভা বসে, দেশ বিদেশ থেকে দলে দলে প্রতিনিধিরা এসে এই বিতর্কে যোগ দেন। এঁদের মধ্যে যাঁর নাম সর্বাগ্রে মনে হয় তিনি হলেন নাগার্জুন। খৃস্টীয় পাঁচ শতকে এঁর জন্ম। বৌদ্ধশাস্ত্রে ও ভারতীয় দর্শনে প্রগাঢ় পান্ডিত্য ছিল নাগার্জুনের, তাঁর ব্যক্তিত্বও ছিল অসাধারণ। এই নাগার্জুনের জন্যই ভারতে মহাযানের জয় হয়। চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের মহাযান মতবাদই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এক কেবল সিংহল ও ব্রহ্মদেশে হীনযান আজও অবধি টিকে আছে।

কুশাণেরা কেবল যে ভারতের আচারব্যবহার রীতিনীতি স্বীকার করে নেয় তা নয়, তারা ভারতের সংস্কৃতির রক্ষণপোষণেও বিশেষ উৎসাহী ছিল। তা সত্ত্বেও এ দেশীয় লোকেদের মনে এই বিদেশী শাসনের প্রতি ভিতরে ভিতরে একটা বিরুদ্ধতা জমে উঠেছিল। পরবর্তীকালে যখন বিদেশীরা দলে দলে এসে ভারতের মধ্যে ঢুকে পড়ে, সেই সময় অর্থাৎ খৃস্টপরবর্তী চতুর্থ শতকে বিদেশীদের বিরুদ্ধে একটি দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়—ভারতে এইভাবে জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত হয়। আর একজন চন্দ্রগুপ্ত—মৌর্য চন্দ্রগুপ্তেরই মত পরাক্রমশালী একজন নৃপতি—এই সব বিদেশী অভিযানকারীদের হটিয়ে দিয়ে একটি বিরাট ও শক্তিসম্পন্ন সাম্রাজ্য গঠন করেন।

এইভাবে ৩২০ খৃস্টাব্দে গুপ্তবংশের রাজত্বকাল শুরু হয়। এই বংশে পর পর কয়েকজন বড় রাজা জন্মগ্রহণ করেন, এঁরা যুদ্ধ-বিগ্রহে কেবল যে বড় ছিলেন তা

নয়, বিশৃঙ্খলা দূর করে রাজ্যে শান্তি স্থাপন করতেও এ'রা ছিলেন অদ্বিতীয়। ক্রমাগত বিদেশী-আক্রমণের ফলে বিজাতীয়বিদ্বেষ ভারতীয়দের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়, সমাজের যাঁরা শীর্ষস্বরূপ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষাত্রিয় প্রভৃতি উচ্চতর বর্ণের লোকেরা দেশরক্ষা তথা দেশের আচার-ব্যবহার সংস্কার রক্ষার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন। ইতি-পূর্বে ভারতীয় সংস্কৃতি বিদেশের যে দান আত্মসাৎ করে নিয়েছিল তা অবশ্য অস্বীকৃত হয়নি। কিন্তু নবাগত মানুষের সঙ্গে সঙ্গে নবাগত চিন্তাধারার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরাট প্রাচীর গে'থে তোলা হল। দেশকে সনাতন আদর্শের ছাঁচে গড়ে তোলার একটি সুদৃঢ় সংকল্প দেখা দিল। বাইরের সংঘাতের প্রতি এই যে বিরুদ্ধতা —এর মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ছিল, ফলে ভারতীয় মনোবৃত্তিতে এমন একটা গোঁড়ামি দেখা দিল যা তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ভারত শম্বুকবৃত্তি অবলম্বন করে তার শরীর মন সমস্ত যেন নিজের আবরণের মধ্যে গুটিয়ে আনে।

এই চিত্তের সঙ্কীর্ণতাকে বড় করে দেখলে ভুল করা হবে। আর্যরা যখন আর্যাবর্ত বা ভারতবর্ষে প্রথম তাঁদের উপনিবেশ স্থাপন করেন, তখন ঠিক এই ধরনের একটি সমস্যার মুখোমুখী দাঁড়াতে হয়েছিল এদেশের লোকদের। তখনও প্রশ্ন জেগেছিল আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে নবাগতদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার সমন্বয় ঘটান যায় কি করে। ভারত বিপুল অধ্যবসায়ের সঙ্গে এই প্রশ্নের একটি চিরস্থায়ী মীমাংসার জন্য চেষ্টা করেছিল—সেই চেষ্টার ফলে আর্য-ভারতীয় সভ্যতার উদ্ভব। বহির্জগৎ থেকে আরও অনেক উপকরণ এসেছে যা এই দেশের বিরাট সত্তার মধ্যে একদেহে লীন হয়ে গেছে, কোনো বিরোধের সৃষ্টি করেনি। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে যদিচ ভারতের সঙ্গে অন্য অনেক দেশের যোগাযোগ হয়েছে, তবু ভারত তার আপন সত্তা কখনও হারিয়ে ফেলেনি, সে যেন নিজেই নিজের মধ্যে ডুবে ছিল বাইরের ঘটনায় তার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেনি। কিন্তু তার এই আত্মসমাহিত ভাব বেশিদিন টিকল না, ঘন ঘন বিদেশী আক্রমণ ও বিজাতীয় আচার-ব্যবহারের সংঘাতে ভারত যেন উচ্চকিত হয়ে উঠল। এ যেন একটা ভূমিকম্পের মতন এবং এই দুর্যোগের ফলে কেবল রাষ্ট্র-ব্যবস্থা নয় ভারতের সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতিও যেন বিপর্যস্ত হয়ে উঠল। সুতরাং প্রতিক্রিয়া যেটা হল সেটা হল রাষ্ট্রিক প্রতিক্রিয়া। এই ধরনের বিরুদ্ধতার শক্তি ও দুর্বলতা একই সঙ্গে এই প্রতিক্রিয়ার মধ্যে প্রকাশ পেল। এই জাতীয়তাবোধ ভারতের ধর্মে, দর্শনে, ইতিহাসে, সংস্কারে, আচারে, সমাজব্যবস্থায়—এক কথায় ভারতীয়দের জীবনের সকল ক্ষেত্রে—প্রকট হয়ে উঠল। এই জাতীয়তাবোধই ব্রাহ্মণ্যধর্ম অর্থাৎ পরবর্তীকালের হিন্দুধর্মের প্রতীকস্বরূপ। জাতির ও জাতীয় সংস্কৃতির যা কিছু জাতির জীবনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়, যাকে বলা চলে জাতীয়তাবোধের মূল ভিত্তি —তারই উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই ধর্ম। ভারতীয় চিন্তাধারাপ্রসূত বৌদ্ধধর্মেও এই জাতীয়তাবোধের ভিত্তি দেখতে পাই। বুদ্ধ যে-ভারতে জন্মেছেন, যে-ভারতে তাঁর পবিত্র ধর্ম প্রচার করেছেন, যে-ভারতের মাটিতে তাঁর দেহরক্ষা করেছেন, সে দেশ সমগ্র বৌদ্ধসমাজের তীর্থক্ষেত্র। বুদ্ধের নির্বাণপ্রাপ্তির পর এই তীর্থভূমিতেই

তাঁর অনুগামী সাধুসন্তেরা বৌদ্ধধর্ম প্রচার করে গেছেন—সুতরাং সকল দেশের বৌদ্ধদের কাছে ভারত তার আপন মহিমায় মহিমান্বিত। কিন্তু মূলত বৌদ্ধধর্ম সর্বকালের সর্বদেশের ও সর্বজাতির ধর্ম, বিদেশে এই ধর্মের প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের আন্তর্জাতিক রূপ ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। এই জন্যই দেখি যে জাতীয় জাগরণের বাহন হয়েছে যুগে যুগে, কালে কালে এই ব্রাহ্মণ্যধর্ম—বৌদ্ধধর্ম নয়।

ভারতের বিভিন্ন ধর্মমত ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রতি এই ব্রাহ্মণ্যধর্মের কোনো বিরুদ্ধতা ছিল না। ব্রাহ্মণ্যধর্মের সুবিস্তৃত পরিসরের মধ্যে এই সমস্ত জাতি ও ধর্মের স্থান ছিল। বস্তুত এই সকল প্রকার বিভেদের সমন্বয় সাধনই হল হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য। ভারতের সত্যকার বিরুদ্ধতা ছিল বহির্ভারতীয় ধর্ম ও জাতিদের প্রতি—তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ভারত বাইরের এই সংঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। এই প্রতিরোধের সব চাইতে বড় অস্ত্র ছিল জাতীয়তাবোধ। শক্তিশালী সম্রাটের হাতে পড়ে এই উগ্র জাতীয়তার অস্ত্র অনেক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্য বিস্তারের সহায়ক হয়—গুপ্তসাম্রাজ্যের বেলাও ঠিক তাই হয়েছিল। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বলিষ্ঠ মনন-শীলতায়, সংস্কৃতির গৌরবে ও রাজশক্তিতে গুপ্ত যুগে ভারত এত উৎকর্ষ লাভ করে যে এই উন্নতিই এক সময়ে ভারতকে সাম্রাজ্যবাদের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। গুপ্ত-বংশের অন্যতম সম্রাট সমুদ্রগুপ্তকে বলা হয় ভারতের নেপোলিয়ন। কেবল রাজ-শক্তিতে নয় সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টির দিক থেকেও গুপ্তযুগ ভারতের স্বর্ণযুগ।

খৃস্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথম দিক থেকে আরম্ভ করে দীর্ঘ একশো পঞ্চাশ বৎসর কাল, উত্তর-ভারতের এই প্রবল প্রতাপান্বিত মহৈশ্বর্যশালী সাম্রাজ্যের উপর গুপ্ত-বংশীয়েরা প্রভুত্ব করেন। তাঁদের বংশধরেরা আরও দেড়শো বছর রাজত্ব করেছিলেন সত্য কিন্তু তাঁরা তাঁদের পূর্বগৌরব অক্ষুণ্ন রাখতে পারেননি, প্রভুত্ব করার চাইতে আত্মরক্ষার দিকেই তাঁদের লক্ষ্য ছিল বেশি। ফলে তাঁদের অধীনে গুপ্তসাম্রাজ্য ক্রমেই সঙ্কীর্ণতর হতে থাকে। মধ্য এশিয়া থেকে দলে দলে নূতন অভিযানকারী বিদেশীর দল স্রোতের মত ভারতে ঢুকে পড়ল ও গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ করল। এই বিদেশীরা হূন নামে খ্যাত; এদেরই একটি দল আট্টিলা নামক দলপতির নেতৃত্বে ইউরোপ ছারখার করে দিয়েছিল। এদের বর্বরোচিত ব্যবস্থার ও পাশবিক অত্যাচারের কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য ভারতের সকল রাজা একত্র মিলিত হয়ে হূনদের আক্রমণ করেন। এই প্রতিরোধের নায়ক ছিলেন যশোবর্মন। হূনেরা এবার পরাজিত ও বিধ্বস্ত হল, তাদের দলপতি মিহিরকুল ভারতীয়দের হাতে বন্দী হল। পরাজিত শত্রুর প্রতি দয়া প্রদর্শন ভারতের চিরাচরিত রীতি, সেই রাজধর্ম অনুসরণ করে গুপ্তবংশীয় রাজা বলাদিত্য মিহিরকুলের প্রাণভিক্ষা তো দিলেনই উপরন্তু—ঔদার্য দেখাতে গিয়ে তাকে ভারত ছেড়ে স্বদেশে যাবার অনুমতি দান করলেন। এই উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ বিশ্বাসঘাতক মিহিরকুল কিছুকাল পরে ভারতে ফিরে এসে বলাদিত্যের রাজ্য আক্রমণ করে ও গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংস করে।

হূনেরা উত্তর-ভারতে বেশিদিন রাজ্য চালাতে পারেনি। তাদের রাজত্বকাল অর্ধ

শতাব্দীরও কম হবে। রাজ্য-হিসাবে অনেক হূন দলপতি কিন্তু এদেশে স্থায়ীভাবে থেকে যান। ভারতের মহামানব সমুদ্রে মিশে যাবার আগে পর্যন্ত এই ক্ষুদে রাজা-রাজড়ারা প্রায়ই বিবাদ বিসম্বাদ ঘটাতেন। খৃস্টীয় সপ্তম শতকে এ'রা একজোট হয়ে আর একবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের সেই প্রয়াস ব্যর্থ করেছিলেন কনৌজের রাজা হর্ষবর্ধন। কালক্রমে হর্ষবর্ধন উত্তর ও মধ্য-ভারতের একচ্ছত্র প্রভু হয়েছিলেন। ইনি নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু মহাযান-মতাবলম্বী ছিলেন বলে হিন্দুধর্মের প্রতি হর্ষের শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। ইনি বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম—উভয় ধর্মেরই পোষকতা করতেন। হর্ষবর্ধনেরই রাজত্বকালে ৬২৯ খৃস্টাব্দে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়ান্‌ৎসাঙ এদেশে আসেন। শ্রীহর্ষ নিজে নাট্যকার ও কবি ছিলেন—অনেক বড় বড় লেখক ও শিল্পী এ'র সভা অলংকৃত করতেন। হর্ষের রাজধানী উজ্জয়িনী এককালে ভারতীয় সংস্কৃতির তীর্থক্ষেত্র ছিল। খৃস্টীয় ৬৪৮ অব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয়। ঠিক সেই সময়ে আরবের ঊষর মরুভূমিতে ইসলামের অভ্যুদয় হচ্ছে—পরবর্তীকালে এই ইসলাম ধর্ম, ত্বরিদ্বেগে আফ্রিকা ও এশিয়ার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

২ : দক্ষিণ-ভারত

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর হাজার বছরের মধ্যে দক্ষিণ-ভারতে অনেক বড় বড় রাজ্য গড়ে ওঠে। অন্ধ্রেরা শকদের হারিয়ে দিয়ে কণিষ্কের সমসাময়িক দক্ষিণ-ভারতের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। তারপর এল দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের চালুক্যদের সাম্রাজ্য, চালুক্যদের পরে এল রাষ্ট্রকুটবংশ। আরও দক্ষিণে ছিল পহ্লববংশ—এদের সময়ে সমুদ্রপথে কয়েকটি ঔপনিবেশিক অভিযান শুরু হয়। সর্বশেষে আসে চোলসাম্রাজ্য—সমগ্র দাক্ষিণাত্য উপত্যকা—তথা সিংহল ও দক্ষিণ-ব্রহ্মের উপর চোলরাজ্য বিস্তার লাভ করে। চোলবংশের শেষ রাজচক্রবর্তী সম্রাট রাজেন্দ্রের মৃত্যু হয় ১০৪৪ খৃস্টাব্দে।

সূক্ষ্ম শিল্পজাত দ্রব্যাদি ও সমুদ্রপথে বাণিজ্যের জন্য দক্ষিণ-ভারত বিখ্যাত ছিল। বস্তুতপক্ষে নৌ-শক্তির উপরই ছিল চোলরাজ্যের প্রতিষ্ঠা—চোলদের বাণিজ্যপোত দূর-দূরান্তরে নানাপ্রকার বাণিজ্যসম্ভার বহন করে নিয়ে যেত। সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে বোঝা যায় তখনকার কালে দক্ষিণ-ভারতে কয়েকটি গ্রীক উপনিবেশ ছিল, কোনো কোনো জায়গায় রোমান মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয়েছে। চালক্যরাজ্যের সঙ্গে পারস্যের সাসানিদ রাজাদের রাজদূত বিনিময়ও ঘটেছিল।

উত্তর-ভারতে পর পর যে-কয়টি বৈদেশিক অভিযান হয় তা প্রত্যক্ষভাবে দক্ষিণ-ভারতের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তবে একটা ব্যাপার যা ঘটেছিল তা হল এই যে উত্তর-ভারত থেকে অনেকে দক্ষিণ-ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেয়—এদের মধ্যে অনেকে ছিল স্থপতি ও শিল্পী। ফলে এই দাঁড়িয়েছিল যে শেষপর্যন্ত দক্ষিণ-ভারতই আর্যাবর্তের পুরাতন শিল্পরীতির কেন্দ্র হয়, উত্তর-ভারতে এই প্রাচীন

রীতি অভিযানকারী বিদেশীদের আনীত নূতন পদ্ধতির সঙ্গে মিশ্রিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে এর পরিণতিস্বরূপ দেখতে পাই যে দক্ষিণ-ভারতই শেষ পর্যন্ত সনাতন হিন্দুত্বের আশ্রয়স্বরূপ হয়ে ওঠে।

৩ : রাজ্যশাসনে সুব্যবস্থা ও যুদ্ধকৌশল

পর পর বহিঃশত্রুর আক্রমণ এবং ভিন্ন ভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পড়ে ভারতবর্ষের তদানীন্তন অবস্থা সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মাতে পারে। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে স্বল্পসংখ্যক পাতার মধ্যে আমরা প্রায় হাজার বৎসরেরও বেশি সময়কার ইতিহাস পর্যালোচনা করেছি। এই দীর্ঘকালের মধ্যে এমন অনেক সময় গেছে যখন শান্তি ও শৃংখলার সঙ্গে দেশ শাসিত হয়েছে। উত্তরাখণ্ডে মৌর্য, কুশাণ ও গুপ্তবংশীয় রাজারা এবং দক্ষিণাপথে অন্ধ্র, চালুক্য, রাষ্ট্রকুট প্রভৃতি রাজবংশ একটানা দু-তিনশো বৎসরেরও বেশি তাঁদের নিজ নিজ রাজত্ব শাসন করেছিলেন। এদেশে ব্রিটিশশাসনের মেয়াদ এখনও পর্যন্ত দু-তিনশত বৎসরের কোঠায় গিয়ে পেঁাছতে পারেনি। এই বিভিন্ন বংশের রাজা-রাজড়ারা প্রায় সকলেই ছিলেন এদেশবাসী। উত্তরসীমান্ত থেকে যাঁরা ভারতে এসে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—তাঁরাও কুশাণবংশীয়দের মত এদেশের আচার-ব্যবহার, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিলেন। বিদেশী গাছ যেন এদেশের মাটিতে শিকড় গজিয়ে, এখানকার জল হাওয়ার সঙ্গে আত্মীয়তা স্বীকার করে বড় হয়ে উঠেছিল। তাঁরা এদেশীয় রাজার মত এদেশ শাসন করতেন। সীমান্তবর্তী দেশগুলির মধ্যে এবং প্রতিবাসী রাজ্যগুলির মধ্যে বাদবিসম্বাদ যে একেবারে ঘটত না এমন নয়। কিন্তু মোটামুটি দেশের শাসনব্যবস্থা বেশ শান্তিপূর্ণই ছিল। দেশশাসকেরা শিল্প ও সংস্কৃতির পরিপোষণ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন ও গৌরব অনুভব করতেন। দেশময় শিল্প ও সংস্কৃতির, সাহিত্য ও অন্যান্য কলার রূপ ও প্রকাশ প্রায় একই রকম ছিল। সেখানে কোনো সীমান্তভেদ ছিল না। ধর্ম কিংবা দর্শনের মতবাদ সম্বন্ধে বাদবিতণ্ডা প্রায় একই সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের সমস্ত দেশে আলোড়ন তুলত।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ চলত, রাজ্যের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক নানা গোলোযোগ ঘটত সত্য, কিন্তু সাধারণ চাষাভুষো, গৃহস্থঘরের লোকেদের দৈনন্দিন জীবনে এজন্য কোনো বিপর্যয় দেখা দিত না। যুযুধান রাজা এবং স্বায়ত্তশাসিত গ্রামের মণ্ডলেরা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ঝগড়াবিবাদ করার পূর্বে অঙ্গীকারপত্র লিখে দিতেন যে শস্যের ক্ষতি তাঁরা করবেন না এবং করলে ক্ষতিপূরণ করতে বাধ্য থাকবেন। এই ধরনের নজীর প্রাচীন ইতিবৃত্তে পাওয়া গেছে। বহিঃশত্রুর আক্রমণের বেলা কিংবা সত্য সত্য ক্ষমতা হস্তগত করার জন্য যুদ্ধের সময় এরকম নিয়মের অন্যথা হত, সেকথা বলাই বাহুল্য। আর্য-ভারতীয় শাস্ত্রের মত ছিল যে যুদ্ধ হবে ন্যায় যুদ্ধ, অন্যায়ের সাহায্যে যুদ্ধ করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ছিল। এরূপ নীতির সঙ্গে কাজের সমন্বয় কতখানি হত তা অনুমান

করা শক্ত। তবে যুদ্ধশাস্ত্রে এবং প্রাচীনকালের পুরাণ ইতিহাসে দেখি যে বিষাক্ত তীর এবং গুপ্তঅস্ত্রের ব্যবস্থা নিষিদ্ধ ছিল; নিদ্রিত, পরাজিত কিংবা শরণাগত শত্রুর প্রাণনাশ করা নীতিগর্হিত বলে নিন্দিত হত। রম্য অট্টালিকাদি ধ্বংস করা সম্বন্ধেও নিষেধ ছিল। পরে এই মনোবৃত্তির পরিবর্তন ঘটে; চাণক্যের সময়েই দেখি যে ছলে-বলেকৌশলে শত্রুনিপাত করা যুদ্ধের অন্যতম রীতি বলে স্বীকৃত হয়েছে। শত্রুকে পরাজিত করার জন্য যদি প্রবঞ্চনার দরকার হয়, যদি তার রাজ্য ছারখার করতে হয়—তবে তাও করা উচিত চাণক্যই প্রথম এরূপ কথা বলেন।

চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে এমন কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্রাদির উল্লেখ আছে যার কথা ভাবতে আজ বিস্ময় মনে হয়। যুদ্ধকৌশল সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি একটি যন্ত্রের কথা বলেছেন যা একশত লোককে একই সঙ্গে ঘায়েল করতে পারত, বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরকের কথাও তাঁর বইয়ে লেখা আছে। পরিখাখনন করে যুদ্ধ করার রীতিও ছিল সেকালে। চাণক্যের উল্লেখের যথার্থ তাৎপর্য যে কি তা আজকের দিনে নিশ্চিত বলা দুরূহ। তৎকালে প্রচলিত ইন্দ্রজাল বিদ্যার উল্লেখই বোধ করি চাণক্য করেছেন। বারুদের ব্যবহার সেকালে যে ছিল না—সেকথা বলাই বাহুল্য।

ভারতের দীর্ঘকালব্যাপী ইতিহাসে দুর্গতির অধ্যায় অনেক গেছে—অগ্নিকান্ড, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও দুর্ভিক্ষ এসে কতবার দেশকে দেশ বিধ্বস্ত করে দিয়েছে, বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু মোটামুটি ভাবে দেখতে গেলে মনে হয় ইউরোপের তুলনায় ভারতের অবস্থা অনেক পরিমাণে শান্তিপূর্ণ ছিল—তুলনা করতে গেলে বলা যায় যে এদেশের লোকেরা অতীতে দীর্ঘকাল ধরে সুখ ও শান্তি উপভোগ করেছে। কেবল অতীতে নয়, তুর্কি ও আফগান আক্রমণের পরেও বহু শতাব্দী ধরে একেবারে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত—ভারতের অবস্থা মোটামুটি বেশ শান্তিপূর্ণ ছিল। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী শান্তির দেবী ভারতে এসে সর্বপ্রথম শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করলেন—এ ধরনের মিথ্যা প্রচার আর কিছু হতে পারে না। একথা সত্য যে ভারতে ইংরেজরাজ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ভারতের দুরবস্থা চরম সীমায় পেঁৗচেছে, এদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো তখন ভেঙেচুরে খান খান। সত্য কথা বলতে কি, এই দুরবস্থার সুযোগ নিয়েই ইংরেজরা এখানে তাদের শাসন পত্তন করে।

৪ : স্বাধীনতার জন্য ভারতের সাধনা

ঝড়ের মুখে ধৈর্য ধরে গভীর অবজ্ঞায়
প্রাচ্য ছিল নম্র নতশির,
অক্ষৌহিণী চলে গেল বজ্রভীষণ রবে
প্রাচ্য বসে গভীর ধ্যানে ধীর।

ড্রাইডেনের কবিতার উপরোক্ত কয়েকটি ছত্র সুপরিচিত। একথা সত্য যে প্রাচ্য-

দেশগুলি এবং বিশেষ করে ভারতবর্ষ—বরাবর ধ্যানধারণা জল্পনা কল্পনা করতে আগ্রহশীল। যাঁরা সংসারী মানুষ অর্থাৎ অতি-বিজ্ঞ—তাঁরা হয়তো এসব জল্পনা কল্পনা নিতান্ত বাজে কাজ বলে হেসে উড়িয়ে দেবেন। ভারত সব সময় মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিকে শারীরিক শক্তির চাইতে বেশি সম্মান দিয়েছে; শক্তিমান ও অর্থবান লোকদের চেয়ে চিন্তাশীল লোকদেরই প্রীতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছে বেশি। তার নিতান্ত অবনতির দিনেও ভারতবর্ষ চিন্তার রাজ্যে নিজের উৎকর্ষের জন্য প্রয়াস করেছে ও তা থেকেই আত্মতুষ্টি লাভ করেছে।

কিন্তু ঝড়ের মুখে ভারত যে নিত্যনিয়ত ধৈর্যসহকারে তার মাথা নিচু করে ছিল এবং বিদেশী অক্ষৌহিণীর আক্রমণ সত্ত্বেও নিশ্চেষ্ট বসে থাকত—একথা ভাবা ভুল। প্রত্যেকবার ভারত প্রতিরোধ করেছে, কখনও সফলকাম হয়েছে কখনও বা হয়নি। কিন্তু পরাজিত হলেও ভারত তার গ্লানির কথা ভুলে যায়নি, ফিরে ফিরে চেষ্টা করেছে তার পরাজয়ের লাঞ্ছনা মুছে ফেলতে। তার এই চেষ্টা দুই বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে—হয় সে যুদ্ধে বাইরের শত্রুকে পরাস্ত করে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে নয়তো আগন্তুককে নিজেদের সমাজভুক্ত করে আত্মসাৎ করেছে। ভারতের প্রতিরোধের উদাহরণস্বরূপ আলেক্‌জান্ডারের সৈন্যদলকে বাধা দেবার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বাধা তো দিয়েই ছিল, উপরন্তু আলেক্‌জান্ডারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে উত্তর-ভারতের উপনিবেশ থেকে গ্রীক সেনাদের তাড়িয়েও দিয়েছিল। অনেকদিন পরে ভারতপ্রবাসী গ্রীক ও সীথিয়ান জাতি ভারতীয়দের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে যায়—ভারতের জাতীয় প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকে। বংশানুক্রমে হূনদের বিরুদ্ধে লড়ে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে সত্য, কিন্তু যে-সব হূন এদেশে থেকে গিয়েছিল তাদের স্বীকার করে নিতে দ্বিধা করেনি। আরবেরা ভারত আক্রমণ করতে এসে সিন্ধুনদের ধারে তাদের অগ্রগতি প্রতিহত হয়। তুর্কি ও আফগানেরা খুব অল্পে অল্পে সিন্ধুনদ অতিক্রম করে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। দিল্লীর সিংহাসন স্থায়ীভাবে দখল করতে তাদের অনেককাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। একদিকে যেমন শত শত শতাব্দিব্যাপী দীর্ঘ বিরুদ্ধতা, অন্যদিকে আবার তেমনি সমন্বয়ের—অনাত্মীয়দের আত্মীয় করণের—চেষ্টা অবিরাম চলেছিল। ফলে হয় কি আক্রমণকারীরাই একদিন আক্রান্তদের দেশ নিজের বলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। এদিক থেকে অর্থাৎ ভেদাভেদ দূর এক-জাতিত্বের সমন্বয়সাধনে আকবরকে আমরা প্রাচীন ভারতের সাধনার প্রতীক বলে মনে করতে পারি। তিনি ভারতকে স্বীকার করেছিলেন বলে ভারত এই আগন্তুককে নিজের সন্তান বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। এই কারণেই তিনি বিরাট মুঘলসাম্রাজ্যের পাকাপোক্ত একটি বুনিয়াদ গঠন করতে পেরেছিলেন। তাঁর বংশধরেরা যতদিন ভারতের স্বভাবসিদ্ধ এই সমন্বয়নীতি মেনে চলেছিল ততদিন এ সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরেনি। যেই তারা এই নীতির অন্যথা করে ভারতপ্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়াল, অমনি তাদের মধ্যে দেখা দিল দুর্বলতা, সাম্রাজ্য গেল খান খান হয়ে ভেঙে। নূতন শক্তি দেখা দিল; তাদের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ হলেও তাদের পিছনে ছিল নবোন্মেষিত জাতীয়তা-

বোধের তাগিদ। এই শক্তি গড়তে পারল না সত্য, কিন্তু মুঘলসাম্রাজ্য ভেঙে ফেলল চুরমার করে। এই সব নূতন শক্তি কিছুকালের মত সফলতা লাভ করল বটে—কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সফল হতে পারল না, কারণ এদের দৃষ্টি ছিল অতীতের দিকে নিবদ্ধ, এরা পুরাতন কালকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল। তারা সম্যকভাবে বুঝতে পারেনি যে প্রাচীন অতীত ও নিকট বর্তমান—এই দুই কালের মধ্যে বিরাট ব্যবধান, বোঝেনি যে ইতিমধ্যে এমন অনেক ব্যাপার ঘটে গেছে যার অস্তিত্ব উপেক্ষা করা চলে না। যে বর্তমান তাদের চোখের সামনেই পচে খসে পড়ছিল, তার জায়গায় তারা চেয়েছিল অতীতের আসন স্থাপন করতে। বোঝেনি যে অতীত কখনও বর্তমানের স্থান নিতে পারে না। প্রাচীনকে আঁকড়ে ধরে থাকতে গিয়ে তারা টেরও পায়নি যে জগৎ ইতিমধ্যে অনেকখানি এগিয়ে গেছে ভারতকে পিছনে ফেলে। নূতন মনোভাব নিয়ে, নূতন কৌশল আয়ত্ত করে, নূতন শক্তিতে শক্তিমান হয়ে একটা নূতন জগৎ যে পশ্চিমে জেগে উঠছিল—তা তারা খেয়ালও করেনি। এই নূতন যুগের প্রতীক হয়ে ইংরেজ যে এদেশে এসেছিল, তারা সেকথা বুঝতে পারেনি। ইংরেজের জয় হল, কিন্তু উত্তর-ভারতে খুঁটো গেড়ে বসতে না বসতেই বাধল সিপাহী বিদ্রোহ—বিদ্রোহ পরিণত হল দেশের মুক্তিসংগ্রামে। সেদিনকার নিদারুণ সংঘাতে ভারতে ব্রিটিশরাজ্য টলমল করে উঠেছিল। স্বাধীনতার স্পৃহা ভারতের বরাবরই ছিল, নির্বিরোধে নির্বিকারভাবে পরের দাসত্ব স্বীকার করে নিতে সে কোনো কালেও চায়নি।

৫ : অগ্রগতি বনাম নিরাপত্তাবোধ

জাতি হিসাবে আমরা একটু আত্মসর্বস্ব আত্মম্ভরী প্রকৃতির—অতীত ও অতীত গৌরব নিয়ে আমাদের গর্বের সীমা নেই। এই অহমিকা বজায় রাখবার জন্যই আমরা যেন আমাদের চতুর্দিকে পার্থক্যের প্রাচীর তুলে দিয়েছি। আভিজাত্যগর্ব এবং বর্ণাশ্রম সংক্রান্ত গোঁড়ামি সত্ত্বেও একটি কথা স্বীকার না করে উপায় নেই—আমরা বর্ণসংকর জাতি। জাতের মর্যাদা নিয়ে যেসব জাত বাড়াবাড়ি করে তাদের মত আমাদের ধমনীতেও নানা জাতের রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আর্য, দ্রবিড়, তুরেনিয়, সেমেটিক ও মোঙ্গোল জাতির উল্লেখ করা যেতে পারে। বিভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন আর্যের দল এদেশে এসে দ্রবিড়দের সঙ্গে মিশে গেছে। তারপর হাজার হাজার বছর ধরে কত যাযাবর জাতি ও উপজাতি এদেশে এসেছে—মীডিয়, ইরানীয়, গ্রীক, ব্যাকিট্রয়, পার্থিয়ান অর্থাৎ শক, কুশাণ অর্থাৎ ইউয়েচি, তুর্কি, তুর্ক-মোঙ্গোলিয়। এরা এসেছে কখনও অল্পসংখ্যায় কখনও বা বড় বড় দল বেঁধে। এসে এদেশে আশ্রয় লাভ করেছে। ডড্ওয়েল তাঁর লিখিত 'ইণ্ডিয়া' বইয়ে বলেছেন, 'কত দুর্ধর্ষ যুদ্ধজীবী জাতি বার বার ভারতের উত্তরভাগ অধ্যুষিত করেছে, এদেশের শাসকদের সিংহাসনচ্যুত করে নগর জনপদ অধিকার করে ছারখার করে দিয়েছে, নূতন রাজ্য গঠন করে নূতন রাজধানী পত্তন করেছে। তারপর তারা বিলুপ্ত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে

বিরাট জনসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে। পরবর্তী বংশধরদের ধমনীতে রেখে গেছে ক্রমশ তরলায়িত কিছু বিদেশী রক্ত, উত্তরাধিকারস্বরূপ রেখে গেছে সামান্য কয়েকটি বিদেশী আচার-ব্যবহারের ধ্বংসাবশেষ। শেষ পর্যন্ত সব কিছু এখানকার পরিবেশের অপ্রতিহত প্রভাবে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।'

এই অপ্রতিহত প্রভাবের পিছনে কি আছে সেটা ভেবে দেখা দরকার। একটা মস্ত কারণ হল এদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ; এখানকার হাওয়াতেই এমন একটা কিছু আছে যার ফলে এই সমন্বয় সাধিত হয়েছে। কিন্তু আবহাওয়াই সবটুকু নয়। ইতিহাসের প্রত্যূষে তরুণ ভারত নিশ্চয় একটা সার্থক জীবনের ইঙ্গিত পেয়েছিল, এমন একটা আবেগ ও প্রেরণা পেয়েছিল যা এতকাল ভারতের অবচেতন মনের উপর কাজ করে এসেছে। যারা ভারতের সংস্পর্শে এসেছে তারাই এই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে ভেদাভেদ সত্ত্বেও ভারতবর্ষের এই সর্বজাতিসমন্বয়ের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। এই আবেগ ও অনুপ্রেরণাই কি এদেশে সভ্যতার অনির্বাণ শিখা জ্বালিয়ে রেখেছিল, এরই প্রভাব কি ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে এদেশের মানুষের মন প্রভাবান্বিত করেছিল?

ভারতের সভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জীবন সম্বন্ধে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী কিংবা একটা বিশেষ আবেগের কথা উল্লেখ করা একটু হয়তো বাড়াবাড়ি বলে মনে হবে। বলা যেতে পারে যে ব্যক্তিবিশেষের জীবনই দেখা যায় শত শত দিক থেকে প্রভাবিত—সুতরাং একটা জাতি কিংবা সভ্যতা কোনো একটা বিশেষ কারণ দ্বারা প্রভাবিত—সেকথা কি বলা চলে? কত বিভিন্ন ভাবধারা এসে মিলেছে এই দেশে, কত তাদের বৈচিত্র্য কত বিভেদ, এমন অনেক ধারা আছে যা পরস্পরের বিপরীতমুখী। সাক্ষ্য প্রমাণ এত প্রচুর যে আজ যে-মত প্রতিষ্ঠিত করতে চাই কাল সেটা খণ্ডিত হচ্ছে। সকল দেশের বেলাতেই পরস্পরের বিপরীত ভাবধারা অল্পবিস্তর দেখা যায়। ভারতবর্ষের মত সুপ্রাচীন সুবিস্তৃত দেশে যেখানে অতীত ও বর্তমান পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত—সেখানে এটা আরও বেশি করে লক্ষণীয়। জটিল ঘটনাবলীকে সহজ করে দেখাবার চেষ্টার মধ্যে বিপদ আছে। কর্ম ও ভাবের অভিব্যক্তিতে খুব সুস্পষ্ট পার্থক্য সচরাচর দেখা যায় না, একটি চিন্তা থেকে আর একটি চিন্তার উদ্ভব হয়, ভাবধারার বাইরের চেহারা অনেক সময় একই থাকে, সেই ভাবের অন্তর্নিহিত অর্থ বদলাতে থাকে। কোনো কোনো সময় ভাব ও চিন্তা সময়ের গতির সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি করে।

যুগে যুগে আমরা ক্রমাগত বদলেছি, আজ যা হয়েছি কাল তা ছিলাম না। জাতি হিসাবে কিংবা সংস্কৃতির দিক থেকে আমরা আগে যা ছিলাম তা থেকে অনেকখানি বদলেছি। চারদিক তাকালে দেখতে পাই যে কেবল ভারতে নয় পৃথিবীর সর্বত্র প্রগতি ও পরিবর্তন বিরাট পদবিক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। তবে একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয়—তা হল এই যে নানা পরিবর্তন ও সঙ্কটের মধ্যেও ভারত ও চীনের সভ্যতা যুগ যুগ ধরে তাদের মূলগত বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে—নূতন যুগের

সঙ্গে যেমন মানিয়ে চলেছে তেমনি আবার নিজেদের সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রেখেছে জীবন ও জীবনের বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি না রাখতে পারলে এটা সম্ভবপর হত না। পুরাতনের সংগে এই যে তাদের যোগ—এর পিছনের হেতুটা ভালো কি মন্দ কিংবা ভাল মন্দ মিশ্রিত কি না—তা আমরা বলতে পারি না। তবে একথা সত্য যে এর পিছনে এমন একটি শক্তি আছে যা এই দুই দেশের বৈশিষ্ট্য এত দিন বাঁচিয়ে রেখেছে। এমনও হতে পারে যে এই শক্তি তার কার্যকরিতা বহু পূর্বেই হারিয়ে ফেলেছে—এবং এখন এটা নিছক বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হয়তো এর মধ্যে ভাল যা কিছু ছিল তা পরবর্তীকালের আবর্জনার মধ্যে চাপা পড়ে গেছে—সারপদার্থ নিঃশেষ হয়ে কেবল হয়তো খোলশটাই পড়ে আছে।

স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার সঙ্গে প্রগতির বিরোধ চিরকালের বিরোধ। দুটোর মধ্যে মিল নেই—একটি চায় অদলবদল, পরিবর্তন; অন্যটি চায় ঝড়ঝাপটার হাত থেকে নিরাপদ একটি শান্তিপূর্ণ আশ্রয়। প্রগতি জিনিসটা পাশ্চাত্যদেশেও অনেকটা নূতন এবং এই এগিয়ে যাবার ইচ্ছাটা সাম্প্রতিক। প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগের মানুষেরা অতীতের স্বর্ণময় যুগের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকত, পরবর্তীকালে যে অধোগতি ঘটেছে তার সম্বন্ধে তাদের হতাশার অন্ত ছিল না। ভারতবর্ষেও প্রাচীনকে আমরা বরাবর সম্মান ও গৌরব দিয়ে এসেছি। এদেশে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার বুনিয়াদ গাঁথা হয়েছিল পাকা ভিত্তির উপর। এদিক থেকে বিচার করলে পশ্চিমের যে কোনো দেশের চাইতে আমাদের দেশের সভ্যতা স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার দিক থেকে বহুগুণে উন্নত ছিল। জাতিভেদ ও একান্নবর্তী পরিবারের ভিত্তির উপর সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে গোষ্ঠী ও ব্যষ্টির উভয়েরই নানাপ্রকার সুবিধা ছিল। সামাজিক দিক থেকে বিশেষ কোনো গোষ্ঠী নিরাপদ বোধ তো করতই, উপরন্তু প্রবীণবয়সে অকর্মণ্য হলে ব্যক্তিবিশেষকে জীবিকানির্বাহের জন্য দুর্ভাবনায় কাল কাটাতে হত না। দুর্বলের এতে সুবিধা হত বটে, কিন্তু শক্তিমানদের এতে খানিকটা অসুবিধা হত নিশ্চয়। যাদের জনসাধারণ বলা হয়—গড়পড়তা হিসাবে যাদের জ্ঞানবুদ্ধি ও ক্ষমতা সমান স্তরের, তাদের সুবিধা হত যে পরিমাণে ঠিক সেই পরিমাণেই অসুবিধা হত তাদের যারা সাধারণ থেকে বাইরে—সে তারা উঁচু নিচু যে কোনো স্তরেরই হোক না কেন। ব্যক্তির চাইতে সমষ্টির সুবিধা হত বেশি—সবাইকে একটা বিশেষ স্তরে নামাতে বা ওঠাতে গেলে ব্যক্তিত্বের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। খুবই আশ্চর্যের বিষয় বলতে হবে—যে ভারতের দর্শন যদিচ ব্যক্তিবিশেষের সাধনা কিংবা সার্থকতার উপর সম্পূর্ণ জোর দেয়, ভারতের সমাজব্যবস্থা সমাজ এবং গোষ্ঠীর উপরই জোর দেয় বেশি। জ্ঞান ও বিশ্বাসের দিক থেকে ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হত, কিন্তু সমাজের দিক থেকে ব্যক্তিকে শ্রেণী কিংবা গোষ্ঠীর নিয়ম ও সংস্কার সম্পূর্ণভাবে মেনে চলা কর্তব্য বলে গণ্য হত।

সমাজের বাঁধন খুব শক্ত ছিল সত্য, কিন্তু সংস্কার বদলানর সঙ্গে সঙ্গে সমাজব্যবস্থা বদলে যাবার দৃষ্টান্ত অপ্রচুর ছিল না। দেখা গেছে অনেক সময় নূতন সমাজ গড়ে উঠেছে নূতন রীতিনীতি ও সংস্কার নিয়ে, অথচ বৃহৎ সমাজের সঙ্গে তার কোনো

বিরোধ ঘটেনি। এই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবার স্বাধীনতা থাকায় বিদেশী প্রভাবকে ভারত এত সহজে আয়ত্তীভূত করতে পারত। এর পিছনে ছিল সবাইকে একই সমাজে অন্তর্গত করে নেবার একটা উদার প্রচেষ্টা. সকল মতবাদের লোককে আত্মীয় বলে স্বীকার করে নেবার নীতি।

স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা যতদিন সমাজের লক্ষ্য ছিল, ততদিন এই প্রকার সামাজিক গঠন মোটামুটিভাবে বেশ ভালভাবেই টিকে ছিল। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে বাঁধন কখনও কখনও আলগা হয়ে পড়েছিল সত্য, কিন্তু অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করার একটা চেষ্টার ফলে সমাজ কখনও দুর্বল হয়ে পড়েনি। এই পুরাতন সমাজব্যবস্থা সর্বপ্রথম টলমল করে উঠল যখন প্রাচীনকালের সংস্কৃতিপুষ্ট স্থাণু মনোভাবকে রূঢ়ভাবে ধাক্কা দিল নূতন যুগের প্রগতিশীল মতবাদ। পুরাতন নূতনে খাপ খেল না। সমাজের উন্নতি জিনিসটা যে স্থিতিশীল নয়—এই ধারণা পাশ্চাত্য সভ্যতার রূপ আমূল বদলে দিয়েছে। প্রাচ্য সভ্যতার বেলাও ঠিক তাই ঘটেছে। প্রগতির পূজারী পশ্চিম এখন কিন্তু নিরাপত্তার আশ্রয় সন্ধান করছে। আর ভারতবর্ষের বেলা দেখছি নিরাপদ আশ্রয়ের অভাবের দরুন পুরাতনের রাস্তা পরিহার করে এদেশ এমন একটা দিকে অগ্রসর হতে চাইছে যেদিকে আছে নিরাপত্তাবোধ।

প্রাচীনকালে কিংবা মধ্যযুগে প্রগতির মতবাদ ভারতবর্ষকে এমন করে বিপর্যস্ত করতে পারেনি। কিন্তু ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে ও পরিবর্তনশীল অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করার আগ্রহের ফলে, ভারতীয়দের মনে একটা সমন্বয়ের স্পৃহা জাগ্রত হয়। কেবল আগন্তুক জাতিদের সমন্বয় নয়, মানুষের বহির্জীবনের সঙ্গে অন্তর্জীবনের, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মধ্যে একটা মিল খুঁজে দেখবার ইচ্ছা এই সময় দেখা দেয়। মানুষে মানুষে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, জাতিতে জাতিতে, যে প্রভেদ তা তখনকার দিনে আজকের মত উৎকট সমস্যারূপে দেখা দেয়নি। একই সংস্কৃতির পটভূমিকায় ভারতের বিভিন্ন জাতি বিচিত্র বিভেদ সত্ত্বেও একতাবদ্ধ হয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতিবেশীরূপে বসবাস করতে থাকে। কত রাজা এল গেল, কিন্তু যে স্বায়ত্তশাসিত গ্রাম্য পঞ্চায়েত-গুলির উপর দেশের শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, তা যুগ যুগ ধরে অনড় অটল ছিল। বাইরের অভিযান কিংবা আক্রমণ জনসমুদ্রের উপরিস্থলে সামান্য একটু তরঙ্গের সৃষ্টি করত বটে, কিন্তু গভীরে প্রবেশ করে আলোড়ন জন্মাতে পারত না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হ'ত যে রাজশক্তি স্বেচ্ছাতন্ত্রী, কিন্তু সংস্কার ও নিয়মের শতপাকে রাজা ছিলেন পদে পদে বাঁধা, গ্রাম্য পঞ্চায়েতের ক্ষমতা বা অধিকারের উপর সহজে তিনি হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। ব্যক্তি এবং সমাজের স্বাধীনতা এইভাবে অনেক অংশে অব্যাহত থাকত।

ভারতীয় জাতিদের মধ্যে রাজপুতদের মত এমন সত্যকার ভারতীয় জাতি খুব অল্পই দেখা যাবে—ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যবিষয়ে রাজপুতদের গর্বের অবধি নেই। বস্তুতপক্ষে এই রাজপুতদের শৌর্য বীর্যের কাহিনী আমাদের ঐতিহ্যের অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে এই রাজপুতদের মধ্যে অনেকে নাকি ভারতের সীথিয়ান শাখা থেকে উদ্ভূত, কেউ কেউ নাকি অসভ্য হূনদের

বংশধর। ভারতের কৃষাণ সম্প্রদায়ের মধ্যে সবার উপরে স্থান দিতে হয় জাঠদের—বলিষ্ঠ কর্মঠ শক্ত একটা জাত—জমির প্রতি এদের যেমন দরদ তেমনি জমিরক্ষার ব্যাপারে অসমসাহসী এরা। জাঠরাও সীথিয়ান বংশসম্ভূত। কাথিয়াওয়াড়ের দীর্ঘদেহ সুদর্শন কাথি কৃষাণেরাও ওই একই জাতির লোক। আমাদের দেশের খুব মুষ্টিমেয় লোকেরই বংশানুক্রম নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা চলে—বেশির ভাগ লোকের জাতি গোত্র সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা নেই। জাতি এদের যাই হোক না কেন, এরা সকলে যে ভারতীয় সে-বিষয়ে নিশ্চিত বলা চলে, অপরাপর জাতিদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ভারতের সংস্কৃতি এরা গড়ে তুলেছে, ভারতের ঐতিহ্যের উপর এদের সকলের সমানাধিকার।

বাইরের আগন্তুক যেসব জাতি ভারতে এসে ভারতীয় হয়ে গেছে—সকলেই তারা ভারতকে কিছু দিয়েছে এবং অনেকখানি নিয়েছে—এই দেওয়া নেওয়ার ফলে পরস্পর পরস্পরের শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। যেসব জাতি নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছে, ভারতের বহু বিচিত্র জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে যোগযুক্ত হয়নি, তারা এদেশের উপর দীর্ঘস্থায়ী কোনো প্রভাব রেখে যেতে পারেনি। পরিণামে তারা লোপ পেয়ে গেছে কিন্তু তার পূর্বে অনেক সময় নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতেরও অল্পবিস্তর ক্ষতিসাধন করে।

৬ : ভারত ও ইরান

ভারতের সঙ্গে যেসব দেশ ও জাতি যোগাযোগ স্থাপন করে ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির উপর তাদের প্রভাব বিস্তার করেছে—তার মধ্যে সবার আগে নাম করতে হয় ইরানের। ইরানের যোগ যেমন প্রাচীন তেমনি গভীর। এই যোগাযোগ শুরু হয়েছিল ভারতে আর্য উপনিবেশ স্থাপনেরও আগে। মনে রাখতে হবে যে ভারতীয় আর্য ও ইরানীয়রা একই বংশসম্ভূত—একই জাতির দুই বিভিন্ন ধারা দেখতে পাই তাদের মধ্যে। কেবল জাতিগত ঐক্য নয় দুই জাতির মধ্যে ধর্ম ও ভাষাগত মিলও অনেকখানি দেখা যায়। বৈদিকধর্মের সঙ্গে জরথুস্ত্রের ধর্ম অনেকখানি মেলে, বৈদিক সংস্কৃত ও আবেস্তার ভাষা পহ্লবীর মধ্যে সাদৃশ্যের অভাব নেই। সংস্কৃত ও পারসীক ভাষা পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠেছে সত্য, কিন্তু অন্যান্য আর্যভাষার মত এই দুই ভাষাতেও একই ধরনের মৌলিক শব্দ প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। দুই দেশের শিল্প ভাষা ও সাহিত্য এবং সংস্কৃতি দুই বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের প্রভাব বশত আলাদা আলাদা রূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। ইরানের প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে পারসীক শিল্পের যে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ—তার মধ্যে এই পরিবেশের প্রভাবটাই আমরা দেখতে পাই। ভারতীয় আর্যদের বেলাও দেখি হিমবন্ত গিরিশ্রেণী, বনস্পতিশোভিত অরণ্যানী ও আর্যাবর্তের তটশালিনী নদীগুলির দ্বারা ভারতের শিল্প ও সাহিত্যের আদর্শ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

ভারতের মত ইরানের সংস্কৃতিও এমন একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল

যে ইরান তার বহিরাগত শত্রুকে কেবল প্রভাবিত করেছে নয় অনেক সময় আত্মসাৎও করেছে। খৃস্টীয় সপ্তম শতকে আরবেরা ইরান অধিকার করে। পরাজিত ইরানের সংস্কৃতির কাছে কিন্তু আরবদের হার মানতে হয়, মরুচারী বেদুইনদের শাদাসিধে ধরনধারণ ত্যাগ করে আরবেরা সুসভ্য ইরানের মার্জিত সংস্কৃতি স্বীকার করে নেয়। ইউরোপে ফরাসীভাষা যেমন আদৃত হয় ঠিক তেমনিভাবে এশিয়াখণ্ডের অনেকখানি জায়গা জুড়ে পারসীভাষা বিদগ্ধ সমাজের সমাদরের ভাষা হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিমে কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে আরম্ভ করে পূর্বে সুদূর গোবি মরুভূমির প্রান্ত পর্যন্ত ইরানের শিল্প ও সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল।

ভারতের উপর এই ইরানীয় প্রভাব বহুকাল ধরেই অব্যাহতভাবে চলে আসছিল। পাঠান ও মুঘলদের রাজত্বকালে পারসীই ছিল রাজভাষা। ব্রিটিশ রাজত্ব পত্তনের অব্যবহিত আগে অবধি ভারতের আদালত মক্তবে এই পারসীভাষা প্রচলিত ছিল। ভারতের চলতি ভাষায় প্রচুর পারসী কথা আছে। সংস্কৃত থেকে যেসব ভাষার উদ্ভব তাদেব মধ্যে পারসী কথা ঢুকবে, এতো খুবই স্বাভাবিক। এই সংস্কৃত পারসীর সংমিশ্রণ সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায় হিন্দুস্তানীতে। পারসীর প্রভাব সুদূর দক্ষিণে দ্রবিড়ভাষার মধ্যেও অল্পবিস্তর দেখতে পাই। অতীতে এমন অনেক ভারতীয় কবি জন্মেছেন যাঁরা পারসীকাব্যকে গৌরব দান করেছেন। এখনও অনেক হিন্দু-মুসলমান সাহিত্যিক আছেন যাঁরা পারসীভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি করে খ্যাতনামা হয়েছেন।

সিন্ধু উপত্যকায় আর্যদের যে সভ্যতা গড়ে ওঠে তার সঙ্গে সমসাময়িক ইরান ও মেসোপোটেমিয়ার সভ্যতার যোগাযোগ ছিল—এবিষয়ে নিঃসন্দেহে বলা চলে। এসব দেশের অলঙ্করণ পদ্ধতি ও নামাঙ্কিত সীলমোহরের মধ্যেও অদ্ভুত মিল দেখতে পাওয়া যায়। পূর্ব আকীমিয় যুগে ইরান ও ভারতের মধ্যে যে লেনদেন ছিল তার কিছু কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ আমাদের হাতে এসেছে। আবেস্তাগ্রন্থে ভারতের উল্লেখ আছে—উত্তর-ভারতের বর্ণনাও আছে। ঋগ্বেদে পারস্যের উল্লেখ দেখি—পারসিকদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আর্যঋষিরা পার্শব ও পরে পারসিক নামটা ব্যবহার করেছেন। এই পারসিক কথা থেকেই বোধ হয় আধুনিক পার্সি কথার উদ্ভব। পার্থিয়দের সে যুগে বলা হত পার্থব। তা হলেই দেখা গেল অতি প্রাচীনকাল থেকেই ইরান ও উত্তর-ভারতের মধ্যে আকীমিয়বংশের রাজত্বের পূর্ব থেকেই একটা নিকট সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। মহারাজরাজেন্দ্র সাইরাস-এর সময় এ যোগ নিকটতর হয়। ইতিহাস বলে যে সাইরাস ভারতের প্রত্যন্তপ্রদেশ—সম্ভবত কাবুল বেলুচিস্তান অবধি—এগিয়ে এসেছিলেন। খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠশতকে ডেরিয়াসের সময় পারস্যসাম্রাজ্য ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ—এবং খুব সম্ভব সিন্ধুপ্রদেশ ও পশ্চিম-পাঞ্জাবের খানিকটা জায়গা অবধি বিস্তৃত ছিল। ভারত ইতিহাসের এই যুগটিকে মাঝে মাঝে জরথুস্ত্রের যুগ বলে অভিহিত করা হয়—বহুবিস্তৃত ছিল এই যুগের প্রভাব। এই সময় সূর্যের উপাসনা বহুল প্রচলিত হয়।

ডেরিয়াসের সাম্রাজ্যে তাঁর ভারতীয় প্রদেশটি সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও জনবহুল ছিল।

সিন্ধুপ্রদেশ তখন এখনকার মত শুষ্ক মরুভূমি ছিল না। ভারতীয় অধিবাসীদের সংখ্যা যে অধিক ছিল এবং তারা যে ডোরিয়াসকে যথেষ্ট পরিমাণে কর দিত হেরোডোটাস সে কথা বলেছেন: 'এরা অন্য লোকদের অপেক্ষা গণনায় অধিক ছিল, এবং সেই অনুপাতে অধিক করও দিত—তার পরিমাণ ছিল ৩৬০° ট্যালেন্ট স্বর্ণরেণু' (দশলক্ষ ইংরাজি পাউণ্ডের থেকেও বেশি)। এ ছাড়া, পারস্য সৈন্যবাহিনীতে ভারতীয় পদাতিক, অশ্বারোহী ও রথের কথাও তিনি বলেছেন। পরে হাতিরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

খৃস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর আগে থেকে বহুকাল ধরে পারস্য ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্যব্যপদেশে যোগাযোগের কথা জানা যায়; ভারতবর্ষ ও ব্যাবিলনের মধ্যেকার যোগ প্রধানত পারস্যোপসাগরের উপর দিয়েই ছিল।* ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে সাইরাস ও ডোরিয়াসের আক্রমণাদির জন্য সাক্ষাৎভাবে সংস্পর্শ ঘটে। আলেক্‌জাণ্ডারের বিজয়লাভের পর ইরান অনেক শতাব্দী ধরে গ্রীকদের অধীনে ছিল। ভারতের সঙ্গে সংস্পর্শ চলতে থাকে, এবং এরূপ মতও প্রকাশ করা হয়েছে যে অশোকের অট্টালিকাগুলি পার্সিপলিসের স্থাপত্যের প্রভাব লাভ করেছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারত ও আফগানিস্থানে যে গ্রীক ও বৌদ্ধ শিল্পের সংমিশ্রণ ঘটেছিল তাতে ইরানের স্পর্শও ছিল। গুপ্তদের সময়ে, অর্থাৎ খৃস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে, ভারতে শিল্প ও সংস্কৃতির উন্নতি হয়েছিল বলে কথিত আছে। এ সময়েও ইরানের সঙ্গে যোগ চলছিল।

কাবুল, কান্দাহার ও সীস্তানের সীমান্তপ্রদেশ অনেক সময় রাজনৈতিকভাবে ভারতের অংশরূপে ছিল। এই স্থানটিই ভারতীয় ও ইরানীদের মিলনস্থান ছিল। পরে এস্থানটিকে 'শ্বেত-ভারত' ('হোয়াইট ইন্ডিয়া') নাম দেওয়া হয়েছিল। ফরাসী পণ্ডিত জেম্‌স্‌ দারমেস্টে্‌লার বলেন: 'এই প্রদেশে হিন্দু সংস্কৃতি বলবান ছিল, এবং খৃস্টের পূর্বের ও পরের দুই শতাব্দী ধরে এর নাম ছিল শ্বেত-ভারত। আর মুসলমানদের ভারত-বিজয় আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত এস্থানটি ইরানীয় অপেক্ষা অধিকতরভাবে ভারতীয় ছিল।'

উত্তরে ব্যবসায়ী ও পর্যটকেরা স্থলপথেই ভারতে আসত। দক্ষিণ-ভারতকে সমুদ্র ও জলপথের বাণিজ্যের উপর নির্ভর করতে হত। আর এইভাবে ভারত অন্য দেশের সঙ্গে যুক্ত থাকত। জানা যায় যে একটি দক্ষিণদেশীয় রাজ্যের সঙ্গে সুসানিদদের সময়ে পারস্যের রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের ব্যবস্থা ছিল।

তুর্কি, আফগান ও মুঘলেরা ভারত জয় করার পর মধ্য ও পশ্চিম-এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সংস্পর্শ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে, ইউরোপে নবযুগের অভ্যুদয়ের সময়ে সমরখন্দ ও বোখারায় ইরানের বিশেষ প্রভাবে তৈমুরীয় নবযুগের

* অধ্যাপক এ. ভি. উইলিয়মস্‌-জ্যাকসন : 'দি কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ্‌ ইণ্ডিয়া' : প্রথম খণ্ড, ৩২৯ পৃঃ।

উদয় হয়। বাবর এই তৈমুর বংশেরই ছিলেন। তিনি এই সময় দেশ থেকে বের হয়ে দিল্লীর রাজতক্ত অধিকার করেন। এ হল ষোড়শ শতাব্দীতে। এই সময় ইরানে সাফাবিদের রাজত্বকালে শিল্প-কলার আশ্চর্যরূপ পুনরভ্যুদয় হয়। একে পারস্য-শিল্পের সুবর্ণযুগ বলে। বাবরের পুত্র হুমায়ুন এই সাফাবি রাজার কাছেই আশ্রয়ের জন্য যান এবং তাঁরই সাহায্যে ভারতে ফিরে আসেন। ভারতের মুঘল রাজারা ইরানের সঙ্গে বিশেষ সংস্পর্শ রক্ষা করে চলতেন। আর বহু পণ্ডিত ও শিল্পী সীমান্ত পার হয়ে পরাক্রান্ত মুঘলদের শোভাপূর্ণ রাজসভায় যশ ও সম্পদের জন্য আসতেন।

ভারতে এক নূতনতর স্থাপত্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে পারস্য প্রেরণা মিলে এই নূতন আদর্শ তৈরি হয়ে ওঠে এবং দিল্লী ও আগ্রা নূতন নূতন শ্রীসম্পন্ন, গৌরবময় সৌধে ভূষিত হয়। এইগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধটি হল তাজমহল। ফরাসী পণ্ডিত মঁসিয়ে গ্রুসে এই সৌধটি সম্বন্ধে বলেছেন 'ভারতের দেহে ইরানের আত্মা মূর্তি পরিগ্রহ করেছে।'

ভারতীয়েরা ইতিহাসের প্রথম থেকে বরাবর যেরূপ ইরানীদের সঙ্গে নিকট যোগ রক্ষা করে এসেছে এমন আর দেখা যায়নি। পরিতাপের বিষয় এই যে এতদিন ধরে মর্যাদার সঙ্গে যে যোগ রক্ষিত হয়ে এসেছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল নাদির শাহের আক্রমণে। দুশো বছর আগে, অল্পকাল স্থায়ী হলেও অতি ভয়ংকর হয়েছিল এই আক্রমণ।

তারপর এল ইংরাজেরা। এরা আমাদের এশিয়ার প্রতিবেশীদের সঙ্গে যোগাযোগের সকল দ্বার, সকল পথ বন্ধ করে দিল। সমুদ্রের উপর দিয়ে নূতন পথ খোলা হল, আর তাদ্বারা আমরা ইউরোপের, বিশেষত ইংলণ্ডের, কাছে এসে পড়লাম, কিন্তু বহুকাল ধরে আমাদের দেশ এবং ইরান ও মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে কোনো যোগই ছিল না। পরে আকাশের পথ খোলায় বর্তমান সময়ে পুরাতন সাহচর্য নূতন করে আরম্ভ হয়েছে। ইংরাজদের আগমনে এই যে হঠাৎ আমাদের এশিয়ার অন্যান্য অংশ হতে বিচ্ছিন্ন হতে হয়েছিল এ হল ভারতে ইংরাজ রাজত্বের এমন একটা কুফল যা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। অধ্যাপক ই. জে. র‍্যাপসন লিখেছেন, 'যে শক্তি অধস্তন শাসকদের একত্র করে একটি বৃহৎ শাসনতন্ত্র গড়ে তুলতে পেরেছে তা প্রধানত নৌশক্তি; এ শক্তির জলের উপরই প্রভাব, সুতরাং স্থলপথ বন্ধ করতে হয়েছে। ভারত সাম্রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান এবং ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে—ইংরাজরা এই নীতিই অবলম্বন করেছে। এইভাবে রাজনৈতিক ঐক্যের ফলেই রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা এসে পড়েছে। একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক যে এই প্রকারের বিচ্ছিন্নতা ভারতের ইতিহাসে অল্পদিনের এবং একেবারে একটা নূতন ব্যাপার—নূতন ও পুরাতনের মাঝে বিচ্ছেদের রেখা।' (দি কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া : ১ম খণ্ড, ৫২ পৃঃ)।

যা হোক, একটা যোগ এখনও চলছে, যদিচ তা পুরাতন ইরানের সঙ্গে, আধুনিক ইরানের সঙ্গে নয়। তেরোশো বছর আগে, যখন মুসলমানধর্ম ইরানে প্রবেশলাভ করে

তখন বহু জরথুস্ত্রপন্থী ভারতবর্ষে এসেছিল। এখানে তাদের আগ্রহের সঙ্গেই গ্রহণ করা হয় এবং পশ্চিম সমুদ্রতীরে তারা বসবাস করতে আরম্ভ করে। তারা আপন ধর্মমত ও সামাজিক আচার-ব্যবহার নিয়েই ছিল, কেউ এবিষয়ে কোনো বিঘ্ন ঘটায়নি, আর তারাও অপরের কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেনি। এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে এই সকল পার্সি নামে অভিহিত লোকেরা শান্তভাবে আড়ম্বরশূন্য হয়ে ভারতের অধিবাসীদের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে এবং এই স্থানকেই নিজেদের দেশ বলে গ্রহণ করেছে, যদিচ একটি ছোট সম্প্রদায়রূপে নিজেদের পৃথক করে রেখেছে, এবং আপনাদের পুরাতন রীতিনীতি জোর করেই ধরে আছে। সম্প্রদায়ের বাইরে তারা বিবাহ হতে দেয় না, আর দুচারটি যা ঘটেছে তা সংখ্যায় অল্পই। এই রীতিটি এদেশে কিছুমাত্র বিস্ময়ের কারণ হয়নি, কারণ এখানে আপন জাতির মধ্যে বিবাহই প্রচলিত। এই পার্সিদের সংখ্যাবৃদ্ধি ধীরে ঘটেছে. আর এতদিনেও তাদের সংখ্যা প্রায় একলক্ষ মাত্র। এরা ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতিলাভ করেছে এবং এদের অনেকেই শ্রমশিল্পে অগ্রণী হয়েছে। ইরানের সঙ্গে তাদের আর কোনো যোগ নেই; এখন তারা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় হয়ে পড়েছে. তবু প্রথাপদ্ধতি, পুরাতন পথ, এবং তাদের প্রাচীনকালের দেশের স্মৃতি ধরে আছে।

এই কিছুকাল ধরে ইরানে মুসলমান-পূর্বকালের পুরাতন সভ্যতার দিকে দৃষ্টি ফিরবার ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ধর্মের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই; এ সাংস্কৃতিক ও জাতীয় ভাবাত্মক—ইরানের পুরাতন সংস্কৃতি ঐতিহ্যরূপে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে, এ হল তারই জন্যে গর্বের অনুভূতি।

জগতে যে সকল পরিবর্তন রূপ নিয়েছে সেজন্য এবং আপনাদের সাধারণ স্বার্থের জন্যও এশিয়ার দেশগুলি এখন পরস্পরের দিকে তাকাতে বাধ্য হয়েছে। ইউরোপীয় প্রভুত্বের কালকে তারা দুঃস্বপ্নের মত চিন্তার ক্ষেত্র হতে বাদ দিয়েছে। পুরাতনের স্মৃতি আগেকার বন্ধুত্ব এবং একযোগে দুরূহ প্রচেষ্টার কথা আজ মনে করিয়ে দিচ্ছে। এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে আজ যেমন ভারতবর্ষ চীনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তেমনি অচির ভবিষ্যতে ইরানের দিকেও হবে।

ইরানের যে সাংস্কৃতিক প্রচার-সমিতি ভারতে এসেছিল তার নেতা দুমাস আগে এলাহাবাদে বলে গেছেন, 'ইরানবাসী ও ভারতবাসীরা দুই ভাইয়ের মত। একটি পারস্য কিংবদন্তীতে আছে, এরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে একজন পূর্বে ও অপরজন পশ্চিমে গিয়েছিল। তাদের পরিবারেরা এ ওর কথা ভুলে গিয়েছিল, কেবল একটিমাত্র ঐক্যের পরিচয় টিকে ছিল, আর সে হল কয়েকটি পুরাতন সুরের টুকরো দিয়ে তৈরি, তাদের বাঁশিতে সে সুরগুলি বাজত। বহু শতাব্দীর অন্তে এইগুলির সাহায্যে এই দুই পরিবার পরস্পরকে চিনতে পেরেছে এবং পুনরায় মিলিত হয়েছে। তাই আমরাও এসেছি ভারতবর্ষে আমাদের বাঁশিতে সেই পুরাতন সুর বাজাব বলে, তাই শুনে যেন আমাদের ভারতীয় জ্ঞাতিভ্রাতারা, আমাদের নিজের বলে চিনে নেন এবং তাঁদের ইরানী ভ্রাতাদের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হন।'

৭ : ভারতবর্ষ ও গ্রীস

প্রাচীন গ্রীসকে ইউরোপীয় সভ্যতার উৎসমুখ বলা হয়, আর প্রাচী ও প্রতীচীর মধ্যে মূলগত পার্থক্যের কথা অনেকই লেখা হয়েছে। আমি এ বুঝি না; এর অনেকটাই অস্পষ্ট এবং বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, আর যথার্থও নয়। অল্পদিন আগে পর্যন্ত অনেক ইউরোপীয় চিন্তাশীল ব্যক্তির কল্পনায় ছিল যে মূল্যবান সব কিছুরই সূত্রপাত হয়েছিল গ্রীসে কিংবা রোমে। স্যর হেন্রি মেইন্ এক জায়গায় বলেছেন যে প্রকৃতির অন্ধশক্তি ছাড়া জগতে গতিশীল কিছুই নেই যা মূলত গ্রীসদেশীয় নয়। ইউরোপীয় প্রাচীন সাহিত্যের পণ্ডিতেরা গ্রীক ও রোমান বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষ ও চীন সম্বন্ধে সামান্যই জানতেন। তবু অধ্যাপক ই· আর· ডড্স্ জোর দিয়েই বলেছেন, 'গ্রীক সংস্কৃতি প্রাচ্য পটভূমিকায় উদ্ভূত হয়েছিল, আর প্রাচীন সাহিত্যের পণ্ডিতদের মনে ছাড়া আর কোথাও এবং কখনও এর থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়নি।'

বহুকাল ধরে ইউরোপে পাণ্ডিত্য গ্রীক, হিব্রু ও ল্যাটিন ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, আর এর থেকে জগতের যে রূপটি পাওয়া গিয়েছিল তা ভূমধ্যসাগরের জগতের রূপ। মূল ধারণাটি রোমানদের ধারণা হতে বিশেষভাবে অন্যরূপ ছিল না, যদিচ অল্পস্বল্প প্রভেদ তো ঘটবেই। কেবল যে ইতিহাস এবং ভৌগোলিক বিভাগের সঙ্গে রাজনীতির সম্বন্ধবিষয়ের মতাদি এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্রমোন্নতিই এই ধারণা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল তা নয়, বিজ্ঞানের উন্নতিতেও এই থেকে বাধা এসেছিল। প্লেটো এবং অ্যারিস্টট্ল-এর প্রভাব ছিল মানুষের মনের উপর। এমনকি যখন এশিয়ার লোকেরা যে সকল উৎকর্ষ লাভ করেছে তার সংবাদ ইউরোপে পৌঁছায় তা অনিচ্ছার সঙ্গেই গৃহীত হয়েছিল। কতকটা অজ্ঞানে এতে বাধাই দেওয়া হয়েছিল—পূর্বের ধারণাতেই এই সংবাদকেও মিল খাইয়ে নেবার চেষ্টা দেখা গিয়েছিল। যখন পণ্ডিত ব্যক্তিরাই এরূপ মনে করতে পারল, অশিক্ষিত লোকেরা যে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে একটা অপরিহার্য পার্থক্যের কথা ভাববে তা আর বিচিত্র কি? ইউরোপে শ্রমশিল্পের উন্নতি ঘটায় ও সেইজন্য আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই মতটা সাধারণের মনে জোরের সঙ্গেই বসে গেল; আর এক বিচিত্র যুক্তিতে প্রাচীন গ্রীস বর্তমান ইউরোপ ও আমেরিকার পিতা কিংবা মাতা হয়ে দাঁড়াল। জগতের অতীত সম্বন্ধে আরও তথ্য লাভ করে কয়েকজন চিন্তাশীল ব্যক্তির মতামত নাড়া পেয়েছে, কিন্তু লোকসাধারণের কাছে—সে বুদ্ধিমানই হোক কি অন্যরূপই হোক—শত শত বছর ধরে যে ধারণা চলে আসছে তাই-ই এখনও বলবৎ আছে। তাদের চিত্তবৃত্তির উপরের স্তরে ছায়ামূর্তিগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর যে দৃশ্যপট তারা নিজেদের জন্যে এঁকেছে তাতে মিশে যাচ্ছে।

ইউরোপ ও আমেরিকা শ্রমশিল্পে প্রভূত উন্নতি লাভ করেছে আর এশিয়া পিছিয়ে আছে, কেবল এই অর্থে ছাড়া, প্রাচী ও প্রতীচী, এই শব্দ দুইটির ব্যবহার আমি বুঝি না। শ্রমশিল্পের এই প্রসার জগতের ইতিহাসে একটা নূতন ব্যাপার। এতে

জগৎকে বদলে দিয়েছে, এবং আরও বদলে দিচ্ছে, এবং এতটা আর কিছুতেই হয়নি। পুরাতন গ্রীক সভ্যতা ও আধুনিক ইউরোপীয় ও আমেরিকান সভ্যতার মধ্যে কোনো প্রকারগত যোগ নেই। স্বাচ্ছন্দ্যই প্রকৃতপক্ষে বাঞ্ছনীয় এই আধুনিক ধারণা গ্রীক কিংবা অন্য কোনো প্রাচীন সাহিত্যে আদৌ নেই। গ্রীকেরা, ভারতীয়েরা, চীনবাসীরা এবং ইরানীরা সকল কালেই জীবনে এরূপ ধর্ম ও তত্ত্বের অনুসন্ধান করেছে যাতে তাদের সমস্ত কার্য প্রভাবান্বিত হয়েছে, আর তারা চেয়েছে এরই দ্বারা ঐক্য ও সামঞ্জস্য স্থাপিত হোক। এই আদর্শটি জীবনের সকল দিকেই দেখা যায়, সাহিত্য, শিল্প এবং সকল ব্যবস্থাতেই—আর এতে একটা সৌষম্য ও পূর্ণতার ভাব প্রকাশ পেয়েছে। হয়তো এতটা মনে করা ঠিক নয়, হয়তো জীবনের প্রকৃত অবস্থা অনেক পরিমাণেই অন্যরূপ ছিল। তা হলেও, এটা ভেবে দেখা আবশ্যক, গ্রীকদের দৃষ্টিভঙ্গী ও তাদের পন্থা থেকে বর্তমান ইউরোপ ও আমেরিকা কত দূরে, অথচ এরাই অবসর সময়ে গ্রীকদের কত প্রশংসা করে, তাদের সঙ্গে অতীতের যোগ খুঁজে বের করতে চায়, যেন অন্তরের একটা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য, কিংবা আধুনিক জীবনের রুক্ষ, তপ্ত মরুতে উদ্যানের সন্ধানে তারা ব্যস্ত।

পূর্ব ও পশ্চিমের প্রত্যেক দেশ এবং জাতির আপন আপন বিশেষত্ব আছে, বাণী আছে, এবং তারা আপন আপন পথে জীবনের সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করছে। গ্রীস এ বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট রূপই গ্রহণ করেছে, আর এ রূপটি মহনীয়; ভারতবর্ষ চীন এবং ইরানও গ্রীসের মতই। প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন গ্রীসে পার্থক্য ছিল, তবু তারা এক ভাবাপন্নই ছিল, যেমন ছিল প্রাচীনকালের ভারত ও চীনের মধ্যে অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও একই ভাবের পরিচয়। এদের সকলেরই ছিল একই প্রকার মনের প্রাশস্ত্য, অপরকে স্বীকার করার শক্তি এবং পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গী, জীবনে এবং প্রকৃতির অসীম বৈচিত্র্য ও আশ্চর্য শোভায় আনন্দ এবং শিল্পে অনুরাগ, আর ছিল প্রাচীন জাতির বহুদিনসঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া প্রশস্তজ্ঞান। এদের প্রত্যেকটি বর্ধিত হয়ে উঠেছিল আপন আপন জাতীয় প্রতিভা অনুসারে, প্রাকৃতিক পরিস্থিতির প্রভাবের মধ্যে, এবং প্রত্যেকটিতেই দেখা গিয়েছিল অন্য সকল দিক অপেক্ষা বিশেষ কোনো দিকে ঝোঁক। এই ঝোঁক আবার বিভিন্ন প্রকারের হয়েছিল। গ্রীকজাতি বর্তমান নিয়েই থাকত, চারদিকে যা কিছু সুন্দর দেখত কিংবা যে সৌন্দর্য তাদের নিজের সৃষ্টি তাতেই আনন্দ লাভ করত। ভারতীয়েরাও বর্তমানের মধ্যে আনন্দ ও সৌষম্য দেখতে পেত, কিন্তু এরই মধ্যে থেকে তাদের দৃষ্টি প্রসারিত ছিল গভীরতর জ্ঞানের দিকে এবং তাদের মনও ব্যাপৃত থাকত বিচিত্র প্রশ্ন নিয়ে। চীনবাসীরা এই সকল প্রশ্ন ও রহস্যের কথা জানত কিন্তু দূরদৃষ্টির জন্যে এগুলিতে বিজড়িত হয়ে পড়ত না। প্রত্যেক জাতিই আপন আপন পথে জীবনের পূর্ণতা ও সৌন্দর্য প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছে। ইতিহাস হতে জানা যায় যে ভারত ও চীনের জীবনের ভিত্তি ছিল সুদৃঢ় এবং টিকে থাকার শক্তিও ছিল অধিক। এখনও পর্যন্ত তারা বর্তে আছে, যদিচ তাদের অনেক ধাক্কা খেতে হয়েছে, অনেক নামাই নামতে হয়েছে, আর ভবিষ্যৎ

হয়েছে অনিশ্চিত। পুরাতন গ্রীস তার জাঁকজমক নিয়ে বেশিদিন টেকেনি, বর্তে আছে কেবল তার আশ্চর্য কীর্তিগুলি, পরবর্তী সংস্কৃতির উপরে প্রভাব, আর তার স্বল্পস্থায়ী জীবন-প্রাচুর্যের স্মৃতি। সম্ভবত 'বর্তমানে' অতিরিক্তভাবে নিবিষ্ট হওয়ার জন্যই গ্রীস 'অতীত' হয়ে পড়েছিল।

চিত্তবৃত্তিতে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতবর্ষ আজ গ্রীসের যতটা নিকটে ইউরোপের কোনো জাতিই ততটা নয়: যদিচ তারা আপনাদের গ্রীসীয় আত্মবৃত্তির সন্তান বলে পরিচয় দেয়। আমরা এটা ভুলে যাই, কারণ আমরা এ বিষয়ে একটা প্রত্যয় নিয়েই জন্মেছি, আর সেইজন্য যুক্তির সঙ্গে চিন্তা করায় বাধা উপস্থিত হয়। লোকে বলে, ভারতবর্ষ ধর্মনৈতিক, তাত্ত্বিক, কল্পনাপ্রিয়, আধ্যাত্মিক, ইহজগৎ সম্বন্ধে অনুরাগ-হীন এবং সমস্তকে অতিক্রম করে পরকালের স্বপ্নে নিমগ্ন। আমাদের এইরূপ বলা হয় বটে, আর যারা তা বলে তারা হয়তো চায় যে ভারতবর্ষ চিন্তায় ও কল্পনায় ডুবে থাকুক, আর তারা, সেই সুযোগে, এই সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে কোনো বাধা না পেয়ে, জগৎকে উপভোগ করতে থাকুক; এর সমস্ত সুখ নিজেরাই নিক। সত্য ভারতবর্ষে এইরূপই হয়েছে, কিন্তু এর থেকে অনেক বেশিও হয়েছে। বাল্যের সরলতা ও উদাসীনতা তার জানা, যৌবনের উদ্দামতা ও ত্যাগ এবং দীর্ঘকাল ধরে বেদনা ও আনন্দের ভিতর দিয়ে পাওয়া পূর্ণবয়সের বিজ্ঞতার পরিচয়ও তার আছে। বারবার ফিরে ফিরে সে তার বাল্যকাল, যৌবন ও পূর্ণবয়সকে পেয়েছে। তার প্রাচীনতা ও বৃহদাকার হেতু অত্যধিক জড়তায় ভারত ভারাক্রান্ত, বহু হীনপ্রথা এবং অকল্যাণকর আচরণ ভিতরে ভিতরে তাকে শক্তিহীন করেছে, অনেক পরগাছা তার অঙ্গে লগ্ন হয়ে রক্তশোষণ করেছে, কিন্তু এই সমস্তের পশ্চাতে আছে বহুযুগের সঞ্চিত শক্তি, একটা প্রাচীন জাতির আন্তর্জানিক বহুদর্শিতা। আমরা অতি পুরাতন, হারিয়ে যাওয়া অনেক শতাব্দী আমাদের কানে কানে কথা বলে; তবু, কেমন করে বারবার যৌবনশক্তি ফিরে পাওয়া যায় তা আমাদের জানা আছে।

কোনো গূঢ় মতবাদ কি গোপনে লব্ধ জ্ঞান যে ভারতকে জীবনীশক্তিসম্পন্ন ও এত দীর্ঘ যুগ ধরে টিকে থাকতে সমর্থ করেছে তা নয়; এতটা সম্ভব হয়েছে তার স্নেহাক্ত মানবতা, বিচিত্র ও সহিষ্ণু সংস্কৃতি এবং জীবন ও তার রহস্য সম্বন্ধে গভীর বোধের জন্য। তার জীবনীশক্তির প্রাচুর্য যুগে যুগে গেছে তার গৌরবময় সাহিত্য ও শিল্প-কলায়; যদিচ এগুলির অল্পই আজ আমরা হাতে পেয়েছি, অনেক কিছুই এখনও অনাবিষ্কৃত আছে, অথবা প্রাকৃতিক কারণে কিংবা মানুষের বৃত্তিতে নষ্ট হয়েছে। হস্তীগুম্ফার ত্রিমূর্তিকে বলা যেতে পারে ভারতেরই বহুমুখী প্রতিমূর্তি—প্রবল, আকর্ষণশীল দৃষ্টি, গভীর জ্ঞান ও বোধশক্তিতে পূর্ণ—আমাদের দিকে নিম্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। অজন্তার প্রাচীর চিত্রগুলি করুণা এবং জীবনের ও সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ, তবু গভীরতর কিছুর সমস্তকে ছাড়িয়ে আরও কিছুর আভাস আছে।

ভৌগোলিক এবং জলবায়ু আবহাওয়ার বিচারে গ্রীস ভারতবর্ষ হতে বিভিন্ন। সে

দেশে একটা প্রকৃত নদী নেই, বন নেই, বড় গাছ নেই, আর এ সব আমাদের দেশে বহুল পরিমাণে আছে। সমুদ্র তার বিশালতা ও সদা পরিবর্তনশীল ভঙ্গীতে গ্রীকদের প্রভাবান্বিত করেছে, সমুদ্রকূলবাসী ছাড়া অন্য কোনো ভারতবাসীকে এতটা করেনি। ভারতের জীবন মহাদেশের জীবন, সেখানে আছে বিস্তৃত সমতলভূমি, বিশাল পর্বত, প্রবলা নদী ও সুবৃহৎ অরণ্য। গ্রীসেও পর্বত আছে, আর ভারতীয়েরা যেমন হিমালয়ের উচ্চতায় তাদের দেবতাদের ও ঋষিদের আরামস্থান নির্দিষ্ট করেছিল, তেমনি গ্রীকেরাও অলিম্পাসের উপর দেবতাদের জন্য স্থান বেছে নিয়েছিল। উভয় জাতিই পৌরাণিক কাহিনী রচনা করে ইতিহাসের সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়ে ফেলেছে যে কল্পনা থেকে ঘটনা পৃথক করা যায় না। শোনা যায়, পুরাতন গ্রীকেরা সুখান্বেষীও ছিল না, সন্ন্যাসীও ছিল না, সুখ অকল্যাণকর, তা নীতিবিগর্হিত, এইরূপ ভেবে তা ত্যাগও করত না, আবার আধুনিক লোকের মত ভেবে চিন্তে ভোগের তাড়নায় সুখের সন্ধানে ছুটত না। আমাদের অনেক বাধা, অনেক কিছু থেকেই আমাদের বঞ্চিত থাকতে হয়; তাদের এমন ছিল না। তারা জীবনকে সহজভাবেই গ্রহণ করত, যাতে হাত দিত তাতে ছিল সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ, আর এইভাবে তারা আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশি জীবন্ত ছিল। ভারতের পুরাতন সাহিত্য হতেও আমাদের অনেকটা এই প্রকারের ধারণা জন্মে। ভারতে সন্ন্যাসও জীবনের একটা দিকরূপে দেখা দিয়েছিল, যা গ্রীসেও পরে হয়েছিল, কিন্তু এটা অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই দেখা দেয়, সাধারণভাবে নয়। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে পরে জীবনের এই দিক অধিকতর গুরুত্বলাভ করে, কিন্তু জীবনের পটভূমিকায় বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি।

যেমন ভারত ও তেমন গ্রীসে জীবন পূর্ণভাবেই উপভোগ করা চলছিল; তবু একটা অন্তরতর জীবনের শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল। এই থেকে কৌতূহল এবং কল্পনা জাগ্রত হয়, কিন্তু প্রকৃত বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা তত জাগেনি, যতটা হয়েছিল সত্যরূপে গৃহীত কতকগুলি প্রতীতির ভিত্তিতে বিচার ও যুক্তি প্রয়োগের দিকে। বাস্তবিক, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উদ্ভবের পূর্বে সর্বত্রই সাধারণভাবে এইরূপ ঘটেছিল। সম্ভবত, এই অসম্ভবতা অল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তবু সাধারণ লোকেরাও এর প্রভাব লাভ করেছিল, এবং সাধারণের সম্মেলন স্থানে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে দার্শনিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করত। জীবন ছিল সামাজিক, যেমন এখনও ভারতবর্ষে দেখা যায়, বিশেষত পল্লী অঞ্চলে। লোকে বাজারে, মন্দিরে কিংবা মসজিদে, কুয়োতলায়, পঞ্চায়েত ঘরে, অথবা সাধারণের মিলনের ঘর থাকলে সেখানে মিলিত হয়ে দিনের খবর এবং সর্বসাধারণের অভাব অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করে। এইরূপেই পূর্বকালেও লোকমত তৈরি হত ও প্রচারলাভ করত। আর এই সকল আলোচনার জন্য অবসরও যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল।

গ্রীক সংস্কৃতির বহু আশ্চর্য কীর্তির ভিতরে আশ্চর্যতর একটি ছিল, সে হল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সূত্রপাত। এটা যদিচ ঠিক গ্রীসেই হয়নি, হয়েছিল গ্রীক জগতেই, আলেক্জান্দ্রিয়ায়। খৃস্টপূর্ব ৩৩০ হতে ১৩০ পর্যন্ত এই দুই শতাব্দী বৈজ্ঞানিক

উন্নতি ও যন্ত্রণাদির উদ্ভাবনের জন্য বিখ্যাত। এর সঙ্গে তুলনীয় কিছুই ভারতের ইতিহাসে পাওয়া যায় না, বস্তুত আর কোনো দেশেও এরূপ কিছু সপ্তদশ শতাব্দী থেকে দ্রুতগতিতে বিজ্ঞানের উন্নতি আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঘটেনি। এমনকি, বিশাল সাম্রাজ্য, সুবিস্তৃত রাজ্যের উপর নিরুপদ্রব শাসন, গ্রীক সংস্কৃতির সঙ্গে নিকট সংস্পর্শ এবং বহু জাতির বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা হতে শেখবার সুযোগ সত্ত্বেও, বিজ্ঞান, উদ্ভাবন, কি যন্ত্রাদি নির্মাণের ব্যাপারে রোমেও বিশেষ কোনো অবদান দেখা যায়নি। ইউরোপে প্রাচীন সভ্যতা ভেঙে পড়ার পর, মধ্যযুগে, আরবেরাই বিজ্ঞানের শিখাটি প্রজ্জ্বলিত রেখেছিল।

আলেকজান্দ্রিয়াতে যে বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা ও উদ্ভাবন প্রবলভাবে চলেছিল তা সমাজেরই প্রয়োজনে; সমাজ তখন বৃদ্ধির মুখে, আর লোকদের প্রধান কর্ম ছিল সমুদ্রের উপর। এরূপ ভারতেও ঘটেছিল অঙ্কশাস্ত্রে। পাটিগণিত ও বীজগণিতের অনেক প্রক্রিয়া, শূন্যের ব্যবহার, কি স্থানিক মান, সমাজের প্রয়োজনেই, উন্নতিশীল ব্যবসায় ও জটিল ব্যবস্থাদির জন্য উদ্ভাবিত হয়েছিল। তবে একটা সন্দেহ আছে সমগ্র গ্রীস কতখানি বৈজ্ঞানিক প্রেরণা পেয়েছিল। সেখানে জীবন নিশ্চয়ই পূর্ব-রীতিতেই চলেছিল, তবে কতকটা দার্শনিকভাবে, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যোগ ও সামঞ্জস্য আকাঙ্ক্ষা করে অগ্রসর হওয়ার পরিচয়ও ছিল। এইভাবে অগ্রসর হওয়াটা পুরাতন গ্রীস ও ভারতবর্ষ উভয় স্থানেই দেখা গেছে। ভারতের মত গ্রীসেও উৎসব অনুষ্ঠান দিয়ে বছরকে ভাগ করা হত, এবং এইভাবে প্রত্যেক ঋতুকে আহ্বান করার ব্যবস্থা ছিল, আর এর দ্বারা মানুষের জীবনকে প্রকৃতির সকল অবস্থায় তার সঙ্গে একসুরে বেঁধে নেওয়া হত। এখনও এই সকল পর্বগুলি অনুষ্ঠিত হয়—বসন্তে ও শস্যসংগ্রহের সময়ে আনন্দের অনুষ্ঠান, শরতের শেষে আলোর উৎসব, দেওয়ালি, গ্রীষ্মের প্রারম্ভে হোলি, আর মহাকাব্যগুলির বীরদের নামে নানা উৎসব। এখনও কোনো কোনো উৎসবে নাচ গান হয়ে থাকে, যেমন রাসলীলার লোকসঙ্গীত ও লোক-নৃত্য; গোপীদের নিয়ে কৃষ্ণের নৃত্য।

প্রাচীন ভারতে, রাজপরিবার ও সম্ভ্রান্তবংশ ভিন্ন অন্যত্র নারীদের জন্য অবরোধ প্রথা ছিল না। বোধহয় তখন নরনারীকে পৃথক করে রাখার ব্যবস্থা ভারতবর্ষ অপেক্ষা গ্রীসেই বেশি ছিল। সুখ্যাতা ও বিদুষী নারীর কথা প্রায়ই ভারতীয় পুরাতন গ্রন্থে পাওয়া যায়, আর তাঁরা অনেক সময় প্রকাশ্য বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন। গ্রীসে, বাইরে থেকে যতটা বোঝা যায়, বিবাহটা চুক্তির ব্যাপার ছিল, কিন্তু ভারতে চিরদিনই ধর্ম-সংস্কার বলে বিবেচিত হয়েছে, যদিচ অন্যরূপ বিবাহেরও উল্লেখ আছে।

ভারতবর্ষে গ্রীক নারীর আদর ছিল। পুরাতন নাটকে পাওয়া যায় প্রায়ই রাজসভায় কিঙ্করীরা গ্রীক হত। ব্রোচ বন্দরে গ্রীস থেকে আমদানির তালিকায় পাওয়া গেছে, 'গানের বালক ও সুন্দরী কিশোরী।' মেগাস্থিনিস মৌর্যরাজা চন্দ্রগুপ্তের বিষয়ে বলতে গিয়ে লিখেছেন, 'রাজার আহার্য স্ত্রীলোকেরা প্রস্তুত করত এবং তারা তাঁকে সুরাও যোগাত। তখন ভারতীয়েরা খুব সুরা ব্যবহার করত।' এই সুরার কিছু কিছু

নিশ্চয়ই গ্রীস কিংবা গ্রীসের কোনো কোনো উপনিবেশ থেকে আসত, কারণ পুরাতন তামিল কবিতায় পাওয়া গেছে, 'যবনদের (আইয়োনিয়ান্ বা গ্রীক) দ্বারা তাদের উত্তম উত্তম জাহাজে আনীত শীতল ও সুগন্ধি সুরা।' একটি গ্রীক বিবরণী হতে জানা যায় যে পাটলিপুত্রের রাজা (সম্ভবত অশোকের পিতা বিন্দুসার) অ্যান্টিওকাসকে সুমিষ্ট সুরা, শুষ্ক ডুমুর ও একজন "সফিস্ট" দার্শনিক কিনে পাঠাতে অনুরোধ করে লিখেছিলেন। অ্যান্টিওকাস উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমরা ডুমুর ও সুরা পাঠাব, কিন্তু গ্রীসের আইনে "সফিস্ট" বিক্রয় করা নিষিদ্ধ।'

গ্রীক সাহিত্য হতে জানা যায় যে সমকামিতা নিন্দনীয় ছিল না। এমনকি তা একরূপ অনুমোদিতই ছিল। সম্ভবত সমাজে নরনারীকে যৌবনে পৃথক করে রাখার ব্যবস্থা ছিল বলে এটা ঘটেছিল। ইরানের এবং পারস্য সাহিত্যে এইরূপ মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে। সেখানে প্রিয় ব্যক্তিকে পুরুষরূপে দেখানই রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে এরূপ কিছু দেখা যায় না। আর সমকামিতা ভারতে কোনোদিনই অনুমোদন পায়নি, এবং কখনওই ব্যাপ্তিলাভ করেনি।

গ্রীক ও ভারতবর্ষের মধ্যে সংস্পর্শ ইতিহাস লেখার প্রথম থেকেই ছিল, আর পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ ও গ্রীক-প্রভাবান্বিত পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে নিকটতর সংস্পর্শের কথা জানা যায়। মধ্য-ভারতের উজ্জয়িনীর জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত পরীক্ষাগারটির সঙ্গে মিশরের আলেক্জান্দ্রিয়ার যোগ ছিল। এই দীর্ঘকালের সংস্পর্শে এই দুই প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে চিন্তা ও সংস্কৃতির বহু আদান প্রদান ঘটেছিল। একখানি গ্রীক পুস্তকে একটি পুরাতন কাহিনী আছে যে কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিতব্যক্তি সক্রেটিসের কাছে এসে তাঁকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। পাইথাগোরাস বিশেষভাবে ভারতীয় দর্শনের প্রভাবলাভ করেছিলেন। অধ্যাপক এইচ. জি. রলিন্সন বলেছেন : 'পাইথাগোরাসের মতাবলম্বীরা ধর্ম, দর্শন-ও গণিত সম্বন্ধে যে সকল অনুমিতি ব্যবহার করেছেন সেগুলি খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে জানা ছিল।' আরউইক্ নামে একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত ভারতীয় চিন্তার ভিত্তিতে প্লেটোর 'রিপাব্লিক' গ্রন্থের ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন।* আধ্যাত্মিক বিষয়ের রহস্যগুলির আলোচনায়, অর্থাৎ গূঢ়তত্ত্বে, স্পষ্টরূপেই প্লেটোর ও ভারতীয় দর্শনের অনেক মূলসূত্রকে মিশিয়ে এক করার চেষ্টা করা হয়েছে। সম্ভবত, খৃস্টীয় অব্দের প্রারম্ভে টিয়ানার দার্শনিক অ্যাপোলোনিয়াস তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন।

প্রসিদ্ধ পর্যটক পণ্ডিত অ্যাল্‌বেরুনি মধ্য-এশিয়ার খোরাসানে পারস্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বোগ্দাদে মুসলমান ধর্মের আরম্ভের দিকে, গ্রীক দর্শন অনেকেরই কাছে প্রিয় ছিল। অ্যাল্‌বেরুনি গ্রীক দর্শন অধ্যয়ন করার পর খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে এদেশে এসে ভারতীয় দর্শন অধ্যয়ন করার জন্য সংস্কৃত শিক্ষা করেন। এই দুই

* জিমার্ন তাঁর 'দি গ্রীক কমনওয়েল্থ্' নামক পুস্তকে আর্উইকের পুস্তকের কথা বলেছেন—নাম 'দি মেসেজ অফ প্লেটো' (১৯২০)। আমি এ পুস্তক দেখিনি।

দর্শনশাস্ত্রে অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করে তিনি বিস্মিত হন এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর পুস্তকে এই দুইটি সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করেন। তিনি গ্রীক ও রোমান জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে সংস্কৃত পুস্তকেরও উল্লেখ করে গেছেন।

গ্রীক ও ভারতীয় সভ্যতা সংস্পর্শে আসায় একের উপর অন্যের প্রভাব অল্পবিস্তর না হয়ে পারেনি, কিন্তু এদের প্রত্যেকটিই নিজের বিশেষত্ব রক্ষায় এবং আপন পথে উন্নতিলাভের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিসম্পন্ন ছিল। আজকাল সব বিষয়কেই আর গ্রীস কি রোম থেকে পাওয়া গেছে এরূপ বলা হয় না। একটা প্রতিক্রিয়া এসে পড়েছে। এখন এশিয়ার, বিশেষত ভারতবর্ষের, দান সম্বন্ধে মানুষের দৃষ্টি খুলেছে। অধ্যাপক টার্ন বলেন 'মোটামুটি দেখতে গেলে, এশিয়াবাসীরা যা গ্রীকদের কাছ থেকে নিয়েছিল তা বাইরের বিষয়, বহিরঙ্গমাত্র—লোকপ্রতিষ্ঠান ভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কিছুই নেয়নি—আর অন্তরবৃত্তিঘটিত কিছুই নেয়নি, কারণ এশিয়ার জানাই ছিল যে এবিষয়ে সে গ্রীকদের অপেক্ষাও দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারবে, আর তা পেরেছিলও।' আবার বলেছেন, 'ভারতীয় সভ্যতা গ্রীক সভ্যতা হতে শক্তিতে ন্যূন ছিল না। কিন্তু, ধর্ম বিষয়ে ছাড়া ব্যাবিলোনিয়া যেমন গ্রীক সভ্যতার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল তেমন করতে পারেনি; তথাচ, ভারতবর্ষ যে এই দুইয়ের মধ্যে অধিক শক্তিসম্পন্ন ছিল এরূপ মনে করার কারণ পাওয়া যেতে পারে।' 'বুদ্ধের প্রতিমূর্তির কথা বাদ দিলে, গ্রীকদের থাকা বা না থাকায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূলগত বিষয়গুলিতে কোনো তারতম্য ঘটত না।'

মূর্তিপূজা যে গ্রীস থেকে ভারতবর্ষে এসেছে একথা ভাবাও কৌতূহলকর। বৈদিক-ধর্ম সকল প্রকার প্রতিমা ও মূর্তিপূজার বিরোধী ছিল। দেবদেবীর জন্য কোনো মন্দিরও ছিল না। ভারতের আরও পুরাতন ধর্মমতে হয়তো মূর্তিপূজার কোনো চিহ্ন থাকতে পারে, কিন্তু তা নিশ্চয়ই ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হত না। প্রথমদিকে বৌদ্ধধর্ম এর অত্যন্ত বিরোধী ছিল, এবং বুদ্ধের প্রতিমা কি প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু আফগানিস্থানে ও সীমান্তের নিকটবর্তী প্রদেশে গ্রীক-শিল্পের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ধীরে ধীরে তা কার্যকরীও হয়ে উঠেছিল। তবু, প্রথমে বুদ্ধের মূর্তি প্রস্তুত হয়নি, কিন্তু বোধিসত্ত্বের (অর্থাৎ বুদ্ধের পূর্ব পূর্ব জন্মের কল্পিত রূপের) মূর্তি অ্যাপোলোর মূর্তির অনুকরণে প্রস্তুত হয়েছিল। এর পর বুদ্ধের মূর্তি ও প্রতিকৃতি প্রস্তুত হয়ে থাকে। এই থেকে হিন্দুধর্মের কোনো সম্প্রদায়ে মূর্তিপূজা, অর্থাৎ প্রতিমাপূজা, উৎসাহ লাভ করে, যদিচ বৈদিকধর্ম এর থেকে মুক্ত হয়েই চলছিল। পারস্য ও হিন্দি ভাষায় প্রতিমা কিংবা প্রতিমূর্তি বোঝাতে 'বুত' শব্দ এখনও ব্যবহৃত হয়, আর এ শব্দটি এসেছে বুদ্ধ শব্দ থেকে।

জীবন, প্রকৃতি ও বিশ্ব এই সব বিষয়ে ঐক্য অনুসন্ধান করায় মানবমনের অনুরাগ দেখা যায়। এই আকাঙ্ক্ষা সমর্থনযোগ্য হোক বা না হোক মনের একটা অপরিহার্য প্রয়োজন পূর্ণ করে। অতীতের দার্শনিকেরা বরাবর এরই সন্ধান করেছেন, এমনকি আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও এই প্রেরণাদ্বারা চালিত হন। আমাদের সকল পরিকল্পনা,

আমাদের শিক্ষাবিষয়ক এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাগুলির কারণ এই ঐক্য ও সামঞ্জস্যের অনুসন্ধান। এখন আমাদের কোনো কোনো সুযোগ্য চিন্তাশীল ও দার্শনিক ব্যক্তিরা বলেন যে এই মৌলিক ধারণাটিই মিথ্যা, বিশ্ব দৈবাৎ অপ্রত্যাশিত-ভাবে সৃষ্ট এবং এতে ঐক্য কি সামঞ্জস্য বলে কিছু নেই। তাই না হয় হল, কিন্তু এই ভুল বিশ্বাস থেকে (যদি তা ভুলই হয়), আর ভারতে, গ্রীসে এবং অন্যত্রও ঐক্যের যে সন্ধান করা হয়েছে, তা হতে প্রত্যক্ষ ফলই পাওয়া গেছে, এবং ঐক্য ও স্থৈর্যলাভ ঘটেছে, জীবনও সমৃদ্ধ হয়েছে।

৮ : প্রাচীন ভারতে নাট্যশালা

ইউরোপীয়রা ভারতীয় নাটক আবিষ্কৃত হতেই কথা উঠল যে এর উদ্ভব হয়েছিল গ্রীক নাটক থেকে, অথবা গ্রীক নাটক একে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। এরূপ কথা ওঠার কিছু কারণ এই ছিল যে তখন পর্যন্ত আর কোনো প্রাচীন নাটকের অস্তিত্ব জানা ছিল না, আর আলেকজান্ডারের অভিযানের পর ভারতের সীমান্তে গ্রীকরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই রাজ্য কয়েক শতাব্দী ধরেই চলেছিল, আর গ্রীক নাটকের অভিনয়ও সেখানে নিশ্চয়ই হয়ে থাকবে। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই প্রশ্নটি নিয়ে অনেক বাদবিতণ্ডা চালিয়েছেন এবং অনুসন্ধান করেছেন। এখন একথা সকলের দ্বারা গৃহীত হয়েছে যে ভারতীয় নাট্যশালা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনভাবেই উৎপন্ন—এর ভাব ও উন্নতি ভারতের নিজস্ব। ঋগ্বেদের গান ও কথোপকথনগুলিতেও এর সূত্রপাত ধরা পড়ে, কারণ সেগুলিতে কিছু নাটকীয় ভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণ এবং মহাভারতে নাটকের উল্লেখ আছে। কৃষ্ণকাহিনীর গান, বাদ্য ও নাচে নাটক রূপ গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ কি সপ্তম শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণকার পাণিনি কতকগুলি নাট্যরূপ উল্লেখ করেছেন।

নাট্যকলা বিষয়ক গ্রন্থ 'নাট্যশাস্ত্র' খৃস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী হতে প্রচলিত আছে শোনা যায়। এই গ্রন্থ এর পূর্বের এই বিষয়ের আরও অনেক গ্রন্থের উপরে লিখিত বলে মনে হয়। যখন নাট্যকলা পূর্ণরূপ নিয়েছে এবং প্রকাশ্য অভিনয়াদি চলেছে তখনই এরূপ গ্রন্থ লেখা হতে পারে। এর আরও আগে নিশ্চয়ই নাট্য সাহিত্য গড়ে উঠেছিল এবং এটা নিশ্চয়ই কয়েক শতাব্দীর ক্রমিক উন্নতির পরে লিখিত। বেশিদিন নয়, ছোটনাগপুরের রামগড় পাহাড়ে খননের ফলে খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর একটি পুরাতন নাট্যঘর পাওয়া গেছে। এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার কথা যে নাট্যশাস্ত্রে যে প্রেক্ষাঘরের সাধারণ বর্ণনা আছে, তার সঙ্গে এই নাট্যশালাটি মিলে যায়।

এখন লোকে বিশ্বাস করছে খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সংস্কৃত নাটক রীতিমতই চলত তবে কোনো কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি এই তারিখকে আরও পিছিয়ে পঞ্চম শতাব্দীতে নিয়ে যেতে চান। যে সমস্ত নাটক আমরা পেয়েছি তাতে আরও পুরাতন গ্রন্থকার ও নাটকের উল্লেখ আছে, কিন্তু আমরা এই সকল লেখক ও তাঁদের গ্রন্থের

সন্ধান এখনও পাইনি। এইরূপ একজন লেখক ছিলেন ভাস; তাঁর পরবর্তী নাটককারেরা তাঁর খুব প্রশংসা করে গেছেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁর তেরোখানি নাটক আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্ভবত, সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সংস্কৃত নাটক যা পাওয়া গেছে তা হল অশ্বঘোষের লেখা। ইনি খৃস্টীয় অব্দের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে কি পরে জীবিত ছিলেন। এগুলি প্রকৃতপক্ষে তালপাতায় লেখা পাণ্ডুলিপির টুকরামাত্র, আর আশ্চর্যের বিষয় এগুলি পাওয়া গেছে গোবি মরুভূমির কিনারায়, তুরফানে। অশ্বঘোষ একজন ধার্মিক বৌদ্ধ ছিলেন এবং বুদ্ধচরিত নামে বুদ্ধের জীবনী লিখে গেছেন। এই গ্রন্থ বহুকাল ধরে ভারত, চীন ও তিব্বতে আদৃত হয়ে আসছে। বহুযুগ আগে একজন ভারতীয় পণ্ডিতদ্বারা চীন ভাষায় এর অনুবাদটি প্রস্তুত হয়।

এই সকল আবিষ্কার হতে ভারতীয় নাটকের ইতিহাস সম্বন্ধে পণ্ডিতদের ধারণা বদলে গেছে, আর মনে হয় আরও তথ্য যখন আবিষ্কৃত হবে তখন ভারতের সংস্কৃতির এই মনোহর দিকটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সীল্‌ভ্যাঁ লেভী তাঁর 'ল্য থিয়াটর্‌ ইণ্ডিয়েঁ' গ্রন্থে লিখেছেন, 'সভ্যতার প্রথম অবস্থায় নাট্যসাহিত্য সভ্যতার অবস্থাবিশেষকে প্রকাশিত করে। নাটক যে-জিনিস পাঠক ও দর্শকসাধারণের কাছে তুলে ধরে, সে হল বাস্তব জীবনের একটা সত্যকার রূপ। এই সত্যটি হয়তো নানারূপে ও নানাভাবে প্রকাশ পায়। পরিহারযোগ্য নানারূপ অবান্তর ব্যাপার, নৈতিক উপদেশ, রূপক প্রভৃতি নাটকে প্রবেশ করে। ভারতীয় নাটকের বিশেষত্ব হল এই যে নাট্যকলা নিয়ে যত রকম পরীক্ষা চালান উচিত ভারতীয় নাট্যবিদ তা করেছেন। নীতি উপদেশ আচার অনুষ্ঠান সবই ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে স্থান পেয়ে এসেছে।'

১৭৮৯ অব্দে কালিদাসের শকুন্তলার স্যর উইলিয়াম জোন্‌সকৃত অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদ পুস্তক থেকে সর্বপ্রথম ইউরোপ ভারতের প্রাচীন নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে জানতে আরম্ভ করে। এই আবিষ্কারের ফলে ইউরোপের শিক্ষিত সমাজে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়, পর পর বইটিব কয়েকটি সংস্করণই ছাপতে হয়। স্যর উইলিয়ামের ইংরেজী অনুবাদ থেকে জার্মাণ, ফরাসী, দিনেমার ও ইতালীয় ভাষাতেও অনুবাদ বের হয়। গ্যেটে শকুন্তলা পড়ে বিস্মিত হন এবং তার উচ্চ প্রশংসা করেন।* সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের রীতি অনুসারে কালিদাসের শকুন্তলানাটকের প্রারম্ভে একটি প্রস্তাবনা আছে। শোনা যায় গ্যেটের 'ফাউস্ট' নাটকে যে প্রস্তাবনা আছে তা নাকি কালিদাস

* ভারতীয় লেখকদের মধ্যে একটা অভ্যাসদোষ আছে, আমিও তা থেকে মুক্ত নই। তাঁরা সচরাচর প্রাচীন ভারতের সাহিত্য ও দর্শনের প্রশংসার নজীরস্বরূপ ইউরোপীয় পণ্ডিতদের লেখা উদ্ধৃত করেন। এই সাধুবাদের ঠিক উলটো নজীর খুব সহজেই ইউরোপীয় লেখকদের বই থেকে দেওয়া চলে। খৃস্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা হঠাৎ ভারতীয় চিন্তা ও দার্শনিক মত আবিষ্কার করে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। তখন তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে ভারত এমন কিছু দিতে পারে যা ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে নেই। তারপর এল প্রতিক্রিয়া, সমালোচনা ও অনাস্থা। কেউ কেউ

থেকে অনুকৃত। কালিদাসকে সংস্কৃত সাহিত্যের কবি সার্বভৌম ও নটচূড়ামণির আসন দেওয়া হয়। অধ্যাপক সীলভ্যাঁ লেভি বলেছেন, 'ভারতীয় কাব্য সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম হল কালিদাসের—এই সাহিত্যের সবটুকু সৌন্দর্য যেন তাঁর কাব্যে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। কালিদাসরচিত নাটক, মহাকাব্য, বিয়োগান্ত কবিতা আজও তার প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করছে—কি বিরাট সেই প্রতিভা—যেমন তার গভীরতা ও প্রসার, তেমনি তা সাবলীল। সরস্বতীর বরপুত্রদের মধ্যে একমাত্র কালিদাসই এমন কাব্য রচনা করে গেছেন যা কেবলমাত্র ভারতের নয়—সমস্ত বিশ্বের। ভারত তাঁর কাব্য নিয়ে গৌরব অনুভব করে, বিশ্ব এই কাব্যের মধ্যে আপনাকে দেখতে পায়। অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ যেদিন সৃষ্ট হয় সেদিন উজ্জয়িনীর আকাশ বাতাস কবির প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিল—আজ বহু শতাব্দী পরে ঠিক সেইরূপ প্রশংসা শুনতে পাচ্ছি পৃথিবীর অপর প্রান্তে—সুদূর পাশ্চাত্যে। যেদিন থেকে উইলিয়াম জোন্স কালিদাসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটালেন সেদিন থেকে স্তুতির আর বিরাম নেই। প্রতিভার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে কালিদাস তার আপন আসন অধিকার করে আছেন, মানব-হৃদয়ের আনন্দ বেদনা তার কাব্যে স্পন্দিত হচ্ছে। এমন লোককেই বলা চলে ইতিহাস প্রসিদ্ধ লোক—বস্তুতপক্ষে এ'রাই এ'দের জীবনে ও কর্মে ইতিহাসের পটভূমিকা রচনা করে যান।'

শকুন্তলা ভিন্ন কালিদাস আরও অনেক নাটক ও খণ্ডকাব্য রচনা করে গেছেন। তাঁর কালসম্বন্ধে সঠিক জানা যায় না, তবে অনুমান হয় তিনি খুব সম্ভব খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দিকে উজ্জয়িনী নগরীতে গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব-কালে জীবিত ছিলেন। এই চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য আখ্যা গ্রহণ করেন। জনশ্রুতি বলে যে বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় নবরত্নের মধ্যে একটি রত্ন ছিলেন কালিদাস। নিঃসন্দেহে বলা চলে যে সমসাময়িক কালেই তাঁর প্রতিভা স্বীকৃত হয়েছিল ও জীবিত অবস্থাতেই তিনি পূর্ণ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। খুব অল্প লোকেরই সৌভাগ্য হয়

বলতে লাগল যে ভারতীয় দর্শনে কোনো বাঁধনী নেই—তা বিক্ষিপ্ত; ভারতের সমাজব্যবস্থায় জাতিভেদের শক্ত কাঠামো অনেকে অপছন্দ করতে লাগল। স্বপক্ষে ও বিপক্ষে এই দুই প্রতিক্রিয়াই ভারতীয় প্রাচীন লেখার বিষয়ে অসম্পূর্ণ জ্ঞানের দরুন ঘটেছে। স্বয়ং গ্যেটে একমত থেকে অন্য মত গ্রহণ করেছিলেন, এবং যদিও তিনি স্বীকার করে গেছেন যে ভারতীয় সভ্যতা পাশ্চাত্যকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে, তবু এই দূরপ্রসারী প্রভাবের আওতায় আপনাকে ধরা দিতে চাননি। ভারত সম্বন্ধে এই মতাদির দ্বিত্ব ইউরোপের চরিত্রগত হয়ে পড়েছে। সাম্প্রতিক যুগে ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রকৃষ্টতম পরিচয় আমরা পেয়েছি রোমাঁ রোলাঁর মধ্যে। এই মহানুভব ইউরোপীয় মনীষী ভারতীয় চিন্তার গোড়ার কথাটি বন্ধুভাবে সহৃদয়তার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তাঁর কাছে প্রাচী ও প্রতীচী মানবাত্মার অন্তহীন প্রচেষ্টার দুটো বিভিন্ন দিক। এই বিষয়ে শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক মিস্টার আলেক্স আরন্সন তাঁর একটি গ্রন্থে বিশেষ পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

জীবনের সুন্দর ও সুকুমার দিকটি উপভোগ করবার। কালিদাস সে-সুযোগ পেয়েছিলেন, জীবনের রূঢ় ও অমার্জিত দিকের দুঃখ তাঁকে পেতে হয়নি। তাঁর রচনায় জীবনের প্রতি অনুরাগ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উচ্ছ্বাসময় রসানুভূতির পরিচয় দেখতে পাই।

মেঘদূত কালিদাসের দীর্ঘ কাব্যগুলির মধ্যে অন্যতম। কান্তাবিরহকাতর নির্বাসিত যক্ষ বর্ষাসমাগমে নবমেঘকে উদ্দেশ করে বলছে যেন মেঘ তার বিরহবেদনার কথা যক্ষপ্রিয়াকে জানায়—এই হল মেঘদূতের মূল বিষয়বস্তু। আমেরিকান পণ্ডিত রাইডার এই কাব্য ও কালিদাসের প্রতি একটি চমৎকার শ্রদ্ধার্ঘ প্রদান করেছেন। তিনি এই কাব্যের দুটি ভাগের উল্লেখ করে বলেছেন : "পূর্বমেঘ অংশে প্রকৃতির বহির্দিকের বর্ণনা, কিন্তু এই বর্ণনায় মানবচিত্তের অনুভূতি বিজড়িত হয়ে রয়েছে। উত্তরমেঘে পাওয়া যায় মানবহৃদয়ের একটি অন্তরঙ্গ ছবি, সে-ছবি প্রকৃতির সৌন্দর্যরসে বিমণ্ডিত হয়ে ফুটে উঠেছে। যাঁরা মূল কাব্যটি পাঠ করেন তাঁদের কারও কারও মন গভীরভাবে স্পর্শ করে পূর্বমেঘ, কারও কারও মন আবার বিচলিত হয় উত্তরমেঘ পাঠ করে। ইউরোপ ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে যা জানতেও পারেনি এবং জানলেও যা ভাল করে উপলব্ধি করতে পারেনি, খৃস্টীয় পঞ্চম শতকেই কালিদাস তা বুঝেছিলেন ও জেনেছিলেন। এ জগৎ মানুষের জন্য সৃষ্ট হয়নি, মানুষ তখনই পূর্ণতালাভ করে যখন সে অতি-মানবীয় সত্তার গৌরব ও মর্যাদা উপলব্ধি করে। কালিদাস এই সত্যটি যে ধরতে পেরেছিলেন এ থেকে তাঁর অভাবনীয় চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপ চিত্তবৃত্তি উচ্চশ্রেণীর কাব্যের জন্যও যেমন আবশ্যক তেমনি আবশ্যক উচ্চাঙ্গ কাব্যের বহিঃসৌষ্ঠবের জন্য। কাব্যরচনার প্রতিভা সচরাচর যে যেখা যায় না এমন নয়, মননশক্তির পরিচয়ও এমন কিছু অসাধারণ নয়। যে জিনিসটি মহার্ঘ্য সে হল এদুটির মধ্যে যোগসুষমা। পৃথিবীতে এরকম যোগাযোগ দশ বারো বারের বেশি ঘটেছে কি না সন্দেহ। কালিদাসের মধ্যে কবি ও মনীষীর এই সুসমঞ্জস মিলনটি ঘটেছিল বলে তাঁকে আনাক্রিঅন, হরেস কি শেলীর দলে ফেলা যায় না, তাঁর স্থান হল সফোক্লিস, ভার্জিল ও মিলটনের সঙ্গে।'

সম্ভবত কালিদাসের বহুপূর্বে আর একটি বিখ্যাত নাটক রচিত হয়েছিল—সে হল শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক। মৃচ্ছকটিকের মধ্যে একটা এমন সুকুমার ভাব আছে যা থেকে মনে হয় নাটকটি বোধহয় কিছু পরিমাণে কৃত্রিমতাদুষ্ট। তবু এর মধ্যে এমন একটা বাস্তবতা আছে যা আমাদের মর্ম স্পর্শ করে। এই নাটক থেকে তখনকার দিনের সভ্যতা ও যুগমানসের পরিচয় পাই। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ৪০০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি আর একখানি নামকরা নাটক রচিত হয়, সে হল বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস। এখানি নিছক রাজনৈতিক নাটক, এতে কোনো প্রেমের গল্প কিংবা পৌরাণিক কাহিনী নেই। এই নাটকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালের কথা আছে, নাটকের নায়ক হলেন স্বয়ং চন্দ্রগুপ্তের প্রধান আমাত্য অর্থশাস্ত্ররচয়িতা চাণক্য। মুদ্রারাক্ষসের কোনো কোনো অংশ আজকের দিনেও বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

সম্রাট হর্ষ যিনি খৃস্টীয় সপ্তম শতকে একটি নূতন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, নাট্যকার হিসাবে তাঁরও যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। হর্ষরচিত তিনখানি নাটকের সন্ধান পাওয়া গেছে। ৭০০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সংস্কৃত সাহিত্যাকাশে আর একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হয়—তিনি হলেন ভবভূতি। এ'র লেখার প্রধান সৌন্দর্য ভাষার ঝঙ্কারে, সুতরাং ভবভূতির কাব্য সহজে অনুবাদ করা যায় না। এ'র কাব্য ভারতে বিশেষ আদৃত, কালিদাসের নিচেই হল ভবভূতির স্থান। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক উইলসন বলতেন, "ভবভূতি ও কালিদাসের কাব্যের মত এমন মধুর গম্ভীর চমৎকার ভাষা ধারণার অতীত।"

শতাব্দীর পর শতাব্দী সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ধারা অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হয়েছে। তবে লক্ষ্য করা যায় যে নবম শতাব্দীর গোড়ার দিকে নাট্যকার মুরারির পর যে সব নাটক লেখা হয়েছে, তার মধ্যে পূর্বেকার উৎকর্ষ আর নেই। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই ক্রমিক ক্ষয় ও অধঃপতনের পরিচয় দেখতে পাওয়া যায়। কেউ কেউ অনুমান করেন যে নাট্যকাব্যের এই অধোগতির অন্যতম কারণ ছিল যে ভারতে পাঠান ও মুঘল শাসনকালে রাজশক্তির কাছ থেকে এরূপ সাহিত্য যথাবিহিত আনুকূল্য লাভ করেনি। হিন্দুদের জাতীয় ধর্মের সঙ্গে নাট্যকলার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকায় ইসলামের গোঁড়া মনোবৃত্তি এই সাহিত্যপ্রচেষ্টাকে সমর্থন করেনি। জনপ্রিয় হলেও এই নাট্যসাহিত্য ছিল উচ্চশ্রেণীর, এর প্রধান নির্ভর ছিল অভিজাতশ্রেণীর রসগ্রাহীদের পৃষ্টপোষকতার উপর। যাই হোক, এই সব আনুমানিক যুক্তি যে খুব সারবান তা মনে হয় না, তবে সমাজের উচ্চতর স্তরে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটলে, জীবনের সকল বিভাগে তার পরোক্ষ প্রভাব বিস্তৃত হবে—এতে আর আশ্চর্য কি। বাস্তবিক পক্ষে রাজনৈতিক পরিবর্তন সূচিত হবার অনেক আগেই নাট্যসাহিত্যে উৎকর্ষের অভাব ঘটেছিল। আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। এই সব রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছিল কয়েক শতাব্দী ধরে উত্তর-ভারতে। নাট্যকাব্যের জীবনীশক্তি যদি পূর্বের মত বলবৎ থাকত তা হলে দক্ষিণ-ভারতে এই কাব্যসৃষ্টির কোনো তো বাইরের বাধা ছিল না। পাঠান, তুর্কি ও মুঘল রাজাদের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে দুএকটা শুচিতাগ্রস্ত যুগ ছাড়া বৈদেশিক শাসকেরা অধিকাংশ সময়ে ভারতীয় সংস্কৃতিকে উৎসাহ দান করে গেছেন। মুসলমান রাজদরবারে ভারতীয় সঙ্গীত সম্পূর্ণরূপে এবং বিশেষ আগ্রহের সঙ্গেই গৃহীত হয়েছিল। এই সঙ্গীতে পারদর্শী অনেক ওস্তাদই ছিলেন মুসলমান। কাব্য ও সাহিত্যও মুসলমান রাজাদের কাছে সমাদর পেয়েছে। হিন্দীভাষায় বিখ্যাত কবিদের মধ্যে অনেক মুসলমানের নাম পাওয়া যায়। বিজাপুরের শাসনকর্তা ইব্রাহিম আদিল শা হিন্দীতে ভারতীয় সঙ্গীতের উপর একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন। ভারতীয় কাব্য ও সঙ্গীতে হিন্দু দেবদেবীদের নামের ছড়াছড়ি, তবু সেগুলি অবাধে স্বীকৃত হয়েছিল এবং পুরাতন পুরাণকাহিনী কিংবা রূপক অবাধে চলত। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এক কেবল প্রতিমারচনা ছাড়া, ইতস্তত দু'একটি সামান্য ব্যতিক্রম ব্যতীত মুসলমান রাজারা ভারতের কোনো কলারূপকে চেপে রাখতে চাননি।

সংস্কৃত নাটকের অধোগতির অন্যতম কারণ হল ভারতের সাহিত্যিক জীবনে সাহিত্যসৃজন ক্ষমতার হ্রাসপ্রাপ্তি ও অন্যান্য নানাদিক দিয়ে জাতীয়জীবনে অধঃপতন। পাঠান ও তুর্কি রাজারা দিল্লীর মসনদে বসবার আগেই এই অধোগতি শুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিদগ্ধ ব্যক্তিদের পাণ্ডিত্য প্রকাশের ভাষারূপে সংস্কৃত ও পারসিক ভাষার মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার ভাব দেখা গিয়েছিল অবশ্য। কিন্তু সংস্কৃত নাটকের নিম্নগামী হবার কারণ তা নয়; এর প্রধান কারণ হল নাটকের ভাষার সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক ভাষার মধ্যে ক্রমবর্ধমান তফাত। ১০০০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি তদানীন্তন চলিত ভাষাগুলি (যা থেকে আমাদের আধুনিক ভাষাগুলি জন্মেছে) সাহিত্যের ভাষারূপে স্বীকৃত হতে আরম্ভ করে।

তবু এই সব নানা প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও, কেমন করে যে সংস্কৃত নাটক সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে বর্তমানকাল অবধি রচিত হয়ে এসেছে—একথা ভাবতে বিস্ময় লাগে। ১৮৯২ খৃস্টাব্দে সংস্কৃতে সেক্সপীয়ারের 'মিডসামার নাইট্‌স ড্রীম' প্রকাশিত হয়। পুরাতন নাটকের পাণ্ডুলিপি এখনও অবধি প্রায়ই আবিষ্কৃত হচ্ছে। অধ্যাপক সীলভ্যাঁ লেভি ১৮৯০ খৃস্টাব্দে যে পাণ্ডুলিপি-তালিকা প্রস্তুত করেন তাতে দেখা যায় ১৮৯ বিভিন্ন লেখকের লেখা ৩৭৭টি নাটকের নাম আছে। সম্প্রতি প্রস্তুত একটি তালিকায় ৬৫০টি নাম পাওয়া যায়।

কালিদাস প্রভৃতির নাটকের ভাষা ছিল মিশ্রিত—সংস্কৃত এবং কোনো একটি প্রাকৃত অর্থাৎ সংস্কৃতেরই লৌকিকরূপ। কোনো কোনো নাটকে শিক্ষিত লোকেরা সংস্কৃতে এবং অশিক্ষিত লোকেরা ও স্ত্রীলোকেরা সচরাচর প্রাকৃত ভাষায় কথা বলে। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। নাটকের বহুলাংশ হল পদ্য ও গীতিকবিতা—এগুলি সবই সংস্কৃতে লেখা। এরূপ মিশ্রিত ভাষা ব্যবহারের ফলে নাটকগুলি লোকসাধারণের বোধগম্য হত বলে মনে হয়। এটা যেন সাহিত্যিক ভাষার সঙ্গে লোকবিনোদনের একটা আপোষনিষ্পত্তির মত। তবু মূলত প্রাচীন নাটক রাজসভা কিংবা ঐরূপ কোনো বিদগ্ধ অভিজাতশ্রেণীর জন্যই রচিত হত। সীল্‌ভ্যাঁ লেভি বলেন যে এদিক থেকে ফরাসী ট্র্যাজেডির সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের একটা মিল আছে। এই সকল ট্র্যাজেডির বিষয় নির্বাচনে না থাকত সাধারণ মানুষের সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ, না থাকত বাস্তবিক জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ। এরূপ সাহিত্য একটা কৃত্রিম সমাজ থেকে উদ্ভূত—অন্যদিক থেকে তেমনি বলা যায় যে সামাজিক জীবনের কৃত্রিমতার জন্য এরূপ সাহিত্য বহুলাংশে দায়ী।

এই উচ্চস্তরের সাহিত্যিক নাটক ছাড়াও আর এক ধরনের নাটক ছিল লোকরঞ্জনের জন্য। এ-সব নাটক রচিত হত পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের গল্পকে ভিত্তি করে—আখ্যানবস্তু থাকত সর্বজনবিদিত আর এসব নাটকে সাহিত্যিক অংশের চাইতে বেশি থাকত সাজপোশাক ইত্যাদি বহিঃপ্রকাশের উপাদান। এই নাটকের ভাষা হত ভিন্ন ভিন্ন জনপদের ভাষা, কাজে কাজেই এর অভিনয় সেই সেই জনপদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকত। সংস্কৃত ভাষার একটা সুবিধা ছিল—সংস্কৃত ছিল সর্বভারতের

শিক্ষিত সমাজের ভাষা, সুতরাং সংস্কৃত নাটকের কদর ছিল সমস্ত দেশজোড়া।

একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে সংস্কৃত নাটকগুলি অভিনয়ের জন্য বিশেষভাবে রচিত হত—রঙ্গমঞ্চে কুশীলবদের প্রবেশ, নিষ্ক্রমণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক নানাবিধ নির্দেশ তো দেওয়া হতই, অনেক সময় দর্শকদের আসন পরিগ্রহণ বিষয়েও নিয়ম থাকত। প্রাচীন গ্রীসে অভিনেত্রীর রেওয়াজ ছিল না, সংস্কৃত নাটকে তার ব্যতিক্রম দেখি। গ্রীক ও সংস্কৃত উভয় ভাষার নাটকেই নৈসর্গিক প্রকৃতির নিত্য উপস্থিতি সম্বন্ধে একটা সুকুমার উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, মানবসমাজ যেন প্রকৃতির সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। গীতিকবিতা নাট্যসাহিত্যের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই কাব্যের তাৎপর্য গভীর, জীবনের সঙ্গে এর সম্বন্ধ নিবিড়। এই কবিতাগুলি প্রায়ই সুর-সহযোগে আবৃত্তি করা হত। গ্রীক নাটকের সঙ্গে সংস্কৃতের সৌসাদৃশ্য অনেক—অনেক আচার ব্যবহার, মানসজীবন ও বহির্জীবনের অনেক প্রকাশ উভয় ভাষাতেই একই-রূপে দেখা যায়। গ্রীক নাটক পড়তে পড়তে হঠাৎ মনে হয় ভারতের কথা পড়ছি না তো! এসব সাদৃশ্য সত্ত্বেও গ্রীক নাটক মূলত সংস্কৃত নাটক থেকে বহুলাংশে ভিন্ন।

গ্রীক নাটকের মূল ভিত্তি হল দুঃখ শোক পাপ ও তাপের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ দুঃখ পায় কেন? কেন পৃথিবীতে পাপের স্থান? সকল ধর্মের অন্তিম লক্ষ্য ঈশ্বর কি? কি অসহায় দুর্ভাগ্য এই মানুষ, ক্ষণিকের সন্তান এই মানুষ! কি উদ্দেশ্য-হীন লক্ষ্যহীন অন্ধ বিদ্রোহ তার পরাক্রান্ত অদৃষ্টদেবতার বিরুদ্ধে—'চিরন্তন অপরিবর্তনেয় নীতি যুগ যুগ ধরে এক অবিসংবাদী সত্য......' দুঃখ পেয়েই মানুষের শিক্ষা, যদি তার কপাল ভাল থাকে তাহলে সে সংগ্রামের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে :

ক্লান্ত সমুদ্র পার হয়ে
ঝঞ্ঝা কবলমুক্ত বন্দরে
যে তার জাহাজ ভিড়াল
সেই সুখী।
সংগ্রাম সংঘর্ষের ঊর্ধ্বে উঠেছে
যে মুক্ত পুরুষ
সেই সুখী।
বিচিত্র কারুকারী জীবনের শিল্পে।
বিত্ত ও শক্তির ক্ষেত্রে
এখানে ভাই ভায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী।
অগণিত নরনারী ভেসে চলে জীবনসমুদ্রে
ঘূরপাক খায় অসংখ্য আশার আবর্তে।
কেউ লক্ষ্য সন্ধান করে পায়, কেউ বা পায় না
আশার সমাধি ঘটে উৎকণ্ঠা বিধুর জীবনে।
বহে যায় দীর্ঘদিন
তারই কোনো ফাঁকে যে জানতে পারে

বেঁচে থাকাটাই আনন্দ
সেই সুখী।

দুঃখের সংঘাতে মানুষ শিক্ষালাভ করে, সে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে শেখে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রহেলিকা প্রহেলিকাই থেকে যায়! মানুষ তার প্রশ্নের মীমাংসা জানতে পারে না, ভাল মন্দের গোলকধাঁধায় কেবলই সে বেঘোরে ঘুরে মরে।

বহুরূপী প্রহেলিকা,
ঈশ্বরের বিধানে বহু ঘটনা ঘটে
আশা ও আশঙ্কার অতীত।
মানুষ ভাবে এক হয় আর
যেখানে পথের চিহ্নমাত্র ছিল না
সেখানেই সে তার পথ খুঁজে পায়।*

গ্রীক ট্র্যাজেডিতে যে শক্তি, যে সমারোহ দেখা যায়, তার সঙ্গে তুলনীয় সংস্কৃতে কিছুই নেই। বস্তুত ট্র্যাজেডিই নেই, কারণ কোনো নাটকই বিয়োগান্ত কি শোকান্ত-ভাবে শেষ হতে দেওয়া হত না। কোনো মূলগত গভীর সমস্যা ওঠেনি, কারণ নাট্য-কারেরা ধর্ম সম্বন্ধে সাধারণের মত ও ধারণাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। এইগুলির মধ্যে আছে পুনর্জন্ম এবং কার্যকারণ বিষয়ক মতাদি। এখন যা ঘটছে তা কোনো আগেকার জন্মের ঘটনার জন্যই হচ্ছে, আকস্মিকভাবে কিংবা বিনা কারণে কিছুই ঘটে না। যদিচ মানুষের প্রচেষ্টায় কোনো ফল হয় না, তবু কোনো অন্ধশক্তি অন্ধভাবে কাজ করছে, আর মানুষকে এরই বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলতে হচ্ছে, এ কথাও ঠিক নয়। দার্শনিকেরা এবং চিন্তাশীল লোকেরা এই সমস্ত কথায় সন্তুষ্ট হতেন না, তাঁরা সব সময় এইগুলির ভিতরে প্রবেশ করে মূল কারণের অনুসন্ধান করতেন ও পূর্ণতর ব্যাখ্যা চাইতেন। তবে সমাজে জীবন পরিচালিত হত এই সকল বিশ্বাস ও মতের উপর, আর নাট্যকারেরা সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তুলতেন না। ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে নাটক ও কাব্যের মিল ছিল, সুতরাং এদের বিরোধী বড় একটা কেউ হত না। নাটক রচনা সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম ছিল, তা অমান্য করা সহজ ছিল না। অদৃষ্ট কি নিয়তিকে মেনে নেবার ভাবও দেখা যেত না; নায়ক সকল সময়েই সাহসী, সকল প্রকার বিপদের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত এরূপ হত। মুদ্রারাক্ষসে চাণক্যের ভূমিকায় আছে, তিনি অবজ্ঞার সঙ্গে বলছেন, 'মূর্খেরাই বিধাতার উপর নির্ভর করে।' তারা নিজেদের উপর ভরসা না করে আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে থাকে। কিছু কিছু

* অধ্যাপক গিলবার্ট মারে-কৃত ইউরিপিডিস্-রচিত গ্রীক নাটকের অনুবাদ থেকে এই দুটি অংশ উদ্ধৃত হয়েছে। প্রথম কবিতাটি 'দি ব্যাকে' ও দ্বিতীয়টি 'আলসেস্টিস্' থেকে।

কৃত্রিমতাও এসে পড়ে: নায়ক হলেই সে বীর হবেই, আর যে দুর্জন সে প্রায় সকল সময়েই দুর্জনের ন্যায় ব্যবহার করে; মধ্যবর্তী কিছু নেই বললেই চলে।

তবু জোরালো নাটকীয় পরিস্থিতি রচনা করে তোলা হত: দৃশ্য বদলাচ্ছে, পটভূমিকা গড়ে উঠছে স্বপ্নে দেখা ছবির মত, বাস্তব, তবু বাস্তব নয়—আশ্চর্য মনোমুগ্ধকর ভাষায় কবিকল্পনার সাহায্যে যেন সব গেঁথে তোলা হয়েছে। যদিচ বাস্তব ক্ষেত্রে এরূপ নাও হতে পারে, কিন্তু এই সব থেকে মনে হয়, ভারতের জীবন তখন অধিকতর শান্তিপূর্ণ ও স্থায়ী ছিল, যেন তার মূল খুঁজে পেয়েছে, তার সব জিজ্ঞাসার উত্তর মিলেছে। ভারতীয় নাটকে এই ভাবটা বহমান দেখা যায়, কোনো ঝড়, কোনো আন্দোলন উপস্থিত হলে উপরে-উপরে একটু নাড়া দেয় মাত্র, কিন্তু গ্রীক ট্র্যাজেডির ভীষণ দুর্যোগের মত কিছুই এতে নেই। সমস্তই মানবিকতায় পূর্ণ, আর আছে স্নিগ্ধ সৌন্দর্য এবং যথার্থ সামঞ্জস্য। সীলভ্যাঁ লেভি বলেন, ভারতীয় নাটক এখনও পর্যন্ত ভারতীয় প্রতিভার সর্বাপেক্ষা সুখকর উদ্ভাবনা।

অধ্যাপক এ. বেরিডেল্ কীথ বলেন, 'ভারতীয় কবিতার মহত্তম ভাগ সংস্কৃত নাটক; ভারতের সাহিত্য যাঁরা সৃষ্টি করেছেন তাঁরা সাহিত্যকলায় এই উৎকৃষ্ট অবদান রেখে গেছেন।......অনেক বিষয়েই ব্রাহ্মণেরা নিন্দালাভ করেছেন কিন্তু তাঁরাই বুদ্ধির ক্ষেত্রে ভারতকে বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। ব্রাহ্মণেরাই ভারতীয় দর্শনের সৃষ্টিকর্তা, আর তাঁদেরই বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের ফলে সূক্ষ্মভাবব্যঞ্জক নাটক উদ্ভূত হয়েছে।'

১৯২৪ খৃস্টাব্দে নিউইয়র্কে শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকের ইংরাজি অনুবাদ অভিনীত হয়েছিল। 'নেশন' পত্রিকার নাট্যসমালোচক জোসেফ উড্ক্রাচ্ লিখেছিলেন, "যাঁরা অনুমান, আদর্শ প্রভৃতি নিয়ে থাকেন তাঁরা বিশুদ্ধ কলানাট্যের উল্লেখ করেন। যদি কোথাও তার উদাহারণ দেখা যায় এতেই দর্শক তা দেখতে পাবেন। আর এখানে প্রাচ্য জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে সে বিষয়ে অনুধ্যান করতে পারবেন। এ জ্ঞান কোনো সম্প্রদায়ের দ্বারা গোপনে রক্ষিত হয়নি—এ এসেছে চিত্তের কমনীয়তা থেকে, যার গভীরতা ও যাথার্থ্য কঠোর হিব্রুবাদের দ্বারা বিকৃত চিরাগত খৃস্টীয় মতে পাওয়া যায় না। ..... নাটকখানি কৃত্রিমতায় পূর্ণ, কিন্তু তবু গভীরভাবে দর্শকের চিত্তে আলোড়ন আনে, কারণ এ তো বাস্তব নয় এ সত্য।......এর লেখক যিনিই হন না, আর চতুর্থ শতাব্দীর লোক হন কি অষ্টম শতাব্দীর লোক হন, তিনি ছিলেন ভাল, তিনি ছিলেন জ্ঞানী, আর তিনি যে ভাল, তিনি যে জ্ঞানী একথা একজন নীতিবাদীর বাক্য কি মসৃণ লেখনীমুখে আসেনি, এসেছে অন্তর থেকে। যৌবনের নবীন রূপ এবং প্রেমের প্রতি পরিমার্জিত সহানুভূতিতে তাঁর প্রশান্তি মধুর হয়েছে, আর প্রবীণতার সাহায্যে তিনি জেনেছেন যে সুকৌশলে জটিলতা এনে সাজান একটি লঘুভাবের গল্পের ভিতর দিয়ে কোমল মানবিকতা ও মঙ্গল ইচ্ছা প্রকাশ করা যায়।.........এরূপ একখানি নাটক কেবল সেইরূপে সভ্যতা থেকে পাওয়া যেতে পারে যা স্থায়িত্ব লাভ করেছে। যে সভ্যতা চিন্তাদ্বারা তার সকল সমস্যা অতিক্রম করেছে তাই পৌঁছায় এরূপ সরল ও শান্তিপূর্ণ বিষয়ে। 'ম্যাক্বেথ্' এবং 'ওথেলো'কে বিরাট

বলা যেতে পারে, তারা আমাদের চিত্তে আলোড়ন আনে তাও ঠিক, কিন্তু এরা বর্বর শ্রেণীর নায়ক, কারণ সেক্সপীয়ার যে উত্তেজিত চিত্তবিক্ষেপ দেখিয়েছেন তার উৎপত্তি হল নবজাগরিত অনুভূতি এবং অসভ্য যুগ থেকে পাওয়া নৈতিক প্রত্যয়গুলির মধ্যে বিরোধে। আমাদের সময়ের বাস্তব শ্রেণীর নাটকগুলিও এই প্রকার জটিলতায় উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু যখন সমস্যার নিরাকরণ হয়, বুদ্ধির দ্বারা উত্তেজনা প্রশমিত হয়, তখন কেবল রূপটি বাকি থাকে।......প্রাচীন সাহিত্যের পর যে যুগ কেটেছে সেই নিকট অতীতে ইউরোপে এরূপ সম্পূর্ণরূপে সুসভ্য লেখা আমরা দেখতে পাই না।"*

৯ : সংস্কৃতের জীবনীশক্তি ও স্থায়িত্ব

সংস্কৃত একটি আশ্চর্য ভাষা, সমৃদ্ধ, উজ্জ্বল, সকল প্রকার উন্নতির লক্ষণযুক্ত, কিন্তু তবু যথাযথ; দু-হাজার ছশো বছর আগে পাণিনি ব্যাকরণের যে সকল নির্দেশ দিয়ে গেছেন তারই কাঠামোর মধ্যে নির্ভুল অবস্থায় আছে। এ ভাষা ব্যাপকতা লাভ করেছে, অধিকতর সমৃদ্ধ হয়েছে, পূর্ণতা পেয়েছে, অলংকৃত হয়েছে, কিন্তু সকল সময়েই আপন মূলের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে চলেছে। সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির কালে এ ভাষার শক্তির লাঘব ঘটেছে এবং রচনাভঙ্গীর সারল্যও হ্রাস পেয়েছে, আর তা ছাড়া, জটিলতা ও স্ফীত উপমা ও রূপক এসে পড়েছে। ব্যাকরণের নিয়মে শব্দকে সন্ধি ও সমাসবদ্ধ করা যায়; ব্যাকরণবিৎ লেখকের হাতে এটা ভাষাচাতুর্য দেখাবার উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং বহু শব্দ একত্র গ্রথিত করে ছত্রের পর ছত্র লিখিত হয়েছে।

স্যর উইলিয়াম্ জোন্স বহু আগে, ১৭৮৪ খৃস্টাব্দে বলেছিলেন, 'সংস্কৃত যতই পুরাতন ভাষা হোক এর গঠন আশ্চর্য, গ্রীক অপেক্ষা নিখুঁত, ল্যাটিন অপেক্ষাও পর্যাপ্ত, এবং উভয় অপেক্ষা বহু পরিমাণে সুমার্জিত; তবু গ্রীক ও ল্যাটিনের সঙ্গে সংস্কৃতের খুব বেশি মিল আছে—অনেক ক্রিয়াপদের ধাতু এক, অনেক ব্যাকরণসম্মত প্রয়োগও এক—ঐক্য এত যে আকস্মিকভাবে ঘটেছে এরূপ মনে করা যায় না। বস্তুত, কোনো শব্দতাত্ত্বিক এই সব নিয়ে আলোচনা করলে ভাষা তিনটি একই মূল থেকে উৎপন্ন হয়েছে তাঁর এইরূপ বিশ্বাস জন্মাবে।......'

উইলিয়াম্ জোন্সের পরে অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত—ইংরাজ, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি—সংস্কৃত অনুশীলন করে একটি নূতন বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেন—তা তুলনামূলক শব্দতত্ত্ব। জার্মান পণ্ডিতেরা এই পথে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন, আর

* আমি এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি মুদ্রারাক্ষসের আর. এস্. পণ্ডিতকৃত অনুবাদের তাঁরই লেখা মুখবন্ধ থেকে নিয়েছি। এই অনুবাদের সঙ্গে অনেক উপাদেয় টিকা টিপ্পনী ও সংযোজনী দেওয়া হয়েছে। সীলভ্যাঁ লেভির 'ল্য থিয়াট্র্ ইঁডিয়ে' (প্যারিস : ১৮৯০) এবং এ. বেরিডেল্. কীথের 'দি স্যান্স্ক্রিট্ ড্রামা' (অক্সফোর্ড : ১৯২৪), এই দুই গ্রন্থের সাহায্য প্রায়ই নিয়েছি, এবং এদের থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতিও দিয়েছি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষার গবেষণায় এ'দের কৃতিত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক হয়েছে। কার্যত জার্মানির সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই সংস্কৃত বিভাগ ছিল, আর তার ভার থাকত একটি কি দুটি অধ্যাপকের উপর। ভারতীয় পাণ্ডিত্য উপেক্ষণীয় না হলেও, পুরাতন ধরনেরই ছিল—তাতে সমালোচনার ভাব ছিল না, আর আরব ও পারস্য ভাষা ভিন্ন কোনো বিদেশী ভাষার জ্ঞানও তাতে ছিল না। ইউরোপের প্রভাবে ভারতে এক নূতনভাবের পাণ্ডিত্যের উদয় হয়, এবং অনেক ভারতীয় ছাত্র গবেষণার নূতন পদ্ধতি এবং সমালোচনা ও তুলনামূলক আলোচনা শিক্ষার জন্য ইউরোপে, সাধারণত জার্মানিতে যান। এ কাজে ইউরোপীয় অপেক্ষা এ'দের অনেক সুবিধা ছিল, কিছু অসুবিধাও ছিল। অসুবিধা এইজন্য যে পূর্বের অনেক ধারণা, পুরুষ-পরম্পরাগত বিশ্বাস এবং চিরাগত আচরণের জন্য নিরপেক্ষ সমালোচনায় বাধা ঘটত। সুবিধা ছিল অনেক, কারণ ভারতীয় ছাত্রেরা লিখিত বিষয়ের ভিতরের ভাবটি ধরতে পারতেন, আর যে পরিস্থিতিতে গ্রন্থাদি রচিত তার ছবি মনে আনা তাঁদের পক্ষে সহজ ছিল বলে আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে তাঁদের অন্তরের মিল হতে পারত।

ব্যাকরণ ও শব্দতত্ত্বের সঙ্গে তুলনায় ভাষার গুরুত্ব অপরিমেয়। ভাষা একটা জাতির ও তার সংস্কৃতির উত্তরবর্তীদের জন্য রক্ষিত কাব্যময় সম্পদ, আর যে সকল চিন্তা ও কল্পনা তাদের গড়েছে সেগুলির জীবন্ত রূপ। যুগ থেকে যুগে শব্দের অর্থ বদলায়, পুরাতন ভাবধারা নূতন হয়ে ওঠে, পুরাতন পরিচ্ছদ ত্যাগ না করেই। একটি পুরাতন শব্দ কি বাক্যাংশের অর্থ ধরা কঠিন হয়, তার ভাব গ্রহণ করা আরও শক্ত হয়ে ওঠে। তখন সেই পুরাতন অর্থটির, কি যাঁরা অতীতে ভাবটি ব্যবহার করেছেন তাঁদের চিত্তের আভাস লাভ করার জন্য কল্পনা ও কবিত্বের সাহায্যে অগ্রসর হতে হয়। ভাষা যত সমৃদ্ধ ও তার প্রাচুর্য যত অধিক এই অসুবিধা তত বেশি হয়ে থাকে। সংস্কৃত অন্যান্য প্রাচীন ভাষার মতই এমন সব শব্দে পূর্ণ যা কেবল কবিত্বের জন্য সুন্দর তা নয়, সেগুলির গভীর ব্যঞ্জনা আছে, আর আছে তাদের সঙ্গে সংশিলষ্ট বহু ভাব যা বিদেশীয় প্রেরণা ও দৃষ্টিভঙ্গীবিশিষ্ট কোনো ভাষায় অনুবাদ করা যায় না। এমনকি এর ব্যাকরণে এর তত্ত্ববিদ্যায় কবিত্ব প্রবলভাবেই নিহিত আছে; এর একখানি প্রাচীন অভিধান পদ্যে রচিত।

আমাদের মধ্যে যাঁরা সংস্কৃত অধ্যয়ন করেছেন তাঁদের পক্ষেও এই প্রাচীন ভাষার অন্তর্নিহিত ভাবটি অনুভব করা, কিংবা এরই পুরাতন জগতে যে জীবনটি ছিল তার আস্বাদ গ্রহণ করা সহজ নয়। তবু কিয়ৎ পরিমাণে আমরা তা করতে পারি, কারণ আমাদের দেশের ইতিহ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছি, এবং সেই পুরাতন জগৎ আজও আমাদের কল্পনায় লগ্ন হয়ে আছে। ভারতের আধুনিক ভাষাগুলি সংস্কৃত হতে উদ্ভূত ও এই প্রাচীন ভাষা হতে তাদের শব্দসম্ভার ও প্রকাশরূপগুলি পেয়েছে। সংস্কৃত কাব্য ও দর্শনে ব্যবহৃত অনেক উচ্চশ্রেণীর গভীর তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ বিদেশীভাষায় অনুবাদ করা যায় না, কিন্তু সেগুলি এখনও আমাদের সাধারণের ভাষাগুলিতে ব্যবহৃত হয়। আর সংস্কৃত লোকসাধারণের ভাষারূপে বহুদিন হতে

অপ্রচলিত হলেও এখনও আশ্চর্য জীবনীশক্তির পরিচয় দেয়। কিন্তু বিদেশীরা, যত বড় পণ্ডিতই হন, বিশেষ অসুবিধা অনুভব করেন। আক্ষেপ এই যে বিদ্বান ও পণ্ডিত লোকেরা কবি হন না বললেই চলে, কিন্তু কোনো ভাষার স্বরূপ বোঝানোর কাজ কেবল পণ্ডিত-কবিই করতে পারেন। মঁসিয়ে বার্থ-এর মতে, 'ভাষাগত-করে করা অনুবাদেই বিকৃতি ঘটে', এবং এঁদের কাছ থেকে আমরা তাই-ই পাই।

তুলনামূলক শব্দতত্ত্বের আলোচনা অগ্রসর হয়েছে, সংস্কৃত ভাষায় অনেক গবেষণাও চলেছে; কিন্তু এই ভাষাকে কাব্য ও কল্পনামাধুর্যের দিক থেকে বিবেচনা করা হয়নি, সুতরাং এ হিসাবে সবই ব্যর্থ হয়েছে। সংস্কৃত থেকে ইংরাজিতে কি অন্যান্য বিদেশী ভাষায় অনুবাদ বড় একটা দেখা যায় না যাকে যথাযোগ্য, কি মূল নিয়ে বিচার করলে যথাযথ বলা যেতে পারে। ভারতীয় এবং বিদেশীয় উভয়বিধ লোকই বিভিন্ন কারণে এ বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে। এ বড় দুঃখের বিষয় যে জগৎ এমন কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে যা সৌন্দর্যে, কল্পনায় ও গভীর চিন্তনে পূর্ণ, যা কেবল ভারতের চিরাগত সম্পদ নয়, সমগ্র মানবসমাজের।

বাইবেলের অনুমোদিত সংস্করণের অনুবাদকেরা কঠোরভাবে নিয়ম পালন করে ভক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন, এবং এর ফলে তাঁরা যে কেবল একখানি মহাগ্রন্থ প্রস্তুত করেছেন তা নয়, ইংরাজি ভাষার শক্তি ও গৌরবও বাড়িয়ে দিয়েছেন। যুগের পর যুগ ধরে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এবং কবিরা প্রীতির সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য নিয়ে পরিশ্রম করেছেন, এবং বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় সুন্দর সুন্দর অনুবাদ উৎপাদন করেছেন। এরূপে সাধারণ লোকেও ঐসব সংস্কৃতির আস্বাদ কিছু না কিছু পায় এবং তাদের নিরানন্দ একঘেয়ে জীবনে সত্য ও সুন্দরের আভাস লাভ করে। দুর্ভাগ্যের বিষয় সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে এ কাজটি এখনও করা হয়নি। এ যে কখন হবে, এবং একেবারেই হবে কি না জানি না। আমাদের বিদ্বান ব্যক্তিরা সংখ্যায় বাড়ছেন, বিদ্যাতেও বাড়ছেন, আর আমাদের কবিরাও আছেন, কিন্তু এঁদের মধ্যে একটা ফাঁক থেকে গেছে, এবং তা বাড়ছে। আমাদের সৃষ্টির প্রেরণা অন্যদিকে ফিরে আছে, আর জগৎ যে আমাদের উপর নানাদিক থেকে নানা দাবি চালাচ্ছে তাতে অবসরমত প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করার সময় আমাদের নেই। বিশেষভাবে ভারতবর্ষে আমাদের আর একদিকে দৃষ্টি দিতে হবে, এবং যতটা পারা যায় পূর্বের অমনোযোগের ক্ষতি দূর করতে হবে। অতীতে আমরা প্রাচীন সাহিত্যে অত্যধিক ডুবে ছিলাম, আর সৃষ্টির প্রবৃত্তি হারিয়েছিলাম বলে এই সাহিত্যের যা কিছুকে আমাদের অতি আদরের বলে দাবি করতাম তাও আমাদের কোনো অনুপ্রাণনা দিত না। আমার মনে হয়, ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের অনুবাদ বের হতে থাকবে, আর পণ্ডিতেরাও সতর্ক হয়ে দেখবেন সংস্কৃত শব্দ ও নামের বানান যেন শুদ্ধ হয়, যেন নির্ভুল উচ্চারণের জন্য যথা প্রয়োজন চিহ্ন দেওয়া থাকে, আর টিকা টিপ্পনী, ব্যাখ্যা ও তুলনামূলক আলোচনার যেন অভাব না ঘটে। বস্তুত সবই থাকবে, কাজ হবে নির্ভুল, যথাযথ এমনকি একেবারে বিবেকসম্মত, কিন্তু জীবন্ত ভাবটি থাকবে না।

যা একদিন ছিল প্রাণে এবং আনন্দে পূর্ণ, এত সুন্দর, সুমধুর এবং অবাধ কল্পনা দ্বারা সুসজ্জিত তাই হয়ে উঠবে পুরাতন, বৈচিত্র্যবিহীন, নীরস; তাতে যৌবন কি সৌন্দর্যের পরিচয় থাকবে না, থাকবে কেবল পণ্ডিতের অধ্যয়নকক্ষের ধূলো, মধ্যরাত্রিতে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের গন্ধ।

বলতে পারি না সংস্কৃত কতকাল অপ্রচলিত ভাষা হয়েছে, অর্থাৎ কতদিন সাধারণ লোকে এ ভাষায় কথা বলে না। কালিদাসের সময়েও এ সাধারণের ভাষা ছিল না, যদিচ ভারতবর্ষের সর্বত্র শিক্ষিত লোকের ভাষা ছিল। এইভাবে অনেক শতাব্দী চলেছিল, এমনকি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত সংস্কৃতের এইরূপ ব্যবহার বিস্তৃত হয়েছিল। খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কাম্বোডিয়ায় নিয়মিতভাবে সংস্কৃত আবৃত্তি করা হত, হয়তো অভিনয়ও হত, এরূপ লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়। থাইল্যাণ্ডে (শ্যামদেশে) এখনও সংস্কৃত কোনো কোনো পর্বোপলক্ষে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ভারতে সংস্কৃতের জীবনীশক্তির পরিচয় বিস্ময়ের বিষয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আফগানেরা যখন দিল্লীর সিংহাসনে আপনাদের প্রতিষ্ঠিত করে তখন পারস্যভাষা ভারতবর্ষের অধিকাংশ অংশে রাজভাষা হয় এবং তখন ক্রমে ক্রমে অনেক শিক্ষিত লোক সংস্কৃতের স্থানে এই ভাষা গ্রহণ করে। সাধারণের ভাষাগুলিও উন্নতিলাভ করেছিল এবং লিখিত আকার ধারণ করেছিল। তবু সংস্কৃত চলিত ছিল, যদিচ অনেকটা পড়ে গিয়েছিল। ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে ত্রিবান্দ্রমে প্রাচ্য সম্মেলনীর সভাপতিরূপে ডক্টর এফ্. এফ্. টমাস দেখান, সংস্কৃত ভারতে কতখানি ঐক্য স্থাপনের সহায় হয়েছে এবং এখনও কত বিস্তৃতভাবে এই ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তিনি এই ইঙ্গিতটিও দেন যে সংস্কৃতের একটি সরল, সহজ রূপ—যাকে ভিত্তিগত সংস্কৃত বলা যায় তাই—যাতে নিখিল ভারতীয় ভাষা হয় সেজন্য উৎসাহ দেওয়া উচিত! তাঁর এই মতের স্বপক্ষে অনেক আগেই ম্যাক্স মূলার যা বলেছিলেন তিনি তা উদ্ধৃত করেন : 'ভারতে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এমনি আশ্চর্য মিল দেখা যায় যে, বারবার প্রচণ্ড সামাজিক আলোড়ন, ধর্মসংস্কার ও বিদেশীর দ্বারা আক্রমণ সত্ত্বেও একথা বলা যায় সংস্কৃতই একমাত্র ভাষা যা এই বিশাল দেশের সর্বত্রই কথিত হয়।......আমার বিশ্বাস, শতাধিক বছর ধরে ইংরাজ শাসন ও ইংরাজি শিক্ষার পরেও, সংস্কৃত যত ব্যাপকভাবে ভারতে আজও বোধগম্য হয়ে আছে দান্তে-র সময়ে ইউরোপে ল্যাটিন এতটা ছিল না।'

জানি না দান্তে-র সময়ে ইউরোপে কতজন লোক ল্যাটিন বুঝত, এও জানি না আজ ভারতে কতজন লোক সংস্কৃত বোঝে, কিন্তু জানি যে এই শেষোক্ত লোকদের সংখ্যা, বিশেষত দক্ষিণ-ভারতে, এখনও অনেক। যাঁরা হিন্দি, বাংলা, মারাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি আর্য-ভারতীয় ভাষার কোনোটি ভাল করে জানেন তাঁদের পক্ষে সহজ, কথা সংস্কৃত বোঝা বেশি কঠিন নয়। এমনকি বর্তমানকালের উর্দু সম্পূর্ণরূপে আর্য-ভারতীয় তো বটেই, তা ছাড়া সম্ভবত এর শতকরা আশিটি শব্দ সংস্কৃত হতে গৃহীত। অনেক সময় একথা বলা শক্ত কোনো শব্দ পারস্য ভাষা হতে এসেছে, কি সংস্কৃত হতে, কারণ এই দুই ভাষার মূল শব্দগুলি একই প্রকারের। এটা কৌতূহলকর ব্যাপার যে দক্ষিণের

দ্রাবিড় ভাষাগুলি, যদিচ মূলে একেবারেই বিভিন্ন, সংস্কৃত হতে এত রাশি রাশি শব্দ আপন করে নিয়েছে যে তাদের শব্দ-সম্পদের প্রায় অর্ধেক সংস্কৃতের সঙ্গে নিকটভাবে সম্পর্কিত।

সংস্কৃতে বহু বিষয়ের অনেক পুস্তক এবং নাটকও সমগ্র মধ্যযুগ ও বর্তমান যুগ পর্যন্ত লেখা হয়েছে। এখনও এরূপ পুস্তক এবং সংস্কৃত সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অবশ্য এগুলি উচ্চাঙ্গের নয়, আর এদের দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্যের পোষকতা হয় না। বিস্ময়ের বিষয় হল এই যে এতকাল ধরে সংস্কৃত চলে আসছে। সময়ে সময়ে এখনও সভা-সমিতিতে এই ভাষায় বক্তৃতা দেওয়া হয়ে থাকে, অবশ্য যাঁরা শোনেন তাঁরা বাছাই করা লোক।

সংস্কৃতের ব্যবহার চলছিল বলে ভারতের আধুনিক ভাষাগুলির স্বাভাবিক উন্নতি বাধা পেয়েছিল। শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোকেরা এগুলিকে নিম্নশ্রেণীর ভাষা বলে মনে করতেন, তাঁদের মতে এ সব ভাষায় কোনো নূতন কি পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক রচনা করা সম্ভব ছিল না, সুতরাং রচনা কার্য সংস্কৃতে, এবং এর পরবর্তীকালে প্রায়ই পারস্য ভাষায়, চলত। এই বাধা সত্ত্বেও প্রবল প্রাদেশিক ভাষাগুলি কয়েক শতাব্দীতে ক্রমে ক্রমে আকার গ্রহণ করে, লিখিত রূপ পায় এবং আপন আপন সাহিত্য গড়ে তোলে।

একথাটা আমাদের বিশেষভাবে ভাল লাগছে যে আধুনিক থাইল্যাণ্ডে যখন শিলপ-বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও রাজ্যশাসন বিষয়ে নূতন নূতন পরিভাষার প্রয়োজন হয় তখন সংস্কৃত থেকে অনেকগুলি শব্দ তৈরি করে নেওয়া হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতীয়েরা আগ্রহ দেখাতেন ধ্বনির উপর, সেইজন্য তাঁদের গদ্য পদ্য উভয়বিধ রচনায় ছন্দ ও সঙ্গীত মাধুর্য লক্ষিত হত। শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্যে বিশেষ চেষ্টা করা হত এবং এ জন্যে বিশদভাবে নিয়ম প্রবর্তন করা হয়েছিল। এর প্রয়োজনও ছিল, কারণ পুরাকালে শিক্ষা দেওয়া হত মুখে মুখে এবং পুস্তকগুলি আগাগোড়া মুখস্থ করা হত, আর যুগের পর যুগ প্রচারিত থাকত। শব্দের ধ্বনিতে যে আগ্রহ দেখান হত তা থেকে ধ্বনির সঙ্গে অর্থের সঙ্গতি সৃষ্টি করার চেষ্টা আসে এবং এ হতে অনেক শ্রুতিমধুর শব্দ পাওয়া গেছে, আবার কৃত্রিম ও অমার্জিত মিশ্রিত শব্দও মিলেছে। এ বিষয়ে ই· এইচ্· জনস্টন্ লিখেছেন, 'ভারতের প্রাচীন কবিদের মনে ধ্বনিবৈচিত্র্য সহজেই সাড়া পেয়েছিল, আর এরূপ কিছু অন্য দেশের কোথাও দেখা যায় না। এদের ললিত সঙ্গতি থেকে বিশেষ আনন্দ লাভ করা যায়। কোনো কোনোটিতে কিন্তু ধ্বনির সঙ্গে অর্থ মেলাবার চেষ্টা করা হয়েছে এমনভাবে যে তাতে কোনো সূক্ষ্ম চাতুর্য নেই, আর এই পথে প্রস্তুত পদ্যে অতিশয় শ্রুতিকটুতা এসে পড়েছে। এরূপ অনেক শ্লোকে নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে, কোনো কোনোটিতে একটিমাত্র।'*

* ই. এইচ্. জনস্টন্-এর অশ্বঘোষকৃত বুদ্ধচরিতের অনুবাদ (লাহোর, ১৯৩৬)।

বর্তমান সময়েও, বেদ থেকে আবৃত্তি প্রাচীনকালে উচ্চারণ সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম প্রচলিত হয়েছিল যথাযথভাবে সেগুলিকে অনুসরণ করেই হয়ে থাকে।

আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে যেগুলি সংস্কৃত থেকে এসেছে সেগুলিকে আর্য-ভারতীয় বলা হয়; যেমন হিন্দি-উর্দু, বাংলা, মারাঠি, গুজরাটি, উড়িয়া, অসমীয়া, রাজস্থানী (হিন্দির আর এক রূপ), পাঞ্জাবী· সিন্ধী· পাস্তো এবং কাশ্মিরী। আর দ্রাবিড় ভাষা হল, তামিল তেলেগু, কানাড়ী ও মালয়ালাম। এই পনেরোটি ভাষায় সমগ্র ভারতের চলে যায়। হিন্দী. এবং এর অন্য রূপ, উর্দু. ব্যাপ্তিতে সর্বাপেক্ষা অধিক, আর যেখানে কথ্য নয় সেখানেও লোকে এ ভাষা বোঝে। এগুলি ছাড়া কয়েকটি প্রাদেশিক কথ্য ভাষা এবং পর্বত ও বনবাসীদের অপরিণত, স্বল্প পরিসরে ব্যবহৃত ভাষা আছে। একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় যে ভারতে পাঁচশো কি তারও বেশি ভাষা চলে। এটা শব্দতাত্ত্বিকের এবং আদমসুমারির বড় কর্তার কল্পনা-প্রসূত। এ'রা প্রাদেশিক কথ্য ভাষার প্রত্যেক রূপটি এবং ব্রহ্মদেশের সঙ্গে আসাম-বাঙলা সীমান্তের প্রত্যেক অকিঞ্চিৎকর ভাষাকে গণনার মধ্যে এনেছেন। অনেক ক্ষেত্রে এগুলির কোনো কোনটি মাত্র কয়েক শত কি সহস্র লোকে ব্যবহার করে থাকে। এই তথাকথিত পাঁচশো ভাষার অধিকাংশই ভারতের পূর্ব সীমান্তে এবং ব্রহ্মের সীমান্ত অঞ্চলে চলে। আমাদের আদমসুমারির বড় কর্তারা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তদনুসারে গণনা করলে দেখা যাবে ইউরোপে বহুশত ভাষা চলিত আছে, আর, আমার মনে হচ্ছে একটা তালিকায় জার্মানিতে ষাটটা ভাষা ব্যবহৃত হয় বলে লেখা হয়েছে।

এই ভাষার সংখ্যাধিক্যের সঙ্গে ভারতের ভাষাসমস্যার কোনো যোগ নেই। এ প্রশ্ন বস্তুত হিন্দি-উর্দুর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ একটা ভাষাই, কেবল লেখ্য অংশে দুটি রূপ ও দুটি বর্ণমালা। কথ্য অংশে কোনো পার্থক্য নেই বললেই চলে। এই দূরত্ব হ্রাস করে হিন্দুস্থানী নামে একটি রূপ গড়ে তোলবার জন্যে চেষ্টা করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এখন এই ভাষাটি সমগ্র ভারতে বোধগম্য একটি সাধারণ ভাষা হয়ে উঠছে।

পাস্তো সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন আর্য-ভারতীয় ভাষাগুলির একটি, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এবং আফগানিস্থানে সর্বসাধারণের ভাষা। আমাদের অন্য সকল ভাষা অপেক্ষা এর উপরে পারস্য ভাষার প্রভাব সব থেকে বেশি হয়েছে। অতীতে এই সীমান্ত অঞ্চলে অনেক উচ্চশ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তি, পণ্ডিত ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণবিৎ জন্মগ্রহণ করেছেন।

সিংহলের ভাষা সিংহলী। এটিও সংস্কৃত হতে সাক্ষাৎভাবে প্রাপ্ত আর্য-ভারতীয় ভাষা। সিংহলীরা যে কেবল তাদের ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ভারতবর্ষ হতে পেয়েছে তা নয়, তারা জাতি হিসাবে এবং ভাষায় ভারতীয়দের আত্মীয়।

একথা এখন ভালরূপেই গৃহীত হয়েছে যে সংস্কৃতের সঙ্গে ইউরোপীয় প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাগুলির সম্বন্ধ আছে। এমনকি স্লাভিক ভাষাগুলিতেও অনেক প্রয়োগরূপ ও শব্দমূল আছে যা সংস্কৃতেও পাওয়া যায়। ইউরোপের ভাষাগুলির মধ্যে লিথুয়েনিয়ার ভাষাই সংস্কৃতের সব হতে কাছে।

১০ : বৌদ্ধ দর্শন

এরূপ বলা হয় যে বুদ্ধ যে অঞ্চলে বাস করতেন সেই অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার করেছেন। সে ভাষা একটা প্রাকৃত—সংস্কৃত থেকে গৃহীত। তিনি অবশ্য সংস্কৃত জানতেন, কিন্তু যাতে সাধারণ লোকের কাছে পৌঁছতে পারেন সেজন্য তাদের ভাষাই বেছে নিয়েছিলেন। এই প্রাকৃত থেকে এসেছে পালি, আর পালি হল আদি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলির ভাষা। তাঁর কথোপকথন, অন্যান্য বিবরণ ও আলোচনাদি তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে পালিতে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। সিংহলে, ব্রহ্মে ও শ্যামে, অর্থাৎ যেখানে যেখানে বৌদ্ধধর্মের হীনযানরূপ প্রচলিত সেখানে সেখানে এই সকল পালিগ্রন্থই ধর্মের ভিত্তিরূপে ব্যবহৃত হয়।

বুদ্ধের কয়েক শত বছর পরে সংস্কৃতের ব্যবহার ফিরে আসে এবং বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা তাঁদের দার্শনিক ও অন্যান্য গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লেখেন। অশ্বঘোষের রচনা ও নাটকগুলি আমাদের সর্বাপেক্ষা পুরাতন নাটক। উদ্দেশ্য ছিল ধর্মপ্রচার, আর এগুলি লেখা হয়েছিল সংস্কৃতে। ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতদের লেখা এই সংস্কৃত গ্রন্থগুলি চীন, জাপান, তিব্বত ও মধ্য এশিয়ায় প্রচারিত হয়। এই সকল স্থানে বৌদ্ধধর্মের মহাযান রূপটি প্রচলিত আছে।

যে কালে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভারতে সে সময়টায় মানসিক উদ্দীপনা ও দার্শনিক জিজ্ঞাসাবাদ প্রবল হয়েছিল; আর এ কেবল ভারতে নয়, কারণ ঐ কালেই এসেছিলেন, লাও-শে, কনফিউসিয়াস, জরথুস্ত্র ও পাইথাগোরাস। ভারতে উদ্ভূত হয়েছিল জড়বাদ, আবার ভগবদ্‌গীতাও পাওয়া গিয়েছিল; তা ছাড়া এসেছিল, বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম এবং অন্যান্য বহু চিন্তাধারা; আর এই সকল চিন্তাধারাই রূপ গ্রহণ করে ভারতীয় দর্শনের নানাভাগে পরিণত হয়েছিল। এইকালে চিন্তাগুলিতে নানা স্তর ছিল, একটি হতে আর একটিতে পৌঁছান যেত, আর কখনও কখনও স্তরে স্তরে আংশিক ঐক্যও লক্ষিত হত। বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় দেখা দেয়, আর বৌদ্ধধর্ম থেকেও ভাঙা দল নানা চিন্তাশীলদের দল গড়ে তোলে। তারপর এই দার্শনিক প্রেরণা ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পেয়ে শেষে পাণ্ডিত্যপ্রকাশ ও বাদানুবাদে উপনীত হয়।

বুদ্ধ আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ তর্কবিতর্কের বিরুদ্ধে তাঁর অনুগামীদের বারবার সাবধান করে দিয়েছিলেন। বিবরণে পাওয়া যায় যে তিনি বলেছিলেন, 'যদি কোনো বিষয়ে কোনো ব্যক্তি কিছু বলতে না পারে তার সেই বিষয়ে নীরব থাকাই উচিত।' সত্যকে জীবনে খুঁজে নিতে হবে, জীবনের বহির্ভূত বিষয় সম্বন্ধীয় যুক্তিতে নয়, কারণ সে সমস্ত বিষয় মানুষের বুদ্ধিরও বহির্ভূত। তিনি জীবনের নৈতিক দিকে জোর দিয়েছিলেন, আর মনে হয় অনুভব করতেন যে মন যদি আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে আগে থেকেই ব্যাপৃত থাকে তাহলে নৈতিক দিকে অবহেলা ঘটে, ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। প্রথম দিকে বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধের এই দার্শনিক ও যৌক্তিক

দিক অনেকটা প্রকাশ পেয়েছিল এবং এই ধর্মে জিজ্ঞাসাও ছিল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। অভিজ্ঞতার জগতে দোষলেশহীন জীব সম্বন্ধে কোনো প্রত্যয় সম্ভব নয়, সুতরাং এবিষয়টিকে পাশে সরিয়ে রাখা হত; আর সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে ধারণা একটা অনুমান যা যুক্তিদ্বারা সিদ্ধ হতে পারে না, কাজেই এ বিষয়েও সেই ব্যবস্থাই করা হয়েছিল। থাকত অভিজ্ঞতা, আর তা একদিকের বিবেচনায় যথেষ্টই সত্য। অভিজ্ঞতা 'হয়ে ওঠার' প্রবাহ মাত্র, সর্বক্ষণই বদলে যাচ্ছে, অন্য কিছু হচ্ছে। এইভাবে এই সব মধ্যবর্তী বাস্তবসত্যকে স্বীকার করা হত, আর মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে আরও সন্ধান চলত।

বুদ্ধ তো বিদ্রোহী ছিলেনই, তবে তিনি দেশের ধর্মমতের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেননি। মিসেস্ রাইস ডেভিড্স বলেন, 'গৌতম হিন্দু হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বর্ধিত হয়েছিলেন, জীবনযাপন করেছিলেন এবং প্রাণত্যাগ করেছিলেন......গৌতমের অধ্যাত্মতত্ত্ব ও মূল নীতিতে এমন কিছুই ছিল না যা প্রচলিত কোনো না কোনো মতে পাওয়া যায় না। আর তাঁর নীতি উপদেশের অনেক অংশেরই অনুরূপ বিধান পূর্বের ও পরের হিন্দু গ্রন্থে পাওয়া যায়। অনেকেই অনেক ভাল কথা সুন্দর-ভাবে বলে গেছেন; গৌতম সেগুলিকে নিজের মত করে নিয়েছিলেন, সেগুলিকে বিশদ করে তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ও বিধিবদ্ধ করেছিলেন, আর এতেই ছিল তাঁর বিশেষত্ব ও মৌলিকত্ব। এছাড়া যেভাবে তিনি অনেক হিন্দু পণ্ডিতদের দ্বারা গৃহীত ন্যায় বিচারের মূল তত্ত্বগুলিকে যুক্তির পথে পূর্ণতা দান করেছিলেন তাও তাঁর আর এক বিশেষত্ব। তাঁর সুগভীর আন্তরিকতা ও জনহিত-আকাঙ্ক্ষায় দেখতে পাই তাঁর ও অন্যান্য উপদেষ্টাদের মধ্যে কি পার্থক্য ছিল।'*

তবু বুদ্ধ তাঁর সময়ের গতানুগতিক ধর্মাচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বীজ বপন করেছিলেন। তাঁর অনুমান কি তত্ত্ব সম্বন্ধে তেমন আপত্তির কারণ ছিল না, যেহেতু সকল প্রকার তত্ত্বই প্রচলিত মতের মধ্যে গৃহীত হতে পারত, কিন্তু আপত্তি উঠল যখন দেশের সামাজিক বিধান ও সামাজিক জীবনে পরিবর্তন আসতে লাগল। পুরা-তন বিধি চিন্তার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে অবাধ ও নমনীয় ছিল, সকল প্রকার মতই স্বীকার করতে পারত, কিন্তু ব্যবহারে ছিল কঠোর, সুতরাং কোনো প্রকার নিয়মভঙ্গ অনুমোদন লাভ করত না। কাজেই বৌদ্ধধর্ম পুরাতন মত হতে সরে যেতে আরম্ভ করল, আর বুদ্ধের তিরোভাবের পর এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্ধিত হল।

বৌদ্ধধর্মের পুরাতন রূপটি হীনযান নামে পরিচিত। আদি বৌদ্ধধর্ম দুর্বল হতেই মহাযান রূপ গ্রহণ করে। এই মহাযানেই বুদ্ধে দেবত্ব আরোপিত হয় এবং তিনি সগুণ দেবতারূপে পূজিত হতে থকেন। উত্তর-পশ্চিম গ্রীস হতে বুদ্ধের প্রতিমূর্তি দেখা দেয়। আর প্রায় এই সময়েই ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুদয় হয় এবং আবার সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য জেগে ওঠে। হীনযান এবং মহাযানের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ, বিতর্ক ও

* এই উদ্ধৃতি এবং আরও অনেক কিছু স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের 'ইণ্ডিয়ান ফিলসফি' (জর্জ্ অ্যালেন, আন্উইন, লণ্ডন : ১৯৪০) থেকে গৃহীত হয়েছে।

বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ হয়, আর পরবর্তী ইতিহাসে দেখা যায় এটা বরাবর চলে আসছে। হীনযান দেশগুলি (সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যাম), চীন ও জাপানে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মকে অবজ্ঞাই করে থাকে। আমার মনে হয় এদের সম্বন্ধে অন্য পক্ষের আচরণও একই প্রকারের।

হীনযান কতক পরিমাণে পুরাতন, অবিমিশ্র মত ধরে ছিল এবং পালিতে বিধি-নিষেধ রচনা করে তারই মধ্যে চলাফেরা করত; আর মহাযান প্রত্যেক দেশের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে নিজেকে মিশ খাইয়ে নিয়ে, আর প্রায় সকল বিষয়ে সহনশীলতা দেখিয়ে, নানাদিকে বিস্তৃতিলাভ করেছিল। ভারতে জনসাধারণের ধর্মের দিকে তা এগিয়ে চলতে আরম্ভ করেছিল, আর চীন, জাপান ও তিব্বত, এই তিনের প্রত্যেকটিতে পৃথক পৃথক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রথমদিকের কোনো কোনো বৌদ্ধ মনীষী বুদ্ধ যে আত্মার অজ্ঞেয়তা বিষয়ে মত প্রকাশ করে গেছেন তা হতে সরে গিয়ে আত্মার অস্তিত্ব একেবারেই অস্বীকার করেন। উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় যে সকল আশ্চর্য মনন-শীল ব্যক্তি ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন নাগার্জুন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একজন। তিনি খৃস্টীয় অব্দ আরম্ভ হবার সময়ে, কণিষ্কের রাজত্বকালে, জীবিত ছিলেন, এবং মহাযান মতগুলির তিনিই প্রধান রচয়িতা। তাঁর চিন্তায় আশ্চর্য শক্তি ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এমন সমস্ত সিদ্ধান্ত করতেও ভয় পাননি যা অধিকাংশ লোকের কাছে লজ্জা ও আক্ষেপের বিষয় বলে মনে হয়েছে। দয়ামায়াহীন হয়ে তিনি তাঁর যুক্তি অনুসরণ করে চলেছেন এবং শেষে অস্বীকার করে বসলেন যা আগে তিনি নিজে বিশ্বাস করতেন। চিন্তা আপনাকে জানতে পারে না, নিজের বাইরে যেতে পারে না, কিংবা অপর কোনো চিন্তাকেও উপলব্ধি করতে পারে না। এই বিশ্ব থেকে পৃথক কোনো ঈশ্বর নেই, আর ঈশ্বর হতে পৃথক কোনোই বিশ্ব নেই, আর এই উভয়ই বাহ্য প্রকাশ মাত্র। এইভাবে তিনি অগ্রসর হয়েছেন যে পর্যন্ত না সবই ধুয়ে মুছে গেছে—সত্য এবং যা নির্ভুল নয় তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, কোনো কিছুকে বোঝাও যায় না। ভুল বোঝাও সম্ভব নয়, কারণ যা অযথার্থ তাকে কেউ ভুল বুঝবে কেমন করে? কিছুই যথার্থ নয়। জগতের অস্তিত্ব ঘটনাসাপেক্ষ; এ একটি গুণ ও সম্বন্ধের আদর্শিক বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা; আমরা এতে বিশ্বাস করি কিন্তু একে বুদ্ধির সাহায্যে বুঝিয়ে দিতে পারি না। তবু এই সমস্ত অভিজ্ঞতার অন্তরালে কিছু যে আছে তার ইঙ্গিতও দিয়েছেন—তা নিরপেক্ষ সত্তা—আমাদের চিন্তার অগম্য, কারণ একে আমাদের চিন্তার বিষয় করলেই আপেক্ষিক হয়ে পড়ে।*

* ইউ. এস. এস. আর-এর অ্যাকাডেমি অফ সায়ান্সের অধ্যাপক শ্চেরবাট্স্কি 'দি কন্সেপশন অফ বুদ্ধিস্ট্ নির্বাণ' (লেনিনগ্রাড : ১৯২৭) নামক তাঁর পুস্তকে বলেছেন, নাগার্জুনকে 'সমগ্র মানবসমাজের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মধ্যে একজন' বলে গ্রহণ করতে হবে। তিনি নাগার্জুনের রচনাভঙ্গী সম্বন্ধে বলেছেন, 'তা বিস্ময়কর, সকল সময়ে কৌতূহল উদ্রিক্ত করে রাখে, সাহসের পরিচয় দেয়, কখনও বা আমাদের বোঝবার সকল

বৌদ্ধ দর্শনে নিরপেক্ষ সত্তাকে অনেক সময়ে শ‍ূন্যতা বলা হয়েছে, তব‍ু আমরা শ‍ূন্য অথবা খালি থাকা সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করি তার এবং এই শ‍ূন্যতার মধ্যে পার্থক্য আছে।* যে জগৎ আমাদের অভিজ্ঞতার অন্তর্গত তাতে অন্য কোনো শব্দের অভাবে একে শ‍ূন্যতাই বলতে হয়, কিন্তু অধ্যাত্ম তত্ত্বের দিক থেকে এর অর্থ হল, যা সকল বস্তুর অন্তরস্থ অথচ সমস্ত অতিক্রম করে বর্তমান। একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত বলেছেন, 'শ‍ূন্যতার জন্যেই সব সম্ভব হয়েছে, শ‍ূন্যতা ব্যতীত জগতে কিছ‍ু সম্ভব নয়।'

এই সকল হতে বোঝা যায় অধ্যাত্মবিদ্যা কোন পথে নিয়ে চলে, আর মনকে এই সকল কল্পনায় ব্যাপ‍ৃত রাখার বির‍ুদ্ধে ব‍ুদ্ধের সাবধান বাণী কি গভীর জ্ঞানের পরিচয় দেয়। তব‍ু মান‍ুষের মন সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে নারাজ, সকল সময়েই জ্ঞানরাজ্য থেকে সেই ফলটি পেতে চায় যা নিজেই জানে তার নাগালের বাইরে। অধ্যাত্মতত্ত্ব বৌদ্ধ

চেষ্টাকে ব্যর্থ করে, আবার কখনও বা দম্ভ প্রকাশ করে।' তিনি নাগার্জ‍ুনের মতামতের সঙ্গে ব্র্যাড্‌লি ও হেগেলের মতামত তুলনা করেছেন: 'ব্র্যাড্‌লি দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সকল ধারণাকেই নিন্দা করেছেন: বস্তু ও গ‍ুণ আপেক্ষিকতা, স্থান ও কাল, পরিবর্তন, কার্য-কারণ, গতি, আত্মা—সবই অস্বীকার করেছেন। এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে ব্র্যাড্‌লির এই মত আর নাগার্জ‍ুনের অস্তিত্বে অস্বীকৃতি একই। ভারতীয় দিক থেকে দেখতে গেলে ব্র্যাড্‌লির মতকে খাঁটি মাধ্যমিক বলা যায়। এই সব অপেক্ষা বেশি ঐক্য দেখা যায় হেগেলের ও নাগার্জ‍ুনের বিভিন্ন বিসংবাদী মত পরীক্ষা করার পদ্ধতিতে।'

শ্চেরবাট্‌স্কি বৌদ্ধ দর্শনের কোনো কোনো অংশ এবং আধ‍ুনিক বিজ্ঞানের দ‍ৃষ্টি-ভঙ্গীতে যে সাদ‍ৃশ্য দেখা যায় তার নির্দেশ দিয়েছেন। এই সাদ‍ৃশ্য বিশেষভাবে বিশ্বের চরম অবস্থা সম্বন্ধে যে ধারণা করা হয় তাতে পাওয়া যায়, কারণ বিভিন্ন জগৎ হতে বিকীর্ণ তাপের কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিকেরা যে সকল তথ্যে উপনীত হয়েছেন তাও একই প্রকারের। তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। যখন ইউ. এস. এস. আর-এর অন্তর্গত ট্রান্স্‌বাইকালিয়ার নবপ্রতিষ্ঠিত ব‍ুরিঅ্যাট্‌ গণতন্ত্রের শিক্ষাবিভাগের কর্তারা ধর্মের বির‍ুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন তখন তাঁরা বলেন যে আধ‍ুনিক বিজ্ঞান বিশ্বসম্বন্ধে জড়বাদম‍ূলক মত পোষণ করে। এই গণতন্ত্রের মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধ ভিক্ষ‍ুরা একখানি প‍ুস্তিকায় এই জবাব দেন যে জড়বাদ তাঁদের কাছে অজ্ঞাত নয়, আর তাঁদেরই এক দার্শনিক সম্প্রদায় জড়বাদম‍ূলক মত গড়ে তুলেছেন।

* অধ্যাপক শ্চেরবাট্‌স্কি এই বিষয়ে উচ্চশ্রেণীর পণ্ডিত, এবং তাঁর মতকে সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে। তিনি নানা ভাষায়, এমনকি তিব্বতীয় ভাষাতেও, অনেক ম‍ূল গ্রন্থ স্বয়ং পরীক্ষা করেছেন। তিনি বলেন, শ‍ূন্যতা হল সাপেক্ষবাদ। প্রত্যেক বস্তু যেহেতু সাপেক্ষ এবং আত্মনির্ভরশীল তার নিজের নিরপেক্ষ শ‍ুদ্ধ সত্তা সম্ভব নয়। স‍ুতরাং তা শ‍ূন্য। পক্ষান্তরে বাস্তব, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎকে অতিক্রম করে, অথচ একে অন্তর্ভুক্ত করে, কিছ‍ু আছে যাকে শ‍ুদ্ধ সত্তা বলা যায়, কিন্তু এর প্রতীতি সম্ভব নয়, আর বাস্তব জগতের সীমাবদ্ধ ভাষায় একে প্রকাশ করাও যায় না, স‍ুতরাং একে বলতে হয় 'তথতা'। এই শ‍ুদ্ধ সত্তাকে শ‍ূন্যতাও বলা হয়েছে।

দর্শনে বিকাশলাভ করেছিল, কিন্তু পথটা ছিল মনোবিজ্ঞানের। তা ছাড়া, মনোবিজ্ঞান বিষয়ে ধারণা কত গভীর ছিল তা লক্ষ্য করলে আশ্চর্য হতে হয়। আধুনিক মনস্তত্ত্বের অবচেতন সত্তার কথা পরিষ্কাররূপে জানা ছিল, এবং এ বিষয়ে আলোচনাও হয়েছিল। একখানি পুরাতন পুস্তকে একটি বিস্ময়কর বাক্য পাওয়া গেছে যা ইডিপাসের গূঢ়ভাব বিষয়ক অনুমানের কথা মনে করিয়ে দেয়, যদিচ আলোচনা হয়েছে অন্যপথে।*

বৌদ্ধধর্মে চারটি দার্শনিক সম্প্রদায় গড়ে ওঠে, এর দুটি হীনযান শাখার, আর দুটি মহাযান শাখার। এই সমস্ত বৌদ্ধ দর্শনের উৎপত্তি উপনিষদে, কিন্তু বেদের প্রামাণিকতা গৃহীত হয়নি। প্রায় এদেরই সময়ে যে সমস্ত হিন্দু দর্শন উদ্ভূত হয় সেগুলি হতে এই সকল বৌদ্ধ দর্শনের পার্থক্যই হল বেদকে প্রামাণিক বলে না মানায়। কিন্তু এই হিন্দু দর্শনগুলিতে বেদকে সাধারণভাবে যদিচ মানা হয়েছে, এবং বাহ্যত সম্মান দেখান হয়েছে, সেগুলিকে অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করা হয়নি—তারা চলেছে আপন পথে, বেদের কথায় বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে। বেদ ও উপনিষদের কথা নানাভাবে বলা হয়েছে বলে পরবর্তীকালের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের পক্ষে বেদ ও উপনিষদের কোনো একটা বিশেষ দিকে ঝোঁক দেওয়া বরাবর সম্ভব ছিল এবং এরই ভিত্তিতে তাঁরা নিজের নিজের দর্শন গড়ে তুলেছিলেন।

এই চার শ্রেণীর দর্শনে যে বৌদ্ধ চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন যুক্তিপথে তার গতির কথা বলেছেন। প্রথমত এই গতি আরম্ভ হয় দ্বৈতভাবমূলক অধ্যাত্মতত্ত্বের পথে, এতে বস্তুর প্রত্যক্ষ অস্তিত্ববোধকেই জ্ঞান বলে ধরা হয়েছে; পরবর্তী ধাপে বলা হয়েছে, ধারণার মধ্যে দিয়ে সত্যের বোধ লাভ করা যায়, আর এর ফলে মন ও বস্তুর মধ্যে যেন একটা যবনিকার অন্তরাল সৃষ্টি হয়েছে। এই দুই ধাপে পাওয়া গেল হীনযান শাখার দর্শন। মহাযান শাখার দর্শন এই পথে আরও এগিয়ে গেছে, এবং এতে প্রতিরূপের পশ্চাতে বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয়েছে, আর সকল অভিজ্ঞতাকে বলা হয়েছে মনের মধ্যে পরম্পরাক্রমে সজ্জিত ধারণা মাত্র। এখন এল সাপেক্ষবাদের ধারণা এবং অবচেতন সত্তা। শেষ ধাপটি হল নাগার্জুনের মাধ্যমিক দর্শন, অর্থাৎ মধ্যপথ। মন ধারণায় বিশ্লিষ্ট হয়, তখন থাকে কেবল কতকগুলি অসংহত ধারণা ও উপলব্ধি, কিন্তু এদের সম্বন্ধে কিছুই নির্দিষ্ট করে বলা যায় না।

* এই বাক্যটি পাওয়া গেছে বসুবন্ধুর অভিধর্মকোষে। পুরাতন মতাদি ও চিরাগত প্রথাগুলি সংগৃহীত হয়ে এই গ্রন্থখানি খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে লিখিত হয়েছিল। সংস্কৃতে লেখা মূল গ্রন্থ হারিয়ে গেছে, কিন্তু চীনের ও তিব্বতীয় ভাষায় এর অনুবাদ পাওয়া যায়। চৈনিক অনুবাদটি প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়ান্‌ৎসাঙ-এর কৃত। এই অনুবাদ হতে ফরাসী ভাষাতেও একখানি অনুবাদ বের হয় ১৯২৬ খৃস্টাব্দে। আচার্য নরেন্দ্র দেব আমার সহকর্মী আর একই জেলে আমরা এখন আবদ্ধ আছি। ইনি ফরাসী থেকে গ্রন্থখানি হিন্দি ও ইংরাজিতে অনুবাদ করছেন, আর আমাকে এই বিশেষ অংশটি দেখিয়েছেন। এটি পাওয়া যাবে তৃতীয় অধ্যায়ে, ১৫০ পৃঃ।

তাহলে আমরা পোঁছলাম এমন কিছুতে যাকে ধরা ছোঁয়া যায় না, এমন কিছু যা আমাদের সীমাবদ্ধ মনের অগম্য, আমরা যা প্রকাশ করতে পারি না, যার সংজ্ঞা দিতে পারি না। বড় জোর বলা চলে, এটা এক প্রকারের সংবিৎ—বিজ্ঞান।

মনস্তত্ত্ব ও অধ্যাত্মতত্ত্বসম্মত বিশ্লেষণে অদৃশ্য জগৎ কি শুদ্ধসত্তার ধারণা নিছক সংবিতে দাঁড়ায়। আমরা শব্দ যেভাবে ব্যবহার করি, আর তার মানে যা করে থাকি, সেদিক থেকে দেখতে গেলে কিছুই তো আর বাকি থাকে না। তবু, এই সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও, আমাদের এই সসীম জগতে নীতিসম্মত আচরণের একটা সুনির্দিষ্ট মূল্য আছে। সুতরাং আমাদের জীবনে এবং আচরণে নীতিশাস্ত্রকে মেনে সৎ জীবন যাপন করতে হয়। এই জীবনে এবং এই ঘটনাময় জগতে যুক্তি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে চলতে পারি, এবং আমাদের তা করা উচিত। অনন্ত আছেন সমস্তকে অতিক্রম করে, সুতরাং তাতে এগুলির প্রয়োগ সম্ভব নয়।

১১ : হিন্দুধর্মের উপর বৌদ্ধধর্মের ক্রিয়া

পুরাতন আর্যধর্ম এবং ভারতে যে সকল মতাদি প্রচলিত ছিল তাদের উপর বুদ্ধের উপদেশের কি ফল হয়েছিল? কোনোই সন্দেহ নেই যে ধর্মনৈতিক ও জাতীয় জীবনে এই সকল উপদেশের স্থায়ী ফলই হয়েছিল, আর তা এসেছিল সবলভাবেই। বুদ্ধদেব হয়তো ভাবেননি যে তিনি একটি নূতন ধর্মের প্রবর্তক হয়েছেন; তিনি সম্ভবত নিজেকে একজন সংস্কারক বলেই মনে করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সবল ব্যক্তিত্ব ও শান্তি-পূর্ণ বাণী নানা সামাজিক ব্যবহার ও ধর্মাচরণের বিরোধিতা করায় আত্মরক্ষায় যত্নবান পুরোহিত সম্প্রদায় তাঁর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল। তিনি প্রচলিত সমাজ-বিধি, কি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একেবারে উৎপাটিত করে ফেলতে চাননি; তিনি এগুলির মূল-সূত্রকে স্বীকার করতেন, কেবল তারই তলে যা কিছু মন্দ জমে উঠেছিল সেগুলিকে আক্রমণ করেছিলেন। তবু বলতেই হবে যে তিনি অনেকটা সমাজবিপ্লবীই হয়ে উঠেছিলেন। ব্রাহ্মণ শ্রেণী আপন স্বার্থেই চাইত যে পুরাতন সমাজব্যবস্থা টিকে থাকুক, তাই তারা বুদ্ধদেবের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিল। তাঁর উপদেশে এমন কিছুই নেই যা সুপ্রসারিত হিন্দু চিন্তার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায় না, কিন্তু যখন ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের উপরে আক্রমণ ঘটল সে হল একটা পৃথক ব্যাপার।

মগধে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব একটু দুর্বল ছিল। এটা লক্ষ্য করার কথা যে বৌদ্ধধর্ম এই মগধেই প্রথমে প্রতিষ্ঠালাভ করে। তারপর পশ্চিমে ও উত্তরে ব্যাপ্ত হয় এবং অনেক ব্রাহ্মণও যোগ দেয়। আদিতে এটা ছিল ক্ষত্রিয় ব্যাপার, যদিচ এতে সাধারণ লোকেরও আগ্রহের কারণ ছিল। পরবর্তীকালে অনেক ব্রাহ্মণ এই ধর্ম গ্রহণ করায় দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক দিকে এর উন্নতিলাভ ঘটে; আর প্রধানত এই ব্রাহ্মণদের জন্যই মহাযান শাখা গড়ে ওঠে, কারণ অনেকাংশে, বিশেষত এর উদার দিকে, এই শাখা প্রচলিত আর্যধর্মমতের বিভিন্নরূপের খুব কাছাকাছিই ছিল।

বৌদ্ধধর্ম শতাব্দিকে ভারতীয় জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, আর এ হবারই কথা, কারণ এই ধর্ম সহস্রাধিক বছর ধরে একটি জীবন্ত, শক্তিসম্পন্ন ও বহুবিস্তৃত ধর্মরূপে ভারতে কাজ করেছে। এমনকি ভারতে যে দীর্ঘকাল ধরে এর শক্তিক্ষয় ঘটেছে সে সময়ে, এবং পরে যখন একে এদেশে পৃথক একটা ধর্ম বলে মনে করাও বন্ধ হয়ে গেছে তখনও এর পরোক্ষ প্রভাব হিন্দুমতেরই অংশরূপে জাতীয় জীবনে ও চিন্তায় থেকে গিয়েছিল। যদিচ শেষে এই ধর্মকে এদেশের লোক ধর্মরূপে গ্রহণ করেনি, এর প্রভাব স্থায়ীভাবেই ছিল দেশের লোকের উপর, এবং তাদের উন্নতির সহায়ও হয়েছিল। এই স্থায়ী ফলের সঙ্গে মত, কি দার্শনিক অনুমানাদি, কি ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্ক ছিল না বলা যেতে পারে।

বুদ্ধদেবের আদর্শবাদ ছিল এমন যে তা বাস্তব ক্ষেত্রেও কার্যকরী হয়েছিল। তাঁর নৈতিক ও সামাজিক আদর্শ এবং তাঁর ধর্ম এদেশের লোকের মনে এরূপ প্রেরণা এনে দিয়েছিল যার ক্ষয় নেই। এর সঙ্গে তুলনীয় ইউরোপে খৃস্টধর্মের নৈতিক আদর্শের প্রভাব, যদিচ সর্বত্র খৃস্টীয় মতের উপর তত মনোযোগ দেওয়া হয়নি। আরও তুলনীয় ইসলামের মানবিকতা ও সামাজিক পদ্ধতি এবং কর্মনীতি, যা বহু জাতিকে অনুপ্রাণনা দান করেছিল, যদিচ তারা এর ধর্মের রূপ কি বিশ্বাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি।

ভারতে আর্যধর্মমত বিশেষভাবে জাতীয় ধর্মের রূপ গ্রহণ করে দেশের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, আর তা সমাজে যে জাতিভেদের কাঠামো গড়ে তুলছিল তাতে এই সীমাবদ্ধতাই প্রবল হয়েছিল। এ ধর্মে কোনো প্রচারক প্রতিষ্ঠান ছিল না, অন্যকে এ ধর্মে টেনে আনার কোনো চেষ্টাও দেখা যায়নি, আর ভারত-সীমান্তের বাইরে দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। দেশের মধ্যে কারও উপর কোনোপ্রকার জুলুম না করে, অজ্ঞাতভাবেই ছিল এর গতি, কি নূতন কি পুরাতন সকলকে নিজের করে নিয়ে এবং নূতন নূতন জাতি সৃষ্টি করে অগ্রসর হয়েছিল। বাইরের সম্বন্ধে এই মনোভাব তখনকার দিনের পক্ষে স্বাভাবিকই ছিল বলতে হবে, কারণ তখন যাতায়াত ছিল কষ্টসাধ্য, আর বিদেশের সঙ্গে সংস্পর্শের প্রয়োজনও অনুভূত হয়নি। অবশ্য বাণিজ্য ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে সে সংস্পর্শ ছিল, কিন্তু তাতে ভারতীয় জীবনে কোনো পার্থক্য ঘটার কারণ ছিল না। ভারতের জীবন মহাসমুদ্র আপনাতেই আপনি আশ্রিত, বিশাল এবং বিচিত্র, সুতরাং তার সকল স্রোতের সকল পথের জন্যই তাতে যথেষ্ট স্থান আছে, তার সীমার বাইরে কি ঘটে চলেছে সে বিষয়ে তার চিন্তার প্রয়োজন ছিল না। এই মহাসমুদ্রের মাঝখানে একটা নূতন উৎসমুখ হঠাৎ খুলে গেল, নির্মল বিশুদ্ধ বারি নির্গত হয়ে বহুদিনের নিষ্কম্প উপরিভাগে তুলল আলোড়ন, তখন মানুষে-প্রকৃতিতে সৃষ্টি করে রেখেছিল যে সীমা তার মায়া আর রইল না। বুদ্ধদেবের উপদেশের এই উৎস হতে বের হল যে আবেদন তা কেবল এদেশের লোকের কাছে নয়, আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ল। এ বিশ্বজনীন আহ্বান মহৎ জীবনের পথে, শ্রেণী কি বর্ণ কি জাতি, কোনো গণ্ডীই স্বীকার করল না।

বুদ্ধদেবের সময়ের ভারতবর্ষের পক্ষে এ এক নূতন পথের যাত্রা। অশোকই প্রথম বিশালভাবে কার্যে অগ্রসর হলেন; রাষ্ট্রদূত গেল বিদেশে এবং দেশের বাইরে ধর্ম-প্রচারের চেষ্টা হতে লাগল। এইভাবে ভারতবর্ষ জগৎ সম্বন্ধে বোধ লাভ করতে আরম্ভ করে, আর বোধহয় প্রধানত এই কারণে খৃস্টীয় অব্দের প্রথম অংশে বিস্তৃতভাবে উপনিবেশ স্থাপনের দিকে ভারতের দৃষ্টি পড়েছিল ও সেজন্য চেষ্টা হয়েছিল। এই সকল অভিযানের ব্যবস্থা হিন্দু রাজারা করেছিলেন, আর তাঁরা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও আর্য সংস্কৃতি। এই উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা এবং সেজন্য অভিযানকে আশ্চর্য ব্যাপার বলেই মনে হয়, কারণ ভারতের ধর্মমত ও সংস্কৃতি নিজের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, আর জাতিভেদের ভিতর দিয়ে নিজেদের মধ্যেই ক্রমে ক্রমে বিভেদ রচনা করেছিল। কোনো একটা বলবৎ প্রেরণা এসেছিল, একটা কিছু মৌলিক দৃষ্টি-ভঙ্গীতে পরিবর্তন এনেছিল বলেই এতটা বাইরের দিকে মনোযোগ গিয়েছিল। এই প্রেরণা অনেক কারণেই এসে থাকতে পারে, তবে এর অনেকখানিই বাণিজ্য ও একটা ক্রমবর্ধমান সমাজের নানা প্রয়োজনে ঘটেছিল, আর সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীতে যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তা হয়েছিল বৌদ্ধধর্মের জন্য, এবং এই ধর্মের ভিতর দিয়ে বিদেশের সঙ্গে যে সংস্পর্শ এসেছিল সেজন্য। হিন্দুধর্মের যথেষ্টই কর্মশক্তি ছিল, আর তখন তা যেন উপচে পড়ছিল, কিন্তু হিন্দুধর্ম তো আগে বিদেশের দিকে বেশি মনোযোগ দেয়নি। নূতন ধর্মের বিশ্বজনীনতার একটি সুফল এই হয়েছিল যে এই কর্মশক্তি দূরে সুদূরে প্রবাহিত হয়েছিল।

বৈদিক ধর্ম ও জনপ্রিয় অন্যান্য ধর্মের প্রথাপদ্ধতি ও অনুষ্ঠানাদি, বিশেষত জীব-বলি, অনেক পরিমাণে দূর হয়েছিল। বেদ ও উপনিষদে অহিংসার কথা ছিল, বৌদ্ধ-ধর্ম থেকে, এবং বেশি করে জৈনধর্ম থেকে একথা জোর পেয়েছিল। এখন প্রাণের প্রতি এক নূতনভাবে সম্মান দেখান হতে আরম্ভ হল এবং জীবে দয়াও নূতনরূপে প্রকাশ-লাভ করল। আর সকল সময়েই, এই সমস্তের অন্তরালে, ছিল উত্তম জীবনযাপন করার, মহত্তর জীবনলাভ করার প্রচেষ্টা।

কঠোর সন্ন্যাস পালনের কোনো নৈতিক মূল্য আছে বুদ্ধদেব একথা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু মোটের উপর তাঁর শিক্ষায় মানুষ জীবনকে নিন্দা করতে আরম্ভ করেছিল। এটা হীনযান মতেই ঘটেছিল বেশি, আর এর থেকেও বেশি হয়েছিল জৈন-ধর্মে। জন্মান্তরের চিন্তা বৃদ্ধি পেয়েছিল, মুক্তির ইচ্ছা, সাংসারিক জীবনের ভার থেকে নিষ্কৃতি পাবার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছিল। যৌন সংযমে উৎসাহ দেওয়া হতে লাগল, আর নিরামিষ আহার বেড়ে গেল। এসব বুদ্ধের আগেও ভারতে ছিল, কিন্তু তখন যেভাবে এতে জোর দেওয়া হত তা ছিল অন্য প্রকারের। পুরাতন আর্য আদর্শে জোর ছিল পূর্ণ, সর্বাঙ্গীন জীবনের উপরে। ছাত্রাবস্থা ছিল সংযম ও নিয়মানুবর্তিতার কাল; গৃহস্থ ব্যক্তি জীবনের সকল কার্যেই পূর্ণ অংশ গ্রহণ করত, আর যৌন জীবন এরই অন্তর্গত ছিল। তারপরে আসে এই সমস্ত থেকে নিবৃত্ত হয়ে সাধারণের কাজ করার ও ব্যক্তিগত উন্নতি সাধনের সময়। আর, সকলের শেষে, যখন বার্দ্ধক্য উপস্থিত

হয়েছে, তখন আসে সন্ন্যাস, জীবনের স্বাভাবিক সমস্ত বিষয় ও আসক্তি থেকে বিরত হবার অবস্থা।

পূর্বে সন্ন্যাসভাবাপন্ন বিষয়বিমুখ ব্যক্তিদের ছোট ছোট মণ্ডলী, সাধারণত শিক্ষার্থীদের নিয়ে, বনে বসবাস করতেন। বৌদ্ধধর্ম আসার পর অনেক বিরাট মঠ গড়ে উঠল প্রায় সকল স্থানেই ভিক্ষুদের জন্য এবং ভিক্ষুণীদের জন্য, এবং নিয়মিতভাবে সে সকল স্থানে লোক সমাগম হতে লাগল। বিহার প্রদেশের নামটিই এসেছে 'বিহার' শব্দ থেকে, অর্থ মঠ। এ হতে বোঝা যায় এই সুবৃহৎ প্রদেশটি মঠে কিরূপ পূর্ণ ছিল। এই সকল মঠ শিক্ষায়তনও ছিল, অথবা কোনো শিক্ষালয় এবং সময়ে সময়ে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকত।

কেবল ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র মধ্য এশিয়াতেও অনেক সুবৃহৎ বৌদ্ধ মঠ স্থাপিত হয়েছিল। বাল্‌খ্‌-এর মঠ ছিল প্রসিদ্ধ, তাতে প্রায় এক হাজার ভিক্ষু থাকতেন। ইতিহাসে এর উল্লেখ আছে; এর নাম ছিল নব-বিহার, পারস্য ভাষায় হয়েছিল 'নৌবহার'।

চীন, জাপান ও ব্রহ্মে বৌদ্ধধর্ম বহুকাল প্রচলিত আছে, কিন্তু সে সকল দেশ অপেক্ষা ভারতে এই ধর্ম হতে পরকাল সম্বন্ধে চিন্তা এত বেশি হল কেন? আমি বলতে পারলাম না, কিন্তু আমার মনে হয়, প্রত্যেক দেশটির জাতীয় পটভূমিকায় এমন সবলতা ছিল যে এই ধর্মকে নিজের মত করে গড়ে নিতে পেরেছিল। যেমন চীনে. কনফিউসিয়াস ও লাও-শে এবং অন্যান্য দার্শনিকদের সময় থেকে বহু রীতিনীতি প্রবলভাবে চলে এসেছে। তা ছাড়া, চীন ও জাপান উভয় দেশে বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখা গৃহীত হয়েছিল, আর এ শাখা হীনযান অপেক্ষা কম নিন্দাবাদী। এই সকল মতবাদ ও দার্শনিক তত্ত্ব প্রভৃতির ভিতরে সব থেকে বেশি ইহকালের অসারতা ও পরকালের ভাব জৈনধর্মে দেখা গেছে, আর ভারতবর্ষ এই জৈনধর্মের প্রভাব লাভ করেছিল।

ভারতে বৌদ্ধধর্মের আরও একটা আশ্চর্য রকম ফল দেখা গিয়েছিল, আর সে হল তার সমাজবিধি সম্বন্ধে, তার দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পথে। বৌদ্ধধর্ম জাতিভেদ অনুমোদন করেনি, যদিচ তার মূল নীতিটি মেনে নিয়েছিল।

বুদ্ধের সময়ে বর্ণভেদ তখনও পরবর্তীকালের কঠোরতা লাভ করেনি। তখন জন্ম অপেক্ষা দক্ষতা, চরিত্র ও কর্মে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হত। অনেক সময়ে বুদ্ধ স্বয়ং দক্ষ আন্তরিকতাপূর্ণ ও নিয়মানুবর্তী ব্যক্তি বোঝাতে ব্রাহ্মণ শব্দ ব্যবহার করেছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে একটি সুবিখ্যাত গল্প আছে যা হতে বোঝা যায় তখন জাতি ও যৌন সম্বন্ধ কি ভাবে বিবেচিত হত।

গল্পটি জবালার পুত্র সত্যকাম সম্বন্ধে। গৌতম ঋষির (বুদ্ধদেব নন) কাছে শিক্ষা-লাভ করার অভিলাষ করে সত্যকাম যখন গৃহ হতে যাত্রা করবেন, মাতা জবালাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার গোত্র কি?' মা বললেন, 'বৎস, আমি জানি না, তুমি কোন বংশে জন্মেছ। যৌবনে যখন আমাকে পিতার গৃহে অতিথিদের পরিচর্যায় দাসীর ন্যায় ইতস্তত যেতে আসতে হত তখনই আমি তোমাকে গর্ভে লাভ করেছিলাম।

আমি জানি না তুমি কোন বংশের। আমি জবালা, তুমি সত্যকাম। বোলো, তুমি জবালার পুত্র, সত্যকাম জবালা।'

সত্যকাম তারপর গৌতমের কাছে উপস্থিত হলে ঋষি বংশের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তর দিলেন তাঁর মা'র কথায়। তখন গুরু বললেন, 'প্রকৃত ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেউ এরূপভাবে উত্তর দিতে পারে না। যাও, সমিধ্ নিয়ে এস বন্ধু, আমি তোমাকে দীক্ষাদান করব। তুমি সত্য হতে ভ্রষ্ট হওনি।'

সম্ভবত বুদ্ধদেবের সময়ে একমাত্র ব্রাহ্মণেরাই কঠোরভাবে জাতি রক্ষা করে চলত। ক্ষত্রিয়েরা, অর্থাৎ শাসকশ্রেণী, আপন মণ্ডলী সম্বন্ধে গর্ব অনুভব করত এবং তাদের বংশগত ঐতিহ্যের অভিমানও ছিল, তবু শ্রেণী হিসাবে, যারা রাজ্য লাভ করত তাদের কি তাদের বংশকে গ্রহণ করার জন্য দ্বার খোলাই ছিল। অবশিষ্টদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল বৈশ্য, কৃষিজীবী; এদের বৃত্তি সম্মান লাভ করত। এ ছাড়া আরও বৃত্তিগত বর্ণ ছিল। বর্ণহীন অস্পৃশ্য লোকেদের সংখ্যা ছিল কম; তারা ছিল সম্ভবত কিছু অরণ্য-বাসী, আর কতকগুলি ব্যক্তি যাদের কাজ ছিল মৃতদেহের সৎকার, কি এরূপ কিছু।

জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম অহিংসার উপর জোর দিয়েছিল এবং এই কারণে, লাঙ্গল দেওয়ায় প্রায়ই জীবহত্যা হত বলে এ কাজকে হীন মনে করার রীতি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। যে বৃত্তি আর্য-ভারতীয়দের গর্বের বিষয় ছিল, মৌলিক গুরুত্ব সত্ত্বেও, দেশের কোনো কোনো অংশে তার মর্যাদার হানি ঘটেছিল, এবং যারা নিজেরা জমিতে চাষ দিত তারা সমাজের নিম্নস্তরে নেমে গিয়েছিল।

বৌদ্ধধর্ম পৌরোহিত্য ও অনুষ্ঠানাদি, এবং মানুষকে উন্নত হবার ও উচ্চতর জীবন লাভ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, কিন্তু এই বৌদ্ধধর্মই আবার অজ্ঞাতে বহুসংখ্যক কৃষিকর্মে রত মানুষের অবনতির কারণ হয়ে উঠেছিল। তবু এজন্য বৌদ্ধধর্মকে দায়ী করা ভুল হবে, কারণ অন্য কোনো স্থানে তো তার ফল এরূপ হয়নি। জাতিভেদের মধ্যে প্রকৃতিগত ভাবে এমন কিছু ছিল যার জন্য এরূপ ঘটেছিল। অহিংসায় অত্যধিক অনুরাগ থাকায় জৈনধর্ম তাকে এই পথে প্ররোচনা দেয়. আর বৌদ্ধ-ধর্মও অনবধানতা বশত এ কার্যে সহায় হয়েছিল।

১২ : হিন্দুধর্ম কিরূপে বৌদ্ধধর্মকে অন্তর্ভুক্ত করে

আট কি নয় বছর আগে যখন আমি প্যারিসে গিয়েছিলাম, আঁন্দ্রে ম্যাল্‌রো আলাপ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি অদ্ভুত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি জানতে চাইলেন, সেটা কি, যার বলে সহস্রাধিক বছর আগে, কোনো গুরুতর সংগ্রাম ব্যতীত, হিন্দুধর্ম সুব্যবস্থিত বৌদ্ধধর্মকে ভারতবর্ষ হতে বিতাড়িত করতে পেরেছিল? বহু দেশের ইতিহাস ধর্মের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহে কুৎসিত হয়েছে; কিন্তু এরূপ কিছু ঘটতে না দিয়ে হিন্দুধর্ম কেমন করে এত বিপুল এবং বহু-বিস্তৃত জনপ্রিয় ধর্মকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে? কি অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তি হিন্দুধর্মের ছিল যে এই আশ্চর্য কার্যটি করতে

পেরেছে? এখনও কি ভারতের সেই শক্তি বর্তমান আছে? যদি থাকে, তার স্বাধীনতা ও মহত্ত্ব সুনিশ্চিত।

প্রশ্নটি হয়তো একজন ফরাসী বিচক্ষণ কর্মবীরের যোগ্য। তবু ইউরোপ ও আমেরিকার অল্পলোকেই এরূপ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায়। তারা বর্তমানকালের সমস্যা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। এই সমস্ত সমস্যা ম্যাল্‌রোকেও বিচলিত করেছে, তাই তিনি তাঁর সমধিক শক্তিশালী বিশ্লেষণশীল মন নিয়ে আলোকের সন্ধান করছেন; তিনি তা চান যেখান থেকেই পাওয়া যাক, অতীতে কি বর্তমানে, চিন্তায়, বাক্যে কি লেখায়; কিংবা সব থেকে ভাল হয় যদি মেলে জীবন এবং মৃত্যুর খেলায়, কর্মের আসরে।

ম্যাল্‌রো যে এই প্রশ্নটি করেছিলেন তা কেবল জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষায় নয়। তাঁর মন এই প্রশ্নে পূর্ণ ছিল, তাই আমাদের দেখা হবা মাত্র ঔৎসুক্যের সঙ্গে কথাটা তুল-লেন। প্রশ্নটি আমারও মনোমত হয়েছিল, কারণ এই প্রকারের প্রশ্ন আমার মনেও প্রায়ই উঠছিল। কিন্তু তাঁকে ও নিজেকে দেবার মত কোনো সন্তোষজনক উত্তর আমার ছিল না। অনেক উত্তর ও ব্যাখ্যা অবশ্য আছে, কিন্তু সেগুলি হতে মনে হয় প্রশ্নের সারাংশই অবশিষ্ট থেকে গেছে।

এটা স্পষ্টই দেখা যায় যে এদেশে ব্যাপকভাবে বলপ্রয়োগ দ্বারা বৌদ্ধধর্মকে বিনাশ করা হয়নি। সময়ে সময়ে কোনো হিন্দু রাজা ও প্রবল বৌদ্ধসঙ্ঘের মধ্যে স্থানীয় বিরোধ ঘটেছে, তবে এসব রাজনৈতিক কারণেই হয়েছে, এবং সেজন্য মূলগত কোনো পার্থক্য ঘটেনি। একথা মনে রাখা আবশ্যক যে বৌদ্ধধর্ম কোনোদিন সম্পূর্ণরূপে হিন্দুধর্মের স্থান নিতে পারেনি, কারণ যখন ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য সর্বাপেক্ষা বেশি হয়েছিল তখনও হিন্দুধর্ম ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধধর্মের পরিসমাপ্তি স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছিল—ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হয়ে অন্য রূপ পরিগ্রহ করেছিল। কীথ বলেন, 'ভারতবর্ষের এই অসামান্য ক্ষমতা দেখা যায় যে যা কিছু অপর থেকে নিয়েছে তাকেও প্রয়োজন মত বদলে নিয়ে আপন অঙ্গীভূত করেছে।' বিদেশ থেকে নেওয়া বিষয়ে যখন এরূপ ঘটেছে, তার আপন মন ও চিন্তা উদ্ভূত বিষয়ে আরও ঘটবার কথা। বৌদ্ধধর্ম যে সম্পূর্ণরূপে ভারতে জাত তা নয়, এর দর্শন পূর্ববর্তীকালের বেদান্তদর্শনের চিন্তা ও তত্ত্বের অনুযায়ী। উপনিষদে পৌরোহিত্য ও অনুষ্ঠানকে বিদ্রূপ করা হয়েছে এবং জাতিভেদের মূল্যও হ্রাস করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া ঘটেছে এবং তাদের মতগত বিরোধ সত্ত্বেও, অথবা সেই জন্যই দার্শনিক তত্ত্বে ও সাধারণের ধর্মবিশ্বাসে পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে। মহাযান বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের মত ও রূপ গ্রহণ করার দিকে অগ্রসর হয়েছে বলে দেখা যায়, আর এর নৈতিক মৌলিকত্ব বজায় থাকলে প্রায় সব কিছুর সঙ্গেই আপোষ করতে প্রস্তুত ছিল বলে মনে হয়। এদিকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বুদ্ধকে ঈশ্বরের অবতার বলে সাব্যস্ত করে নিল, আর বৌদ্ধধর্মও তাই করে বসল। মহাযান মত দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করল, তবে বিস্তৃতিতে তার লাভ হল বটে, কিন্তু ক্ষতি হল উৎকর্ষে ও বৈশিষ্ট্যে। মঠগুলি অর্থশালী হল, স্বার্থান্বেষীদের প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়াল,

নিয়মানুবর্তিতাও দুর্বল হল। সাধারণের পূজাপদ্ধতিতে যাদুবিদ্যা, কুসংস্কারাদি ঢুকে পড়ল। বৌদ্ধধর্মের প্রথম হাজার বছর পরে এই ধর্মে উত্তরোত্তর অবনতিই ঘটতে লাগল। মিসেস রাইস্ ডেভিড্স এই সময়কার এর রুগ্ন অবস্থা দেখিয়ে বলেছেন, 'ব্যাধিগ্রস্ত কল্পনার নিরতিশয় প্রকোপে গৌতমের নৈতিক শিক্ষা একপ্রকার ঢাকা পড়েই গিয়েছিল। অনুমিতি বাড়তে লাগল, আদর লাভ করল, আর যত তারা বাড়ে তাদেরই জন্য আরও অনুমানের প্রয়োজন হয়। এই প্রকারই চলল যে পর্যন্ত না সমস্ত আকাশ মানব মস্তিষ্কের জালজুয়াচুরিতে ভর্তি হয়ে গেল। এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার মহান, সরল শিক্ষাগুলিকে চেপে মেরে ফেলা হল রাশিকৃত আধ্যাত্মিক তত্ত্বের নিচে।'

সেইসময়ে যে 'ব্যাধিগ্রস্ত কল্পনা' ও 'মস্তিষ্কের জালজুয়াচুরি' ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও তার শাখাপ্রশাখাকে আক্রমণ করেছিল এ বর্ণনাটি সেগুলি সম্বন্ধেও বেশ খাটে।

বৌদ্ধধর্ম যখন আরম্ভ হয় তখন ভারতে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান ও সংস্কার চলছিল। এই ধর্ম লোককে নূতন জীবন দান করল, তাদের শক্তির নূতন উৎস খুঁজে বের করে নূতন নূতন প্রতিভার দ্বার খুলে দিল। দেশে নেতৃত্বশক্তি নূতন করে জাগ্রত হল। অশোকের রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় এ ধর্ম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রসার লাভ করে ভারতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ধর্ম হয়ে উঠল। বিদেশেও এর বিস্তৃতি ঘটল এবং সকল সময়েই বহুসংখ্যক বিদ্বান বৌদ্ধ বিদেশে যেতে ও এদেশে আসতে লাগল। এ চলল অনেক শতাব্দী ধরে। বুদ্ধের হাজার বছর পরে, খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে, যখন চীন-দেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এদেশে আসেন তিনি দেখেন যে বৌদ্ধধর্ম আপন জন্মভূমিতে বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করেছে। সপ্তম শতাব্দীতে আরও প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন্‌ৎসাঙ ভারতে আসেন, এবং অবনতির চিহ্ন দেখেন, যদিচ তখনও কোনো কোনো অঞ্চলে এ ধর্ম বলবৎ ছিল। বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত ও ভিক্ষু ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষ হতে চীনে গিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান ঘটে, এবং খৃস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত রাজাদের সহায়তায় দেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নবযুগের অভ্যুদয় হয়। এতে কোনো প্রকার বৌদ্ধবিদ্বেষ ছিল না, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মের গুরুত্ব ও শক্তি অবশ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল, আর এই সব বৌদ্ধধর্মের পরলোকবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ারূপে কাজ করেছিল। গুপ্ত রাজাদের শেষের কয়েকজনকে হূন আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হয়, এবং তাঁরা হূনদের শেষে বিতাড়িত করলেও দেশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ক্ষয় আরম্ভ হয়। পরেও অনেকবার আশাপ্রদ উজ্জ্বল দিনের দেখা মিলেছিল, এবং অনেক মহৎ ব্যক্তির অভ্যুদয় হয়েছিল, কিন্তু ততদিনে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম দুয়েরেই অবনতি ঘটেছে, আর কদর্য আচরণ সকল এসে পড়েছে। এখন এ দুটিকে পৃথক করে দেখাই কঠিন হয়ে দাঁড়াল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম বৌদ্ধধর্মকে আপন অঙ্গীভূত করেছিল, আর এই প্রক্রিয়ায় নিজেও অনেক দিকেই বদলে গিয়েছিল।

অষ্টম শতাব্দীতে ভারতের একজন শীর্ষস্থানীয় দার্শনিক, শঙ্করাচার্য হিন্দু সন্ন্যাসীদের জন্য বৌদ্ধদের পুরাতন সঙ্ঘের অনুরূপ মঠ স্থাপন করতে আরম্ভ করেন।

পূর্বে ব্রাহ্মণ্যধর্মে এরূপ কোনো ব্যবস্থা ছিল না, যদিচ ছোট ছোট মণ্ডলী ছিল।

পূর্ববঙ্গে ও উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধুতে নিকৃষ্ট রূপের বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল। বহু-বিস্তৃত রূপে এ ধর্ম ভারতে আর দেখা যায় না।

১৩ : ভারতীয় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী

এক চিন্তা থেকে আর এক চিন্তা আসে, তাদের প্রত্যেকটিই জীবনের পরিবর্তনশীল অবস্থার কারণেই আসে, আর তাদের মধ্যে যুক্তিপথে মানবমনের গতিবিধিও লক্ষ্য করা যায়। তবু এগুলির অনেকই মিশ্রতররূপে দেখা দেয়, নূতন চলে পুরাতনের পাশে-পাশে, কিন্তু তাদের মধ্যে মিল সম্ভব হয় না, হয়তো বা একটা আর একটার প্রতিবাদী। এমনকি একটি ব্যক্তিবিশেষকে নিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায় তার মন যেন একটা গোছা-বাঁধা বিসংবাদী বিষয়ের সমষ্টি; আর তার নিজেরই কার্যকলাপের ভিতরে মিল নেই। একটা জাতিতে সংস্কৃতির সকল স্তরের লোক থাকে, তাদের নিজেদের মধ্যে আর তাদের চিন্তায়, বিশ্বাসে ও কাজে অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন যুগের পরিচয় পাওয়া যায়। হয়তো তাদের আচরণ অনেকটা বর্তমানকালের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার সঙ্গে মেলে, কারণ তা না হলে, তারা কোনো চড়ায় আটকিয়ে থাকত, জীবনের স্রোত হতে পৃথক হয়ে যেত, কিন্তু এই সকল আচরণের পশ্চাতে আছে পুরাতন মতাদি আর অবিচারিত ধারণা। এ বড় আশ্চর্য যে, শ্রমশিল্পে উন্নতি করেছে এমন অনেক দেশে যেখানে লোকে স্বতই আধুনিকতম আবিষ্ক্রিয়া ও উদ্ভাবনার সুবিধা নিয়ে থাকে সেখানেও, দেখা যায় লোকে ধরে আছে বাঁধা মত ও ধারণা, বিচারে যা অচল, বিবেচনায় অগ্রাহ্য। একজন রাজনীতিক বিচার ও বুদ্ধিতে উজ্জ্বল না হয়েও আপন পথে কৃতকার্য হতে পারে। একজন ব্যবহারজীবী ওকালতিতে ও আইনের জ্ঞানে বড় হতে পারে, অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ কিছু না জেনেও। এমনকি একজন বৈজ্ঞানিক, বর্তমান যুগের হুবহু প্রতিনিধি হয়েও, অনেক সময় পাঠাগার ও পরীক্ষাগারের বাইরে গেলেই বিজ্ঞা-নের পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গী ভুলে যায়।

আর একথাটা সেই সমস্ত সমস্যা সম্বন্ধেও সত্য আমাদের দৈনন্দিন বাস্তব জীবনে যেগুলির সম্মুখীন হতে হয়। তত্ত্ববিদ্যার কি আত্মতত্ত্বের সমস্যা দূরের কথা, আমাদের প্রতিদিনের কর্তব্যের সঙ্গে তাদের যোগ অল্পই। যদি আমরা কঠোর সংযম অভ্যাস এবং শিক্ষা গ্রহণ না করি তা হলে আমাদের অনেকের কাছেই এ সকল বিষয় বুদ্ধির অগম্য থেকে যায়। তবু আমাদের প্রত্যেকেরই জীবন সম্বন্ধে কোনো না কোনো দার্শনিক মত আছে, তা জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক পেয়েছি, চিন্তা করে পেয়ে না থাকি, পিতা পিতামহের কি অন্য কারও কাছ থেকে এসেছে, আর একে আমরা স্বতঃসিদ্ধ বলেই ধরে নিয়েছি। কিংবা আমরা হয়তো নিজের চিন্তায় আস্থা না থাকায় তার বিপদের ভয়ে আশ্রয় খুঁজি ধর্মবিশ্বাসে, কিংবা কোনো ধর্মমতে; আর তা না হলে, জাতীয় অদৃষ্টের দোহাই দিই, কিংবা একটা ঝাপসা গোছের মানব সেবায় নেমে পড়ে মনের আরাম লাভ

করি। অনেক সময় আবার এই সব, এবং আরও অনেক একসঙ্গে জোট পাকায়, যদিচ তাদের মধ্যে বিশেষ কোনো যোগসূত্র থাকে না। তখন আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে, আর প্রত্যেক খণ্ডটা আলাদা আলাদা চলাফেরা করে আপন আপন খোপের মধ্যে।

পুরাকালে সম্ভবত মানুষের ব্যক্তিত্বে অধিকতর ঐক্য ও সামঞ্জস্য ছিল, যদিচ খুব উচ্চ-শ্রেণীর কোনো কোনো লোক ভিন্ন অপরের ব্যক্তিত্ব তেমন উন্নত ছিল না। এই যে দীর্ঘ যুগসন্ধির পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি এতে সেই ঐক্য ভেঙে ফেলেছি, আর অন্য কোনো ঐক্যও এখনও লাভ করিনি। এখনও আমরা মতমূলক ধর্ম এবং জীর্ণ আচরণ ও বিশ্বাস নিয়ে আছি, তবু কথা বলি আর দাবি করি যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে জীবনযাপন করছি। হয়তো বিজ্ঞান জীবন সম্বন্ধে সংকীর্ণ পথে চলেছে এবং এর অনেক অত্যন্ত আবশ্যক অংশকেও উপেক্ষা করেছে, আর সেইজন্যই নূতন করে কোনো ঐক্য ও সামঞ্জস্য গড়ে তোলায় প্রয়োজনানুরূপ সহায়তা করতে পারেনি। সম্ভবত, বিজ্ঞানের এই দিকটি পরিসরে বৃদ্ধি পাচ্ছে আর আমরা ব্যক্তিত্বের মধ্যেই পূর্বাপেক্ষা উন্নততর ঐক্য অর্জন করতে পারব।

কিন্তু আসল সমস্যাটি এখন আরও কঠিন আরও জটিল হয়ে উঠেছে, এবং মানবের ব্যক্তিত্ব বিষয়ে সীমাবদ্ধ নয়। হয়তো প্রাচীন ও মধ্যযুগের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে একপ্রকার সামঞ্জস্যময় ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা সহজ ছিল। তখনকার দিনের শহর ও পল্লীময় জগতে, সমাজ ও আচরণ সম্বন্ধে বাঁধাবাঁধি ধারণা কার্যকরী থাকায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি ও মণ্ডলী নিয়মিতভাবে বাইরের সকল আলোড়ন থেকে রক্ষিত হয়ে স্ব স্ব জীবন যাপন করত। আজ প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্র জগৎজোড়া, সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণাতে বিবাদের লক্ষণ দেখা যায়, আর এই সমস্তের মূলে আছে জীবন সম্বন্ধে নানা দার্শনিক তত্ত্ব। একটা জোরালো হাওয়া কোথাও উঠে এক জায়গায় সৃষ্টি করেছে ঘূর্ণিঝড়, আর এক জায়গায় তার উল্টো আলোড়ন। ব্যক্তিকে যদি আজ নিজের মধ্যে ঐক্য পেতে হয়, তার সহায়রূপে আবশ্যক সমগ্র জগৎসমাজের একতা।

ভারতবর্ষে, অন্য সব স্থান অপেক্ষা বেশি করেই, সমাজব্যবস্থার পুরাতন ধারণা ও এর মূলে জীবন সম্বন্ধে যে দার্শনিক তত্ত্ব আছে এই সব কতক পরিমাণে বর্তমানকাল পর্যন্ত টিকে আছে। এরূপ টিকে থাকতে পারত না যদি সমাজকে স্থায়িত্ব দিতে পারে এবং তাকে জীবন পরিচালনার উপযোগী করে রাখতে পারে এমন কিছু তাদের মধ্যে না থাকত। আর অবশেষে সেগুলি অক্ষম হয়ে পড়ত না, জীবন থেকে চ্যুত হয়ে বোঝা ও বাধা হয়ে দাঁড়াত না, যদি তাদেরই দোষ এই গুণকে দুর্বল না করত। যাই হোক, এগুলিকে আজ বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র মনে করা যায় না, এগুলিকে দেখতে হবে জগৎকে নিয়ে বিচার করে, মিলিয়ে নিতে হবে তার সঙ্গে।

হ্যাভেল্ বলেন, 'ভারতে ধর্মকে মত মাত্র বলা যায় না। মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য গৃহীত কর্মণ্য অনুমিতিকে আধ্যাত্মিক উন্নতির বিভিন্ন স্তরের ও জীবনের বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে অভিযোজিত করে নেওয়া হয়েছে, এবং তাই এদেশে

ধর্ম।' মত জীবন হতে বিচ্ছিন্ন হয়েও লোকের বিশ্বাসের বিষয় হয়ে চলতে পারে, কিন্তু এ ধর্ম কর্মশীল—হয় জীবনের সঙ্গে মিলবে না হয় তাতে বাধা দেবে। এরূপ অনুমিতি সমর্থন লাভ করে যদি কর্মণ্য হয়, যদি জীবনের অনুযায়ী হয় এবং যদি পরিবর্তনশীল অবস্থার উপযোগী হয়ে চলতে পারে। যতদিন এরূপ পারে এর উদ্দেশ্য সফল হয়, এবং আপন কাজ করে চলে, কিন্তু যখন স্পর্শরেখার মত জীবনের তির্যক রেখাকে ছুঁয়ে দূরে চলে যায়, আর জীবন ও এর মধ্যেকার দূরত্ব কেবল বাড়তেই থাকে, তখন হয় শক্তিহীন, তাৎপর্যশূন্য।

আধ্যাত্মিক অনুমান ও কল্পনা সদা পরিবর্তমান জীবন ব্যাপার নিয়ে চলে না, এই সমস্তের পশ্চাতে কোনো অপরিবর্তনীয় সত্য যদি থাকে সে-সব চলে তাই নিয়ে। সুতরাং তারা বাইরের কোনো পরিবর্তনে কিছুমাত্র না বদলেও একরূপ টিকে থাকে। কিন্তু আসলে তো সেগুলি যে আবেষ্টনীতে উদ্ভূত হয়েছে এবং যে মনোভাবে প্রতীত হয়েছে তাদেরই ফলস্বরূপ। যদি এই সব আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রভাব বাড়ে তারা জাতির জীবনের সাধারণ দার্শনিক দিকটাই বদলে দেয়। ভারতে দর্শন গভীর অংশে বিদ্বান ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও, অন্য দেশ অপেক্ষা এখানে বেশি ব্যাপ্তিলাভ করেছে, এবং জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিশেষ মনোভাব গড়ে উঠেছে অনেক পরিমাণে এরই প্রভাবে।

এই ব্যাপারে বৌদ্ধদর্শনও বিশেষ কাজ করেছে, আর মধ্যযুগে ইসলাম প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে কিছু অদলবদল এনে দিয়েছিল। এটা হয়েছিল যখন নূতন নূতন ধর্মসম্প্রদায় উদ্ভূত হয়ে হিন্দুধর্ম ও ইসলামীয় সামাজিক এবং ধর্মনৈতিক বিধিব্যবস্থার মধ্যেকার পার্থক্য দূর করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু প্রধানত ভারতীয় ষড়্দর্শনের প্রভাবই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হয়েছে। দর্শনের এইসকল শাখার কোনো কোনোটি বৌদ্ধ চিন্তাদ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত হয়েছে। এর সবগুলিকেই পুরাতনপন্থী বলে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু তাদের পদ্ধতি ও সিদ্ধান্তে অনেক পার্থক্য আছে, যদিচ তাদের অনেক ধারণাই এক। এদের ভিতরে বহুদেববাদ পাওয়া যায়, সগুণ ঈশ্বর নিয়ে একেশ্বরবাদও মেলে, অবিমিশ্র অদ্বৈতবাদও আছে, আর আছে এমন একটা দার্শনিক মত যাতে ঈশ্বর অস্বীকৃত হয়েছেন, এবং যার মূল কথা হল বিবর্তনবাদ। আদর্শবাদ ও বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ দুই-ই আছে। এই ঐক্যে ও অনৈক্যে ভারতীয় মনের অন্তর্ভুক্ত করার শক্তি এবং সমস্ত জটিলতার নানা দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। ম্যাক্স্ মূলার এই দুইটিই দেখিয়ে বলেছেন, '......আমি বেশি বেশি করেই এই সত্যটি উপলব্ধি করেছি যে দর্শনের এই ছয়টি শাখার বিভিন্নতার অন্তরালে আছে একটি সাধারণ জ্ঞানভাণ্ডার, যাকে লোকপ্রিয় জাতীয় দার্শনিক তত্ত্ব বলা যায়,......আর এখান থেকে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই আপন আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে দেওয়া হয়েছে।'

এই সমস্তের ভিতরে সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয়েছে যে বিশ্বজগৎ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত, আর এতে একটি বিরাট ছন্দ আছে। এরূপ কিছু ধরে নেওয়ার প্রয়ো-

জনও আছে, কারণ তা না হলে, এ সমস্তের ব্যাখ্যা দেবার কোনো বিহিত হত না। যদিচ কার্য-কারণের নিয়ম চলছে তবু ব্যক্তিমাত্রেরই আপন অদৃষ্ট গড়ে নেবার স্বাধীনতা আছে। পুনর্জন্মে বিশ্বাস আছে, আর জোর দেওয়া হয়েছে নিঃস্বার্থ প্রেম ও ফল-নিরপেক্ষ কর্মে। বিচার ও যুক্তিতে আস্থা রাখা হয়, আর এগুলি তর্কে ব্যবহৃতও হয়ে থাকে, কিন্তু একথাও মেনে নেওয়া হয় যে এসব অপেক্ষা স্বজ্ঞা বা সহজাত জ্ঞান অধিক মূল্যবান। অনেক সময় এরূপ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় যা যুক্তির সীমার বাইরে, তবু বিচার চলে যুক্তির পথে। অধ্যাপক কীথ বলেছেন, 'দর্শনের শাখাগুলি পুরাতন-পন্থী, শাস্ত্রের প্রামাণ্য মানে, কিন্তু অস্তিত্ব-সংক্রান্ত সমস্যা মানবীয় যুক্তিতে আলোচনা করে। অনেক সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত গৃহীত হলেও, আর অনেক সময় ঠিক তদনুযায়ী না হলেও, শাস্ত্রই ব্যবহার করা হয় অনুমোদনের জন্য।'

১৪ : ষড়্দর্শন

ভারতীয় দর্শনের প্রথম দিকের কথা আলোচনা করতে হলে বুদ্ধপূর্ব যুগে ফিরে যেতে হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন পাশাপাশি অগ্রসর হয়ে উন্নতিলাভ করেছে, কখনও কখনও পরস্পরের সমালোচনা করেছে, কখনও বা পরস্পরের কাছ থেকে তথ্য গ্রহণ করেছে। খৃস্টীয় অব্দ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ছয়টি হিন্দুদর্শন অপরিণত বহুর মধ্যে থেকে রূপ গ্রহণ করে এবং বিশিষ্টরূপে গড়ে ওঠে। তাদের প্রত্যেকটি স্বাধীনভাবে অগ্রসর হয়েছে, প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তথাপি তারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে নেই, কারণ সকলগুলিই একটি বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ।

এই ছয়টি দর্শন (১) ন্যায়, (২) বৈশেষিক, (৩) সাংখ্য, (৪) যোগ, (৫) মীমাংসা, (৬) বেদান্ত, এই ছয়টি নামে পরিচিত।

ন্যায়ের পদ্ধতি বিশ্লেষণ মূলক ও যৌক্তিক। বস্তুত ন্যায় শব্দের অর্থ শুদ্ধভাবে যুক্তি প্রয়োগের বিজ্ঞান। এই দর্শন অনেকাংশে অ্যারিস্টট্ল-এর ন্যায়ের মত, যদিচ এই দুয়ের মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে। অন্য সকল দর্শনে ন্যায়ের বিচারনীতি গৃহীত হয়েছে। যুক্তি প্রয়োগের অনুশীলনের জন্য প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই শাস্ত্র বরাবর অধীত হত, এবং বর্তমানকাল পর্যন্ত বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীত হয়ে এসেছে। ভারতের আধুনিক শিক্ষায় এর স্থান নেই, কিন্তু এখনও যেখানে পুরাতন পদ্ধতিতে সংস্কৃতের অধ্যাপনা হয়, ন্যায়শাস্ত্র নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকার একটি মূল্যবান অংশ হয়ে আছে। দর্শন অধ্যয়নের আগে ন্যায়কে অপরিহার্যরূপে শিক্ষণীয় মনে করা তো হতই, তা ছাড়া প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের পক্ষে মানসিক দক্ষতা লাভের জন্য এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করা আবশ্যক বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। এদেশের পুরাতন শিক্ষা-পদ্ধতিতে এর স্থান তেমনি উচ্চ যেমন হয়ে আছে অ্যারিস্টট্ল-এর ন্যায়ের স্থান ইউরোপীয় শিক্ষা-পদ্ধতিতে।

তখনকার দিনের পদ্ধতি অবশ্য এখনকার বাস্তব গবেষণা থেকে পৃথক শ্রেণীর ছিল।

যাই হোক এ পদ্ধতি আপন পথে বৈজ্ঞানিক ও সূক্ষ্ম বিচারে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং যুক্তি প্রমাণের পথ দিয়ে এক পা এক পা করে এগিয়ে চলত। এর মূলে একটু বিশ্বাসের স্থানও ছিল, একটু অনুমান, যুক্তির সঙ্গে যার আলোচনা চলে না। কতকগুলি অনুমিতি গ্রহণ করে তাদেরই ভিত্তিতে একে স্থাপিত করা হয়েছিল। জীবন ও প্রকৃতির মধ্যে একটি ছন্দ, একটি ঐক্য আছে এইরূপ অনুমান গৃহীত হয়েছিল। সগুণ ঈশ্বর, জীবাত্মা ও পরমাণুবাদে বিশ্বাস ছিল। ব্যক্তি কেবলমাত্র আত্মা কি কেবলমাত্র দেহ নয়, কিন্তু এদুটির মিলনে উপজাত। আর বাস্তব সত্য আত্মা ও প্রকৃতির একটা নিগূঢ় মিশ্রিত অবস্থা।

বৈশেষিক দর্শন অনেক দিকে ন্যায়ের অনুরূপ। এতে জোর দেওয়া হয়েছে যে পৃথগাত্মা ও বস্তু পরস্পর বিভিন্ন এবং বিশ্ব সম্বন্ধে পরমাণুবাদ এই দর্শনেই বিকাশলাভ করেছে। ধর্মনীতি বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করে—এই বিধির চতুর্দিকে বিশ্ব-জগৎ পরিচালিত। ঈশ্বর বিষয়ক অনুমান স্পষ্টরূপে স্বীকৃত হয়নি। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন এবং প্রথম দিকের বৌদ্ধ দর্শনের ভিতরে অনেক যোগ লক্ষ্য করা যায়। মোটের উপর এগুলি বাস্তবভাবে অগ্রসর হওয়ার পরিচয় দেয়।

সাংখ্য দর্শন মহর্ষি কপিল (খৃস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী) বহু প্রাচীন ও বুদ্ধপূর্ব চিন্তাধারা হতে গঠন করেছেন বলে শোনা যায়। এখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রিচার্ড গার্বে বলেন, 'মানব মনের পূর্ণ স্বাধীনতা ও তার আপন শক্তিতে সম্পূর্ণ নির্ভরের কথা জগতের ইতিহাসে কপিলের মতের মধ্যে সর্বপ্রথমে পাওয়া গেছে।'

বৌদ্ধধর্মের উদ্ভবের পর সাংখ্য সুব্যবস্থিত দর্শন হয়ে ওঠে। মানুষের মন থেকে উদ্ভূত অবিমিশ্র দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ধারণা নিয়ে এর মত, এবং এর সঙ্গে বাস্তব জগতে যা কিছু লক্ষিত হয় তার কোনো যোগ নেই। এর নাগালের বাইরের কোনো বিষয়ে এরূপ দৃষ্টি সম্ভবও নয়। বৌদ্ধধর্মের ন্যায় সাংখ্য যুক্তিপথে জিজ্ঞাসার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে, এবং বৌদ্ধধর্ম যেখানে কোনো শাস্ত্রীয় প্রামাণ্যের সাহায্য ব্যতীত যুক্তিতর্কে নির্ভর করেছে সেখানেই তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হয়েছে। এই বিচারের পথ গ্রহণ করার জন্যই ঈশ্বরের ধারণা ত্যাগ করতে হয়েছে। সুতরাং সাংখ্যে সগুণ কি নির্গুণ কোনো ঈশ্বরই নেই; একেশ্বরবাদও নেই, অদ্বৈতবাদও নেই। এর গতি ছিল নিরীশ্বরবাদের মধ্যে দিয়ে, আর এই দর্শন একটি অতি প্রাকৃত ধর্মকে তলেতলে নাশ করেছিল। কোনো ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেননি, অবিরত একটা বিবর্তন চলেছে। এ হল আত্মা বা আত্মাসকল ও বস্তুর মধ্যে পরস্পরের উপর পরস্পরের ক্রিয়া, আর বস্তু ও তেজের বা শক্তির সমধর্মী। এই বিবর্তন একটি অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

সাংখ্যকে দ্বৈতদর্শন বলা হয়, যেহেতু দুটি আদি কারণের উপরে এটি গঠিত: প্রকৃতি, অর্থাৎ সদা ক্রিয়াশীল পরিবর্তমান শক্তি, এবং পুরুষ, যার পরিবর্তন নেই। পুরুষ বা আত্মার সংখ্যা অসীম, আর এই পুরুষ সংবিৎ কি চেতনার ন্যায় কিছু। পুরুষ স্বয়ং নিষ্ক্রিয়, কিন্তু এরই প্রভাবে প্রকৃতি বিবর্তিত হয় এবং অবিচ্ছিন্ন ক্রিয়া-

শীলতা দ্বারা নূতনত্ব পেতে থাকে। কার্যকারণের নিয়ম স্বীকৃত হয়, কিন্তু বলা হয় যে কার্য প্রকৃতপক্ষে কারণের মধ্যেই নিহিত থাকে। কারণ (হেতু) ও কার্য (ফল) হয়ে দাঁড়ায় একই বিষয়ের অপরিণত ও পরিণত অবস্থা। ব্যবহারিক দিক থেকে বিবেচনা করলে কারণ ও কার্য পরস্পর হতে সুস্পষ্টরূপে পৃথক, কিন্তু মূলত তাদের মধ্যে অভিন্নতা আছে।

যুক্তি এইভাবে চলতে থাকে ও দেখায় কেমন করে প্রকাশহীনা প্রকৃতি বা শক্তি হতে, বা চেতনার প্রভাবে, এবং কার্যকারণ বিধানের মধ্যে দিয়ে, স্বভাব তার বিপুল জটিলতা ও বিচিত্র উপাদানগুলি নিয়ে উদ্ভূত হয়েছে, এবং সদাই বদলাচ্ছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বে যা অতি ক্ষুদ্র, এবং যা অতি মহৎ, সমস্তের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্নতা ও একটা অখণ্ডতা বিদ্যমান। এই দর্শনের সমগ্র ধারণাটি আধ্যাত্মিক, এর বিচার কতকগুলি অনুমানে প্রতিষ্ঠিত এবং দীর্ঘ, জটিল ও যুক্তিনিবদ্ধ।

পতঞ্জলির যোগসূত্র বিশেষভাবে দেহ ও মনের সংযম সাধনার পদ্ধতি—উদ্দেশ্য মন ও আত্মার শিক্ষা। পতঞ্জলি কেবল এই পুরাতন দর্শন বিধিবদ্ধ করেননি, পাণিনির সংস্কৃত ব্যাকরণের একটি সুবিখ্যাত ভাষ্য লিখে গেছেন। এর নাম মহাভাষ্য এবং একে পাণিনির গ্রন্থের মতই প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর্গত বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। লেনিনগ্রাডের অধ্যাপক শ্চেরবাট্স্কি বলেছেন, 'ভারতের আদর্শস্থানীয় বৈজ্ঞানিক-গ্রন্থ হল পতঞ্জলির মহাভাষ্য-সমন্বিত পাণিনির ব্যাকরণ।'*

যোগ শব্দ এখন ইউরোপ ও আমেরিকায় সুপরিচিত, যদিচ তেমন বোধগম্য নয়। সে সব দেশে, এই শব্দটির সঙ্গে নানা অদ্ভুত প্রথা ও আচরণ সংযুক্ত আছে এইরূপ মনে করা হয়, যেমন বুদ্ধের মূর্তির মত নাভিদেশে কি নাকের অগ্রভাগে তাকিয়ে বসে থাকা।† কোনো কোনো লোক শরীরের দুচারটি কৌশল শিখে নিয়ে পশ্চিম দেশে আপনাদের যোগ বিষয়ে অভিজ্ঞ বলে প্রচার করে এবং অতিবিশ্বাসপ্রবণ উত্তেজনাপ্রিয় লোকদের ঠকিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। বিষয়টি এই সকল কৌশল অপেক্ষা অনেক উচ্চশ্রেণীর। এর মূল কথাটি মনস্তত্ত্বের এই ধারণায় প্রতিষ্ঠিত যে যথোপযুক্ত মানসিক সাধনা দ্বারা চেতনার বিশেষ উচ্চস্তরে ওঠা যায়। আগে থেকে সত্য কি বিশ্ব সম্বন্ধে কোনো আধ্যাত্মিক অনুমান গ্রহণ না করে নিজে নিজে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিরূপে যোগ ব্যবহৃত হবার কথা। সুতরাং যোগ পরীক্ষামূলক, আর এই শাস্ত্রে পরীক্ষার অনুকূল অবস্থা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যে কোনো দার্শনিক মতে—তার

* একথা এখনও স্থির সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হয়নি যে ব্যাকরণবিদ্ পতঞ্জলি ও যোগ-সূত্রের রচয়িতা পতঞ্জলি একই ব্যক্তি। ব্যাকরণবিদের তারিখ ঠিক জানা গেছে—খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী। কারও কারও মতে যোগসূত্রের রচয়িতা অন্য ব্যক্তি ছিলেন ও দু কি তিনশো বছর পরে আসেন।

† যোগের অর্থ মিলন। সম্ভবত ইংরাজি 'ইয়োক' শব্দ—যোগ করা অর্থে—আর এই শব্দ একই মূল হতে পাওয়া গেছে

Kedarnath Sadharan Pathag

অনুমানের ভিত্তি যাই হোক না কেন—যোগ পদ্ধতিরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। এইভাবে, নিরীশ্বরবাদী সাংখ্য দর্শনে আস্থাবান ব্যক্তিরাও এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। বৌদ্ধধর্মে কতকটা এইরূপ এবং কতকটা অন্যরূপ যোগ সাধনার ব্যবস্থা হয়েছিল। সুতরাং পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রের অনুমান-অংশ তত প্রয়োজনীয় নয়, এর পদ্ধতি-অংশই আসল। এতে ঈশ্বর বিশ্বাস আবশ্যক নয়, তবে এরূপ ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি মনের একাগ্রতালাভে সাহায্য করে, সুতরাং উদ্দেশ্যসাধনের উপযোগী।

একথা বলা হয়েছে যে যোগ সাধনায় অগ্রসর হলে, মরমীরা যেরূপ বলেন, একটা স্বজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি, বা দিব্যানন্দের অবস্থা আসে। বলতে পারি না, এটা উচ্চ মানসিক অবস্থা কি না যাতে গভীরতর জ্ঞানের দ্বার খুলে যায়, অথবা আত্ম-সংবেশন (সেল্‌ফ্‌ হিপ্নোটিজ্‌ম্‌) মাত্র। যদি প্রথমটা সম্ভব হয়, পরেরটাও নিশ্চয়ই ঘটে, আর এটা জানা কথা যে অনিয়ন্ত্রিত যোগসাধন সময়ে সময়ে সাধকের মনের পক্ষে বিপজ্জনক হয়েছে।

সাধনার সর্বোচ্চ ধাপে আসার আগে দেহ ও মনের সংযম অভ্যাস করা আবশ্যক। দেহ হবে উপযুক্ত ও নিরাময়, নমনীয় ও শ্রীসম্পন্ন, শক্ত ও সবল। কতকগুলি শারীরিক ব্যায়ামের বিধি আছে, আর প্রাণায়াম, গভীর ও সুদীর্ঘ প্রশ্বাস গ্রহণের ব্যবস্থা, ইত্যাদি। এগুলিকে ব্যায়াম বলা ঠিক হল না, কারণ এতে এমন কিছু নেই যাতে উদ্যমের প্রয়োজন হয়। এগুলির নাম আসন, উপবেশন প্রণালী; যথা নিয়ম এগুলি অভ্যাস করলে দেহ স্বচ্ছন্দ ও স্বাস্থ্যবান হয়, তাকে কোনোরূপে ক্লান্ত করে না। এই পুরাতন, বিশেষভাবে ভারতীয় শরীররক্ষার পদ্ধতিটি উল্লেখযোগ্য, কারণ এ-বিষয়ের সাধারণ পদ্ধতিতে পাওয়া যায় ছুটাছুটি, হাত-পা ছোঁড়া, লাফিয়ে চলা, কিংবা লাফ দেওয়া, আর এসবে মানুষ হাঁপাতে থাকে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট পায় এবং ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই সবও ভারতে খুব দেখা যায়, যেমন কুস্তি, সাঁতার, ঘোড়ায় চড়া, তলোয়ার খেলা, তীর ছোঁড়া, মুগুর ভাঁজা, জুজুৎসুর মত প্যাঁচ, আর নানাপ্রকার আমোদ ও খেলা। কিন্তু আসন মনে হয় ভারতবর্ষের উপযোগী, তার দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গেও মিল খায়। এর ভঙ্গীতে ভারসাম্যের দিকে দৃষ্টি আছে, আর যখন দেহের অনুশীলন চলে তখনও মনে কোনো চাঞ্চল্য আসতে পারে না। শক্তির অপচয় না ঘটিয়ে, মনকেও বিব্রত না করে দৈহিক বল ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা যায়। এই কারণে আসনগুলি যে-কোনো বয়সের লোকে অভ্যাস করতে পারে। কয়েকটি বৃদ্ধদেরও উপযোগী।

আসনের সংখ্যা অনেক। বেশ কয়েক বছর ধরে আমি নিজে কয়েকটি বাছাবাছা সহজ আসন যখনই সুযোগ পেয়েছি অভ্যাস করেছি, আর আমার কোনো সন্দেহই নেই যে উপকার পেয়েছি—মনে রাখতে হবে যে আমাকে অনেক সময় আমার মন ও দেহের পক্ষে অনুপযোগী আবেষ্টনের মধ্যে কাটাতে হয়েছে। এই আসনগুলি এবং কয়েকটি নিশ্বাস-প্রশ্বাসের অভ্যাস পর্যন্তই আমার এ-বিষয়ের দৌড়। আমি শরীর সম্বন্ধে প্রাথমিক ধাপগুলির বেশি অগ্রসর হইনি, আর মন বরাবরই অবাধ্যতা করে আসছে এবং বড় বেশি বেশি দোষ করেছে।

দেহের নিয়মানুবর্তিতা অভ্যাসের জন্য আহার সংযম আবশ্যক, কেবল ঠিক ঠিক দ্রব্য আহার করা চলবে, অযোগ্যগুলিকে বাদ দিতে হবে, এবং অহিংসা, সত্যবাদিতা, সংযম প্রভৃতির অভ্যাসদ্বারা নৈতিকভাবে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। অহিংসা শারীরিক আঘাত করা থেকে বিরত হওয়া মাত্র নয়, তা অপেক্ষা অনেক বেশি কিছু। এর অর্থ বিদ্বেষ এবং ঘৃণা বর্জন করা।

বলা হয়েছে যে এই সমস্ত হতে ইন্দ্রিয়দমন শিক্ষা করা যায়; তার পর আসে গভীর চিন্তন ও ধ্যান, আর সর্বশেষ আসে নিবিষ্টতা এবং তা হতে প্রাপ্ত বহুবিধ স্বজ্ঞা।

বিবেকানন্দ একজন উচ্চশ্রেণীর যোগ ও বেদান্তের ব্যাখ্যাতা ছিলেন। তিনি যোগ যে পরীক্ষামূলক এবং যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই বিষয়ে জোর দিয়ে বলেছেন, 'যোগগুলির কোনোটাই যুক্তি ত্যাগ করেনি। কেউ তোমাকে প্রতারণা করতে চায় না, কোনো প্রকারেই পুরোহিতদের হাতে তোমার যুক্তি সঁপে দিতে বলে না।...... তাদের প্রত্যেকটি বলে, তোমার যুক্তি ধরে থাকো, চেপে ধরে রাখো।' যদিচ যোগ ও বেদান্ত অন্তর্নিহিত ভাবে বিজ্ঞানের অনুরূপ, একথা ঠিক যে তারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আপন কথা বলে, সুতরাং তাদের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য দেখা দেবেই। যোগশাস্ত্র অনুসারে, আত্মা বুদ্ধিতে সীমাবদ্ধ নয়, এবং 'চিন্তাই কার্য, আর কেবল কার্যই চিন্তাকে কোনো মূল্য দিতে পারে।' প্রেরণা ও সংস্কার স্বীকৃত হয়, কিন্তু এদুটি কি ভুল পথে নিয়ে যায় না? বিবেকানন্দ এর উত্তরে বলেছেন যে প্রেরণা যুক্তির বিরুদ্ধতা করলে চলবে না—'যাকে আমরা প্রেরণা বলি তা যুক্তিরই পরিণত অবস্থা। যুক্তির পথ দিয়েই সংস্কারে পেঁছতে হয়......যথার্থ প্রেরণা যুক্তির বিরুদ্ধে হয় না; যদি হয় তা প্রেরণা নয়।' আরও বলেছেন, 'প্রেরণা সকলের কল্যাণের জন্য হওয়া আবশ্যক; নাম, যশ কি ব্যক্তিগত লাভের জন্য নয়। একে সকল সময়েই জগতের হিতের জন্য হতে হবে, এবং সম্পূর্ণরূপে স্বার্থশূন্য হতে হবে।'

পুনরায় বলেছেন, 'জ্ঞান কেবল অভিজ্ঞতা হতে পাওয়া যায়।' যে গবেষণা-পদ্ধতি আমরা বিজ্ঞান ও বাইরের জ্ঞানের জন্য ব্যবহার করি সেই পদ্ধতিতেই ধর্মকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। 'যদি কোনো ধর্ম এরূপ অনুসন্ধানে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সে ধর্ম মূল্যহীন, তুচ্ছ কুসংস্কার মাত্র; যত শীঘ্র তা লোপ পায় ততই মঙ্গল।' 'কেউ বলতে পারে না কেন ধর্ম বলবে যে তা যুক্তির বিধি মানতে বাধ্য নয়।......কারণ, কারও আদেশে লক্ষ লক্ষ দেবতায় অন্ধভাবে বিশ্বাস করা অপেক্ষা মানবজাতি যদি যুক্তির পথ অবলম্বন করে নিরীশ্বরবাদী হয়ে যায় তাও ভাল।......হয়তো এমন ধর্মগুরুরা জন্মেছেন যাঁরা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম করে ওপারের আভাস পেয়েছেন। এ কথাটা আমরা বিশ্বাস করব যখন আমরাও এরূপ আভাস পাব; তার পূর্বে নয়।' কেউ কেউ বলেছেন যে যুক্তির তেমন শক্তি নেই, প্রায়ই ভুল করে। যুক্তির যদি শক্তি নাই থাকে একদল পুরোহিতকে কেন অধিকতর নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শক বলে মনে করব? বিবেকানন্দ আরও বলেছেন, 'আমি আমার যুক্তিকে মেনে চলব, কারণ এর সকল দুর্বলতা সত্ত্বেও এরই মধ্যে দিয়ে আমার পক্ষে সত্যকে লাভ করার

কিছু সম্ভাবনা আছে।......সুতরাং আমরা যুক্তির অনুসরণ করব, আর যারা যুক্তি অনুসরণ করে কোনো বিশ্বাসে না পৌঁছায় তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাব।' 'এই রাজ-যোগের চর্চায় কোনো মত বা বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই। কিছু বিশ্বাস কোরো না যতক্ষণ না তা নিজে দেখে নিয়েছ।'*

বিবেকানন্দ যে যুক্তির উপর জোর দিতে কখনও ছাড়েননি, এবং কেবল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন, তার কারণ তিনি সর্বান্তঃকরণে মনের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন, আর অন্য কারণ এই যে তাঁর নিজের দেশেই অপরের প্রাধান্য মেনে নেওয়ার কুফল দেখেছিলেন; বলেছেন, 'কারণ আমি এমন দেশে জন্মেছি যেখানে এই প্রকার কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া যতদূর যেতে পারে গেছে।' তিনি যোগ ও বেদান্ত এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, এবং তাঁর এরূপ ব্যাখ্যা দেবার অধিকারও ছিল। কিন্তু পরীক্ষা ও যুক্তি যতই তাদের মূলে থাক তারা এমন সব ক্ষেত্রের কথা বলে যা মাঝারি বুদ্ধির লোকের নাগালের, এমনকি বোধেরও বাইরে, কারণ সে সব অভিজ্ঞতা মনোরাজ্যের মনস্তত্ত্বঘটিত, এবং আমরা যে জগৎকে জানি, এবং যাতে অভ্যস্ত, সেখানকার নয়। এই সকল গবেষণা ও অভিজ্ঞতা আমাদের দেশেই আবদ্ধ নয়, কারণ খৃস্টীয় মরমী, সুফী ও অন্যান্যদের মধ্যে এগুলির পরিচয় যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। এ বড় আশ্চর্য, এই অভিজ্ঞতাগুলি বিভিন্ন দেশ ও লোকের মধ্যে দেখা গেলেও এদের ভিতরে সাদৃশ্য আছে, যেমন রোমাঁ রোলাঁ যা বলেছেন তারই একটা দৃষ্টান্ত: 'ধর্মবিষয়ক অভিজ্ঞতালাভ ব্যাপারটি বিশ্বজনীন এবং নিত্য; আর বিভিন্ন জাতিতে ও সময়ে ঘটলেও এই প্রকারের অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে যে নিকট সাদৃশ্য বর্তমান তাতে মানবের আত্মার চিরন্তন ঐক্য সমর্থিত হয়—কেবল আত্মাই বা বলি কেন, কারণ এ যায় আরও গভীরে, আত্মাই তার অন্বেষণে তৎপর—আর সমর্থন লাভ করে মানবতা যে উপাদানে গঠিত তার অভিজ্ঞতা।'

তাহলে ব্যক্তির মানসিক পটভূমিকায় কি আছে তা তলিয়ে দেখার এবং এরূপে কতকগুলি প্রত্যক্ষজ্ঞান ও মননিয়ন্ত্রণের শক্তির উদ্ভব করার গবেষণামূলক পদ্ধতিকে যোগ বলা যায়। বলতে পারলাম না, বর্তমান মনস্তত্ত্বে এর ব্যবহার থেকে কতখানি লাভবান হওয়া যেতে পারে। অরবিন্দ ঘোষ যোগের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন: 'সমগ্র রাজযোগ যে-প্রত্যক্ষজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে তা এই: আমাদের অন্তরের উপাদানগুলিকে, সেখানকার সকল যোগাযোগ, ক্রিয়া ও শক্তিগুলিকে, পৃথক পৃথক করে নেওয়া যায় কিংবা দ্রবীভূত ও পুনঃ সমাহৃত করে নূতন নূতন সংযোগ উৎপন্ন করা চলে, এবং তখন নূতন নূতন এমন কাজে লাগানো যায়, আগে যা সম্ভবই ছিল না; অথবা সেগুলিকে রূপান্তরিত করে নেওয়া যায় এবং অন্তরের নির্দিষ্ট রীতিতে এক নূতন সংশ্লেষণ গড়া হয়।'

পরের দর্শনটি হল মীমাংসা। এটি অনুষ্ঠান-প্রধান ও এর গতি বহুদেববাদের দিকে।

* এই সমস্ত উদ্ধৃতি রোমাঁ রোলাঁর বিবেকানন্দের জীবনী হতে নেওয়া হয়েছে।

এই দর্শনের বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় বর্তমান হিন্দুধর্ম ও হিন্দু আইনের উপর, এতেই বিধিবদ্ধ হয়ে আছে সংজীবনযাপনের নিয়মগুলি আর হিন্দুদের এগুলি মানতে হয়। একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক যে এই দর্শনে বিবৃত বহুদেববাদ বিচিত্র প্রকারের, কারণ দেবতাদের বিশেষ বিশেষ শক্তি থাকলেও তাঁদের মানুষ অপেক্ষা নিম্নস্তরের বলে মনে করা হয়েছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মের লোকেই মনে করে যে মানবজন্মই জীবের আত্মোপলব্ধির পথে উচ্চতম অবস্থা, এমনকি দেবতারাও কেবল মানবজন্মের ভিতর দিয়ে এই মুক্তি ও উপলব্ধি লাভ করতে পারেন। এই ধারণা অবশ্য বহুদেববাদ বললে সাধারণত যা বোঝায় তা হতে ভিন্ন। বৌদ্ধেরা বলেন যে কেবল মানুষেই পূর্ণ বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারে।

এই সকল দর্শনের শেষটি হল বেদান্তদর্শন। এই দর্শন উপনিষদ্ থেকে উদ্ভূত হয়ে নানা রূপ গ্রহণ করেছে, কিন্তু বরাবরই অদ্বৈতবাদমূলক বিশ্বতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। সাংখ্যের পুরুষ এবং প্রকৃতির স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত হয় না, তারা একই শুদ্ধসত্তার বিভিন্ন রূপ মাত্র। পূর্বপ্রচলিত বেদান্তের ভিত্তিতে শঙ্করাচার্য যে দর্শন গড়ে তোলেন তার নাম অদ্বৈত বেদান্ত। এখনকার হিন্দুধর্মের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী শঙ্করের এই তত্ত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

এই অদ্বৈতবাদ অনুসারে পরম সত্য হল শুদ্ধসত্তা, আত্মন্। এই হল বিষয়ী, জ্ঞাতা; বাকি সমস্ত বিষয় মাত্র। এই শুদ্ধসত্তা কিরূপে সমগ্র বিশ্বে ওতপ্রোত হয়ে বিদ্যমান, কিরূপে একই বহুরূপে প্রকাশিত, তবু আপন অখণ্ডতা রক্ষা করে আছেন, কারণ এই শুদ্ধসত্তা অবিভজনীয়—এই সমস্তকে যুক্তি-বিচার দ্বারা নিষ্পন্ন করা যায় না, কারণ আমাদের মন সসীম জগতে সীমাবদ্ধ। উপনিষদে আত্মন্‌কে এইভাবে বিবৃত করা হয়েছে, যদি একে বিবৃতি বলতেই হয়: 'পূর্ণ ঐ, পূর্ণ এই, পূর্ণ হতেই পূর্ণ উদ্ভূত হয়; পূর্ণের পূর্ণ গ্রহণ করলেও পূর্ণ অবশিষ্ট থাকে।'

শঙ্কর সূক্ষ্ম ও জটিল জ্ঞানের মত খাড়া করে তুললেন, এবং কয়েকটি অনুমানের উপর ধাপে ধাপে যুক্তির সঙ্গে বিচার করে শেষে তাঁর অদ্বৈতবাদকে পূর্ণাঙ্গ দর্শনের রূপ দান করলেন। পৃথগাত্মা যাকে বলা হয় তার কোনো পৃথক সত্তা নেই, তা শুদ্ধসত্তাই, কেবল কোনো কোনো দিকে সীমাবদ্ধ। একে ঘটের মধ্যে স্থিত আকাশের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এ তুলনায় আত্মন্ হল মহাকাশ। বোঝবার সুবিধার জন্য এদুটির মধ্যে নির্দেশের পার্থক্য ধরে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু এ পার্থক্য প্রতীয়মানমাত্র, সত্য নয়। এই পৃথগাত্মা ও আত্মার একত্বের উপলব্ধিই মুক্তি।

আমাদের চারিদিকের দৃশ্যমান প্রাকৃতিক জগৎ এই সত্তার প্রতিফলন মাত্র, অথবা অভিজ্ঞতার জগতে তার ছায়া। একে বলা হয়েছে মায়া। কেউ কেউ এ শব্দের অর্থ করেছেন ভ্রান্তি, কিন্তু এ তো অস্তিত্বহীন কিছু নয়—অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের অভাবের মধ্যবর্তী অবস্থা। এ একপ্রকার আপেক্ষিক অস্তিত্ব। হয়তো সাপেক্ষ্যবাদের ধারণার সাহায্যে মায়া শব্দের অর্থ খানিকটা বোঝা যেতে পারে। তাহলে এই জগতে ভাল ও মন্দটা কি? তাও কি প্রতিফলন কি ছায়ামাত্র, কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই তাদের? শেষ

পর্যন্ত সেগুলি যাই হোক, আমাদের অভিজ্ঞতার জগতে এই সকল সদসৎ নীতি-শাস্ত্রবিহিত পার্থক্যের মূল্যে আছে, আর সেগুলিকে স্বীকারও করা হয়। যেখানে মানুষ এইভাবে জীবনযাপন করছে সেখানে এগুলি অগ্রাহ্য নয়।

সসীম জীব অনন্তে সীমা আরোপ না করে তা কল্পনা করতে পারে না; তারা কেবল সীমাবদ্ধ বাস্তব ধারণাই লাভ করতে পারে। তবু এই সমস্ত সসীম প্রতীতিকে শেষ পর্যন্ত অসীম এবং শুদ্ধসত্তার উপর নির্ভর করতে হয়। সুতরাং ধর্মের রূপ আপেক্ষিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, আর প্রত্যেক ব্যক্তিরই যে আপন আপন শক্তি অনুযায়ী ধারণা গড়ে তোলার অধিকার আছে তাও স্বীকার করতে হয়।

শংকর বর্ণভেদের ভিত্তিকে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু সামাজিক ব্যবস্থা স্বীকার করেছিলেন এই যুক্তিতে যে এতে জাতির অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সমষ্টিগত হয়ে বর্তমান আছে। কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে-কোনো বর্ণের যে-কোনো জাতি সর্বোচ্চ জ্ঞানলাভ করতে পারে।

শংকরের দৃষ্টিভঙ্গীতে ও দর্শনে জগৎকে অস্বীকার করার ভাব দেখা যায়, এবং তিনি যে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে আত্মার স্বাধীনতা লাভকেই চরম লক্ষ্য বলে মনে করতেন সেজন্য জগতের সাধারণ জীবন থেকে সরে দাঁড়ানোর দিকেও ঝোঁক দিয়ে গেছেন। তাছাড়া স্বার্থত্যাগ ও বৈরাগ্যের উপরেও ক্রমাগত জোর দিয়েছেন।

তবুও শংকর বিপুল কর্মশীল, শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। নিজের মধ্যেই আত্ম-গোপন করবেন কিংবা বনের মধ্যে একটা কোণ বেছে নিয়ে অন্যদের কথা ভুলে নিজের ব্যক্তিগত সার্থকতা লাভে তৎপর হবেন, এরূপ কাজ এড়িয়ে যাবার পাত্র শংকর ছিলেন না। ভারতের সুদূর দক্ষিণে মালাবারে জন্মগ্রহণ করে তিনি অবিরাম ভারতময় ঘুরে বেড়িয়েছেন, এবং অসংখ্য লোকের সঙ্গে তর্কবিতর্ক, বিচার, যুক্তিপ্রদর্শন করেছেন, অসংখ্য লোককে বুঝিয়ে নিজের মতে এনেছেন এবং আপন অনুরাগ ও প্রচণ্ড শক্তি-দ্বারা অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁর কথা শুনে মনে হয় তিনি আপন কার্য সম্বন্ধে সদা জাগ্রত ছিলেন এবং কন্যাকুমারিকা হতে হিমালয় পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষকে আপন কর্মক্ষেত্র বলে গ্রহণ করেছিলেন, কারণ এই সমস্ত ভূখণ্ড সংস্কৃতিসূত্রে একত্র গ্রথিত ও একই প্রেরণায় প্রাণবন্ত, বাইরে যত বিভিন্নরূপই গ্রহণ করুক না কেন। তাঁর সময়ে ভারতে যে সমস্ত বিভিন্ন চিন্তাধারা মানুষের মনকে ব্যস্ত করে রেখেছিল তিনি সেগুলিকে সংশ্লিষ্ট করে দেশের দৃষ্টিভঙ্গীতে ঐক্য আনার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর বত্রিশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে তিনি বহু দীর্ঘ জীবনের কাজ করে গেছেন, এবং ভারতের উপর তাঁর প্রবল চিন্তাশক্তি ও শক্তিমান ব্যক্তিত্বের এমন ছাপ রেখে গেছেন যে তা আজও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়ে আছে। একাধারে তাঁর মধ্যে বিচিত্র সম্মিলন ঘটেছিল, কারণ তিনি ছিলেন দার্শনিক ও পণ্ডিত, অজ্ঞেয়বাদী ও মরমী, কবি ও ঋষি, আর এ ছাড়া প্রকৃত সংস্কারক এবং কুশল ব্যবস্থাপক। ব্রাহ্মণ্যধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি দশটি শাখা স্থাপিত করেছিলেন, আর এদের চারটি এখনও বেশ বর্তে আছে। তিনি চারটি বিশাল মঠ স্থাপন করেছিলেন, দূরে দূরে প্রায় ভারতের চার

কোণে। একটি ছিল মহীশূরে শ্রীঙ্গেরিতে, একটি পূর্ব-উপকূলে পুরীতে, তৃতীয়টি কাথিয়াওয়াড়ে (সুরাষ্ট্র) দ্বারকায়, আর চতুর্থটি হিমালয়ের বুকের মধ্যে বদরিনাথে। বত্রিশ বছর বয়সে গ্রীষ্মপ্রধান দাক্ষিণাত্যের এই ব্রাহ্মণ হিমালয়ের তুষারাচ্ছন্ন অত্যুচ্চ অংশে, কেদারনাথে প্রাণত্যাগ করেন।

যখন যাতায়াত ছিল কষ্টসাধ্য, আর যানবাহন ছিল আদিকালের এবং মন্থর. সেই সময়ে শঙ্কর যে এই বিশাল দেশের সর্বত্র ভ্রমণ করেছেন একথাটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। এইভাবে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন, সর্বত্র তাঁরই ন্যায় মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের দেখা পেয়ে, তাঁদের সঙ্গে তখনকার দিনের বিদ্বান লোকের সাধারণ ভাষা, সংস্কৃতে, আলাপ-আলোচনা করেছেন, এতে দেখা যায় যে সেই পুরাতন কালেও ভারতে বিশেষ ঐক্য ছিল। এই সকল ভ্রমণ তখন এমন কিছু অসাধারণ কাজ ছিল না, কারণ লোকে রাজনৈতিক বিভাগ সত্ত্বেও যাতায়াত করত, গ্রন্থও এদিক থেকে ওদিকে যেত, এবং নূতন চিন্তা কি নূতন অনুমান সমগ্র দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ত; লোকে সেসব নিয়ে আলোচনা করত। অনেক সময় প্রচণ্ড বাদ-প্রতিবাদও ঘটত। শিক্ষিত লোকদের মধ্যে একটা বুদ্ধি ও সংস্কৃতিমূলক সাধারণ জীবন ছিল, আর এছাড়া নিম্নতর স্তরের লোকদেরও মহাকাব্যের যুগ থেকে ভারতবর্ষে যে বহুসংখ্যক তীর্থক্ষেত্র ছড়িয়ে আছে সেসব জায়গায় ক্রমাগত যাতায়াত ছিল। এই কারণে এবং ভারতের বিভিন্ন অংশের লোকের মধ্যে দেখাশোনায় মানুষের মনে একটা সাধারণ দেশ ও সাধারণ সংস্কৃতির ধারণা নিশ্চয়ই বদ্ধমূল হয়েছিল। ভ্রমণ যে কোনো উচ্চ বর্ণের লোকেরাই করত তা নয়, যাত্রীদের মধ্যে সকল জাতির সকল শ্রেণীর লোকই থাকত। এই সকল তীর্থভ্রমণে মানুষের মনে ধর্মনৈতিক যে ফলই হোক না, এর মধ্যে এখনকার কালের মতই ছুটির দিনের আমোদের ও নানা নূতন নূতন স্থান দেখার ভাবও ছিল। প্রত্যেক তীর্থস্থানে অল্প পরিসরে সমগ্র ভারতের সকল বৈচিত্র্যই দেখা যায়—নানা রীতিনীতি, নানা পরিচ্ছদ, নানা ভাষা। তবু সকলে স্পষ্টই অনুভব করে সেই সমস্ত বিষয়, সেই সমস্ত সূত্র, যেগুলি তাদের সবাইকে এক করে রেখেছে এবং এক জায়গায় এনে মিলিয়েছে। তাদের নানাবিধ আদান-প্রদানে উত্তর ও দক্ষিণের ভাষার পার্থক্যও বাধা দিতে পারেনি।

শঙ্করের সময়েও এইরূপ ছিল, এবং তিনি যে সে-কথা জানতেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। মনে হয় শঙ্কর এই জাতীয় ঐক্য ও এক মনোভাব বাড়িয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি বোধহয় দার্শনিকতত্ত্ব ও ধর্মের ক্ষেত্রে কাজ করে, দেশের সর্বত্র গভীরতর চিন্তার ঐক্য আনতে চেয়েছিলেন। তিনি সাধারণ লোকের মধ্যেও বহুভাবে কাজ করেছিলেন এবং এইরূপে অনেক লৌকিক মত দূর করেছিলেন। তাঁর দর্শন-মন্দিরের দ্বার খুলে রেখেছিলেন যে পারে সেই-ই প্রবেশ করবে বলে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, চারদিকে চার মঠ প্রতিষ্ঠাদ্বারা তিনি ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্যের ধারণাটিকে উৎসাহ দিয়ে ফলিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। পূর্বের ন্যায় এবং এখন বেশি করে এই চারটি স্থান ভারতের সকল অংশ থেকে আগত যাত্রীদের তীর্থ হয়ে আছে।

প্রাচীন ভারতীয়েরা তীর্থের জন্য কি সুন্দর সুন্দর স্থানই না নির্বাচন করে নিয়েছিলেন। প্রায় সকলগুলিই মনোরম স্থানে প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। কাশ্মীরে অমরনাথে তুষারাকীর্ণ গহ্বর দেখা যায়, আর কন্যাকুমারিকা অন্তরীপের কাছে রামেশ্বরমে ভারতবর্ষের সর্ব দক্ষিণ অগ্রভাগে কুমারী দেবীর মন্দির। তারপর এদিকে বারাণসী; আর হিমালয়ের পাদদেশে হরিদ্বার, গঙ্গা এখানে বহু আঁকাবাঁকা পার্বত্য-উপত্যকা-অধিত্যকা দিয়ে এসে সমতল ভূমিতে প্রবাহিতা হয়েছে; প্রয়াগে যমুনা মিলিত হয়েছে গঙ্গায়; আর যমুনার উপর মথুরা এবং বৃন্দাবন কৃষ্ণকাহিনীতে পরিবৃত; তারপর বুদ্ধগয়া; বুদ্ধ এখানেই বুদ্ধত্বলাভ করেছিলেন বলে শোনা যায়; আর দক্ষিণে আছে বহু তীর্থ। অনেক পুরাতন মন্দিরে বিশেষভাবে দাক্ষিণাত্যে, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও অন্যান্য শিল্পের চিহ্নাবশেষ দেখা যায়। এইরূপ তীর্থস্থানে ভ্রমণ করলে ভারতের শিল্পসম্বন্ধে গভীর জ্ঞান জন্মে।

শোনা যায়, শঙ্কর সুবিস্তৃত ধর্মরূপে বৌদ্ধধর্মের অবসান ঘটাতে সাহায্য করেছিলেন, আর এর পর ব্রাহ্মণ্যধর্ম যেন ভ্রাতৃস্নেহের আলিঙ্গনে এ-ধর্মকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। কিন্তু শঙ্করের সময়ের আগেই বৌদ্ধধর্ম ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। তাঁর কোনো কোনো ব্রাহ্মণ-প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁকে ছদ্মবেশী বৌদ্ধ বলেছিলেন। একথা অবশ্য সত্য যে তাঁর উপর বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রভাব ঘটেছিল।

১৫ : ভারতবর্ষ ও চীন

ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যেকার বহু সংস্পর্শ এবং তাদের নৈকট্য বৌদ্ধধর্মের মধ্যে দিয়ে ঘটেছিল। অশোকের রাজত্বের আগে এরূপ কোনো সংস্পর্শ হয়েছিল কি না আমরা জানি না; রেশম চীন থেকে আসত সুতরাং সম্ভবত সমুদ্রপথে বাণিজ্য কিছু ছিল। ভারতবর্ষের পূর্বসীমান্ত প্রদেশের মানুষের মধ্যে মোঙ্গলীয় আকৃতি সাধারণভাবেই দেখা যায় এবং এই কারণে মনে হয় অতি প্রাচীনকালেও স্থলপথে এই দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ ছিল, এবং লোকেরা বসবাসের জন্য এখান থেকে চীনে ও চীন থেকে এখানে এসেছিল। নেপালে এরূপ দৃষ্টান্ত খুবই দেখা যায়, আর আসামে (পুরাতন কামরূপ) এবং বাঙলাতেও প্রায়ই নজরে পরে। ঐতিহাসিক দিক থেকে বলতে গেলে অশোকের ধর্ম-প্রচারকেরাই প্রথম পথ কেটে এগিয়েছিলেন আর চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রচার যতই বৃদ্ধি পেয়েছে ততই এই দুই দেশ হতে বহু তীর্থযাত্রীদল যাতায়াত করেছে, আর এরূপ হয়েছে প্রায় হাজার বছর ধরে। তারা স্থলপথে গোবি মরু ও সমতলভূমি পার হয়ে হিমালয়ের উপর দিয়ে ও মধ্য-এশিয়ার পাহাড়-পর্ব্বত উত্তীর্ণ হয়ে যেত। পথ ছিল দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল। অনেক ভারতীয় ও চীনদেশীয় যাত্রী পথে প্রাণ হারাত। একটা বিবরণ থেকে জানা যায় যে যাত্রীদের শতকরা ৯০ জনের মৃত্যু ঘটেছিল। অনেকে গন্তব্যস্থানে পেঁৗছে আর দেশে ফেরেনি, নূতন দেশেই থেকে গিয়েছিল। আরও একটা পথ ছিল, যদিচ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ নয়, তবে দৈর্ঘ্যে সম্ভবত

কিছু কম। এ সমুদ্রপথ গিয়েছে চীন-ভারত, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, মালয় এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ হয়ে। এপথ প্রায়ই ব্যবহৃত হত এবং কখনও কখনও কোনো কোনো যাত্রী স্থলপথে গিয়ে সমুদ্রপথে দেশে ফিরত। বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি সমগ্র মধ্য-এশিয়ার এবং অংশত ইন্ডোনেশিয়ার উপর ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং এই বিশাল ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক মঠ ও বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চীন ও ভারতবর্ষ হতে যাত্রীরা জলপথে ও স্থলপথে এই সকল স্থানে গিয়ে সাদর আতিথ্যলাভ করত। কখনও কখনও চীন থেকে ছাত্রেরা ইন্ডোনেশিয়ার কোনো ভারতীয় উপনিবেশে কয়েক মাস থেকে সংস্কৃতভাষা শিখে নিয়ে ভারতবর্ষে আসত।

ভারতবর্ষ থেকে যেসকল পণ্ডিত ব্যক্তিরা চীনে গিয়েছিলেন তাঁদের ভ্রমণের সর্বাপেক্ষা পুরাতন বিবরণী যা পাওয়া যায় তা হল কাশ্যপ মাতঙ্গ সম্বন্ধে। ইনি চীনে পেঁছান ৬৭ খৃস্টাব্দে, সম্রাট সিং-তি-র রাজত্বকালে, সম্ভবত তাঁরই আহ্বানে। তিনি লো নদীর তীরে লো-ইয়াং নামক স্থানে বাস করেন। ধর্মরক্ষা তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে যেসকল খ্যাতিমান পণ্ডিতেরা যান তাঁদের নাম বুদ্ধভদ্র, জিনভদ্র. কুমারজীব, পরমার্থ, জিনগুপ্ত এবং বোধিধর্ম। এঁদের প্রত্যেকেই আপন আপন ভিক্ষু বা শিষ্য মণ্ডলী সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। বলা হয়েছে যে খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর একসময় এক লো-ইয়াং প্রদেশেই তিন হাজারের উপর বৌদ্ধভিক্ষু এবং দশ হাজার ভারতীয় পরিবার ছিল।

এই সকল পরিব্রাজক ভারতীয় পণ্ডিতেরা, চীনে অনেক সংস্কৃত পুঁথি সঙ্গে নিয়েছিলেন ও চীনের ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সেই ভাষায় মৌলিক গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। চৈনিক সাহিত্যে তাঁদের দান যথেষ্ট, তাতে কবিতাও ছিল। কুমারজীব ৪০১ খৃস্টাব্দে চীনে যান। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। আমরা তাঁর রচিত ৪৭ খানা বিভিন্ন পুস্তক পেয়েছি। চীনের ভাষায় তাঁর রচনাভঙ্গী উৎকৃষ্ট বলে শোনা যায়। তিনি ভারতীয় মহাপণ্ডিত নাগার্জুনের জীবনী চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। জিনগুপ্ত খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে চীনে যান। ইনি ৩৭খানি মৌলিক সংস্কৃত গ্রন্থ চীনের ভাষায় তর্জমা করেন। তাঁর জ্ঞান-গরিমা এরূপ বৃদ্ধি পেয়েছিল যে ত'আং বংশের একজন সম্রাট তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

পণ্ডিতেরা যেমন এদেশ থেকে চীনে গিয়েছিলেন তেমনি বহু চীনদেশীয় পণ্ডিত এদেশে এসেছিলেন। যাঁরা ভ্রমণবৃত্তান্ত রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি-লাভ করেছেন ফা-হিয়েন, সুং ইউন, হিউয়েন্‌ৎসাঙ এবং ই-সিং। ফা-হিয়েন পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতে আসেন। তিনি চীনে কুমারজীবের শিষ্য ছিলেন। তিনি যখন যাত্রার আগে বিদায় গ্রহণ করতে যান, কুমারজীব তাঁকে বলেছিলেন তিনি যেন তাঁর সমস্ত সময় ধর্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান সংগ্রহে ব্যয় না করেন এবং ভারতের অধিবাসীদের রীতিনীতি ও জীবন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেন, কারণ তাহলে চীনও ভারতকে ভাল করে জানতে ও বুঝতে পারবে। ফা-হিয়েন পাটলিপুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন।

সপ্তম শতাব্দীতে, যখন ত'আং বংশ চীনে শক্তিশালী ছিল এবং হর্ষবর্ধন উত্তর-ভারতে তাঁর সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য করছিলেন তখন চীনদেশীয় ভ্রমণকারীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হিউয়েন্‌ৎসাঙ ভারতে আসেন। ইনি স্থলপথে গোবি মরু পার হয়ে, তুরফান, কুচ, তাসখন্ড, সমরখন্দ, বাল্‌খ্‌, খোটান ও ইয়ারখন্ডের উপর দিয়ে এসে হিমালয় উত্তীর্ণ হয়ে ভারতে পেঁছিান। তিনি তাঁর পথের বিপদ-আপদের কথা, মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধরাজা ও মঠের কথা, উৎসাহশীল তুর্কি-বৌদ্ধদের কথা লিখে গেছেন। ভারতে তিনি সর্বত্র ভ্রমণ করেছিলেন, সকলস্থানে সম্মান লাভ করেছিলেন এবং সর্বত্র স্থান ও লোক সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করে গেছেন, আর এছাড়া তিনি যে অনেক আমোদজনক ও বিচিত্র গল্প শুনেছিলেন তাও লিখেছেন। পাটলিপুত্রের কাছে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অনেক বছর কাটিয়েছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় বহুবিষয়ক বিদ্যার আয়তনরূপে প্রসিদ্ধ ছিল এবং দেশের সকল স্থান হতে এখানে ছাত্রসমাগম ঘটত। শোনা যায়, দশ হাজার ছাত্র ও ভিক্ষু এখানে অবস্থিতি করত। হিউয়েন্‌ৎসাঙ এখানে আইন-বিশারদের উপাধি গ্রহণ করেন এবং শেষে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যক্ষ হন।

হিউয়েন্‌ৎসাঙ-এর পুস্তক, সি-ইউ-কি, অর্থাৎ পশ্চিমদেশীয় রাজ্যের (অর্থাৎ ভারতের) বিবরণ, একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। তিনি এসেছিলেন উচ্চ সভ্যতাপ্রাপ্ত, নানা সংস্কৃতিসমৃদ্ধ দেশ থেকে। তখন তাঁর দেশের রাজধানী সি-আন-ফু ছিল শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্ররূপে প্রসিদ্ধ, সুতরাং ভারতের তদানীন্তন অবস্থার বিবরণ ও তারা উপর মন্তব্য তিনি যা রেখে গেছেন তা মূল্যবান। তিনি তখনকার শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে বলেছেন যে শিক্ষা অল্প বয়সে আরম্ভ হত ও ধাপে ধাপে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত চলত, আর সেখানে (১) ব্যাকরণ, (২) কলা ও কারুশিল্পবিজ্ঞান, (৩) ভেষজবিদ্যা, (৪) ন্যায় এবং (৫) দর্শন অধ্যাপনা করা হত। তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন ভারতীয়দের জ্ঞানপিপাসা। সকল ভিক্ষু ও পুরোহিতেরাই শিক্ষক ছিলেন; সুতরাং একপ্রকার প্রাথমিক শিক্ষা যথেষ্টই বিস্তৃতিলাভ করেছিল। দেশবাসীদের সম্বন্ধে বলেছেন, 'সাধারণ লোকেরা যদিচ স্বভাবত সরলচিত্ত, তারা ব্যবহারে সৎ ও মর্যাদা-সম্পন্ন। অর্থসম্পর্কিত ব্যাপারে তারা অকপট এবং সহৃদয়তার সঙ্গে বিচার করতে সমর্থ। তাদের ব্যবহারে প্রবঞ্চনা কি বিশ্বাসঘাতকতা নেই, তারা বিশ্বস্তভাবে শপথ ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। তাদের রাজ্যশাসনে আশ্চর্যরূপে সততার পরিচয় পাওয়া যায়, আর আচরণে পাওয়া যায় শান্ত, মধুর ভাব। অপরাধী ও বিদ্রোহী ব্যক্তির সংখ্যা অল্প, তারা কদাচিৎ উপদ্রব করে।' তিনি আরও বলেছেন, 'শাসনকার্য দয়াধর্মে প্রতিষ্ঠিত, এবং ব্যবস্থাও আড়ম্বরশূন্য।......লোককে বিনা পারিশ্রমিকে জোর করে খাটানো হয় না......প্রজাদের দেয় কর, শুল্ক প্রভৃতিও অল্প।......ব্যবসায়ীরা যথেচ্ছ বাণিজ্য-ব্যপদেশে যাতায়াত করত।'

হিউয়েন্‌ৎসাঙ যে-পথে এসেছিলেন সেই পথে মধ্য-এশিয়া হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন, আর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন অনেক পুঁথি। তাঁর বিবরণী থেকে সুস্পষ্টরূপে জানা

যায় খোরাসান, ইরাক, মোসুল এবং সীরিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত সকল স্থানে বৌদ্ধধর্মের কিরূপ প্রভাব ছিল। তবু এই সময়ে ঐসব জায়গায় বৌদ্ধধর্ম দুর্বল হয়ে আসছিল আর আরবদেশে ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইসলামধর্ম প্রসারলাভ করতে আরম্ভ করেছে। ইরানীদের সম্বন্ধে হিউয়েন্‌ৎসাঙ মন্তব্য করেছেন, 'এরা বিদ্যালাভে কোনো স্পৃহা দেখায় না, কেবল কারুশিল্পে আত্মনিয়োগ করে আছে। তারা যা কিছু তৈরি করে নিকটবর্তী দেশে তা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে মূল্যবান বলে গৃহীত হয়।'

পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কালেও যেমন, তখনও তেমনি, ইরান জীবনকে সুসজ্জিত করতেই সব মনোযোগ দিয়েছিল, আর এর প্রভাব এশিয়ার দূর দূর অঞ্চলেও প্রসারিত হয়েছিল। গোবি মরুর এক প্রান্তে তুরফান একটি অদ্ভুত ক্ষুদ্র রাজ্য; হিউয়েন্‌ৎসাঙ এর বিবরণ দিয়ে গেছেন। তারপর পুরাতত্ত্ববিদদের নিকট হতে আরও অনেক কিছু জানা গেছে। এখানে অনেক সংস্কৃতি এসে মিলেছিল এবং একটি মিশ্রিত সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল চীন, ভারত ও পারস্য দেশ হতে, এমনকি গ্রীক সংস্কৃতি থেকেও কিছু কিছু প্রেরণা নিয়ে। ভাষা ইউরোপ-ভারতীয়, ইরান ও ভারত থেকে পাওয়া, কতকটা ইউরোপের সেল্‌টিক ভাষার মত; ধর্ম এসেছিল ভারত থেকে, জীবনের ধারা চীন থেকে, আর শিল্পজাত বহু দ্রব্য ইরান হতে। সুন্দর সুন্দর বুদ্ধ এবং দেবদেবীর মূর্তি ও প্রাচীর চিত্রের পরিচ্ছদ ভারতীয়, শিরোভূষণ গ্রীক। মঁসিয়ে গ্রুসে বলেন যে দেবীগুলির মূর্তি ও ছবিতে পাওয়া যায় 'হিন্দু নমনীয়তা, গ্রীসীয় সুপ্রকাশ-ভঙ্গী এবং চীনদেশীয় লালিত্যের বড়ই সুন্দর সমাবেশ।'

হিউয়েন্‌ৎসাঙ দেশে ফিরে গিয়ে তাঁর সম্রাট ও দেশবাসীর কাছ থেকে আদর লাভ করেছিলেন। তারপর তিনি একস্থানে বসবাসের ব্যবস্থা করে যে সমস্ত পুঁথি সঙ্গে এনেছিলেন সেগুলির অনুবাদে মনোনিবেশ করেন। কথিত আছে যে যখন তিনি অনেক বছর আগে দেশ থেকে যাত্রা করেন তখন সম্রাট ত'আং পানীয় পদার্থে এক মুষ্টি ধূলি মিশ্রিত করে তাঁকে দিয়ে বলেছিলেন, 'যদি এই পাত্রের পানীয় গ্রহণ কর তাহলে ভাল করবে, কারণ আমরা তো জানি কোনো ব্যক্তির আপন দেশের এক মুষ্টি মৃত্তিকা দশ সহস্র পাউন্ড বিদেশী সোনা হতেও মূল্যবান।'

হিউয়েন্‌ৎসাঙ ভারতভ্রমণ করতে আসায়, এবং তিনি নিজের দেশে এবং ভারতে যে সম্মানলাভ করেছিলেন তার ফলে, এই দুই দেশের রাজাদের মধ্যেও সংস্পর্শ ঘটেছিল। কনৌজের হর্ষবদ্ধন ও ত'আং সম্রাট পরস্পরের সভায় রাজদূত পাঠিয়ে-ছিলেন। হিউয়েন্‌ৎসাঙ তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে পত্রালাপের মধ্যে দিয়ে ভারতের সঙ্গে যোগ-রক্ষা করতেন আর এইভাবে পুঁথি সংগ্রহ করতেন। চীনে দুখানি পত্র রক্ষিত আছে, মূল সংস্কৃতে লেখা এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর একখানি ৬৫৪ খৃস্টাব্দে স্থবির প্রজ্ঞাদেব নামে একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত কর্তৃক হিউয়েন্‌ৎসাঙকে লেখা। আপ্যায়নাদির পর এপত্রে উভয়ের বন্ধুদের সংবাদ দেওয়া হয়েছে, আর আছে, 'আমরা যে ভুলি না তার চিহ্নস্বরূপ একজোড়া শুভ্রবস্ত্র পাঠালাম। পথ দীর্ঘ, সুতরাং উপহার ক্ষুদ্র হওয়ায় কিছু মনে করবেন না। আমরা আকাঙ্ক্ষা করি আপনি এই উপহার

গ্রহণ করুন। আর আপনার যেসমস্ত সূত্র ও শাস্ত্র আবশ্যক তালিকা পাঠাবেন. আমরা গ্রন্থগুলি নকল করে পাঠাব।' হিউয়েন্‌ৎসাঙ তাঁর পত্রোত্তরে বলেছেন, 'অল্পদিন আগে ভারত থেকে প্রত্যাগত একজন রাজদূতের কাছ হতে শুনেছি মহা অধ্যাপক শীলভদ্র আর ইহজগতে নেই। এই সংবাদে আমার শোকের অবধি নেই...... যেসকল সূত্র এবং শাস্ত্র আমি সঙ্গে এনেছিলাম তার মধ্যে যোগাচার্য-ভূমি-শাস্ত্র এবং অন্যান্য গ্রন্থ. মোট ৩০খানি পুস্তক অনুবাদ করেছি। বিনয়ের সঙ্গে আপনাকে জানাচ্ছি যে সিন্ধুনদ পার হবার সময় শাস্ত্রগ্রন্থের একটি মোট হারিয়েছে। যা গেছে তার তালিকা এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। যদি সুযোগ মেলে, এইগুলি পাঠাবার জন্য অনুরোধ করি। কয়েকটি সামান্য দ্রব্য উপহারস্বরূপ পাঠাচ্ছি অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করবেন।'*

হিউয়েন্‌ৎসাঙ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছেন; এ ছাড়াও এই স্থানের আরও অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। তবু কয়েক বছর আগে আমি যখন সেখানে গিয়ে নালন্দার খননে প্রকাশিত ধ্বংসাবশেষ দেখি তখন স্থানটির বিস্তৃতি ও ব্যবস্থার বিশালতা দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। পুরাতন স্থানের সামান্য অংশমাত্র খননে প্রকাশ পেয়েছে, আর অখনিত অংশের উপর এখন লোকে ঘরবাড়ি তৈরি করে বসবাস করছে। যা দেখতে পাওয়া গেছে তাতে আছে অনেক প্রস্তরনির্মিত সুবৃহৎ অট্টালিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত বিরাট প্রাঙ্গণের অবশেষ।

হিউয়েন্‌ৎসাঙ চীনে দেহত্যাগ করার অল্পদিন পরে আর একজন প্রসিদ্ধ চীনদেশীয় পরিব্রাজক ভারতে আসেন। তার নাম ই-সিং। তিনি ৬৭১ খৃস্টাব্দে যাত্রা করেন এবং হুগলী নদীর মোহনায় তাম্রলিপ্ত বন্দরে পেঁছতে তাঁর প্রায় দুবছর লেগেছিল। এর কারণ তিনি সমুদ্রপথে এসেছিলেন, আর পথের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য শ্রীভোগে (সুমাত্রার অন্তর্গত বর্তমান প্যালেম্‌বাং) অনেক মাস অপেক্ষা করেছিলেন। তাঁর এই যাত্রা উল্লেখযোগ্য, কারণ সে সময় সম্ভবত মধ্য-এশিয়ায় গোলমাল চলছিল এবং রাজনৈতিক অনেক পরিবর্তন ঘটছিল। এই কারণেই সে-পথের বহু বৌদ্ধ মঠ বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকবে। অথবা, সম্ভবত ইন্দোনেশিয়ার ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হওয়ায় এবং এই সকল দেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যের ও অন্যান্য যোগ ঘটায় সমুদ্রপথই সুবিধাজনক ছিল। ই-সিং লিখিত এবং অন্যান্য বিবরণী থেকে জানা যায় যে তখন পারস্য, ভারতবর্ষ, মালয়, সুমাত্রা ও চীনের মধ্যে নিয়মিত সমুদ্রযাত্রা চলছিল। ই-সিং কোয়াংটুং থেকে একটি পারস্যদেশীয় জাহাজে যাত্রা করে প্রথমটা সুমাত্রায় যান।

ই-সিং অনেকদিন ধরে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং কয়েকশো সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করে দেশে ফেরেন। তাঁর আগ্রহ ছিল প্রধানত বৌদ্ধ রীতিনীতির ও অনুষ্ঠানাদির সূক্ষ্মদিকে, এবং এই সকল বিষয়ে খুঁটিনাটি অনেক কিছুই তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তিনি প্রথাদি, পরিচ্ছদ ও আহার্য সম্বন্ধেও বলেছেন। এখনকার মত তখনও উত্তর-ভারতে গম প্রধান আহার্য বস্তু ছিল, আর দক্ষিণ ও পূর্ব-ভারতে

* ডক্টর পি. সি. বাগচির 'ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড চাইনা' (কলিকাতা : ১৯৪৪) গ্রন্থে উদ্ধৃত।

চাল। মাংস কখনও কখনও খাওয়া হত, কিন্তু তার দৃষ্টান্ত অল্পই, (ই-সিং সম্ভবত অন্যাদের অপেক্ষা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কথাই বেশি বলেছেন)। ঘি, তেল, দুধ এবং ননি সকলস্থানেই পাওয়া যেত, আর পিঠা ও ফল মিলত প্রচুর। ই-সিং বিশেষভাবে লক্ষ্য করে গেছেন যে ভারতীয়েরা অনুষ্ঠানাদি নির্দোষভাবে সম্পন্ন করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করত। তিনি লিখেছেন, 'পাঁচটি প্রদেশসমন্বিত ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের মধ্যে প্রথম ও প্রধান পার্থক্য হল বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধের মধ্যে যে প্রভেদ করা হয় তার বিশেষত্বে।' আবার বলেছেন, 'ভুক্তাবশেষ পরের আহারের জন্য রেখে দেওয়া (যেমন চীনদেশে প্রচলিত আছে) ভারতবর্ষে নিয়মবিরুদ্ধ।'

ই-সিং ভারতবর্ষকে পশ্চিমদেশ বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু লিখেছেন যে একে আর্য-দেশ বলা হয়: "আর্যদেশ; আর্য অর্থাৎ মহান; দেশ, ভূখণ্ড; পশ্চিমদেশের নাম 'মহান ভূখণ্ড'। একে এই নাম দেওয়া হয়েছে কারণ মহৎ চরিত্রের লোকেরা পর্যায়ক্রমে এদেশে জন্মগ্রহণ করেন, এবং সেইজন্য এই নাম দিয়ে দেশটির প্রশস্তি করা হয়েছে। এর আর একটি নাম 'মধ্যদেশ', অর্থাৎ মধ্যবর্তী দেশ, কারণ দেশটি লক্ষ লক্ষ দেশের কেন্দ্রস্বরূপ। লোকেরা এ-নামটিও জানে। কেবল উত্তরের লোকেরা (হুন, মোঙ্গল বা তুর্কি) এই মহান্ দেশকে 'হিন্দু' (সিন্‌টু) বলে, কিন্তু এ-নাম তেমন প্রচলিত নয়, এর কোনো বিশেষ অর্থও নেই। ভারতের লোকেরা এই আখ্যাটির কথা জানে না; ভারতের যথাযোগ্য নাম 'মহান দেশ'।"

ই-সিং 'হিন্দু' সম্বন্ধে যা কিছু বলেছেন সেসমস্ত বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য। তিনি বলেছেন, 'কেউ কেউ বলেন ইন্দু শব্দের অর্থ চন্দ্র, আর চীনের ভাষায় ভারতের নাম, অর্থাৎ ইন্দু (ইন্‌-টু) , এই শব্দ হতে এসেছে। এরূপ অর্থ হতেও পারে, তবে এ-নাম সাধারণত ব্যবহৃত হয় না। আর মহান চৌ-এর (চীনের) ভারতবর্ষীয় আখ্যা : চীন—একটি নাম মাত্র, এর কোনো বিশেষ অর্থ নেই।' তিনি কোরিয়া ও অন্যান্য দেশের সংস্কৃত নামেরও উল্লেখ করেছেন।

ই-সিং ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষীয় বহু বিষয়ের প্রশংসাবাদ করেছেন, তবে এ-কথাটিও স্পষ্ট করে বলেছেন যে তিনি প্রথম স্থানটি দেন নিজের মাতৃভূমিকে। ভারত 'মহান দেশ', কিন্তু চীন 'দিব্য দেশ'। 'ভারতের পাঁচ অংশের লোকেরা আপনাদের শুদ্ধতা ও শ্রেষ্ঠতার গর্ব করে থাকে। কিন্তু সুরুচি, সাহিত্যিক পারিপাট্য, সুসঙ্গত ও সংযত আচরণ, অভ্যর্থনা ও বিদায়কালীন রীতি, আহার্যের রুচিকর স্বাদ এবং দাক্ষিণ্য ও সততার উৎকর্ষ কেবল চীনেই পাওয়া যায়, আর কোনো দেশ চীনকে এ-বিষয়ে অতিক্রম করতে পারে না।' "শলাকা চিকিৎসা ও উত্তপ্ত ধাতব অস্ত্রের সাহায্যে চিকিৎসায় এবং নাড়ীজ্ঞানে ভারতের কোনো অংশই চীন অপেক্ষা অগ্রসর হয়নি; জীবন দীর্ঘ করার ঔষধ কেবল চীনেই পাওয়া যায়।......অধিবাসীদের চরিত্র ও তাদের প্রস্তুত দ্রব্যের গুণের জন্য চীনকে 'দিব্য দেশ' বলা হয়। ভারতের পাঁচ অংশ এমন কেউ কি আছে যে চীনের প্রশংসা করে না?"

পুরাতন সংস্কৃত সাহিত্যে চীনের সম্রাটকে 'দেবপুত্র' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এ-নাম

'সন্ অফ হেভ্ন'-এর একেবারে সঠিক অনুবাদ। ই-সিং নিজে সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বলেছেন যে এই ভাষা উত্তর কি দক্ষিণ দূরদেশেও সম্মানলাভ করে। '......অতএব দিব্য দেশের (চীনের) লোকেরা ও স্বর্গীয় ভাণ্ডারের (ভারতের) লোকেরা এই ভাষা ব্যবহারের যথার্থ নিয়মাদি যত্নপূর্বক অন্য দেশের লোকেদের যেন শিক্ষাদান করে।'* সংস্কৃতভাষাবাহী বৈদগ্ধ্য চীনে যথেষ্ট প্রসারলাভ করে থাকবে। কয়েকজন চীনদেশীয় পণ্ডিত চৈনিক ভাষায় সংস্কৃত উচ্চারণ বিধি প্রচলিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। ভিক্ষু শাউওয়েন্ ছিলেন ত'আং বংশের রাজত্বকালের লোক। তিনি এই বিধি অনুসারে চৈনিক ভাষায় একটি বর্ণমালা প্রস্তুত করতে চেষ্টা করেছিলেন।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম দুর্বল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে যে পণ্ডিতদের বিনিময় চলছিল তাও প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, যদিচ ভারতের মধ্যে যেসকল বৌদ্ধ তীর্থ-স্থান আছে সেগুলি দেখবার জন্য চীন থেকে যাত্রীরা আসত। একাদশ শতাব্দী থেকে যে রাজনৈতিক বিপ্লবের যুগ চলেছিল সেই সময় বহু বৌদ্ধভিক্ষু পুঁথির বোঝা বহন করে নেপালে গিয়েছিলেন, এবং হিমালয় উত্তীর্ণ হয়ে তিব্বতে পৌঁছেছিলেন। এইরূপে ভারতীয় সাহিত্যের প্রভূত অংশ, পূর্বে এবং তখন চীনে ও তিব্বতে যায়, আর বর্তমান সময়ে সেগুলির মৌলিক গ্রন্থ, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুবাদ আবিষ্কৃত হচ্ছে। ভারতবর্ষের বহু পুরাতন গ্রন্থ চৈনিক ও তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদের মধ্যে দিয়ে রক্ষিত হয়েছে, সেগুলি কেবল বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে নয়, সেগুলির মধ্যে আছে ব্রাহ্মণ্যধর্ম, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, ভেষজবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের গ্রন্থ। চীনের সুংপাও সংগ্রহে অনেকে মনে করেন এরূপ ৮,০০০ গ্রন্থ আছে। তিব্বত এরূপ গ্রন্থে পূর্ণ বললে হয়। ভারতীয়, চৈনিক ও তিব্বতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে সহযোগিতা প্রায়ই ঘটত এরূপ জানা যায়। এইরূপ সহযোগিতার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দের সংস্কৃত-তিব্বতীয়-চৈনিক অভিধানটি। এর নাম 'মহাব্যুৎপত্তি'; গ্রন্থখানি খৃস্টীয় নবম কি দশম শতাব্দীতে রচিত।

অষ্টম শতাব্দী হতে আরম্ভ করে যত ছাপা বই চীনে আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে সংস্কৃত বইও আছে। এগুলি খোদাইকরা কাঠের ফলক থেকে ছাপা। দশম শতাব্দীতে চীনে রাজকীয় মুদ্রাকর সমিতি গঠিত হয় এবং এর ফলে দশম শতক থেকে আরম্ভ করে সুং যুগ পর্যন্ত ছাপার কাজ দ্রুত উন্নতিলাভ করে। বিস্ময়ের কথা ভারতীয় ও চৈনিক পণ্ডিতেরা শতশত বছর ধরে সাহিত্য বিষয়ে সহযোগিতা করেছেন, এবং পুস্তক ও পুঁথি বিনিময় করেছেন—তবু এই কালের ভারতে প্রস্তুত ছাপার কাজের কোনোই নিদর্শন মেলে না। এর কারণ বোঝা যায় না। ছাপার জন্য কাঠের ফলক ব্যবহার চীন থেকে তিব্বতে যায় অনেক কাল আগে, আর আমার বিশ্বাস

* জে. টাকাকুসু : ই-সিং-এর ভারতবর্ষে ও মালয় দ্বীপপুঞ্জে আচরিত বৌদ্ধধর্মের বিবরণীর অনুবাদ থেকে গৃহীত।

এখনও তার ব্যবহার সেখানে চলছে। এই কাজ ইউরোপে যায় মোঙ্গল কিংবা ইউআন বংশের রাজত্বকালে (১২৬০-১৩৬৮), প্রথমে জার্মানি এটা জানতে পারে এবং তারপর পঞ্চদশ শতাব্দীতে অন্য সব দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

ভারতের আফগান-ভারতীয় ও মুঘল যুগেও ভারত ও চীনের মধ্যে মাঝে মাঝে কূটনৈতিক আদান-প্রদান চলেছিল। দিল্লীর সুলতান, মুহম্মদ বিন্ তুঘলক (১৩২৬-৫১) বিখ্যাত আরবদেশীয় ভ্রমণকারী ইব্ন্ বাতুতাকে রাজদূতরূপে চীনে পাঠিয়েছিলেন। এই সময় বাঙলাদেশ দিল্লীর প্রভুত্ব ঝেড়ে ফেলে আপন সুলতানের অধীনে আসে। চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি চীন রাজসভা বাঙলার সুলতানের সভায় দুজন দূত পাঠান, হু-শিএন্ এবং ফিন্-শিএন্। এর পর সুলতান ঘিয়াস-উদ্-দীনের রাজত্বকালে বাঙলা থেকে চীনে দূতের পর দূত পাঠানো হয়েছিল। এ হল চীনে মিং সম্রাটদের সময়। পরবর্তীকালে, ১৪১৪তে, সৈয়দ্-উদ্-দীন যে দূতদের পাঠান তাঁরা অনেক মূল্যবান উপহার নিয়ে গিয়েছিলেন, আর উপহারের মধ্যে ছিল একটি জীবন্ত জিরাফ। জিরাফ যে কেমন করে ভারতে এসেছিল তা জানা যায় না, হয়তো আফ্রিকা হতে উপহারস্বরূপ এসে থাকবে। দুষ্প্রাপ্য জীবটি পেয়ে তিনি সুখী হবেন বলে মিং সম্রাটের কাছে পাঠানো হয়েছিল। বাস্তবিক, এ-উপহারটি বিশেষভাবে মূল্যবান বলে গৃহীত হয়েছিল, কারণ চীনে কনফিউসিয়াসের অনুবর্তীদের কাছে জিরাফ এখনও শুভলক্ষণরূপে গৃহীত হয়। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে এ জন্তুটি জিরাফই ছিল, কারণ এর একটা দীর্ঘ বর্ণনা ছাড়া চীন দেশেই রেশমের উপর আঁকা এর একখানা ছবিও আছে। রাজসভার শিল্পী যিনি এই ছবিটি এঁকেছিলেন তিনি জন্তুটির প্রশংসা করে একটি লিখিত বিবরণ রেখে গেছেন, আর এ থেকে যে সৌভাগ্য আসবার কথা তাও লিখেছেন। 'মন্ত্রীরা এবং লোকেরা ভিড় করে জিরাফটি দেখতে এসেছিল, আর তাদের আনন্দের অবধি ছিল না।'

ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য বৌদ্ধযুগে উন্নতিলাভ করে। আফগান ভারত ও মুঘল যুগেও এই বাণিজ্য অব্যাহতভাবে চলেছিল। এই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যদ্রব্য বিনিময় বরাবর ছিল। এ বাণিজ্য স্থলপথে হিমালয়ের উত্তর গিরিসংকটের মধ্যে দিয়ে মধ্য এশিয়ার পুরাতন যাত্রীপথ হয়ে চলত। এছাড়া জলপথেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপ হয়ে, প্রধানত দাক্ষিণাত্যের বন্দরগুলিতে, বাণিজ্যের ব্যবস্থা ছিল।

এই প্রায় সহস্রাধিক বছর ধরে ভারত ও চীনের মধ্যে যে আদান-প্রদান চলেছিল তাতে প্রত্যেক দেশটি অপরটির কাছ থেকে কিছু-না-কিছু শিখে নিয়েছিল। তা যে কেবল চিন্তা ও দর্শন বিষয়েই ঘটেছিল তা নয়, সুকৌশলে জীবন-পরিচালনা ও তার বিজ্ঞানসম্মত রীতি সম্বন্ধেও আদান-প্রদান হয়েছিল। সম্ভবত ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে পরস্পরের উপর পরস্পরের প্রভাব চীনেই অধিকতরভাবে পড়েছিল। আমাদের দেশ যে বেশি কিছু নিতে পারেনি তা আমাদের পক্ষে পরিতাপের বিষয়, কারণ চীনের সবল সহজজ্ঞান কিছু পেলে এদেশের উপকার হত, তার সাহায্যে অতিরিক্ত কল্পনা-প্রবণতাকে অনেকটা দমন করতে পারা যেত। চীন অনেক কিছুই ভারতবর্ষ থেকে

নিয়েছে, কিন্তু নিয়েছে আপন শক্তিতে, দৃঢ়বিশ্বাসের জোরে, নিজের রীতিতে নিজের জীবনধারার সঙ্গে মিলিয়ে।* এমনকি সেখানে বৌদ্ধধর্ম এবং তার জটিল তত্ত্ব কনফিউসিয়াস ও লাও-শে'র মতবাদের সঙ্গে একটুখানি মিশ্রিত করে গৃহীত হয়েছিল। বৌদ্ধদর্শনের কতকটা দুঃখবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, চীনবাসীদের জীবনের প্রতি অনুরাগ ও আমোদপ্রিয়তায় পরিবর্তন আনতে পারেনি, দমন করতেও পারেনি। একটি পুরাতন চীনদেশীয় প্রবাদ আছে, 'রাজশক্তি যদি তোমাকে ধরতে পারে কশাঘাতে মেরে ফেলবে। আর বৌদ্ধেরা যদি ধরে, তারা মেরে ফেলবে অনাহারে!'

ষোড়শ শতাব্দীর একখানি বিখ্যাত চৈনিক উপন্যাস য়ুচ'এন্-এন্-কৃত 'বানর' (আর্থার ওয়েলি এই পুস্তক ইংরাজিতে অনুবাদ করেছেন)। এই পুস্তকে হিউয়েন্‌ৎ-সাঙ-এর ভারত যাত্রার পথে নানা আশ্চর্য ও কৌতুকজনক ঘটনার কাহিনী আছে। শেষ অধ্যায়ে পুস্তকখানি ভারতবর্ষকে উৎসর্গ করে লেখা হয়েছে, 'এই পুস্তক আমি বুদ্ধের নিষ্পাপ পবিত্র দেশের কাছে উৎসর্গ করলাম। এ যেন পৃষ্ঠপোষক এবং উপদেষ্টাদের দয়ার যোগ্য প্রতিদান হতে পারে: এ যেন দুর্গত ও অভিশপ্তদের ক্লেশের উপশম ঘটাতে পারে......।'

এর পর বহুশতাব্দী ভারত ও চীন পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন ছিল, আবার উভয় দেশ অদ্ভুত বিধিবিড়ম্বনায় ইংরাজের ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর আওতায় এসে পড়ে। ভারতবর্ষকে এই প্রভাবের বোঝা বহুদিন ধরে সহ্য করতে হয়েছে; চীনে ইংরেজ সংস্পর্শটা অল্পদিনেই শেষ হয়, যাবার আগে ইংরেজরা তাদের অবদানস্বরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অহিফেন রেখে গেছে।

এখন অদৃষ্টচক্রের পূর্ণ বৃত্তটাই ঘুরে গেছে, আর ভারতবর্ষ ও চীন পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, পুরাতন স্মৃতি তাদের মনে আজ ভিড় করে এসেছে; আবার নূতনতর যাত্রীদল পর্বতের ব্যবধান উত্তীর্ণ হয়ে কি তার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে পরস্পরকে উৎসাহ দিচ্ছে, শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, আর সৌহার্দ্যের নূতন নূতন বাঁধন গড়ছে, যা হবে চিরস্থায়ী যোগসূত্র।

১৬ : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ ও সংস্কৃতি

ভারতবর্ষকে যদি জানতে ও বুঝতে হয় আমাদের সময় ও স্থানের ব্যবধান ছাড়িয়ে দূরে যেতে হবে। আমরা যেন কিছুক্ষণের মত আমাদের দুর্গতি, ক্ষুদ্রতা ও বিভীষিকা ভুলে যেতে পারি। তাহলে আমরা আভাস পাব আমাদের দেশ একদিন কেমন ছিল, কি যোগ্যতা দেখিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'আমার দেশকে জানতে হলে সেই যুগে যেতে হবে যখন সে তার আত্মাকে উপলব্ধি করেছিল, তার বাস্তব

* চৈনিক নবযুগ আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক হু-শি অতীতে চীনের ভারতীয় ভাবাপন্ন হওয়া সম্বন্ধে এইরূপ লিখেছেন।

সীমা অতিক্রম করে ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছিল, যখন ভারত আত্মপ্রকাশ করেছিল দীপ্যমান মহানুভবতায়; যে-প্রকাশ পূর্বদিগন্ত আলোকিত করে বহু বিদেশের অধিবাসীদের অন্তরে এনেছিল এই প্রত্যয় যে ভারত তাদেরও আপন। তারা জাগ্রত হয়ে উঠেছিল চমকিত বিস্ময়ে জীবনের অনুভূতিতে। এখন দেখলে আমার দেশকে জানা যাবে না, এখন সে এক ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যে আত্মগোপন করেছে, হীন গর্বে সকলকে বাইরে ঠেকিয়ে রেখেছে। সে-অতীতের সকল আলো নিবে গেছে, ভবিষ্যতের যাত্রীদের জন্য তার কোনো বাণী নাই। আজ তার দীন মন নিজেকে নিয়ে মূক হয়ে নিজেরই চারি-দিকে আবর্তিত হচ্ছে।'

কেবল যে অতীতকালে ফিরে যেতে হবে তা নয়, সশরীরে না হলেও মনে মনে এশিয়ার দেশে দেশে বিচরণ করতে হবে যেখানে যেখানে ভারতবর্ষ নানাভাবে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিল, রেখে এসেছিল তার অন্তরাত্মার অবিনশ্বর পরিচয়, তার শক্তির, তার সৌন্দর্য-প্রীতির বহু প্রমাণ। আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকে জানে আমাদের অতীতের এই সকল মহৎ কীর্তির কথা, অতি অল্প লোকে অনুভব করে যে ভারতবর্ষ চিন্তা ও দার্শনিকতত্ত্বে মহৎ বলে স্বীকৃত হয়েছিল, এবং কর্মেও সমান মহত্ত্বলাভ করেছিল। ভারতের নরনারীরা তাদের স্বদেশ থেকে দূরে যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল তা এখনও লেখা বাকি আছে। পশ্চিমবাসীরা অধিকাংশই এখনও মনে করে যে প্রাচীন ইতিহাস প্রধানত ভূমধ্যসাগরতীরস্থ দেশগুলিকে নিয়ে, আর মধ্যযুগ ও বর্তমানকালের ইতিহাস ইউরোপ নামক কলহপ্রিয় ক্ষুদ্র মহাদেশটির ব্যাপার। এখনও তারা ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করছে যেন ইউরোপই সব এবং বাকি সমস্তকে কোথাও না কোথাও খাপ খাইয়ে নেওয়া যেতে পারবে।

স্যর চার্লস্ এলিয়ট লিখেছেন, 'একদল ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের আক্রমণকারীদের ইতিহাস বর্ণন করে এরূপ ধারণার সৃষ্টি করেন যেন তার অধিবাসীরা দুর্বল ও স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায়, এবং অবশিষ্ট মানবসমাজ হতে আপনাদের সমুদ্র ও পর্বতের দ্বারা বিচ্ছিন্ন। এঁরা ভারতের প্রতি সুবিচার করেন না। এতে হিন্দুদের বুদ্ধিবৃত্তির বিজয়ের কোনো কথা নেই। তাদের রাজনৈতিক বিজয়ও তাচ্ছিল্যের বিষয় ছিল না, কারণ অধিকৃত ভূখণ্ডের বিস্তৃতির জন্য যদি বা নাই হয়, দূরত্বের জন্য তা উল্লেখযোগ্য। তবু ভারতীয় চিন্তার প্রসারের তুলনায় এই প্রকারের সামরিক ও বাণিজ্য ঘটিত প্রচেষ্টা তুচ্ছ।'*

এলিয়ট যখন একথা লেখেন তখন হয়তো জানতেন না যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইতিমধ্যে বহু আবিষ্ক্রিয়া ঘটেছে, এবং তার ফলে ভারত ও এশিয়ার অতীত দিন সম্বন্ধে ধারণা একেবারে বদলে গেছে। এই সমস্ত আবিষ্কারের কথা জানা থাকলে তাঁর যুক্তি আরও জোর পেত এবং তিনি দেখাতে পারতেন যে চিন্তার প্রসার ছাড়াও বিদেশে ভারতের কীর্তিকলাপ আদৌ তাচ্ছিল্যের বিষয় ছিল না। আমার মনে আছে, প্রায়

* এলিয়ট : 'হিন্দুয়িস্‌ম্ অ্যান্ড বুদ্ধিস্‌ম্' : ১ম খণ্ড, ১২ পৃঃ।

পনেরো বছর পূর্বে প্রথম যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিশদভাবে লিখিত ইতিহাস পাঠ করেছিলাম তখন আমার বিস্ময়ের অবধি ছিল না—উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। মনের মধ্যে ভেসে উঠেছিল চতুর্দিকে এক নূতন রূপ, ইতিহাস ফুটে উঠেছিল নবতর অর্থ নিয়ে, ভারতের অতীতের বহু অজ্ঞাত সংবাদ বহন করে। এই সমস্তের সঙ্গে মিলিয়ে আমার পূর্বের চিন্তা ও ধারণাগুলিকে বদলে নিতে হয়েছিল। শূন্য থেকে হঠাৎ প্রকাশ পেয়েছিল চম্পা, কাম্বোডিয়া এবং আংকোর শ্রীবিজয় এবং মজাপাহিত। সেদিন দেখতে পেয়েছিলাম এই সব ভারত উপনিবেশের জীবন্ত রূপ, তাদের সেই সহজাত প্রাণচঞ্চল ভাব—যার দ্বারা অতীত স্পর্শ করে বর্তমানকে।

ডক্টর এইচ· জি· কোয়ারিচ্ ওয়েল্স্ প্রবল পরাক্রমশালী বিজয়ী বীর শৈলেন্দ্রের বিষয়ে লিখেছেন, 'এঁর কীর্তিকলাপ কেবল পাশ্চাত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তাঁর খ্যাতি সেই সময়ে পারস্য হতে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। দশ বিশ বছরের মধ্যে তিনি সমুদ্রের পরপারে বিপুল একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলে-ছিলেন, এই সাম্রাজ্য পাঁচ শতাব্দী টিকে ছিল এবং তার ফলে ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতি যবদ্বীপ ও কাম্বোডিয়ায় অতি আশ্চর্যরূপে উন্নতিলাভ করেছিল। তথাপি আমাদের বিশ্বকোষে ও ইতিহাসে এই সুদূরপ্রসারিত সাম্রাজ্য কি তার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে অনুসন্ধান করলে কিছুই পাওয়া যাবে না।......এ সাম্রাজ্য যে কোনোদিন ছিল, সেকথা প্রাচ্যের বিষয়ে অনুশীলনকারী কয়েকজন ব্যক্তি ব্যতীত আর কারও জানা নেই।'*

অতীতের এই সকল ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের সামরিক প্রচেষ্টার আলোচনা বিশেষভাবে মূল্যবান, কারণ এ-প্রসঙ্গে ভারতীয় চরিত্র ও প্রতিভার এমন সকল দিকে আলোকপাত করে যেগুলি এখনও পর্যন্ত স্বীকৃত হয়নি। তবে তাদের উপনিবেশ-গুলিতে তারা যে উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলেছিল সেকথা আরও মূল্যবান। এই সভ্যতা সহস্রাধিক বছর ধরে বলবৎ ছিল।

গত পঁচিশ বছরে সুবিস্তৃত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। এই অঞ্চলকে কখনও কখনও 'বিশাল ভারত' বা 'বৃহত্তর ভারত' আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এর ইতিহাসে এখনও অনেক ফাঁক আছে, কখনও কখনও পরস্পর-বিরোধী কথাও পাওয়া যায়। বিভিন্ন পণ্ডিতেরা এরূপ অনুমান প্রকাশ করেন যার মধ্যেও বিরোধ দেখা যায়। তবে এ ইতিহাসের মোটামুটি নক্সাটা বেশ সুস্পষ্ট, খুঁটিনাটি অনেক কথা জানতে পারা গেছে। যাই হোক, উপকরণের অভাব নেই, কারণ ভারতের অনেক পুস্তকে এই বিষয়ের কথা পাওয়া যায়; আরব-দেশীয় ভ্রমণকারীরাও কিছু কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, আর চীনের ঐতিহাসিক বিবরণে বহু মূল্যবান তথ্য আছে। এ ছাড়া অনেক পুরাতন খোদিত লিপি ও তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। জাভা ও বলিতে ভারতীয় বিষয়ের উপর লিখিত বহু গ্রন্থ

* 'টুঅর্ডস আংকোর' (হ্যারাপ, ১৯৩৭) হতে উদ্ধৃত।

আছে, এদের কোনো কোনোটিতে ভারতীয় মহাকাব্য ও পুরাণ সেখানকার ভাষায় লেখা হয়েছে। গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য হতেও তথ্যাদি পাওয়া যায়। এসব ছাড়া, প্রাচীন স্মৃতিসৌধগুলির ধ্বংসাবশেষ এই ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের পক্ষে খনিস্বরূপ, বিশেষভাবে যেগুলি আংকোর ও বোরাবুদুরে পাওয়া গেছে।*

খৃস্টীয় অব্দের প্রথম শতাব্দী হতে দলের পর দল ভারতীয় ঔপনিবেশিকেরা পূর্বে ও দক্ষিণপূর্বে গিয়েছিল এবং সিংহল, ব্রহ্ম, মালয়, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্নিও, শ্যাম, কাম্বোডিয়া ও চীন-ভারতে উপস্থিত হয়েছিল। এদের মধ্যে কেউ কেউ ফর্মোসা, ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ এবং সেলিবিস পর্যন্ত পৌছতে সমর্থ হয়েছিল। এমনকি ম্যাডা-গ্যাস্কোরের চলিত ভাষাও হল ইন্দোনেশিয়ান, আর এতে অনেক সংস্কৃত শব্দ মিশ্রিত আছে। এইভাবে বিস্তৃতিলাভ করতে নিশ্চয়ই তাদের কয়েকশো বছর লেগেছিল, আর খুব সম্ভব এই জায়গাগুলির প্রত্যেকটিতে ভারত থেকে বরাবর যাওয়া হয়নি, হয়েছিল কোনো না কোনো মধ্যবর্তী উপনিবেশ হতে। খৃস্টাব্দের প্রথম শতাব্দী থেকে প্রায় ৯০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত চারটি প্রধান ঔপনিবেশিক অভিযান ঘটেছিল বলে মনে হয়। এই অভিযানের ফাঁকে ফাঁকে দলে দলে লোক গিয়েছিল পূর্বাভিমুখে। একটা বিষয় লক্ষণীয় যে রাজশক্তিই এই সব অভিযানের ব্যবস্থা করেছিলেন। দূরে দূরে উপনিবেশগুলি প্রায় একই সময়ে স্থাপিত হয়েছিল। উপনিবেশগুলি এরূপ স্থানে স্থাপিত হয় যেখানে সামরিক সুবিধা পাওয়া যায় ও প্রধান প্রধান বাণিজ্যপথেরও সুবিধা পাওয়া যায়। এই সকল স্থানগুলিকে পুরাতন ভারতীয় নাম দেওয়া হয়েছিল, যেমন এখন যাকে বলে কাম্বোডিয়া পূর্বে তার নাম ছিল কম্বোজ। গান্ধারে বা কাবুল উপত্যকায় এই নামে একটি সুপরিচিত শহর ছিল। এ থেকে এই উপনিবেশ স্থাপনের সময়েরও খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যায়, কারণ তখন গান্ধার (আফগানি-স্থান) নিশ্চয়ই আর্য-ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছিল।

এখন প্রশ্ন ওঠে বিপদসঙ্কুল সমুদ্র পার হয়ে এই অসাধারণ অভিযানগুলি কেমন করে ঘটল—কোন প্রেরণায়? এগুলির আগে নিশ্চয়ই অনেক যুগ কি শতাব্দী ধরে কোনো কোনো ব্যক্তি কি ছোট ছোট দল বাণিজ্যের জন্য সমুদ্রযাত্রা করেছিল এবং তারপর অভিযানগুলির পরিকল্পনা মনে এসেছিল ও তখন তার ব্যবস্থাও হয়েছিল। অতি প্রাচীন কোনো কোনো সংস্কৃত গ্রন্থে এই সমস্ত পূর্বদেশ সম্বন্ধে অস্পষ্ট উল্লেখ আছে। সকল সময় নামগুলি চিনে নেওয়া যায় না, আবার মাঝে মাঝে চিনে নিতে কোনো অসুবিধাও ঘটে না। 'যবদ্বীপ' নাম, 'যবের দ্বীপ' হতে পাওয়া গেছে; এখনও আমরা যব শব্দ এই অর্থে ব্যবহার করি। পুরাতন পুস্তকগুলিতে আরও যেসকল নাম পাওয়া গেছে তাও সাধারণত কোনো খনিজপদার্থ, কি ধাতু, কিংবা কোনো শ্রম-

* ডক্টর আর. সি. মজুমদারের 'এন্‌সিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান কলনীস ইন দি ফার ইস্ট' (কলিকাতা: ১৯২৭) আর তাঁর 'স্বর্ণদ্বীপ' (কলিকাতা: ১৯৩৭) দ্রষ্টব্য। কলিকাতার 'বৃহত্তর ভারত সমিতি'র প্রকাশিত পুস্তকাদিও দ্রষ্টব্য।

শিল্পজাত অথবা কৃষিজাত পদার্থের সঙ্গে সংশিলষ্ট। নামগুলি হতে বাণিজ্যের কথাই মনে হয়। ডক্টর আর· সি· মজুমদার দেখিয়েছেন যে কোনো দেশের সাহিত্যে তার অধিবাসীদের মনের খবর থাকে, আর এইরূপ বিচারে আমরা জানতে পারি যে 'খৃস্টীয় অব্দ আরম্ভ হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে ও পরে ভারতে ব্যবসায় ও বাণিজ্য ভারতীয় জনসাধারণের প্রধান আগ্রহের বিষয় ছিল।' এই সমস্ত হতে বিধিবদ্ধ অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার কথা মনে হয়, আর মনে হয়, তখনকার লোকেরা সকল সময় দূর দেশে পণ্য বিক্রয়ের জন্য বাজারের সন্ধান করত। খৃস্টপূর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতের বাণিজ্য বৃদ্ধিলাভ করেছিল। মনে রাখতে হবে এটা ছিল অশোকের পরবর্তী সময়। বণিকেরা অগ্রসর হওয়ার পর ধর্মপ্রচারকেরা তাদের অনুসরণ করে। সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক পুরাতন গল্পে সমুদ্রযাত্রা ও জাহাজের দুর্ঘটনার কথা আছে। গ্রীক ও আরব-দেশীয় বিবরণীতে খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীতেও ভারতবর্ষ ও দূর পূর্বের মধ্যে সমুদ্রপথে আদান-প্রদানের কথা পাওয়া যায়। চীন, ভারত, পারস্য, আরব ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যে যে বাণিজ্য-পথ ছিল সেই পথেই পড়ত মালয় উপদ্বীপ ও ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ। এই ভূখণ্ডের ভৌগোলিক গুরুত্ব ছিল এবং তা ছাড়া এই দ্বীপগুলিতে মূল্যবান খনিজপদার্থ, ধাতু, মশলা ও গড়ন-কাঠ পাওয়া যেত প্রচুর। এখনকার মত তখনও মালয় তার রাং-এর খনির জন্য বিখ্যাত ছিল। সম্ভবত প্রথম প্রথম সমুদ্রযাত্রা ঘটেছিল ভারতের পূর্ব-উপকূল ধরে, প্রথমে কলিঙ্গ (উড়িষ্যা), বাঙলা, ব্রহ্ম, আর তারপর মালয় উপদ্বীপ হয়ে। এর পরে, পূর্বদেশ, ও দাক্ষিণাত্য হতে সিধা জলপথ আবিষ্কৃত হয়। এই পথে বহু চীনদেশীয় তীর্থযাত্রী ভারতে এসেছিল। ফা-হিয়েন পঞ্চম শতাব্দীতে যবদ্বীপ হয়ে আসেন, এবং অভিযোগ করেন যে সেখানে অনেক ধর্মদ্রোহী ব্যক্তি দেখেছেন। যারা ব্রাহ্মণ্যধর্মে বিশ্বাসী, বৌদ্ধ নয়, তিনি তাদেরই কথা বলেছেন এরূপ অনুমান করা যেতে পারে।

স্পষ্টই জানা যায় যে প্রাচীন ভারতে জাহাজ নির্মাণ একটা উন্নত ও সমৃদ্ধ শ্রমশিল্প হয়ে উঠেছিল। সেই সময়ে প্রস্তুত জাহাজের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া গেছে। অনেক ভারতবর্ষীয় বন্দরের কথাও জানা যায়। খৃস্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর দাক্ষিণ-ভারতীয় (অন্ধ্র) মুদ্রায় দুটি মাস্তুলযুক্ত জাহাজের প্রতিকৃতি দেখা গেছে। অজন্তার প্রাচীর চিত্রে সিংহল-বিজয়ের ছবি আছে, আর আছে হাতি নিয়ে যাচ্ছে এমন জাহাজের ছবি। যে সকল শক্তিশালী রাজ্য ও সাম্রাজ্য ভারতীয় উপনিবেশগুলি স্থাপন করেছিল তারা বিশেষভাবে নৌশক্তি-সম্পন্ন ও বাণিজ্যে আগ্রহান্বিত ছিল বলে জলপথগুলিকে আয়ত্ত রেখেছিল। তারা সমুদ্রের উপর পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধও করেছিল। এরূপ একটি ভারতীয় উপনিবেশ দক্ষিণ-ভারতের চোলরাজ্যকে যুদ্ধে আহবান করে, কিন্তু চোলরাও সমুদ্রের উপর যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিমান ছিল, তারা নৌবহর পাঠিয়ে কিছুকালের জন্য শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্যকে দমন করে রেখেছিল।

১০৮৮ খৃস্টাব্দের একটি ক্ষোদিত তামিল লিপিতে 'পনেরো শতের সমবায়ের' কথা পাওয়া যায়। যতটা বোঝা যায় এটা ব্যবসায়ীদের সমবায় ছিল। বলা হয়েছে যে এরা

ছিল 'সাহসী পুরুষ, কৃতযুগের (সত্যযুগের) প্রারম্ভ হতে বহু দেশ ভ্রমণ করে বেড়িয়েছে, পাইকারি ও খুচরা হিসাবে ঘোড়া, হাতি, মূল্যবান পাথর, গন্ধদ্রব্য ও ঔষধাদি বিক্রয়ের কাজে জল ও স্থলপথে ছয় মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রবেশ করেছে।'

এই হল ভারতীয়দের প্রথম উপনিবেশ স্থাপন-প্রচেষ্টার পটভূমিকা। বাণিজ্য, বিদেশে কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টায় অনুরক্তি এবং শক্তি বিস্তারের প্রেরণায় বশবর্তী হয়ে তারা পূর্বদেশগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। সংস্কৃত গ্রন্থে এই সকল স্থানকে বলা হয়েছে 'স্বর্ণভূমি' অথবা 'স্বর্ণদ্বীপ' এই নামের মধ্যেই প্রলুব্ধ করার কারণ নিহিত ছিল, প্রথম ঔপনিবেশিকেরা স্থির হয়ে বসার পর তাদের দলের আরও লোক এসে পড়ত এবং এইভাবে দূরের দেশে শান্তিতে প্রবেশলাভ ঘটত। স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে আগন্তুকদের মিশ্রণ আরম্ভ হলে ক্রমে একটা মিশ্রিত সংস্কৃতিও বিবর্তিত হয়ে উঠত। সম্ভবত এর পর ভারতবর্ষ হতে ক্ষত্রিয় রাজপুত্রেরা কি সম্ভ্রান্তবংশীয় সামরিক শিক্ষার্থীরা সাহসিকতার কাজ কিংবা রাজত্ব স্থাপনের আকাঙ্ক্ষায় উপস্থিত হত। নামের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে এইরূপে যারা এসেছিল তারা ভারতে বহুবিস্তৃত 'মাল্ব' জাতির লোক, আর এদের থেকেই এসেছে মালয় জাতি। এরা সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছে। এখনও মধ্য-ভারতের একটা অংশ মালয় নামে পরিচিত। প্রথমদিকের ঔপনিবেশিকেরা পূর্ব-উপকূলের কলিঙ্গ (উড়িষ্যা) হতে যাত্রা করেছিল এইরূপ মনে করা হয়। দাক্ষিণাত্যের হিন্দু পল্লবরাজ্য উপনিবেশ-স্থাপনের জন্য যথাযোগ্য আয়োজন ও সংগঠনের ব্যবস্থা করেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে শৈলেন্দ্রবংশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল তা অনেকের মতে উড়িষ্যা হতে গিয়েছিল। উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্ম ছিল প্রবল, কিন্তু রাজবংশ ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী।

এই ভারতীয় উপনিবেশগুলি দুটি বৃহৎ দেশ ও দুটি গৌরবময় সভ্যতার মাঝখানে অবস্থিত ছিল—ভারতবর্ষ ও চীন। তাদের কতকগুলি এশিয়াভূখণ্ডের উপরেই চীন-সাম্রাজ্যের সীমান্তে আর অপরগুলি চীন ও ভারতের মধ্যস্থিত বাণিজ্যপথের উপরেই ছিল। সুতরাং এই দুই দেশের দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ায় এই স্থানগুলিতে একটি চীন-ভারতীয় মিশ্রিত সভ্যতা প্রকাশ পায়, কিন্তু এই দুই সংস্কৃতি এরূপ প্রকৃতির যে তাদের মধ্যে কোনো বিরোধ উপস্থিত হয়নি, এবং নানা আকারের ও নানা প্রকারের মিশ্রিতরূপ পাওয়া গিয়েছিল। এশিয়া মহাদেশের স্থল অংশের উপনিবেশগুলিতে, যেমন, ব্রহ্ম, শ্যাম ও চীন-ভারতে—চীনের প্রভাব হয়েছিল বেশি, আর দ্বীপগুলি ও মালয় উপদ্বীপে ভারতবর্ষের ছাপ বেশি পড়েছিল। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই শাসন-পদ্ধতি ও জীবনাদর্শ এসেছিল চীন হতে, আর ধর্ম ও শিল্পকলা এসেছিল ভারত থেকে। মহাদেশের উপরকার দেশগুলি তাদের বাণিজ্যের জন্য বেশিরভাগ চীনের উপর নির্ভর করত, এবং তাদের মধ্যে প্রায়ই দূত বিনিময় ঘটত, কিন্তু কাম্বোডিয়াতে এবং আংকোরের বিশাল ধ্বংসাবশেষগুলিতে যা কিছু শিল্পাদর্শের প্রভাব দেখা গেছে তা

রাজ্য বলা হত, তবে ১২৯২ খৃস্টাব্দে মজাপহিত নামে একটি নূতন নগর স্থাপিত হয়। এর পর মজাপহিত সাম্রাজ্য উদ্ভূত হয়ে শ্রীবিজয়ের পরিবর্তে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রধান-শক্তির স্থান অধিকার করে। মজাপহিত কুব্লাই খাঁ প্রেরিত কয়েকজন চৈনিক দূতকে অপমান করে, এবং তার জন্য শাস্তিস্বরূপ চীন হতে তার বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরিত হয়। যবদ্বীপবাসীরা সম্ভবত চৈনিকদের কাছ থেকে বারুদের ব্যবহার শিক্ষা করে এবং এর সাহায্যে শৈলেন্দ্রদের সম্পূর্ণরূপে জয় করতে সমর্থ হয়।

মজাপহিত ছিল বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত বিস্তৃতিশীল একটি সাম্রাজ্য। এখানকার কর ধার্য ও আদায়ের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থার কথা জানা যায়। এ রাজ্য বাণিজ্য ও উপনিবেশ-বিস্তারে বিশেষ মনোযোগ দিত। রাজ্যশাসনের ব্যবস্থার মধ্যে ব্যবসায়, বাণিজ্য ও ঔপনিবেশিক বিভাগ, সাধারণের স্বাস্থ্য বিভাগ, যুদ্ধবিগ্রহ, স্বরাষ্ট্র প্রভৃতি বিভাগ পরিচালনার আয়োজন ছিল। কয়েকজন বিচারপতি সহযোগে একটি প্রধান বিচারালয় ছিল। এখানকার সাম্রাজ্যশাসনের বিধি-ব্যবস্থা ছিল বিস্ময়কর। প্রধান কাজ ছিল ভারত হতে চীনে বাণিজ্য। স্বনামধন্য রানী সুহিতা এক সময় এখানকার শাসনকর্ত্রী হন।

মজাপহিত ও শ্রীবিজয়ের মধ্যে যে যুদ্ধ ঘটে তাতে বিষম নির্দয়তা প্রকাশ পেয়েছিল। যদিচ মজাপহিত জয়লাভ করে, যুদ্ধের যে অবসান হয়েছিল একথা বলা যায় না, কারণ এই জয়েই ভবিষ্যৎ সংঘর্ষের বীজ উপ্ত হয়েছিল। শৈলেন্দ্র-শক্তির অবশেষের সঙ্গে অন্যেরা বিশেষত আরবেরা ও মুসলমান ধর্মান্তর-গ্রাহীরা, প্রবল হয়ে ওঠে এবং এর ফলে সুমাত্রা ও মালাক্কায় মালয়শক্তি উদ্ভূত হয়। পূর্বসমুদ্রের উপর এতদিন দক্ষিণ-ভারত অথবা ভারতীয় উপনিবেশগুলি প্রভুত্ব বজায় রেখেছিল, এখন তা আরবদের হাতে চলে গেল। এইরূপে মালাক্কা সুবৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে এবং ইসলাম-ধর্ম মালয় উপদ্বীপ ও অন্যান্য দ্বীপগুলিতে বিস্তৃত হয়েছিল। এই নূতন শক্তি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মজাপহিত শক্তিকে নিঃশেষ করেছিল। কিন্তু কয়েক বছর পরেই, ১৫১১ খৃস্টাব্দে অ্যাল্বুকার্ক-এর অধীনে পর্তুগীজেরা মালাক্কা দখল করে। এখন ইউরোপ তার নূতন ও উন্নতিশীল নৌশক্তি-প্রভাবে দূর পূর্বে এসে উপস্থিত হল।

১৭ : বিদেশে ভারতীয় শিল্পের প্রভাব

এই সমস্ত প্রাচীন সাম্রাজ্য ও রাজবংশগুলির বিবরণ পুরাতত্ত্ববিদের কাছে সমাদর লাভ করে, কিন্তু সভ্যতা ও শিল্পের ইতিহাসের উপাদানরূপে এদের মূল্য বেশি। ভারতের দিক হতে বিচার করলে এগুলির গুরুত্ব অনেক, কারণ সুদূর বিদেশ ও দ্বীপগুলিতে ভারতই বহু কর্মে এবং নানা রূপে আপন জীবনীশক্তি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিল। আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভারতের শক্তি উচ্ছলিত প্রবাহে দূরে—সুদূরে ছড়িয়ে পড়ছে, কেবল তার চিন্তা সঙ্গে যাচ্ছে তা নয়, তার অন্যান্য আদর্শ, তার শিল্প, তার বাণিজ্য, তার ভাষা, তার সাহিত্য এবং তার শাসন-ব্যবস্থা সমস্তই তার সঙ্গে চলেছে। ভারতের জীবন প্রবাহ কখনও রুদ্ধ হয়নি, এদেশ কোনো দিন

পর্বত ও সমুদ্রের দ্বারা অন্য সকল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একলা দাঁড়ায়নি। ভারতের অধিবাসীরা ঐসকল পর্বতের বাধা এবং বিপদসঙ্কুল সমুদ্র পার হয়ে গড়ে তুলেছিল, মঁসিয়ে রিনি গ্রুসে যাকে বলেছেন, 'একটি বৃহত্তর ভারত। বৃহত্তর গ্রীস যেমন এও তেমনি রাজনৈতিক দিকে সুব্যবস্থিত ছিল না কিন্তু নৈতিক ও মানসিক ব্যাপারে সামঞ্জস্যসাধন উভয়েই সমান পরিমাণে করতে পেরেছিল।' বস্তুত এই মালয়েসিয়ানদের রাজনৈতিক বিধিবদ্ধতাও উচ্চশ্রেণীরই ছিল, যদিচ তা ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত ছিল না। মঁসিয়ে গ্রুসে ভারতীয় সংস্কৃতি যে বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রসারলাভ করেছিল তার কথা বলেছেন : 'পূর্ব ইরানের মালভূমিতে, সিরিণ্ডিয়ার মরূদ্যান-গুলিতে, তিব্বতের এবং মোঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার শুষ্ক অনুর্বর অংশে, প্রাচীন ও সভ্য চীন ও জাপানে, চীন-ভারতের মন্, খ্মের প্রভৃতি আদিবাসীদের জনপদে, মালয়-পলিনেসিয়ায়, ইন্দোনেশিয়ায় ও মালয়ে—এই সকল স্থানে ভারতবর্ষ এমন ছাপ রেখে এসেছিল, যা কোনোদিন মুছে ফেলা যাবে না। এ ছাপ কেবল ধর্মের উপরে নয়, শিল্প ও সাহিত্যের উপরেও, এক কথায়, যা কিছু অন্তরের উন্নততর অবস্থা জ্ঞাপন করে সমস্তের উপর এই প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল।'*

ভারতীয় সভ্যতা বিশেষভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছিল এবং আজ এই সমস্ত স্থানে তার নিদর্শন পাওয়া যায়। চম্পা, আংকোর, শ্রীবিজয়, মজাপহিত ও অন্যান্য স্থানে সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। যেসকল রাজ্য ও সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল তাদের রাজাদের নামগুলি ছিল খাঁটি ভারতীয় ও সংস্কৃত। এ কথার অর্থ এরূপ নয় যে তারা ভারতীয়ই ছিল; আসলে তারা ভারতীয় ভাবাপন্ন হয়েছিল। রাজকীয় অনুষ্ঠানগুলি ছিল ভারতীয় আর সেগুলি সংস্কৃতে নির্বাহিত হত। রাজ্যের কর্ম-চারীরা পুরাতন সংস্কৃত পদবীতে অভিহিত হত, এবং এগুলি এখনও থাইল্যাণ্ডে (শ্যামে), এমনকি মালয়ের মুসলমান রাজ্যেও চলিত আছে। ইন্দোনেশিয়ার এই সকল স্থানের পুরাতন সাহিত্য ভারতীয় পুরাণের কাহিনী ও উপকথায় পূর্ণ। যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপের বিখ্যাত নৃত্যগুলি ভারত হতে গৃহীত। ক্ষুদ্র বলিদ্বীপটি বর্তমানকাল পর্যন্ত তার পুরাতন ভারতীয় সংস্কৃতি বজায় রেখেছে, এমনকি হিন্দু-ধর্মও সেখানে টিকে আছে। ফিলিপাইন লিখনপ্রণালী ভারতবর্ষ হতে পেয়েছিল।

কাম্বোডিয়াতে বর্ণমালা দক্ষিণ-ভারত হতে নেওয়া হয়েছে, আর বহু সংস্কৃত শব্দ সামান্য পরিবর্তিত আকারে সেদেশে প্রচলিত আছে। সেখানকার দেওয়ানি ও ফৌজ-দারি আইন ভারতের প্রাচীন সংহিতাকার মনুর বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং এগুলি বর্তমান কাম্বোডিয়ার আইনে, বৌদ্ধ প্রভাবের জন্য অল্পাধিক পরিবর্তিত করে, সংহিতাবদ্ধ করা হয়েছে।†

* রিনি গ্রুসে : 'সিভিলাইজেশন্‌স অফ দি ইস্ট্' : ২য় খণ্ড, ২৭৬ পৃঃ

† এ. লেক্লেয়ার : 'র‍্যাসার্শ স্যুর লে জোরিজিন ব্রামানিক দে লোআ কাঁবোজিয়েন' : বি. আর. চট্টোপাধ্যায়ের 'ইণ্ডিয়ান কালচারাল ইনফ্লুয়েন্স্ ইন কাম্বোডিয়া' পুস্তকে উদ্ধৃত।

এই সকল পুরাতন ভারতীয় উপনিবেশে ভারতীয় প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট হয়ে আছে তাদের চমৎকার শিল্পে ও স্থাপত্যে। প্রথমে যে প্রেরণা সেখানকার লোকেরা লাভ করেছিল তাকে কতকটা পরিবর্তিত আকারে স্থানীয় প্রতিভার সঙ্গে সংশিলষ্ট করে নিয়েছিল, আর তারই ফলে আংকোর ও বোরোবুদুরের স্মৃতি-সৌধগুলি ও আশ্চর্য দেবমন্দিরগুলির সৃষ্টি হয়। যবদ্বীপের বোরোবুদুরে, বুদ্ধদেবের জীবনের সমগ্র আখ্যায়িকাটি পাথরে ক্ষোদিত মূর্তিতে আছে। অন্যস্থানে বিষ্ণু, রাম ও কৃষ্ণের কাহিনীগুলি উৎকীর্ণ মূর্তিতে (বাস-রিলিফ্) দেখা যায়। মিস্টার ওস্‌বার্ট সিট্‌ওয়েল লিখেছেন, 'একথা অসঙ্কোচে বলা যায় যে আংকোর তার বর্তমান অবস্থাতেও সমগ্র জগতের সর্বপ্রধান বিস্ময়; এখানে আছে মানব প্রতিভা ভাস্কর্যে যত উচ্চে উঠেছে তারই একটি পরিচয়, চীনে যা দেখা যায় সে সমস্ত অপেক্ষা বহুগুণে মনোমুগ্ধকর এবং আনন্দদায়ক।' '......এখানে দেখি সেই সভ্যতার অবশেষ চিহ্ন যা ছয় শতাব্দী ধরে তার অত্যুজ্জ্বল পক্ষ বিস্তৃত করে রেখেছিল এবং তারপর এমনভাবে বিনষ্ট হয়েছে, যে তার নামও আজ কেউ উল্লেখ করে না।'

আংকোর ভাটের মন্দিরের চারদিকে বিশাল ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে। তাতে আছে কৃত্রিম হ্রদ এবং জলাশয়, প্রণালী এবং সেতু, আর একটি প্রকাণ্ড ফটক, উপরে তার 'প্রস্তরে ক্ষোদিত অতিকায় একটি মস্তক—মুখটি সুন্দর, হাসি হাসি, কিন্তু যেন একটি দুর্বোধ্য প্রহেলিকা, আকৃতি কাম্বোডিয়াবাসীর ন্যায়, রূপে ও শক্তিমত্তায় দেবোপম।' মনোমুগ্ধকর, অথচ চিত্তচাঞ্চল্যজনক এই রহস্যের হাসিটি, আর এই হাসির সঙ্গে মুখখানি বারবার অনুকৃত হয়েছে। এই ফটক দিয়ে মন্দিরে যাওয়া যায় : 'নিকটবর্তী দেবালয়টি উচ্চ কল্পনার পরিচয় দেয়, জগতে অদ্বিতীয়, আংকোর ভাট অপেক্ষাও মনোহর, কারণ এর রচনাভঙ্গী অধিকতর অপার্থিব—যেন কোনো সুদূর গ্রহের কোনো নগর হতে আনা হয়েছে......কোনো উচ্চশ্রেণীর কবিতার ছত্রগুলির মাঝে মাঝে যেমন সৌন্দর্য নিহিত থাকে যাকে ধরা যায় অথচ যায় না, তেমনি ছিল এই মন্দিরের সৌন্দর্য।'*

আংকোর সৃষ্টির প্রেরণা এসেছিল ভারত হতে, কিন্তু খ্‌মের প্রতিভা একে গড়ে তুলেছিল কিংবা এই দুটি মিলিত হয়ে এই বিস্ময় উৎপন্ন করেছিল। কাম্বোডিয়ার যে-রাজা এই মন্দিরটি গঠিত করান তাঁর নাম ছিল সপ্তম জয়বর্মণ—একেবারে ভারতীয় নাম। ডক্টর কোয়ারিচ্ ওয়েল্‌স্ বলেন, 'যখন নির্দেশ দেবার মত ভারতীয় আর কেউ সেখানে রইল না, তখনও সেখানকার লোকেরা ভারতের অনুপ্রাণনা ভোলেনি। খ্‌মের-প্রতিভা এই অনুপ্রাণনার সাহায্যে বহু বিস্ময়কর রূপ প্রকাশিত করে আশ্চর্য সবলতার পরিচয় দেয়। অবিমিশ্র ভারতীয় পরিস্থিতিতে গঠিত কোনো কিছুর সঙ্গে এগুলির তুলনা যুক্তিসঙ্গত হবে না। একথা সত্য যে খ্‌মের-সংস্কৃতি বিশেষভাবে

* এই উদ্ধৃতিগুলি অস্‌বার্ট সিট্‌ওয়েল-এর 'এসকেপ উইথ মি—অ্যান্ ওরিয়েণ্টাল স্কেচবুক' (১৯৪১) থেকে গৃহীত।

ভারতীয় প্রেরণার ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল, আর এই প্রেরণা না পেলে খ্মেররা মধ্য আমেরিকার মায়া-জাতীয় শিল্পীদের অসংস্কৃত জমকালো রূপ অপেক্ষা উন্নততর কিছু সৃষ্টি করতে পারত না। তবে এও স্বীকার করতে হবে যে বিশাল ভারতের মধ্যে এখানেই এই প্রেরণা যোগ্যতম ক্ষেত্র লাভ করেছিল।'*

এই সমস্ত আলোচনার ফলে মনে হয় নিজ-ভারতবর্ষে তার মূলগত প্রেরণা দিনদিন নিস্তেজ হয়েছে, কারণ বহুকাল ধরে নূতন কোনো ধারণা ও ভাবের স্রোত না আসায় দেশের চিত্ত অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও যথা প্রয়োজন পরিপুষ্টির অভাবে শক্তিশূন্য হয়ে পড়েছে। যতদিন ভারতবর্ষ আপন হৃদয়দ্বার সমগ্র জগতের কাছে উন্মুক্ত রেখে ও নিজের সমৃদ্ধির অংশ অপরকে দিয়ে তাদের কাছ থেকে আপন অভাব দূর করে নিয়েছিল, ততদিন সতেজ, সবল ও জীবনীশক্তিসম্পন্ন ছিল। কিন্তু যতই সে আত্ম-রক্ষার লোভে নিজের খোলার মধ্যে প্রবেশ করে বাইরের স্পর্শ হতে দূরে থাকার প্রয়াস পেয়েছে, ততই সে প্রেরণাশূন্য হয়েছে এবং তার জীবন প্রাণশূন্য অতীতকে কেন্দ্র করে অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে মরছে। সৌন্দর্যসৃষ্টির শক্তি হারিয়ে তার সন্তানেরা সৌন্দর্য চিনে নেবার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলেছে।

যবদ্বীপ, আংকোর প্রভৃতি বিশাল ভারতের বহুস্থানে যে খননকার্য ও আবিষ্ক্রিয়া ঘটেছে তা হয়েছে ইউরোপের, বিশেষত ফরাসী ও ওলন্দাজ পণ্ডিত ও প্রত্নতত্ত্ববিদদের দ্বারা। হয়তো অনেক বৃহৎ নগর ও স্মৃতিসৌধ আবিষ্কৃত হওয়ার অপেক্ষায় এখনও সেখানে মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত অবস্থায় আছে। ইতিমধ্যে শোনা যাচ্ছে মালয়ে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ-সম্পন্ন অনেক স্থান খনির কাজে ও রাস্তা প্রস্তুতের সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য নষ্ট করা হয়েছে। এই নষ্ট করার কাজে যুদ্ধও নিশ্চয় যোগ দিয়েছে।

কয়েক বছর আগে শ্যামদেশীয় একটি ছাত্রের কাছ থেকে একখানি পত্র পেয়েছিলাম। এই ছাত্রটি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে অধ্যয়নের জন্য এসেছিলেন। স্বদেশে ফিরে যাবার মুখে আমায় তিনি লিখেছিলেন, 'আমার পরম সৌভাগ্য যে আমাদের মাতামহী এই প্রাচীনদেশ আর্যাবর্তে এসে তাঁর চরণে আমার শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিতে পারলাম। এ'রই স্নেহক্রোড়ে আমার মাতৃভূমি প্রেমের সঙ্গে লালিতপালিত হয়েছেন এবং সংস্কৃতি ও ধর্মে যা কিছু মহান, যা কিছু সুন্দর তাকে ভালবাসতে ও গ্রহণ করতে শিক্ষা পেয়েছেন।' শ্যামদেশীয় সকলেই হয়তো এরকম চিঠি লিখবেন না, তবে এ থেকে প্রকাশ পাচ্ছে ওদেশে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিরূপ ভাব পোষণ করা হয়ে থাকে। এরূপ শ্রদ্ধার ভাব দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশেই লক্ষ্য করা যায় যদিচ অনেকটা অস্পষ্টভাবে। সর্বত্রই এখন প্রবল কিন্তু সংকীর্ণ স্বাদেশিকতা প্রকাশ পেয়েছে, নিজের স্বার্থের দিকে সকলের দৃষ্টি, আর অপরকে অবিশ্বাস, ও ইউরোপীয় প্রভুত্ব সম্বন্ধে ভয় ও ঘৃণা দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকাকে

* ডক্টর এইচ্. জি. কোয়ারিচ্ ওয়েল্স-এর 'টুঅর্ড্স আংকোর' (হ্যারাপ, ১৯৩৩) থেকে গৃহীত।

অনুকরণ করে বাহবা নেবার ইচ্ছাটাও আছে। ভারতের পরাধীনতার জন্য এরা অবজ্ঞা প্রকাশ করে থাকে, তবু এরই অন্তরালে ভারতবর্ষের প্রতি একটু শ্রদ্ধা একটু বন্ধুত্ব অনুভব করে, কারণ পুরাতন স্মৃতি সহজে যায় না, আর তারা এখনও ভোলেনি যে একদিন ভারত তাদের দেশের মাতৃদেশ ছিল এবং আপন সমৃদ্ধ-ভাণ্ডার থেকে উত্তম আহার্য ও পানীয় দিয়ে একদিন তাদের পালন করেছে। যেমন গ্রীক সংস্কৃতি গ্রীস হতে নির্গত হয়ে ভূমধ্যসাগরতীরস্থ দেশগুলিতে ও পশ্চিম-এশিয়ায় বিস্তৃত হয়েছিল, তেমনি ভারতবর্ষের সংস্কৃতির প্রভাব বহুদেশে বিস্তার-লাভ করে গভীরভাবে আপন চিহ্ন রেখে এসেছে।

সীলভ্যাঁ লেভি লিখেছেন, 'পারস্য হতে চীন সমুদ্র পর্যন্ত, সাইবিরিয়ার তুষারাচ্ছাদিত প্রদেশ হতে যবদ্বীপ ও বোর্নিও পর্যন্ত, ওশিয়ানিয়া থেকে সোকোট্রা পর্যন্ত ভারতবর্ষ তার বিশ্বাস, তার কাহিনী ও তার সভ্যতা প্রচার করেছে। বহু শতাব্দীর পর বহু শতাব্দীতে মানবসমাজের এক চতুর্থাংশের উপর আপন চিহ্ন এমনভাবে রেখে এসেছে যে তা কোনোদিন মুছে ফেলা যাবে না। যাদের এ-জ্ঞান নেই, যারা জানে না, তারা বহুদিন ভারতবর্ষকে বিশ্বের ইতিহাসে তার যোগ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। ভারত এই উচ্চস্থান দাবী করতে পারে। মানবতার প্রতীকরূপে, তার সকল সারবস্তুর আধাররূপে, জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ দেশগুলির সঙ্গে গণনীয় হবার অধিকার আছে ভারতবর্ষের।'*

১৮ : প্রাচীন ভারতশিল্প

ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্প অন্যান্য দেশে প্রচারলাভ করায় ভারতের বাইরেও তার কলার বহু উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। পরিতাপের বিষয় এই যে আমাদের অনেক পুরাতন স্মৃতি-সৌধ ও ভাস্কর্য, বিশেষভাবে উত্তর-ভারতে, কালের কবলে পতিত হয়েছে। স্যার জন মার্শাল বলেছেন: 'ভারতশিল্পকে কেবল ভারতে দেখতে হলে তার অর্দ্ধেকের বেশি দেখা যাবে না। একে ভাল করে জানতে হলে বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতি অনুসরণ করে আমাদের চলতে হবে মধ্য এশিয়ায়, চীনে ও জাপানে। আমরা তাহলে দেখতে পাব তিব্বত, ব্রহ্ম, শ্যামে এই শিল্প নূতন নূতন রূপ পরিগ্রহ করে নব নব সৌন্দর্যে প্রকাশলাভ করছে। কাম্বোডিয়া ও যবদ্বীপে তার সৃষ্ট অতুলনীয় রূপৈশ্বর্য দেখে আমরা অবাক হয়ে যাব। এই সকল দেশের প্রত্যেকটিতে ভারতশিল্প এক নূতন জাতীয় প্রতিভার সম্মুখীন হয়েছে, এবং নূতন স্থানীয় পরিচিতি লাভ করেছে, সুতরাং এদের প্রভাবে নিজেও নূতন পরিচ্ছদ গ্রহণ করেছে।'*

ভারতশিল্প ভারতীয় ধর্মের ও দর্শনের সঙ্গে এমনভাবে সম্বন্ধনিবদ্ধ যে ভারতীয় মনকে যে-সমস্ত আদর্শ পূর্ণ করে আছে সেগুলি সম্বন্ধে একটু জ্ঞান না থাকলে একে

* ইউ. এন্. ঘোষাল দ্বারা 'প্রোগ্রেস অফ গ্রেটার ইণ্ডিয়ান রিসার্চ : ১৯১৭-১৯৪২' (কলিকাতা : ১৯৪৩) বইয়ে উদ্ধৃত।

ভাল করে জানাই যায় না। শিল্পে, যেমন সঙ্গীতে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারণায় অনেক প্রভেদ দেখা যায়। হয়তো, ইউরোপের মধ্যযুগের শিল্পী ও ভাস্করেরা বর্তমান সময়ের তাঁদের পথাবলম্বীদের অপেক্ষা ভারতীয় শিল্প ও ভাস্কর্যে অধিক ঐকাত্ম্য অনুভব করতেন, কারণ এখানকার এঁরা 'রেনেসান্স' ও তার পরবর্তী যুগ হতে অনুপ্রাণনা গ্রহণ করে থাকেন। ভারতশিল্পে সকল সময়েই ধর্মনৈতিক প্রবর্তনা কাজ করেছে—শিল্পীর দৃষ্টি শিল্পকে অতিক্রম করে। মনে হয় এইরূপই কোনো আধ্যাত্মিকভাব ইউরোপেও সুবৃহৎ উপাসনামন্দিরগুলির রচনায় শিল্পীদের প্রেরণা দান করেছিল। সৌন্দর্যের ধারণা করা হয় আত্মগত ভাবে, বিষয়গত ভাবে নয়, যদিচ এই সুন্দরের ধারণা বস্তু ও রূপে রমণীয় হয়ে প্রকাশ হতে পারে। গ্রীকেরা সৌন্দর্যের জন্যই সৌন্দর্য ভালবাসত আর তারা যে এতে কেবল আনন্দলাভ করত তা নয়, সত্যও উপলব্ধি করত। প্রাচীন ভারতীয়েরাও সৌন্দর্য ভালবাসত, কিন্তু সকল সময়েই তারা কাজের মধ্যে একটা গভীর অর্থ ফুটিয়ে তুলতে ও অন্তর্নিহিত সত্যকে তারা যেরূপে দেখত তা প্রকাশ করতে চাইত। তারা যা কিছু সৃষ্টি করেছে তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি দেখে তাদের ভূয়সী প্রশংসা না করে থাকা যায় না, যদিচ তারা কি উদ্দেশ্য নিয়ে অথবা কি ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করেছে তা বোধগম্য হয় না। আর যে নিদর্শনগুলি নিতান্ত সাধারণ সেগুলি দেখলে শিল্পীর মনের সঙ্গে মিল না থাকায় কাজের কোনো গুণই চোখে পড়ে না। এরূপ ক্ষেত্রে অস্বস্তি বোধ করতে হয়, কখনও কখনও বিরক্তি আসে, আর শেষে এই সিদ্ধান্ত হয় যে শিল্পী তার কাজ জানত না, সুতরাং অকৃতকার্য হয়েছে। কখনও কখনও বিরক্তি বৃদ্ধি পায়, এরূপ কাজ অসহ্য হয়ে ওঠে।

প্রাচ্য প্রতীচ্য কোনো শিল্পের কথাই আমি কিছু জানি না, সুতরাং এ-বিষয়ে কোনো কথা বলার যোগ্যতাই আমার নেই, আমার মনে যে প্রতিক্রিয়ার উদয় হয় তা এ-বিষয়ে অশিক্ষিত অসমধর্মীর মনে যেমন হতে পারে তাই। কোনো কোনো ছবি, কি ভাস্কর্য, কি সৌধ দেখে আমার মন আনন্দে পূর্ণ হয়, কিংবা আমার মনে এক অননুভূতপূর্ব ভাবের উদয় হয়, অথবা একটুখানি সুখী হই, কি কোনো ভাবেরই উদয় হয় না—এড়িয়ে চলে যাই, কিংবা সত্য সত্যই ভাল লাগে না, বিরক্তি বোধ করি। এই সকল প্রতিক্রিয়ার কারণ নির্দেশ করা কিংবা কোনো শিল্পজাত বস্তুর গুণাগুণ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে আলোচনা করা আমার সাধ্যাতীত। সিংহলের অন্তর্গত অনুরাধাপুরার বুদ্ধদেবের মূর্তি দেখে আমার মনে বিশেষ আলোড়ন উত্থিত হয়েছিল; এই মূর্তির একখানি ছবি বহু বছর ধরে আমার সঙ্গে আছে। অপর পক্ষে, দক্ষিণ-ভারতের অনেক বিখ্যাত মন্দির তাদের বহু খুঁটিনাটি ক্ষোদিত কাজ ও ভাস্কর্যে আমার মনে চাঞ্চল্য আনে, আমি অস্বস্তি অনুভব করি।

গ্রীক চিরাচরিত প্রথায় শিক্ষিত ইউরোপীয়রা প্রথমত গ্রীক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ভারতীয় শিল্পের বিচার করেছিল। গান্ধার ও সীমান্ত প্রদেশের গ্রীক-বৌদ্ধ শিল্প সম্বন্ধে তারা যা জানত সেই জ্ঞানের সাহায্যে ভারতীয় শিল্পকে গ্রীক-বৌদ্ধ শিল্পেরই

অপকৃষ্ট রূপ বলে বিবেচনা করেছিল। ধীরে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী খুলে গেল, জানা গেল যে ভারতীয় শিল্প মৌলিক, প্রাণময়, গ্রীক-বৌদ্ধ শিল্প হতে গৃহীত তো নয়ই, বরঞ্চ ওটাই, ভারতশিল্পের নিষ্প্রভ প্রতিচ্ছায়া মাত্র। এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ইংলন্ড অপেক্ষা ইউরোপীয় মহাদেশ থেকে বেশি এসেছে। এ বড় আশ্চর্য যে ভারতশিল্প ও সংস্কৃত সাহিত্য ইংলন্ড অপেক্ষা ইউরোপ মহাদেশেই অধিক আদর লাভ করেছে। আমি এক এক সময় ভাবি ইংলন্ডের সঙ্গে আমাদের যে হতভাগ্য রাজনৈতিক সম্পর্ক তা কতখানি এজন্য দায়ী। এ-কথাটায় সত্য কিছু থাকতে পারে, তবে মনে হয় আরও মূলগত কারণ কিছু না কিছু আছে। অবশ্য অনেক ইংরাজ আছেন যাঁরা শিল্পী, বিদ্বান, কি অন্য কিছু। এ'রা ভারতের অন্তরাত্মা ও দৃষ্টিভঙ্গীর অনেকটাই বুঝেছেন এবং আমাদের পুরাতন মহামূল্য সঞ্চয়গুলিকে আবিষ্কার করেছেন, জগতের কাছে পরিচিত করে দিয়েছেন। অনেকে আছেন তাঁদের গভীর বন্ধুত্ব ও সেবার জন্য ভারত কৃতজ্ঞ। তবু কথাটা ঠিকই যে ভারতীয় ও ইংরাজের মধ্যেকার ফাঁকটা আছেই, আর তা বেড়েই যাচ্ছে। ভারতের দিক থেকে দেখলে কথাটা বোঝা সহজ, অন্তত আমার পক্ষে, কারণ অনেক ব্যাপার অল্পকাল হল ঘটেছে, এবং আমাদের অন্তঃকরণে একেবারে কেটে বসেছে। অন্যদিকেও এই রূপই কোনো প্রতিক্রিয়া অন্য কারণে হয়ে থাকবে। এই কারণগুলির একটি মনে হয় সমস্ত জগতের কাছে দোষী বলে সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ক্রোধ, যদিচ তাদের মতে দোষ তাদের নয়। কিন্তু মনোভাবটা রাজনীতি থেকেও গভীর, আর অনেক সময় একটু অসতর্ক হলেই বের হয়ে পড়ে। এটা সব থেকে বেশি ইংরাজ শিক্ষিত সমাজেই ঘটেছে। তাদের কাছে আমরা খৃস্টীয় ধর্মশাস্ত্রোক্ত মূল পাপের একটা বিশেষ সংস্করণ, আর আমাদের কাজেও নাকি এর পরিচয় আছে। এক জনপ্রিয় ইংরাজ গ্রন্থকার অল্পদিন হল একখানা বই লিখেছেন, সেটা যা কিছু ভারতীয় সব বিষয়ে বিদ্বেষ ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ। অবশ্য লেখকটিকে ইংরাজদের চিন্তা কি বুদ্ধির পরিচয় দেবার উপযুক্ত বলা যায় না, তবে এরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন উচ্চশ্রেণীর একজন লেখক, মিস্টার ওসবার্ট্ সিট্ওয়েল, তাঁর 'এস্কেপ উইথ মি' (১৯৪১) বইতে বলেছেন, 'ভারতবর্ষ নানাভাবে নানারূপ বিস্ময় উৎপাদন করলেও বিতৃষ্ণার কারণই থেকে গেছে।' আরও বলেছেন যে ভারতীয় শিল্প যে তাঁরা অনেক সময় পছন্দ করেন না তার কারণ বহু ব্যঞ্জনা অতিরিক্তরূপে ফুটিয়ে তোলা হয়।

মিস্টার সিট্ওয়েল ভারতশিল্প কি সাধারণভাবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এরূপ মত পোষণ করতে পারেন, এতে কারও কিছু বলার নেই; এরকম ভাবাই তাঁর অভ্যাস। ভারতবর্ষের অনেক কিছু দেখে আমারও ভাল লাগে না, কিন্তু আমি সমগ্র দেশ সম্বন্ধে এরকম ভাবি না। অবশ্য, আমি নিজে ভারতীয়, যতই মন্দ হই নিজেকে অত সহজে ঘৃণা করতে পারি না। কিন্তু এটা শিল্প সম্বন্ধে মত কি ধারণার বিষয় নয়; এটা আসলে সজ্ঞানে কি আন্তর্জ্ঞানিকভাবে একটা সমগ্র জাতি সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা ও অপ্রীতি। একথাটা কি তবে সত্য যে আমরা যার ক্ষতি করি তাকে আমরা পছন্দ করি না, ঘৃণা করি?

যেসকল ইংরাজ ভারতীয় শিল্পের গুণ উপলব্ধি করেছেন এবং নূতন আদর্শের দ্বারা তার বিচার করেছেন তাঁদের মধ্যে লরেন্স বিনিয়ন ও ই. বি. হ্যাভেল্-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হ্যাভেল্ ভারতশিল্পের আদর্শ ও অন্তর্নিহিত ভাব সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। তিনি এই কথাটি জোর দিয়ে বলেছেন যে, কোনো মহান জাতির শিল্প হতে তার চিন্তা ও চরিত্র সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান লাভ করা যায়। অবশ্য যদি তার অন্তরস্থ আদর্শগুলি জানা থাকে। কোনো বিদেশী শাসকজাতি আদর্শগুলিকে ভুল বুঝলে কি নিন্দা করলে মনের মধ্যে শত্রুতার বীজ উপ্ত হয়। ভারতশিল্প কোনো সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য সৃষ্ট হয়নি, এর উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম ও দর্শনের অন্তর্নিহিত ভাবগুলিকে সাধারণ লোকের কাছে বোধগম্য করে তোলা। আরও বলেছেন, 'ভারতীয় জীবন সম্বন্ধে যিনিই ভাল করে জেনেছেন তিনিই লক্ষ্য করেছেন যে ভারতের কৃষকেরা পশ্চিমের দৃষ্টিতে নিরক্ষর হলেও সমগ্র জগতে তাদের শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রবুদ্ধ, আর এই কথাতেই প্রমাণ হয় যে হিন্দুশিল্প তার শিক্ষা প্রসারের কাজে সফলতা লাভ করেছিল।'*

সংস্কৃত কাব্যে এবং ভারতীয় সঙ্গীতে যেমন, তেমনি শিল্পেও, শিল্পীকে প্রকৃতির সকল অবস্থার সঙ্গে নিজের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে নিতে হয়, তবেই মানুষের এবং প্রকৃতি ও বিশ্বের মধ্যে যে চিরন্তন সঙ্গতি আছে তা প্রকাশ করতে পারে। এশিয়ার সকল শিল্পের মূল কথাটি এই, আর এই জন্যই নানা বৈচিত্র্য ও জাতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও এশিয়ার শিল্পে একটা ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। অজন্তার মনোহর প্রাচীর-চিত্রগুলি ছাড়া ভারতের পুরাতন চিত্র বিশেষ কিছু নেই। হয়তো এসবের অধিকাংশই নষ্ট হয়েছে। চীন ও জাপান যেমন চিত্রে উৎকর্ষ লাভ করেছিল, ভারত তেমনি ভাস্কর্য ও স্থাপত্যে শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করেছিল।

ভারতীয় সঙ্গীত ইউরোপীয় সঙ্গীত হতে বিভিন্ন। ভারতে সঙ্গীত আপন পথে উন্নতিলাভ করেছিল এবং সবিশেষ উৎকর্ষ দেখিয়ে চীন ও দূর পূর্ব ভিন্ন এশিয়ার সকল স্থানের সঙ্গীতে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এইভাবে সঙ্গীত ভারত এবং বহু দেশের মধ্যে পূর্বের যোগাযোগের উপরে আরও একটি নূতন যোগসূত্র হয়ে উঠেছিল। এ দেশগুলির নাম করা যেতে পারে, যেমন পারস্য, আফগানিস্থান, আরব, তুরস্ক, এবং এ ছাড়া উত্তর-আফ্রিকায় যেখানে যেখানে আরব সভ্যতা বলবৎ ছিল সেই সব দেশ। ভারতীয় কালোয়াতী সঙ্গীত এখনও সম্ভবত এই সকল দেশে আদর লাভ করতে পারে।

ভারত এবং এশিয়ার অন্যান্য স্থানে শিল্প যেভাবে উন্নতিলাভ করেছে তা আলোচনা করলে বোঝা যায়, এর উপর আরও একটা বিশেষ প্রভাব পড়েছিল হাতে তৈরি প্রতিমা সম্বন্ধে ধর্মনৈতিক বিরুদ্ধতা থেকে। বেদ প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে। আর

* ই. বি. হ্যাভেল্ : 'দি আইডিয়াল্স অফ ইণ্ডিয়ান আর্ট' (১৯২০) : ১৯ পৃঃ।

বুদ্ধের মূর্তি ও চিত্র যা কিছু প্রস্তুত হতে আরম্ভ হয়েছিল তা বৌদ্ধ যুগের শেষের দিকে। মথুরার যাদুঘরে বোধিসত্ত্বের একটি বৃহদাকৃতি মূর্তি আছে, তাতে শক্তি ও তেজ প্রকাশ পেয়েছে। এটি তৈরি হয়েছিল কুশাণবংশের রাজত্বকালে, খৃস্টীয় অব্দ শুরু হবার কাছাকাছি।

প্রথম দিকে ভারতশিল্প স্বাভাবিকত্বে পূর্ণ ছিল, সম্ভবত চীনের প্রভাববশত। ভারতশিল্পের ইতিহাসের বিভিন্ন অংশে চীনের প্রভাব ঘটেছিল বলে জানা যায়, আর ভারতবর্ষের আদর্শবাদের প্রভাবও বিশেষ বিশেষ যুগে চীন ও জাপানে প্রবলভাবে কাজ করেছে।

খৃস্টপূর্ব চতুর্থ হতে ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্তরাজাদের কালে, অর্থাৎ যাকে ভারতের স্বর্ণযুগ বলা যায় সেই সময়ে, অজন্তার গুহাগুলি খনন করা এবং প্রাচীর-চিত্রগুলি অঙ্কন করা হয়েছিল। বাঘ ও বাদামী গুহাও এই সময়ের। অজন্তার প্রাচীর-চিত্রগুলি খুবই সুন্দর: এগুলি আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে আমাদের বর্তমান যুগের শিল্পীদের দৃষ্টি স্বভাব-বিমুখীন হয়েছে, আর অজন্তাচিত্রের আদর্শে তাদের আপন রচনাভঙ্গী গড়ে নেবার চেষ্টায় ফল ভাল হয়নি।

অজন্তা আমাদের নিয়ে চলে যেন স্বপ্নলোকে, কিন্তু তবু সে জগৎ খুবই বাস্তব। এই চিত্রগুলি বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এঁকেছিলেন। বহু পূর্বে তাঁদের প্রভু বলেছিলেন, নারী হতে দূরে থেক, এমনকি তাদের দিকে দৃষ্টিপাতও কোরো না, কারণ তারা বিপজ্জনক। তবু এই সকল চিত্রে অজস্র নারী দেখা যায়; কত সুন্দরী নারী, রাজ-কন্যা, গায়িকা, নর্তকী, কেউ বা দাঁড়িয়ে, কেউ বা বসে, কেউ বা প্রসাধনে রত, অথবা অনেকে মিলে হয়তো শোভাযাত্রায় চলেছে।

অজন্তার এই সকল নারীচিত্র প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। এই সকল ভিক্ষু শিল্পীরা জগৎ সংসার এবং জীবনের চলন্ত নাট্যকে কত ভাল করেই জেনেছিলেন, এবং সেই জন্য তাঁরা বোধিসত্ত্বের চিত্রে যেমন শান্ত সৌম্য অনৈহিক গম্ভীর ভাব প্রকাশ করেছেন, তেমনি এই সকল প্রাচীর-চিত্রে প্রীতি ফুটিয়ে তুলেছেন।

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে ইলোরার বিরাট গুহাগুলি কঠিন পাথর কেটে প্রস্তুত করা হয়েছিল; তাদেরই মাঝখানে বিশাল কৈলাস মন্দির। একথা আজ ভেবেই পাওয়া যায় না কেমন করে মানুষ এর পরিকল্পনা করেছিল, আর কেমন করেই বা তাদের সেই পরিকল্পনাকে অবয়ব ও রূপ দান করেছিল। হস্তীগুম্ফা ও সেখানকার সবল ও রহস্য-ব্যঞ্জক ত্রিমূর্তি প্রায় এই সময়েই প্রস্তুত হয়; আর মামল্লপুরমের স্মৃতি-সৌধগুলিও এই সময়ের।

হস্তীগুম্ফায় শিব-নটরাজের, অর্থাৎ নৃত্যরত শিবের, একটি ভাঙা মূর্তি আছে। হ্যাভেল্ বলেন যে এর এই হীনাঙ্গ অবস্থাতেও একটা বিশাল পরিকল্পনার পরিচয় দেয়, কি আশ্চর্য বিরাট শক্তি প্রকাশ করে : 'যদিচ মনে হয় সমগ্র শিলাটি নৃত্যের তালে তালে আলোড়িত হচ্ছে, তবু মুখমণ্ডলে দেখতে পাই সেই শান্তি সেই প্রসন্নতা যা বুদ্ধের মুখে প্রতিভাত হয়।'

আর একটি শিব-নটরাজমূর্তি ইংলণ্ডের যাদুঘরে আছে। এইটি দেখে এপ্‌স্টাইন্‌ লিখেছেন, 'শিব নৃত্যে রত, সৃষ্টি করছেন বিশ্বকে আবার তাকে ধ্বংস করছেন; তাঁর দীর্ঘ লয়ে বিশ্বযুগের ধারণা মনে আসে, নৃত্যছন্দে যেন যাদুবিদ্যার মোহাচ্ছন্ন করার অমোঘ শক্তি অনুভূত হয়। এই যাদুঘরে রক্ষিত একটি একত্র সজ্জিত মূর্তি-পুঞ্জে প্রেমের ব্যঞ্জনার মধ্যে মৃত্যুর শোকঘন প্রকাশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এতে মানুষের আসক্তিগত উত্তেজনার মৃত্যুময় পরিণাম এমনভাবে ব্যক্ত হয়েছে যা আর কোথাও দেখা যায় না। এই সকল গভীর অর্থপূর্ণ শিল্পসৃষ্টিগুলিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মূলগতভাব ও অকঠোর ব্যঞ্জনার উপরই—এগুলিতে প্রতীকতার অনাবশ্যক সজ্জাড়ম্বর নেই। আমাদের ইউরোপীয় রূপকগুলি এদের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর এবং লক্ষ্যহীন।'*

একটি বোধিসত্ত্বমূর্তির মস্তকাংশ যবদ্বীপের অন্তর্গত বোরোবুদুর থেকে কোপেন-হেগেনের গ্লাইপ্‌টোটেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সৌন্দর্য সম্বন্ধে প্রচলিত বিচারেও এ-মূর্তিটি সুন্দর। হ্যাভেল্‌ বলেন, এর মধ্যে গভীর কিছু আছে যা বোধিসত্ত্বের আত্মাকে যেন মুকুরে প্রতিফলিত করে প্রকাশ করছে। 'এই মুখে মহাসমুদ্রের গভীরতার স্থৈর্য প্রতিভাত হয়েছে। মেঘমুক্ত নীলাকাশের প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়েছে; এ-সৌন্দর্য মানুষের দৃষ্টির অগোচর।'

হ্যাভেল্‌ আরও বলেছেন, 'যবদ্বীপে ভারতীয় শিল্প তার একটা নূতন নিজস্ব ভঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছে, আর এশিয়া মহাদেশের শিল্প হতে তার পার্থক্য এতেই বোঝা যায়। এই উভয় শিল্পেই গভীর প্রশান্তির ভাব অবশ্য লক্ষ্য হয়, কিন্তু যব-দ্বীপের দিব্য আদর্শে হস্তীগুম্ফা এবং মামল্লপুরমের ভাস্কর্যের কঠোর তাপসভাব দেখা যায় না। নিজ-ভারতবর্ষে ভারতীয়েরা পুরুষানুক্রমে বহু ঝড় ও ঝঞ্ঝার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। এদেরই বংশধরেরা ঔপনিবেশিকভাবে যবদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের এই নূতন গৃহে ভারতীয়েরা যে শান্তি ও নিরাপত্তা উপভোগ করেছে তা এই ভারত-যবদ্বীপীয় শিল্পে যেন প্রসন্নতা ও আহ্লাদের ভাবে প্রকাশলাভ করেছে।'†

১৯ : ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য

খৃস্টীয় অব্দের প্রথম হাজার বছর ভারতের বাণিজ্য সুদূর বিস্তৃত ছিল এবং ভারতীয় বণিকেরা অনেক বিদেশীয় বাণিজ্য ক্ষেত্রের উপর প্রভুত্ব করত। পূর্ব সমুদ্রে তাদের প্রভাব তো ছিলই, সে প্রভাব পরে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। মরিচ ও অন্যান্য মশলা ভারত থেকে, অথবা ভারতের ভিতর দিয়ে, প্রায়ই ভারতীয় এবং চীন-দেশীয় জাহাজে পশ্চিমে রপ্তানি হত। কথিত আছে গথ্‌দের অ্যালারিক রোম থেকে

* এপ্‌স্টাইন্‌ : 'লেট দেয়ার বি স্কাল্প্‌চার' (১৯৪২) : ১৯৩ পৃঃ।
† হ্যাভেল্‌ : 'দি আইডিয়াল্‌স অফ ইণ্ডিয়ান আর্ট' (১৯২০) : ১৬৯ পৃঃ।

৩,০০০ পাউন্ড মরিচ নিয়ে গিয়েছিলেন। রোমান লেখকেরা দুঃখ প্রকাশ করতেন যে বিলাস দ্রব্যের বিনিময়ে রোম থেকে ভারতে ও পূর্বদেশে সোনার স্রোত বইত।

ভারতে এবং অন্যত্রও বাণিজ্য তখন স্থানীয় উৎপন্ন ও প্রাপ্ত দ্রব্যের বিনিময় মাত্র ছিল। ভারত চিরদিনই উর্বর ভূমির জন্য বিখ্যাত, তা ছাড়া, এখানে এমন অনেক দ্রব্য পাওয়া যায় যা অন্যত্র মেলে না।

সমুদ্রপথ খোলা থাকায় ভারত আপন দ্রব্য বিদেশে চালান দিত এবং পথের মধ্যে পূর্ব সাগরস্থ দ্বীপগুলি থেকেও দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে বাণিজ্য বিস্তার করত। তার অন্য সুবিধাও ছিল, কারণ অতি আদিকাল থেকে ভারত বস্ত্র প্রস্তুত করে আসছে; তখন অন্য কোনো দেশ এ কাজে হাত দেয়নি, সুতরাং এই ব্যবসায় দূরদেশ পর্যন্ত প্রসারলাভ করেছিল। রেশমও এদেশে অনেক আগেই উৎপন্ন হতে আরম্ভ হয়, যদিচ তা চীনদেশীয় রেশমের মত ভাল হত না। চীনদেশের রেশম এদেশে আসতে আরম্ভ করে খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে। এদেশে রেশমের চাষ নিশ্চয় পরে আরম্ভ হয়েছে, আর বেশি অগ্রসরও হয়নি। তবে কাপড় রঙ-করার কাজ এদেশে খুব অগ্রসর হয়েছিল, এবং পাকা রঙ প্রস্তুতের বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি এখানে উদ্ভাবিত হয়েছিল। এর একটা হল নীলের ব্যবহার। নীলকে বলা হয় 'ইণ্ডিগো'—শব্দটি গ্রীকেরা তৈরি করেছিল 'ইন্ডিয়া' শব্দ হতে। সম্ভবত রঙ-করার জ্ঞানের জন্যই ভারতের বৈদেশিক ব্যবসায় জোর পেয়েছিল।

খৃস্টীয় অব্দের প্রথম কয়েক শতকে অন্যান্য সকল দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষে রসায়ন সম্ভবত অধিক উন্নতিলাভ করেছিল। এ-বিষয়ে আমি বেশি কিছু জানি না। কিন্তু ভারতীয় রসায়নবিদ ও বৈজ্ঞানিকদের অগ্রণী, কয়েক পুরুষ ধরে বৈজ্ঞানিকদের শিক্ষাগুরু, স্যার পি. সি. রায়ের লিখিত 'হিসট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি' নামে একখানি গ্রন্থ আছে। সে-সময় রসায়ন ধাতুবিদ্যা ও নিম্নতর ধাতু হতে উচ্চতর ধাতু প্রস্তুতের প্রণালীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। নাগার্জুন নামে একজন বিখ্যাত রসায়নবিদ ও ধাতু-বিদ্যাবিশারদ ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের বিষয় জানা যায়। নামের সাদৃশ্যের জন্য কেউ কেউ মনে করেন যে খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীর দার্শনিক নাগার্জুন এবং এই বৈজ্ঞানিক একই ব্যক্তি। কিন্তু এ-বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। ইস্পাতে পান দিয়ে কাঠিন্য সঞ্চার করার পদ্ধতি বহু আগেই ভারতে জানা ছিল, আর ভারতীয় ইস্পাত ও লোহা, বিশেষভাবে যুদ্ধের প্রয়োজনে বিদেশে মূল্যবান বলে বিবেচিত হত। আরও অনেক ধাতু জানা ছিল, ব্যবহৃতও হত, এবং ধাতু-ঘটিত যৌগিক পদার্থ ঔষধরূপে ব্যবহারের জন্য তৈরি হত। চুয়ানো (ডিস্টিলেশন) এবং ভস্মীকরণ ভালই জানা ছিল এবং ঔষধ-প্রস্তুত-বিজ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতিলাভ করেছিল। যদিচ এই সমস্ত অনেকটা পুরাতন প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত পদ্ধতি অনুসারে করা হত, মধ্যযুগ পর্যন্ত গবেষণা-মূলক কাজও অনেক পরিমাণে অগ্রসর হয়েছিল। শারীর-স্থান-বিদ্যা (অ্যানাটমি) এবং শারীর-বিদ্যার (ফিসিঅলজি) অনুশীলন হত এবং হার্ভে'র আগেই রক্তসঞ্চালনের বিষয় এদেশে আলোচিত হয়েছিল।

বিজ্ঞানগুলির সর্বাপেক্ষা পুরাতন জ্যোতির্বিদ্যা। এই শাস্ত্র নিয়মিতভাবে এদেশের বিদ্যালয়গুলিতে অধ্যেতব্য বিষয় ছিল এবং ফলিত-জ্যোতিষ এরই সঙ্গে যুক্ত থাকত। একটি এমন নির্ভুল পঞ্জিকা প্রস্তুত হয়েছিল যা এখনও লোকে ব্যবহার করে। পঞ্জিকাটি সৌর, কিন্তু মাসগুলি চান্দ্র, সুতরাং মাঝে মাঝে সংশোধনের প্রয়োজন হয়। অন্য স্থানের ন্যায় এখানেও পুরোহিতেরা (অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা) এই পঞ্জিকা নিয়ে চলত এবং ঋতু-অনুযায়ী পর্বগুলির তারিখ নির্ধারিত করে দিত, এবং তা ছাড়া সূর্য ও চন্দ্র-গ্রহণের সময়নির্দেশ নির্ভুল ভাবেই করা হত, কারণ গ্রহণও পর্বের মধ্যে গণ্য ছিল। এই বিদ্যার সুযোগ নিয়ে তারা সাধারণ লোকেদের মধ্যে অনেক বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান আচরণাদি কুসংস্কার প্রচারিত করে নিজেদের প্রতিষ্ঠা বাড়িয়ে নিত। জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যবহারিক জ্ঞান সমুদ্রযাত্রীদের বিশেষ উপকারে আসত। এই বিষয়ের জ্ঞানের উন্নতির জন্য প্রাচীন ভারতীয়েরা বিশেষ গর্ব অনুভব করতেন। তাঁরা আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া থেকে গৃহীত আরবদের জ্যোতির্বিদ্যার কথাও জানতেন।

প্রাচীন ভারতে যন্ত্রবিদ্যা ও যন্ত্রব্যবহার কতখানি অগ্রসর হয়েছিল তা বলা কঠিন, তবে জাহাজ-নির্মাণের কাজ একটা সমৃদ্ধ শ্রমশিল্প হয়ে উঠেছিল। বিশেষভাবে যুদ্ধে ব্যবহৃত অনেক প্রকারের যন্ত্রাদির কথাও জানা যায়। এই সমস্ত হতে একদল অতি বিশ্বাসপ্রবণ ও উৎসাহী ভারতবাসী এদেশে সকল প্রকার জটিল যন্ত্রাদিও ছিল এরূপ কল্পনা করে থাকে। সে যাই হোক, মনে হয় তখন যন্ত্রপাতি প্রস্তুত ও ব্যবহারে এবং রসায়ন ও ধাতুবিদ্যায় ভারত কোনো দেশ অপেক্ষা পিছিয়ে ছিল না। এজন্য এদেশ বাণিজ্যে অনেক সুবিধা লাভ করত এবং কয়েক শতাব্দী ধরে অনেকগুলি বিদেশী বাণিজ্যক্ষেত্রের উপর কর্তৃত্ব করতে পেরেছিল।

ভারতের আরও একটা সুবিধা ছিল—ক্রীতদাস মজুর নিয়ে কাজ করা হত না। এই ক্রীতদাস মজুর রাখার জন্যই গ্রীকেরা তাদের সভ্যতার প্রথমদিকে অনেক অসুবিধা ভোগ করেছে। কারণ এদের দ্বারা তাদের অগ্রগতি বাধাক্রান্ত হয়েছিল। জাতিভেদের অনেক দোষ, আর এ-দোষ রীতিমত বৃদ্ধিই পেয়েছিল, কিন্তু যারা খুব নিচের লোক তাদের পক্ষেও জাতিভেদ দাসত্ব হতে ঢের ভাল। প্রত্যেক বর্ণের মধ্যে সাম্য ছিল, খানিকটা স্বাধীনতা ছিল, আর প্রত্যেক জাতিই ছিল ব্যক্তিগত, সুতরাং লোকেরা আপন আপন কাজ নিয়ে থাকত। এ-ব্যবস্থায় উন্নত শ্রেণীর নিপুণতা প্রকাশ পেত—বিশেষ বিশেষ কাজে বিশেষ শিল্প-চাতুর্য অর্জিত হত।

২০ : প্রাচীন ভারতে গণিত

প্রাচীন ভারতীয়েরা উচ্চ মনোবৃত্তিসম্পন্ন ছিল এবং ভাব ও গুণাত্মক বিষয় নিয়ে চিন্তাতেও নিপুণ ছিল. সুতরাং তাদের অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ উৎকর্ষ দেখাবার কথা। ইউরোপ তার প্রথম পাটিগণিত ও বীজগণিত আরবদের কাছ থেকে পায়, আর সেইজন্য আরবীয় অঙ্ক ব্যবহার করে, কিন্তু আরবেরা তারও আগে এগুলি ভারতবর্ষ

থেকে পেয়েছিল। এ-কথা এখন সকলেই জানে যে ভারতবর্ষ গণিতে বিস্ময়কর উন্নতি করেছিল এবং আধুনিক পাটিগণিত ও বীজগণিতের আরম্ভ বহু পূর্বে এদেশেই হয়েছিল। গণনার জন্য কাঠামো ব্যবহারের অসুবিধা আর রোমান অঙ্কের ব্যবহারের জন্য গণিতের অগ্রগতি বহুকাল বাধাক্রান্ত হয়েছিল: তারপর যখন শূন্য সমেত দশটি ভারতীয় সঙ্কেত এই সমস্ত বাধা হতে মানুষের মনকে মুক্তি দিল তখন সংখ্যা, তার ব্যবহার ও প্রয়োগ-রহস্যের উপর বিশেষ আলোকপাত ঘটল। এই সঙ্কেতগুলির অনুরূপ আর কিছু জানা ছিল না, এবং আর কোনো দেশে এরূপ অঙ্ক ব্যবহৃত হত না। এখন অবশ্য এসব সাধারণ হয়ে পড়েছে, এগুলির বিশেষত্বের কথা না ভেবেই আমরা গ্রহণ করে থাকি, তবু মানতে হবে যে এই সঙ্কেতগুলির মধ্যে অঙ্কশাস্ত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বীজ নিহিত ছিল। ভারতবর্ষ হতে বোগ্‌দাদ হয়ে এগুলির পশ্চিম দেশে পৌঁছতে অনেক শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছিল।

দেড়শো বছর আগে নেপোলিয়নের সময়ে, লা প্লাস্‌ লিখেছিলেন, 'দশটি সঙ্কেতের সাহায্যে সকল সংখ্যা প্রকাশ করার সুকৌশল ভারতবর্ষই আমাদের দিয়েছিল। প্রত্যেক সঙ্কেতটির নিজের মান আছে, তা ছাড়া তার একটা স্থানীয় মান আছে, অর্থাৎ সংখ্যায় যেখানে তাকে বসানো হয় সেই স্থান হতেই একটা মান লাভ করে। এ এমন একটি ধারণা যা গভীর ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। একে এখন আমাদের কাছে এত সহজ মনে হয় যে এর প্রকৃত মর্যাদা আমরা ভুলে যাই, কিন্তু এই ধারণাটি সরল বলেই এর সাহায্যে সকল প্রকার গণনা ও হিসাব সহজ হয়েছে, এবং এই কারণে মানুষের প্রয়োজনীয় সকল উদ্ভাবনার মধ্যে শ্রেষ্ঠগুলির একটি হল পাটিগণিত। এ-বিষয়টি সম্বন্ধে বিশেষভাবে লক্ষণীয় আর একটা কথা এই যে, প্রাচীনকালের দুজন মহাপণ্ডিত আর্কিমিডিস ও অ্যাপোলোনিয়াসের কাছেও এটা ধরা পড়েনি।'*

ভারতবর্ষে জ্যামিতি পাটিগণিত এবং বীজগণিতের উদ্ভাবনা আদিকালে ঘটেছিল। সম্ভবত প্রথম প্রথম বৈদিক বেদীর চিত্র-বিচিত্র অঙ্কনের জন্য এক প্রকার জ্যামিতিক বীজগণিতের উদ্ভাবনা হয়েছিল। সমচতুর্ভুজ ক্ষেত্রকে একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের বাহু-বিশিষ্ট আয়তক্ষেত্রে পরিণত করার জ্যামিতিক পদ্ধতির কথা একাধিক অতি-প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া গেছে। এখনও হিন্দু অনুষ্ঠানে জ্যামিতিক রেখাচিত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এদেশে জ্যামিতি অনেক অগ্রসর হয়েছিল, কিন্তু গ্রীস কি আলেক্‌জান্দ্রিয়ার মত নয়। পাটিগণিত ও বীজগণিতে অবশ্য ভারতই সকলের অগ্রণী ছিল। দশমিক পদ্ধতি ও শূন্যের ব্যবহারের উদ্ভাবন-কর্তা একজন, কি বহু, এবং কে, তা জানা যায় না। এখন পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা প্রাচীনকালে শূন্যের ব্যবহার যা আবিষ্কৃত হয়েছে তা খৃস্টপূর্ব দুশো অব্দের কাছাকাছি লিখিত একখানি ধর্মগ্রন্থ হতে। স্থানীয় মানপদ্ধতি সম্ভবত খৃস্টীয় অব্দের প্রথমদিকে উদ্ভাবিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। শূন্য,

* হগ্‌বেন-এর 'ম্যাথাম্যাটিক্‌স ফর দি মিলিয়ন' (লন্ডন : ১৯৪২) গ্রন্থে উদ্ধৃত।

আগে একটি বিন্দুর সাহায্যে লেখা হত, পরে একটি ছোট গোল চিহ্ন ব্যবহৃত হতে আরম্ভ হয়। এটিকে অন্য সঙ্কেতগুলির ন্যায় একটি অঙ্ক বলে গণ্য করা হত। অধ্যাপক হ্যাল্‌স্টেড এই সঙ্কেতটির গুণ বর্ণনা করে লিখেছেন, 'শূন্যের সৃষ্টির গুরুত্ব সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি সম্ভব নয়। সারহীন শূন্যতাকে যে কেবল স্থান, কি নাম, কিংবা রূপ কি সঙ্কেত মাত্র দেওয়া হয়েছে তা নয়, শক্তিও দেওয়া হয়েছে। এরূপ সৃষ্টি যে-হিন্দু জাতি হতে এর উদ্ভব তারই প্রকৃতির বিশেষত্বে সম্ভব হয়েছে। এ যেন নির্বাণকে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত করার মত। বুদ্ধি ও শক্তির সকল প্রকার অগ্রগতির পক্ষে এত অনুকূল গাণিতিক সৃষ্টি আর একটি নেই।'*

আরও একজন আধুনিক গণিতজ্ঞ এই স্মরণীয় ঘটনাটি সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী ভাষা ব্যবহার করেছেন। ডান্টজিগ্‌ তাঁর সংখ্যা বিষয়ক গ্রন্থ: 'নাম্বার'-এ লিখেছেন, 'এই সুদীর্ঘ পাঁচহাজার বছরে অনেক সভ্যতার উত্থান ও পতন ঘটেছে, তবে প্রত্যেকটিই উত্তরবর্তীদের জন্য সাহিত্য, শিল্প, দার্শনিক তত্ত্ব ও ধর্মের আকারে কিছু না কিছু সমৃদ্ধি রেখে গেছে! গণনাই বলতে গেলে মানুষের সর্বাপেক্ষা আগে উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত কৌশল, কিন্তু এ-বিষয়ে আমরা কি সাফল্যের পরিচয় পাই? যা কিছু জানা যায় তা হল একটা বাঁধা ধরা গণনাপদ্ধতি, এতই অপরিণত যে তার সাহায্যে এগিয়ে চলা একরূপ অসম্ভব; আর একটা সামান্য গণনা-যন্ত্র, তাকে নিয়ে বিশেষ কিছুই করা যায় না, এমনকি অতি প্রাথমিক হিসাবের জন্যও ওস্তাদ ডাকতে হয়।...... মানুষ হাজার হাজার বছর এই দুটি নিয়ে কোনো প্রকারে কাজ চালিয়েছে, যন্ত্রটির বিশেষ কিছু উন্নতি করতে পারেনি, আর সমগ্র পদ্ধতিটিতেও উল্লেখযোগ্য কিছু যোগ দিতে পারেনি।......উন্নতিহীনভাবে যে অজ্ঞাত যুগগুলি কেটেছে তাতে মানুষের ধারণা অগ্রসর হয়েছে অতিশয় মন্দগতিতে, এর তুলনাতেও গণনার ইতিহাসকে একেবারে বদ্ধ-প্রবাহ বলে মনে হয়। এইভাবে দেখলে, খৃস্টীয় অব্দের প্রথম দিকে অজ্ঞাত একজন হিন্দু যে স্থানীয় মানের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন, তা সমগ্র জগতের একটি গণনীয় ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।'†

ডান্টজিগের কাছে এ একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না কেমন করে গ্রীসের অত বড় বড় গণিতজ্ঞেরাও এই আবিষ্ক্রিয়ার কাছ দিয়েও যাননি। 'গ্রীকেরা কি তাহলে ব্যবহারিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে এতই হীনশ্রদ্ধ ছিল যে ক্রীতদাসদের হাতে আপন সন্তানদের শিক্ষা ছেড়ে দিয়েছিল? যে-জাতির কাছ থেকে আমরা জ্যামিতি পেয়েছি, এবং যার দ্বারা এর এত উন্নতি হয়েছে, এ কেমন করে হল যে সেই জাতি বীজগণিতের প্রাথমিক অংশও সৃষ্টি করতে পারেনি? এও কি সমানই আশ্চর্য

* জি. বি. হ্যাল্‌স্টেড: 'অন দি ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড টেক্‌নিক্‌ অফ এরিথ্‌মেটিক' (শিকাগো, ১৯১২): ২০ পৃঃ। বি. দত্ত ও এ. এন. সিং কৃত 'হিস্ট্রি অফ্‌ হিন্দু ম্যাথাম্যাটিক্‌স' (১৯৩৫) গ্রন্থে উদ্ধৃত।

† এল্‌. হগ্‌বেন-এর 'ম্যাথাম্যাটিক্‌স ফর দি মিলিয়ন' (লণ্ডন: ১৯৪২) গ্রন্থে উদ্ধৃত।

নয় যে আধুনিক গণিতশাস্ত্রের একটি মূল ভিত্তি যে বীজগণিত তারও সূত্রপাত হয়েছে ভারতবর্ষে, আর প্রায় সেই সময়েই যখন অঙ্কের স্থানীয় মান উদ্ভাবিত হয়েছিল?'

এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন অধ্যাপক হগ্‌বেন: 'কেন হিন্দুরাই এ-পথে অগ্রসর হয়েছিল, কেন প্রাচীনকালের গণিতবিদেরা এ পথ ধরেননি, কেনই বা কাজের লোকেরাই এ-পথের প্রথম পথিক হন তা বোধগম্য হওয়া দুরূহ হয়ে ওঠে, যদি মানসিক উৎকর্ষের কারণ আমরা কেবল কয়েকজন বিশেষ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতিভার মধ্যে খুঁজি, এবং ব্যক্তিগত প্রতিভা যে রীতিনীতি, আচরণ ও চিন্তার সামাজিক পরিস্থিতিতে কাজ করেছে সেখানে কোনো সন্ধান না করি। খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যা ঘটেছিল, সে-কালের পূর্বেও তা ঘটেছে, হয়তো এখন সোভিয়েট রাশিয়ায় তা ঘটছে।......এই সত্যটি যদি আমরা স্বীকার করি একথাটি আমাদের কাছে বোধগম্য হবে যে প্রত্যেক সংস্কৃতির মধ্যে তার সংকটও নিহিত থাকে যদি লোকসাধারণের শিক্ষা বিশেষ ধীশক্তিমান ব্যক্তিদের শিক্ষার ন্যায় মনোযোগ লাভ না করে।'*

প্রতিভাবান লোকেরা তাঁদের সময়ের তুলনায় অগ্রসর হয়ে চলেন; কখনও কখনও মনের কোনো উজ্জ্বল মুহূর্তে আশ্চর্য কিছু উদ্ভাবন কি আবিষ্কার করে ফেলেন। অঙ্কশাস্ত্রের এই সকল অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনা কিংবা আবিষ্কার এমনিভাবে হঠাৎ প্রতিভান্বিত লোকের দ্বারা ঘটেছে এরূপ মনে করা ভুল। আসলে এগুলি সমগ্র সমাজের সাধন-সঞ্চিত উৎকর্ষের ফলস্বরূপ—সেই সময়ের কোনো দাবি মিটাবার জন্য এসেছিল। অবশ্য এ-দাবি চিনে নিয়ে তাকে মিটাবার জন্য উচ্চশ্রেণীর প্রতিভা আবশ্যক হয়েছিল। কিন্তু সমাজের এই দাবি যদি না জাগত তা মিটাবার চেষ্টাও থাকত না, এবং এ-অবস্থায় যদি উদ্ভাবনাটি ঘটত, হয়তো লোকে তা বিস্মৃত হয়ে যেত, কিংবা তার ব্যবহারের প্রয়োজন উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে এক পাশে ফেলে রাখা হত।

গণিত বিষয়ে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এ-দাবি ছিল, কারণ এই সকল রচনা বাণিজ্য ও সামাজিক নানা বিষয়ে জটিল গণনাঘটিত সমস্যায় পূর্ণ। এগুলিতে কর, ঋণ ও সুদ বিষয়ে অনেক সমস্যা আছে, আর আছে যৌথ কারবার, পণ্য-বিনিময়, অর্থ-বিনিময় এবং খাঁটি ও মিশ্রিত সোনা সম্বন্ধে হিসাবাদি। সমাজ তখন জটিল হয়ে উঠেছে এবং অনেক লোক দেশ-শাসনের কাজে ও ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয়েছে। হিসাবের সরল পদ্ধতি ব্যতীত আর কাজ চলা সম্ভব ছিল না।

শূন্যের ব্যবহার শুরু হওয়ায় এবং দশমিকের স্থানীয় মান বিষয়ক পদ্ধতি গৃহীত হওয়ায় ভারতে এ-বিষয়ে মানুষের মনের অর্গল খুলে গেল এবং পাটিগণিত ও বীজগণিতের দ্রুত উন্নতি ঘটল। তারপর এল ভগ্নাংশ এবং ভগ্নাংশের গুণন ও হরণ।

* হগ্‌বেন : 'ম্যাথাম্যাটিক্‌স ফর দি মিলিয়ন' (লণ্ডন : ১৯৪২) : ২৮৫ পৃঃ।

এখন ত্রৈরাশিকের নিয়ম আবিষ্কৃত হয়ে পরিণত আকার গ্রহণ করল। বর্গ এবং বর্গ-মূল ও বর্গমূলের চিহ্ন $\sqrt{}$ ঘন ও ঘনমূল, বিয়োগ চিহ্ন ও ত্রিকোণামিতির জ্যা-র (সাইন-এর) মানতালিকা পাওয়া গেল। বৃত্ত-পরিমিতির চিহ্ন π-র মান ৩·১৪১৬ নির্ণীত হল, আর অজ্ঞাত সংখ্যার স্থানে বর্ণমালার অক্ষর ব্যবহার হতে লাগল। এ ছাড়া সমীকরণ ও বর্গ-সমীকরণও আলোচিত হল, এবং শূন্য সংক্রান্ত গণিত বিষয়ে গবেষণা হতে লাগল। শূন্যের পরিচয় দেওয়া হল: ক-ক=০; ক+০=ক; ক−০=ক; ক×০=০; ক÷০=অনন্ত। ঋণাত্মক সংখ্যার ধারণা করা হল, $\sqrt{৪}=\pm২$।

খৃস্টীয় পঞ্চম হতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে একের পর এক বহু উচ্চশ্রেণীর গণিতজ্ঞ তাঁদের গ্রন্থে গণিতের এই সকল আরও অনেক উন্নতির কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আরও পুরাতন গ্রন্থও আছে, যেমন খৃস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর বৌধায়ন, খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর আপস্তম্ব এবং কাত্যায়ন। এইগুলিতে জ্যামিতিক সমস্যার কথা আছে, বিশেষত ত্রিভুজ, আয়তক্ষেত্র ও বর্গক্ষেত্র সম্বন্ধে। তবে সর্বাপেক্ষা পুরাতন বীজগণিত গ্রন্থ যা পাওয়া যায় তা বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আর্যভট্টের রচিত।

ইনি ৪৭৬ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, এবং জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতের বিষয়ে এই গ্রন্থ ২৩ বছর বয়সে রচনা করেছিলেন। যদিও এঁকে কখনও কখনও বীজগণিতের উদ্ভাবনকর্তা বলা হয়, মনে হয় তিনি অন্তত আংশিকভাবে পূর্বতন গ্রন্থকারদের রচনার উপর নির্ভর করেছিলেন। এঁর পর যে উচ্চশ্রেণীর ভারতীয় গণিতজ্ঞের নাম পাওয়া যায় তা হল প্রথম ভাস্করের (৫২২), আর তাঁর পরেই আসেন ব্রহ্মগুপ্ত (৬২৮)। এই বিখ্যাত জ্যোতির্বিদের কাছ থেকে শূন্যের ব্যবহার পাওয়া গেছে আর এঁর দ্বারা গণিতের আরও অনেক উন্নতি হয়েছে। এই সকল পন্ডিতদের পর আসেন এক এক করে অনেকে যাঁরা পাটিগণিত ও বীজগণিতের গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তার পর ১১১৪ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয় ভাস্কর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন, পাটিগণিত, বীজগণিত, ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে। তাঁর পাটিগণিত-বিষয়ক গ্রন্থের নাম 'লীলাবতী'; গণিতের কোনো পুস্তকের পক্ষে এ-নাম অদ্ভুত, কারণ এ-শব্দটি স্ত্রীলোকের নামের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গ্রন্থে বার বার কোনো স্বল্প-বয়স্কা বালিকাকে 'লীলাবতী' নামে সম্বোধন করে শিক্ষণীয় বিষয়ের উপদেশ দেওয়া আছে। কোনো প্রমাণ নেই, কিন্তু মনে করা হয় যে লীলাবতী ভাস্করের কন্যা ছিলেন। গ্রন্থের ভাষা সুস্পষ্ট ও সহজ, এবং অলপবয়স্কদের উপযোগী। এখনও কতকটা এর রচনাভঙ্গীর জন্য গ্রন্থখানি সংস্কৃত বিদ্যালয়ে অধীত হয়। গণিতবিষয়ক গ্রন্থ আরও লিখিত হতে থাকে (নারায়ণ, ১১৫০; গণেশ ১৫৪৫), কিন্তু এগুলি পূর্বে যা-কিছু লেখা হয়েছিল তারই পুনরুক্তি মাত্র। দ্বাদশ শতাব্দীর পর হতে বর্তমান যুগে পেঁছনো পর্যন্ত এদেশে গণিতে অল্পই মৌলিক কাজ হয়েছে।

অষ্টম শতাব্দীতে, খালিফ্ অল-মনসুরের রাজত্বকালে (৭৫৩-৭৭৪) কয়েকজন ভারতীয় পন্ডিত কতকগুলি গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থ সঙ্গে নিয়ে বোগ্-দাদে যান। সম্ভবত এরও আগে ভারতীয় অঙ্ক-সঙ্কেতগুলি বোগ্দাদে পেঁছেছিল,

কিন্তু এই প্রথম সুব্যবস্থিতভাবে গণিত ওদেশে যায়, আর এই সময়ে আর্যভট্টের ও অন্যদের গ্রন্থ আরবীভাষায় অনূদিত হয়। এইরূপে আরব অঞ্চলে এই সকল পণ্ডিতেরা গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার অনুশীলন বিস্তৃত করেন। এছাড়া ভারতীয় অঙ্কসঙ্কেতও সেখানে প্রচারিত হয়। বোগদাদ তখন বিদ্যালোচনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল এবং গ্রীক ও ইহুদী পণ্ডিতেরা সেখানে সমবেত হন ও গ্রীক দর্শন, জ্যামিতি ও বিজ্ঞান নিয়ে আসেন। মধ্য-এশিয়া হতে স্পেন পর্যন্ত সমগ্র মুসলমান জগতে বোগদাদের সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তৃত হয় এবং এই বিশাল ভূখণ্ডে আরবীতে অনূদিত ভারতীয় গণিত ছড়িয়ে পড়ে। অঙ্ক-সঙ্কেতগুলিকে আরবেরা 'হিন্দের সঙ্কেত' বলত, আর সংখ্যার আরবী হল 'হিন্দসা'—অর্থাৎ 'হিন্দ্ হতে'।

এই আরব প্রভাবান্বিত দেশগুলি হতে নব-গণিত ইউরোপীয় দেশগুলিতে পেঁছায়, সম্ভবত স্পেনের মুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দিয়ে, এবং ইউরোপীয় গণিতের ভিত্তি স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। ইউরোপে নূতন সংখ্যাগুলির ব্যবহার সহজে প্রচলিত হয়নি, কারণ সেগুলিকে (খৃস্ট ধর্মে) অবিশ্বাসীদের সঙ্কেত বলা হত, এবং এই জন্য সেগুলির গ্রহণে বাধা ঘটেছিল। এই বাধা দূর হয়ে সঙ্কেতগুলি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হতে কয়েক শত বছর লেগেছিল। এগুলির সকলের আগের ব্যবহার সম্বন্ধে যা জানা গেছে তা হয়েছিল সিসিলির মুদ্রায়, ১১৩৪ খৃস্টাব্দে। ইংলণ্ডে প্রথম ব্যবহার হয় ১৪৯০ খৃস্টাব্দে।

এখান হতে বোগদাদে পণ্ডিতেরা গ্রন্থাদি নিয়ে যাওয়ার আগে পশ্চিম এশিয়ায় ভারতীয় গণিতের জ্ঞান, বিশেষত অঙ্কের স্থানীয় মানবিধি, প্রচারিত হয়েছিল। সেভেরাস্ সেবোখ্ত্ নামে একজন সীরিয়াবাসী সন্ন্যাসী-পণ্ডিত ইউফ্রেটীস নদী-তীরে একটি মঠে বাস করতেন। তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে গ্রীক পন্ডিতেরা সীরিয়াবাসীদের অবজ্ঞা করত। ৬৬২ খৃস্টাব্দে এই অভিযোগে তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে তাঁর দেশবাসীরা কোনোরূপেই গ্রীকদের অপেক্ষা হীন ছিল না। বিষয়টির ব্যাখ্যা-স্বরূপ তিনি ভারতীয়দের সম্বন্ধে লিখেছেন, 'ভারতীয়দের বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা আমি বাদ দিচ্ছি; তাঁরা সীরিয়াবাসীদের মত নন; তাঁদের জ্যোতির্বিদ্যা-বিষয়ক সূক্ষ্ম আবিষ্ক্রিয়াগুলিতে গ্রীস ও ব্যাবিলোনিয়ার পণ্ডিতদের আবিষ্কার অপেক্ষা সমধিক চাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁদের গণনা এতই আশ্চর্য যে সেকথা প্রকাশ করে বলা যায় না। আমি কেবল বলতে চাই যে তাঁদের গণনা নয়টি সঙ্কেতের সাহায্যে করা হয়ে থাকে। গ্রীক ভাষা ব্যবহার করে বলে যারা মনে ভাবে যে তারা বিজ্ঞানের শেষ সীমায় পেঁচেছে তাদের এই সকল বিষয় জানা উচিত, তাহলে তারা অনুধাবন করতে পারবে যে আরও অনেকে আছেন যাঁরা কিছু জানেন।'*

ভারতীয় গণিত সম্বন্ধে ভাবলেই আধুনিককালের একজন অসাধারণ লোকের কথা

* বি. দত্ত ও এ. এন. সিং প্রণীত 'হিস্ট্রি অফ্ হিন্দু ম্যাথাম্যাটিক্স' (১৯৩৩) গ্রন্থে উদ্ধৃত। এই বিষয়ের অনেক তথ্যের জন্যে আমি এই পুস্তকখানির কাছে ঋণী।

মনে আসে। ইনি শ্রীনিবাস রামানুজম। দাক্ষিণাত্যে একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম-গ্রহণ করে তিনি যথাযোগ্য শিক্ষার সুযোগ পাননি। মাদ্রাজের পোর্ট-ট্রাস্টে কেরানীর পদ গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁর মনে অদমনীয় সহজাত প্রতিভা সকল সময় উচ্ছলিত হয়ে থাকত, এবং তিনি অবসর সময় সংখ্যা ও সমীকরণ নিয়ে ব্যাপৃত থাকতেন। সৌভাগ্যক্রমে এক সুযোগে একজন গণিতজ্ঞের দৃষ্টি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তিনি এই ব্রাহ্মণ যুবকের কিছু কিছু কাজ ইংলণ্ডে, কেমব্রিজে পাঠিয়ে দেন। সেখানে তাঁর কাজ দেখে অনেকে সন্তুষ্ট হয়ে একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিলে তিনি কেরানীগিরি ত্যাগ করে কেমব্রিজে যান এবং অল্পকাল মধ্যেই বিস্ময়কর মৌলিকত্ব দেখান ও অনেক মূল্যবান কাজ করেন। ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটি একরূপ নিজেরাই অগ্রসর হয়ে তাঁকে সভ্য অন্তর্ভুক্ত করে নেন; কিন্তু তিনি দুবছর পরে, ৩৩ বছর বয়সে, সম্ভবত ক্ষয়রোগে, প্রাণত্যাগ করেন। আমার মনে পড়ছে, অধ্যাপক জুলিয়ান হাক্সলি কোথায় যেন তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন যে তিনি এই শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ গণিত-বিশারদ ছিলেন।

রামানুজমের সংক্ষিপ্ত জীবন ও মৃত্যুতে ভারতের দুরবস্থার পরিচয় আছে। আমাদের এই কোটি কোটি লোকের মধ্যে কতই অল্পসংখ্যক ব্যক্তি কোনো শিক্ষালাভ করতে পায়, আর কত কত জন অনশনের প্রান্তে জীবনধারণ করে; আর যারা কিছু শিক্ষা পায় তাদেরও আশা ভরসার দৌড় কোনো কার্যালয়ে কেরানীগিরি পর্যন্ত—বেতন ইংলণ্ডে বেকার ব্যক্তিরা যে ভাতা এমনিই পায় তা হতেও অনেক কম। জীবনের দ্বার যদি তারা খোলা পেত, যদি পেত অন্ন, স্বাস্থ্যের অনুকূল অবস্থার মধ্যে জীবন-ধারণের সুযোগ এবং শিক্ষা ও উন্নতির সুবিধা, তাহলে এদেশের কত বহু জন উচ্চ-শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক, শিল্পবিদ, শ্রমশিল্পে উদ্যোক্তা, লেখক কিংবা চারুশিল্পী হয়ে নূতন ভারত ও নূতন জগৎ গড়ে তোলার কাজে সহায় হতে পারত।

২১ : বৃদ্ধি ও ক্ষয়

খৃস্টীয় অব্দের প্রথম হাজার বছরে ভারতে অনেক উন্নতি-অবনতি, অনেক বিদেশী আক্রমণকারীদের সঙ্গে সংগ্রাম, অনেক অন্তর্বিরোধ ঘটল। তবু এই কালে দেশে সবল জাতীয়জীবন প্রকাশ পেল; সকলদিকে উচ্ছলিত শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। দর্শন, সাহিত্য, নাটক, শিল্প, বিজ্ঞান ও গণিতে পুষ্পিত হয়ে উঠল ভারতীয় সংস্কৃতিজাত একটি সমৃদ্ধ সভ্যতা। এই সময়ে এদেশের অর্থনীতির ক্ষেত্র বর্ধিত হল, আর ভারতের দিগন্ত যেন বিস্তৃত হয়ে উঠল আরও অনেক দেশকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে। ইরান, চীন, গ্রীক জগৎ ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে এখন সংস্পর্শ ঘটল, আর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল পূর্ব সমুদ্রের দিকে বিস্তার লাভের প্রচেষ্টায় ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপন এবং ভারতের সীমা ছাড়িয়ে তার সংস্কৃতির বিস্তারলাভ। এই হাজার বছরের মাঝামাঝি চতুর্থ শতাব্দীর প্রায় প্রথম থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত, গুপ্তসাম্রাজ্য নানাভাবে উন্নতি লাভ করার পর এই বুদ্ধি, জ্ঞান, শিল্প প্রভৃতির

বিস্তারের প্রয়াস শক্তির প্রতীক হয়ে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করল। একেই বলা হয় ভারতের সুবর্ণযুগ, অর্থাৎ উৎকর্ষশীল প্রাচীন যুগ। এই যুগের লেখাকেই প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য বলা হয়েছে। এই সকল লেখায় আমরা পাই তখনকার উন্নতির অনুরূপ প্রসন্নতা ও আত্মনির্ভরের পরিচয়, আর দেখি ভারতের সভ্যতার এই মধ্য-দিনের গর্বে উদ্দীপ্তচিত্ত মানুষেরা তাদের সমগ্র ধীশক্তি ও শিল্পশক্তি যতদূর উৎকর্ষ-লাভ সম্ভব তার জন্য নিয়োগ করছে।

কিন্তু এই সুবর্ণ যুগ শেষ হবার আগেই দুর্বলতা ও ক্ষয়ের চিহ্ন দেখা গেল। শ্বেত হূনেরা উত্তর-পশ্চিম থেকে বার বার আক্রমণ করল ও প্রতিহত হল, কিন্তু তাদের আক্রমণ থামল না, ধীরে ধীরে তারা উত্তর-ভারতে প্রবেশ করতে লাগল। প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল তারা উত্তর-ভারতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত রেখেছিল, কিন্তু শেষ পরাক্রান্ত গুপ্তরাজা মধ্য-ভারতের এক রাজা যশোবর্মণের সহযোগে হূনদের বিতাড়িত করে দিল। এই বহুকালব্যাপী বিরোধ ও সংঘর্ষে ভারতবর্ষ রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ল এবং মনে হয় বহুসংখ্যক হূন উত্তর-ভারতে স্থায়ী হওয়ায় দেশ-বাসীদের মধ্যে ভিতরে ভিতরে একটা পরিবর্তন ঘটল। দেশের লোকের সঙ্গে তারা মিশে গেল যেমন আরও অনেক বিদেশী মিশে গিয়েছিল, কিন্তু তারা যে পরিবর্তন আনল তাতে আর্য-ভারতীয় জাতির পুরাতন আদর্শগুলি দুর্বল হয়ে পড়ল। পুরাতন বিবরণ হতে জানা যায় যে হূনেদের ব্যবহার অতিশয় নির্দয় ও বর্বরশ্রেণীর ছিল, যুদ্ধ কি রাজ্যশাসন সম্বন্ধে ভারতীয় রীতিনীতির একেবারে বিরুদ্ধ।

সপ্তম শতাব্দীতে রাজা হর্ষের সময়ে রাজনীতি ও সংস্কৃতির উভয়ত পুনর্জীবনলাভ ঘটেছিল। উজ্জয়িনী গুপ্তরাজাদের সমৃদ্ধি-সমুজ্জ্বল রাজধানী ছিল; আবার একবার একটা শক্তিশালী রাজ্যের রাজধানী এবং শিল্প ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে উঠল। কিন্তু পরের কয়েক শতাব্দীতে এই স্থানও দুর্বল হয়ে পড়ল। নবম শতাব্দীতে গুজরাটের মিহিরভোজ কনৌজে রাজধানী স্থাপন করে উত্তর ও মধ্য-ভারতে তাঁর রাজ্য গড়ে তোলেন। আর একবার সাহিত্য পুনর্জীবিত হয়েছিল, আর এবার রাজশেখর ছিলেন এই সাহিত্য প্রচেষ্টার প্রধান নায়ক। একাদশ শতাব্দীতে পুনরায় আর একজন ভোজ-বংশীয়ের অভ্যুদয় হয়, এবং তাঁর সময়ে উজ্জয়িনী পুনরায় সমৃদ্ধ রাজধানী হয়ে ওঠে। এই ভোজরাজ আশ্চর্য শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি ব্যাকরণে পণ্ডিত ছিলেন এবং অভিধান রচনা করেছিলেন, আর তাছাড়া চিকিৎসাশাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিদ্যাতেও বিশেষ উৎসাহশীল ছিলেন। তিনি অনেক সৌধ রচনা করেন এবং শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হন। কবি ও লেখকরূপেও তাঁর প্রসিদ্ধি আছে, কারণ অনেক গ্রন্থ তাঁর রচিত বলে শোনা যায়। মহানুভবতা, বিদ্যা ও দাক্ষিণ্যের দৃষ্টান্তরূপে তাঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প ও কাহিনী সাধারণের মধ্যে এখনও প্রচারিত আছে।

মাঝে মাঝে এই সকল সাময়িক উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া গেলেও ভিতরে ভিতরে ভারত বলহীন হয়ে পড়ল এবং তাতে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা দুর্বল তো হলই,

সঙ্গে সঙ্গে তার সৃষ্টিশক্তিও কমে গেল। কবে এটা ঘটল তা বলা যায় না, কারণ ব্যাপারটা ধীরে ধীরে ঘটেছে, আর দক্ষিণ অপেক্ষা উত্তরে আগে হয়েছে। দক্ষিণ এই-ভাবে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয় দিকেই গুরুত্বলাভ করল। এর কারণ সম্ভবত এই যে দক্ষিণকে বার বার বৈদেশিক আক্রমণ সহ্য করতে হয়নি। বোধ হয় উত্তরের অনিশ্চিত অবস্থা এড়াবার জন্য লেখক, শিল্পী ও স্থপতিরা বসবাসের জন্য দক্ষিণে গিয়েছিল। দক্ষিণের সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী রাজ্য ও তাদের গৌরবোজ্জ্বল রাজসভা এই সকল গুণী লোকেদের কাছে আকর্ষণের বিষয় হয়েছিল। সেখানে তাঁরা অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য বহু সুবিধা লাভ করে তাঁদের গুণানুরূপ সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

উত্তর-ভারত যদিচ আর পূর্বের মত প্রভাবসম্পন্ন ছিল না এবং ছোট ছোট খণ্ড-রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, সেখানে জীবন তখনও ছিল উৎকর্ষশীল। সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক প্রচেষ্টার অনেক কেন্দ্র তখনও সেখানে ছিল। বারাণসী পূর্বের মতই ছিল ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধীয় সকল চিন্তার মর্মস্থল, এবং কোনো ব্যক্তি নূতন কোনো অনুমান প্রচার করতে, কিংবা কোনো পূর্বের অনুমানের নূতন ব্যাখ্যা দিতে ইচ্ছা করলে, তাঁকে তাঁর বক্তব্য প্রতিপন্ন করতে এখানেই আসতে হত। কাশ্মীর বহুকাল ধরে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য বিদ্যার আবাসভূমি ছিল। সুবিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরও অনেক বিশ্ববিদ্যালয় উন্নতিলাভ করেছিল। এই নালন্দার গৌরবের অন্ত ছিল না, এখানে অধ্যয়ন করাটাই পাণ্ডিত্যের পরিচয় বলে গৃহীত হত। এখানে প্রবেশ করাও সহজ ছিল না কারণ বিদ্যায় যথোচিত অগ্রসর না হলে কোনো ব্যক্তিকে এখানে ভর্তি করা হত না। এখানে বিদ্যার উচ্চস্তরের কাজ হত, ছাত্রেরা আসত চীন, জাপান, তিব্বত থেকে, এমনকি কথিত আছে যে কোরিয়া, মোঙ্গোলিয়া ও বোখারা থেকেও শিক্ষার্থী আসত। বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য-ধর্মানুমোদিত ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধীয় বিদ্যা ছাড়া এখানে সাধারণ ব্যবহারিক বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হত। শিল্প ও স্থাপত্যের শিক্ষালয়, চিকিৎসা-বিদ্যালয়, এবং কৃষি, গোশালা, পশুপালন প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষা দেওয়ার আয়োজন ছিল। বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার প্রধানত এই নালন্দার ছাত্রদের দ্বারা হয়েছিল।

এছাড়া, বিহারে বর্তমান ভাগলপুরের সন্নিকটে ছিল বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়, আর কাথিয়াওয়াড়ে বল্লভী। গুপ্তদের সময়ে উজ্জয়িনীর বিশ্ববিদ্যালয় উন্নতিলাভ করেছিল। দাক্ষিণাত্যে ছিল অমরাবতী।

এই হাজার বছর যখন শেষের দিকে এল, ভারত-সভ্যতার মধ্যাহ্ন-সূর্য যেন অপরাহ্নে ঢলে পড়ল; প্রভাতের দীপ্তি অনেক আগেই নিস্তেজ হয়েছিল, এখন মধ্যদিনও অতিক্রান্ত হল। দাক্ষিণাত্যে এখনও শক্তির পরিচয় শেষ হয়নি, তা আরও কয়েক শতাব্দী দেখা গিয়েছিল। বিদেশে ভারতীয় উপনিবেশগুলিতে পরবর্তী সহস্র বছরের মাঝামাঝি পর্যন্ত জীবনের গতি সবলই ছিল। কিন্তু অন্তঃকরণ হয়ে উঠেছিল পাথরের মত প্রাণহীন, এবং দিন দিন এই অবস্থা সভ্যতার সর্ব অঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

অষ্টম শতাব্দীর শঙ্করের পর আর কোনো উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক জন্মালেন না, যদিচ অনেক টিকাকার ও তার্কিকের উদ্ভব হল। শঙ্করও তো এসেছিলেন দাক্ষিণাত্য থেকে। সত্যের অনুসন্ধানে যে কৌতূহল ও নূতন পথে চিন্তা করার সৎসাহস প্রকাশ পেয়েছিল, তার স্থান নিল নীরস যুক্তি আর নিষ্ফল তর্ক-বিতর্ক। ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম দুয়েরই হল অধোগতি আর হীন-শ্রেণীর পূজাপদ্ধতি দেখা দিল কোনো কোনো তান্ত্রিক রূপ নিয়ে এবং বিকৃত যোগাভ্যাসও ছড়িয়ে পড়ল।

সাহিত্যে, অষ্টম শতাব্দীর ভবভূতিই শেষ উচ্চশ্রেণীর লেখক। অনেক পুস্তক তাঁর পরেও লেখা হতে থাকে কিন্তু রচনাভঙ্গী দিন দিন জটিল হয়ে ওঠে, ও তাতে পূর্বের ন্যায় চিন্তা কি প্রকাশের নূতনত্ব ও সতেজ ভাব আর দেখা যায় না। গণিতে, দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাস্করই শেষ বিশিষ্ট ব্যক্তি। শিল্পে, ই. বি. হ্যাভেল আমাদের আরও একটু এদিকে আনতে চান। তিনি বলেন যে প্রকাশের রূপ নিখুঁতভাবে শিল্পগুণে সম্মত হয়ে ওঠে সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দীতে, আর সেই সময়েই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য ও চিত্র প্রস্তুত হয়। সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দী হতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত তাঁর মতে ভারতশিল্পের শ্রেষ্ঠতার সময়। এই সময়টাতেই ইউরোপীয় গথিক শিল্পের সর্বোচ্চ উন্নতি ঘটেছিল। তিনি আরও বলেন ভারতীয় শিল্পের সৃষ্টি-শক্তির যে অবনতি হয়েছে তা শুরু হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীতে। তাঁর এই কথা কতখানি ঠিক তা আমি জানি না, কিন্তু আমার মনে হয়, শিল্পের ক্ষেত্রেও দক্ষিণ-ভারত উত্তর অপেক্ষা দীর্ঘতর কাল পুরাতন রীতি বজায় রেখেছিল।

যে-সকল অপেক্ষাকৃত বৃহৎ দলগুলি উপনিবেশ স্থাপনের জন্য দেশত্যাগ করেছিল তাদের শেষদল বহির্গত হয়েছিল নবম শতাব্দীতে, দক্ষিণ-ভারত হতে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের চোলরা একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমুদ্রের উপর প্রবল ছিল এবং শেষের দিকে শ্রীবিজয় জয় করেছিল।

এইরূপে আমরা দেখতে পাই যে ভারতের জীবন শুষ্ক হয়ে আসছিল এবং তার শক্তি ও সৃষ্টি-প্রতিভাও হারাচ্ছিল। এটা হচ্ছিল ধীরে এবং কয়েক শতাব্দী ধরে। এই ক্রমিক ক্ষয় উত্তরে আরম্ভ হয়ে শেষে দক্ষিণে পৌঁছেছিল। এই যে রাজনৈতিক অবনতি ও সাংস্কৃতিক গতিহীনতা এল তার কারণ কি? জীবের যেমন বার্দ্ধক্য আসে তেমনি কি সভ্যতারও বার্দ্ধক্য এসেছিল, কিংবা এর কি জোয়ার-ভাটা আছে? অথবা কোনো বাহ্য কারণে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রভৃতির জন্যই কি এরূপ ঘটেছিল? রাধাকৃষ্ণন বলেন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারানোর সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় দর্শন শক্তিহীন হয়েছিল। সীলভ্যা লেভি লিখেছেন, 'স্বাধীনতা হারানোর সঙ্গে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতিও লোপ পায়। ভাষায় ও সাহিত্যে যে নবীনতা ও সাবলীলতা ছিল তা দেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্বাসিত হল এবং তার স্থান অধিকার করল শুষ্ক পাণ্ডিত্যের কচ্‌কচি।'

এটা অবশ্যম্ভাবী, কারণ স্বাধীনতা হারালে সাংস্কৃতিক অবনতি ঘটবেই ঘটবে। আর কোনো প্রকারের ক্ষয় পূর্বেই না ঘটলে স্বাধীনতাই বা যাবে কেন? একটা ছোট

দেশকে আর একটা শক্তিমান দেশ সহজেই পীড়ন করতে পারে, কিন্তু ভারতের মত বিশাল, পরিপুষ্ট এবং উচ্চ-সভ্যতা-সম্পন্ন দেশ বিদেশীর আক্রমণে মুহ্যমান হয় না যদি ভিতরে ভিতরে তার ক্ষয় না হয়ে থাকে, কিংবা আক্রমণকারীরা যদি যুদ্ধবিদ্যায় অধিকতর পারদর্শী না হয়। এই হাজার বছরের শেষাশেষি ভারতে আভ্যন্তরীণ ক্ষয়ের চিহ্ন স্পষ্টই দেখা গেছে।

প্রত্যেক সভ্যতায় পুনঃ পুনঃ ক্ষয় ও বিপ্লব আসে, আর ভারতের ইতিহাসেও পূর্বে এসেছিল। কিন্তু ভারত সেসব সত্ত্বেও টিকে ছিল, এবং পুনরায় পূর্ব বল ফিরিয়েও এনেছিল। কখনও কখনও কিছুকাল নিশ্চেষ্ট থেকে ভারত আবার আত্ম-প্রকাশ করেছে নবশক্তিতে। তার অন্তঃস্থলে বরাবর কর্মশক্তি সঞ্চিত থাকত এবং এই শক্তি দেশকে নব নব সংস্পর্শের ভিতর দিয়ে আবার সতেজ করে তুলেছে, পুরাতন হতে একটু পৃথক রূপে, কিন্তু সকল সময়েই তার সঙ্গে নিবিড় যোগ রক্ষা করে। সেই অভিযোজনশক্তি, সেই মনের নমনীয়তা, যার দ্বারা ভারত রক্ষা পেয়েছে বহুবার, তা কি এখন তাকে ত্যাগ করেছে? তার বিশ্বাসগুলির অনমনীয়তা, তার সমাজ-ব্যবস্থার কঠোরতা, তার মনকেও কঠিন ও কর্মক্ষমতাশূন্য করে দিয়েছে কি? জীবনের উন্নয়ন যদি না হতে থাকে, তার বিবর্তন থেমে যায়, চিন্তার অগ্রগতিও বন্ধ হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষ বহুকাল ধরে একটা অদ্ভুত যোগাযোগের পরিচয় দিয়ে আসছে, এখানে মিশেছে ব্যবহারিক জীবনের রক্ষণশীলতার সঙ্গে বিস্ফোরক চিন্তা। এ-চিন্তা অবশ্য ব্যবহারকেও স্পর্শ করেছে, কিন্তু তা তার আপন পথে, অতীতের অসম্মান না করে। 'যদি ওরা একবার পুরাণের ভাবধারা অনুধাবন করে, তাহলে সেখানে নূতনতর প্রেরণার সন্ধান পাবে। অগোচরে ভারতের রূপান্তরের পর রূপান্তর ঘটে।' কিন্তু যখন চিন্তা তার সবলতা, তার বিস্ফোরকশক্তি হারাল, তার সৃষ্টিশক্তি রইল না, জীর্ণ, অর্থহীন প্রথার বশ্যতা স্বীকার করে এবং যা কিছু নূতন তারই ভয়ে জড়সড় হয়ে পুরাতন বুলি আওড়াতে লাগল, তখন জীবনের প্রবাহ গেল থেমে, নিজের তৈরি কারাগারে নিজেই আবদ্ধ হল।

সভ্যতা অবসন্ন হয়ে পড়েছে এমন দৃষ্টান্ত আমরা অনেক পেয়েছি। সম্ভবত এর সব থেকে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল রোমের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের প্রাচীন সভ্যতার অবসান। উত্তর থেকে আগত আক্রমণকারীদের কাছে পরাজিত হবার বহু পূর্বেই রোম আপন আভ্যন্তরীণ দুর্বলতায় প্রায় নির্জীব হয়ে এসেছিল। এর অর্থ-নৈতিক অবস্থা একদিন উন্নতিশীল ছিল কিন্তু এ-সময়ে ক্ষীণ হয়ে অনেক কষ্টের কারণ হয়েছিল। শহরের শ্রমশিল্পগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সমৃদ্ধ নগরগুলি ক্ষুদ্র ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, এমনকি জন্মের হারও কমে গিয়েছিল। সম্রাটেরা তাঁদের ক্রমবর্ধমান অসুবিধা দূর করার জন্য অনেক উপায় অবলম্বন করেছিলেন। বণিক, কারিগর ও শ্রমিক সকলের সম্বন্ধেই নূতন নূতন আইন জারি করা হয়েছিল এবং তাদের জোর করে নির্দিষ্ট কোনো কোনো কাজে নিযুক্ত রাখা হত। অনেক কর্মীর পক্ষে তাদের আপন আপন মণ্ডলীর বাইরে বিবাহও নিষিদ্ধ ছিল; এই প্রকারে

কোনো কোনো কাজে নিযুক্ত লোকেদের মধ্যে জাতিভেদ গড়ে উঠেছিল। চাষীরা হয়ে পড়েছিল গোলাম। কিন্তু দেশের নিম্নগতিকে এই ধরনের উপর উপর চেষ্টায় বাধা দেওয়া যায়নি, বরঞ্চ তাতে অবস্থা আরও মন্দ হয়েছিল, আর এইভাবে রোমসাম্রাজ্যের অবসান ঘটেছিল।

ভারতের সভ্যতার অবনতি এমনি নাটকীয় ভাবে হয়নি। যা-কিছু ঘটেছে সেসব সত্ত্বেও টিকে থাকার আশ্চর্য শক্তি দেখিয়েছে ভারত, কিন্তু ধারাবাহিক অবনতি স্পষ্টই দেখা যায়। খৃস্টের জন্মের পর প্রথম হাজার বছরের শেষে ভারতে সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল তার খুঁটিনাটি খবর দেওয়া কঠিন, তবে একথা অনেকটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে তার উন্নতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থা শেষ হয়ে এসেছিল, এবং তা ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছিল। সম্ভবত এটা হয়েছিল তার সমাজগঠনের কঠোরতা ও অপরকে বাইরে ঠেকিয়ে রাখার জন্য। জাতিভেদ এই অবস্থার জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী। ভারতীয়েরা বিদেশে (যেমন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়) গেলে তাদের মানসিক ও সামাজিক অনমনীয়তা কমে যেত, তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও সহজভাব লাভ করত, এবং সেই জন্য তারা উন্নতি করতে পারত এবং তাদের প্রতিপত্তিও বিস্তৃত হত। আরও চার কি পাঁচ শতাব্দী ধরে তারা এই সব উপনিবেশে উন্নতিলাভ করেছিল, তেজ ও সৃষ্টি-শক্তির পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে, বাইরের সঙ্গে যোগরক্ষা না করার জন্য, সেই শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, এবং একটা সংকীর্ণ অনুদার ভাব প্রকাশ পেয়েছিল। জীবনকে খণ্ড খণ্ড করে নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ করা হয়েছিল, সেখানে কাজ একেবারে বাঁধা-ধরা, বন্ধন ছিল কঠিন ও চিরস্থায়ী, আর কারও সঙ্গে দেশের লোকের কোনো সম্পর্কই থাকতে পারত না। দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা ছিল ক্ষত্রিয়দের কাজ, অন্যদের এতে আগ্রহ দেখা যেত না, আর তাদের একাজে হাত দিতেও দেওয়া হত না। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা ব্যবসায়-বাণিজ্যকে তাচ্ছিল্য করত। নিম্নজাতির লোকদের শিক্ষা ও উন্নতির সুযোগ হতে বঞ্চিত রাখা হত—তারা কেবল উচ্চ বর্ণের লোকেদের কাছে বাধ্য থাকার শিক্ষা পেত। নগরে অর্থনৈতিক এবং শ্রমশিল্প-বিষয়ে উন্নতি হয়েছিল, কিন্তু রাজ্যের কাঠামো ছিল অনেকাংশেই সামন্ততান্ত্রিক। সম্ভবত যুদ্ধবিদ্যাতে ভারতের অবনতি ঘটেছিল। এই অবস্থায়, কাঠামো না বদলালে এবং প্রতিভা ও শক্তির নূতন নূতন উৎসমুখ খুলে না দিলে, কোনো লক্ষণীয় প্রগতি সম্ভব ছিল না। জাতিভেদ এরূপ পরিবর্তনে বাধাস্বরূপ হয়েছিল। এর গুণ যাই হোক না কেন, (যদিচ এরই কারণে সমাজ স্থায়িত্ব লাভ করেছিল) এই জাতিভেদেই আবার ধ্বংসের কারণ নিহিত ছিল।

ভারতের সামাজিক ব্যবস্থা দেশের সভ্যতাকে আশ্চর্য স্থায়িত্ব দান করেছিল। (এ বিষয়ে পরে আরও বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।) এই জাতিভেদ প্রত্যেক দল, অর্থাৎ জাতির মধ্যে একতা এনে তাতে বল সঞ্চার করেছিল, কিন্তু ব্যাপ্তি ও ব্যাপকতর মিলনের পথে বাধা হয়েছিল। শ্রমশিল্প ও নৈপুণ্যে বৃদ্ধি পেয়েছিল কিন্তু জাতির আপন আপন গণ্ডির মধ্যে, পৃথক পৃথক ভাবে। বিশেষ বিশেষ কাজ বংশগত হয়েছিল,

আর নূতন ধরনের কাজ কি নূতন পথের চেষ্টায় কারও উৎসাহ ছিল না, সকলেই পুরাতন অভ্যস্ত পথে চলতে চাইত, নব নব উদ্ভাবনা কি প্রবর্তনায় কেউ মন দিত না। এতে ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যে খানিকটা স্বাধীনতা মিলত সত্য, কিন্তু এর জন্য যে ক্ষতি ঘটত তা অনেক, কারণ অধিকতর স্বাধীনতার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হত না, আর বহু সংখ্যক লোক উন্নতির সকল সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়ে সমাজের নিম্নস্তরে চিরদিন আবদ্ধ থাকত। যতদিন এই সমাজ-ব্যবস্থায় উন্নতি ও বিস্তৃতির পথ ছিল ততদিন ভালই ছিল, কিন্তু যখন তার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে অধিকতর উন্নতির জন্য আর স্থান রইল না, সমাজ তখন হয়ে পড়ল নিশ্চল এবং প্রগতিশূন্য, আর শেষে এই সমস্ত কারণের অপরিহার্য ফল ফলল—চলতে লাগল পিছন দিকে।

এইরূপে পতন ঘটল সকল দিকেই—জ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, বৈজ্ঞানিক কুশলতা, যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতি সকল বিষয়েই, এবং বহির্জগতের জানা-শোনা ও তার সঙ্গে সংস্পর্শও বন্ধ হল। এখন লোকের মন লিপ্ত হয়ে পড়ল কেবল স্থানীয় ব্যাপারে, ভারতবর্ষকে সমগ্রভাবে বিবেচনা করার বদলে তারা ভাবতে লাগল আপন আপন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের কথা, এবং অর্থনৈতিক চেষ্টার ক্ষেত্র হল সংকীর্ণ। তবু পুরাতন সমাজ-অঙ্গে জীবনীশক্তি ছিল, আর ছিল ধরে থাকার ক্ষমতা, এবং কিছু নমনীয়তা ও নূতন বিষয়কে আপনাতে অভিযোজিত করে নেবার যোগ্যতা। এই সকল গুণ থাকায় ভারতের লোকেরা বহু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও টিকে আছে, এবং নূতন নূতন সংস্পর্শ ও চিন্তাধারা হতে লাভবান হতে পেরেছে, কোনো কোনো বিষয়ে অগ্রগতিও দেখা যায়। কিন্তু পুরাতনের বহু অবশেষ, এই অগ্রগতিকে বেশিদূর যেতে দেয় না—বাধা দেয়, ধরে রাখে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ন ূ ত ন ন ূ ত ন স ম স্যা

১ : আরব ও মোঙ্গোল

হর্ষ যখন উত্তর-ভারতে একটি প্রতাপশালী রাজ্যে রাজত্ব করছিলেন এবং চীনদেশীয় পরিব্রাজক পণ্ডিত হিউয়েন্‌ৎসাঙ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নে রত ছিলেন, সেই সময়ে আরবদেশে ইসলাম ধর্ম রূপগ্রহণ করছিল। পরে ইসলাম, ধর্ম ও রাজনৈতিক শক্তি উভয়রূপে, ভারতে এসেছে এবং অনেক নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। তবু আমাদের জেনে রাখা ভাল যে ভারতে কিছু করার আগে তার অনেক কাল কেটেছিল। ভারতের কেন্দ্রস্থলে আসতে তার ছ'শো বছর লেগেছিল, আর জয়ী-রাজশক্তিরূপে আসার আগেই তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসে পড়েছিল। তখন তার পতাকাও হাত-বদল করে পূর্ব হতে ভিন্ন প্রকারের লোকের হাতে গেছে। আরবেরা উচ্ছ্বসিত উৎসাহে ও প্রবল শক্তিতে স্পেন হতে মোঙ্গোলিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত জয় করে সেসব জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল একটি পরমোজ্জ্বল সংস্কৃতি। কিন্তু তারা আসল-ভারতবর্ষে আসেনি, তারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিকটে এসে সেখানেই ছিল। আরব সংস্কৃতি ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ল, এবং তুর্কি গোষ্ঠী মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় প্রাধান্য লাভ করল। এই তুর্কি ও আফগানেরা ভারতের সীমান্ত প্রদেশ হতে ভারতের মধ্যে রাজনৈতিক শক্তিরূপে ইসলাম নিয়ে এল।

কয়েকটা তারিখের সাহায্যে এই ঘটনাগুলিকে ভাল করে বুঝে নেওয়া যায়। হিজরাতের সময় হতে ইসলামের আরম্ভ এরূপ বলা যেতে পারে। অর্থাৎ ৬২২ খৃস্টাব্দে হজরত মুহম্মদ যখন মক্কা থেকে মদীনায় গেলেন তখনই তাঁর ধর্মের শুরু। তার দশ বছর পরে মুহম্মদের মৃত্যু ঘটে। আরবের অবস্থা বিধিবদ্ধ হতে কিছু সময় লেগেছিল, আর তার পরেই একটার পর একটা বহু বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটল, যার ফলে আরবেরা ইসলামের পতাকা হাতে নিয়ে পূর্বে মধ্য এশিয়া পার হয়ে সমগ্র উত্তর আফ্রিকা মহাদেশটির ভিতর দিয়ে, পশ্চিমে স্পেন ও ফ্রান্সে উপস্থিত হল। সপ্তম শতাব্দীতে ও অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে তারা ইরাক, ইরান ও মধ্য এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল। ৭১২ খৃস্টাব্দে তারা ভারতের উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধুদেশে পেঁাছায় ও সেদেশ অধিকার করে। এই স্থানের এবং ভারতের অপেক্ষাকৃত উর্বর অংশের মধ্যে একটি সুবৃহৎ মরুভূমির ব্যবধান থাকায় তারা আর অগ্রসর হয়নি। পশ্চিমে, আরবেরা আফ্রিকা ও ইউরোপের মধ্যস্থিত প্রণালী পার হয়ে ৭১১ খৃস্টাব্দে স্পেনে উপস্থিত হয়। এই প্রণালীর বর্তমান নাম জিব্রল্টার। তারা সমগ্র স্পেন অধিকার করে পিরিণীজ পর্বত পার হয়ে ফ্রান্সে যায়। ৭৩২ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সের অন্তর্গত টুওর্‌স

নামক স্থানে চারল্‌স্‌ মারটেল্‌ কর্তৃক পরাজিত হওয়ায় তাদের অগ্রগতি থেমে যায়।

এ বড় আশ্চর্য, এই আরবদের বিজয়-অভিযান। মনে রাখতে হবে যে তাদের দেশ ছিল মরুভূমি, আর তখন পর্যন্ত তারা উল্লেখযোগ্য কিছুই করেনি। নিশ্চয়ই তাদের এই বিপুল শক্তি তারা পেয়েছিল মুহম্মদের বলবত্তা, তাঁর বৈপ্লবিক চরিত্র হতে, আর তাঁর বিশ্ব-মানবের ভ্রাতৃত্বের বাণী থেকে। তবু এরূপ মনে করা ভুল যে আরব সভ্যতা ইসলামের আগমনের পর হঠাৎ অগোচর অবস্থা হতে মাথা তুলে উঠেছিল। ইসলামী পণ্ডিতদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের আগেকার আরবদের নিন্দা করার প্রবণতা দেখা যায়। তাঁরা সেই সময়ের নাম দিয়েছেন জাহিলিয়ৎ, অর্থাৎ একপ্রকার অজ্ঞান ও কুসংস্কারপূর্ণ অন্ধকার যুগ। অন্যান্য সভ্যতার ন্যায় আরব সভ্যতাও বহুকালের; সেমিটিক জাতিগুলির অর্থাৎ ফিনিসিয়ান, ক্রিট্যান, চ্যালডিয়ান এবং হিব্রু, এইগুলির উন্নতির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিল। ইহুদীরা অপরকে দূরে রাখার, অন্যের সঙ্গে মিলিত না হবার, নীতি অবলম্বন করে, ও সেইজন্য অধিকতর উদার ভাবাপন্ন চ্যালডিয়ান প্রভৃতি জাতি হতে নিজেদের পৃথক করে নেয়, এবং তাদের ও অন্যান্য সেমিটিক জাতির মধ্যে বিরোধ চলতে থাকে। তবু সমগ্র সেমিটিক দেশগুলিতে সংযোগ ও আদান-প্রদান ছিল, আর তাদের সকলের জীবনের পটভূমিকা ছিল এক। ইয়েমেনে ইসলাম-পূর্ব আরব সভ্যতা বিশেষভাবে গড়ে ওঠে। মুহম্মদের আগমনের সময়ে আরবী একটি উন্নত ভাষা ছিল, এবং এর সঙ্গে মিশ্রিত ছিল কিছু পারস্য শব্দ, এমনকি ভারতীয় শব্দও ছিল। ফিনিসিয়ানদের ন্যায় আরবেরাও বাণিজ্যের জন্য দূরে সমুদ্রপথে যেত। ইসলাম-পূর্ব কালে দক্ষিণ-চীনে ক্যাণ্টনের কাছে একটা আরব উপনিবেশ ছিল।

যা হোক, একথা সত্য যে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মুহম্মদ তাঁর অনুসরণকারীদের মধ্যে বিশেষ শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন এবং তাঁদের অন্তর বিশ্বাস ও উৎসাহে পূর্ণ করেছিলেন। এইসকল লোকেরা মনে করত যে তারা একটি নূতন ধর্মান্দোলনের পতাকাবাহী, এবং এইরূপ মনে করায় তারা প্রবল উদ্যম ও আত্মনির্ভরতা লাভ করে অগ্রসর হয়েছিল। এরূপ ক্ষেত্রে অনেকসময় একটা জাতি সমগ্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং দেশের ইতিহাসই বদলে যায়। আর একটা কারণে তারা এতখানি সফলতা লাভ করেছিল। এই সময়ে মধ্য এশিয়া ও উত্তর-আফ্রিকায় পতন এসেছে। উত্তর-আফ্রিকায় দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী খৃস্টীয় দলের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়েছে কোনটি প্রভুত্ব করবে তাই নিয়ে, আর এই বিরোধ রক্তারক্তিতে দাঁড়াতে আরম্ভ করেছে। তখন এখানে যে খৃস্টধর্ম প্রচলিত ছিল তা সংকীর্ণতাদুষ্ট ও অসহনশীল। এদের এবং যে-সকল মুসলমান আরব মানবের ভ্রাতৃত্বের বাণী নিয়ে এসেছিলেন ও আশ্চর্য সহনশীলতা প্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যেকার পার্থক্য বড়ই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এদেশের লোকেরা খৃস্টীয়দের সঙ্গে বিরোধে ক্লান্ত হয়ে আরবদের পক্ষাবলম্বন করেছিল।

আরবেরা যে-সংস্কৃতি বিভিন্ন দেশে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল তা তখন নানা

পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে দিন দিন উন্নতিলাভ করছিল। এই সংস্কৃতিতে ইসলামের নবলব্ধ ধারণাগুলি অবশ্য বিশেষভাবেই বর্তমান ছিল, কিন্তু একে ইসলামীয় সভ্যতা বললে একটু গোলমালে পড়তে হয়। দামাস্কাসে তখন তাদের রাজধানী, সেখানে তারা শীঘ্রই সহজ, সরল জীবন ত্যাগ করে অধিকতর কৃত্রিম জীবন অবলম্বন করল। কনস্টান্টিনোপলের বিজেন্টাইন প্রভাবও তারা পেয়েছিল, কিন্তু সব থেকে বড় পরিবর্তন এল তখন, যখন তারা বোগদাদে গেল। সেখানে পুরাতন ইরানের প্রেরণা লাভ করে আরব-পারস্য সভ্যতা গড়ে তুলল, আর এই সভ্যতা তাদের প্রভুত্বাধীনে যে বিশাল ভূখণ্ড ছিল তাতে ছড়িয়ে পড়ল।

আরবদের বিজয় বহুবিস্তৃত হয়েছিল, এবং যতদূর জানা যায় সহজেই হয়েছিল, কিন্তু ভারতে তারা তখন ও পরেও সিন্ধুপ্রদেশ অপেক্ষা অধিকদূর অগ্রসর হয়নি। এখানে প্রশ্ন ওঠে, ভারতবর্ষ কি তখন এতই সবল ছিল যে আক্রমণ যথোচিতরূপে প্রতিহত করতে পেরেছিল? হয়তো তাই, কারণ এছাড়া বোঝা যায় না কেন প্রকৃত আক্রমণ আসার আগে কয়েক শতাব্দী কেটে গিয়েছিল। আরবদের নিজেদের মধ্যে কোনো গণ্ডগোল থাকার জন্যও এটা হয়ে থাকতে পারে। সিন্ধুপ্রদেশ বোগদাদ কেন্দ্রীয় শক্তি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন মুসলমান রাজ্য হয়ে পড়ে। যদিচ ভারতের উপর বিজয়-অভিযান ঘটেনি, এদেশ ও আরব জগতের মধ্যে সংস্পর্শ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পর্যটকেরা এই সকল স্থানে যাতায়াত করতে থাকেন, দূত বিনিময় চলে, ভারতীয় গ্রন্থ, বিশেষত গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থ, বোগদাদে নিয়ে যাওয়া হলে সেগুলি আরবীভাষায় অনূদিত হয়। অনেক ভারতীয় চিকিৎসক বোগদাদে গিয়েছিলেন। এই বাণিজ্যসংক্রান্ত ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অবশ্য উত্তর-ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। দক্ষিণ-ভারতের রাজ্যগুলিও, বিশেষত পশ্চিম সমুদ্রতীরস্থ রাষ্ট্রকুটগুলি ব্যবসায়ের জন্য কতকটা যোগ দিয়েছিল।

এইরূপে বরাবর সংস্পর্শ ও আদান-প্রদান ঘটায় ভারতীয়েরা এই নূতন ইসলামধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে। প্রচারকেরাও এই নূতন মত প্রচারের জন্য এসেছিলেন এবং তাঁদের সাদরে গ্রহণ করা হয়েছিল। মসজিদ নির্মিত হয়; রাজশক্তি কিংবা প্রজারা কোনো আপত্তি তোলেনি এবং কোনো ধর্মনৈতিক বিরোধও ঘটেনি। ভারতের চিরাগত অভ্যাসই হল সকল প্রকার ধর্মমত ও পূজার্চনা সম্বন্ধে সহনশীলতা। এই সমস্ত হতে বোঝা যায় যে ইসলাম রাজনৈতিক শক্তিরূপে আসার আগে ধর্মরূপে এদেশে এসেছিল।

ওম্মেয় খালিফদের প্রতিষ্ঠিত আরব সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল দামাস্কাসে; এখানে একটি সুন্দর নগর গড়ে উঠেছিল। শীঘ্রই কিন্তু, ৭৫০ খৃস্টাব্দে, আব্বাসিয় খালিফেরা রাজধানী বোগদাদে উঠিয়ে নিয়ে যান। এইবার অন্তর্বিরোধ আরম্ভ হল এবং স্পেন কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্য হতে পৃথক হয়ে একটা স্বতন্ত্র আরব রাজ্য হয়ে রইল। ক্রমে ক্রমে বোগদাদ সাম্রাজ্যও দুর্বল হয়ে বহু ছোট-ছোট রাজ্যে বিভক্ত হল। সেলজুক্ তুর্কিরা মধ্য এশিয়া থেকে এসে বোগদাদে সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিমান হয়ে দাঁড়াল। এখনও

কিন্তু খালিফ আপন ইচ্ছাসুখে রাজত্ব করছেন। ঘজনির সুলতান মাহমুদ ছিলেন একজন তুর্কি, শক্তিমান যোদ্ধা ও বুদ্ধিমান নেতা। ইনি আফগানিস্থানে বলশালী হয়ে উঠে খালিফকে উপেক্ষা করলেন, এবং উপহাস করতে লাগলেন। তবু বোগদাদই মুসলমান জগতের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হয়ে রইল, এমনকি দূরবর্তী স্পেনও অনুপ্রাণনার জন্য এর দিকেই তাকাত। তখন ইউরোপ বিদ্যা, বিজ্ঞান ও শিল্পে এবং জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যে পিছিয়ে ছিল। কেবল আরব-স্পেন, বিশেষত কার্ডোবা বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যা ও মানববুদ্ধির কৌতূহলের বাতিটি ইউরোপের সেই তামস-যুগে প্রজ্জ্বলিত রেখেছিল, এবং এরই কিছু কিছু আলো ইউরোপের তমিস্রা ভেদ করেছিল।

১০৯৫ খৃস্টাব্দে জেরুসালেম উদ্ধার-কল্পে যে যুদ্ধযাত্রা করা হয় তাকে বলা হয়েছে ধর্মযুদ্ধের অভিযান। এ যুদ্ধ চলেছিল প্রায় দেড়শো বছর ধরে। এ কিন্তু দুটি বিবদমান আক্রমণোন্মুখ ধর্মের, অর্থাৎ একদিকে খৃস্টীয়দের ক্রুশকাষ্ঠ আর অন্যদিকে মুসলমানদের চন্দ্রকলার মধ্যে যুদ্ধ নয়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক জি. এস্. ট্রেভালিয়ান বলেন, 'ইউরোপে শক্তির পুনরুদ্বোধন ঘটলে তা পূর্বাভিমুখে চলতে চেয়েছিল, এই যুদ্ধ তারই সামরিক ও ধর্মনৈতিক প্রকাশ। এই যুদ্ধের দ্বারা ইউরোপ যা করতে পেরেছিল তা খৃস্টের কবরটির পুনরুদ্ধার নয়, কিংবা সমগ্র খৃস্টধর্মাবলম্বীদের একতা সংসাধিত হওয়ার সম্ভাবনাও তার ফলে ঘটেনি বরঞ্চ বলতে গেলে এই দুই উদ্দেশ্যই বিফল হয়েছিল। এদের বদলে ইউরোপ ঘরে এনেছিল ললিতকলা, শিল্প, বিলাসিতা, বিজ্ঞান এবং বুদ্ধিবৃত্তির কৌতূহল—সন্ন্যাসী পিটার* এর সবগুলিকেই কিন্তু অতিশয় ঘৃণা করতেন।'

এই যুদ্ধ অভিযানগুলির শেষেরটি নিষ্ফলতার লজ্জা নিয়ে যখন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সেই সময়ে দেখা যায় এশিয়ার অন্তরে এক দারুণ আন্দোলন, একটা প্রবল বিক্ষোভ উপস্থিত হয়েছে। পশ্চিমে চেঙ্গিজ খাঁর অগ্রগতির ধ্বংসলীলা আরম্ভ হয়ে গেছে। ১১৫৫ খৃস্টাব্দে এই ব্যক্তি মোঙ্গোলিয়ায় জন্মগ্রহণ করে। ১২১৯ খৃস্টাব্দে তার অভিযান আরম্ভ হয় এবং অবিলম্বে সমগ্র মধ্য এশিয়া একটা ধূমায়মান ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। তখন তার বয়স হয়েছে। বোখারা, সমরখন্দ, হীরাট ও বালখ্ ছিল এক একটি বিরাট নগর, প্রত্যেকটিতে দশ লক্ষের অধিক লোকের বাস; এগুলি সমস্ত পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল। চেঙ্গিজ রাশিয়ায় কিয়েভ্ পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসে; তার পথে না পড়ায় বোগদাদ বেঁচে গিয়েছিল। চেঙ্গিজ ৭২ বছর বয়সে ১২২৭ খৃস্টাব্দে প্রাণত্যাগ করে। তার উত্তরবর্তীরা ইউরোপের ভিতরে আরও দূরে গিয়েছিল, এবং ১২৫৮ খৃস্টাব্দে হুলাগু বোগদাদ অধিকার করে, ও শিল্প ও বিদ্যার এই সুবিখ্যাত কেন্দ্রটিকে ধ্বংস করে। এখানে পাঁচশো বছরেরও অধিককাল ধরে জগতের সকল স্থান হতে বহু মূল্যবান বস্তু সংগৃহীত হয়েছিল, সবই নষ্ট হয়ে যায়।

* ধর্মযাজক পিটার ('দি হারমিট') এই যুদ্ধের প্রবর্তক ছিলেন।

এশিয়ায় আরব-পারস্য সভ্যতা মোঙ্গোলদের প্রভুত্বাধীনে টিকে ছিল, এবার বিষম আঘাত লাভ করল। তবে উত্তর-আফ্রিকার কোনো কোনো অংশে এবং স্পেনে এ-সভ্যতা তখনও স্থায়ী রইল। বহুসংখ্যক বিদ্বান ব্যক্তি তাঁদের গ্রন্থাদি সঙ্গে নিয়ে বোগদাদ থেকে কাইরোয় ও স্পেনে পলায়ন করলেন। এই দুই স্থানে শিল্প ও বিদ্যার পুনরুত্থান ঘটল। কিন্তু স্পেন এ-সময়ে আরবদের হাতছাড়া হতে আরম্ভ করেছে। কর্ডোবা ১২৩৬ খৃস্টাব্দে আরবদের হাত থেকে চলে গেল। গ্রাণাডা আরও দুই শতাব্দী ধরে আরব সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়েছিল। ১৪৯২ খৃস্টাব্দে গ্রাণাডাও ফার্ডিন্যান্ড ও ইসাবেলার হাতে গেল এবং স্পেনে আরব রাজত্বের অবসান ঘটল। অটোমান তুর্কিরা ১৪৫৩ খৃস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল্ দখল করে এবং এইরূপে ইউরোপে পুনরুত্থান-যুগের উদয় হয়।

যুদ্ধবিগ্রহ ব্যাপারে একটু নূতনত্ব দেখা গিয়েছিল মোঙ্গোলদের এশিয়া ও ইউরোপ বিজয়ে। লিডেল্ হার্ট বলেন, 'ইতিহাসে আর কোনো অভিযানে এরূপ যুদ্ধবিদ্যার প্রয়োগ দেখা যায়নি। যেমন ছিল তার ব্যাপ্তি তেমনি নিপুণতা; শত্রুকে চমকিত করা, ক্ষিপ্র গতি, অপ্রত্যাশিতরূপে অগ্রসর হওয়ার কৌশল, এই সকল গুণই এতে দেখা গিয়েছিল।' চেঙ্গিজ খাঁ জগতের সর্বাপেক্ষা বড় সামরিক নেতা ছিল এরূপ বলা যায়। এশিয়া ও ইউরোপের বীরত্ব, তার এবং তার তীক্ষ্ণবুদ্ধি উত্তরবর্তীদের কাছে ছিল তৃণবৎ। মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপ যে তাদের হাত হতে রক্ষা পেয়েছিল সে কতকটা দৈবাৎই ঘটেছিল। এই মোঙ্গোলদের কাছে থেকে ইউরোপ যুদ্ধবিদ্যা ও সমরকৌশল শিক্ষা করে। আর চীন থেকে ইউরোপ যে বারুদের ব্যবহার শেখে তাও এই মোঙ্গোল-দের হাত দিয়ে।

মোঙ্গোলরা ভারতে আসেনি। তারা সিন্ধুনদীতীরে থেমে যায় ও অন্য দেশ বিজয়ে ব্যাপৃত হয়। তাদের বৃহৎ সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার পর এশিয়ায় কয়েকটা ছোট ছোট রাজ্য গড়ে ওঠে। তারপর তুর্কি তৈমুর, মাতৃপক্ষে চেঙ্গিজ খাঁর বংশের পরিচয় দিয়ে, তারই মত বিজয়-অভিযান চালাবার চেষ্টা করে। তার রাজধানী সমরখন্দ্ পুনরায় একটা সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হয়ে ওঠে; কিন্তু অধিককালের জন্য নয়। তৈমুরের মৃত্যুর পর তার বংশধরেরা যুদ্ধবিগ্রহ অপেক্ষা শান্তিতে শিল্প-সাহিত্য নিয়ে থাকাই বেশি পছন্দ করেছিল। মধ্য এশিয়ায় একটা তৈমুরীয় সাংস্কৃতিক পুনরভ্যুত্থান ঘটেছিল, আর এই পরিবেশেই তৈমুরের এক বংশধর, বাবর, জন্মগ্রহণ করেন ও লালিত-পালিত হন। বাবর ভারতে মুঘল রাজবংশের প্রবর্তক—জাঁকজমকপ্রিয় মুঘলদের তিনিই প্রথম। তিনি ১৫২৬ খৃস্টাব্দে দিল্লী অধিকার করেন।

চেঙ্গিজ খাঁ নামটা আজকাল মুসলমানী বলে মনে হয়, কিন্তু ব্যক্তিটি মুসলমান ছিল না। অনেকের মতে সে 'শামা' ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। এ ধর্ম যে কি তা আমি জানি না, তবে শব্দটা শুনলে বৌদ্ধ নামের আরবী (সংস্কৃত 'শ্রবণ' হতে গঠিত) 'শামানি' শব্দের কথা মনে হয়। বৌদ্ধধর্মের কয়েকটা হীনরূপ এশিয়ার অনেক অংশে প্রচলিত ছিল; মোঙ্গোলিয়াতেও ছিল। চেঙ্গিজ সম্ভবত এরই কোনো একটার প্রভাবের মধ্যে লালিত-

পালিত হয়েছিল। ভাবতেও অদ্ভুত লাগে যে ইতিহাসের সব থেকে প্রচণ্ড সামরিক বিজেতা এক প্রকারের বৌদ্ধ ছিল।*

আজও, মধ্য এশিয়ায় চারজন ঐতিহাসিক দিগ্বিজয়ীর কথা মানুষে স্মরণ করে—সিকান্দার (আলেকজাণ্ডার), সুলতান মাহ্মুদ, চেঙ্গিজ খাঁ এবং তৈমুর। এখন এই চারটি নামের সঙ্গে আরও একটি নাম যোগ দেওয়া আবশ্যক। এ নাম লেনিনের। ইনি অন্য শ্রেণীর মানুষ ছিলেন, যোদ্ধা ছিলেন না, কিন্তু দিগ্বিজয়ী ছিলেন অন্যরূপ ক্ষেত্রে—এই নামের চারধারে এরই মধ্যে অনেক কাহিনী গুচ্ছবদ্ধ হয়ে উঠেছে।

২ : আরব সংস্কৃতির বিকাশ ও ভারতবর্ষের সঙ্গে সংস্পর্শ

ক্ষিপ্রগতিতে এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক অংশ এবং ইউরোপেরও এক টুকরো অধিকার করার পর আরবেরা যুদ্ধবিজয়ের অন্য ক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করল। তাদের সাম্রাজ্য এখন দৃঢ়বদ্ধ করা হচ্ছিল, অনেক নূতন নূতন দেশ তাদের দৃষ্টিপথে এসে পড়েছে। এখন তারা এই সমগ্র জগৎ ও তার জীবনায়ন জানতে চায়। বুদ্ধিবৃত্তির কৌতূহল, যুক্তিগতভাবে অনুমানশীলতা, বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা, এগুলি অষ্টম ও নবম শতাব্দীর আরবদের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। সাধারণত, বাঁধাধরা ধারণা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে গঠিত কোনো ধর্ম যখন প্রবর্তিত হয় তার প্রথম দিকে ধর্মমতই গুরুত্ব লাভ করে, কোনো পরিবর্তন অনুমোদন পায় না। তাদের ধর্মমত আরবদের অনেকখানিই অগ্রসর করে দিয়েছিল; বিজয়োল্লসিত সাফল্যে তাদের এই ধর্মমত আরও গভীর, আরও দৃঢ় হয়েছিল। তবু আমরা দেখি, তারা মতাদির সীমা লঙ্ঘন করে অজ্ঞেয়তাবাদ নিয়েও আলোচনা চালাচ্ছে, এবং উৎসাহের সঙ্গে মনের প্রসার সম্বন্ধে সচেষ্ট হয়েছে। আরব-ভ্রমণকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা, অন্যজাতির লোকেরা কি করেছে, কি ভাবছে তা জানবার জন্য, এবং তাদের দর্শন, বিজ্ঞান, জীবন-নীতি পর্যালোচনা করে নিজেদের চিন্তার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে দূরদূর দেশে গমন করেছেন। দূরদেশ হতে বিদ্বান ব্যক্তি ও গ্রন্থ বোগ্দাদে আনা হত। অষ্টম

* সাইবিরিয়ার মেরু প্রদেশে, মোঙ্গোলিয়ায় এবং সোভিয়েট-মধ্য-এশিয়ার অন্তর্গত টান্নাটুবায় একপ্রকারের শামান বা শামাধর্ম এখনও অল্প অল্প আছে। এ ধর্ম সম্পূর্ণরূপে ভূতপ্রেতে বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত, বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে এর কোনো যোগই দেখা যায় না। তবু বহু পূর্বে এটি বৌদ্ধধর্মের কোনো কোনো হীনরূপের প্রভাবে উদ্ভূত হয়ে থাকতে পারে বলে অনুমান হয়। পরে তা স্থানীয় কুসংস্কারের মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেছে। তিব্বত নিঃসন্দেহরূপে বৌদ্ধ দেশ, সেখানেও লামাধর্ম নামে বৌদ্ধধর্মের একটা পৃথক রূপ প্রকাশ পেয়েছে। মোঙ্গোলিয়ায় শামান ধর্ম থাকলেও সেখানে বৌদ্ধ প্রভাবের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপে, উত্তর ও মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম যে নিষ্প্রভ হয়ে আদিকালের বহু বিশ্বাসে লুপ্ত হয়েছে, তার নানা ক্রম দেখা যায়।

শতাব্দীর মধ্যভাগে খালিফ অল্-মনসুর গবেষণা ও অনুবাদের জন্য একটি সমিতি গঠন করেন, এবং এ'দের দ্বারা গ্রীক, সীরিয়াক, জেন্দ্, ল্যাটিন এবং সংস্কৃত হতে অনেক গ্রন্থ অনূদিত হয়। সীরিয়া, এশিয়া মাইনর ও লেভাণ্টের পুরাতন মঠগুলি পুঁথির জন্য লুণ্ঠিত হয়েছিল। আলেক্জান্দ্রিয়ার পুরাতন বিদ্যালয়গুলি খৃস্টীয় বিশপেরা বন্ধ করে দেয় ও সেখানকার ছাত্রদের তাড়িয়ে দেয়। এইসকল বিতাড়িত ছাত্রদের অনেকে পারস্য ও অন্যান্য স্থানে চলে যায়। তারা এখন বোগ্দাদে নির্ভয় আশ্রয় এবং সাদর অভ্যর্থনা লাভ করল, এবং সঙ্গে নিয়ে এল গ্রীক দর্শন, বিজ্ঞান ও গণিত—প্লেটো ও অ্যারিস্টট্ল্, টোলেমি ও ইউক্লিড্। আরও সেখানে এসেছিলেন, নেস্টোরীয় ও ইহুদী বিদ্বান ব্যক্তিরা এবং ভারতীয় চিকিৎসক, দার্শনিক ও গণিতজ্ঞেরা। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে খালিফ হারুন অল্-রসিদ ও অল্-মামুনের রাজত্বকালে বোগ্দাদ সভ্যজগতে সর্ববৃহৎ জ্ঞানকেন্দ্র হয়ে ওঠে।

ভারতের সঙ্গে আরবদের অনেক সংস্পর্শ থাকায় তারা ভারতীয় গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা বহুল পরিমাণে শিক্ষা করেছিল। তবু দেখা যায় যে এইসকল সংস্পর্শ-প্রচেষ্টা এসেছিল আরবদের কাছ থেকে, এবং আরবেরা যদিচ ভারত হতে অনেক কিছুই শিখে নিয়েছিল, তাদের কাছ হতে ভারতীয়েরা বেশি কিছু শেখেনি। ভারতবাসীরা নিজেদের দূরে দূরে রাখত এবং অহমিকায় বিজড়িত হয়ে যতদূর পারে আপন খোলার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকত। এ বড়ই পরিতাপের বিষয়, কারণ ভারতীয়দের মন যখন সৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলছিল তখন বোগ্দাদে বুদ্ধিবৃত্তির চরম উৎকর্ষের সময়। এই মনীষার উত্তেজনা ও আরবদের নবজাগরণ ভারতীয়ের মনেও আলোড়ন ঘটাতে পারত। অনুসন্ধান করলে পুরাতন দিনের ভারতীয়েরা আরবদের মধ্যে চিন্তা-ক্ষেত্রে আত্মীয়তার পরিচয় পেত।

শক্তিশালী বারমক পরিবার (বারমিসাইড্-রা) হতে হারুন অল্-রসিদ অনেক উজির পেয়েছিলেন। এই পরিবার বোগ্দাদে ভারতীয় বিদ্যা ও বিজ্ঞানের অনুশীলনে বিশেষ উৎসাহ দান করেছিলেন। এই পরিবার সম্ভবত বৌদ্ধধর্ম হতে ধর্মান্তর গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে থাকতে পারে। হারুন অল্-রসিদ একবার পীড়িত হলে মানক নামে এক চিকিৎসককে ভারত হতে নিয়ে যাওয়া হয়। মানক বোগ্দাদে বসবাস করেন এবং সেখানে একটি বৃহৎ চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হন। ইনি ভিন্ন আরব গ্রন্থকারেরা আরও ছ'জন ভারতীয় চিকিৎসকের কথা উল্লেখ করেছেন। জ্যোতির্বিদ্যায় আরবেরা ভারত এবং আলেক্জান্দ্রিয়ার জ্যোতির্বিদদের অপেক্ষাও উন্নতি করেছিল। এই প্রসঙ্গে দুটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; নবম শতাব্দীর জ্যোতির্বিদ ও গণিত বিশারদ অল্ খোয়ারিশ্মি, আর দ্বাদশ শতাব্দীর কবি-জ্যোতির্বিদ ওমর খায়য়াম্। চিকিৎসাশাস্ত্রে এশিয়া ও ইউরোপে আরব চিকিৎসক ও অস্ত্রশাস্ত্রবিদের প্রশস্তিলাভ ঘটেছিল। এ'দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন বোখারার ইবন্‌সিনা (অভিসেন্না)। ইনি ১০৩৭ খৃস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। আবু নাস্র ফারাবি একজন উচ্চশ্রেণীর চিন্তাশীল দার্শনিক ছিলেন।

দর্শনশাস্ত্রে ভারতের প্রভাব দেখা যায়নি। আরবেরা এই বিষয়ে ও বিজ্ঞানে গ্রীক ও পুরাতন আলেক্‌জান্দ্রিয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করত। আরবদের উপর প্লেটো এবং বিশেষভাবে অ্যারিস্টট্‌ল্‌-এর প্রভাব খুব প্রবল ছিল। তখন থেকে এবং এখনও ইসলামীয় বিদ্যালয়ে এঁদের মৌলিক লেখা না হলেও, তার উপর আরবীয় ব্যাখ্যা নিয়মিতভাবে অধ্যাপনা করা হয়ে থাকে। আলেক্‌জান্দ্রিয়া থেকে প্রাপ্ত প্লেটোর দর্শনের নবরূপও আরবদের প্রভাবান্বিত করেছিল। গ্রীক দর্শনের জড়বাদ আরবদের কাছে পৌঁছেছিল ও যুক্তিবাদের মাধ্যমে প্রকাশলাভ করেছিল। যুক্তিবাদীরা যুক্তির ভাষায় ধর্মনীতির ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছিল, আর জড়বাদীরা ধর্মকে একেবারে নামঞ্জুর করে দিয়েছিল। এই কথাটা তবু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে বোগ্‌দাদে এই সকল বিরোধী অনুমান নিয়ে অবধি আলোচনা অবাধে চলতে দেওয়া হত। ধর্মমত ও যুক্তির এই বাদানুবাদ ও সংঘর্ষ সমগ্র আরব জগতে এবং স্পেনেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ঈশ্বরের প্রকৃতি নিয়েও আলোচনা চালান হয় এবং বলা হয় যে ঈশ্বরের সেসব কোনো গুণ থাকতে পারে না যা সাধারণত তাঁতে আরোপ করা হয়ে থাকে। এ গুণগুলি মানবীয়। ঈশ্বর দয়ালু কি সৎ, একথা বলা তাঁর দাড়ি আছে বলার মতই মূর্খতার পরিচায়ক।

যুক্তিবাদ থেকে আসে অজ্ঞেয়তাবাদ, আর তার পরে সংশয়বাদ। বোগ্‌দাদ যত পড়তে থাকে এবং তুর্কি-শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে এই যুক্তিপথের অনুসন্ধান স্পৃহা তত কমতে থাকে। কিন্তু আরব-স্পেনে এটা থামেনি। স্পেনে একজন আরব দার্শনিক একেবারে ধর্মহীনতায় পৌঁছেছিলেন। এঁর নাম ইব্‌ন্‌ রুশ্‌দ্‌ (আবেরোজ্‌)—ইনি দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। শোনা যায়, তিনি তাঁর সময়ের বিভিন্ন ধর্মসম্বন্ধে বলেছিলেন যে সেগুলি শিশু ও নির্বোধ ব্যক্তিদের জন্য, সেগুলি কার্যোপযোগী নয়। তিনি যে একথা বলেছিলেন তা সন্দেহজনক, কিন্তু কিংবদন্তী থেকে জানা যায় তিনি কি প্রকারের মানুষ ছিলেন। তাঁর মতের জন্য তিনি বহু দুঃখ পেয়ে গেছেন। অনেক বিষয়ে তাঁর কথা উল্লেখযোগ্য। স্ত্রীলোকদের সাধারণের কাজে নামবার সুযোগ দেবার জন্য তিনি লিখে গেছেন, এবং এই মত প্রকাশ করে গেছেন যে সুযোগ পেলে তারা নিজেদের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করতে পারবে। এ তাঁরই কথা যে যেসকল রুগ্ন ব্যক্তির আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা নেই তাদের এবং তাদেরই মত অন্য লোকদের সংসার থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত, কারণ তারা সমাজের ভারস্বরূপ। ইউরোপে যে যে দেশে তখন জ্ঞানচর্চা হত স্পেন তাদের সকলগুলি অপেক্ষা অনেক অধিক অগ্রসর ছিল। আরব ও ইহুদী বিদ্বানেরা কর্ডোবা থেকে এসে প্যারিস ও অন্যান্য স্থানে বিশেষ সম্মানলাভ করতেন। যতদূর জানা যায় এইসকল আরবেরা অন্য কোনো ইউরোপীয়দের সম্বন্ধে উচ্চমত পোষণ করত না। টোলিডোর সৈয়দ নামে একজন আরব গ্রন্থকার পিরিণীজ পর্বতের উত্তরের ইউরোপীয়দের এইরূপ বিবরণ দিয়েছেন : 'তাদের প্রকৃতি ঠাণ্ডা ধরনের, তারা কখনও পূর্ণতা লাভ করে না। তাদের দেহ বিশাল এবং বর্ণ শ্বেত, কিন্তু তাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও গভীরতা নেই।'

আরব সংস্কৃতি ও সভ্যতা যে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় সুন্দররূপে প্রকাশ পেয়েছিল তাদের অনুপ্রাণনালাভের দুটি প্রধান উৎস ছিল আরব ও ইরানীয়। এই দুটি নিবিড়ভাবে মিলিত হয়ে চিন্তার সবলতা ও উচ্চশ্রেণীর লোকদের মধ্যে উন্নততর জীবনধারণপদ্ধতি এনেছিল। আরবেরা এনেছিল বল ও অনুসন্ধানস্পৃহা; ইরানীরা এনেছিল জীবনের মাধুর্য, শিল্প ও বিলাসিতা। বোগ্‌দাদ তুর্কিদের প্রভুত্বাধীনে যত দুর্বল হতে লাগল তার যুক্তিবাদ ও অনুসন্ধানস্পৃহাও তত হ্রাস পেতে লাগল। তারপর চেঙ্গিজ খাঁ এবং মোঙ্গোলেরা এগুলিকে নিঃশেষ করে দিল। একশো বছর পরে মধ্য-এশিয়া আবার একবার জেগে উঠেছিল এবং সমরখন্দ্‌ ও হীরাট্‌ চিত্রবিদ্যা ও স্থাপত্যের কেন্দ্র হয়েছিল, আর এই প্রকারে আরব-পারস্য সভ্যতার পুরাতন ঐতিহ্য পুনরুদিত হয়েছিল। কিন্তু আরবদের যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্তি আর ফিরে আসেনি। ইসলাম একটি কঠোর ধর্মমতে পরিণত হয়ে মন জয় করা অপেক্ষা সামরিক বিজয়ের অধিক উপযোগী হয়েছিল। এশিয়ার এ-ধর্মের প্রধান প্রতিনিধি আর আরবেরা রইল না, তুর্ক* এবং মোঙ্গোল (পরে ভারতে এরা মুঘল নাম লাভ করে) এবং কতকটা আফগানেরা সেস্থান গ্রহণ করল। পশ্চিম এশিয়ায় মোঙ্গোলেরা মুসলিমধর্ম গ্রহণ করে; দূর পূর্বে ও মধ্যবর্তী প্রদেশে তাদের অনেকে বৌদ্ধ হয়।

৩ : ঘজ্‌নির মাহ্‌মুদ ও আফগান জাতি

অষ্টম শতাব্দীর শুরুতে, ৭১২ খৃস্টাব্দে, আরবেরা সিন্ধুপ্রদেশে পোঁছায় ও সেস্থান অধিকার করে। তারা আর অগ্রসর হয়নি। প্রায় অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই এ স্থানও আরবসাম্রাজ্য হতে স্খলিত হয়, একটি ক্ষুদ্র, স্বাধীন মুসলিম রাজ্যরূপে টিকে থাকে। প্রায় তিনশো বছর ভারতবর্ষের উপর আর কোনো আক্রমণ হয়নি। ১০০০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি আফগানিস্থানের অন্তর্গত ঘজ্‌নির সুলতান মাহ্‌মুদ্‌ ভারতবর্ষের উপর তার লুন্ঠন-আক্রমণ শুরু করে। এ ব্যক্তি ছিল তুর্ক, মধ্য এশিয়ায় এই সময়ে মাহ্‌মুদ বলশালী হয়ে উঠেছিল। অনেকবারই আক্রমণ ঘটে, আর প্রত্যেকবারই মাহ্‌মুদ্‌ অতিশয় রক্তপাত ও নৃশংস অত্যাচার করেছিল এবং প্রভূত ধনরত্ন লুন্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিল। খিভা-র আল্‌বেরুনি তারই সময়ের একজন বিদ্বান ব্যক্তি। ইনি লিখে গেছেন, 'হিন্দুদের যেন ধূলিকণার মত, পুরাতন কালের জনশ্রুতির মত, চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাদের বিক্ষিপ্ত অবশেষ মুসলমানদের উপর গভীর ঘৃণা পোষণ করে।' এই কথঞ্চিৎ কবিত্বময় কথাগুলি হতে মাহ্‌মুদের কৃত বিধ্বংসের কিছু

* আমি অনেকবার 'তুর্ক' ও 'তুর্কি' শব্দ ব্যবহার করেছি। এতে একটু গোলমালের সৃষ্টি হতে পারে, কারণ অটোমান বা ওস্‌মানলি তুর্কিদের বংশোদ্ভব তুর্কি দেশের অধিবাসীরা তুর্ক নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অন্য তুর্কও আছে—যেমন সেলজুক্‌, মধ্য-এশিয়া, চীনা তুর্কিস্থান প্রভৃতি অংশের সকল তুরানী জাতিকে তুর্ক অথবা তুর্কি বলা যায়।

ধারণা করা যায়, তবু একথা মনে রাখতে হবে যে এই ব্যক্তির অত্যাচার কেবল উত্তর-ভারতের একটা অংশে, বিশেষভাবে তাদের আগমনের পথে ঘটেছিল। মধ্য, পূর্ব ও দক্ষিণ-ভারতের সমস্তটাই তার আক্রমণ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিল।

দক্ষিণ-ভারত এই সময়ে প্রতাপান্বিত চোলসাম্রাজ্যের অধীনে ছিল; এই সাম্রাজ্যের প্রভুত্ব সমুদ্রপথের উপরেও বিস্তৃত ছিল এবং যবদ্বীপে শ্রীবিজয় ও সুমাত্রা পর্যন্ত গিয়েছিল। তখন পূর্ব সমুদ্রে ভারতীয় উপনিবেশগুলি ছিল সবল ও উন্নতিশীল। সমুদ্রের উপর প্রতিপত্তি তাদের ও দক্ষিণ-ভারতের হাতে ছিল। এতে অবশ্য উত্তর-ভারতের উপর স্থলপথের আক্রমণ বন্ধ হয়নি।

মাহ্‌মুদ পাঞ্জাব ও সিন্ধু জয় করে নিজের রাজ্যের অন্তর্গত করে নেয়। প্রত্যেক লুন্ঠন-আক্রমণের পর মাহ্‌মুদ ঘজ্‌নিতে ফিরে যেত। কাশ্মীরকে কিন্তু মাহ্‌মুদ জয় করতে পারেনি—এই পার্বত্য প্রদেশ তার সকল আক্রমণ রোধ করতে পেরেছিল। কাথিয়াওয়াড়ে সোমনাথ আক্রমণ করার পর ফেরবার পথে রাজপুতানার মরুপ্রদেশে তাকে বিষম পরাজয় স্বীকার করতে হয়।* এই হল তার শেষ আক্রমণ, এর পর আর আসেনি।

মাহ্‌মুদ ছিল যোদ্ধা, ধার্মিক ব্যক্তি ছিল না, কিন্তু অন্যান্য বিজয়ী ব্যক্তিদের ন্যায় নিজের কাজে ধর্মের নামের সাহায্য ও সুযোগ নিয়েছিল। ভারতবর্ষ ছিল তার কাছে এমন একটা দেশ যেখান থেকে সে যদৃচ্ছা ধনরত্ন ও বস্তুসম্ভার স্বদেশে নিয়ে যেতে পারবে। তার একজন সেনাপতির নাম ছিল তিলক। তিলক ভারতীয় ও হিন্দু ছিল এবং মাহ্‌মুদ-এরই অধীনে ভারতে একটা বাহিনী গড়ে তুলেছিল। এই বাহিনী সে মধ্য এশিয়ায় আপন সহধর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল। মাহ্‌মুদের আকাঙ্ক্ষা

* তারিখ-ই-সোরথ একখানি পারস্যভাষার ইতিহাস গ্রন্থ। ১৮৮২ খৃস্টাব্দে বোম্বাই-এর রণছোড়জি অমরজি কর্তৃক এই পুস্তক অনূদিত হয়, এবং এরই ১১২ পৃষ্ঠায় একটি কৌতূহলকর বিবরণ আছে : 'শাহ্ মাহ্‌মুদ আতঙ্কিত হয়ে বেগে পলায়ন করে নিজের জীবনরক্ষা করে, কিন্তু তার বহু অনুসঙ্গী স্ত্রী-পুরুষ বন্দী হয়।......তুর্ক, আফগান ও মুঘল বন্দিনীদের মধ্যে কুমারীদের ভারতীয় সৈনিকেরা পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিল।... ...বাকিগুলির শরীরাভ্যন্তর বিরেচক পদার্থের সাহায্যে নির্মল করে নিয়ে অনুরূপ পদস্থ লোকের সঙ্গে বিবাহিত করা হয়েছিল।' 'নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোক নীচ জাতীয় পুরুষের সঙ্গে বিবাহিত হয়। উচ্চশ্রেণীর বন্দীদের শ্মশ্রু ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়, এবং তাদের শেখাবৎ ও ওআধেল গোষ্ঠীর রাজপুতরূপে গ্রহণ করা হয়। নীচ জাতীয় বন্দীদের কোলি, খন্ত, বাব্রিয়া ও মের জাতির অন্তর্গত করা হয়।' আমি নিজে তারিখ-ই-সোরথ পড়িনি এবং এ গ্রন্থ কতটা নির্ভরযোগ্য তাও জানি না। এই উদ্ধৃতিটি কে. এম্. মুন্সীর 'দি গ্লোরি দ্যাট ওঅস্ গুর্জরদেশ', ৩য় খণ্ড, ১৪০ পৃঃ হতে গ্রহণ করা হয়েছে। যেভাবে বিদেশীয়রা বিভিন্ন রাজপুত গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এমনকি বিবাহও ঘটেছে, তা লক্ষণীয়। নির্মল করার পদ্ধতিটি অভিনব।

ছিল যেন তার আপন নগর ঘজ্‌নি মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার বড় বড় নগরগুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। এইজন্য ভারতবর্ষ হতে অনেক কারুশিল্পী ও স্থপতি বলপূর্বক নিয়ে গিয়েছিল। স্থাপত্যে তার খুব আগ্রহ ছিল। দিল্লীর নিকটবর্তী মথুরার অট্টালিকাগুলি দেখে লিখেছিল, 'এখানে হাজার অট্টালিকা আছে যা বিশ্বাসীর বিশ্বাস অপেক্ষাও দৃঢ়। এই নগর বর্তমান অবস্থায় আসতে বহু বহু লক্ষ দীনার ব্যয় হয়েছে, আর এরূপ একটি নগর দুশো বছরের কমে প্রস্তুত হতে পারে না।'

যুদ্ধের অবকাশে মাহ্‌মুদ নিজের দেশে সংস্কৃতি বিষয়ের কাজকর্মেও উৎসাহ দিত। কতকগুলি উচ্চশ্রেণীর বিদগ্ধ ব্যক্তিকে সে একত্র সংগ্রহ করেছিল। শাহনামার লেখক, বিখ্যাত পারস্য কবি ফিরদৌসি ছিলেন এদের মধ্যে অন্যতম, কিন্তু পরে মাহ্‌মুদের সঙ্গে তাঁর মনান্তর ঘটে। সমসাময়িক বিদ্বান পর্যটক ছিলেন অ্যাল্‌বেরুনি। ইনি আপন পুস্তকে মধ্য এশিয়ায় অন্যান্য বিষয়ের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বিবরণ দিয়ে গেছেন। ইনি খিভা-র সন্নিকটে পারস্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন; ভারতবর্ষে এসে অনেক স্থানে পর্যটন করেছিলেন। তিনি যে দক্ষিণ-ভারতে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার কিছু নিজের চোখে দেখেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, কিন্তু দক্ষিণের চোলরাজ্যের জল সেচনের বিপুল ব্যবস্থার কথা লিখে গেছেন। তিনি কাশ্মীরে সংস্কৃত শিক্ষা করেন এবং ভারতের দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন, আর গ্রীক দর্শন অধ্যয়ন করার জন্য পূর্বেই গ্রীকভাষা শিক্ষা করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থগুলি যে কেবল তথ্যের ভান্ডার তা নয়, আমরা সেগুলি থেকে জানতে পারি, যুদ্ধ, লুন্ঠন ও প্রভূত নরহত্যার অন্তরালে ধীরভাবে বিদ্যানুশীলন চলত, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের লোকেদের মধ্যে তিক্ততা এনে দিয়েছিল তবু এক দেশের লোক অন্য দেশের লোকদের বুঝতে চেষ্টা করত। অবশ্য রাগ-দ্বেষের জন্য বিচারশক্তি দুদিকেই ক্ষুণ্ণ হত এবং প্রত্যেকেই আপনজনকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করত। ভারতীয়দের সম্বন্ধে অ্যাল্‌বেরুনি বলেছেন যে তারা 'দাম্ভিক, বৃথা-গর্বিত, আত্মগোপনশীল এবং অনমনীয়.' আর তারা বিশ্বাস করে যে 'তাদের দেশের মত কোনো দেশ নেই, তাদের মত কোনো জাতি নেই, তাদের রাজার মত রাজা কোথাও নেই, তাদের বিজ্ঞানের মত বিজ্ঞানও কোথাও নেই।' সম্ভবত এই কথাগুলিতে আমাদের দেশের লোকেদের প্রকৃতি নির্ভুলভাবেই প্রকাশ পেয়েছে।

ভারতের ইতিহাসে মাহ্‌মুদের লুন্ঠন একটা বড় ঘটনা, যদিচ তাতে সমগ্রভাবে ভারতের কোনো রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন ঘটেনি, এবং দেশের অন্তরস্থল অক্ষুণ্ণই ছিল। এই লুন্ঠনগুলি হতে অবশ্য বুঝতে পারা গিয়েছিল যে উত্তর-ভারতের পতন ঘটেছে—দুর্বল হয়ে পড়েছে। অ্যালবেরুনির বিবরণে উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে রাজনৈতিক ক্ষয়ের কথা স্পষ্টরূপে পাওয়া যায়। উত্তর-পশ্চিম থেকে বার বার আক্রমণ ঘটায় ভারত বাহিরের প্রভাব সম্বন্ধে উন্মুক্ত না হলেও অনেক নূতন বিষয় তার মধ্যে প্রবেশলাভ করেছিল। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রবল হয়েছিল নিষ্ঠুর সামরিক বিজয়ের সঙ্গে

ইসলামের আগমন। এতদিন পর্যন্ত তিনশো বছরেরও অধিককাল ধরে ইসলাম ধর্ম-রূপে শান্তির সঙ্গে এসে কোনো বিরোধ না ঘটিয়ে ভারতের ধর্মগুলির মধ্যে আপন স্থান নিয়েছিল। এখন যে-নূতনরূপে এল এতে দেশবাসীর মধ্যে একটা মনস্তত্ত্বঘটিত প্রতিক্রিয়া ঘটল, তাদের মন তিক্ততায় ভরে গেল। একটা নূতন ধর্মে কোনো আপত্তি ছিল না, কিন্তু যা অত্যাচার উৎপীড়নের দ্বারা দেশের জীবনকে ওলটপালোট করে দেয় তাতে লোকের ঘোরতর আপত্তি ছিল।

মনে রাখা আবশ্যক যে হিন্দুধর্ম তার নানা রূপে ও ভাবে এদেশে প্রবল হলেও ভারতবর্ষ তখনও বহুধর্মের দেশ ছিল। জৈন ও বৌদ্ধধর্মদ্বয় দুর্বল হয়ে হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল, তবে এগুলি ছাড়াও দেশে ছিল খৃস্টধর্ম ও ইহুদীধর্ম। শেষোক্ত দুটি সম্ভবত খৃস্টের জন্মের একশো বছরের মধ্যেই এদেশে আসে ও স্থান লাভ করে। দক্ষিণ-ভারতে বহুসংখ্যক সীরিয় ও নেস্টোরীয় খৃস্টধর্মাবলম্বী বসবাস করত এবং অপর সকলের ন্যায় দেশের জনসংখ্যার অংশবিশেষ হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে ইহুদীরাও ছিল, আর ছিল জরথুস্ত্রের মতাবলম্বী ছোট্ট সম্প্রদায়টি—ইরান থেকে সপ্তম শতাব্দীতে এদেশে এসে এরা বাস আরম্ভ করেছিল। বহু মুসলমানেরাও বাস করছিল পশ্চিম উপকূলে ও উত্তর-পশ্চিমে।

মাহ্‌মুদ বিজেতৃরূপে এসেছিল, আর পাঞ্জাব হয়েছিল তার রাজ্যের একটি সীমান্ত প্রদেশ। যখন সে নিজে রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত হল তখন তার আগেকার পদ্ধতি একটু নরম করে এনে সে এ প্রদেশের লোকগুলিকে কতকটা নিজের দিকে টানবার চেষ্টা করেছিল। ভারতীয়দের উপর আর জোর চালাত না; হিন্দুদের সৈন্য ও শাসনবিভাগে উচ্চপদে গ্রহণ করেছিল। এই নূতন পদ্ধতির শুরুটাই কেবল মাহ্‌মুদের সময়ে লক্ষ্য করা যায়। এটা পরে আরও বৃদ্ধি পায়।

মাহ্‌মুদ ১০৩০ খৃস্টাব্দে প্রাণত্যাগ করে। এর পর একশো-ষাট বছরেরও অধিককাল ভারতবর্ষের উপর আর কোনো আক্রমণ হয়নি এবং তুর্কিরাজ্যও পাঞ্জাব ছাড়িয়ে বিস্তৃত হয়নি। তারপর একজন আফগান, সাহাব-উদ্-দীন ঘুরি, ঘজ্‌নি দখল করে এবং ঘজ্‌নি সাম্রাজ্যের অবসান ঘটায়। প্রথম সে লাহোরে এবং পরে দিল্লীতে হানা দেয়। কিন্তু দিল্লীর রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান তাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। সাহাব-উদ্-দীন আফগানিস্থানে ফিরে যায়, এবং পরের বছরে আর একটা সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরে আসে। এবার তার জয় হয় এবং ১১৯২ খৃস্টাব্দে সে দিল্লীর সিংহাসন লাভ করে।

পৃথ্বীরাজ জনপ্রিয় বীর, এখনও তাঁর নাম গানে ও কাহিনীতে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে, কারণ নির্ভীক প্রেমিকেরা এরূপ জনপ্রিয় হয়েই থাকে। কনৌজের রাজা জয়চন্দ্রের কন্যার পাণিপ্রার্থী হয়ে বহু রাজকুমার কনৌজ রাজসভায় উপস্থিত হয়েছিল; পৃথ্বী-রাজ এইসকল রাজকুমারদের উপেক্ষা করে তাঁর প্রতি অনুরক্তা প্রেমপাত্রী কনৌজ রাজকুমারীকে নিয়ে আসেন। তিনি তাঁর এই বধূকে অল্পকালের জন্য জীবনসঙ্গিনী-রূপে পেয়েছিলেন। কনৌজের শক্তিমান রাজার সঙ্গে এই কারণে তাঁর বিরোধ ঘটল

এবং উভয় পক্ষের বহু বীর হত হল। দিল্লীর ও মধ্য-ভারতের বীরত্ব অন্তর্বিপ্লবে লিপ্ত হল এবং অনেক নরহত্যা ঘটল। এইরূপে একটি স্ত্রীলোকের প্রতি প্রেমের জন্য পৃথ্বীরাজ সিংহাসন ও প্রাণ উভয়ই হারালেন, আর বৃহৎ সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লী একজন বহিঃশত্রুর হস্তগত হল। তবু তাঁর প্রেমের কাহিনী এখনও গীত হয়, তাঁকে বীর আখ্যা দেওয়া হয়েছে; আর জয়চন্দ্রকে বলা হয় দেশদ্রোহী।

দিল্লী বিজিত হল, কিন্তু তাতে ভারতের অন্যান্য স্থানের স্বাধীনতা গেল না। চোলরা তখনও দক্ষিণে যথেষ্ট প্রবল ছিল, এবং আরও অনেক স্বাধীন রাজ্য ছিল। আফগান শক্তি দক্ষিণের অধিকাংশ অংশে বিস্তৃত হতে আরও দেড় শতাব্দী লেগেছিল। কিন্তু দিল্লীই ছিল নূতন বিধানের প্রধান কেন্দ্র, তার প্রতীকস্বরূপ।

৪ : ভারতীয়-আফগান : দক্ষিণ-ভারত : বিজয়নগর : বাবর : সামুদ্রিক শক্তি

ইংরাজ ও কয়েকজন ভারতীয় ঐতিহাসিক এদেশের ইতিহাসকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন -প্রাচীন বা হিন্দু যুগ, মুসলমান যুগ ও ইংরাজ যুগ। এই বিভাজন ঠিক হয়নি, আর এতে বুদ্ধির পরিচয়ও নেই। এতে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ভুল হয়, কারণ এরূপে দেখলে দেশবাসীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থা অপেক্ষা বাইরের পরিবর্তনই বেশি নজরে পড়ে। যাকে প্রাচীন যুগ বলা হয় তা বিশাল, ও নানা পরিবর্তন, উত্থান ও পতন এবং পুনরুত্থানের যুগ। মুসলমান বা মধ্য যুগ আর এক পরিবর্তনের সময়: তার গুরুত্ব আছে, কিন্তু যা কিছু ঘটেছে তা উপরিভাগের ব্যাপার, তা হতে ভারতীয় জীবনের মূলগত ধারায় বিশেষ কোনো পার্থক্য আসেনি। যে সকল আক্রমণকারীরা উত্তর-পশ্চিম থেকে এসেছিল, প্রাচীন-কালের অগ্রাগতদের মতই তারা ভারতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়ে তার অংশবিশেষে দাঁড়িয়ে-ছিল। তাদের বংশ ভারতীয় হয়ে গিয়েছিল, আর জাতিগতভাবেও মিলন ঘটেছিল বিবাহের মধ্যে দিয়ে। দু একটা ব্যতিক্রম বাদ দিলে দেখা যায় যে জাতির রাজনীতিতে যাতে হস্তক্ষেপ করা না হয় তার জন্য প্রায় সর্বত্র চেষ্টা করা হয়েছিল। তারা ভারত-বর্ষকে তাদের মাতৃভূমি বলেই মনে করত, এবং আর কোনো দেশের প্রতি আকৃষ্ট ছিল না। ভারতবর্ষ স্বাধীনই ছিল।

ইংরাজদের আগমনে দেশে গুরুতর পরিবর্তন ঘটল, পুরাতন বিধিব্যবস্থা অনে-কাংশেই ভেঙে গেল। তারা পশ্চিম থেকে নিয়ে এল একেবারে অন্য প্রকারের মনোবেগ। ইউরোপে এই মনের অবস্থাটা ইংলন্ডের পুনরুত্থান, সংস্কার ও রাজনৈতিক বিপ্লবের সময় হতে ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হচ্ছিল, এবং শ্রমশিল্প-ঘটিত বিপ্লবের প্রথমদিকে রূপ-গ্রহণ করছিল। আমেরিকার ও ফ্রান্সের বিপ্লবে এ-ভাব আরও প্রবল হল। ইংরাজেরা ভারতে বিদেশী, বাইরের লোক—যাকে বলা যায় খাপছাড়া তাই হয়ে রইল, এবং অন্য কিছু হবার চেষ্টাও করল না। সব থেকে বড় পরিবর্তন এল, ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম বাইরে থেকে চলতে লাগল তার শাসন এবং তার অর্থনীতির কেন্দ্র হল

দ্রদেশে। তারা ভারতকে করে তুলল বর্তমানকালের একটা উপনিবেশ; তার দীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম ভারত হল পরাধীন।

ঘজ্নির মাহ্মুদের ভারত-আক্রমণ অবশ্য বিদেশী তুর্কের আক্রমণই ছিল, এবং এর ফলে কিছুকালের জন্য পাঞ্জাব ভারত হতে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যে আফগানরা এসেছিল তারা ছিল অন্য প্রকারের। তারা আর্য-ভারতীয় জাতি—ভারতবাসীর সঙ্গে তাদের নিকট সম্বন্ধই ছিল। বাস্তবিক, দীর্ঘকাল ধরে আফগানিস্থান অপরিহার্যরূপে ভারতের অংশবিশেষ হয়েছিল। তাদের ভাষা পাস্তো মূলে সংস্কৃত হতে উৎপন্ন। ভারতে ও তার বাইরে এমন স্থান কমই আছে যেখানে এত পুরাতন স্মৃতিসৌধ, ভারতীয় সংস্কৃতির—বিশেষত বৌদ্ধযুগের, এত চিহ্ন দেখা যায়, যেমন মেলে আফগানিস্থানে। নির্ভুলভাবে বলতে গেলে, আফগানদের ভারতীয়-আফগান বলা উচিত। তারা অনেক বিষয়ে ভারতের সমতলভূমির অধিবাসী-দের হতে কিছু পৃথক ছিল, যেমন কাশ্মীরের পার্বত্য উপত্যকার লোকেরা নিচের অধিকতর উষ্ণ সমতলভূমির লোকেদের হতে অন্যরূপ হয়ে থাকে। কিন্তু এই পার্থক্য সত্ত্বেও কাশ্মীর বহুকাল ধরে ভারতীয় বিদ্যা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র ছিল। আফগানেরা এ ছাড়া অধিকতর সংস্কৃতিসম্পন্ন আরব ও পারস্যবাসী অপেক্ষা ভিন্ন প্রকারের লোক ছিল। তাদের পার্বত্য বাসস্থানের মতই তারা ছিল অটল ও ভয়ংকর, ছিল ধর্মমতে দৃঢ়, ছিল যোদ্ধা; মনোবৃত্তির অনুশীলনে তাদের আগ্রহ ছিল না। প্রথমে তারা বিদ্রোহী-দের উপর বিজেতৃদের ন্যায় নির্দয় ও কঠোর ব্যবহার করেছিল।

শীঘ্রই কিন্তু তারা অনেকটা নরম হয়ে এল। তখন ভারতবর্ষ হল তাদের দেশ, দিল্লী তাদের রাজধানী। মাহ্মুদ রাজধানী রেখেছিলেন ঘজ্নিতে, এরা এদেশকেই নিজের দেশ বলে গ্রহণ করল। তারা এসেছিল আফগানিস্থান থেকে, এখন সেদেশ তাদের রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ হয়ে গেল। তাদের ভারতীয় হওয়াও হল বেশ তাড়া-তাড়ি, অনেকে এদেশের স্ত্রীলোক বিবাহ করে সংসারী হল। তাদের একজন শাসক, আলাউদ্দীন খিলিজি, এবং তাঁর পুত্র সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলা বিবাহ করেছিলেন। পরবর্তী অনেক শাসনকর্তা তুর্কি ছিলেন, যেমন কুতুব্-উদ্-দীন আইবাক্, সুলতানা রেজিয়া এবং ইল্তুমিস; কিন্তু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ও সৈন্যবিভাগ ছিল আফগান। দিল্লী রাজধানীরূপে উন্নতিলাভ করেছিল। ইব্ন্ বাতুতা ছিলেন মরোক্কোর বিখ্যাত আরব পর্যটক; ইনি কাইরো ও কন্স্টাণ্টিনোপ্ল্ হতে চীন পর্যন্ত বহু দেশে পর্যটন ও বহু নগর দেখার পর দিল্লীর বিবরণ একটু অতিরঞ্জন করেই বলেছেন, 'জগতের বৃহত্তম নগরগুলির একটি।'

ধীরে ধীরে দিল্লীর সুলতানের রাজ্য দক্ষিণদিকে বিস্তৃত হতে আরম্ভ করল। চোল-রাজ্য তখন পতনোন্মুখ, কিন্তু তার স্থানে আর একটি সমুদ্র-পথচারী-শক্তি উদ্ভূত হয়েছিল। এ হল পাণ্ড্যরাজ্য। মাদুরায় ছিল এর রাজধানী; আর পূর্ব উপকূলে কেয়ালে ছিল এর বন্দর। ছোট রাজ্য হলেও পান্ড্য বাণিজ্যের একটি বৃহৎ কেন্দ্র ছিল। মার্কো পোলো চীন হতে আগমনের পথে, ১২৮৮ ও ১২৯৩ খৃস্টাব্দে, দুবার এর

বন্দর দেখে বলেছেন 'এ স্থানটি একটি সুবৃহৎ সমৃদ্ধ নগর।' এখানে আরব ও চীন থেকে আগত অনেক জাহাজ থাকত। তিনি অতি সূক্ষ্ম মসলিন কাপড়ের বিষয়েও উল্লেখ করেছেন, 'মাকড়সার জালের তন্তুর মত।' পূর্ব উপকূলে এ কাপড় প্রস্তুত হত। মার্কো পোলো আরও একটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত কথা বলে গেছেন। সমুদ্র-পথে আরব ও পারস্য থেকে বহুসংখ্যক অশ্ব দক্ষিণ-ভারতে আমদানি হত। দক্ষিণ-ভারতের আবহাওয়া অশ্বপালনের উপযোগী ছিল না, কিন্তু অন্য ব্যবহার ছাড়াও যুদ্ধবিগ্রহের কাজে অশ্বের প্রয়োজন ছিল। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া অশ্বপালনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল স্থান থাকায় কতকটা সেই কারণে মধ্য এশিয়ার লোকেরা সামরিক ব্যাপারে এত উৎকর্ষ দেখাতে পেরেছিল। চেঙ্গিজ খাঁর মোঙ্গোলেরা আশ্চর্য অশ্বারোহী ছিল, আর তারা অশ্ব ভালবাসত। তুর্কিরাও উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী ছিল, আর আরবদের অশ্বের প্রতি প্রীতি সর্বজনবিদিত। উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে কয়েকটি ভাল অশ্ব-পালনের উপযোগী স্থান আছে, যেমন কাথিয়াওয়াড়ে, রাজপুতেরাও অশ্বপ্রিয়। অনেক ছোট-ছোট যুদ্ধ এক-একটা বিখ্যাত অশ্বের জন্য ঘটেছে। গল্পে আছে যে একজন দিল্লীর সুলতান একজন রাজপুত সামন্তের অশ্বের প্রশংসা করে সেটি চেয়েছিলেন। হরপতি লোদি রাজাকে উত্তর দিয়েছিলেন, 'কোনো রাজপুতের কাছে তিনটি জিনিস কখনও চাওয়া উচিত নয়—তার অশ্ব, তার পত্নী, কিংবা তার তরবারি।' এবং এই কথা বলে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গিয়েছিলেন। এর পর এই নিয়ে অনেক বিরোধ ঘটে।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষাশেষি তুর্কি কি তুর্কি-মোঙ্গোল তৈমুর উত্তর হতে নেমে আসে ও দিল্লীর সুলতানরাজ্য ধ্বংস করে। সে কয়েক মাস মাত্র ভারতে ছিল—কেবল দিল্লীতে এসেই ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু এই অল্পদিনেই তার পথের দুই ধারের সমস্ত নাশ করে, যাদের হত্যা করেছিল তাদের মুণ্ড দিয়ে পিরামিড্ তৈরি করে গিয়েছিল। দিল্লীকে মৃতের নগর করে দিয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে সে বেশিদূর যায়নি, কেবল পাঞ্জাবের ও দিল্লীর কোনো কোনো অংশকে তার অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল।

এই মহানিদ্রা হতে জাগতে দিল্লীর বহুবছর লেগেছিল, আর যখন জাগল তখন দেখল আর দিল্লী সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের রাজধানী নেই। তৈমুরের আক্রমণে সে সাম্রাজ্য ভেঙে গেছে, এবং দক্ষিণে কয়েকটি রাজ্য গড়ে উঠেছে। এর অনেক আগে, চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, দুটি বৃহৎ রাজ্য দেখা দেয়—গুলবার্গা অর্থাৎ বাহমনি রাজ্য* আর বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য। গুলবার্গা তারপর পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ত হয়, তার একটি হল আমেদনগর। আহমদ নিজাম শাহ ১৪৯০ খৃস্টাব্দে আমেদনগর প্রতিষ্ঠা

* বাহমনি রাজ্যের নাম ও তার উদ্ভবের কথা উল্লেখযোগ্য। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একজন আফগান মুসলমান, কিন্তু অল্প বয়সে তাঁর পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকর্তা ছিলেন গঙ্গু ব্রাহ্মণ নামে একজন হিন্দু। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তিনি এই ব্রাহ্মণের নাম গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁর বংশ ব্রাহ্মণ শব্দ হতে বাহমনি নাম পেয়েছিল।

করেন। তিনি ছিলেন বাহমনি রাজাদের এক উজির, নিজাম-উল্-মুল্‌ক্ ভৈরির পুত্র। নিজাম-উল্-মুল্‌ক্ নিজে ছিলেন একজন ভৈরু নামক ব্রাহ্মণ হিসাবনবীশের পুত্র। ভৈরু হতে এসেছে ভৈরি। সুতরাং আমেদনগর রাজবংশ এই দেশীয়। আমেদ-নগরের বীরাঙ্গনা চাঁদ বিবির দেহে ছিল মিশ্রিত রক্ত। দক্ষিণের সমস্ত মুসলমান রাজাই ছিল দেশীয় ও ভারতীয় ভাবাপন্ন।

তৈমুর দিল্লী বিধ্বংস করার পর উত্তর-ভারত দুর্বল ও বহুধাবিভক্ত হয়ে যায়। দক্ষিণ-ভারতের অবস্থা ছিল অপেক্ষাকৃত ভাল, আর সেখানকার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শক্তিশালী রাজ্য ছিল বিজয়নগর। এই রাজ্য ও শহরে উত্তর-ভারত হতে বহু হিন্দু আশ্রয়প্রার্থী এসেছিল। তখনকার দিনের বিবরণ হতে জানা যায় যে নগরটি সমৃদ্ধ ও খুব সুন্দর ছিল। মধ্য এশিয়ার আব্দুর-রাজ্জাক্ লিখে গেছেন, 'নগরটি এরূপ যে সমগ্র পৃথিবীতে এর তুল্য আর একটি স্থান দেখা যায় না, এমন আর কোনো নগরের কথা শোনাও যায় না।' বাজারের জন্য আচ্ছাদনবিশিষ্ট পথ ও সুন্দর সুন্দর মণ্ড ছিল, আর এই সমস্তের ঊর্ধ্বে ছিল রাজার প্রাসাদ, 'ক্ষোদিত এবং মসৃণ ও সমানভাবে সজ্জিত প্রস্তরের প্রণালী-পথে বহু ক্ষুদ্রকায়া নদী প্রবাহিতা ছিল প্রাসাদের চারদিকে।' সমস্ত নগরটি উপবনে পূর্ণ ছিল এবং ইতালি হতে আগত নিকোলো কন্‌টির বিবরণ অনুসারে জানা যায় যে এই নগরের পরিধি ছিল ষাট মাইল। পায়েজ নামে একজন পোর্টুগীজ ১৫২২ খৃস্টাব্দে 'রিনেসান্স' যুগের ইতালির অনেক নগর দেখার পর এদেশে আসেন। তিনি বিজয়নগর সম্বন্ধে বলেছেন যে এ নগর 'রোমের মতই বড় এবং দেখতে সুন্দর' এবং বহু সংখ্যক হ্রদ, জলনালী এবং ফলের বাগানের জন্য রমণীয় ও বিস্ময়কর। 'এ নগর সকল প্রকার আয়োজনে পৃথিবীর মধ্যে সর্বা-পেক্ষা সমৃদ্ধ।' প্রাসাদের কক্ষগুলি গজদন্তেই প্রস্তুত বলা যেতে পারে। উপরে তাকালে দেখা যেত হস্তীদন্তে ক্ষোদিত গোলাপ ও পদ্ম ফুল—'এই সমস্ত এতই মূল্যবান ও মনোহর যে অন্যত্র কিছু এরূপ পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ।' এখানকার রাজা কৃষ্ণদেব রায় সম্বন্ধে পায়েজ লিখেছেন, 'একজন রাজা যতদূর ভাল হতে পারেন তিনি তাই, সকলে তাঁকে ভয় করে, কিন্তু তাঁর স্বভাব স্ফূর্তিপূর্ণ ও প্রফুল্ল। তিনি বিদেশীদের সম্মান দেখাতে ভালবাসেন, তাদের সদয়ভাবে গ্রহণ করেন, আর তারা যে অবস্থারই লোক হোক না তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন।'

বিজয়নগর যখন সুখসমৃদ্ধি উপভোগ করছে, দিল্লীর ছোট সুলতান বংশকে তখন আর এক শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হল। উত্তরের পর্বত হতে আর এক আক্রমণকারী দিল্লীর সন্নিকটে পাণিপথ সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হল, এবং ১৫২৬ খৃস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করল। এই পাণিপথে কতবার ভারতের অদৃষ্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে। এই আক্রমণকারী আর কেউ নয়, বাবর, তুর্কি-মোঙ্গোল, মধ্য এশিয়ার তৈমুরের বংশের এক রাজপুত্র, ভারতে মুঘলসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

বাবর যে কৃতকার্য হয়েছিলেন তা সম্ভবত কেবল দিল্লীর সুলতানের রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল বলে নয়, বাবরের এরূপ এক প্রকার কামান ছিল যা আগে কখনও

ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হয়নি। এখন থেকে মনে হয় ভারতবর্ষ যুদ্ধবিজ্ঞানে পিছিয়ে পড়তে লাগল। বস্তুত আসল কথাটা হল এ-বিষয়ে সমগ্র এশিয়াখণ্ড কোনো উন্নতিই করেনি, কিন্তু ইউরোপ অগ্রসর হয়ে চলেছিল। বিশাল মুঘলসাম্রাজ্য দুশো বছর ধরে ভারতে শক্তিমান ছিল, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী হতে আর ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারল না। কিন্তু সমুদ্রপথের উপর প্রভুত্ব ব্যতীত ইউরোপীয় শক্তির ভারতে আসা সম্ভব ছিল না। এই কালে সব থেকে বড় পরিবর্তন যা ঘটেছিল তা হল জলপথে ইউরোপীয় শক্তির ক্রমোন্নতি। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দক্ষিণের চোল-সাম্রাজ্যের পতনের পর সমুদ্রপথে ভারতের শক্তি দ্রুত লোপ পেতে শুরু করে। ছোট পাণ্ডারাজ্য সাগর-সংশ্লিষ্ট হলেও যথেষ্ট পরিমাণে সবল ছিল না। ভারতীয় উপ-নিবেশগুলির ভারত মহাসমুদ্রের উপর প্রভাব পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। তারপর আরবেরা তাদের শক্তি হরণ করল, আর এর পরেই এল পোর্তুগীজেরা।

৫ : মিশ্র-সংস্কৃতির উন্নতি : পর্দাপ্রথা : কবীর : নানক : খুসরু

এই সমস্ত বিবরণ হতে দেখা যায় যে 'ভারতে মুসলমান আক্রমণ' কিংবা ভারতের ইতি-হাসের কোনো অংশকে 'মুসলমান যুগ' বলা নিতান্তই ভুল, যেমন ইংরাজদের আগ-মনকে 'খৃস্টীয় আক্রমণ' এবং ইংরাজ যুগকে 'খৃস্টীয় যুগ' বলা ভুল হত। ইসলাম ভারতবর্ষকে আক্রমণ করেনি, আক্রমণের অনেক আগেই এসেছিল। তুর্কি আক্রমণ (মাহমুদের) হয়েছিল, আফগান আক্রমণ এবং তুর্কি-মোঙ্গোল বা মুঘল আক্রমণও ঘটেছিল; আর এই তিনটির মধ্যে শেষের দুটি ছিল গুরুতর। আফগানদের সীমান্তবর্তী ভারতীয় দলে ফেলা যায়, বিদেশী তারা ছিল না। তাদের রাজত্বকালকে আফগান-ভারতীয় যুগ বলা চলে। মুঘলেরা একেবারেই বিদেশী, ভারতের অজানা, তবু তারা ভারতীয় জীবনের সঙ্গে অতি দ্রুত যুক্ত হয়েছিল এবং এই যোগাযোগের ফলে ভারতীয়-মুঘল যুগ আরম্ভ হয়।

হয়তো ইচ্ছা করেই, অথবা অবস্থাগতিকে, কিংবা উভয় কারণে, আফগান রাজারা এবং তাদের অনুসঙ্গীরা ভারতীয়দের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। তাদের বংশগুলি সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় হয়ে গিয়েছিল, এ দেশেই তারা স্থির হয়ে একেই স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছিল, আর অন্য সকল দেশকে বিদেশ বলে মনে করত। রাজনৈতিক বিরোধ সত্ত্বেও তাদের ভারতীয়ই মনে করা হত, আর রাজপুত রাজন্যরাও তাদের প্রভুত্ব স্বীকার করত। কিন্তু আরও অনেক রাজপুত ছিল যারা এ-নম্রতা স্বীকার করত না, এবং সেইজন্য ভীষণ যুদ্ধাদি ঘটত। দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহের নাম সুপরিচিত। তাঁর মাতা ছিলেন হিন্দু। ঘিয়াসুদ্দিন তুঘলকের মাতাও হিন্দু ছিলেন। আফগান, তুর্কি ও হিন্দু সম্ভ্রান্ত বংশের মধ্যে বিবাহ যে প্রায়ই হত তা নয়, কিন্তু হত। দক্ষিণে গুলবাগা'র একজন মুসলমান নরপতি বিজয়নগরের একটি হিন্দু রাজ-কন্যাকে বিবাহ করেছিল। এ-বিবাহে খুব ধুমধাম জাঁকজমক হয়েছিল।

জানা যায়, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার মুসলমান দেশগুলিতে ভারতীয়দের সুনাম ছিল। একাদশ শতাব্দীর মত এত আগেও, অর্থাৎ আফগানদের দ্বারা ভারত-বিজয়ের পূর্বে, ইদ্রিসি নামে একজন মুসলমান ভৌগোলিক লিখেছিলেন, 'ভারতীয়েরা স্বভাবত ন্যায়নিষ্ঠ; তারা কাজে কখনও অন্যায়রূপে ব্যবহার করে না। তাদের বিশ্বস্ততা, সততা ও নিষ্ঠার কথা সুপরিজ্ঞাত। এই সকল গুণের জন্য তাদের প্রসিদ্ধি এত অধিক যে সকল দিক হতে লোকে সেখানে ভিড় করে আসে।'*

একটি সুযোগ্য শাসনব্যবস্থা এইকালে গড়ে ওঠে, এবং বিশেষভাবে সামরিক কারণে যাতায়াতের সুবিধাও বৃদ্ধি পায়। শাসন এখন পূর্বাপেক্ষা অধিকতর কেন্দ্রীভূত হয়, যদিচ স্থানীয় রীতিনীতিতে হাত দেওয়া হত না। শের শাহ মুঘল আমলের প্রথম দিকে কিছুকাল একটা ফাঁকে রাজত্ব করেন। ইনি আফগান রাজাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। তিনি রাজস্ব ব্যবস্থা আরম্ভ করেন, আকবর পরে তা ব্যাপকভাবে ব্যবহারে আনেন। আকবরের বিখ্যাত রাজস্ব-সচিব টোডরমলকে শের শাহ-ই প্রথমে নিযুক্ত করেছিলেন। আফগান শাসকেরা দিন-দিন বেশি-বেশি করে বুদ্ধিমান হিন্দুদের কাজে লাগাচ্ছিলেন।

ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্মের উপর আফগানদের ভারত বিজয়ের ফল দুদিকে হয়েছিল —একটা দিক ঠিক আর একটার উল্টো। প্রথম প্রতিক্রিয়া হল আফগান শাসনের অন্তর্গত স্থান হতে দক্ষিণ দেশে বহু লোকের পলায়ন। যারা থেকে গেল তারা সামাজিক ব্যবস্থায় কঠোর হল, অপরকে বাইরে ঠেকিয়ে রাখল, নিজেরা যেন আপন খোলায় প্রবেশ করল, এবং জাতিভেদের বিধিকে কঠিনতর করে বিদেশী চালচলন ও প্রভাব থেকে নিজেদের রক্ষা করবার জন্য চেষ্টাবান হল। অন্যদিকে কতকটা অজ্ঞাতে, চিন্তায় এবং ব্যবহারে বিদেশী ধারার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াও চলতে লাগল। একটা সংশ্লেষণও হয়ে দাঁড়াল : নূতন ধরনের স্থাপত্য দেখা দিল : আহার্য ও পোশাকে পরিবর্তন এল, জীবনও অনেকভাবে বদলে গেল। এই সংশ্লেষণ সঙ্গীতে স্পষ্টভাবে লক্ষিত হল—তা পুরাতন ভারতীয় মার্গরূপ অনুসরণ করে নানা দিকে উন্নতিলাভ করল। পারস্য ভাষা হল রাজভাষা, আর এই কারণে অনেক পারস্য শব্দ সাধারণ ভাষায় প্রবেশলাভ করল। আবার এই সঙ্গেই চলিত ভাষাগুলিরও উন্নতিলাভ ঘটল।

অকল্যাণকর যা কিছু এল তার একটি হল পর্দাপ্রথা। এ যে কেন এল তা ঠিক করে জানা যায় না, কিন্তু মনে হয় পুরাতনের সঙ্গে নূতনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় কোনো রকমে এটা এসে পড়েছে। ভারতবর্ষে আগে অভিজাত বংশে স্ত্রী-পুরুষকে পৃথক পৃথক রাখার প্রথা কিছু পরিমাণে ছিল; অন্যদেশেও এটা ছিল, যেমন প্রাচীন গ্রীসে। এই প্রকারের প্রথা প্রাচীন ইরানে এবং কতকটা পশ্চিম এশিয়ায় ছিল, কিন্তু কোথাও স্ত্রীলোকদের অবরোধ রীতি কঠোরভাবে পালিত হত না। সম্ভবত, এত কঠোরতা বিজেন্টাইন বা কন্স্টান্টিনোপ্‌লের রাজকীয় পরিবারে প্রথম আরম্ভ হয়, কারণ

* এলিয়ট : 'হিস্ট্রি অফ্ ইন্ডিয়া' : ১ম খণ্ড, ৮৮ পৃঃ।

সেখানে স্ত্রীলোকদের মহলে প্রহরীর কাজে নপুংসকদের নিয়োগ করার রীতি ছিল। এর প্রভাব রাশিয়ায়ও পেঁছেছিল এবং সেখানে পিটার দি গ্রেটের সময় পর্যন্ত স্ত্রীলোকদের জন্য আলাদা থাকার কঠোর ব্যবস্থাই ছিল। তাতারদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি; একথা প্রমাণ হয়ে গেছে যে তারা স্ত্রীলোকদের পৃথক করে রাখত না। আরব পারস্য সভ্যতা বিজেণ্টাইন রীতিনীতির প্রভাবে অনেকদিকেই বদলে যায় এবং সম্ভবত এই থেকে উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকদের বেলা অবরোধ-প্রথা এসে পড়ে। তত্রাচ, আরব কিংবা পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার কোনো স্থানে অবরোধ-প্রথা কঠোর আকারে ছিল না। যেসকল আফগানেরা দিল্লী অধিকৃত হবার পর দলে দলে উত্তর-ভারতে প্রবেশ করেছিল তাদের মধ্যেও পর্দা অকরুণ ছিল না। তুর্কি ও আফগান রাজকুমারীরা এবং রাজপরিবারের মহিলারা অনেক সময় ঘোড়ায় চড়ে বের হতেন, শিকারে যেতেন এবং দেখা সাক্ষাৎ করে বেড়াতেন। যে-সকল মুসলমান নারী হজ উপলক্ষে মক্কায় যান তাঁদের তীর্থের পথে মুখমণ্ডল অনাবৃত রাখতে হয়, এবং এই প্রথা এখনও পালিত হয়ে থাকে। মুঘলদের সময়ে অবরোধ-প্রথা আভিজাত্য ও সম্মানের চিহ্ন হয়ে দাঁড়ায়, এবং মনে হয় এই কারণে এটা এদেশে প্রচারলাভ করে। এই প্রথা উচ্চশ্রেণীর পরিবারে বিস্তৃত হয় সেই সকল স্থানে যেখানে মুসলমান-প্রভাব বেশি হয়েছিল, যেমন দিল্লী অঞ্চল, যুক্তপ্রদেশ, রাজপুতানা, বিহার ও বাঙলাদেশ। তবু বলতে হয়, এ বড় অদ্ভুত যে পাঞ্জাব ও সীমান্তপ্রদেশ মুসলমান-প্রধান হলেও সেখানে পর্দা কঠোর নয়। ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে, কতক পরিমাণে মুসলমানদের মধ্যে ছাড়া, পর্দাপ্রথা দেখা যায় না।

এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই যে এই কয়েকশো বছরে ভারতের যে পতন ঘটেছে স্ত্রী-অবরোধ বা পর্দাপ্রথা তার একটা বিশেষ কারণ। আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে ভারতকে উন্নতিশীল সামাজিক জীবন পেতে হলে এই বর্বর প্রথা দূর হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। এতে যে স্ত্রীলোকদের ক্ষতি হয় তা কারও অবিদিত নেই, কিন্তু পুরুষদেরও, এবং মায়েদের কাছে পর্দার মধ্যে থাকতে হয় বলে শিশুদেরও সমান ক্ষতি হয়ে থাকে। সৌভাগ্যক্রমে এই অকল্যাণকর প্রথা হিন্দুদের মধ্যে থেকে দ্রুত লোপ পাচ্ছে, আর মুসলমানদের মধ্যে থেকেও যাচ্ছে, কিন্তু অধিকতর ধীরে। পর্দাপ্রথার দূরীকরণে যা কিছু সাহায্য করেছে এবং করছে তাদের মধ্যে প্রধান হল কংগ্রেসের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রচেষ্টাগুলি, কারণ এগুলিতে হাজার হাজার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীকে কাজের ক্ষেত্রে সাধারণের মধ্যে টেনে এনেছে। গান্ধীজি বরাবরই পর্দার দারুণ শত্রু। তিনি বলেছেন, 'এটা একটা অতিবড় অমানুষিক অপরাধ।' পর্দাপ্রথা নারীদের পিছনে টেনে রেখেছে, উন্নতি করতে দিচ্ছে না। 'পুরুষেরা এই বর্বর প্রথাটাকে আঁকড়ে ধরে থাকায় স্ত্রীলোকদের প্রতি যে কি অবিচার করে তাই ভাবি। যখন এটা প্রথম আসে তখন যদি বা এর কোনো প্রয়োজন ছিল, এখন সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং দেশের এত ক্ষতি করছে যে তার পরিমাণ করা যায় না।' গান্ধীজি নির্বন্ধের সঙ্গে চেয়েছেন যে আত্মোন্নতির জন্য

নারীরা যেন পুরুষদের সমান স্বাধীনতা ও সুযোগ লাভ করে। 'পুরুষজাতি ও নারীজাতির মধ্যেকার ব্যবহার সুবুদ্ধিসম্মত হতেই হবে। তাদের মধ্যে কোনো বাধা থাকবে না, উভয়দেরই ব্যবহার হবে সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত।' বাস্তবিক, গান্ধীজি নিরতিশয় আগ্রহের সঙ্গে নারীর স্বাধীনতা ও সাম্যের কথা লিখেছেন ও বলেছেন, এবং তীব্রভাষায় তার পারিবারিক দাসীবৃত্তির নিন্দা করেছেন।

আমি প্রসঙ্গান্তরে এসে একেবারে আধুনিক কালে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। এখন আমাকে মধ্যযুগে ফিরে যেতে হবে। আফগানেরা যে সময় দিল্লী অধিকার করে বসে সেযুগে পুরাতন ও নূতনের মধ্যে একটা সংশ্লেষণ ঘটে উঠেছিল। অধিকাংশ পরিবর্তনই হচ্ছিল উপরের দিকে, সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে; তাতে সাধারণ লোকেদের জীবনে, বিশেষত পল্লী অঞ্চলে, কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এ-সমস্তই আরম্ভ হয় রাজসভা-সম্পর্কিত লোকেদের মধ্যে, তারপর নগরে ও তদনুরূপ অঞ্চলে বিস্তৃতিলাভ করে। এই প্রকারে উত্তর-ভারতে একটা মিশ্র সংস্কৃতির বিকাশ আরম্ভ হল এবং এটা চলল কয়েক শতাব্দী ধরে। দিল্লী এবং বর্তমান সময়ে যার নাম যুক্তপ্রদেশ, এই অঞ্চলই হল এর কেন্দ্র। বস্তুত এই জায়গা বরাবরই আর্য-সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে আছে। কিন্তু এই আর্যসংস্কৃতির অনেকখানিই দক্ষিণে সঞ্চারিত হয়েছিল, আর তারপর সে-স্থান হিন্দু পুরাতনপন্থার দুর্গবিশেষ হয়ে ওঠে।

তৈমুরের আক্রমণে দিল্লীর সুলতানরা দুর্বল হলে যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুরে একটা ছোট মুসলমান রাজ্য গড়ে ওঠে। পঞ্চদশ শতাব্দীর সব সময়েই এ-স্থান শিল্প ও সংস্কৃতির এবং ধর্মনৈতিক উদারতার কেন্দ্র হয়েছিল। সাধারণের মধ্যে তখন হিন্দি-ভাষা উন্নতিলাভ করছিল, এখানে তা উৎসাহলাভ করল। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মমতের মধ্যেও সংশ্লেষণ আনার চেষ্টা চলেছিল এই রাজ্যে। প্রায় এই সময়ে উত্তরে, সুদূর কাশ্মীরে, জৈনুলাব্দীন নামে একজন স্বাধীন মুসলমান নরপতি তাঁর উদারতার জন্য এবং সংস্কৃতভাষায় পাণ্ডিত্য ও পুরাতন সংস্কৃতিতে উৎসাহদানের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

ভারতের সর্বত্র এই উত্তেজনা চলছিল এবং নূতন নূতন ধারণায় মানুষের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। পূর্বের ন্যায় ভারতবর্ষ অজ্ঞাতে এই অভিনব অবস্থায় আপন প্রতি-ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বিদেশাগত বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছিল, আর এতে নিজেও কতকটা বদলে যাচ্ছিল। এই উত্তেজনার কালেই নূতন শ্রেণীর সংস্কারকদের উদয় হয়, তাঁরা এই সংশ্লেষণের স্বপক্ষেই তাঁদের প্রচারকার্য চালান এবং অনেকসময় জাতি-ভেদকে নিন্দা করেন, কখনও বা তা উপেক্ষা করেন। দক্ষিণে হিন্দু রামানন্দকে পাওয়া যায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে, আর পাওয়া যায় তাঁর প্রসিদ্ধ শিষ্য, বারাণসীর মুসলমান জোলা, কবীর। ভক্ত কবীরের দোঁহা ও অন্যান্য কবিতা এবং গীত বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল এবং এখনও জনপ্রিয় হয়ে আছে। উত্তরে গুরু নানককে পাই—তিনি শিখ-ধর্মের প্রবর্তকরূপে খ্যাত। এই সকল সংস্কারকদের প্রভাব তাঁদের নামে যে সকল সম্প্রদায় গঠিত হয় সে সব ছাড়িয়ে বহু দূরে বিস্তৃত হয়েছিল। হিন্দুধর্ম সমগ্রভাবে

নূতন ধারণাগুলির সংঘর্ষ অনুভব করে, এবং ভারতে ইসলাম অন্য স্থান অপেক্ষা একটু পৃথকরূপে প্রকাশ পায়। ইসলামের প্রচণ্ড একেশ্বরবাদের প্রভাব হিন্দুধর্মের উপর পড়েছিল, আর হিন্দুদের সর্বেশ্বরবাদমূলক দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় মুসলমানদের উপর কার্যকরী হয়েছিল। এই সকল ভারতীয় মুসলমানের অধিকাংশই ছিল অন্য সম্প্রদায় হতে ধর্মান্তরিত, পুরাতন রীতিনীতির আবেষ্টনীর মধ্যে প্রতিপালিত। এর পর মুসলমান মর্মিয়া তত্ত্ব এবং সুফীধর্ম পরিণতি লাভ করল।

ভারতে যে পরদেশীরা অন্তর্ভুক্ত হচ্ছিল তার একটা নির্ভুল পরিচয় হল এই যে তারা এদেশের জনপ্রিয় ভাষাটা ব্যবহার করছিল, যদিচ পারস্য ভাষা রাজভাষারূপে ব্যবহৃত হত। আগেকার দিনের মুসলমানদের দ্বারা হিন্দিভাষায় লেখা অনেক ভাল ভাল পুস্তক আছে। এই সকল গ্রন্থকারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ যিনি তাঁর নাম আমির খুসরু। তিনি ছিলেন তুর্কি, তাঁদের পরিবার তাঁর দু'তিন পুরুষ আগে যুক্তপ্রদেশে বসবাস করতে আরম্ভ করে, এবং তিনি চতুর্দশ শতাব্দীতে কয়েকজন আফগান সুলতানের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। তিনি পারস্যভাষায় সর্বোচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন, এবং সংস্কৃত জানতেন। এছাড়া, তাঁর সঙ্গীতজ্ঞান ছিল উচ্চ, ভারতীয় সঙ্গীতে অনেক নূতন নূতন বিষয় যোজনা করেছিলেন। শোনা যায় সেতার তাঁরই উদ্ভাবনা। বহু বিষয়ে তিনি লিখে গেছেন, বিশেষভাবে ভারতের প্রশংসায়; যে যে বিষয়ে এদেশ শ্রেষ্ঠ তা উল্লেখ করেছেন। এগুলি তাঁর মতে, ধর্ম, দর্শনশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, ভাষা ও ব্যাকরণ (সংস্কৃত), সঙ্গীত, গণিত, বিজ্ঞান ও আম্রফল!

কিন্তু ভারতে তাঁর সুখ্যাতির প্রধান কারণ চলিত হিন্দিভাষায় রচিত জনপ্রিয় গানগুলি। সাধুভাষা ব্যবহার না করায় বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন, কারণ তা করলে তাঁর গান কেবল অল্প কয়েকজনেই বুঝত। তিনি পল্লীতে ঘুরে বেড়িয়েছেন কেবল ভাষার জন্য নয়, পল্লীজীবনের রীতিনীতি জানতে চেয়েছিলেন। নানা ঋতু ও তাদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে গান গেয়ে গেছেন, ভারতীয় প্রাচীন পদ্ধতিতে, তাদের উপযোগী সুরে ও কথায়; আরও গেয়েছেন জীবনের সকল দিকের গান, নববধূর আগমনী (বরণগান), বিচ্ছেদের করুণ গীত, বর্ষায় তৃষ্ণাতুর পৃথ্বীপৃষ্ঠ হতে সহসা উত্থিত হয়েছে জীবনের যে নব নব আয়োজন, তারই সঙ্গীত। এই সকল গান এখনও ব্যাপকভাবে গীত হয়, উত্তর ও মধ্য-ভারতের পল্লীতে পল্লীতে শোনা যায়। বর্ষা যখন আসে, গ্রামে গ্রামে বড় বড় দোলনা ঝোলানো হয় আম কিংবা অশ্বত্থ গাছের শাখা হতে, আর যত ছেলে-মেয়ে সব একত্র হয়ে তাঁরই গান গেয়ে এই ঋতুর আবাহন করে।

আমির খুসরু অসংখ্য হেঁয়ালি ও ধাঁধা রচনা করে গেছেন, এগুলি বালক-বৃদ্ধ সকলেরই প্রিয়। তাঁর দীর্ঘ জীবনকালেও তিনি গান ও ধাঁধার জন্য প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। সেই প্রসিদ্ধি এখনও আছে, এখনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছ'শো বছর আগে রচিত গান তার জনপ্রিয়তা বজায় রেখেছে, এখনও লোকসাধারণের মনে তার আবেদন অক্ষুণ্ণ, এখনও তা লোকের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে অবিকৃত ভাবে ও কথায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ আর কোনো দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে বলে আমার জানা নেই।

৬ : ভারতীয় সামাজিক সংগঠন : মণ্ডলীর গুরুত্ব

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে কেউ কিছু জেনেছেন তিনিই জাতিভেদের কথা শুনেছেন। প্রায় সব বিদেশী ব্যক্তি এবং ভারতেরও অনেক লোক এর নিন্দা করে। এর সকল বাঁধাবাঁধি এবং খুঁটিনাটি সমর্থন করে এমন লোক এখন সম্ভবত ভারতেও নেই, তবে অনেকেই আছে যারা এর মূল বিষয়টা স্বীকার করে, আর বহু হিন্দু জাতিভেদ মেনে চলে। জাতি শব্দটার ব্যবহার নিয়েও একটু গোলমাল আছে, কারণ বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন অর্থে একে গ্রহণ করে। সাধারণ কোনো ইউরোপীয় ব্যক্তি, কিংবা সেইরূপ ভাবাপন্ন কোনো ভারতীয় মনে করে যে এটা সামাজিক সাধারণ শ্রেণী-বিভাগ মাত্র, কালক্রমে এই কঠিন আকার পেয়েছে; এর দ্বারা এই সকল শ্রেণী আপন আপন প্রতিপত্তি রক্ষা করে চলেছে, যাতে যারা উচ্চে তারা যেন বরাবরই উপরে থাকতে পারে, আর যারা নিচে তারা যেন চিরকাল সকলের তলায় পড়ে থাকে। এ-ধারণা যথার্থ। আর্য বিজেতারা বিজিতদের হতে পৃথকভাবে এবং তাদের উপরে থাকতে চেয়েছিল, এবং এতেই সম্ভবত জাতিভেদের শুরু। পরিণতরূপে তা যে এইভাবেই কাজ করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, যদিচ প্রথম-প্রথম এতে কড়াক্কড়ি তেমন ছিল না। তবে একথাটা কেবল আংশিক-ভাবে সত্য, কারণ এ থেকে বোঝা যায় না কেমন করে জাতিভেদ এত শক্তি এবং এরূপ নিবিড় আকার লাভ করল, কেমন করে এখনও পর্যন্ত টিকে আছে। বৌদ্ধধর্ম একে কম আঘাত করেনি, অনেক শতাব্দী ধরে আফগান ও মুঘল শাসন এবং ইসলামের বিস্তারও এর অনুকূল ছিল না, আর, এ ছাড়াও, অগণিত হিন্দু সংস্কারক এর বিরুদ্ধে প্রচার করেছেন, তবু এ প্রথা যায়নি। কিন্তু এই বর্তমানকালেই জাতিভেদ প্রথাকে প্রবলতম আক্রমণ সহ্য করতে হচ্ছে, আজ এর মূলে গিয়ে আঘাত পৌঁচাচ্ছে। এরূপ যে হচ্ছে তার কারণ এ নয় যে হিন্দুসমাজে সংস্কারের প্রেরণা প্রবল আকারে এসেছে, যদিচ এ-প্রেরণা নিঃসন্দেহভাবে আছে, আর সে কারণ এও নয় যে পশ্চিম থেকে পাওয়া ধারণার ফলে এরূপ হচ্ছে, যদিচ পশ্চিমের প্রভাবও অনুভব করা যাচ্ছে। আমাদের চোখের সামনে যে পরিবর্তন ঘটছে তার হেতু এই যে আজ মূলগত অর্থনৈতিক পরি-বর্তনের জন্য ভারতে সমাজের সংগঠন শিথিল হয়ে পড়েছে, এবং তা একেবারেই বিপর্যস্ত হয়ে যেতেও পারে। জীবন গেছে বদলিয়ে, আর চিন্তার ভঙ্গী, তার রূপও এত বদলাচ্ছে যে জাতিভেদ যে আরও টিকে থাকবে এটা সম্ভব বলে মনে হয় না। কি যে এর জায়গা নেবে তা বলা আমার শক্তির অতীত, কারণ আসল সমস্যাটি জাতিভেদ অপেক্ষা অনেক বড়। সমাজব্যবস্থা একটি সমস্যা; দুদিক থেকে এর অভিমুখে অগ্রসর হওয়া যায়, কিন্তু পথ দুটি একেবারে পরস্পর বিপরীত, সুতরাং বিরোধ এখানেই। পুরাতন হিন্দু ধারণা হল, সমাজব্যবস্থায় মণ্ডলীই গণনীয়, কিন্তু পশ্চিমের ধারণায় ব্যক্তিই গুরুত্বলাভ করে, সুতরাং তার স্থান দলের উপরে।

এ-বিরোধ কেবল যে ভারতে দেখা দিয়েছে তা নয়। এ-বিরোধ পশ্চিমের সমগ্র জগতের, যদিচ অন্যত্র রূপ তার অন্য। সাধারণতন্ত্রমূলক উদারনীতি এবং এর দ্বারা

আনীত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনই বলতে গেলে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউ-রোপীয় সভ্যতার পরিচয়, ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ কতদূর উঠতে পারে তার নিদর্শন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাব ও তার দ্বারা অনুপ্রাণিত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থা বৃদ্ধি পেয়ে বিংশ শতাব্দীতেও এসে পড়েছে। কিন্তু এই অল্পদিনেই এগুলি এ-কালের পক্ষেও অতি-পুরাতন হয়ে দাঁড়িয়েছে, বর্তমান সংকটাপন্ন অবস্থা এবং যুদ্ধের চাপ সহ্য করতে পারছে না। দলের ও সম্প্রদায়ের গুরুত্ব বেড়ে গেছে; এখন সমস্যা হল, একদিকে ব্যক্তির দাবি এবং অন্যদিকে দলের দাবি, এই দুটিকে কেমন করে মিলিয়ে নেওয়া যায়। এই সমস্যার সমাধান বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আকারে পাওয়া যেতে পারে, তবু যা সকলস্থানেই খাটে এমন একটা মূলগত মীমাংসার জন্য মানুষের চেষ্টা দিন-দিন বৃদ্ধি পাবে।

জাতিভেদ স্বতন্ত্র একটা কিছু নয়; এটা একটা বৃহৎ সমাজসংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এর স্পষ্টতর দোষগুলি বাদ দিয়ে, এর কঠোরতা কমিয়ে ব্যবস্থাটাকে রক্ষা করা অসম্ভব নয়। তবে এটা না হবারই কথা, কারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে-সকল শক্তি আজকাল কাজ করছে সেগুলি এর বাইরের রূপ নিয়ে ব্যস্ত নয়—আঘাত করছে এর ভিত্তিতে, এর অন্য সব অবলম্বনকে দূর করতে চায়। বাস্তবিক, অনেক অবলম্বন ইতিমধ্যেই গেছে, কিংবা দ্রুত যাচ্ছে, আর জাতিভেদ দিন-দিন আশ্রয়হীন হয়ে পড়ছে। এটাকে আমরা পছন্দ করি, কি করি না, প্রশ্ন এখন তা নয়; আমাদের পছন্দ-অপছন্দ যাই হোক না কেন, পরিবর্তন আসছেই। ভারতবর্ষের লোকের সমষ্টিগত প্রতিভা ও চরিত্রের গুণে তাদের সমাজব্যবস্থা এরূপ সমৃদ্ধ ও স্থায়ী হয়েছে। আমাদের সে শক্তি নিশ্চয়ই আছে যে সমস্ত পরিবর্তনকে এমনভাবে গড়ে নিতে পারি, এবং পরিচালিত করতে পারি, যেন সেই গুণগুলির সুযোগ ও সুবিধা পূর্ণরূপে গ্রহণ করা যায়।

স্যার জর্জ বার্ডউড্ কোনো এক জায়গায় বলেছেন, 'যতদিন হিন্দুরা জাতিভেদ ধরে থাকবে, ততদিন ভারতবর্ষ অক্ষুণ্ণ ভারতবর্ষ হয়ে থাকবে, কিন্তু তারা এটা ত্যাগ করলে তাদের দেশ ভারতবর্ষই থাকবে না; তখন এই গৌরবময় উপদ্বীপ, লন্ডন শহরের দরিদ্রদের বাসস্থান অরুচিকর ইস্ট্-এন্ডের মত অ্যাংলো-স্যাক্সান সাম্রাজ্যের মধ্যে একটা নগণ্য স্থান হয়ে পড়বে।' জাতিভেদ থাকা না-থাকায় কিছুই যায় আসেনি, বহুদিন হতেই তো আমাদের ঐরূপ অবস্থাতেই ফেলা হয়েছে। ভবিষ্যতে আমাদের অবস্থা আর যা-ই হোক না সেটা ঐ সাম্রাজ্যের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না। তবে স্যার জর্জ বার্ডউড্ যা বলেছেন তাতে কিছু সত্যও আছে, যদিচ সম্ভব যে তিনি বিষয়টিকে এই দিক থেকে দেখেননি। কোনো বিশাল, দীর্ঘকালস্থায়ী সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে গেলে, তার স্থানে যদি সেখানকার লোকের বিশেষত্ব ও প্রতিভার এবং কালেরও অধিকতর উপযোগী কোনো ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে সামাজিক জীবন সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়ে যায়, সম্বদ্ধতা নষ্ট হয়, সাধারণ ব্যক্তিরা ক্লেশ ভোগ করে এবং মানুষের ব্যক্তিগত ব্যবহার অতিশয় অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। সম্ভবত পরি-বর্তনের সময় অনেক ভাঙাচোরাই এড়ানো যায় না, আর আজ জগতের সর্বত্রই তো

তাই দেখা যাচ্ছে। বোধ হয় এরই দুঃখ-যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে মানুষ পরিণতি লাভ করে, জীবনের শিক্ষা পায় এবং নূতন নূতন অবস্থার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে।

যাই হোক অধিকতর উপযোগী কিছু আসবে এই আশায় সব ভেঙেচুরে বসে থাকতে পারি না, আগে আবশ্যক কিসের জন্য আমরা প্রয়াস পাচ্ছি তার ধারণা, সে-ধারণা যতই অস্পষ্ট হোক না কেন। শূন্যতার সৃষ্টি করে অপেক্ষা করা চলে না, কারণ এ-শূন্যতা আপনা-আপনি এমন ভাবে পূর্ণ হয়ে উঠবে যাতে আখেরে হয়তো আমাদের আক্ষেপ করতে হতে পারে। গঠনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করার সময় বিবেচনা করতে হবে কিরূপ মানুষ নিয়ে আমাদের কাজ, তার চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষার পটভূমিকা কি প্রকারের, আর কি পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের চলতে হবে। তা না করে যদি আমরা একটা আদর্শিক পরিকল্পনার আকাশ-কুসুম রচনা করে বসি, কিংবা অন্যেরা অপর-স্থানে যা করেছে তারই অনুকরণের কথা ভাবি, তাহলে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া হবে। সুতরাং ভারতীয় পুরাতন সামাজিক গঠনটি, যেটি আমাদের দেশের লোকের মনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে এসেছে, সেটিকে আমাদের পরীক্ষা করে নির্ভুল-ভাবে জেনে ও বুঝে নিতে হবে।

গঠনটির ভিত্তি ছিল এই তিনটির উপর: আত্মকর্তৃত্বশীল পল্লীসমাজ, জাতিভেদ এবং একান্নবর্তী পরিবার। এদের প্রত্যেকটিতেই মণ্ডলী প্রধান, ব্যক্তির আসন তার নিচে। পৃথক পৃথকভাবে বিচার করলে এদের কোনোটিতেই তেমন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না; অন্যান্য দেশেও, বিশেষভাবে মধ্যযুগে, এদের প্রত্যেকটিরই অনুরূপ কিছু-না-কিছু দেখা গেছে। প্রাচীনকালের ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের ন্যায় শাসনব্যবস্থা আদি-কালে অন্যত্রও ছিল। একপ্রকার আদিকালীন কমিউনিসমও ভারতে ছিল। ভারতীয় পল্লীসমাজের সঙ্গে প্রাচীন রাশিয়ার 'মির' তুলনীয়। জাতিভেদ ছিল কর্মগত, ইউরোপের বণিক-সমিতির মত। চীনদেশের পারিবারিক গঠন হিন্দুদের একান্নবর্তী পরিবারের মতই। এই তুলনামূলক আলোচনা আরও অগ্রসর করার উপযোগী তথ্য আমার সঞ্চিত নেই, আর, তা ছাড়া, সেটা করা আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আবশ্যকও নয়। মোটের উপর বিচার করলে ভারতের সর্বাঙ্গীন সংগঠন ছিল অনন্যসাধারণ, আর তার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই বিশেষত্বও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৭ : গ্রামিক স্বায়ত্তশাসন : শুক্রনীতিসার

তুর্কি ও আফগানদের দ্বারা ভারতাক্রমণ ঘটার আগে এদেশের শাসন-পদ্ধতি কিরূপ ছিল সে-সম্বন্ধে দশম শতাব্দীতে লিখিত একখানি গ্রন্থ হতে কিছু জানা যায়। এখানি শুক্রাচার্যের রচনা, 'নীতিসার', দেশ-শাসনের বিজ্ঞান। এ-গ্রন্থে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা এবং নগর ও পল্লীর জীবন সম্বন্ধে আলোচনা আছে। তখনকার দিনের রাজার শাসন-পরিষদ এবং বিভিন্ন শাসন-বিভাগের কথাও এতে আছে। সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ও বিচার ব্যাপারে পল্লীপঞ্চায়ত বা মনোনীত পরিষদের যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি ছিল, এবং এর

সদস্যগণ রাজকর্মচারীদের কাছ থেকে বিশেষ সম্মান লাভ করতেন। এই পঞ্চায়তই জমি বণ্টন করে দিত, উৎপন্নদ্রব্য হতে কর আদায় করত এবং গ্রামের পক্ষ থেকে রাজার অংশ জমা দিত। এইরূপ অনেকগুলি পল্লীপরিষদের কাজ তদারক করবার জন্য এবং প্রয়োজন হলে তা নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য ঊর্ধ্বতন পঞ্চায়তের ব্যবস্থা ছিল।

কয়েকটি ক্ষোদিত লিপি থেকে জানা যায় কি পদ্ধতিতে পল্লীপরিষদের সদস্যদের নির্বাচন করা হত এবং তাদের কি কি যোগ্যতা থাকা আবশ্যক ছিল, আর কি দোষেই বা কোনো ব্যক্তি নির্বাচনের অযোগ্য বলে বিবেচিত হত। নির্বাচন দ্বারা প্রতি বছর বিভিন্ন সমিতি গঠিত হত, স্ত্রীলোকেরা এগুলিতে মনোনীত হতে পারতেন। অপকর্মের জন্য সদস্যকে বহিষ্কৃত করে দেওয়ার রীতি ছিল। কোনো সদস্য সাধারণের অর্থের হিসাব দিতে না পারলে তাকে অযোগ্য প্রতিপন্ন করা যেতে পারত। যাতে কেউ আত্মীয়স্বজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতে না পারে সেজন্য একটা ভাল নিয়ম ছিল : সাধারণের কাজসংক্রান্ত পদে কোনো সদস্যের আত্মীয় নিযুক্ত হতে পারত না।

পল্লীপরিষদ আপন আপন অধিকার সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করত, কোনো সৈন্য রাজার অনুমতি ব্যতীত গ্রামে প্রবেশ করতে পারত না। 'নীতিসারে' আছে যে লোকে কোনো রাজকর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে 'প্রজাদের পক্ষাবলম্বন করাই রাজার কর্তব্য।' কোনো রাজকর্মচারীর বিরুদ্ধে অনেকে অভিযোগ আনলে তাকে পদচ্যুত করার রীতি ছিল, কারণ মনে করা হত যে 'উচ্চপদের গর্বে সকলেরই মাদকতা আসে।' প্রজাদের মধ্যে সংখ্যাভূয়িষ্ঠের মতে রাজাকে চলতে হত। 'জনমত রাজা অপেক্ষাও শক্তিশালী, কারণ অনেকগুলি তন্তু নিয়ে যে রজ্জু প্রস্তুত হয় তা একটা সিংহকেও আকর্ষণ করার পক্ষে যথেষ্ট।' কোনো রাজকীয় পদে কাউকে নিয়োগ করার কালে কাজ, চরিত্র ও গুণের বিচার করতে হত, জাতি কি বংশের নয়, এবং মনে করা হত যে 'ত্বকের বর্ণ কি পূর্বপুরুষের পরিচয়ে ব্রাহ্মণের উপযুক্ত মনোবৃত্তি জন্মাতে পারে না।'

অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর শহরগুলিতে বহু শ্রমশিল্পী ও ব্যবসায়ী থাকত, এবং শিল্পসমিতি, বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান ও মহাজনী বা পোদ্দারী-প্রতিষ্ঠান (ব্যাঙ্ক) গঠিত হত, আর এগুলির প্রত্যেকটিই আপন আপন কাজ নিয়ন্ত্রিত করে চলত।

এই সকল তথ্য হতে অবশ্য সব কথা বোঝা যায় না, তবে এইগুলি ও আরও অনেক বিষয় হতে জানা যায় যে শহর ও পল্লীতে ব্যাপকভাবে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা ছিল। কেন্দ্রীয় শক্তিকে যতদিন তার ধার্য কর নিয়মিত আদায় দেওয়া হত, ততদিন এই ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা হত না বলা যেতে পারে। চলিত প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত কানুন অমান্য করা যেত না, এবং এইরূপে প্রতিষ্ঠিত অধিকারে রাজনৈতিক কি সামরিক কোনো শক্তিই হাত দিতে পারত না। শুরুতে পল্লীর মধ্যে কৃষিব্যবস্থা সমবায় পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিভিন্ন পরিবারের এবং প্রত্যেক মানুষের কতকগুলি অধিকার যেমন ছিল তেমনি কতকগুলি বাধ্যতামূলক কর্তব্য ছিল আর সেসব এই সমস্ত প্রথানুযায়ী স্থিরীকৃত ও নির্দিষ্ট হত।

ভারতে ধর্মের নামে রাজ্য পরিচালনা হয়নি, অর্থাৎ দেবতাকে রাজার স্থানে কল্পনা করে কোনো রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ভারতীয় শাসনবিজ্ঞান অনুসারে, রাজা ন্যায়হীন ও অত্যাচারী হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে প্রজাদের অধিকার আছে বলে বিবেচনা করা হত। চৈনিক দার্শনিক মেনসিয়াস্ দুহাজার বছর আগে যা বলে গেছেন তা ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও খাটে: 'কোনো রাজা যদি তার প্রজাদের ধূলি ও তৃণ-জ্ঞান করে ও তদনুরূপ আচরণ করে তাহলে তাদের উচিত রাজাকে দস্যু ও শত্রুর ন্যায় বিবেচনা করে তার সঙ্গে তদনুরূপ ব্যবহার করা।' এখানকার রাজশক্তির সমগ্র ধারণাটিই ইউ-রোপীয় সামন্ততন্ত্র হতে বিভিন্ন ছিল। সামন্ততন্ত্রী রাজ্যের সকল ব্যক্তি ও বস্তুতে রাজার অধিকার থাকত। সেখানে রাজা তাঁর প্রতিভূস্বরূপ সামন্তদের (লর্ড ও ব্যারন-দের) স্ব স্ব ক্ষেত্রে অনুরূপ অধিকার দিতেন, আর তারা রাজার প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিত। এইরূপে রাজশক্তির একটা ক্রমপরম্পরাগত বিধি দাঁড় করানো হত। ভূমি ও প্রজা উভয়ের উপর সামন্তেরা, আর তাদের মধ্যে দিয়ে রাজাও, স্বত্ববান থাকতেন। এটা রোমান রাজ্যব্যবস্থার একটা রূপ। ভারতে এ-প্রকার কিছু ছিল না। ভূমির উপর কতকগুলি কর আদায় করার অধিকার রাজার ছিল, আর তিনি এই কাজের ভার অপরকে দিতে পারতেন, কিন্তু তাঁর কোনো প্রতিভূকে এ ছাড়া আর কোনো অধিকার দিতে পারতেন না। ভারতে কৃষকেরা কোনো প্রভুর গোলাম ছিল না। ভূমির অভাব ছিল না, সুতরাং কোনো কৃষককে উচ্ছেদ করায় কোনো লাভ ছিল না। এইরূপে দেখা যায় ভারতে পশ্চিমের মত ভূস্বামী ছিল না, আর কৃষকেরা তাদের জমির উপর সম্পূর্ণরূপে স্বত্ববান হত না। এই দুটি ব্যবস্থা ইংরাজেরা এদেশে এনেছে এবং তাতে বিষম অনিষ্ট ঘটেছে।

বিদেশীদ্বারা বিজিত হওয়ায় এদেশে যুদ্ধ এসেছিল ও বহুকিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে-ছিল। তারপর বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং নির্দয়ভাবে তা প্রশমিত করা হয়; নূতন শাসকেরা সৈন্যদল ও যুদ্ধোপকরণের বহুলতায় শক্তিমান হয়ে ওঠে। পূর্বে এদেশে শাসনব্যবস্থায় প্রচলিত রীতিনীতি ও প্রথা মানতে হত, কিন্তু এখন শাসকশ্রেণী এ-সমস্তকে প্রায়ই উপেক্ষা করতে পারত। এই থেকে গভীর পরিবর্তন আসতে লাগল, আত্মকর্তৃত্বশীল পল্লীসমাজের ক্ষমতা হ্রাস পেতে লাগল, পরে রাজস্ব-বিষয়েও অনেক পরিবর্তন এসে পড়ল। আফগান ও মুঘল নরপতিরা এরূপ সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন যেন পুরাতন রীতিনীতি ও বিধিব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে না হয়। তাঁরা মূলগত কোনো বিধিই বদলাননি, এবং ভারতীয় জীবনের আর্থিক ও সামাজিক গঠন পূর্ববৎ চলছিল। ঘিয়াস-উদ্-দীন তুঘলক নিজের কর্মচারীদের বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তাঁরা যেন প্রথা-ঘটিত সকল নিয়মকানুন রক্ষা করেন, এবং যেহেতু ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার, রাজকার্য যেন ধর্ম হতে পৃথক রাখা হয়। কিন্তু সময়ের পরি-বর্তনে, নানা বিরোধের জন্য ও শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় ধীরে ধীরে, কিন্তু অধিক মাত্রায় চিরাচরিত প্রথাগুলি তাদের সম্মান হারাল। স্বায়ত্তশাসনশীল পল্লীসমাজ কিন্তু বহুকাল অপরিবর্তিতই ছিল, ইংরাজ-শাসনের যুগে এতেও ভাঙন ধরল।

৮ : জাতিভেদ—প্রথা ও প্রকাশ : একান্নবর্তী পরিবার

হ্যাভেল্ বলেন, 'ভারতবর্ষে ধর্ম মতমাত্র নয়; এখানে ধর্ম মানবের জীবন ও কর্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য গৃহীত অনুমানগত বিধি, আর একে যথাপ্রয়োজন অভিযোজিত করে নেওয়া হয় আধ্যাত্মিক উন্নতি ও জীবনের বিভিন্ন অবস্থা অনুসারে।' প্রাচীনকালে, যখন আর্য-ভারতীয় সংস্কৃতি রূপ গ্রহণ করে তখন, ধর্মকেই বহু মানবের প্রয়োজন-সকল বিধান করতে হয়েছিল। এই সকল মানবের মধ্যে সভ্যতায়, বোধে এবং আধ্যাত্মিক অবস্থায় অত্যধিক পার্থক্য ও দূরত্ব লক্ষিত হত। এদের মধ্যে আদিকালের অরণ্যবাসীরা ছিল, বস্তু এবং প্রতীকপূজক ও সকল প্রকার কুসংস্কারে বিশ্বাসবান লোকও ছিল, আবার এমন লোকও ছিলেন যাঁরা আধ্যাত্মিক চিন্তার সর্বোচ্চস্তরে উত্তীর্ণ হয়েছেন। আর এই সকলের মাঝামাঝি সকল প্রকার এবং সকল স্তরের মত ও আচরণ বর্তমান ছিল। কতকগুলি লোক অতি উচ্চশ্রেণীর চিন্তা নিয়ে থাকতেন, অনেকের কাছে সেগুলি অধিগম্যই ছিল না। সামাজিক জীবন যতই উন্নত হতে লাগল মতের ঐক্যও তত প্রসারতা লাভ করল, তবু সাংস্কৃতিক ও প্রকৃতিগত অনেক পার্থক্য থেকে গেল। আর্য-ভারতীয় ধারাই ছিল কোনো মতকে জোর করে নিরোধ না করা। প্রত্যেক মণ্ডলী আপন উৎকর্ষ ও বোধশক্তির অনুরূপ ক্ষেত্রে তার নিজের আদর্শ অনুসারে চলতে কোনো বাধা পেত না। অনেক সময়ে অপরের মতকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা দেখা যেত—কাউকে অস্বীকার করা কিংবা চেপে রাখা হত না।

সামাজিক সংগঠনে যে-সমস্যার সম্মুখীন হতে হত তা আরও জটিল। এই সমস্ত একেবারে বিভিন্ন মণ্ডলীগুলিকে কেমন করে একই সমাজ-গঠনের মধ্যে আনা যায়, এই হল সমস্যা। কারণ ব্যবস্থা এরূপ হওয়া আবশ্যক প্রত্যেক মণ্ডলী যেন সমগ্র সমাজ-দেহে সহযোগিতা দান করতে পারে, এবং সেই সঙ্গে আপন স্বাতন্ত্র্যও রক্ষা করে বর্তে থাকে ও উন্নতিলাভ করে। তুলনাটা কষ্ট-কল্পিত, তবু বলা যেতে পারে, এ অবস্থাটা বহু দেশে সংখ্যালঘিষ্ঠদের নিয়ে যে সমস্যা দেখা যায় তারই মত। এ সমস্যার মীমাংসা হচ্ছে না। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র তাদের সংখ্যালঘিষ্ঠঘটিত সমস্যার সমাধান অল্পবিস্তর করে সকলকে একেবারে আমেরিকান করে নিয়ে—সকলে যেন একছাঁদের হয়ে যায়। যেসব দেশের ইতিহাস পুরাতন এবং সমস্যা আরও জটিল সেখানে সমাধান সহজ নয়। এমনকি ক্যানাডাতেও ফরাসীদল তাদের জাতি, ধর্ম ও ভাষা সম্বন্ধে সচেতন। ইউ-রোপে বেড়া আরও উঁচু এবং আরও গভীর। বিভিন্ন ইউরোপবাসীর জীবনের পট-ভূমিকা অনেকটা এক, এবং সংস্কৃতি একই প্রকারের, তবু তাদের মধ্যে, এবং যারা ইউরোপ হতে দূরে গেছে বসবাস করতে, তাদেরও মধ্যে এই সমস্যা দেখা যায়। যেখানে ইউরোপের বাইরের লোক আছে, তারা ইউরোপীয় ছাঁচের যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোরা সম্পূর্ণরূপে আমেরিকান হওয়া সত্ত্বেও পৃথক জাতি বলে বিবেচিত হয়, এবং অন্যেরা যে সকল সুযোগ-সুবিধা বিনা চেষ্টাতেই পায়, তার অনেকগুলি হতেই বঞ্চিত থাকে। এগুলি অপেক্ষাও নিম্নতর অসংখ্য উদাহরণ অন্য-

স্থান থেকে দেওয়া যেতে পারে। কেবল সোভিয়েট রাশিয়া বহুজাতি সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্র সৃষ্টি করে এই সকল সমস্যার সমাধান করেছে, অনেকে এইরূপ অভিমত দিয়ে থাকে।

এখন আমাদের জ্ঞান বেড়েছে এবং আমরা অনেক উন্নতিলাভও করেছি। আজও যদি এইসকল সমস্যা ও অসুবিধা হতে আমরা নিষ্কৃতি না পাই তাহলে একবার ভেবে দেখতে হয়, যখন আর্য-ভারতীয়েরা এই বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বহুজাতীয় মানবের দেশে তাদের সভ্যতা ও সমাজশৃঙ্খলা গড়ে তুলছিল, তখন অবস্থাটা আরও কত কঠিন ছিল। এইসকল সমস্যার নিরাকরণের স্বাভাবিক পন্থা তখন এবং পরেও ছিল বিজিতদের উচ্ছেদসাধন করা কিংবা তাদের ক্রীতদাস করে নেওয়া। এ পথ ভারতে গৃহীত হয়নি, কিন্তু স্পষ্টই দেখা যায় যে যাতে উপরের লোকেরা চিরদিন উপরেই থাকতে পারে সেজন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছিল। এইভাবে উচ্চাধিকার পাকা করে নেওয়ার পর একপ্রকার সম্প্রদায়-বহুল রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা হয়, তাতে কতকগুলি সাধারণ নিয়মানুবর্তিতায় ও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রত্যেক মণ্ডলীকে কোনো কোনো বিষয়ে স্বাধীনভাবে চলার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেক দল আপন বৃত্তি অনুসরণ করতে এবং আপন রীতিনীতি অনুসারে ইচ্ছানুযায়ী জীবনযাপন করতে পারত। এতে এই সীমাটুকু মাত্র নির্দিষ্ট ছিল যে কোনো দল আর একটির কাজে হস্তক্ষেপ করতে কিংবা তার সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হতে পারত না। সমগ্র ব্যবস্থাটি নমনীয় ও ব্যাপ্তিশীল ছিল, কারণ যখন কোনো পুরাতন দলে অনৈক্য উপস্থিত হত, ভিন্ন মতাবলম্বীরা সংখ্যায় যথেষ্ট হলে নূতন দল গঠন করে নিতে পারত। নবাগতেরাও এইভাবে নূতন দল গঠন করে নিত। সকল দলেই সাম্য ও গণতন্ত্রসম্মত ব্যবস্থা ছিল—নিয়ন্ত্রণক্ষমতা থাকত নির্বাচিত নেতাদের হাতে, এবং তাঁরা প্রায়ই, গুরুতর কোনো প্রশ্ন উঠলেই, সকলের সঙ্গে পরামর্শ করতেন।

এই সকল মন্ডলী প্রায় সকল সময়েই কোনো না কোনো কাজের সঙ্গে, অর্থাৎ কোনো কারুশিল্প কিংবা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকত। এইভাবে তারা এক-একটা ব্যবসায়ী-সমিতি কি শিল্পীসংঘ হয়ে দাঁড়াত। প্রত্যেকটির মধ্যে সংহতি লক্ষিত হত; এতে দলস্থ ব্যক্তিরা কেবল যে দলটিকেই রক্ষা করে চলত তা নয়, তাদের মধ্যে কেউ বিপন্ন হলে কিংবা আর্থিক কষ্টে পড়লে তাকে সকল প্রকারে সাহায্য করার ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক জাতি একটা নির্দিষ্ট কাজ নিয়ে থাকত, কিন্তু বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন কাজের মধ্যে এমন যোগাযোগ ছিল যে প্রত্যেক মণ্ডলী আপন কাঠামোর মধ্যে সুশৃঙ্খলায় আপন কাজ করলে সমগ্র সমাজটিই সুচারুরূপে পরিচালিত হত। এসবের উপরে, মণ্ডলীগুলিকে জাতীয় বন্ধনে একত্র করে রাখার জন্য যে চেষ্টা করা হয় তা বহুল পরিমাণে সফল হয়েছিল, এবং সকলে একই সংস্কৃতি ও একই ঐতিহ্যের গর্ব অনুভব করত, অন্তরে একই বীর ও ঋষিগণের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করত, একই দেশকে আপন বলে জানত, এবং একই দেশের দূরে দূরান্তরে তীর্থ পরিক্রমা করে বেড়াত। তখনকার জাতীয় বন্ধন এবং এখনকার জাতীয়তা এক নয়; তা রাজনীতির ক্ষেত্রে ছিল দুর্বল,

কিন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ছিল সবল। রাজনৈতিকভাবে সঙ্ঘবদ্ধতা ছিল না বলেই এদেশে বৈদেশিক আক্রমণ জয়যুক্ত হয়েছিল, আর সমাজনৈতিক সবলতা ছিল বলে প্রত্যেক আঘাতের পর পুনরায় বল সঞ্চয় করা ও বিদেশাগত সকল বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া সহজ হয়েছিল। এই সমাজদেহের শীর্ষস্থান এতগুলি ছিল যে সবকটি মাথা একসঙ্গে ছেদন করা সম্ভবপর হয়নি। বহু পরাজয়, বহু বিঘ্ন তাই উত্তীর্ণ হতে পেরেছে ভারতবর্ষ।

এইরূপে দেখলে দেখা যায় যে বর্ণাশ্রম ছিল কর্ম ও কর্তব্যের ভিত্তিতে অনেক মণ্ডলীর একতাবদ্ধতার রূপ। এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে এতে সকল বিষয়ই আশ্রয়লাভ করবে, অথচ কোনো মণ্ডলীকেই অপরগুলির সঙ্গে সাধারণভাবে কোনো মত মানতে হবে না—প্রত্যেকটিরই আপন পথে চলার অধিকার পূর্ণভাবেই থাকবে। এরই বিশালতার মধ্যে দেখা যেত এক-পত্নীকত্ব, বহু-পত্নীকত্ব এবং কৌমার্য। এর সবগুলি-কেই অন্যান্য প্রথা, মত ও আচরণের মত মেনে নেওয়া হত। জীবনই ছিল আসল, তাকে রক্ষা করে চলতে হত সমাজের সকল স্তরে। কোনো সংখ্যালঘিষ্ঠকে কোনো সংখ্যাভূয়িষ্ঠের কাছে মাথা নত করতে হত না, কারণ সংখ্যায় ছোট হলেও তারা একটা আত্মকর্তৃত্বশীল মণ্ডলী গঠন করে নিতে পারত। প্রশ্ন ছিল কেবল এই: পার্থক্যটা কি সত্যই বিশেষত্বব্যঞ্জক, আর পৃথকভাবে কর্মশীল হবার পক্ষে সংখ্যাটা কি যথেষ্ট? যে-কোনো দুটি মণ্ডলীর মধ্যে সকল প্রকার পার্থক্যই সম্ভব ছিল, হোক তা কুল, ধর্ম কি বর্ণের, সংস্কৃতি কি বোধশক্তির উৎকর্ষের।

ব্যক্তি মণ্ডলীর অংশরূপে বিবেচিত হত। সে মণ্ডলীর ক্রিয়ায় কোনো বাধার সৃষ্টি না করলে যেমন ইচ্ছা চলতে পারত। মণ্ডলীর কাজে কোনো বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করায় তার কোনো অধিকার ছিল না, কিন্তু যথেষ্ট শক্তিমান হলে এবং যথেষ্ট সংখ্যায় অনুগামী সংগ্রহ করতে পারলে তার পক্ষে নিজের একটি মণ্ডলী কি দল গড়ে নেওয়া অসম্ভব ছিল না। কোনো দলের সঙ্গে তার মিল না ঘটলে সকলে বুঝত যে জগতের সামাজিক সকল ব্যাপারেই সে অচল, এবং তখন সে জাতি, দল ও সমস্ত সাংসারিক চেষ্টা ত্যাগ করে সন্ন্যাসীও হতে পারত—তার যথা ইচ্ছা ঘুরে বেড়াত কিংবা যা খুশি করতে কোনো বাধা থাকত না।

একটা কথা এখানে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে যদিচ দল কি সমাজের স্বার্থে ব্যক্তিকে দমিত রাখা ভারতীয় সামাজিক ব্যবস্থার অন্তর্গত ছিল, ধর্মবিষয়ক চিন্তায় ও আধ্যাত্মিক চেষ্টায় ব্যক্তিই বরাবর প্রাধান্য লাভ করেছে। মুক্তি ও সার-সত্যের জ্ঞান ছিল সকলের জন্য, জাতি উচ্চ কি নীচ—যাই হোক না কেন। এ দুটি মণ্ডলীর বিষয় বলে বিবেচিত হত না, কারণ এরূপ বিষয় সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত। মুক্তির অনুসন্ধানে কোনো দৃঢ়, অনমনীয় মত স্বীকৃত হত না—মনে করা হত সব দ্বার দিয়েই তাতে পৌঁছানো যায়।

ভারতীয় সমাজগঠনে যদিচ মণ্ডলীবন্ধনই মূলনীতিরূপে গৃহীত হয়েছিল, এবং যদিচ এরই ফলে জাতিভেদও এসেছিল, এদেশে তবু বরাবরই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিকে

আগ্রহ দেখা গেছে। এই দুদিকের মধ্যে বিরোধও দেখা যায়। ধর্মমতের ঝোঁক ব্যক্তির উপর, এবং এইজন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অংশত ধর্মমত থেকেই এসেছে। যে সকল সমাজ-সংস্কারকেরা জাতিভেদের সমালোচনা ও নিন্দা করেছেন তাঁরা সাধারণত ধর্ম-সংস্কারকও ছিলেন, আর তাঁদের প্রধান যুক্তি ছিল যে জাতিভেদ হতে যে বিভিন্নতা সৃষ্ট হয়েছে তা আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপন্থী, এবং ধর্ম এ-বিষয়ে যে নির্দেশ দিয়ে থাকে তা গভীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের। বৌদ্ধধর্ম জাতিভেদ-ঘটিত মণ্ডলীবদ্ধতার আদর্শ ত্যাগ করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বিশ্বজনীনতা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু স্বাভাবিক সামাজিক-জীবন ত্যাগ করা আবশ্যক হয়েছিল এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য। বৌদ্ধধর্ম জাতি-ভেদের স্থানে অন্য কোনো কার্যকরী সমাজগঠন আনতে না পারায়, জাতিভেদপ্রথা তখনকার দিনে এবং তার পরেও থেকে যায়।

প্রধান প্রধান জাতিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যায়, বর্ণাশ্রমের বাইরে যারা তাদের অর্থাৎ অস্পৃশ্যদের বাদ দিলে, প্রথমে পাই ব্রাহ্মণদের—পুরোহিত, শিক্ষক ও ধীমান ব্যক্তিদের; তারপর ক্ষত্রিয়েরা, বা রাজা ও যোদ্ধারা; পরে বৈশ্যেরা, বা বণিক, ব্যবসায়ী ও মহাজনেরা; আর শেষে পাওয়া যায় যারা কৃষি ও তদ্রূপ অন্যান্য কাজ করত সেই শূদ্রদের। সম্ভবত বিশেষভাবে সংঘবদ্ধ জাতি ছিল ব্রাহ্মণদের, অন্যদের তাতে প্রবেশলাভের উপায় ছিল না। ক্ষত্রিয়েরা প্রায়ই বিদেশীয় ও দেশীয় কেউ শক্তি-মান হয়ে উঠলে তাকে অন্তর্ভুক্ত করে নিত। বৈশ্যেরা প্রধানত ব্যবসায় ও বাণিজ্য ও মহাজনী কারবার নিয়ে থাকত, এবং অন্যান্য অনেক বৃত্তি গ্রহণ করত। শূদ্রদের প্রধান কাজ ছিল কৃষি এবং গৃহস্থদের পরিচর্যা। নূতন জাতিগঠন বন্ধ হয়নি, তা ঘটত যেমন-যেমন নূতন নূতন বৃত্তির সৃষ্টি হত, আর অন্য কারণেও ঘটেছে। কিন্তু সামাজিকক্রমে পুরাতন জাতিগুলি সকল সময়েই নূতনগুলির উপরে থাকতে চেষ্টা করত। এখনও পর্যন্ত এরূপ চলেছে। উপরের জাতিতে লোকে উপবীত ব্যবহার করে, কিন্তু হঠাৎ কোনো কোনো নিচের জাতির লোকেরা উপবীত গ্রহণ করে। এতে অবশ্য বিশেষ কোনো পার্থক্যই উপস্থিত হয়নি, কারণ প্রত্যেক জাতিই আপন আপন সীমার মধ্যে চলাফেরা করে ও আপন আপন বৃত্তি নিয়েই থাকে। উপবীত গ্রহণ করাটা মর্যাদা বৃদ্ধি করার চেষ্টা মাত্র। কখনও কখনও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যোগ্যতার জোরে রাজ-কার্যে উচ্চস্থান অধিকার করেছে, কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

সমাজগঠন ব্যাপারে সাধারণত প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিংবা লাভবান হবার প্রচেষ্টা ছিল না, এবং সেইজন্য এতে যতটা বৈষম্য উপস্থিত হতে পারত তা হয়নি। সকলের উপরে ব্রাহ্মণেরা তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও বিদ্যার জন্য গর্বিত এবং অপর ব্যক্তির দ্বারা সম্মানিত হলেও তাঁদের মধ্যে বেশি কেউ পার্থিব সমৃদ্ধির পরিচয় দিতে পারতেন না। আর বণিকেরা ধর্ম ও সাংসারিক সৌভাগ্য থাকা সত্ত্বেও মোটের উপর সমাজে বিশেষ উচ্চ-স্থান লাভ করত না।

জনসাধারণের অধিকাংশ লোকই ছিল কৃষিজীবী। সমাজব্যবস্থায় ভূস্বামী ছিল না, আর কৃষকদেরও স্বত্বাধিকার ছিল না। এখন একথা বলা শক্ত আইনত জমি ছিল কার;

কারণ স্বত্বাধিকার বিষয়ে এখন যে ব্যবস্থা চলে তখন এরূপ কিছুই ছিল না। কৃষকের অধিকার ছিল জমি চাষ করার, আর আসল প্রশ্ন ছিল উৎপন্নদ্রব্য কিরূপে বিভাগ করা হবে। কৃষক বৃহত্তর অংশ লাভ করত, রাজা কিংবা রাজশক্তি সাধারণত একষষ্ঠাংশ গ্রহণ করতেন, আর পল্লীবাসীরা যে যে মণ্ডলীর কাছ থেকে সাহায্য লাভ করত সেগুলিও তাদের প্রাপ্য অংশ পেত—যেমন পুরোহিত ও শিক্ষাব্রতী ব্রাহ্মণ, বণিক, কামার, ছুতোর, পাদুকা-প্রস্তুতকারী, কুমার, ঘরামি, নাপিত, ঝাড়ুদার প্রভৃতি। এইরূপে দেখা যায় যে একভাবে রাজশক্তি হতে আরম্ভ করে ঝাড়ুদার পর্যন্ত সকলেই কৃষিজাতদ্রব্যে অংশীদার ছিল।

সমাজে অনুন্নত ও অস্পৃশ্য জাতি ছিল, কিন্তু তারা কারা? বর্ণবিভেদের নিচের দিকে কয়েকটি জাতিকে কতকটা অনির্দিষ্টভাবেই অনুন্নত বলা হয়, অন্যান্য জাতি হতে তাদের পার্থক্য সম্বন্ধে কোনো বাঁধাবাঁধি নিয়ম নেই, তবে অস্পৃশ্যজাতি বলতে যাদের বোঝায় তাদের আমরা জানি। উত্তর-ভারতে যারা ঝাড়ুদারী অর্থাৎ অপরিচ্ছন্ন কি অশুচি কাজ করে তাদেরই অস্পৃশ্য মনে করা হয়ে থাকে, এবং এদের সংখ্যা অল্পই। ফা-হিয়েন্ লিখেছেন, যখন তিনি এদেশে আসেন তখন যারা বিষ্ঠা পরিষ্কার করত তাদেরই অস্পৃশ্য বলা হত। দক্ষিণ-ভারতে অস্পৃশ্যলোকের সংখ্যা অনেক বেশি। কেমন করে যে তারা এত বেশি সংখ্যায় দাঁড়িয়েছে তা বলা কঠিন। সম্ভবত যা কিছুকে অশুচি কাজ বলে মনে করা হত, সেসব কাজের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সকলকেই অস্পৃশ্য-রূপে বিবেচনা করা হত। পরে হয়তো ভূমিহীন কৃষিমজুরদেরও এদের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

আনুষ্ঠানিক বাহ্য পবিত্রতার ধারণা হিন্দুদের মধ্যে অসাধারণরূপে সবল দেখা যায়। এ হতে একটা ভাল এবং অনেকগুলি মন্দ ফল পাওয়া গেছে। শারীরিক পরিচ্ছন্নতা সেই ভাল ফল। সকল হিন্দুর, এমনকি অনুন্নত জাতিগুলির লোকদেরও প্রাত্যহিক স্নান একটি অবশ্য করণীয় কার্য। ভারতবর্ষ থেকেই এ-অভ্যাস ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। একজন সাধারণ হিন্দু, এমনকি অতিদরিদ্র চাষীও, তার সুমার্জিত উজ্জ্বল তৈজসপত্রের গর্ব করে। এই পরিচ্ছন্নতাবোধের ভিত্তি অবশ্য বৈজ্ঞানিক নয়, কারণ যে দিনে দুবার স্নান করে সেও হয়তো অসংকোচে অপরিষ্কৃত ও রোগবীজপূর্ণ জল পান করে। এ-বোধ সামাজিকও নয়—অন্তত এখন নয়। একজন তার নিজের কুটিরটি হয়তো পরিচ্ছন্ন রাখে, আর তার প্রতিবেশীর গৃহের সম্মুখে পল্লীপথে আবর্জনা ফেলে দেয়। পল্লীগুলি অপরিচ্ছন্ন ও আবর্জনাস্তূপে পূর্ণ। এও লক্ষ্য করা যায় যে সত্য সত্য পরিচ্ছন্নতায় তেমন আগ্রহ নেই, ধর্মাচরণের জন্য প্রয়োজন বলেই তা পালিত হয়। এই প্রয়োজন না থাকলে পরিচ্ছন্নতাও অত্যন্ত কমে যায়।

আনুষ্ঠানিক পবিত্রতার ধারণা থেকে মন্দ ফল এই হয়েছে যে মানুষ অপরকে বাইরে ঠেকিয়ে রেখেছে, স্পর্শ করাও দোষের মনে করেছে, অপরজাতির লোকের সঙ্গে পানাহারও আপত্তিকর হয়েছে। আর এই সমস্ত অভ্যাস এমন উৎকট আকার ধারণ করেছে যে জগতের আর কোথাও এমনটা দেখা যায় না। এই কারণে একদল লোককে

অস্পৃশ্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে, যেহেতু তারা এমন একটা কাজ করে, যাকে সমাজের পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক হলেও অশুচি বলে মনে করা হয়। কেবল আপন জাতির লোকের সঙ্গে পানাহার করার রীতি সকল জাতিতেই ছড়িয়ে পড়েছে। এই ব্যবহারকে সম্ভ্রমের চিহ্ন বলে গ্রহণ করা হয় এবং সেইজন্য উপরের শ্রেণী অপেক্ষা নিচের শ্রেণীতে বেশি কঠোর আকারে দেখা যায়। বাস্তবিক, উচ্চশ্রেণীতে এ রীতি ভেঙেই যাচ্ছে, কিন্তু নিম্নশ্রেণী ও অনুন্নত জাতিগুলিতে পূর্ববৎ আছে।

বিভিন্নজাতির লোকের মধ্যে পানাহার নিষিদ্ধ ছিল, আর অসবর্ণ বিবাহ ছিল আরও নিষিদ্ধ। কতকগুলি এরূপ বিবাহ অবশ্য বন্ধ করা যায়নি। এ বড় আশ্চর্য যে প্রত্যেক জাতি আপন সীমার মধ্যেই থেকে গেছে ও পুরুষানুক্রমে একইভাবে চলেছে। একটা জাতি যুগ যুগ ধরে কোনো পরিবর্তন স্বীকার করেনি, অভিন্নই থেকে গেছে, বাইরে থেকে এমন মনে হলে বুঝতে হবে দৃষ্টিতে ভুল হয়েছে; তবু জাতিভেদ বিশেষভাবে উচ্চস্তরে তার বিশিষ্টরূপ রক্ষা করে চলেছে।

নিচের দিকে কোনো কোনো দলকে জাতিভেদ ব্যবস্থার অন্তর্গত বলে মনে করা হয় না। প্রকৃতপক্ষে কোনো দলই, এমনকি অস্পৃশ্যরাও, জাতিভেদের কাঠামোর বাইরে নয়। অনুন্নত ও অস্পৃশ্যশ্রেণীর লোকেরা নিজেদের জাতি গঠন করে নেয় এবং নিজেদের পঞ্চায়েত বা জাতি-বৈঠক মনোনীত করে তাদের সমাজের সকল কাজ নিষ্পন্ন করার জন্য। কিন্তু পল্লীর সাধারণ জীবন হতে তাদের যে বাইরে ঠেকিয়ে রাখা হয় তাতে বৃহত্তর সমাজ ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।

আত্মকর্তৃত্বশীল পল্লীসমাজ ও জাতিভেদ ভারতের পুরাতন সমাজ-সংগঠনের দুইটি বিশেষ নিদর্শন। তৃতীয়টি হল একান্নবর্তী পরিবার। এ-ব্যবস্থায় পরিবারের সকলে সমবেতভাবে পারিবারিক সম্পত্তির অধিকারী, আর জীবিত থাকলেই উত্তরাধিকার লাভ হত। পিতা কিংবা অন্য কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি পরিবারের প্রধান হতেন আর তিনি অধ্যক্ষের ন্যায় বিষয়-সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করতেন, তবে রোমীয় ব্যবস্থার অনুরূপ সর্বময় কর্তা হতেন না। কোনো কোনো অবস্থায়, সকল পক্ষ ইচ্ছা করলে সম্পত্তি-বিভাগ অনুমোদিত হত। অবিভক্ত সম্পত্তি হতে কর্মী-অকর্মী নির্বিশেষে পরিবারের সকলের গ্রাসাচ্ছাদন চলত, কাজেই প্রত্যেকেই কমপক্ষে যা পাবার তা পেত, যোগ্যতা অনুসারে কারও পুরস্কারস্বরূপ বেশি কিছু পাবার উপায় ছিল না। এ যেন সকলেই বিমার সুবিধা লাভ করত, ক্ষম-অক্ষমে প্রভেদ ছিল না—যারা স্বভাবতই ক্ষীণ, শরীরে কি মনে অপটু, তাদেরও সকলের সমান প্রাপ্য ছিল। এইভাবে সকলেই যদিচ নির্বিঘ্ন ছিল, মোটের উপর পরিবারে যারা অধিক কর্মঠ তারা তাদের কাজের সমুচিত প্রতিদান পেত না, সুতরাং ভাল কাজের দাবিও কমে যেত। ব্যক্তির সুবিধা কি উচ্চাভিলাষ বিবেচনার বিষয় হত না, কেবল সমগ্র পরিবারটির কথাই ভাবা হত। এরূপ পরিবারে লালিত-পালিত হলে কেবল নিজের কথা ভাবার অভ্যাস তেমন বৃদ্ধি পেত না, বরঞ্চ সকলের দিক দেখার শিক্ষালাভ হত।

পশ্চিমের, এবং বিশেষভাবে মার্কিণের অতিশয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক সভ্যতায় ব্যক্তি-

গত উচ্চাভিলাষ উৎসাহ লাভ করে, ব্যক্তিগতভাবে সুবিধা অর্জন করা সকলের লক্ষ্য। যারা বুদ্ধিমান ও উদ্যমশীল তারা সুখ-সমৃদ্ধির অধিকারী হয়, আর যারা ভীরু, দীনচিত্ত তাদের হয় দুর্গতি। ভারতের ব্যবস্থা ছিল এর ঠিক বিপরীত। একান্নবর্তী পারিবারিক ব্যবস্থা এদেশে এখন ভেঙে যাচ্ছে এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে জীবনের আর্থিক পটভূমিকা বদলে যাচ্ছে। ব্যবহারিক জীবনে নূতন নূতন সমস্যাও দেখা দিচ্ছে।

ভারতের সমাজ-সংগঠনের তিনটি স্তম্ভই তাহলে দেখা গেল ব্যক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, প্রতিষ্ঠিত দলের, মণ্ডলীর উপর। উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক নিরাপত্তা, স্থায়িত্ব এবং মণ্ডলীর অর্থাৎ সমাজের অনুবৃত্তি। অগ্রগতি লক্ষ্যের বিষয় ছিল না, সুতরাং সেদিক থেকে ক্ষতি হত। প্রত্যেক মণ্ডলীতে—সে পল্লীসমাজে, কি কোনো কোনো বিশেষ জাতিতে, কিংবা কোনো বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারেই হোক, একটা মিলিত জীবন সকলে একসঙ্গে ভোগ করত, সাম্যের ভাব অনুভূত হত—পদ্ধতি ছিল গণতান্ত্রিক। এখনও বিশেষ-বিশেষ জাতির পঞ্চায়েতগুলি এই পদ্ধতিতে চলে। এক-একজন পল্লী-বাসীকে, এমনকি নিরক্ষর হলেও, রাজনীতি ও অন্যান্য কারণে নির্বাচিত সমিতিতে কাজ করতে অত্যন্ত ইচ্ছুক দেখে এক সময়ে আমি আশ্চর্য হয়েছি। দেখেছি, শীঘ্রই সে সমিতির কাজের ধারা ধরে নেয় এবং তার নিজের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনায় বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারে, আর এরূপ আলোচনায় সহজে তাকে দমিয়ে রাখাও যায় না। কিন্তু ছোট ছোট মণ্ডলীর একটা দোষ ছিল, প্রায়ই ঝগড়া হত, দল ভেঙে যেত।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতি যে ভারতে কেবল জানা ছিল তা নয়, সামাজিক জীবনে, স্থানীয় শাসনে, বণিক-সমিতিতে, ধর্মসম্মেলনে এবং আরও এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হত। জাতিভেদের যত দোষই থাক না, প্রত্যেক মণ্ডলীতে গণতান্ত্রিক ব্যবহার বাঁচিয়ে রেখেছিল। সভা-সমিতির কার্যক্রম, নির্বাচন ও যুক্তিতর্ক সম্বন্ধে নানারূপ বিধিনিষেধ প্রচলিত থাকত। মার্কুইস্ অফ জেট্‌ল্যান্ড্ বৌদ্ধসম্মেলন সম্বন্ধে লেখবার সময় এই বিষয়ের উল্লেখ করেছেন: "এ কথা শুনে অনেকে আশ্চর্য হবেন যে দুহাজার বছর কিংবা আরও আগে এই সকল বৌদ্ধসম্মেলনে যে সকল নিয়ম পালিত হত সেগুলি যেন আমাদের পার্লামেন্টের বর্তমান ব্যবহার বিধিরই প্রাথমিক সূত্র। সম্মেলনের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য একজন বিশেষ কর্মচারী নিয়োগ করা হত, একে আমাদের পার্লামেণ্টের হাউস্ অফ কমন্সের মিস্টার স্পীকার বা সভাপতির প্রথম রূপ বলা যেতে পারে। আর একজন কর্মচারী নিযুক্ত হতেন, তিনি দেখতেন যেন যথাপ্রয়োজন সংখ্যায় সদস্যেরা উপস্থিত থাকেন। এঁকে বর্তমানকালের প্রধান 'হুইপের' সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, কারণ তাঁরও ঐ প্রকারেরই কাজ। কোনো সদস্য সম্মেলনে কোনো কাজ উপস্থিত করার সময় প্রস্তাবের আকারে তা করতেন এবং তারপর সে-বিষয়ে আলোচনা হতে পারত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একবারেই কাজ শেষ হত, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রস্তাবটি তিনবার আনার প্রয়োজন ছিল।

এখন পার্লামেণ্টে কোনো বিধি আইনরূপে গৃহীত হবার আগে সে-সম্বন্ধে প্রস্তাবটি তিনবার উপস্থাপিত করার প্রয়োজন হয়ে থাকে। আলোচনায় মতানৈক্য দেখা গেলে এখনকার মত ভোট নিয়ে শেষ মীমাংসা করা হত, আর এ ভোট নেওয়া হত এমনভাবে যে একজনের ভোট আর একজন জানতে না পারে।"*

এখন দেখা গেল প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-গঠনের অনেক সদ্‌গুণ ছিল, আর তা না হলে এতদিন টিকে থাকতে পারত না। এই সমাজ-ব্যবস্থার সহায় ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির দার্শনিক আদর্শ। মানুষ বললেই সঙ্গে সঙ্গে বোঝাত সদাশয়তা ও শোভন ব্যবহারের অধিকারী সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি—কেবল লাভের জন্য ব্যগ্র কোনো লোককে বোঝাত না। চেষ্টাই করা হত যেন মর্যাদা, শক্তি ও অর্থ একত্র যুক্ত হয়ে জমে জমে না ওঠে—যেন এমন না হয় যে একটা হলেই বাকিগুলিও আনুষঙ্গিকরূপে সঙ্গে সঙ্গে আসবে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির কর্তব্য বিশেষ মনোযোগ লাভ করত, তাদের অধিকারের কোনো কথা ছিল না। স্মৃতিতে বিভিন্ন জাতির ধর্মের, অর্থাৎ করণীয় ও কর্তব্যের, যে তালিকা আছে তাতে অধিকারের কোনো নির্ঘণ্ট নেই। মণ্ডলীর মধ্যে, বিশেষত পল্লীতে, যাতে বাইরের উপর নির্ভর করতে না হয় সেজন্য আত্মপর্যাপ্তি লাভ করার চেষ্টা ছিল, এবং আর এক অর্থে, প্রত্যেক বর্ণের মধ্যেও এটা দেখা যেত। ব্যবস্থাটা ছিল বাইরের দিকে বন্ধ, যদিচ নিজের কাঠামোর মধ্যে কতক অভিযোজনা ও পরিবর্তন চলতে পারত, এবং অনেকটা নিরপেক্ষতা ছিল। কিন্তু এই সমাজ-ব্যবস্থা দিন দিন কঠোর হয়ে উঠছিল এবং বাইরের সঙ্গে তার যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। এইভাবে ক্রমশ এর বিস্তারলাভের শক্তি যাচ্ছিল কমে, আর নবতর মেধা, নবতর প্রতিভার আগমনও বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। প্রবল স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরা সকল প্রকার আমূল পরিবর্তনে বাধা দিত। ভিন্ন মণ্ডলীতে শিক্ষাকে প্রসারলাভ করতে দেওয়া হত না। উপরের শ্রেণীর লোকেরা অনেক কুসংস্কারকেই কুসংস্কার বলে জানত, তবু সেগুলিকে রক্ষা করা হত এবং তেমনি অনেক নূতন নূতন কুসংস্কার যোগও করা হত। দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মাত্র নয়, চিন্তাই গিয়েছিল থেমে, প্রথা হয়ে উঠেছিল প্রবল, এবং প্রসারতা ও উন্নতিলাভের পথ গিয়েছিল বন্ধ হয়ে।

পরিকল্পনায় ও প্রয়োগে, বর্ণাশ্রমে আভিজাত্যের আদর্শ লক্ষিত হয়, আর এটা যে গণতান্ত্রিকভাবের বিরুদ্ধ তা বোঝাই যায়। যারা উপরে আছে তাদের সম্মান রক্ষা করে চললে, অর্থাৎ প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় তাদের উচ্চস্থান সম্বন্ধে কোনো আপত্তি না তুললে, যে সম্মান তারা উপভোগ করত তদনুরূপ সামাজিক কর্তব্য পালন করতে তারা প্রস্তুত ছিল। উৎকর্ষ ও যশোলাভ উচ্চশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, যারা নিচের তারা কোনো সুবিধা পেত না, আর যা বা পেত তা যথেষ্ট নয়। উপরের এই লোকগুলি সংখ্যায় ছিল বৃহৎ এবং তাদেরই মধ্যে ছড়িয়ে ছিল সকল শক্তি, পদমর্যাদা এবং প্রভাব। সুতরাং তারা অনেকদিন ধরে বেশ চালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষে

* 'দি লেগাসি অফ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে অধ্যাপক রলিনসন কর্তৃক উদ্ধৃত

বর্ণাশ্রম এবং ভারতের সমাজ-গঠনের দুর্বলতা ও নিষ্ফলতার ফলে বহু মানবকে অবনত করে ফেলা হল এবং শিক্ষায়, কি সংস্কৃতিতে, কিংবা অর্থনৈতিকভাবে তাদের কোনো সুযোগ দেওয়া হল না। এই অবনতি সকল দিকে যে হীনতা নিয়ে এল তা হতে উচ্চশ্রেণীর লোকেরাও নিষ্কৃতি পায়নি। ভারতের জীবনে যে অর্থনৈতিক ও অন্য প্রকার দীনতা এসেছে তা এইজন্যই। অতীতে অন্যান্য দেশের এবং ভারতের সামাজিক বিধিব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য যে খুব বেশি ছিল তা নয়, কিন্তু জগতের সর্বত্র গত কয়েক পুরুষ ধরে যে পরিবর্তন সকল হয়েছে তাতে সেই প্রভেদ আজ অনেক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকের দিনের বিচারে, সমাজের দিক থেকে দেখলে, জাতিভেদ এবং তার সঙ্গে আর যা-কিছু চলে সবই অচল—এসব কেবল বিরোধের সৃষ্টি করে, আর গতি ও উন্নতির পক্ষে বিষম বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এর কাঠামোর মধ্যে সকলের পক্ষে সমান মর্যাদা ও সুযোগ লাভ করা অসম্ভব—রাজনৈতিক কি অর্থনৈতিক, কোনো প্রকার গণতন্ত্রই এর মধ্যে চলতে পারে না। জাতিভেদ ও গণতন্ত্রের মধ্যে যে বিরোধ তা স্বভাবজ, এই দুটির মধ্যে কেবল একটিরই টিকে থাকা ও রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

৯ : বাবর এবং আকবর : ভারতীয়করণ

পুনরায় আগেকার কালে ফিরে যাচ্ছি। আফগানেরা তখন ভারতেই বসবাস আরম্ভ করেছে এবং ভারতীয় হয়ে গেছে। তাদের নরপতিদের প্রথম কাজ হল দেশের অধিবাসীদের বিরুদ্ধতাকে কমিয়ে আনা, এবং তারপর চেষ্টা হল তাদের নিজেদের পক্ষে লাভ করা। এখন ভেবে-চিন্তে যে-নীতি তারা গ্রহণ করল তদনুসারে আপনাদের নির্মম শাসন-পদ্ধতিকে নরম করে আনল, নিজেরা সহনশীল হল, প্রজাদের কাছ থেকে সহযোগিতা চাইল, আর বিদেশী বিজেতৃদের ন্যায় ব্যবহার ত্যাগ করে এই দেশেই উপজাত ও লালিত-পালিত ভারতবর্ষীয়ের ন্যায় আচরণ করতে আরম্ভ করল। যেমন যেমন এই সব উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে আগত লোকেরা দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল ততই প্রথমে যা শাসননীতি মাত্র ছিল তা তাদের প্রকৃতিগত অভ্যাস হয়ে দাঁড়াল। যখন উপরের দিকে এইরূপ ঘটছিল তখন দেশবাসীদের মধ্যেও চিন্তায় ও জীবনযাত্রায় সংশ্লেষণের চেষ্টা জাগল। এইভাবে একটা মিশ্র সংস্কৃতির উদয় হতে লাগল। পরে আকবর যা গড়ে তুলেছিলেন এইভাবেই তার ভিত্তিপত্তন ঘটল।

আকবর ভারতীয় মুঘল-রাজপরিবারের তৃতীয় নরপতি, কিন্তু বাস্তবিক তিনিই এই সাম্রাজ্যকে সুগঠিত করেছিলেন। তাঁর পিতামহ বাবর ১৫২৬ খৃস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসন জয় করেন, কিন্তু তিনি ছিলেন ভারতে নবাগত, মনে মনে জানতেন যে তিনি বিদেশী। তিনি এসেছিলেন উত্তরদেশ হতে। মধ্য এশিয়ায় তাঁর নিজের দেশে তখন তৈমুরীয় নবযুগ-অভ্যুদয় চলছিল ও ইরানের শিল্প ও সংস্কৃতি ছিল প্রবল। সেখানে ছিল প্রীতিপূর্ণ সামাজিক জীবন, আলাপ-আলোচনার আনন্দ, ইরান ও বোগ্‌দাদ থেকে আগত সুরুচিপূর্ণ জীবনাদর্শ ও স্বাচ্ছন্দ্য। তিনি এগুলির অভাব অনুভব

করছিলেন। তাঁর চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল পার্বত্য উত্তরদেশের তুষারের জন্য, ফারঘনার ভোজ্য, ফুল ও ফলের জন্য। তবু হিন্দুস্থানে এসে যদিচ তিনি নৈরাশ্য অনুভব করেছিলেন, বলে গেছেন যে এ বড় সুন্দর দেশ। ভারতে আগমনের চার বছরের মধ্যেই বাবরের মৃত্যু হয়। এখানে যতদিন বেঁচেছিলেন তার অধিকাংশই তাঁর কেটেছিল যুদ্ধ-বিগ্রহে, আর আগ্রায় এক অত্যাশ্চর্য রাজধানীর রচনায়। এই কাজের জন্য তিনি কন্স্টান্টিনোপ্ল্ হতে একজন স্থপতিকে আনিয়েছিলেন। এটা ছিল সমারোহপ্রিয় সুলেমানের সময়, যখন কন্স্টান্টিনোপ্লে বহু সুন্দর সুন্দর সৌধ গঠিত হচ্ছিল।

বাবর ভারতবর্ষের বিশেষ কিছুই দেখেননি। তিনি তখন শত্রুভাবাপন্ন লোকেদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন বলে অনেক কিছুই তাঁর দৃষ্টিতে পড়েনি। তবু তাঁর বিবরণে উত্তর-ভারতে সাংস্কৃতিক পতনের কথা বলে গেছেন। অংশত তৈমুরের আক্রমণ ও ধ্বংসলীলা, আর অংশত বিদ্বান ব্যক্তি ও শিল্পীদের দক্ষিণ দেশে চলে যাওয়ার জন্য এটা ঘটেছিল। তা ছাড়া ভারতীয়দের সৃষ্টি-প্রতিভা শুষ্ক হয়ে যাওয়া এর অন্যতম কারণ। বাবর বলেছেন যে নিপুণ কারিগর ও শ্রমিকের অভাব ছিল না, কিন্তু কৌশলের পরিচয় পাওয়া যেত না, এবং যান্ত্রিক উদ্ভাবনার অভাব হয়েছিল। জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখে ভারতবর্ষ ইরান অপেক্ষা অনেক পিছিয়ে ছিল। বলতে পারি না এইপ্রকার জীবনের প্রতি ভারতীয়দের আগ্রহ ছিল না বলেই এরূপ ঘটেছিল, কি অন্য কারণ ছিল। আগ্রহ থাকলে এসব ইরান থেকে আসতে পারত, কারণ ইরান ও ভারতের মধ্যে আদান-প্রদান প্রায়ই ঘটত। সংস্কৃতি-বিষয়ে ভারতের কঠোরতা ও পতনই এর কারণ বলে মনে হয়। প্রাচীন সাহিত্য ও চিত্র হতে জানা যায় যে আগেকার দিনে, ভারতে জীবন-পরিচালনার আদর্শ, সে-সময়ের তুলনায়, উচ্চ ও জটিল ছিল। এমনকি বাবর যখন উত্তর-ভারতে এলেন তখন দক্ষিণের বিজয়নগর সম্বন্ধে অনেক ইউরোপীয় ভ্রমণকারী বলেছেন যে সেখানে শিল্প, সংস্কৃতি, সুরুচি ও বিলাসিতার আদর্শ খুব উচ্চশ্রেণীর ছিল।

কিন্তু উত্তর-ভারতে সাংস্কৃতিক ক্ষয় স্পষ্টই দেখা যায়। অপরিবর্তনীয় ধর্মমত ও কঠোর সামাজিক গঠনের জন্য কোনো নূতন চেষ্টা কি অগ্রগতি সম্ভব হয়নি। ইসলামীয় ও বিভিন্ন প্রকার জীবন ও চিন্তায় অভ্যস্ত বহু বিদেশীর আগমনে এখানকার মত ও সামাজিক ব্যবস্থা নাড়া পেল। এক বিষয়ে কিন্তু বিদেশীদের দ্বারা বিজিত হওয়ায় উপকার দর্শে—দেশবাসীর মানসিক পরিধি এতে বৃদ্ধি পায়, তারা আপনাদের খোলের বাইরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে বাধ্য হয়। তখন অনুভব করে যে জগৎকে তারা যা মনে করেছিল ঠিক তা নয়—জগৎ অনেক বড় ও বিচিত্র। আফগানদের দ্বারা বিজিত হওয়ায় এদেশে অনেক পরিবর্তন এসেছিল। তারপর মুঘলেরা এল। তারা আফগানদের অপেক্ষা সংস্কৃতিতে ছিল উচ্চ, এবং তাদের জীবনও ছিল উন্নত, সুতরাং তারাও ভারতে অনেক পরিবর্তন আনল। বিশেষভাবে ইরানের সুপরিজ্ঞাত ও সুরুচিসম্মত অনেক বিষয় ভারতে এসে উপস্থিত হওয়ায় রাজসভায় নানা কৃত্রিমতাপূর্ণ আচরণ এসে পড়ে, এবং দেশের সম্ভ্রান্ত লোকদের জীবন বদলে যায়।

দাক্ষিণাত্যের বাহমনিরাজ্য কালিকটের মধ্যে দিয়েই ইরানের সংস্পর্শে এসেছিল।

নূতন ভাবের আগমনে ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে—তার শিল্প, স্থাপত্য ও অন্যান্য বিষয়ে, অনেক নূতনত্ব এসেছিল। তবে এ-সমস্ত দুটি পুরাতন কালের সাংস্কৃতিক ধারার সংস্পর্শের ফল, আর এই দুই ধারা তার আগেই তাদের জীবনীশক্তি ও সৃষ্টি-শক্তি হারিয়ে ফেলায় অনেকটা অনমনীয় আকার ধারণ করেছিল। বহু পুরাতন ভারতীয় সংস্কৃতি তখন যেন শ্রান্ত হয়ে পড়েছে; আরব-পারস্য সংস্কৃতি অনেককাল আগেই তার মধ্যদিন উত্তীর্ণ হয়েছে। আরবদের মধ্যে কৌতূহল ও নূতন নূতন বিষয়ে চিন্তা করার উৎসাহ তখন আর বড় একটা দেখা যেত না।

বাবরের মধ্যে চিত্তাকর্ষক অনেক গুণই ছিল। তিনি যেন নবযুগ-অভ্যুদয়ের উপযুক্ত এক রাজপুত্র—সাহসী, দূরদেশে প্রতিষ্ঠালাভে উদ্যোগী, শিল্প ও সাহিত্য-প্রিয় এবং সুখময় জীবনে অভিলাষী। তাঁর পৌত্র আকবর তাঁর অপেক্ষাও উচ্চতর সদ্গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন ভীতিশূন্য সাহসী পুরুষ, অসাধারণ সেনানায়ক, কিন্তু তবু ধীর ও দয়ালু—একদিকে আদর্শবাদী, আবার অদ্ভুত কর্মী ও এরূপ গুণবান নায়ক যে সকলের আন্তরিক অনুরক্তি তিনি আকর্ষণ করতেন। যোদ্ধারূপে তিনি ভারতের বহুবিস্তৃত অংশ জয় করেছিলেন, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ছিল অন্য প্রকার জয়ের উপর—তিনি চেয়েছিলেন লোকের অন্তর জয় করতে। তাঁর সভায় যে পর্তুগীজ জেজুইট ধর্ম-প্রচারকেরা ছিলেন তাঁরা আকবর সম্বন্ধে বলে গেছেন যে তাঁর দৃষ্টি ছিল সমুদ্রের উপর সূর্য-কিরণের ন্যায় সদা কম্পিত, গতিশীল। পূর্বে যে একতাবদ্ধ ভারতের কথা মানুষের চিন্তায় দেখা দিয়েছিল, আকবরের মধ্যে তার পুনঃ প্রকাশ দেখা গেল। এ-একতা কেবল রাজনৈতিক নয়, ভারতের সকল লোকের মিশে এক হয়ে যাওয়াই তাঁর লক্ষ্য ছিল। ১৫৫৬ খৃস্টাব্দ হতে তাঁর প্রায় পঞ্চাশ বছর ব্যাপী দীর্ঘ রাজত্বকালে তিনি এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য চেষ্টা করে গেছেন। অনেক রাজপুত সামন্ত অন্য কারও কাছে মাথা নত করতেন না, কিন্তু আকবর তাদের অন্তর জয় করে-ছিলেন। তিনি এক রাজপুত রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর উত্তরাধিকারী জেহাঙ্গীরের দেহে অর্ধেক মুঘল ও অর্ধেক রাজপুত রক্ত ছিল। জেহাঙ্গীরের পুত্র সাহাজাহানের মাতাও রাজপুত রমণী ছিলেন। এইরূপে এই তুর্কি-মুঘল রাজবংশ তুর্কি কি মুঘল অপেক্ষা অধিকতর ভারতীয় হয়ে উঠেছিল। আকবর রাজপুতদের গুণগ্রাহী ছিলেন, তাঁদের আত্মীয় বলে মনে করতেন এবং বিবাহসূত্রে তাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধবদ্ধ হয়ে আপন রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলেন। এই মুঘল-রাজপুত যোগ অনেক-দিন চলেছিল বলে কেবল রাজ্যশাসন কি সৈন্যবিভাগে পরিবর্তন এসেছিল তা নয়, শিল্প, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রাও পরিবর্তিত হয়েছিল। সম্ভ্রান্ত মুঘল লোকেরা ক্রমে ক্রমে ভারতীয় হয়ে গিয়েছিল এবং রাজপুতেরা পারস্য সংস্কৃতির প্রভাব লাভ করেছিল।

আকবর অনেককেই নিজের দিকে টেনে এনেছিলেন ও তাঁদের বন্ধুত্বও রক্ষা করে-ছিলেন, কিন্তু মেবারের রানা প্রতাপের অসাধারণ বীরত্ব দমন করতে পারেননি। রানা

প্রতাপ এই বিদেশীর কাছে এমনকি নাম-মাত্র বশ্যতা স্বীকার করা অপেক্ষা সর্বদা পশ্চাদ্ধাবিত হয়ে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোও বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেছিলেন।

আকবর আপনার চারদিকে, তাঁর প্রতি, ও তাঁর আদর্শে অনুরক্ত, বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে একত্র করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে আমরা পাই, ফৈজি ও আবুল ফজল্ দুই ভাই, বীরবল, রাজা মানসিংহ এবং আব্দুর রহিম খান্‌খানা। তাঁর রাজসভা সকল ধর্মের লোকের, এবং যাঁরাই কিছু নূতন মত প্রচার করেছেন কিংবা নূতন কিছু উদ্ভাবন করেছেন তাঁদের, মিলনের স্থান হয়ে উঠেছিল। তিনি সকল প্রকার ধর্মবিশ্বাস ও মত সম্বন্ধে এতই উদারতা দেখাতেন যে তা গোঁড়া মুসলমানদের ক্রোধের কারণ হয়েছিল। এ-বিষয়ে তিনি আরও অগ্রসর হয়ে সংশ্লেষণের সাহায্যে সকলের উপযোগী একটা ধর্মমত খাড়া করবার প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁরই রাজত্বকালে উত্তর-ভারতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগবন্ধন অনেকটা অগ্রসর হয়, এবং তিনি স্বয়ং হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সমভাবে প্রিয় হয়ে ওঠেন। এইরূপে মুঘল রাজবংশ ভারতের আপন হয়ে স্থিতি লাভ করেছিল।

১০ : যান্ত্রিক অগ্রগতি ও সৃষ্টিশক্তি বিষয়ে এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে পার্থক্যের আলোচনা

আকবরের মন ছিল কৌতূহলে পূর্ণ—তিনি সকল সময়েই আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় বিষয়ে কোথায় কি আছে তা জানার জন্য প্রয়াসী ছিলেন। যন্ত্রাদিতে এবং যুদ্ধ-বিজ্ঞানে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি যুদ্ধের জন্য শিক্ষিত হাতিকে বিশেষভাবে মূল্যবান মনে করতেন এবং এরূপ হাতি তাঁর সৈন্যবিভাগে অনেক ছিল। তাঁর রাজসভার জেজুইট ধর্মযাজকেরা লিখেছেন, 'তিনি বহু বিষয়ে জ্ঞানলাভ করার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং তার ফলে তিনি যে কেবল রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন তা নয়, বহু যান্ত্রিক বিষয়ও তাঁর জানা ছিল। ক্ষুধিত ব্যক্তি যেমন এক গ্রাসে আহার্য বস্তু নিঃশেষ করতে চায় তিনিও তেমনি জ্ঞানলাভের প্রবল আগ্রহে সকল বিষয় অবিলম্বে জানবার চেষ্টা করতেন।'

এও আবার আশ্চর্য যে তাঁর কৌতূহল হঠাৎ থেমে যেত এবং অনেক বিষয়ের পথ খোলা পেয়েও তিনি অগ্রসর হতেন না। তিনি বিরাট সমারোহপ্রিয় মুঘলের আখ্যা পেলেও, এবং স্থলে শক্তিমান হলেও. জলপথে শক্তিহীনই ছিলেন। ১৪৯৮ খৃস্টাব্দে ভাস্কোডাগামা কালিকটে পেঁছান। আলবুকার্ক ১৫১১ খৃস্টাব্দে মালাক্কা জয় করেন এবং ভারত মহাসাগরে পোর্টুগীজ সামুদ্রিকশক্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। ভারতের পশ্চিম উপকূলে গোয়া পোর্টুগালের অধীন হয়। কিন্তু এততেও আকবরের সঙ্গে পোর্টুগালের সাক্ষাৎভাবে যুদ্ধ বাধেনি। ভারত হতে জলপথে তীর্থযাত্রীরা মক্কায় যেত, এবং তাদের মধ্যে অনেক সময় রাজপরিবারের ও সম্ভ্রান্তবংশীয় লোক থাকত। অনেক সময় পোর্টুগীজেরা এদের আটক করে মুক্তিশুল্ক আদায় করত। এই সব থেকে বোঝা

যায় যে আকবর স্থলপথে যতই শক্তিমান থাকুন, জলপথে পোর্টুগীজেরাই ছিল প্রভুত্ব-শালী। অবশ্য বোঝা যায় যে কোনো মহাদেশের অন্তর্গত রাজশক্তি জলপথের শক্তিলাভ করতে তেমন তৎপর হয় না, কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক, অতীতে ভারত যে এতই গৌরব লাভ করেছিল তা অংশত ছিল জলপথে তার প্রভুত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার জন্য। অবশ্য আকবরকে একটি বিশাল মহাদেশ জয় করার কাজে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল, পোর্টু-গীজদের প্রতি মনোযোগ দেবার মত সময় তাঁর ছিল না, আর যদিচ মাঝে মাঝে তারা তাঁকে পীড়া দিত, তিনি তাতে কোনো গুরুত্ব আরোপ করতেন না। একবার তিনি জাহাজ প্রস্তুতের কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু সে নৌ-শক্তি গঠনের উদ্দেশ্যে ততটা নয়, যতটা আমোদ লাভের জন্য।

এছাড়া, গুলি-বারুদ-কামানের জন্য মুঘল সৈন্য-বিভাগ, এবং তখনকার দিনের অন্যান্য রাজ্যগুলির সৈন্যবিভাগও বিদেশীয়দের, বিশেষত অটোমান তুর্কিদের, উপর নির্ভর করত। এই সকলের অধ্যক্ষ রুমি খাঁ উপাধি পেতেন। তখনকার দিনের পূর্ব-রোম বা কন্স্টান্টিনোপ্‌ল্‌কে রুম বলা হত। এই সকল বিদেশী বিশেষজ্ঞেরা স্থানীয় লোকদের শিক্ষা দিত; কিন্তু প্রশ্ন এই যে আকবর কি অপর কেউ কেন নিজের লোকদের বিদেশে পাঠিয়ে শিখিয়ে আনেননি, অথবা এই বিষয়ের গবেষণায় উৎসাহ দান করেননি।

আরও একটা কথা এই যে জেজুইটরা আকবরকে একখানি ছাপা বাইবেল গ্রন্থ এবং সম্ভবত দু'একখানি অন্য গ্রন্থও উপহার দিয়েছিলেন, কিন্তু তবু কেন তিনি ছাপার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেননি একথা জিজ্ঞাসার বিষয়। ছাপার কাজ হতে রাজ্য-শাসন ব্যাপারে ও অনেক প্রচেষ্টায় তিনি যথেষ্ট সাহায্য পেতে পারতেন।

তারপর ঘড়ির কথা। মুঘল সম্ভ্রান্ত লোকেদের কাছে ঘড়ির খুব আদর ছিল। প্রথমে পোর্টুগীজেরা ও পরবর্তীকালে ইংরাজেরা ইউরোপ হতে এগুলি এনেছিল। এই সব ঘড়ি ধনীদের শখের দ্রব্যরূপে আদর পেত, সাধারণ লোকেরা সূর্য-ঘড়ি কিংবা বালু ও জলের ঘড়িতে কাজ চালাত। এই সকল 'স্প্রীং'-ওয়ালা ইউরোপীয় ঘড়ি কিরূপে প্রস্তুত হয় তা জানার কিংবা এদেশে তৈরি করার চেষ্টা হয়নি। এদেশে উচ্চশ্রেণীর কারিগর ছিল কিন্তু যন্ত্র প্রস্তুত সম্বন্ধে আগ্রহের অভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

এই কালে কেবল ভারতেই যে সৃষ্টি ও উদ্ভাবনা-শক্তি নিষ্ক্রিয় হয়েছিল তা নয়, সমগ্র পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় এ দৌর্বল্য আরও অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। চীন সম্বন্ধে ঠিক জানি না, কিন্তু আমার মনে হয় এই নিষ্ক্রিয়তা চীনকেও আক্রমণ করেছিল। মনে রাখতে হবে যে, পূর্বকালে ভারত ও চীন উভয় দেশেই বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে অনেক উন্নতিলাভ ঘটেছিল। জাহাজনির্মাণ ও সমুদ্রপথে সুবিস্তৃত বাণিজ্য যান্ত্রিক উদ্ভাবনায় উৎসাহের কারণ হয়েছিল ও এ-বিষয়ে উন্নতিও ঘটেছিল। এও সত্য যে, এই কালে, এই সমস্ত এবং অন্যান্য কোনো দেশে গুরুত্বপূর্ণ কোনো যান্ত্রিক উন্নতি ঘটেনি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে, এই দিকের বিচারে, পৃথিবীর অবস্থা পূর্ববর্তী হাজার কি দুহাজার বছরের অবস্থা হতে অন্যরূপ ছিল না।

ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রাথমিক অনুশীলন কতক পরিমাণে ঘটেছিল আরবদের দ্বারা। আর মধ্যযুগের সেই কালে যখন ইউরোপে কোনো উন্নতি ঘটেনি, তখন অনেক বিষয়ে আরবেরা প্রগতির পরিচয় দিয়েছিল; কিন্তু তারাও আবার পিছিয়ে পড়ে। শোনা যায় যে প্রথমদিকের অনেক ঘড়ি আরবেরা সপ্তম শতাব্দীতে নির্মাণ করেছিল। দামাস্কাসে একটি প্রসিদ্ধ ঘড়ি ছিল এবং হারুন অল্-রসিদের সময়ে বোগ্দাদেও এরূপ একটি ছিল। কিন্তু আরবদের অবনতির কালে এই শিল্প ঐ সকল দেশ হতে লোপ পায়, যদিচ কোনো কোনো ইউরোপীয় দেশে এর উন্নতি হচ্ছিল এবং ঘড়ি সেসমস্ত দেশে আর দুর্লভ বস্তু বলে বিবেচিত হত না।

ইংলণ্ডে ছাপার কাজের প্রবর্তক ক্যাক্স্টনের অনেক আগে স্পেনের মুর-আরবেরা কাঠের ফলকের সাহায্যে ছাপার কাজ করত।* রাজশক্তির হুকুমগুলির অনেক নকল প্রস্তুত করার জন্য রাজ-দপ্তর হতে এ-কাজ করা হত। খোদিত কাষ্ঠফলক হতে ছাপা ছাড়া এ-কাজ আর অধিকদূর অগ্রসর হয়নি, আর তাও লোপ পেয়েছিল। অটোমান তুর্কিরা অনেককাল ধরে ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ায় প্রবলতম শক্তি হয়ে ছিল, কিন্তু তারাও ছাপার কাজে মনোযোগ দেয়নি, যদিচ তাদেরই দুয়ারের পাশে ইউরোপে তখন বহুসংখ্যক ছাপা বই প্রস্তুত হচ্ছিল। তারা নিশ্চয়ই এর কথা জানত, কিন্তু এই গুরুত্ব-পূর্ণ উদ্ভাবনাটি ব্যবহার করতে আগ্রহ অনুভব করেনি। অংশত ধর্মসংস্কারও একটা বাধা হয়েছিল, কারণ তাদের ধর্মপুস্তক কোরান ছাপা হলে ধর্মের মর্যাদার হানি হবে বলে বিবেচনা করা হত। ছাপা কাগজ অসম্মানকরভাবে ব্যবহৃত হতে পারে, পদদলিত কিংবা আবর্জনাস্তূপে প্রক্ষিপ্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হত। নেপোলিয়নই সর্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র মিশরে নিয়ে যান এবং সেখান থেকে এ যন্ত্রের ব্যবহার খুব ধীরে অন্যান্য আরবীয় দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে।

এশিয়া যখন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ল—অতীতের নানা প্রচেষ্টার পর শ্রান্তিতে যখন এলিয়ে পড়েছে—তখন অনেক বিষয়ে অনুন্নত ইউরোপ গুরুতর পরিবর্তনের সম্মুখীন হল। এক নূতন প্রবর্তনা এসে পড়েছে, শক্তির নব নব উন্মেষ দেখা দিয়েছে। ইউরোপ পাঠাতে লাগল মহাসমুদ্রের পরপারে তার প্রচেষ্টাশীল ব্যক্তিদের; তার চিন্তা-শীল ব্যক্তিদের চিন্তা নূতন নূতন ধারায় প্রবাহিত হল। 'রেনেসাঁস' বা নবযুগের অভ্যুদয়ে বৈজ্ঞানিক উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই হয়নি, বরঞ্চ তাতে মানুষের মন বিজ্ঞান থেকে ফিরেই গিয়েছিল, কারণ এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে পুরাতন সাহিত্যের প্রাচীনপন্থী শিক্ষা প্রচলিত হয়েছিল তাতে সুপরিজ্ঞাত বৈজ্ঞানিক ধারণা-গুলিরও প্রসার বাধাক্রান্ত হয়। শোনা যায় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েও

* বলতে পারি না এরূপ ছাপার কাজ কেমন করে স্পেনে আরবদের কাছে পৌঁছেছিল। সম্ভবত চীনের মোঙ্গোলদের মারফত গিয়েছিল, উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপে পৌঁছাবার আগেই। কর্ডোবা হতে কাইরো, দামাস্কাস ও বোগ্দাদ পর্যন্ত সমগ্র আরব জগৎ তখন, মোঙ্গোলদের অভ্যুদয়ের পূর্বেই, চীনের সংস্পর্শে এসেছিল।

অধিকাংশ শিক্ষিত ইংরাজ পৃথিবীর আহ্নিক গতি কি সূর্যের চারিদিকে তার বার্ষিক গতির কথা, কোপারনিকাস, গ্যালিলিয়ো এবং নিউটনের আবিষ্ক্রিয়া এবং উন্নত দূরবীণ প্রস্তুত হওয়া সত্ত্বেও, অগ্রাহ্য করত। গ্রীক ও ল্যাটিন প্রাচীন সাহিত্যে শিক্ষা-লাভ করে তারা টোলেমির পৃথ্বীকেন্দ্রিক বিশ্বের কথাই ধরে বসে ছিল। মিস্টার ডব্লিউ. ই. গ্ল্যাড্স্টোন ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, এবং বহু বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল, কিন্তু তিনিও বিজ্ঞান বুঝতেন না, এবং এর প্রতি আকৃষ্টও হননি। এখনও অনেক রাজনীতিজ্ঞ ও জনসেবী আছেন (কেবল ভারতে নয়) যাঁরা বিজ্ঞান কি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না, যদিচ এমন একটা জগতে তাঁরা বাস করছেন যা আজ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বিজ্ঞানের ব্যবহারের দ্বারা, আর তাঁরা নিজেরাও এই বিজ্ঞানেরই সাহায্যে বহু হত্যা ও ধ্বংসকার্য করে চলেছেন।

যাই হোক, রেনেসাঁস বা নবযুগের অভ্যুদয়ে ইউরোপে মানুষের মন অনেক শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েছে, এবং অনেক সংস্কার যা যত্নে রক্ষিত হয়ে আসছিল, তাও গেছে। এটা এই অভ্যুদয়ের জন্য অংশত এবং পরোক্ষভাবেই ঘটুক, কিংবা এ-সত্ত্বেই ঘটুক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বাস্তব জগৎ বিষয়ে জিজ্ঞাসার ভাব তখন জাগ্রত হয়েছে, কেবল যে পুরা-তন বিধিব্যবস্থায় আপত্তি তোলা হয়েছে তা নয়, সকল প্রকার কাল্পনিক ও অস্পষ্ট বিষয়েই আপত্তি দেখা যায়। ফ্রান্সিস্ বেকন্ লিখেছিলেন, 'মানুষের শক্তিলাভের ও জ্ঞানলাভের পথ দুটি আছে পাশাপাশি, এবং একই প্রকারের, তবু ভাবাত্মক বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত থাকার ক্ষতিকর অভ্যাস অদমনীয় রূপে এতই দেখা যায় যে বিজ্ঞানকে ব্যব-হারিক বিষয় সকলের ভিত্তিতে গড়ে তোলাই তার পক্ষে নিরাপদ, কারণ তাহলে তার চিন্তনীয় অংশেও ব্যবহারিক অংশের ছাপ পড়তে পারে।' তাঁর পরে, সপ্তদশ শতাব্দীতে, স্যার টমাস ব্রাউন্ বলে গেছেন, 'জ্ঞানের মারাত্মক শত্রু এবং যা সত্যকে সর্বাপেক্ষা অধিক আঘাত করেছে তা হল বিনাদ্বিধায় আপন মতামতের উপর অপরের প্রভুত্ব স্বীকার করা। বিশেষভাবে প্রাচীনকালের নির্দেশের ভিত্তিতে মত ও বিশ্বাস গড়ে নেওয়ায় আমাদের বহু ক্ষতি হয়েছে। যাঁদের বুদ্ধি আছে তাঁরা বুঝতে পারেন যে এখানকার অধিকাংশ লোকই এরূপ কুসংস্কারাপন্ন হয়ে পুরাতনকালের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে থাকে যে তার প্রভাব বর্তমানকালের যুক্তিযুক্ততাকেও হারিয়ে দেয়। তখনকার কালের লোকেরা আমাদের হতে বহু দূরে কালে জীবিত ছিল। এখন হলে, বর্তমান অথবা নিকট ভবিষ্যতের কেউই অবাধে তাদের কাজগুলিকে ঘটতে দিত না; কিন্তু তারা কালের দূরত্ব হেতু ঈর্ষারও সীমার বাইরে। কালে তারা যতই দূরে ততই যেন তারা সত্যের কাছাকাছি, অনেকের ভাবটা এইরূপ। এই সব থেকে মনে হয় আমরা স্পষ্টত নিজেদের প্রবঞ্চিত করে চলি, এবং সত্যপথ থেকে দূরে চলে যাই।'

আকবর ষোড়শ শতাব্দীর লোক, আর এই ষোড়শ শতাব্দীতেই ইউরোপে বলগণিত জন্মলাভ করে এবং তাতে মানবজীবনে যেন একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসে পড়ে। এই আবিষ্ক্রিয়ার পর ইউরোপ উন্নতিলাভ করতে থাকে, প্রথম প্রথম ধীরে, কিন্তু ক্রমশই তার বেগভার বেড়ে ওঠে, আর ঊনবিংশ শতাব্দীতে আশ্চর্য উন্নতি করে একটা

নূতন জগৎ গড়ে তোলে। যে-কালে ইউরোপ নৈসর্গিক শক্তি-সকলের সুবিধা গ্রহণ করে সমৃদ্ধির সৃষ্টি করছিল, এশিয়া অচল ও নিষ্ক্রিয় থেকে তার পুরাতন পদ্ধতিতে মানুষের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে চলছিল।

এরূপ কেন হয়েছিল? এশিয়া এত বৃহৎ যে এ-প্রশ্নের একটা মাত্র উত্তর হয় না। প্রত্যেক দেশটি, বিশেষত চীন এবং ভারতবর্ষের মত সুবৃহৎ দেশগুলি সম্বন্ধে, পৃথক পৃথক ভাবে বিচার করা আবশ্যক। সে-সময়ে এবং পরেও চীন অবশ্য ইউরোপীয় যে-কোনো দেশ অপেক্ষা অনেক উচ্চতর সংস্কৃতি-সম্পন্ন ছিল, এবং তার জীবনযাত্রাও ছিল উন্নততর। ভারতবর্ষ বাহ্যত কেবল যে জাঁকজমকপূর্ণ রাজসভার পরিচয় দিত তা নয়, সমৃদ্ধ ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল এবং শ্রমশিল্প ও কারুশিল্পেও প্রভূত উন্নতি করেছিল। তখন কোনো ভারতীয় ব্যক্তি ইউরোপ গেলে সেখানকার দেশগুলিকে অনেক বিষয়ে অনগ্রসর ও অমার্জিত বলে মনে করতে পারত। তবু যে প্রবল কর্মশক্তি ইউরোপে প্রকাশ পেতে লাগল ভারতে তার কোনো চিহ্নই দেখা যায়নি।

একটা সভ্যতার যে পতন ঘটে তা যতটা আভ্যন্তরীণ ক্ষয়ের জন্য হয় ততটা বাইরের আক্রমণের জন্য হয় না। এই পতন হতে পারে দুটো কারণে। যখন এর যা কিছু দেবার থাকে তা দেওয়া হয়ে যায়, এই দ্রুত পরিবর্তমান জগতে আর কিছুই দেবার থাকে না, কিংবা দেশের কর্তৃত্ব যাদের হাতে তারা যখন ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং যোগ্যতার সঙ্গে দেশের দায়িত্ব বহন করতে পারে না। এমনও হয় যে, সভ্যতাটির সামাজিক দিক এমন যে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর সমাজই একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়, এবং এই বাধা দূর না হওয়া পর্যন্ত কিংবা সেই সভ্যতায় বিশেষ কোনো পরিবর্তন না আসা পর্যন্ত আর অগ্রগতি সম্ভব হয় না। তুর্কি ও আফগান আক্রমণ হওয়ার আগেই ভারতীয় সভ্যতায় ক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল। পুরাতন ভারতের সঙ্গে এই সকল আক্রমণকারীদের এবং তাদের নূতন নূতন ভাবের সংঘর্ষে ধীশক্তির বন্ধন কি মোচন হয়েছিল ও নব নব শক্তি কি নব নব কর্মক্ষেত্রে মুক্তিলাভ করেছিল?

কতকটা ঘটেছিল নিশ্চয় এবং শিল্প ও স্থাপত্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীত, এবং জীবনযাত্রায় পরিবর্তন ঘটেছিল। কিন্তু এই পরিবর্তন তেমন গভীর হয়নি—অনেকটা উপরে উপরেই ছিল এবং সামাজিক সংস্কৃতিও পূর্ববৎই থেকে গিয়েছিল। কোনো কোনো দিকে বাস্তবিক অধিকতর কঠোর হয়েছিল। আফগানেরা প্রগতির কোনো সূত্র আনেনি, কারণ তারা ছিল অনুন্নত সামন্ততান্ত্রিক গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের লোক। ইংলন্ডের ন্যায় ভারতবর্ষ সামন্ততান্ত্রিক ছিল না, কিন্তু রাজপুত বংশগুলি ছিল ভারতের আত্মরক্ষা ব্যাপারে মেরুদন্ডস্বরূপ, এবং এগুলি এক প্রকার সামন্ততান্ত্রিকভাবে গঠিত ছিল। মুঘলেরা আংশিক ভাবে মাত্র সামন্ততান্ত্রিক ছিল, কিন্তু তাদের কেন্দ্রটিতে ছিল প্রবল রাজতন্ত্র। এই রাজতন্ত্র রাজপুতনার সামন্ততন্ত্রের উপর প্রভুত্বলাভ করেছিল।

আকবর যদি তাঁর স্বভাবত আগ্রহ ও কৌতূহলপূর্ণ মন সমাজের দিকে ফিরাতেন, এবং জগতের অন্যান্য অংশে কি ঘটছে তা জানতে চাইতেন, তাহলে তিনি সামাজিক

পরিবর্তনের সূত্রপাত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি আপন সাম্রাজ্য দৃঢ়নিবদ্ধ করতে অত্যধিক ব্যস্ত ছিলেন, আর তাঁকে যে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা হল কেমন করে ইসলামের ন্যায় প্রচারশীল ধর্মকে দেশবাসীর ধর্ম ও সামাজিক ব্যবহারের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা যায়। তিনি যুক্তির পথে ধর্মের ব্যাখ্যা করে তখনকার মত দেশের চেহারা আশ্চর্যরকম ফিরিয়ে দিয়েছিলেন বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু এই অপরোক্ষ এখানেও সফল হয়নি, যেমন অন্য কোথাও হয়নি।

এইরূপে আকবরও ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থায় কোনো মূলগত পরিবর্তন আনতে পারেননি, আর যা বা বাহ্য পরিবর্তন ও মানসিক চেষ্টার প্রসারতা এনেছিলেন তাও তাঁর মৃত্যুর পরেই থেমে যায়, এবং ভারতবর্ষ পুনরায় তার অনড়, অপরিবর্তনশীল জীবনপথে চলতে থাকে।*

১১ : সাংস্কৃতিক ঐক্যের উন্নয়ন

আকবর তাঁর সাম্রাজ্য-সৌধ এমন করে গড়েছিলেন যে তাঁর পরবর্তী মুঘল নরপতিদের অক্ষমতা সত্ত্বেও সে সাম্রাজ্য আরও একশো বছর টিকে ছিল। প্রত্যেক মুঘল নরপতির রাজ্যাবসানে রাজপুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের জন্য যুদ্ধ ঘটত এবং তাতে কেন্দ্র-শক্তি

* আবুল ফজল্ বলেন যে আকবর কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারের কথা শুনেছিলেন। পরবর্তী সম্রাট জেহাঙ্গীরের সময়ে আমেরিকা হতে ইউরোপ হয়ে তামাক ভারতবর্ষে এসেছিল। এর ব্যবহার দমন করার জন্য জেহাঙ্গীরের চেষ্টা সত্ত্বেও তা আশ্চর্যরূপে দ্রুত প্রসারলাভ করে।

সমগ্র মুঘল রাজত্বকালে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের বিশেষ সংযোগ ছিল; আর এই সংযোগ রাশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত আদান-প্রদান যে চলত তাও জানা যায়। একজন রাশিয়ান বন্ধু তাঁদের দেশের নথিপত্রে এই বিষয়ের উল্লেখের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ১৫৩২ খৃস্টাব্দে খোজা হুসেন নামে সম্রাট বাবরের প্রেরিত দূত বন্ধুত্বসন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে মস্কোতে গিয়েছিলেন। জার মাইকেল ফেডোরোভিচের রাজত্বকালে (১৬১৩-১৬৪৫) ভারতীয় বণিকেরা ভলগা নদীর তীরে বসবাস আরম্ভ করে। ১৬২৫ খৃস্টাব্দে সামরিক শাসনকর্তার আদেশে অ্যাস্ট্রাখানে ভারতীয়দের জন্য একটি সরাই নির্মিত হয়। মস্কোতে ভারতীয় কারুশিল্পী, বিশেষত বস্ত্র-বয়নকারীদের নিয়ে যাওয়া হয়। ১৬৯৫ খৃস্টাব্দে সীমেন্ মেলেণ্কি নামে একজন রাশিয়ান বাণিজ্য-প্রতিনিধি দিল্লীতে আসেন এবং আরঙ্গজেব দ্বারা গৃহীত হন। ১৭২২ খৃস্টাব্দে রাশিয়ান সম্রাট পিটার অ্যাস্ট্রাখানে আসেন ও ভারতীয় বণিকদের সাক্ষাৎ দান করেন। ১৭৪৩ খৃস্টাব্দে একদল ভারতীয় সাধু অ্যাস্ট্রাখানে এসেছিলেন; এঁদের মধ্যে দুজন রাশিয়ায় বসবাস করে সে-দেশের প্রজা হন।

দুর্বল হয়ে পড়ত। কিন্তু রাজসভা পূর্বের ন্যায় উজ্জ্বলই ছিল এবং মুঘল সমারোহের খ্যাতি এশিয়া ও ইউরোপময় ছড়িয়ে পড়েছিল। আগ্রা ও দিল্লীতে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা মাথা তুলে উঠল, তাতে পুরাতন ভারতীয় স্থাপত্যের আদর্শ এক নূতন সরল ভাব গ্রহণ করে মহান রূপরেখায় প্রকাশলাভ করল। এই মুঘল-ভারতীয় স্থাপত্যের সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের গতানুগতিক এবং অতিরিক্ত পারিপাট্য ও অলঙ্কার-শোভিত মন্দির ও অন্যান্য সৌধগুলির তুলনায় পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠল। নবভাবে অনুপ্রাণিত স্থপতি ও নির্মাতারা স্নেহাক্ত হস্তে আগ্রায় তাজমহল সৃষ্টি করল।

সমারোহপ্রিয় 'গ্র্যান্ড মুঘল'দের সর্বশেষ ছিলেন আরঙ্গজেব। ইনি কালের প্রবাহকে পিছিয়ে দেবার চেষ্টায় তাঁর ঘড়িটা যেন বন্ধই করে ফেললেন, তা যেন চুরমার হয়ে ভেঙে গেল। যতদিন মুঘল নরপতিরা দেশের প্রতিভার সঙ্গে এক পথে চলেছিলেন এবং দেশের মধ্যে সকল শক্তিকে সংশ্লিষ্ট করে একটা সাধারণ জাতীয় ভাব গড়ে তোলার কাজে লিপ্ত ছিলেন ততদিন তাঁরা সবলই ছিলেন। আরঙ্গজেব যখন এই বিষয়ে বাধা দিয়ে, একে চাপা দিয়ে, ভারতবর্ষীয় নরপতি অপেক্ষা মুসলমানরূপে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন তখন মুঘল সাম্রাজ্যও ভাঙতে লাগল। আকবরের কাজ, এবং অনেকটা তাঁর উত্তরবর্তীদের কাজও, নষ্ট হয়ে গেল, এবং আকবরের রাষ্ট্রনীতির প্রভাবে দেশের মধ্যে যে নানা শক্তি দমিত অবস্থায় ছিল সেগুলি মুক্তিলাভ করে সাম্রাজ্যের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াল। এখন নূতন নূতন আন্দোলন উঠল। উদ্দেশ্য তাদের সংকীর্ণই ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে দিয়ে পুনরুত্থিত জাতীয়তা প্রকাশলাভ করল। যদিচ স্থায়ী কিছু গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি, সময়ও তার অনুকূল ছিল না, এই সকল আন্দোলন শেষ পর্যন্ত মুঘলসাম্রাজ্য ধ্বংস করতে সমর্থ হয়।

ভারতবর্ষের উপর উত্তর-পশ্চিম হতে আগত আক্রমণকারীদের এবং ইসলামের আঘাত প্রবলই হয়েছিল। এর ফলে স্পষ্ট হয়ে উঠল হিন্দুসমাজের দোষত্রুটিগুলি, যেমন জাতিভেদের কঠোর পরিণতি, অস্পৃশ্যতা এবং উৎকট বহিষ্করণনীতি। ইসলামের ভ্রাতৃভাবের আদর্শ, এবং একটা মত হিসাবেই এই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যে সাম্য স্বীকৃত হয়, তারও প্রভাব লোকের উপর পড়ল, এবং হিন্দুসমাজে যারা কোনো প্রকার সমান ব্যবহার পেত না তাদের উপর এ-প্রভাব বিশেষভাবে কার্যকরী হল। এই সকল কারণে দেশের মধ্যে ধর্মনৈতিক সংশ্লেষণের জন্য নানা আন্দোলন উপস্থিত হয়। অনেকে ধর্মান্তর গ্রহণ করে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই নিম্নতর জাতি হতে, বিশেষভাবে বাঙলাদেশে। উচ্চতর জাতির কোনো কোনো ব্যক্তি নূতন ধর্ম গ্রহণ করে, প্রকৃতপক্ষে ধর্মমতের পরিবর্তনের জন্যই, অথবা, যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটেছিল, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে। শাসকশ্রেণীর ধর্মগ্রহণে সুবিধা তো হবারই কথা।

এইভাবে ব্যাপকভাবে ধর্মান্তর গ্রহণ ঘটলেও, হিন্দুধর্ম তার বিভিন্ন রূপে দেশের প্রধান ধর্মরূপেই চলছিল, এবং নিবিড়, আত্মপর্যাপ্ত ও আপন শক্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিল, বহিষ্করণনীতিও অনুসরণ করা হচ্ছিল। উপরের জাতির লোকেদের মনে চিন্তা ও ধারণায় নিজেদের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ ছিল না, আর তাঁরা দর্শন ও

অধ্যাত্মতত্ত্বের সমস্যা বিষয়ে ইসলামকে অমার্জিত বলে মনে করতেন। ইসলামের একেশ্বরবাদও তাঁরা নিজেদের ধর্মের মধ্যেই অদ্বৈতবাদের সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছিলেন, আর এই অদ্বৈতবাদই তাঁদের দর্শনের মূল বিষয় ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তি এর যে-কোনোটি অথবা অধিকতর সাধারণ ও সহজ কোনো পূজাপদ্ধতি বেছে নিতে পারত। তার পক্ষে বৈষ্ণব হয়ে, সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করায় কোনো বাধা ছিল না, আবার, অধিকতর দার্শনিক ভাবাপন্ন হলে অধ্যাত্মতত্ত্ব ও উচ্চশ্রেণীর দর্শনশাস্ত্রের অস্ফুট রাজ্যে বিচরণও চলত। যদিচ তাদের সামাজিক গঠন সম্পূর্ণরূপে মণ্ডলীবদ্ধতায় পর্যবসিত ছিল, ধর্ম বিষয়ে তারা অত্যন্ত ব্যক্তিত্ববাদী ছিল, অপরকে নিজধর্মে আনায় বিশ্বাস করত না, সে-চেষ্টাও ছিল না, আর কেউ ধর্মান্তর গ্রহণ করলে বিশেষ কিছু মনে করত না। অপর কর্তৃক তাদের সামাজিক সংগঠনে কি জীবনযাপন পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ বিশেষ আপত্তির বিষয় ছিল। যদি কোনো মণ্ডলী আপন পথে চলতে চাইত তাতে কোনো বাধা ছিল না। মণ্ডলীর প্রভাব এতই অধিক ছিল যে ধর্মান্তর গ্রহণও হয়েছিল মণ্ডলীর ব্যাপার। উপরের জাতিতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তিরা ধর্মান্তরিত হতে পারত, কিন্তু নিচের দিকে, কোনো একটা স্থানের একটা বিশেষ জাতির লোকেরা কিংবা হয়তো একটা গোটা পল্লীই অন্য ধর্ম গ্রহণ করত। এইভাবে তাদের মণ্ডলীজীবন পূর্ববৎই চলত, তফাত যা ঘটত তা পূজাদি বিষয়ে সামান্যভাবে। এইজন্য বর্তমান সময়ে আমরা দেখতে পাই যে কোনো কোনো বিশেষ পেশা ও শিল্প সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের একচেটিয়া হয়েছে। বয়ন-শিল্পীরা বেশির ভাগ, এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে, মুসলমান। জুতা ব্যবসায়ী ও কশাইরা মুসলমান ছিল। দর্জিরা প্রায় সকলেই, এবং আরও অনেক শ্রমশিল্পী ও কারুশিল্পীরা মুসলমান ধর্মাবলম্বী। এখন মণ্ডলী-বন্ধন ছিন্ন হওয়াতে বহুলোক ব্যক্তি-স্বতন্ত্রভাবে ভিন্নবৃত্তি গ্রহণ করেছে এবং এই কারণে বৃত্তিগত মণ্ডলীগুলির মধ্যে পার্থক্যরেখা লোপ পেয়েছে। কারুশিল্প ও পল্লীশিল্পগুলি ইংরাজ শাসনের আদিপর্বে জোর করেই নষ্ট করা হয়, এবং পরে এদেশের অর্থনীতি ঔপনিবেশিক রূপ গ্রহণ করলে তার ফলেও এগুলি লোপ পায় এবং বহু শিল্পী, বিশেষভাবে তন্তুবায়েরা, কর্মের অভাবে জীবিকা অর্জনের উপায় হতেও বঞ্চিত হয়। যারা এই বিপদেও রক্ষা পায় তারা চাষের কাজে ভূমিহীন মজুররূপে যোগ দেয় কিংবা আত্মীয়দের সঙ্গে অতি সামান্য মাত্র ভূমির অংশ গ্রহণ করে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করতে থাকে।

ঐ কালে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হওয়ায়, সে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি অথবা মণ্ডলীর ব্যাপার, যাই হোক না কেন, বিশেষ কোনো বাধা উপস্থিত হত না, অবশ্য জোর করে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা না হলে। বন্ধুরা, আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা হয়তো ব্যাপারটাকে অপছন্দ করতেন, কিন্তু হিন্দুরা সম্প্রদায়রূপে এতে বিশেষ কিছু গুরুত্ব আরোপ করত না। তার তুলনায় আজকাল মুসলমান কিংবা খৃস্টীয় যে-কোনো ধর্মে কেউ ধর্মান্তরিত হলে ব্যাপকভাবে ব্যাপারটা সাধারণের মনোযোগ

আকর্ষণ করে এবং বিরক্তি প্রকাশ করা হয়। এরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে বেশির ভাগ রাজনৈতিক কারণে, বিশেষত বিভিন্ন ধর্মানুযায়ী পৃথক পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা হওয়ার পর থেকে। নূতন একটি লোকও কোনো মণ্ডলীতে এলে সেটাকে লাভ বলে মনে করা হয়, কারণ এরকম করে দল বৃদ্ধি পেলে একদিন অধিক-সংখ্যক প্রতিনিধি পাঠানো যেতে পারবে এবং অধিকতর রাজনৈতিক শক্তি পাওয়া যাবে। এমনকি এইজন্য আদম-সুমারির সংখ্যাও কমবেশি করার চেষ্টা হয়ে থাকে। রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও এখন হিন্দুদের মধ্যে অহিন্দুকে ধর্মান্তরিত করে নেবার ইচ্ছা দেখা গেছে। এটা হিন্দুধর্মের উপর ইসলামের সাক্ষাৎ প্রভাব হতে ঘটেছে, যদিচ এজন্য ইসলামের সঙ্গেই বিরোধ উপস্থিত হয়েছে। পুরাতনপন্থী হিন্দুরা এখনও এরূপ অহিন্দুকে হিন্দু করে নেওয়া সমর্থন করে না।

কাশ্মীরে বহুকাল ধরে ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়া চলতে থাকায় শতকরা ৯৫ জন অধিবাসী মুসলমান হয়ে পড়েছে, কিন্তু তারা তাদের পুরাতন হিন্দু দেশাচার অনেক রক্ষা করে চলে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই রাজ্যের হিন্দু রাজা দেখেন যে এই সকল লোকেদের মধ্যে বহুসংখ্যক ব্যক্তি দলবদ্ধ হয়ে হিন্দুসমাজে ফিরে আসবার জন্য উৎসুক। তিনি কাশীতে পণ্ডিতদের কাছে প্রতিনিধি পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করেন এটা সম্ভব কি না। পণ্ডিতেরা এরূপ ধর্মান্তর গ্রহণ সমর্থন করতে অস্বীকার করেন, এবং বিষয়টি এইরূপে শেষ হয়।

যে-সকল মুসলমানেরা বাহির থেকে এদেশে এসেছিল তারা কোনো নূতন কর্মপদ্ধতি কিংবা কোনো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গঠনতন্ত্র সঙ্গে আনেনি। ইসলামের অন্তর্গত মানবের ভ্রাতৃত্বে ধর্মনৈতিকভাবে বিশ্বাস থাকলেও তাদের মানসিক প্রকৃতি ছিল মণ্ডলীগত এবং দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সামন্ততান্ত্রিক। কর্মপদ্ধতি ও বস্তু উৎপাদন অথবা শ্রমশিল্প সংগঠন ব্যাপারে তারা তখনকার ভারতীয়দের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। সুতরাং ভারতের অর্থনৈতিক জীবন এবং সামাজিক সংগঠনের উপর তাদের প্রভাব বিশেষ কিছু হয়নি। পুরাতন জীবনই চলছিল, আর সকল প্রকার লোকই—হিন্দু, মুসলমান এবং অন্যেরা—তাতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছিল।

স্ত্রীলোকের অবস্থা ক্রমেই মন্দ হয়ে যায়। প্রাচীন আইনেও উত্তরাধিকার ও পারিবারিক অধিকারে তাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছিল, যদিচ ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ আইন অপেক্ষা তখনকার আইন ভাল ছিল। এই সকল নিয়ম হিন্দু একান্নবর্তী পরিবার বিধি হতে উৎপন্ন হওয়ায় লক্ষ্য ছিল যৌথ-সম্পত্তি রক্ষার দিকে, যাতে সম্পত্তি অন্য পরিবারে চলে না যায়। বিবাহে স্ত্রীলোক অন্য পরিবারের অন্তর্গত হয়ে যেত। অর্থনৈতিক বিচারে নারীকে পিতা, স্বামী অথবা পুত্রের প্রতিপাল্য বলে মনে করা হত, কিন্তু আপন অধিকারে সে সম্পত্তির মালিক হতে পারত। অনেক বিষয়ে স্ত্রীলোক সম্মানলাভ করত এবং যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীনতার সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করত। মননকার্যে, দর্শনশাস্ত্র, রাজ্যশাসন ও যুদ্ধকার্যে খ্যাতিলাভ করেছেন এরূপ বহু স্ত্রীলোকের নাম ভারতের ইতিহাসে

পাওয়া যায়। এই স্বাধীনতা ক্রমে হ্রাস পেয়েছে। ইসলামে স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত আইন আছে, কিন্তু এতে হিন্দু নারীর কোনো লাভ হয়নি। যাতে তাদের ক্ষতি অধিক হয়েছিল, আর মুসলমান স্ত্রীলোকের ক্ষতি হয়েছিল আরও অধিক, সে হল স্ত্রী-অবরোধপ্রথার তীব্রতর বৃদ্ধিতে। সমাজের উপরের দিকে এই প্রথা সমগ্র উত্তর-ভারত ও বঙ্গদেশে বিস্তারলাভ করেছিল, কিন্তু দক্ষিণ ও পশ্চিম-ভারত এর অমঙ্গলকর কবলে পড়েনি। উত্তরেও কেবলমাত্র উচ্চতর শ্রেণীর লোকেরা এটা মেনে চলত কিন্তু নিম্নতর শ্রেণীর নারীরা এই প্রথা হতে মুক্ত থেকে সুখেই জীবনধারণ করত। এই সময়ে নারীরা শিক্ষার সুযোগ অল্পই লাভ করত, আর তাদের কাজকর্ম চলাফেরা ছিল গৃহেই আবদ্ধ।* কোনো প্রকার সুনামের কাজ করার সুযোগ না পেয়ে তারা অবরোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ জীবন যাপন করত। তাদের বলা হয়েছিল যে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্য সতীত্ব, আর চরম পাপ এর হানি। এই হল পুরুষের তৈরি বিধি, কিন্তু নিজের উপর এর প্রয়োগ করেনি। জেহাঙ্গীরের সময়ে তুলসীদাস হিন্দি রামায়ণ রচনা করেন। গ্রন্থখানি সুপ্রসিদ্ধ, এবং সত্যই প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু রচয়িতা নারীর যে চিত্র অঙ্কন করে গেছেন তা অতিশয় অন্যায্য ও পক্ষপাতিত্বপূর্ণ।

অনেকটা অধিকাংশ ভারতীয় মুসলীম হিন্দুধর্ম হতে ধর্মান্তরিত ব্যক্তি হওয়ায়, এবং অনেকটা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বহুদিনব্যাপী সংস্পর্শ ঘটায়, এই দুই সম্প্রদায়ে, বিশেষভাবে উত্তর-ভারতে, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, স্থাপত্য, আহার, পরিচ্ছদ এবং সাধারণ লোকাচার প্রভৃতি বিষয়ে যে-সকল পরিবর্তন এসেছিল তাতে ভাব, অভ্যাস, আচরণ ও রুচির ঐক্য দেখা দিয়েছিল। তারা একত্র একজাতির ন্যায় শান্তিতে বাস করত, একে অপরের পার্বণে-অনুষ্ঠানে যোগ দিত, একই ভাষায় কথা বলত, একই ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করত, এবং একই প্রকার অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হত। সম্ভ্রান্ত লোকেরা ও ভূম্যধিকারীরা এবং তাদের অসংখ্য সাঙ্গোপাঙ্গ রাজসভা হতে আদব-কায়দা গ্রহণ করতেন। (এ'রা ঠিক ভূমির মালিক ছিলেন না, এবং খাজনা আদায় করতেন না, কিন্তু বিশেষ বিশেষ স্থানের রাজস্ব, অর্থাৎ রাজসরকারের প্রাপ্য অংশ, আদায় করে নিজেরাই রেখে দিতে পারতেন। এরূপ অধিকার তাঁরা কেবল আপন আপন জীবদ্দশার জন্য পেতেন।) তাঁরা একটা জটিল ব্যবহারগত সাধারণ সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলেন; একই পোশাক পরতেন, একই প্রকারের আহার গ্রহণ করতেন, আর তাঁদের ছিল একই প্রকারের খেলা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, বিনোদনে, শিকারে কিংবা বীরত্বে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু সৌসাদৃশ্য দেখা যেত।

* তবু এই কালেও, এবং পরে, বহু খ্যাতিমতী নারী জন্মগ্রহণ করেছিলেন—তাঁদের কেউ বা ছিলেন বিদুষী, কেউ বা সুশাসিকা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে লক্ষ্মী দেবী মিতাক্ষরা বিধির উপর যে অতি প্রয়োজনীয় ও উপাদেয় ভাষ্য রচনা করেন তা মধ্যযুগের একখানি প্রসিদ্ধ সংহিতারূপে আদৃত হয়।

পোলো খেলা ছিল অনেকের খুব পছন্দ, আর হাতের লড়াই ছিল খুব জনপ্রিয়।

জাতিভেদ, একেবারে একীভূত হওয়ার পক্ষে বাধা হলেও, দুই সমাজে এইরূপে মেলামেশা ও মিলিতজীবন চলত। মিশ্রিত বিবাহ কদাচিৎ হত, আর হলেও এতে কোনো সামাজিক মিলনের সম্ভাবনা ছিল না—একটি হিন্দু নারী মুসলমান সমাজে চলে যেত, এই হত তার একমাত্র ফল। একসঙ্গে আহার চলত না, তবে এর বিরুদ্ধে তেমন কড়াকড়িও ছিল না। স্ত্রী-অবরোধ প্রচলিত থাকায় সামাজিক জীবন গড়ে ওঠেনি। মুসলমানদের মধ্যে পর্দাপ্রথার কঠোরতা থাকায় সে সমাজ সম্বন্ধে একথাটা বেশি খাটে। হিন্দু ও মুসলমান পুরুষদের মধ্যে মেলামেশা প্রায়ই হত, কিন্তু এই দুই দলের স্ত্রীলোকেরা এ-সুবিধা পায়নি। সম্ভ্রান্ত পরিবারের ও উচ্চশ্রেণীর নারীরা সেইজন্য বিচ্ছিন্ন হয়েই থাকতে বাধ্য হত, আর তাদের সাধারণ ধারণাও বিভিন্ন দলে বিভিন্ন ছিল, এবং একদলের নারীরা অপর দলের নারীদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতে পারত না।

দেশের অধিকাংশ লোকই পল্লীবাসী। পল্লীগুলিতে, সাধারণ লোকেদের মধ্যে সমষ্টিগতভাবে মেলামেশা শহর অপেক্ষা অধিক ছিল। পল্লীর সীমাবদ্ধ জীবনে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ দেখা যেত। জাতিভেদের জন্য বিশেষ বাধা উপস্থিত হত না, আর হিন্দুরা মুসলমানদের তাদেরই জাতিভেদের অন্তর্গত একটা জাতি বলে বিবেচনা করত। অধিকাংশ মুসলমান হিন্দুধর্ম হতে ধর্মান্তরিত ব্যক্তি হওয়ায় তারা অনেক পুরাতন হিন্দু রীতিনীতি পালন করে চলত, আর হিন্দুদের জীবনের পট-ভূমিকা, তাদের পুরাণ ও মহাকাব্যের গল্পাদি ভালরূপই জানত। তারা একই প্রকার কাজ করত, একই রূপ জীবন যাপন, একই প্রকার পোশাক পরিধান করত ও একই ভাষায় কথা বলত। তারা একদল আর এক দলের উৎসবে যোগ দিত, তার কতকগুলি অপেক্ষাকৃত সাধারণ পার্বণ উভয় দলেই সমভাবে অনুসৃত হত এবং সকলে একই পল্লীগীত গাইত। এই সকল লোকের অধিকাংশই ছিল চাষী, সাধারণ শিল্পী অথবা কারুশিল্পী।

সম্ভ্রান্তবংশ এবং চাষী ও শিল্পীদের মাঝামাঝি তৃতীয় আর একটা বৃহৎ দল ছিল, বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক। এরা প্রধানত হিন্দুই ছিল, এবং যদিচ এদের কোনো রাজনৈতিক শক্তি ছিল না, দেশের অর্থনৈতিক ব্যাপার অনেক পরিমাণে এদেরই হাতে ছিল। অন্যদল দুটি অপেক্ষা মুসলমানদের সঙ্গে এদের দলের সংশ্রব সর্বাপেক্ষা কম ছিল। বাইরে থেকে যে-সকল মুসলমান এসেছিল তাদের দৃষ্টিভঙ্গী সামন্ততান্ত্রিক ছিল বলে তারা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মিশতে চাইত না। ইসলামে সুদ নেওয়ার বিরুদ্ধে যে নিষেধ আছে তাও ব্যবসায়ের পক্ষে বাধা ছিল। তারা নিজেদের শাসকশ্রেণীর লোক অর্থাৎ সম্ভ্রান্তবংশীয় মনে করত, এবং উচ্চ রাজকর্মচারী, জায়গীরদার কিংবা সামরিক কর্মচারীরূপে কাজ করত। রাজদরবারে এবং ধর্মনৈতিক ও অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অনেক বিদ্বান ব্যক্তিও থাকতেন।

মুঘল রাজত্বকালে পারস্য ভাষা ছিল রাজভাষা। অনেক হিন্দু গ্রন্থকার এই ভাষায়

পুস্তক রচনা করেছিলেন। এইগুলির কয়েকটি প্রাচীন সাহিত্যে স্থানলাভ করেছে। মুসলমান পণ্ডিতেরাও সংস্কৃত গ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন এবং হিন্দি ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। হিন্দিভাষায় প্রখ্যাতনামা কবিদের মধ্যে একজন ছিলেন 'পদ্মাবতে'র লেখক মালিক মুহম্মদ জৈসি ও আর একজন আবদুর রহিম খানখানা, ইনি আকবরের দরবারে একজন উচ্চশ্রেণীর বহু সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর অভিভাবকের পুত্র ছিলেন। আরব, পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় খানখানার পাণ্ডিত্য ছিল; এঁর হিন্দি কবিতাগুলি উচ্চশ্রেণীর। কিছুকাল তিনি মুঘল সম্রাটের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। মেবারের রাণা প্রতাপ বরাবর আকবরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং কখনও আত্মসমর্পণ করেননি, খানখানা তবু তাঁরও প্রশংসা করে সবিশেষ গুণগ্রাহিতার সঙ্গে লিখে গেছেন। সমরাঙ্গনে যিনি ছিলেন তাঁর শত্রু ইনি তাঁরও দেশহিতৈষণা, উচ্চ আত্মসম্মানবোধ ও শৌর্যের প্রশংসা করে গেছেন।

আকবর সকল বিষয়েই মিত্রতাপূর্ণ ও গুণগ্রাহী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলতেন এবং এই ছিল তাঁর শাসননীতি। তাঁর অনেক মন্ত্রী ও উজিরেরা এটা তাঁর কাছ থেকে শিখে নিয়েছিলেন। তিনি বিশেষভাবে রাজপুতদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, কারণ তাঁদের মধ্যে দেখতেন তাঁর নিজেরই অনেক গুণ, যেমন নির্ভীকতা, বীরত্ব, আত্মসম্মান ও শৌর্যের অনুভূতি এবং প্রতিশ্রুতিরক্ষা। তিনি রাজপুতদের স্বপক্ষে টেনে এনেছিলেন। তাদের অনেক সদ্গুণ ছিল বটে, কিন্তু তাদের সমাজের গঠনটা ছিল মধ্যযুগের। নূতন নূতন ধারণা উপস্থিত হচ্ছিল, কিন্তু সমাজ সময়ের পক্ষে পুরাতনপন্থী হয়ে পড়েছিল। আকবরও এই সকল নূতন ভাব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না, কারণ তিনিও যে সমাজে জন্মেছিলেন তারই প্রভাবের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।

আকবরের সাফল্যের কথা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, কারণ তিনি উত্তর ও মধ্যভারতে বহু পৃথক পৃথক দল থাকা সত্ত্বেও একটা ঐক্যের ভাব আনতে পেরেছিলেন। উপরের দিকে অধিকাংশই বিদেশী শাসকশ্রেণীর লোক, এ দিকে দেশীয়দের ধর্ম ও জাতিভেদ—আবার বিদেশীয়দের প্রচারশীল ধর্ম দেশের অনড় ধর্ম-মতের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই সকল বাধা দূর হয়নি, কিন্তু তবু ঐক্যের ভাব এসেছিল। এ যে কেবল আকবর সকলকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন বলে ঘটেছিল তা নয়, তিনি যে সুব্যবস্থাটি গড়ে তুলেছিলেন তার প্রতিও দেশের লোক আকৃষ্ট হয়েছিল। তাঁর পুত্র এবং পৌত্র, জেহাঙ্গীর ও শাহজাহান, একেই মেনে নিয়ে এরই কাঠামোর মধ্যে কাজ করেছিলেন। তাঁদের কোনো অসাধারণ যোগ্যতা ছিল না, তবু তাঁদের রাজত্বকাল ভালই কেটেছিল, কারণ তাঁরা আকবরের দ্বারা বিধিবদ্ধ পথে চলেছিলেন। তাঁদের পরে এলেন তাঁদের থেকে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন আরঙ্গজেব। ইনি কিন্তু ছিলেন একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। ইনি পূর্বের পথ ত্যাগ করে আকবরের চেষ্টার সুফল সব নষ্ট করে ফেললেন। তবে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হল না, আর এ বড়ই আশ্চর্য যে আরঙ্গজেবের দ্বারা এরূপ ঘটলেও, এবং পরবর্তী সম্রাটেরা দুর্বল ও অকর্মণ্য হলেও আকবরের সুগঠিত ব্যবস্থার উপর লোকের শ্রদ্ধা দূর হয়নি। এইভাব

অবশ্য উত্তর ও মধ্য-ভারতেই আবদ্ধ ছিল, এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমে বিস্তারলাভ করেনি। সুতরাং পশ্চিম-ভারত হতে এল এর বিরুদ্ধতা।

১২ : আরঙ্গজেবের প্রগতিপরিপন্থী ব্যবস্থা : হিন্দু জাতীয়তার উদ্ভব : শিবাজী

আরঙ্গজেব ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই-এর সময়ে রাজসিংহাসন অধিকার করেন, তখন মধ্য ইউরোপে ত্রিশ বছর ব্যাপী যুদ্ধটা চলছিল। ফ্রান্সে যখন ভার্সাই রূপ নিচ্ছে তখন আগ্রায় তাজমহল ও মতিমসজিদ গড়ে উঠছে, আর তৈরি হচ্ছে দিল্লীর জুমা-মসজিদ এবং রাজপ্রাসাদের দেওয়ান-ই-আম ও দেওয়ান-ই-খাস। এই সমস্ত মনোহর সৌধগুলি যেন পরী-রাজ্যের রূপ নিয়ে মুঘল সমারোহের সাক্ষ্য দেয়। দিল্লীর রাজ-দরবার, তার ময়ূর-সিংহাসন—সব মিলে ভার্সাই অপেক্ষা মনোমুগ্ধকর হয়েছিল, কিন্তু ঐ ভার্সাই-এর মতই দারিদ্র্যপীড়িত প্রজাদের বুকের উপর ছিল তাদের ভিত্তি। গুজ-রাট ও দাক্ষিণাত্যে তখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল।

এরই মধ্যে ইংলণ্ডের নৌ-শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে প্রসারলাভ করছিল। আকবর ইউরোপের কেবল পোর্টুগীজদেরই জানতেন। তাঁর পুত্র জেহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইংরাজ নৌ-শক্তি ভারত সাগরে পোর্টুগীজদের পরাজিত করে, এবং জেহাঙ্গীরের রাজদরবারে ১৬১৫ খৃস্টাব্দে প্রথম জেম্সের প্রেরিত রাষ্ট্রদূত স্যার টমাস রো উপস্থিত হন। তিনি কারখানা তৈরির অনুমতি সংগ্রহ করে সুরাটের কারখানা আরম্ভ করেন এবং ১৬৩৯ খৃস্টাব্দে মাদ্রাজ নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। শতাধিক বছর ধরে ভারতে কেউই ইংরাজদের আগমনের ঘটনাটিতে কোনো গুরুত্ব আরোপ করেনি। ইংরাজরা যে তখন জলপথে প্রভুত্বলাভ করেছে, এবং পোর্টুগীজদের একরূপ বিতাড়িত করেছে, তাও মুঘল শাসক ও তাঁদের পরামর্শদাতাদের কাছে বিশেষ কিছু চিন্তার বিষয় বলে মনে হয়নি। যখন আরঙ্গজেবের সময়ে মুঘল সাম্রাজ্যে দুর্বলতা দেখা দিল, তখন ইংরাজেরা যুদ্ধের দ্বারা ভারতে তাদের অধিকার বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে সুগঠিতভাবে চেষ্টা আরম্ভ করল। এ হল ১৬৮৫ খৃস্টাব্দে। আরঙ্গজেব তখন দুর্বল হয়ে পড়েছেন. এবং শত্রুপরিবেষ্টিতও হয়েছেন; তবু ইংরাজদের পরাজিত করতে সমর্থ হলেন। এর আগেই ফরাসীরা ভারতে একটুখানি স্থান অধিকার করেছে। ইউরোপের শক্তি তখন অগাধ—উছলে পড়ছে। ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা যখন দ্রুত অবনতির দিকে চলেছে তখন এই শক্তি ভারতে ও পূর্বদেশে প্রসারিত হল। ফ্রান্সে চতুর্দশ লুই-এর সুদীর্ঘ রাজত্বকাল তখনও চলছে, এবং তিনি বিপ্লবের বীজ বপন করে চলেছেন। ইংলণ্ডে ইতিমধ্যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকেদের দ্বারা রাজার শিরশ্ছেদ সংঘটিত হয়েছে, ক্রমওয়েলের স্বল্পকাল স্থায়ী গণতন্ত্র এসেছে ও গেছে, দ্বিতীয় চার্লস্‌ও এসেছেন এবং গেছেন, আর দ্বিতীয় জেম্স পলায়ন করেছেন। পার্লামেন্ট অনেক পরিমাণে একটা নূতন বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিভূস্বরূপ হয়ে রাজার শক্তি সংকুচিত করে আপন প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এই কালে, আরঙ্গজেব অন্তর্যুদ্ধের পর পিতা শাহজাহানকে কারারুদ্ধ করে মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করেন। আবার আর একজন আকবর এলে তিনি হয়তো এই সময়কার পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে নবজাগ্রত শক্তিগুলিকে আয়ত্ত করতে পারতেন। কিন্তু অবস্থাটা হয়ে উঠেছিল সঙ্গীন। আকবরের পক্ষেও একে সামলান সহজ হত না। তাঁর স্বাভাবিক কৌতূহল ও জ্ঞানস্পৃহায় নূতন নূতন বিষয়গুলি যা-কিছু এসে পড়েছিল ও আসছিল, বুঝে না নিলে এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারে যে-সকল পরিবর্তন ঘটছিল সেগুলিকেও বোধায়ত্ত না করলে, তিনিও হয়তো তাঁর সাম্রাজ্যের ভেঙে পড়াটা ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন কেবল সাময়িকভাবে। আরঙ্গজেব বর্তমান অবস্থা বুঝে নেওয়া দূরে থাক, তাঁর অব্যবহিত পূর্বে যা ঘটেছে তাও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। তিনি পেয়েছিলেন তাঁর দূর পূর্বপুরুষগণের স্বভাব, যথেষ্ট যোগ্যতা এবং কর্মে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তাঁর পূর্ববর্তীরা যা করে গেছেন তা নষ্ট করতেই চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ছিলেন ধর্মমতে গোঁড়া এবং ঘোরতর নীতিবাদী—শিল্প কি সাহিত্যে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। হিন্দুদের উপর জিজিয়া নামে পুরাতন মাথট-কর আবার আদায় করতে আরম্ভ করায় তাঁর অধিকাংশ প্রজাদের মনে ভীষণ ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল, আর অনেক হিন্দু-মন্দিরও তিনি ধ্বংস করেছিলেন। গর্বিত রাজপুতেরা মুঘল সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ ছিল। আরঙ্গজেব তাদের অসন্তুষ্ট করেন, উত্তরে শিখেরা তাঁর বিরুদ্ধে জেগে ওঠে। এই শিখেরা ছিল একটি শান্তিপ্রিয় জাতি, হিন্দু ও মুসলীম ভাব মিলিয়ে একটি নূতন ধর্মমত গড়ে নিয়েছিল; এখন দমিত ও লাঞ্ছিত হওয়ায় একটা সামরিক সম্প্রদায়ে গঠিত হয়ে উঠল। আর ভারতের পশ্চিম উপকূলের নিকটে ছিল যুদ্ধপ্রিয় মারাঠাজাতি, তারা প্রাচীন রাষ্ট্রকূটদের বংশধর; আরঙ্গজেব তাদেরও ক্রোধের উদ্রেক করলেন ঠিক যখন তাদের মধ্যে একজন তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও শৌর্যশালী নেতার উদয় হয়েছে।

এখন বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বত্র একটা উত্তেজনা পুনর্জীবন লাভের ভাব—ধর্ম ও জাতীয়তার সংমিশ্রণে প্রকাশলাভ করল। এই জাতীয়তা এখনকার মত ঐহিক প্রকৃতির ছিল না, আর এতে তখন সমগ্র ভারতবর্ষ অন্তর্গত হয়নি। এর মধ্যে একটু সামন্ততন্ত্র, একটুখানি স্থানীয় ভাবাবেগ, একটু বা সাম্প্রদায়িকতা ছিল। রাজপুতেরা সর্বাপেক্ষা সামন্ততান্ত্রিক হওয়ায় আপনাদের গোষ্ঠীর প্রতি অনুরক্তি দেখাত; শিখেরা ছিল পাঞ্জাবের অন্তর্গত একটি ছোট সম্প্রদায় মাত্র, তারা আত্মরক্ষাতেই তৎপর থাকায় ঐ-প্রদেশের বাইরে মনোযোগ দিতে পারত না। তবু ধর্মের ভাব যা কাজ করছিল তার প্রকাশের পটভূমিকা ছিল জাতীয়তায়, আর এর সমস্ত ঐতিহ্য ছিল ভারতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডনেল বলেছেন, 'কেবল ভারতীয়েরাই ইউরোপ-ভারতীয় মানব জগতে একটা জাতীয় ধর্ম গড়ে তুলেছে যাকে বলা যায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম—এবং একটি বিরাট জগদ্ব্যাপী ধর্মও সৃষ্টি করেছে, তার নাম বৌদ্ধধর্ম। অন্যেরা এ-বিষয়ে কোনো মৌলিকতা দেখানো তো দূরের কথা, অনেকদিন আগেই বিদেশীয় ধর্মমত গ্রহণ করেছে।' এই ধর্ম ও স্বাদেশিকতার মিলিত রূপ এদের উভয় হতে শক্তি

ও দৃঢ়নিবদ্ধতা লাভ করেছিল, তবে শেষে এর দুর্বলতা ও অপ্রাচুর্য এই মিশ্রণ থেকেই এসেছিল। এই স্বাদেশিকতা কেবলমাত্র আংশিক জাতীয়তাই হতে পেরেছিল, কারণ এতে বহিষ্করণের ভাব ছিল তাই এর ধর্মমতের প্রভাবের বাইরে যা-কিছু তাকে বাইরেই রেখে দিয়েছিল। হিন্দুজাতীয়তা স্বভাবের নিয়মেই উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু ধর্ম কি ধর্মমতের সকল বৈষম্যের ঊর্ধ্বে যে বিশাল জাতীয়তা আছে তাকে বাধাক্রান্ত করেছে। একথা কিন্তু ঠিক যে এই সময়ে, যখন একটা সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ছিল তখন অনেক ভারতীয় ও অভারতীয় উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি নিজের নিজের জন্য ছোট ছোট রাজ্য তৈরি করে নিতে ব্যাপৃত ছিল, আর তখন জাতীয়তা বলতে আমরা এখন যা বুঝি তা বিশেষ করে দেখা যেত না। এই সব লোকেরা প্রত্যেকে আপন আপন শক্তি বৃদ্ধি করতেই ব্যস্ত ছিল, আর প্রত্যেক দল নিজের স্বার্থ নিয়েই থাকত। এই সময়ের যেটুকু ইতিহাস পাওয়া যায় তা হতে কেবল এই উচ্চাভিলাষী লোকেদের বিষয়েই জানতে পারি, ঘটনাগুলির অন্তরালে তাৎপর্যপূর্ণ আর যা ছিল ইতিহাসে তার উপর কোনো গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। তবু, অস্পষ্টভাবে হলেও, জানা যায় যে এ কেবল উচ্চাভিলাষীদের ব্যাপার ছিল না। যদিচ তাদের কেউ কেউ কিছু কিছু সাফল্যলাভ করেছিল। বিশেষভাবে মারাঠাদের একটা বৃহত্তর ধারণা ছিল, এবং তারা যতই শক্তিলাভ করছিল এই ধারণাটাও ততই বর্ধিত হচ্ছিল। ১৭৮৪ খৃস্টাব্দে ওআরেন হেস্টিংস্ লিখে গেছেন, 'হিন্দুস্থান ও দাক্ষিণাত্যের ভিতরে কেবল মারাঠাদের মধ্যে একটা স্বাদেশিক অনুরাগ দেখা যায়, এবং এই ভাব জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে দৃঢ়নিবদ্ধ আছে বলে মনে হয়। রাজ্যে কোনো বিপর্যয় উপস্থিত হলে এই অনুরাগই হয়তো এক উদ্দেশ্যসাধনে তাদের নেতৃবর্গকে একতাবদ্ধ করে তুলবে।' সম্ভবত তাদের এই স্বাদেশিকতা দেশের মারাঠি-ভাষী অংশেই আবদ্ধ ছিল। তথাপি মারাঠিরা তাদের আচরণে ও সামরিক ব্যবস্থায় উদারভাবাপন্ন ছিল, এবং ভিতরে ভিতরে তাদের মধ্যে একটা গণতান্ত্রিক ভাবও সজাগ ছিল। এতে তাদের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। শিবাজী আকবরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু মুসলমানদেরও আপন আপন কাজে নিয়োজিত করতে সঙ্কোচ বোধ করেননি।

দেশের অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা যে ভেঙে পড়েছিল তাও মুঘল সাম্রাজ্য নষ্ট হওয়ার একটা কারণ। কৃষকেরা বার বার বিদ্রোহ করেছিল—কয়েকবার যথেষ্ট ব্যাপক-ভাবে। ১৬৬৯ খৃস্টাব্দ হতে বরাবর রাজধানীর নিকটেই জাট কৃষিজীবীরা অনেকবার দিল্লীর রাজসরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। তাছাড়া সৎনামী নামে আর একদল দরিদ্র প্রজা বিদ্রোহ করে। একজন মুঘল সম্ভ্রান্ত লোক এদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, 'স্বর্ণকার, ছুতার, ঝাড়ুদার, চামার এবং অন্যান্য নীচজাতীয় রক্তপিপাসু ক্ষুদ্রাশয় লোক।' তার আগে পর্যন্ত কেবল রাজপুত্র এবং সম্ভ্রান্তবংশীয় লোকেরাই বিদ্রোহী হত; এখন অন্য এক প্রকারের লোকেদের এই পথে ভাগ্যপরীক্ষা শুরু হল।

যখন সাম্রাজ্যটি বিরোধ ও বিপ্লবে ছিন্নভিন্ন হচ্ছিল তখন নব-জাগ্রত মারাঠা-শক্তি দিন দিন প্রবলতর হয়ে পশ্চিম-ভারতে সুসংগঠিত হয়ে উঠতে লাগল। শিবাজী

১৬২৭ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে যথাকালে শক্তিমান পার্বত্যজাতি মারাঠাদের এক আদর্শস্থানীয় নেতা হয়ে উঠলেন। পাহাড়-পর্বতে লুক্কায়িত থেকে তিনি যুদ্ধ চালাতে লাগলেন; তাঁর অশ্বারোহী সৈন্য দূরে-সুদূরে যেতে লাগল; সুরাটে ইংরাজদের কারখানা নষ্ট করল এবং মুঘল রাজ্যের দূরবর্তী অনেক অংশে চৌথ নামক কর আদায় করতে লাগল। সাহসী এবং নেতৃত্বের উপযুক্ত বহুগুণের অধিকারী শিবাজী ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি হতে প্রেরণা গ্রহণ করে পুনরুদ্বোধিত হিন্দু জাতীয়তার প্রতীক হয়ে উঠলেন। তিনি মারাঠাদের জাতীয় পটভূমিকা দান করে একটি একতাবদ্ধ প্রবল জাতিতে পরিণত করলেন, এবং এমন এক দুর্দমনীয় শক্তিরূপে গড়ে তুললেন যে তারা মুঘল সাম্রাজ্য চূর্ণ করে ফেলল। ১৬৮০ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়, কিন্তু তাঁর পরেও মারাঠা-শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কালে ভারতে প্রভুত্বলাভ করে।

১৩ : মারাঠা ও ইংরাজের মধ্যে প্রাধান্যের জন্য যুদ্ধ : ইংরাজের জয়

আরঙ্গজেবের মৃত্যু ঘটে ১৭০৭ খৃস্টাব্দে। তারপর শত বছর ধরে ভারতের উপর প্রভুত্বের জন্য জটিল এবং বহুমুখীন যুদ্ধ চলতে থাকে। মুঘল সাম্রাজ্য দ্রুতগতিতে ভেঙে পড়ল এবং রাজপ্রতিনিধি ও শাসনকর্তারা প্রায় স্বাধীন নরপতিরূপে আপন আপন প্রদেশের শাসনকার্য চালাতে লাগল, যদিচ তখনও দিল্লীতে মুঘলদের বংশধরের এরূপ সম্মান ছিল যে শক্তিহীন, এমনকি কারারুদ্ধ অবস্থাতেও লৌকিক আনুগত্য তিনি লাভ করতেন। এই সকল শাসনকর্তাদের যথার্থত কোনো শক্তি ছিল না, বিশেষ কোনো প্রভাবও ছিল না, তবে যে-ব্যক্তি সর্বোপরি অধিকার লাভের চেষ্টা করছে তাকে সাহায্য করে কিংবা তার বিরোধিতা করে কিছু কিছু প্রতিপত্তি সংগ্রহ করতে পারত। হায়দ্রাবাদের নিজামের রাজ্য দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ পরিচালনার পক্ষে সুবিধামত স্থানে অবস্থিত ছিল বলে প্রথমত ইনি কিছু প্রভাব লাভ করেছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই ধরা পড়ে গেল যে সে-সুবিধা কথার-কথা মাত্র—রাজ্যটি বাইরের শক্তির উপর নির্ভর করে টিকে আছে, ভিতরে তা তৃণপূর্ণ, অন্তঃসারশূন্য। এর এই বিশেষত্ব দেখা গেল যে কপটাচরণ করে, নিজে কোনো দায় না নিয়ে ও বিপদ এড়িয়ে, পরের দুর্ভাগ্যে লাভবান হবার বুদ্ধি রাখে। স্যর জন্ শোর এই রাজ্য সম্বন্ধে বলেছেন, 'অতিশয় ক্ষুদ্রাশয়, শক্তিহীন ......সুতরাং অপরের আনুগত্য স্বীকার করতে প্রস্তুত।' মারাঠারা নিজামকে তাদেরই অধীন করদরাজ্য বলে মনে করত। নিজাম একবার স্বাধীনতা-স্পৃহা দেখিয়ে এই অধীনতা এড়াবার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু এজন্য তাঁকে অচিরে শাস্তি পেতে হয়েছিল এবং মারাঠারা তাঁর দুর্বল, সাহসহীন সৈন্যদের বিতাড়িত করেছিল। নিজাম তখন ইংরাজ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আশ্রয় গ্রহণ করে, তাদের অধীনতা স্বীকার দ্বারা রাজ্যরক্ষা করেছিলেন। বাস্তবিক, ইংরাজের দ্বারা মহীশূরের টিপু সুলতান পরাজিত হওয়ার পর হায়দ্রাবাদ রাজ্য, বিশেষ কিছু চেষ্টা না করেই, আপন সীমা অনেক বাড়িয়ে নিয়েছিল। ওআরেন হেস্টিংস্ ১৭৮৪ খৃস্টাব্দে হায়দ্রাবাদের নিজাম

সম্বন্ধে লিখেছেন : 'এ'র রাজ্য ছোট এবং রাজস্বও অল্প, আর সামরিক শক্তি নগণ্য। কোনোদিনই ইনি ব্যক্তিগতভাবে সাহস অথবা কোনো প্রকার প্রচেষ্টার পরিচয় দেননি। বরঞ্চ দেখা যায় যে এ'র রাজ্য-পরিচালনার নীতিই হল নিকটবর্তী রাজ্যগুলিকে যুদ্ধে প্ররোচিত করে সেগুলির দৌর্বল্য ও বিপদের সুবিধা নিয়ে নিজে লাভবান হওয়া। এই সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা বরাবরই এড়িয়ে গেছেন, আর যুদ্ধের অনিশ্চয়তার মধ্যে না গিয়ে অসম্মানকরভাবে ক্ষতি স্বীকার করেও আত্মরক্ষা করেছেন।'*

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাঁরা আধিপত্যলাভের জন্য প্রচেষ্টা করেছিলেন তাঁদের চারভাগে ভাগ করে দেখা যায়। দক্ষিণে মারাঠারা এবং হায়দার আলি ও তাঁর পুত্র টিপু সুলতান। এ'রা ভারতীয়। বিদেশীরা ছিলেন ইংরাজেরা ও ফরাসীরা। এ একরূপ সুনিশ্চিত বলেই মনে হয়েছিল যে সৌভাগ্যবান মারাঠারাই একদিন সমগ্র ভারতের উপর আধিপত্য বিস্তার করে মুঘল সাম্রাজ্যের স্থান অধিকার করবে। ১৭৩৭ খৃস্টাব্দেই তাদের বাহিনী একেবারে দিল্লীর তোরণে উপস্থিত হয়েছিল আর তখন এমন কোনো শক্তি ছিল না যা তাদের প্রতিরোধ করতে পারে।

সেই কালে (১৭৩৯ খৃস্টাব্দে) উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে আর এক উৎপাত দেখা দেয়। পারস্যের নাদির শাহ হত্যা ও লুণ্ঠনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবলবেগে দিল্লীর উপর এসে পড়ে এবং বিখ্যাত ময়ূর-সিংহাসন ও প্রভূত ধন-রত্নাদি নিয়ে চলে যায়। এই লুণ্ঠন নাদির শাহের পক্ষে একটা সহজ ব্যাপারই হয়েছিল, কারণ দিল্লীর রাজারা তখন ক্ষীণ ও পৌরুষহীন হয়ে পড়েছিল, যুদ্ধ করার অভ্যাসই এদের আর ছিল না; আর মারাঠাদের সঙ্গেও নাদির শাহকে যুদ্ধ করতে হয়নি। একদিক থেকে দেখলে নাদির শাহের লুণ্ঠনে মারাঠাদের সুবিধাই হয়েছিল। তারা পরে পাঞ্জাবেও ছড়িয়ে পড়ে, এবং ভারতে মারাঠা প্রভুত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সূচনা দেখা দেয়।

নাদির শাহের লুণ্ঠনের ফল হয়েছিল দুটি। দিল্লীর মুঘল বংশধরদের রাজ্য কি রাজশক্তিতে সকল দাবিই এতে শেষ হয়। এর পর তারা অস্পষ্ট ছায়ার ন্যায় ভৌতিক রাজত্ব উপভোগ করতে থাকে, আর শক্তিমানদের হাতে পুতুলনাচের খেলনা-পুতুল হয়ে পড়ে।

নাদির শাহ আসার আগেই তাদের অবস্থা অনেকটা এইরূপই দাঁড়িয়েছিল, এ-ব্যক্তি কেবল কাজটাকে সম্পূর্ণ করে দিয়েছিল। কিন্তু তবু চিরাগত আচরণ ও প্রথাদির প্রভাব এতই অধিক যে ইংরাজ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী, এবং অন্যেরাও, পলাশীর যুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত মুঘল বংশধরদের সম্মানের চিহ্নস্বরূপ উপহার পাঠাত। এর পরেও কোম্পানী মনে করত যে তারা দিল্লীর সম্রাটের প্রতিভূস্বরূপ কাজ করছে এবং ১৮৩৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এই সম্রাটের নামে মুদ্রা প্রস্তুত হয়েছিল।

দ্বিতীয় ফলটি এই হয় যে আফগানিস্থান ভারতবর্ষ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বহুকাল

* টম্সনের 'দি মেকিং অফ্ দি প্রিন্সেস' (১৯৪৩) পুস্তকের ১ম পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

ধরে এ-স্থান ভারতের অংশ হয়েছিল, এখন নাদির শাহের রাজ্যের সামিল হয়ে পড়ে। কিছুকাল পরে নাদির শাহের কয়েকজন কর্মচারী দলবদ্ধভাবে বিদ্রোহী হয় ও তাকে হত্যা করে, এবং তখন আফগানিস্থান স্বাধীন রাজ্য হয়ে ওঠে।

নাদির শাহ দ্বারা মারাঠাদের কোনোরূপ শক্তিক্ষয় ঘটেনি, এবং তারা পূর্ববৎ পাঞ্জাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আমেদ শাহ দুরানী তখন আফগানিস্থানের নরপতি। এর সঙ্গে ১৭৬১ খৃস্টাব্দে পানিপথে মারাঠাদের যুদ্ধ ঘটে, এবং মারাঠারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। মারাঠাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা এই দুর্বিপাকে হত হন, এবং কিছুকালের জন্য মারাঠা-সাম্রাজ্যের স্বপ্ন ভেঙে যায়। ক্রমে ক্রমে তারা আবার শক্তিলাভ করতে থাকে, তবে মারাঠা রাজ্য কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু পুনার পেশোয়ার নেতৃত্বে তখনও সংঘবদ্ধভাবে কাজ করতে থাকে। এই সকল রাজ্যের প্রধানগুলির অধিপতি গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার আর বরোদার গায়কোয়ার। এই সংঘবদ্ধ শক্তি পশ্চিম ও মধ্য-ভারতের সুবিশাল অংশের উপর তখনও প্রভুত্ব করছিল। কিন্তু যখন পানিপথে আমেদ শাহ দ্বারা মারাঠারা পরাজিত হয় ঠিক সেই সময়ে ইংরাজ কোম্পানী আধিপত্য বিস্তার করে একটা শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে।

বঙ্গদেশে ক্লাইভ রাজদ্রোহ ও জাল-জুয়াচুরি প্রভৃতিতে উৎসাহ দিয়ে, এবং নামমাত্র যুদ্ধ করে ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশীতে জয়লাভ করে। এই তারিখকে কেউ কেউ ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত বলে মনে করে। আরম্ভটা বিস্বাদই হয়েছিল, আর এর কটুত্ব এখনও এতে লেগে আছে। অল্পকালের মধ্যেই ইংরাজেরা বাঙলা ও বিহারের সমস্তটাই অধিকার করে। তাদের শাসনের প্রথম দিকের কুফলগুলির একটি হল, বাঙলা ও বিহারে ১৭৭০ খৃস্টাব্দে ভীষণ দুর্ভিক্ষে এই দুই বিশাল, সমৃদ্ধ ও জনাকীর্ণ প্রদেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক প্রাণ হারায়।

তখন সমগ্র জগতে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। দক্ষিণ-ভারতেও এই যুদ্ধ চলে, আর শেষ হয় ইংরাজদের জয়ে—ফরাসীরা ভারতবর্ষ হতে প্রায় বিতাড়িত হয়ে যায়।

ভারতে ফরাসীদের শক্তি নিঃশেষ হওয়ায় এখন তিনটি শক্তিকে প্রভুত্বের জন্য বিবাদরত দেখা গেল—সংঘবদ্ধ মারাঠা, দক্ষিণের হায়দার আলি, আর ইংরাজ। পলাশী-যুদ্ধজয় এবং বাঙলা ও বিহারে বিস্তৃতিলাভ সত্ত্বেও ভারতে বিশেষ কেউ মনে করত না যে ইংরাজেরা এমন বড় কোনো শক্তি যা একদিন সমগ্র ভারতের উপর রাজত্ব করবে। এ-বিষয়ে কেউ কিছু বলতে চাইলে এখনও মারাঠাদের প্রথম স্থান দিত, কারণ তারা পশ্চিম ও মধ্য-ভারতে ছড়িয়ে পড়ে দিল্লী পর্যন্ত পৌঁচেছিল এবং তাদের সাহস ও যুদ্ধ করার শক্তি বহু-বিদিত হয়ে উঠেছিল। হায়দার আলি ও টিপু সুলতান ছিলেন ইংরাজের দারুণ শত্রু। এঁরা ইংরাজদের ভীষণভাবে হারিয়ে দিয়ে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শক্তিকে প্রায় শেষ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা দাক্ষিণাত্যের বাইরে আসেননি। সুতরাং তাঁদের দ্বারা সমগ্র ভারতের ভাল-মন্দ বিশেষ কিছুই হয়নি।

হায়দার আলি ছিলেন যোগ্য ব্যক্তি, ভারতের ইতিহাসে তাঁর বিশেষ স্থান আছে। তিনি একটা জাতীয় আদর্শ পোষণ করতেন এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দূষ্টিশীল নেতার অনেক গুণ তাঁর মধ্যে ছিল। তিনি বরাবর যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েও আশ্চর্য আত্মসংযম ও পরিশ্রমশীলতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। সকলের আগে তিনিই প্রথম নৌ-শক্তির গুরুত্ব অনুভব করেন এবং বুঝতে পারেন যে ইংরাজেরা সে শক্তির প্রভাবে দিন দিন ভয়াবহ হয়ে উঠছে। এদের বিতাড়িত করার জন্য একটা মিলিত চেষ্টার উদ্দেশ্যে তিনি মারাঠাদের, নিজামের ও অযোধ্যার সুজা-উদ্‌দোলার কাছে দূত পাঠান, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। তিনি আপন নৌবহরও প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেন এবং মালদ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে সেখানে জাহাজ তৈরি ও নৌ-শক্তি গঠনের জন্য কেন্দ্র স্থাপন করেন। আপন বাহিনীর সঙ্গে যাত্রাকালে পথিমধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর পুত্র টিপু নৌবহর বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি নেপোলিয়ন ও কনস্টান্টিনোপ্‌লের সুলতানের কাছেও বার্তা পাঠিয়েছিলেন।

উত্তরে পাঞ্জাবে রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে একটি শিখ রাজ্য গড়ে উঠছিল। পরে এ-রাজ্য কাশ্মীর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এও একটা ধারে-পাশের ব্যাপার, এতে আসল সংগ্রামে, অর্থাৎ ভারতবর্ষের উপর আধিপত্য লাভের সংগ্রামে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আসতেই বোঝা গেল যে এ-সংগ্রাম দুটি শক্তির মধ্যে—মারাঠা ও ইংরাজ, আর অন্যান্য রাজ্যগুলি এই দুটির কোনোটার অধীন কিংবা অনুগত।

মহীশূরে টিপু সুলতান ১৭৯৯ খৃস্টাব্দে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। এখন ক্ষেত্র উন্মুক্ত রইল মারাঠা ও ইংরাজদের মধ্যে শেষ মীমাংসার জন্য। ইংরাজদের একজন উচ্চ কর্মচারী চার্লস্ মেট্‌কাফ্ ১৮০৫ খৃস্টাব্দে লিখে গেছেন, 'ভারতে এখন দুটির বেশি প্রবল শক্তি নেই—ইংরাজ ও মারাঠা। অন্যান্য রাজ্যগুলি এদেরই এক কি অন্যের প্রভাব স্বীকার করে। আমরা এক ইঞ্চিও যদি পিছু হটি সেটুকু মারাঠারাই দখল করবে।' কিন্তু মারাঠা দলপতিদের মধ্যেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। তারা পৃথক পৃথকভাবে ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ও পরাজিত হয়। অবশ্য তারা কয়েকটা যুদ্ধে প্রশংসনীয়ভাবে জয়লাভ করেছিল। বিশেষভাবে ১৮০৪ খৃস্টাব্দে আগ্রার কাছে ইংরাজেরা তাদের কাছে ভীষণভাবে পরাজিত হয়। কিন্তু ১৮১৮ খৃস্টাব্দের মধ্যেই মারাঠা শক্তির শেষ পরাজয় ঘটে, আর মধ্য-ভারতে তাদের দলপতিরা আত্মসমর্পণ করে ও ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনতা স্বীকার করে। এখন ইংরাজেরা ভারতের এক বৃহৎ অংশের উপর অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজশক্তি হয়ে প্রত্যক্ষভাবে অথবা কাউকে সাক্ষী-গোপাল খাড়া করে অথবা অনুগত ব্যক্তিদের দ্বারা দেশ শাসন করতে লাগল। পাঞ্জাব এবং কোনো কোনো সীমান্ত-প্রদেশীয় স্থান তখনও ইংরাজদের অধীনে আসেনি, তবে ভারতে ব্রিটিশসাম্রাজ্য স্থাপিত হয়ে গেছে। এর পর দুচারটি যুদ্ধ ঘটে শিখ ও গুর্খাদের সঙ্গে, ও ব্রহ্মদেশে, এবং এগুলির ফলে মানচিত্রের উপর ইংরাজ-অধিকৃত অংশে যা বা একটু খোঁচ-খাঁচ ছিল তাও ঠিক হয়ে যায়।

১৪ : সংগঠন ও বিজ্ঞানসম্মত বিধিব্যবস্থায় ভারতের অনগ্রসরতা এবং ইংরাজদের উৎকর্ষ

ভারতেতিহাসের এই অধ্যায়টি সম্বন্ধে চিন্তা করলে একথাই অনেকটা মনে হয়, ইংরাজেরা যে ভারতে আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিল তা একটার পর একটা অনেক আকস্মিক ঘটনার জন্য এবং ভাগ্যক্রমে। সাম্রাজ্য ও প্রচুর ধনলাভ করে তারা জগতের মধ্যে শক্তিতে সর্বাগ্রগণ্য হয়েছিল, কিন্তু তার তুলনায় তাদের চেষ্টা করতে হয়েছিল সামান্যই। ঘটনাগুলির অন্য রূপ গ্রহণ করা সহজই ছিল, আর তা হলে তাদের সকল আশা চূর্ণ হত ও কোনো উচ্চাভিলাষের আর পথ থাকত না। হায়দার আলি, টিপু, মারাঠা, শিখ ও গুর্খা এই সকলের কাছেই তারা পরাজিত হয়েছিল। ভাগ্যের প্রসন্নতা একটুখানি কম হলেই ভারতে তাদের পা ফেলবারও জায়গা থাকত না, আর থাকলেও তা কেবল উপকূলবর্তী কোনো কোনো স্থানেই হতে পারত, অন্যত্র নয়।

তবে একটু তলিয়ে দেখলে প্রকাশ পায় যে তখন দেশের অবস্থা যা ছিল তাতে ইংরাজের রাজ্যলাভ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। অদৃষ্টের কৃপা যে ছিল তা জানা যায়, কিন্তু সুযোগ গ্রহণ করার যোগ্যতা ইংরাজদের ছিল। মুঘলসাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার পর ভারতবর্ষ একটা অব্যবস্থিত শৃঙ্খলাহীন অবস্থা লাভ করে। বহু শতাব্দী ধরে ভারত এত দুর্বল এত নিঃসহায় হয়নি। সুসংগঠিত শক্তি নষ্ট হওয়ায় সাহসী ও প্রচেষ্টাশীল রাজ্যলাভেচ্ছু ব্যক্তিদের কাছে এদেশ অবারিত হয়ে পড়ল। এই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে ছিল ইংরাজ; কেবল তাদেরই ছিল সেই সব গুণ যা এরূপ ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করতে হলে আবশ্যক। তাদের প্রধান অসুবিধা ছিল এই যে তারা দূর দেশ থেকে আগত বিদেশী; কিন্তু এই অসুবিধা তাদেরই অনুকূলে কাজ করেছিল, কারণ কেউই তাদের প্রতি কোনো গুরুত্ব আরোপ করেনি, ভাবেওনি যে ভারতবর্ষ অধিকারের জন্য তাদেরও যুদ্ধে নামা সম্ভব।

এ বড় আশ্চর্য যে এই ভ্রম পলাশীর যুদ্ধের পরেও অনেকদিন টিকে ছিল, আর তারা আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ ব্যাপারে দিল্লীর সাক্ষীগোপাল সম্রাটের প্রতিভূস্বরূপ কাজ করতে থাকায় এই ভুল ধারণাটা প্রবল হয়েছিল। বাঙলাদেশ হতে এমনভাবে তারা বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য নিয়ে গিয়েছিল এবং তাদের ব্যবসায়ের ধারাও ছিল এমন যে সাধারণের ধারণা জন্মেছিল, এই সকল বিদেশীরা কেবল অর্থ ও ধনরত্ন চায়, রাজত্ব তেমন চায় না। লোকে ভাবত যে তারা তৈমুর ও নাদির শাহের মত পীড়াদায়ক হলেও সাময়িক উৎপাতবিশেষ; ভাবত এই দুর্জন বিদেশাগতের মতই লুটপাট করে শেষ কালে নিজেদের দেশে ফিরে যাবে।

ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে এসেছিল ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে, আর তাদের সামরিক আয়োজন ছিল এই ব্যবসায় রক্ষার জন্য। কেউ একরূপ লক্ষ্যই করেনি যে তারা ধীরে ধীরে অধিকৃত স্থান বৃদ্ধি করে নিচ্ছিল, প্রধানত স্থানীয় বিবাদে পক্ষ গ্রহণ করে, এক প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপরের বিরুদ্ধে সাহায্য দিয়ে। এই কোম্পানীর সৈন্যেরা ছিল

সুশিক্ষিত, সুতরাং যে দলে যোগ দিত তারই সুবিধা হত, আর কোম্পানী এইরূপ সাহায্যের বিনিময়ে প্রভূত অর্থ আদায় করত। এইরূপে কোম্পানীর শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং এর সামরিক আয়োজনও আয়তনে বর্ধিত হয়। লোকে মনে করত এই সৈন্যদলকে ভাড়া নেওয়া যায়। যখন ধরা পড়ল যে ইংরাজেরা যা করছে তা নিজেদের জন্যই, অপরের জন্য নয়, এবং ভারতের উপর রাজকীয় প্রভুত্বলাভই তাদের উদ্দেশ্য, তার আগেই তারা এদেশে আপনাদের স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে।

বিদেশীবিদ্বেষ তখনও ছিল, এবং পরে তা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা কিন্তু আদৌ সাধারণ কিংবা বিস্তৃতভাবে জাতীয় মনোভাব হয়ে ওঠেনি। পটভূমিকা ছিল সামন্ততান্ত্রিক, সুতরাং স্থানীয় নায়ক বা দলপতির প্রতি আনুগত্য দেখান হত। চীনের ন্যায় এদেশেও নানা দুঃখকষ্ট প্রসারলাভ করায় লোকে যে-কোনো সামরিক নেতা নিয়মিত বেতন অথবা লুণ্ঠনের সুযোগ দানের প্রতিশ্রুতি দিত, বাধ্য হয়ে তারই সঙ্গে যোগদান করত। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্যেরা অধিকাংশ ছিল ভারতীয় সিপাই। কেবল মারাঠাদের মধ্যে কিছু জাতীয় ভাব দেখা যেত। অর্থাৎ কোনো নায়কের আনুগত্য অপেক্ষাও অধিক কিছু তাদের মধ্যে ছিল—কিন্তু তাও ছিল অনেকাংশে সঙ্কীর্ণ। তাদের ব্যবহারে রাজপুতদের ক্রোধের সঞ্চার হয়, কারণ তাদের বন্ধুরূপে পাবার চেষ্টা না করে মারাঠারা তাদের সঙ্গে শত্রুভাবে ব্যবহার করত। মারাঠা নায়কদের নিজেদের মধ্যেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, এবং মাঝে মাঝে অন্তর্বিপ্লবও ঘটত, যদিচ পেশোয়ার নেতৃত্বে তাদের মধ্যে একটা মৈত্রীবন্ধনের ভাব অস্পষ্টরূপে হলেও ছিল। অনেকবার বিপদের সময়ে তারা একে অন্যের সহায়তা না করায় শত্রুর কাছে পৃথক পৃথকভাবে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

তবু মারাঠাদের মধ্যে থেকে অনেক যোগ্য ব্যক্তি উদ্ভূত হয়েছেন—অনেক রাজনীতিক ও যোদ্ধা—যেমন নানা ফার্নাবিস, পেশোয়া প্রথম বাজিরাও, গোয়ালিয়রের মহাদাজি সিন্ধিয়া এবং ইন্দোরের হোলকার যশোবন্ত রাও আর রানী অহল্যাবাঈ। মারাঠাদের সাধারণ সৈনিকেরা ছিল উৎকৃষ্ট, তারা কর্তব্যভ্রষ্ট হত না এবং অবিচলিতভাবে নিশ্চয় মৃত্যুর সম্মুখীন হত। কিন্তু আশ্চর্য এই যে এত সাহসিকতার অন্তরালে তাদের মধ্যে, শান্তির সময়ে এবং যুদ্ধের কালেও, কেমন একটা অনভিজ্ঞতা এবং পূর্বাপর না ভেবেই অগ্রসর হওয়ার অভ্যাস প্রকাশ পেত। জগৎ সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান ছিল না, এমনকি ভারতের ভূ-বৃত্তান্তও তাদের অতি সামান্যই জানা ছিল। যাতে সব হতে বেশি ক্ষতি হত তা এই যে অন্যত্র কি ঘটছে এবং তাদের শত্রুরাই বা কি করছে সে খবরও তারা রাখত না। এরূপ অবস্থায় রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি অথবা কোনো সুফলপ্রদ সামরিক কৌশল অবলম্বন সম্ভব হয়নি। তারা অল্প সময়ের মধ্যে একস্থান হতে ছাউনি তুলে অন্যত্র যেতে পারত, এবং তাদের গতি ছিল ক্ষিপ্র, আর এই কারণে শত্রুরা চমকিত হত ও ভয় পেত, কিন্তু যুদ্ধটা তাদের কাছে সাহসের সঙ্গে শত্রুকে বার বার আক্রমণ করাতেই পর্যবসিত ছিল।

'গেরিলা'-যুদ্ধে অর্থাৎ লুকিয়ে থেকে আক্রমণ করায়, তারা সিদ্ধহস্ত ছিল। পরে

তারা যথারীতি সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠিত করে নেয়, তবে তাতে ফল তেমন হয়নি, কারণ যুদ্ধসজ্জায় লাভ হয়েছিল সত্য, কিন্তু অবিলম্বে স্থানান্তরিত হবার ক্ষমতা ও ক্ষিপ্রতা কমে গিয়েছিল। এই নূতন ব্যবস্থার সঙ্গে তারা সহজে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেনি। তারা আপনাদের খুব চতুর বলে মনে করত, আর চতুর তারা ছিলই। কিন্তু কি শান্তি, কি যুদ্ধের কালে, চাতুরীতেও তাদের হারিয়ে দেওয়া কঠিন ছিল না, কারণ একটা পুরাতন কাঠামোর মধ্যে ছিল তাদের চিন্তা আবদ্ধ, তার বাইরে যাবার শক্তি ছিল না।

বিদেশের শিক্ষিত সৈন্যেরা যে আজ্ঞানুবর্তিতায় ও কৌশলে উৎকৃষ্ট তা ভারতীয় রাজারা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা আপন আপন বাহিনীকে শিক্ষিত করে নেওয়ার জন্য ফরাসী এবং ইংরাজ অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন, আর এই দুই শ্রেণীর বিদেশীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকায় ভারতীয় বাহিনীগুলি ভালই গড়ে উঠেছিল। আগেই বলা হয়েছে যে হায়দার আলি এবং টিপুরও নৌ-শক্তির গুরুত্ব সম্বন্ধে ধারণা জন্মেছিল, কিন্তু তাঁরা বড়ই বিলম্বে ইংরাজদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপযুক্ত নৌবহর প্রস্তুত করে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, এবং সেইজন্য কৃতকার্য হতে পারেননি। মারাঠারাও এ-বিষয়ে একটা ক্ষীণ চেষ্টা করেছিল। ভারতে তখন জাহাজ নির্মিত হত, কিন্তু অল্পকালের মধ্যে নানা বিরুদ্ধতা সত্ত্বে নৌবহর গড়ে তোলা সহজ ছিল না। ভারতে ফরাসী-শক্তি লোপ পাওয়ায় ভারতীয় রাজাদের সৈন্যবাহিনীতে যে-সকল ফরাসী অধ্যক্ষ ছিল তাদের এদেশ ছেড়ে যেতে হয়। তারপর বিদেশী কর্মচারী যারা ছিল তারা প্রায় সকলেই ইংরাজ। প্রায়ই বিপদকালে তারা আপন প্রভুদের ত্যাগ করত, এবং কখনও কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুদের (ইংরাজ) কাছে আত্মসমর্পণ করত ও বাহিনীর সঙ্গে ধনরত্নাদিও নিয়ে শত্রুপক্ষে যোগ দিত। বিদেশী অধ্যক্ষদের উপর যে নির্ভর করা হত তা থেকে বোঝা যায় যে ভারতীয় শক্তিগুলির সামরিক বিভাগের বিধি-ব্যবস্থা পরিণতি লাভ করেনি, আর এই সকল ব্যক্তিরা নির্ভরযোগ্য ছিল না বলে সব সময়েই বিপদের সম্ভাবনা ছিল। দেশীয় রাজাদের শাসন ও সামরিক উভয় বিভাগে প্রায়ই ইংরাজেরা তাদের গুপ্ত বিভীষণ-বাহিনী নিযুক্ত রাখত।

মারাঠারা সমধর্মী হওয়ায় তাদের মধ্যে একতার ভাব এবং সমগ্র জাতির হিতাকাঙ্ক্ষা দেখা যেত, কিন্তু তথাপি তারা সামরিক ও অসামরিক বিষয়ে অনগ্রসর ছিল আর অন্যান্য ভারতীয় শক্তিগুলি ছিল আরও অনগ্রসর। রাজপুতেরা সাহসী ছিল, কিন্তু তারা চলত পুরাতন সামন্ততন্ত্রের পথে, আর ছিল অকর্মণ্যতার সঙ্গে তাদের ভাবালুতার আড়ম্বর। এ ছাড়া বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ চলতে থাকায় তাদের ভিতরে কোনো যোগ ছিল না। অনেকে পূর্বে আকবর যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন কতকটা তারই ফলে দিল্লীর লুপ্তপ্রায় রাজশক্তির প্রতি অনুরক্তি অনুভব করত, এবং তখনও সেই শক্তিরই পক্ষাবলম্বন করে ছিল। কিন্তু দিল্লীর এতটুকু সামর্থ্যও ছিল না যে এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারে, সুতরাং রাজপুতদের পতন ঘটতে থাকে, তারা অপরের হাতের খেলনা হয়, এবং অবশেষে মারাঠা-অধিনায়ক সিন্ধিয়ার আনুগত্য

স্বীকার করে। তাদের কোনো কোনো নায়ক নিজেরা যাতে রক্ষা পান সেজন্য একটা শক্তি-সমতা আনার চেষ্টা করেছিলেন। উত্তর ও মধ্য-ভারতের মুসলিম নরপতি ও সামন্তেরা রাজপুতদের মতই সামন্ততান্ত্রিক ও ধারণায় অনগ্রসর ছিল। তারা সাধারণ লোকের দুঃখ বৃদ্ধি করেছিল, আর তাদেরও কেউ কেউ মারাঠাদের আধিপত্য স্বীকার করেছিল।

নেপালের গুর্খারা ছিল উৎকৃষ্ট যোদ্ধা, নিয়মানুবর্তী, এবং ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্যদের সমকক্ষ, হয়তো তাদের অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর। যদিচ তাদের সংগঠন সম্পূর্ণরূপে সামন্ত-প্রাধান্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, নিজেদের মাতৃভূমির প্রতি তাদের অনুরক্তি ছিল গভীর, আর সেজন্য দেশরক্ষা ব্যাপারে তারা ছিল অদমনীয়। ইংরাজদের মনেও তারা ভীতির সঞ্চার করেছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে যে সংগ্রাম চলছিল তাতে তারা যোগ দেয়নি।

মারাঠারা উত্তর ও মধ্য-ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল কিন্তু সেখানে নিজেদের সুনিবদ্ধ করেনি—এসেছিল ও ফিরে গিয়েছিল, স্থায়ী হয়ে বসতে পারেনি। তখন সম্ভবত যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে কোনো নিশ্চয়তা ছিল না বলে সেখানে কেউই স্থায়ী হয়ে বসতে সমর্থ হচ্ছিল না। বাস্তবিক, ইংরাজের দ্বারা অধিকৃত অনেক অংশে, আর যেখানে ইংরাজদের আধিপত্য স্বীকৃত হয়েছে এরূপ স্থানেও, অবস্থা ছিল আরও মন্দ, এবং ইংরাজেরা কিংবা ইংরাজদের শাসন-ব্যবস্থা এই সকল স্থানেও স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি।

একথা আগেই বলা হয়েছে যে মারাঠাদের যুদ্ধবিগ্রহবিষয়ে দূরদর্শিতা ছিল না, আর পূর্বাপর বিচার করে কাজ করার অভ্যাসও তাদের মধ্যে দেখা যেত না। এ-বিষয়ে অন্যান্য ভারতীয় শক্তিগুলি ছিল আরও পশ্চাৎপদ। অন্যদিকে, ইংরাজেরা ছিল সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ। তাদের মধ্যে নির্ভীক ও প্রচেষ্টাশীল লোকের অভাব ছিল না। তারা সকলে এক নীতি অবলম্বন করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করত, বিবেচনা করে অগ্রসর হত, আর আদৌ হঠকারী ছিল না। এড্‌ওয়ার্ড টমসন লিখেছেন, ‘ভারতীয় রাজাদের সভায় ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দপ্তরের যারা থাকত তারা সকলেই এত তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ছিল যে ইংরাজ সাম্রাজ্যের আর কোথাও এরূপ বিচক্ষণতার সমাবেশ দেখা যায়নি।’ এই সকল রাজসভায় ইংরাজ-প্রতিনিধির প্রধান কাজ ছিল রাজমন্ত্রীদের ও অন্যান্য উচ্চরাজকর্মচারীদের উৎকোচ প্রদান করা ও কর্তব্যপথভ্রষ্ট করা। ঐতিহাসিকেরা বলেন যে ইংরাজদের গুপ্তচরের ব্যবস্থা ছিল পাকা। সকল রাজ-দরবারের সকল খবর তারা পেত এবং কার কিরূপ সৈন্যবল তাও জানত, কিন্তু তাদের বিপক্ষরা তাদের শক্তি কি অভিসন্ধি সম্বন্ধে জানতে পারত না। ইংরাজদের এই পঞ্চম-বাহিনী সকল সময়েই তৎপর থাকত, আর সকল প্রকার সঙ্গীন অবস্থায় এবং যুদ্ধের মধ্যেও বিপক্ষের লোক ভাঙিয়ে নিয়ে নিজেরা লাভবান হত। তাদের অনেক যুদ্ধই লড়াইয়ের আগেই জয় করে নিত। পলাশীতে তাই হয়েছিল এবং এই নীতি তারা শিখদের সঙ্গে যুদ্ধ পর্যন্ত বরাবর অনুসরণ করেছিল। ইতিহাসে আমরা পাই যে

গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়ার একজন সৈন্যাধ্যক্ষ গোপনে ষড়যন্ত্র করে যুদ্ধের সময়েই সমগ্র সৈন্যবলসহ ইংরাজদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। সিন্ধিয়ার রাজ্য হতে এক অংশ বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে একটি পৃথক ভারতীয় রাজ্য তৈরি করা হয়, এবং সিন্ধিয়ার এই বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীকে সেটি পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হয়। এরাজ্য এখনও আছে, আর লোকটির নামও রাজদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রবচনরূপে প্রচলিত আছে, ঠিক তেমনিভাবে যেমন বর্তমান সময়ে কুইস্‌লিঙের নাম এইরূপ দৃষ্টান্তের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

এই সকল আলোচনা হতে বোঝা যায় যে তখনকার কালে ইংরাজদের রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠন ছিল উৎকৃষ্ট, আর যোগ্য নায়কদের অধীনে তাদের শক্তিও ছিল ব্যূহবদ্ধ। তাদের বিপক্ষদের অপেক্ষা তারা সংবাদ রাখত অধিক, আর সেইজন্য ভারতীয় শক্তিগুলির মধ্যে অনৈক্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ সম্পূর্ণরূপে নিতে পারত। জলপথে প্রভুত্ব থাকায় তাদের নিরাপদ স্থান লাভের সুবিধা ছিল, আর দিন দিন তারা নিজেদের সম্বলও বাড়িয়ে নিতে পারত। কখনও পরাজিত হলেও পুনরায় শক্তিলাভ করে শত্রুকে আক্রমণ করতে পারত। পলাশীর যুদ্ধের পর বাঙলাদেশের উপর আধিপত্য পাওয়ায় তারা অনেক অর্থ লাভ করে এবং বহু সুবিধারও অধিকারী হয়, আর এইরূপে বললাভ ঘটায় তারা মারাঠা ও অন্যান্য শক্তিদের সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে থাকে। প্রত্যেকবার জয়লাভে তারা অধিকতর শক্তিমান হয়ে ওঠে। কিন্তু ভারতীয় শক্তিগুলি একবার পরাজিত হলে একবারেই ভেঙে পড়তে থাকে, আবার বললাভ করে যে যুদ্ধ করবে তা আর পারেনি।

এই যে যুদ্ধ, জয়-পরাজয়, লুণ্ঠন প্রভৃতির মরসুম এসেছিল, এ-সময়ে মধ্য-ভারত, রাজপুতানা ও দক্ষিণ এবং পশ্চিম-ভারতের অনেক অংশ বিপর্যস্ত হয়, এবং অশান্তি, অত্যাচার ও দুঃখদুর্দশার লীলাভূমি হয়ে পড়ে। এই সকল অংশের উপর দিয়ে সৈন্যদল চলাফেরা করত, আর তাদের পিছনে পিছনে আসত দস্যুদল। কেউই এসব স্থানের অধিবাসীদের কথা চিন্তাই করত না, কেমন করে তাদের ধনসম্পত্তি কেড়ে নেবে এই ছিল অত্যাচারীদের চিন্তার বিষয়। ভারতবর্ষের খানিকটা অংশের অবস্থা হয়েছিল ত্রিশ-বছরব্যাপী যুদ্ধের কালে মধ্য ইউরোপের মত। বলতে গেলে ভারতের কোনো স্থানেরই অবস্থা ভাল ছিল না, তবে সব থেকে মন্দ হয়েছিল যে-সকল স্থানে ইংরাজেরা প্রভুত্ব স্থাপন করেছিল সেখানে। এড্‌ওয়ার্ড টমসন লিখেছেন, '......মাদ্রাজে এবং ইংরাজদের অনুগত অযোধ্যা ও হায়দ্রাবাদ রাজ্যে যে অবস্থা উপস্থিত হয়েছিল তার অপেক্ষা উৎকট আর কিছু হতেই পারে না—মানুষের দুর্দশা বৃদ্ধি পেয়ে এ সকল স্থানে যেন বুদ্ধিভ্রংশ উপস্থিত হয়েছিল। এদের তুলনায় মারাঠা রাজনীতিক নানা ফার্নাবিসের দ্বারা শাসিত অংশকে নির্বিঘ্ন মরূদ্যান বলা চলত।'

এরই অব্যবহিত পূর্বে, মুঘলসাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়া সত্ত্বেও, ভারতের অনেক স্থানে বিশৃঙ্খলা বড় একটা দেখা যায়নি। বাঙলাদেশে, প্রায়-স্বাধীন মুঘল রাজপ্রতিনিধি আল্লাবর্দীর রাজত্বকালে শান্তিপূর্ণ সুশৃঙ্খল শাসন পরিচালিত

হয়েছিল, তখন ব্যবসায়-বাণিজ্য উন্নতিলাভ করে ও প্রদেশটি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। আল্লাবর্দীর মৃত্যুর কিছুকাল পরে ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ হয় এবং ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজেদের দিল্লীর সম্রাটের প্রতিভূরূপে প্রতিষ্ঠিত করে যদিচ প্রকৃতপক্ষে তারা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনই ছিল এবং যথা ইচ্ছা কাজ করতে পারত। তারপর আরম্ভ হল কোম্পানীর স্বার্থে তাদের আপন লোক ও অনুগতজনদের দ্বারা বাঙলাদেশের লুণ্ঠন। পলাশীর যুদ্ধের কিছুকাল পরে মধ্য-ভারতে ইন্দোরে অহল্যাবাঈ-এর রাজত্ব আরম্ভ হয়, এবং তা ত্রিশ বছর চলে (১৭৬৫-১৭৯৫)। এই সময়ে শাসনকার্য এরূপ সুশৃঙ্খলায় চলেছিল ও লোকের সুখ-সমৃদ্ধি এরূপ বৃদ্ধি পেয়েছিল যে এসব কথা কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। অহল্যাবাঈ রাজকার্যে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন, এবং রাজ্যকে সুব্যবস্থিত করে তোলেন। জীবিতকালে তিনি সকলের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন, আর তাঁর মৃত্যুর পর কৃতজ্ঞ প্রজারা তাঁকে ঋষিতুল্যা বিবেচনা করে তাঁর স্মৃতির পূজা করেছে। এইভাবে দেখা যায় যে, যখন ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অন্তর্গত হয়ে বাঙলা ও বিহারের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে—লুঠতরাজ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার জন্য ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়—ঠিক সেই সময়ে মধ্য-ভারতে ও দেশের অন্যান্য অনেক স্থানে প্রজারা সুখে বসবাস করছিল।

ইংরাজেরা শক্তি ও ধন দুই-ই লাভ করেছিল কিন্তু সুশাসন দূরের কথা কোনো প্রকার শাসনসম্বন্ধেই কোনো দায়িত্ব অনুভব করত না। ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর অংশীদার বণিকদের দৃষ্টি ছিল কেবল লভ্যাংশ ও ধনসম্পত্তির উপর। তারা তাঁবেদার ব্যক্তিদের উন্নতি কি তাদের রক্ষা বিষয়েও মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক বলে মনে করেনি। বিশেষভাবে তাদেরই অধীন রাজ্যগুলিতে শক্তিমান লোকেদের মনে কোনো প্রকার দায়িত্বজ্ঞানই ছিল না।

মারাঠাদের সম্পূর্ণরূপে দমন করার পর যখন ইংরাজদের অধিকার নির্বিঘ্ন হল তখন তারা সাধারণ অসামরিক শাসন বিষয়ে মনোযোগ দিতে আরম্ভ করে ও একটা শৃঙ্খলাও আনে, কিন্তু অধীন রাজ্যগুলিতে এ উন্নতি হচ্ছিল অতি ধীরে ধীরে, কারণ সে-সকল স্থানে উপরিতন লোকেদের মধ্যে কোনো কর্তব্যবোধ দেখা যেত না।

পাছে ভুলে যাই সেই জন্য আমাদের বারবার শোনান হয় যে ইংরাজেরা ভারতবর্ষকে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা হতে উদ্ধার করেছে। আমরা যে কালের কথা লিখছি তাকে মারাঠা 'ভয়ঙ্কর কাল' আখ্যা দিয়েছিল। ইংরাজেরা এর পর যে বিধিবদ্ধ শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল সেকথা সত্য। কিন্তু ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী ও তাদের প্রতিনিধিরা যে নীতি অবলম্বন করেছিল সেইজন্যই তো দেশে এসেছিল বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা। একথাও মনে করা যেতে পারে যে প্রভুত্বের জন্য যে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছিল তার নিষ্পত্তি হবার পর এ-বিষয়ে ইংরাজদের স্বতঃপ্রবৃত্ত ও সাগ্রহ চেষ্টা না থাকলেও দেশে শান্তি ও সুব্যবস্থা আসতে পারত। অন্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও. তার পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে, এরূপ অনেকবারই ঘটেছে।

১৫ : রণজিৎ সিংহ এবং জয়সিংহ

ভারতবাসীর যোগ্যতার অভাব ঘটায় এবং সমাজব্যবস্থায় ইংরাজেরা অগ্রসর ও উন্নতিশীল হওয়ায় এদেশ এই বিজয়ী বিদেশীদের করায়ত্ত হয়েছিল। এই দুই পক্ষের নেতৃস্থানীয় লোকেদের মধ্যে তুলনা করলে স্পষ্টই দেখা যায় যে ভারতীয়েরা, যতই তাঁদের যোগ্যতা থাকুক না কেন, চিন্তা ও কর্মে সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকতেন, সুতরাং কোথায় কি ঘটছে তার খবরই রাখতেন না। এরূপ ক্ষেত্রে, সমাজের অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটলে নিজের চলাফেরা একটু দেখে যে তার সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন তার কোনো সুযোগই পেতেন না। যদি বা কোনো কোনো ব্যক্তির মনে কৌতূহল জাগত, যে-গন্ডীর মধ্যে তাঁরা ও তাঁদের আপনজনেরা রুদ্ধ হয়ে থাকতেন তার বাইরে যাবার শক্তি তাঁদের ছিল না। অপর দিকে ইংরাজেরা ছিল বৈষয়িক ব্যাপারে বিজ্ঞ। তাদের নিজের দেশে এবং ফ্রান্স ও আমেরিকায় যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে তাতে তাদের ভাবিয়ে তোলে। ইতিমধ্যে দুটো বিপ্লব ঘটে গেছে। ফরাসী বিপ্লবী-বাহিনী ও নেপোলিয়নের বাহিনীর সমরনীতিতে যুদ্ধশাস্ত্রই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ভারতে যে-সকল ইংরাজেরা এসেছিল তাদের মধ্যে অজ্ঞ ব্যক্তিরাও আগমনের পথে জগতের অনেক অংশই দেখে এসেছিল এবং এইভাবে তাদেরও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইংলণ্ডেও এই সময়ে অনেক আবিষ্ক্রিয়া ঘটছিল। পরবর্তীকালের শ্রমশিল্পঘটিত বৈপ্লবিক পরিবর্তন সকলের সূত্রপাত এখনই হয়, যদিচ প্রথমে জানা যায়নি যে বিষয়টি এতই গুরুতর এবং এর প্রভাব এতই সুদূর-প্রসারী হবে। পরিবর্তনের বীজ সমাজের সকল অঙ্গে তখন কাজ করছিল, ফলে ইংলণ্ডের শক্তি বর্ধিত হয়ে দূর দূর দেশে প্রসারিত হল।

যাঁরা ভারতের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁদের মন যুদ্ধ-বিগ্রহ আর রাজনৈতিক ও সামরিক নেতাদের বিষয়েই পূর্ণ ছিল, সুতরাং ভারতের মনোজগতে কি ঘটছিল এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়েই বা কি প্রক্রিয়া চলছিল সে-সকল বিষয়ে তাঁরা একরূপ কিছুই লেখেননি বলা যেতে পারে—তাঁদের লেখা হতে অল্পস্বল্প ইঙ্গিতমাত্র কখনও কখনও পাওয়া যায়। এই ভীতিসঙ্কুল সময়ে মানুষের মন একেবারে ভেঙে পড়েছিল, যেন দুর্দৈবের হাতে আত্মসমর্পণ করে সকল লোকে বুদ্ধি, প্রয়াস, জ্ঞানস্পৃহা, সমস্তই হারিয়ে বসেছিল। অবশ্য এমন লোকও অনেক ছিলেন যাঁরা নবাগত শক্তিগুলিকে জেনে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অবস্থাগতিকে তাঁরাও হৃতশক্তি হয়ে পড়ায় বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেননি।

এ'দের মধ্যে একজনের নাম রণজিৎ সিংহ। তিনি ছিলেন জাট শিখ। পাঞ্জাবে রাজ্য স্থাপন করে তিনি কাশ্মীর ও সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত নিজের রাজ্য বিস্তৃত করেছিলেন। তাঁর অনেক দুর্বলতা ও অনেক দোষ, তবু তাঁর কথা ভোলবার নয়। ফরাসীদেশীয় জাক্‌ম' বলেছেন যে তিনি 'বিশেষ সাহসী পুরুষ' ছিলেন এবং আরও বলেছেন, 'ভারতীয়দের মধ্যে এই প্রথম একজনকে দেখলাম যাঁর জানবার স্পৃহা প্রবল। সমগ্র

জাতির ঔদাসীন্যজনিত দোষ যেন একজনের জ্ঞানস্পৃহায় দূর হয়েছে।' 'তাঁর সঙ্গে আলাপ একটা দুঃস্বপ্নের ন্যায় ভীতিপ্রদ।'* মনে রাখতে হবে যে ভারতীয়েরা, আর বিশেষভাবে তাঁদের মধ্যে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা, মিতভাষী। এ'দের মধ্যে অতি অল্প লোকেই তখনকার দিনের বিদেশী সমর-নায়ক ও ভাগ্যান্বেষীদের সঙ্গে কোনো প্রকার যোগাযোগ ইচ্ছা করতেন, কারণ এই বিদেশীদের অনেক কাজই ছিল ভয়াবহ। সেইজন্য বুদ্ধিমান ভারতীয়েরা তাদের কাছ হতে যতদূর সম্ভব দূরে থেকে আপন আপন সম্মান রক্ষা করতেন। আর যদি বা কোনো কারণে সাক্ষাৎকার অনিবার্য হত, যতদূর সম্ভব মামুলিভাবে তা শেষ করতেন। সাধারণত যে-সকল ভারতীয় ব্যক্তিরা ইংরাজ কিংবা অন্যান্য বিদেশীয়দের সংস্পর্শে আসত তারা ছিল দুই শ্রেণীর—হয় সুবিধাবাদী হীনপ্রকৃতির মানুষ, নয় ভারতীয় রাজাদের দুষ্টবুদ্ধি ও চক্রান্তকারী কোনো কোনো মন্ত্রী।

রণজিৎ সিংহ যে কেবল কৌতূহলী ও জ্ঞানপিপাসু ছিলেন তা নয়; তাঁর সময়ে ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর সর্বত্রই পরের বিষয়ে উদাসীনতা ও নির্মমতা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন দয়াশীল। তিনি একটা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং প্রবল সৈন্য-বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন, কিন্তু রক্তপাত তিনি পছন্দ করতেন না। প্রিন্সেপ বলেছেন, 'এরূপ অল্পমাত্র অপরাধ করে কেউ আজ পর্যন্ত এত বড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি।' যখন ইংলণ্ডে সামান্য চৌর্য-অপরাধেও মানুষের প্রাণদণ্ড হত সেই সময়ে তিনি আপন রাজ্যে অপরাধ যতই গুরুতর হোক—এ-দণ্ড রহিত করেছিলেন। অস্‌বর্ণ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি লিখে গেছেন, 'যুদ্ধের মধ্যে ছাড়া, তিনি হত্যা করেছেন বলে শোনা যায় না, যদিও অনেকবার তাঁকেই হত্যা করার চেষ্টা হয়েছিল। অনেক সুসভ্য রাজার শাসনকালের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে এ'র রাজত্বকাল প্রজাদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার ও তাদের উপর অত্যাচার হতে বহুল পরিমাণে মুক্ত ছিল।'*

রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুরের সাওয়াই জয়সিংহ অন্য প্রকৃতির রাজনীতিক ছিলেন। তিনি ১৭৪৩ খৃস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। সুতরাং তিনি রণজিৎ সিংহের আগেকার লোক। আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যখন ভাঙা-চোরা চলছে তিনি তখনকার লোক। এই সময়, অল্পদিনের মধ্যে একটার পর একটা অনেক বিপর্যয় ঘটেছিল, কিন্তু ইনিও ছিলেন চতুর ও সুবিধা গ্রহণে তৎপর, সুতরাং এই সব সত্ত্বেও টিকে থাকতে পেরেছিলেন। তিনি দিল্লীর সম্রাটের প্রভুত্ব স্বীকার করেন। যখন দেখলেন যে মারাঠারা দ্রুত অগ্রসর হয়ে এসেছে, এবং তারা এতই বলবান যে তাদের গতিরোধ করা অসম্ভব, সম্রাটের পক্ষ থেকে তিনি তাদের সঙ্গে আপোষ করে নেন। কিন্তু, তাঁর রাজনৈতিক কি সামরিক কার্যকলাপ আমার লক্ষণীয় বিষয় নয়। তিনি ছিলেন নির্ভীক যোদ্ধা এবং কূটনীতিতে যোগ্যতাসম্পন্ন, কিন্তু এসব ছাড়া ব্যক্তি হিসাবে তাঁর আরও

* টম্‌সন : ১৫৭ ও ১৫৮ পৃঃ হতে উদ্ধৃত।

বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি একাধারে গণিতজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক, এবং জ্যোতির্বিদ্যা ও পুর-পরিকল্পনা-বিশারদ ছিলেন। ইতিহাসের আলোচনাতেও তাঁর আগ্রহ ছিল।

জয়সিংহ জয়পুর, দিল্লী, উজ্জয়িনী, বারাণসী ও ও মথুরায় বিশাল মানমন্দির গঠন করেন। পোর্টুগীজ ধর্মযাজকদের কাছ থেকে তাঁদের দেশে জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতির কথা শুনে তিনি তাঁদেরই একজনের সঙ্গে পর্টুগালের রাজা ইমানিউএলের রাজসভায় নিজের কয়েকজন লোক প্রেরণ করেন। ইমানিউএল তাঁর দূত জেভিয়ার দা সিলভাকে পাঠান ও তাঁর সঙ্গে দেলা হায়ারকৃত মান-তালিকা পাঠিয়ে দেন। নিজের তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে তিনি দেখতে পান যে পর্টুগালের তালিকা তেমন নির্ভুল ছিল না। তাঁর মতে ব্যবহৃত যন্ত্রের ব্যাস যথাপরিমাণ না হওয়ায় এই ভুলগুলি তালিকায় প্রবেশ-লাভ করে।

জয়সিংহ ভারতীয় গণিতে সম্পূর্ণরূপে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি গ্রীকদেশীয় পুরাতন গণিত-গ্রন্থসকল অধ্যয়ন করেছিলেন এবং এই বিষয়ে তখন পর্যন্ত ইউরোপে আবিষ্কৃত সকল কথাই তিনি জানতেন। ইউক্লিড-এর জ্যামিতি প্রভৃতি অনেক গ্রীক দেশীয় গ্রন্থ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। আর সামতলিক ও গোলীয় ত্রিকোণমিতির ইউরোপীয় পুস্তকও তাঁর ছিল। এ ছাড়া প্রঘাত-তালিকা প্রস্তুত করিয়ে তা সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়েছিলেন। জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে অনেকগুলি আরবীয় গ্রন্থও তিনি অনুবাদ্ করিয়েছিলেন।

তিনি জয়পুর নগর প্রতিষ্ঠা করেন। পুর-পরিকল্পনায় তাঁর আগ্রহ থাকায় তখনকার দিনের অনেক ইউরোপীয় নগরের নক্সা সংগ্রহ করেছিলেন। পরে তাঁর আপন নগরের নক্সা প্রস্তুত হয়। জয়পুরের যাদুঘরে এই সকল পুরাতন নক্সাগুলি রক্ষিত আছে। জয়পুর নগর এতই সুন্দরভাবে রচিত হয়েছে যে এখনও পুর-পরিকল্পনার আদর্শ-রূপে গৃহীত হয়ে থাকে।

জয়সিংহ এই সময়কার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও চক্রান্তে অনেক সময় লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও, তাঁর স্বল্প-পরিসর জীবনের মধ্যে এই সমস্ত এবং আরও অনেক কাজ করে গেছেন। জয়সিংহের মৃত্যুর মাত্র চার বছর আগে নাদির শাহের আক্রমণ ঘটে। যে-কোনো দেশে, যে-কোনো কালে জয়সিংহ একজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি বলে বিবেচিত হতে পারতেন। এটা লক্ষ্য করতে হবে যে রাজপুতানার সামন্ততান্ত্রিক যুগে আর ভারত-বর্ষের একটা বিপর্যয়-সংকুল সময়ে তিনি বিজ্ঞানের আলোচনা করেছিলেন এবং এ-বিষয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠালাভও ঘটেছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে ভারতে বৈজ্ঞানিক অনু-সন্ধান লুপ্ত হয়নি, এবং তখনকার দিনে দেশে এমন একটা চিন্তা-স্রোত বর্তমান ছিল যা থেকে সুযোগ পেলে অনেক সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। জয়সিংহই একক এ-সকল বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন, আর দেশের অপর সকলে উদাসীন ছিল তা নয়। তিনি তখনকার যুগের প্রভাবেই তাঁর বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিলেন এবং নিজের সঙ্গে কাজ করবার জন্য বহু বৈজ্ঞানিক কর্মীকে সংগ্রহ করেছিলেন। এঁদের কয়েকজনকে তিনি পোর্টুগালে দূতনিবাসে পাঠিয়েছিলেন, সামাজিক বাধানিষেধ মানেননি।

আমাদের মনে হয় দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার অনুকূল অনেক কিছুই ছিল, কেবল সুযোগ ছিল না। এ সুযোগ অনেকদিন পর্যন্তই আসেনি। এমনকি দেশে শান্তি এলেও এ কাজ প্রভুত্বসম্পন্ন লোকেদের কাছ থেকে উৎসাহ পায়নি।

১৬ : ভারতের অর্থনৈতিক পটভূমিকা : দুই ইংলন্ড

এই সকল সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক পরিবর্তন যখন ঘটছিল, তখন ভারতের অর্থ-নৈতিক পটভূমিকা কিরূপ ছিল তা জানা আবশ্যক। ভি. অ্যান্স্টে লিখেছেন অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত 'ভারতের বস্তুসম্ভার উৎপাদনের ব্যবস্থা এবং শ্রমশিল্প ও বাণিজ্য সংগঠন তখনকার দিনে পৃথিবীর যে-কোনো দেশে প্রচলিত এই সকল বিষয়ের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারত।'

ভারতে তখন প্রচুর পরিমাণে বহু দ্রব্য প্রস্তুত করার আয়োজন ছিল ও এই সকল দ্রব্য ইউরোপ ও অন্যান্য স্থানে বিক্রয়ের জন্য পাঠান হত। তখন এদেশে সর্বত্র পোদ্দারী ব্যবস্থা (ব্যাঙ্কের কাজ) উন্নতিলাভ করেছিল ও সমৃদ্ধ বণিকদের দ্বারা প্রদত্ত হুন্ডী প্রভৃতি এখানকার সকল বাণিজ্যকেন্দ্রে এবং ইরান, কাবুল, হিরাট, টাশকেণ্ট প্রভৃতি মধ্য এশিয়ার সকল স্থানে গৃহীত হত। বাণিজ্যে বহু অর্থ নিয়োজিত হয়েছিল, আর দেশে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী, কর্মী, দালাল প্রভৃতির একটা জালই যেন ছড়িয়ে ছিল। জাহাজ তৈরির ব্যবসায়ে ভারত উন্নতিলাভ করে ও নেপোলিয়নের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধে ব্যবহৃত তাঁদের একজন নৌ-সেনাপতির ধ্বজাবাহী প্রধান জাহাজখানি এদেশে এই দেশীয়দের দ্বারা পরিচালিত জাহাজ প্রস্তুতের কারখানায় তৈরি হয়েছিল। বস্তুত শ্রমশিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনীতি-ঘটিত ব্যাপারে এদেশ শ্রমশিল্প-আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত সকল দেশেরই সমকক্ষ ছিল। দেশে স্থায়ী ও শান্তিপূর্ণ শাসন না থাকলে, এবং চলাচলের পথ-ঘাট নিরাপদ না হলে কোনো দেশই এরূপ উন্নতি করতে পারে না।

ভারতে প্রস্তুত দ্রব্যসম্ভার উৎকৃষ্ট হওয়ায় বিদেশে তাদের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, এবং এই কারণে ভারতীয়দের মধ্যে বিদেশে প্রচেষ্টাশীল হবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। প্রথম দিকে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান কাজ ছিল ভারতীয় দ্রব্য নিয়ে ইউরোপে ব্যবসায় করা। এ ব্যবসায় বিশেষভাবে লাভজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভারতের কারিগরদের কর্ম-প্রণালী এতই উন্নতিলাভ করেছিল এবং তাদের নৈপুণ্য এতই অধিক ছিল যে তারা ইংলন্ডে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানসম্মত উচ্চতর প্রণালীর সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারত। ইংলন্ডে যখন প্রবল যান্ত্রিক যুগ এল তখন সেদেশে শুল্কের হার অতিরিক্ত রকম বৃদ্ধি করে ভারতীয় দ্রব্যের আমদানি বন্ধ করতে হয়েছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ-আমদানি একেবারে নিষেধই করতে হয়েছিল।

ক্লাইভ ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে মুর্শিদাবাদ নগরটিকে যেরূপ দেখেছিলেন তার বর্ণনা দিয়েছেন : 'লন্ডনের ন্যায় সুবিস্তৃত, জনাকীর্ণ ও সমৃদ্ধ নগর, পার্থক্য কেবল এই যে লন্ডনের অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্যবান লোক এখানে বাস করে।' পূর্ব-বাঙলার ঢাকা

নগর মসলিনের জন্য প্রসিদ্ধ। এই দুই প্রধান নগর হিন্দুস্থানের সীমান্তের সন্নিকটে অবস্থিত। এই বিশাল দেশের সর্বত্র আরও অনেক বৃহত্তর নগর ছিল, অনেক শ্রমশিল্প এবং ব্যবসায়ের কেন্দ্রও ছিল, আর সংবাদ ও বাজার দর প্রভৃতির আদান-প্রদানের জন্য কৌশলপূর্ণ ডাক চলাচলের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। দেশের বড় বড় ব্যবসায়ীরা যুদ্ধ-বিগ্রহের সংবাদাদি ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা পাবার আগেই সংগ্রহ করতে পারত। এইরূপে দেখা যায় যে শ্রমশিল্প-ঘটিত বিপ্লব উপস্থিত হওয়ার আগেই ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্ভবমত উন্নত হয়েছিল। একথা অবশ্য বলা শক্ত আরও উন্নতিলাভ করার শক্তি তার ছিল কি না, এবং দেশের সামাজিক বিধিনিষেধের কঠোরতায় তা কতখানি বাধাক্রান্ত হয়েছিল। তবে মনে হয়, সময়টা স্বাভাবিক হলে ভারত যথা-প্রয়োজন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে, আপন পথে শ্রমশিল্প-ঘটিত নূতন অবস্থার উপযোগী হয়ে উঠত। তবু পরিবর্তনের প্রয়োজন উপস্থিত হলে তার জন্য আপন কাঠামোর মধ্যে একটা বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। হয়তো এটাকে ঘটিয়ে তোলার জন্য ভিতরে ভিতরে আরও কিছু আবশ্যক হত। তবে এটা বোঝা যায় যে শিল্প-আন্দোলনের আগে ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উন্নত ও সুবিধিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এদেশ শ্রমশিল্পে উন্নত দেশের সঙ্গে দ্রব্য-উৎপাদন বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেনি। অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়ে যায় যে হয় এদেশ শ্রমশিল্পের উন্নতি করবে, নয় তার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রভাব প্রবেশলাভ করবে—এ দুটোর একটা হবেই। আসলে কিন্তু বৈদেশিক প্রভুত্বই আগে এসেছিল, আর এই জন্য বহুদিন ধরে ভারত যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল অল্পকালের মধ্যেই তা নষ্ট হয়ে যায়, আর কোনো উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা তার স্থান গ্রহণ করেনি। এক ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী ইংরাজ রাষ্ট্রনৈতিক-শক্তি ও অর্থনৈতিক-শক্তির প্রতিনিধিত্ব করত। এদেশে তার শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল এরূপ যে তার উপর কারও কিছু বলবার অধিকার ছিল না, আর এটা ইংরাজ বণিকদের ব্যাপার হওয়ায় অর্থলোভই ছিল এর উদ্দেশ্য। যে-সময় এই কোম্পানী অতি দ্রুত আশ্চর্যরূপে অর্থসংগ্রহ করছিল, সেই সময়ে, ১৭৭৬ খৃস্টাব্দে, অ্যাডাম স্মিথ 'দি ওয়েল্‌থ্‌ অফ নেশন্‌স্‌' গ্রন্থতে লিখেছিলেন, 'বণিক সম্প্রদায়ের দ্বারা শাসন অপেক্ষা কোনো দেশের পক্ষে নিকৃষ্টতর শাসন আর নেই।'

ভারতীয় বণিক ও দ্রব্য-উৎপাদনকারী সম্প্রদায় ধনী ছিল। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণও তারাই করত, কিন্তু তাদের হাতে কোনো রাজনৈতিক শক্তি ছিল না। তখন শাসন ছিল স্বেচ্ছাচারী, আর বহুল পরিমাণে সামন্ততান্ত্রিক। বস্তুত ভারতের ইতিহাসের আর কোনো পর্যায়ে এতটা সামন্ততান্ত্রিক শাসন ছিল না। সুতরাং পশ্চিম দেশের ন্যায় এখানে কোনো প্রবল মধ্যবিত্তশ্রেণী না থাকায় রাজশক্তি হস্তগত করার জন্য চেষ্টা করবারও কেউ ছিল না। লোকেরা সাধারণত এ-বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করত আর দাসভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। এইরূপে দেশের লোকসমাজে একটা জায়গা হয়ে উঠেছিল শূন্য, এটা পূর্ণ না হলে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব ছিল না। এই যে শূন্যতা তা হয়তো ভারতীয় সমাজের নিশ্চল অবস্থার জন্যই ঘটেছিল, কারণ

এই সমাজ এই সদা-পরিবর্তনশীল জগতে থেকেও কোনো প্রকার নূতনত্ব, কোনো পরিবর্তন, স্বীকার করতে চাইত না। কোনো সভ্যতা পরিবর্তনের অমোঘনীতিকে বাধা দিয়ে অচল হয়ে টিকে থাকতে পারে না। এখানকার সমাজ হতে সৃষ্টি-শক্তি লোপ পেয়েছিল। তা না হলে আরও আগেই তাতে পরিবর্তন আসা উচিত ছিল।

সে সময়ে ইংরাজেরা রাজনৈতিক ব্যাপারে অনেক পরিমাণে অগ্রসর ছিল। তাদের রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটে গেছে, আর তাদের পার্লামেণ্টের শক্তি রাজার শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। তাদের মধ্যবিত্তশ্রেণী নূতন শক্তি অনুভব করে বিস্তৃতিলাভের জন্য প্রয়াসী হয়ে উঠেছে। উন্নতিশীল প্রসারধর্মী সমাজে যে প্রবল জীবনীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তা ইংলণ্ডে বাস্তবিকই দেখা গেছে। নানা ভাবে নানা রূপে, বিশেষভাবে উদ্ভাবনা ও আবিষ্ক্রিয়ায়, তা প্রকাশ পেয়ে শ্রমশিল্প-ঘটিত বৈপ্লবিক পরিবর্তন উপস্থিত করেছে।

তখন ইংরাজ শাসকশ্রেণীর লোকেরা কিরূপ ছিল এই প্রশ্ন উঠতে পারে। মার্কিন ঐতিহাসিক চার্লস ও মেরী বিয়ার্ড দেখিয়েছেন যে মার্কিণ-বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার পরে সেদেশে ইংরাজ-রাজের অধিকারে যে-সকল প্রদেশ ছিল সেগুলি হতে ইংরাজ শাসকশ্রেণীর লোকেরা হঠাৎ বহিষ্কৃত হয়েছিল। এই সকল লোকেদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'এদের ফৌজদারী আইন ছিল বর্বর শ্রেণীর, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা ছিল সঙ্কীর্ণ, অসহনশীল, কঠোর। শাসনব্যবস্থায় দেখা যেত যে এর মূল ব্যাপারটা কতকগুলি উচ্চপদ ও সুযোগ-সুবিধার সমষ্টিমাত্র। এতে শ্রমজীবী নরনারীদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ পেত, সাধারণ লোকেদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার নিরস্ত ছিল, এবং প্রচলিত ধর্ম—কি ক্যাথলিক কি ভিন্নমতাবলম্বী, সকলকেই সমানভাবে গ্রহণ করান হয়েছিল, দেশে দেশে এবং পল্লীতে পল্লীতে 'স্কোয়ার' (জমিদার) ও ধর্মযাজকেরা প্রভুত্ব সম্পন্ন ছিল। সৈন্য ও নৌবিভাগে হৃদয়হীন ব্যবহার চলত, আর কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠপুত্রে দায়াধিকার বর্তানোর আইন থাকায় ভূস্বামীদের প্রতিপত্তি নিরঙ্কুশ হয়ে ছিল, এবং বহু পদস্থ ব্যক্তি চাটুকারবৃত্তি অবলম্বন করে, রাজার নিকট হতে এমন সকল পদ, মাসোহারা প্রভৃতি আদায় করত যার জন্য তাদের কোনো বিশেষ কাজ করতে হত না। এর উপর দেশের ধর্মবিষয়ক বিধি-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় সংগঠন এরূপ ছিল যে সাধারণ লোকেরা এই সকল শক্তিশালী ব্যক্তিদের উদ্ধত ব্যবহার ও লুণ্ঠনে বিব্রত থাকত। ইংরাজ-রাজের প্রভুত্বাধীনে উপনিবেশিকদের এই পর্বত-প্রমাণ অত্যাচার সহ্য করে বসবাস করতে হত। মার্কিণ-বিপ্লবীরা তাদের এই দুর্গতি থেকে মুক্তিদান করল। মুক্তিলাভের দশ-বিশ বছরের মধ্যেই এরা আইনে ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বহু সংস্কার এনে ফেলল। ইংলণ্ডে এইরূপ সংস্কার ঘটতে শত-বৎসর-ব্যাপী একটানা আন্দোলনের প্রয়োজন হয়েছিল। যে সকল রাজনীতিকের চেষ্টায় এরূপ ঘটেছিল তাঁদের নাম ইংলণ্ডের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।'*

* 'দি রাইজ অফ্ আমেরিকান সিভিলাইজেশন' (১৯২৮) ১ম খণ্ড, ২৯২ পৃঃ।

স্বাধীনতার ইতিহাসে একটা বিশেষ যুগ প্রবর্তক ঘটনা হল মার্কিণ দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা। এই ঘোষণা ১৭৭৬ খৃস্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয়, আর তার ছ'বছর পরে উপনিবেশগুলি ইংলণ্ড হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিদ্যা-বুদ্ধি, অর্থনীতি ও সমাজ, এইসকল বিষয়ে তাদের যথার্থ বিপ্লব আরম্ভ করে। ভূমিবিভাগ সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তা ইংরাজের প্রভাবের মধ্যে ইংলণ্ডের আদর্শে গঠিত হয়েছিল, এখন তা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হল। অনেকে বহু বিশিষ্ট অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করত, তার অধিকাংশই রহিত করা হয় এবং বৃহদায়তন ভূসম্পত্তিগুলিকে বাজেয়াপ্ত করে ছোট ছোট খণ্ডরূপে বিলি করা হয়। এখন এল একটি জাগরণের দিন; বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন ও অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা প্রবলভাবে চলতে থাকল। স্বাধীন মার্কিন দেশ সামন্ততন্ত্রের সমস্ত চিহ্ন হতে এবং বিদেশীর প্রভুত্ব হতে মুক্ত হয়ে বিশাল পদক্ষেপে অগ্রসর হতে লাগল।

ফ্রান্সে মহাবিদ্রোহ এসে পুরাতন শাসনযন্ত্রের প্রতীক—অত্যাচারের কারাগার বাস্তিল ভেঙে-চুরে ধূলিসাৎ করে দিল, রাজশক্তির সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততন্ত্রকে ভাসিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিল। সারা পৃথিবীর চোখের সামনে ফ্রান্স মানুষের ন্যায্য অধিকারের ঘোষণাপত্র তুলে ধরল।

সমসাময়িক ইংলণ্ডের অবস্থাটা তখন কেমন তা একবার দেখে আসা যাক। আমেরিকা ও ফ্রান্সের দেশব্যাপী প্রজাবিপ্লবে ইংলণ্ড শঙ্কিত হয়ে উঠল, প্রতিক্রিয়াশীল ইংরাজ পিছু হটে তার নৃশংস ও বর্বরজনোচিত শাসনবিধি ও শাস্তিব্যবস্থা আরও কঠোর করে তুলল। ১৭৬০ খৃস্টাব্দে তৃতীয় জর্জ যখন ইংলণ্ডের সিংহাসনে আসীন তখন ১৬০ দফা অপরাধের জন্য স্ত্রীপুরুষশিশুনির্বিশেষে প্রাণদণ্ডের হুকুম হতে পারত। তৃতীয় জর্জের দীর্ঘ রাজত্বকাল শেষ হয় ১৮২০ অব্দে, ইতিমধ্যে অর্থাৎ ষাট বছরের মধ্যে, প্রাণদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের সংখ্যা আরও একশো দফা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ব্রিটিশ সৈন্যদলভুক্ত সাধারণ-সৈনিকদের প্রতি এমন বীভৎস ও কদর্য ব্যবহার করা হত—তারা যেন চাষের জন্তুর সামিল—তাদের মনুষ্যপদবাচ্য বলে মনে করা হত না। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হত আকছার লোক—আর বেত্রাঘাত তো লেগেই থাকত। সর্ব-সাধারণের সামনে বেত্রদণ্ড দেবার ব্যবস্থা ছিল, একশো দুশো ঘা বেত মারা—এ যেন অতি সাধারণ নৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়িয়েছিল। অপরাধী ব্যক্তি বেতের ঘায়ে হয় পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হত, নয়তো জীবন্মৃত অবস্থায় বেত্রাঘাতজীর্ণ শরীরে মুক্তিলাভ করত এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তার শাস্তির কথা শঙ্কাকুলচিত্তে স্মরণ করত।

এই সব ক্ষেত্রে যেখানে মনুষ্যত্বের প্রশ্ন জাগে, যেখানে ব্যক্তিবিশেষ কিংবা সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার কথা—সেখানে ইংলণ্ডের তুলনায় ভারতের সংস্কৃতি অনেক অনেক উ'চুদরের ছিল। প্রথাপরম্পরায় ভারতে শিক্ষাবিস্তারের যে সহজ পন্থা ছিল, তাতে তখনকার দিনে ভারতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোক ইংলণ্ড তথা ইউরোপের অন্য যে-কোনো দেশের তুলনায়, সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল। সর্বসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাও খুব সম্ভব এদেশে উন্নততর ছিল। যাকে জনসাধারণ বলে অভিহিত করা হয়,

তাদের অবস্থা ইংলণ্ডে এমন শোচনীয় ছিল, তারা সব দিক দিয়ে এমন পিছিয়ে ছিল—যে তাদের সঙ্গে সমান স্তরের ভারতীয় জনসাধারণের কোনো তুলনাই করা চলত না। উভয় দেশের মধ্যে একটা জায়গায় ছিল বিরাট ব্যবধান। পশ্চিম ইউরোপখণ্ডে তখন নূতন ভাবধারা জোয়ারের জলের মত, অলক্ষিতে জীবনের সকল বিভাগে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। পরিবর্তনের বিরাট সম্ভাবনা সেখানে অপ্রত্যক্ষ হলেও সত্য হয়ে উঠেছে। ভারতের বেলা কিন্তু তা ছিল না, ভারত যেখানে স্থিতিলাভ করেছে সেখানেই যেন অনড় অটল হয়ে থেমে গেছে। এই স্থিতিশীলতার মধ্যে নূতন জীবনাদর্শের চাঞ্চল্য কিংবা প্রেরণা ছিল না।

১৬০০ অব্দে রানী এলিজাবেথ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে সনদ দেওয়ার ফলে ইংরাজ ভারতবর্ষে আসে। সেক্সপীয়ার তখন জীবিত এবং তাঁর নাটক রচনায় ব্যাপৃত; ১৬১১ অব্দে বাইবেল-গ্রন্থের প্রামাণ্য ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়; ১৬০৮ অব্দে মিলটন জন্মগ্রহণ করেন। তারপর এল হাম্প্ডেন ও ক্রমওয়েল কর্তৃক প্রজাতান্ত্রিক অভিযান ও বিদ্রোহ। ১৬৬০ অব্দে ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটি সংঘবদ্ধ হয়। এই সোসাইটিই পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের উন্নতি প্রচেষ্টায় অনেক কিছু করেছিল। একশো বছর পরে ১৭৬০ অব্দে বয়নশিল্পের উন্নতিবিধায়ক ফ্লাইং শাট্ল ও স্পিনিং জেনি আবিষ্কৃত হয়, এল স্টীম ইঞ্জিন, এল কাপড়ের কল।

এই দুটো বিভিন্ন ইংলণ্ডের কোনটা এল ভারতবর্ষে? সেক্সপীয়ার ও মিলটনের যে ইংলণ্ড, যে ইংলণ্ড ভাষা ও সাহিত্যে উন্নত; বীরত্বব্যঞ্জক কাজে, রাজনীতিক বিপ্লবে ও স্বাধীনতা আন্দোলনে যে ইংলণ্ড অগ্রগণ্য; আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণায় ও ব্যবহারে যে ইংলণ্ড পথিকৃৎ—সেই ইংলণ্ড কি ভারতে এসেছিল? না এসেছিল আর এক ইংলণ্ড, বীভৎস দণ্ডব্যবস্থায়, পাশবিক শাসনযন্ত্রে যে সামন্ততান্ত্রিক ইংলণ্ড ছিল প্রতিক্রিয়াশীল—প্রগতিবিরোধী? অন্যান্য দেশেও যেমন জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় সংস্কৃতির দুটো বিভিন্ন দিক থাকে, ইংলণ্ডেরও ছিল তেমনি—এই দুটো ইংলণ্ডের কোনটা এসেছিল এদেশে? এড্ওয়ার্ড টম্সন লিখেছেন: 'সভ্যতার শীর্ষস্তরে ও নিম্নস্তরের মধ্যে ইংলণ্ডে ছিল দুস্তর ব্যবধান—এরকম পরস্পরবিরোধী একই সংস্কৃতির দুটো বিভিন্ন রূপ সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। এই দুটো স্তরের মধ্যেকার যে-প্রভেদ, সেটা খুবই ধীরে ধীরে কমে আসছে, কিন্তু এত ধীরে কমছে যে হ্রাসটুকু চোখে পড়ে না।'*

এই দুই ইংলণ্ড পরস্পর প্রতিবেশী, পাশাপাশি থেকে পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে। এদের যে-কোনো একটি যে অপরটিকে ফেলে একলা ভারতবর্ষে আসবে তার জো ছিল না। কিন্তু সংকটের মুহূর্তে কিংবা কার্যকালে দেখা যায় যে এক ইংলণ্ড আর এক ইংলণ্ডকে দাবিয়ে রেখে নিজে এগিয়ে আসে। বলা বাহুল্য এরূপ ক্ষেত্রে মন্দ ইংলণ্ডটাই ভারতবর্ষে সর্বেসর্বা হয়ে বসেছিল। তারা সংস্পর্শে

* 'মেকিং অফ্ ইণ্ডিয়ান প্রিন্সেস' (১৯৪৩), ২৬৪ পৃঃ।

এসেছিল ভারতের মন্দ দিকটার সঙ্গে—কারণ সেটাই ছিল স্বাভাবিক। ভারতের মন্দ দিকটাকেই তারা নানাভাবে প্ররোচিত করে জাগিয়ে তুলেছিল।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতালাভ এবং ভারতের স্বাধীনতানাশ—এই দুটো ঐতিহাসিক ঘটনা প্রায় সমসাময়িক। ভারতবাসী যখন এই দুই দেশের গত দেড়শো বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করে, যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে উন্নতির ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছে তার সঙ্গে ভারতে কি করা হয়েছে এবং কি করা হয়নি—এই সকল তুলনামূলক প্রসঙ্গ যখন মনে মনে আলোচনা করে দেখে, তখন তার মনে একটু আক্ষেপ না হয়ে যায় না। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে আমেরিকানদের অনেক গুণ ও দক্ষতা এবং আমাদের অনেক অকর্মণ্যতা—অনেক দোষ। আমেরিকা ছিল একটা নূতন জগৎ, আঁচড়বিহীন শাদা পাতার উপর তারা তাদের ইচ্ছামত সামর্থ্যমত তাদের নিজের দেশের অদৃষ্টলিপি রচনা করতে পেরেছে। তার তুলনায় আমরা সহস্রাধিক বর্ষব্যাপী ঐতিহ্য ও পুরাতনের স্মৃতির ভারে বহুল পরিমাণে বাধাগ্রস্ত ছিলাম। তা সত্ত্বেও বলা চলে ব্রিটেন যদি ভারতকে সভ্য করে তোলার বোঝা নিজের কাঁধে না চাপাত, যদি সে এতদিন ধরে এত কষ্ট স্বীকার করে স্বায়ত্তশাসনের রীতিনীতি অজ্ঞ ভারতবাসীদের শিক্ষা দিতে না আসত, তা হলে সম্ভবত ভারত অধিকতর স্বাধীন ও সমৃদ্ধ থাকত; সম্ভবত শিল্প, কলা, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে এবং অন্যান্য যা কিছু মনুষ্যজীবনকে সার্থক করে তোলে—সভ্যতার সেই সব দিকে অনেক বেশি উন্নতিলাভ করতে পারত।

অ ন্তি ম প র্যা য়

ব্রিটিশ-শাসনের পত্তন ও স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত

১ : সাম্রাজ্যবাদের আদর্শ : নূতন জাতির প্রতিষ্ঠা

ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে নিকটভাবে পরিচিত একজন ইংরেজ লিখেছেন : 'আমাদের কৃতকর্মের মধ্যে আমরা ভারতবাসীদের কাছে সব চাইতে বেশি বিরাগভাজন হয়েছি ওই দেশের ইতিহাস লিখে।' ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের কোন জিনিসটা ভারতীয়েরা সবচেয়ে বিরুদ্ধতার চোখে দেখেছেন, সেকথা নিশ্চিত বলা শক্ত। তালিকা যেমন দীর্ঘ তেমনি বিচিত্র—সেখান থেকে একটা কোনো ঘটনা বেছে নেওয়া কঠিন। তবে একথা ঠিক যে ইংরেজদের রচিত ভারতবর্ষের ইতিহাস—এবং বিশেষ করে ব্রিটিশ পর্বের ইতিহাস—এদেশবাসী কোনোকালেই সুনজরে দেখতে পারেনি। প্রায়ই দেখা যায় যে ইতিহাস লেখে বিজয়দর্পী বহিঃশত্রু—তাদের চোখে দেশের ইতিহাস খর্বিত খণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পায়। বৈদেশিক বিজেতা পক্ষপাতশূন্য হয়ে বিজিত দেশের ইতিবৃত্ত লিখতে পারে না। রামায়ণ, মহাভারত পুরাণাদি গ্রন্থে আর্য উপনিবেশকারীদের যে চিত্র আমরা দেখতে পাই, আমার বিশ্বাস সে-চিত্রে আর্যগৌরব বাড়াবার একটা বিশেষ রকম চেষ্টা আছে। সেই সঙ্গে আছে বিজিত অনার্য আদিবাসীদের বর্বর অসভ্য অপবাদ দিয়ে ক্ষুদ্র করে দেখাবার প্রয়াস। এমন লোক খুব কমই মিলবে যারা তাদের জাতির সংস্কৃতি ও সংস্কারগত নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে সত্যকে নিরপেক্ষভাবে দেখতে পারে। যেখানে জাতে জাতে বা দেশে দেশে সংঘাত ঘটে সেখানে পক্ষপাতহীন হবার ইচ্ছাকে পর্যন্ত দেশদ্রোহিতা বা স্বজাতিদ্রোহিতা নাম দিয়ে দমন করবার চেষ্টা হয়। যেখানে এই সংঘাত চরমে গিয়ে পৌঁছায় অর্থাৎ যখন দেশে দেশে কিংবা জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ বাধে তখন শত্রুপক্ষ সম্বন্ধে পক্ষপাতহীন বিচারের কথাই ওঠে না। ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছাড়া অপরপক্ষ সম্বন্ধে অন্যবিধ মনোভাব যেন গায়ের জোরে বাতিল করে দেওয়া হয়। চিত্তকে এমনই কঠিন করা হয় যে সত্য মনের মধ্যে প্রবেশ করার পথ খুঁজে পায় না। তখনকার মত সব কিছু ছাপিয়ে একটিমাত্র উদ্দেশ্য কাজ করতে থাকে। এ-উদ্দেশ্যের মূল কথাটাই হল এই যে আমার জাতি কিংবা আমার দেশ যা করছে সেইটাই হল ঠিক, এবং শত্রুপক্ষ যা করছে তা হল অন্যায় ও সর্বতোভাবে নিন্দনীয়। সত্য তখন কোন অতলে তলিয়ে যায়, উলঙ্গ অনাবৃত অসত্য নির্লজ্জের মত ক্রমাগত আপনাকে জাহির করতে থাকে।

দুটো দেশে সত্যকার যুদ্ধবিগ্রহ না চললেও অনেক সময় তাদের পরস্পরের মধ্যে বিরুদ্ধতা ও রেষারেষি দেখতে পাওয়া যায়। বৈদেশিক শক্তির দ্বারা অধ্যুষিত দেশে এরূপ সংঘাত অনিবার্য, ও অনবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। এর ফলে মানুষের চিন্তায়,

কার্যে, বিকার দেখা দেয়, বিরুদ্ধতার ভাবটা ক্রমাগত মনের ভিতর গাঁজিয়ে উঠতে থাকে। প্রাচীনকালে যুদ্ধবিগ্রহ ও যুদ্ধবিগ্রহের বিষময় ফলকে মানুষ যেন প্রাকৃতিক নিয়মের মত অত্যন্ত অনায়াসে স্বীকার করে নিত। বিজেতার পক্ষে স্বাভাবিক কাজই ছিল বিজিত জাতিকে বশ্যতা স্বীকার করানো। নৃশংসতা, বর্বরতা ও অত্যাচার ছিল বিজয়ের আনুষঙ্গিক ব্যাপার। এই সব কুপ্রবৃত্তি ঢাকতে গিয়ে আজকের মত মিথ্যা নীতির দোহাই পাড়তে হত না। তথাকথিত উচ্চতর আদর্শের বিকাশের ফলে অন্যায় কাজেরও স্বপক্ষে একটা সমর্থন দাঁড় করাতে হয়। ফলে অনেক সময় স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় সত্য প্রকাশিত হয় বিকৃত রূপে। ফলে সততার স্থান অধিকার করে মিথ্যা চোখ ভোলানো ছলনা, এবং পাপের সমর্থনে একটা ন্যক্কারজনক ধার্মিকতার আশ্রয় গ্রহণ করার দরকার হয়।

ছিদ্রান্বেষী সকল দেশেই একটা না একটা খুঁত আবিষ্কার করতে পারে। ভারতের মত বিরাট দেশে এরূপ খুঁত ধরা আরও অনেক সহজ। জটিল এদেশের ইতিহাসের ধারা, বহু সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে এদেশে। ভারতে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যার ফলে এদেশের বিষয়ে নানা বিভিন্ন মতবাদের সমর্থন মেলে। এরূপ যে-কোনো একটা সুবিধা মতন মতের উপর একটা বিশেষ যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করা একটুও কঠিন নয়। একই ছাঁচে গড়া একঘেয়েমি সত্ত্বেও আমেরিকাকে বলা হয় পরস্পরবিরোধিতার দেশ। আমেরিকার তুলনায় ভারত তো বিরোধ ও অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ। নিজের উদ্দেশ্যের সমর্থক একটা কিছু সন্ধান করে পাওয়া ভারতে যত সহজে সম্ভব তেমন আর অন্য কোথাও নয়। মনগড়া ভিত্তির উপর এদেশের বিষয়ে একটা মতবাদ গড়ে তোলা মোটেই দুঃসাধ্য নয়। তারপর সেই মতটিকে বিশ্বাস-সহযোগে শক্ত করা খুবই সহজ কাজ। তবু বলব যে এরূপ ভিত্তির উপর কেবল মিথ্যার সৌধই রচনা করা চলে—সত্যের নয়। পক্ষপাত-প্রণোদিত ইতিহাস—ইতিহাস নয়—সত্যের অপলাপ।

ইদানীন্তন কালের ভারত-ইতিহাস অর্থাৎ ভারতে ব্রিটিশ যুগের ইতিহাস—নানারূপ আধুনিক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। আজকের দিনের মোহ ও বিদ্বেষের দ্বারা আধুনিক ভারতের ইতিহাসের সত্য রূপ আবৃত ও আচ্ছন্ন। এই ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে ভারতীয় ও ইংরেজ উভয়েই ভুল করতে পারে, যদিচ তাদের পরস্পরের ভুল হবে বিপরীতমুখী। যে-সকল দলিল দস্তাবেজ নথীপত্রের উপর নির্ভর করে ইতিহাস লিখতে হয় তার অধিকাংশই হল ইংরেজকর্তাদের হাতে গড়া, সুতরাং সেগুলির উপর ইংরাজি পক্ষপাত থাকতে বাধ্য। ইংরেজের হাতে পরাজয় ও তারপরে দেশের মধ্যে যে ভাঙাচোরা অরাজকতার অবস্থা গেছে, তার ফলে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের ইতিহাস বিহিতভাবে লিপিবদ্ধ করা যায়নি। উপরন্তু যা সামান্য নথীপত্র ছিল তার অধিকাংশই ১৮৫৭ সালের সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। যে-সব নজীর রক্ষা পেল সেগুলি পারিবারিক দপ্তরের কুক্ষিগত হয়ে লোকচক্ষুর অগোচরে চলে গেল। প্রকাশ করার দুঃসাহস হবে কি করে—প্রাণের ডর তো আছে! এই সব ইতিহাসের উপাদানগুলি ইতস্তত বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে রইল, অনেক পাণ্ডুলিপি

উই কেটে ছারখার করে দিল। পরে এই রকম দু-একটা নথীপত্র যখন আবিষ্কৃত হল, তখন ইতিহাসের অনেক ঘটনা নূতন আলোকসম্পাতে নূতন রূপ নিয়ে দেখা দিল। ইংরেজ-রচিত ভারত-ইতিহাসকেও অনেকখানি নূতন করে ঢালাই করতে হল এবং ভারতীয়ের দৃষ্টিতে ভারত-ইতিহাস নূতন করে ফুটে উঠল। এই যে ভারতীয় দৃষ্টি, এর পিছনে ছিল অনেক স্মৃতি, অনেক পূর্বানুস্মৃতি। আর খুব বেশি দূরের সময়কার স্মৃতিও নয়—আমাদেরই পিতামহ প্রপিতামহ যে-সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করে গেছেন, যার বর্ণনা তাঁরা গল্প বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাচ্ছলে অনুগামী বংশধরদের কাছে বলে গেছেন, তার উপর ভিত্তি করে একটা নূতন ঐতিহাসিক পটভূমি তৈরি হল। নিছক ইতিহাস হিসাবে এই পরম্পরাগত তথ্যাদির খুব বেশি মূল্য নাও থাকতে পারে, কিন্তু আধুনিক ভারতচিত্তের পটভূমিরূপে এদের মূল্য কম নয়। ইংরেজের চোখে যে শয়তান, ভারতীয়ের চোখে অনেক সময় সে দেবতার সমতুল্য। ইংরেজ যাদের খেতাব, ইনাম, জায়গীর দিয়ে সাগ্রহে সম্মানিত করেছে, দেশের বেশির ভাগ লোকের কাছে তারা দেশদ্রোহী কুইস্‌লিঙ ছাড়া আর কিছুই নয়। পিতার কলঙ্ক পুত্রের মধ্যে বর্তিয়েছে. সমালোচকের দৃষ্টি থেকে কারও এড়িয়ে যাবার জো নেই।

আমেরিকান বিপ্লবের ইতিহাস ইংরেজ লিখেছে একভাবে, আমেরিকানরা লিখেছে আর একভাবে। দুই দেশের মধ্যে পূর্বেকার সেই রেষারেষি দলাদলির ভাব আজ অনেকটা হ্রাস পেয়েছে সত্য, ইংরেজ ও আমেরিকান আজ পরস্পর পরস্পরের মিত্র; কিন্তু তবু দেখা যায় যে ইতিহাসের এই দুই বিভিন্ন পাঠ নিয়ে উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ প্রায়ই ঘটে থাকে। এই তো সেদিন পর্যন্ত অনেক নামজাদা ইংরেজ রাজনীতিকদের কাছে লেনিন ছিলেন নররূপী-রাক্ষস ও ঘৃণ্য দস্যুতস্করের সমগোত্র। অথচ লক্ষ লক্ষ লোক লেনিনকে যুগত্রাতা মানবশ্রেষ্ঠরূপে পূজা করেছেন। এই সব উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে কেন ভারতীয়েরা ইংরেজরচিত ভারত-ইতিহাসকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করে নিতে পারেনি, যদিচ এই ইতিহাসই স্কুল-কলেজে পাঠ্যরূপে তাদের পড়তে হয়েছে। এই মিথ্যাময়ী ইতিবৃত্তকথা ভারতের অতীত গৌরবকে পদে পদে ক্ষুণ্ণ করেছে, যাদের আমরা চিরকাল শ্রদ্ধা সম্মান করে এসেছি, সেই সব প্রাতঃস্মরণীয়দের অবমাননা করেছে, এবং এই সব মিথ্যাভাষণের উপর ভারতে ইংরেজ-রাজত্বের গৌরব-গাথা রচনা করেছে।

গোপালকৃষ্ণ গোখলে একবার রহস্য করে লিখেছিলেন যে নিয়তির দুর্জ্ঞেয় বিধানে ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের গাঁটছড়া বাঁধা পড়েছিল। এই সম্বন্ধ কি করে সম্ভবপর হল—নিয়তির অমোঘ বিধানে না ঐতিহাসিক ঘটনার ঘটকালির ফলে, সেকথা নিশ্চয় করে বলা শক্ত। তবে এটা ঠিক, ভারতে ইংরেজ আসার ফলে দুটো খুব বেশি বিভিন্ন জাতিকে পরস্পরের কাছাকাছি এনেছিল। একত্র করেছিল কিন্তু এক করেনি—এইটাই সব চাইতে শোচনীয় ব্যাপার। দুটো জাত পরস্পরের কাছে এগিয়ে গিয়ে পরস্পরকে অভ্যর্থনা করে নেয়নি; দুয়ের যোগাযোগ হয়েছে পরোক্ষভাবে। নিতান্ত মুষ্টিমেয় ইংরিজি-পড়া ভারতবাসী ইংরেজি সাহিত্য ও রাজনীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত

হয়েছিল। কিন্তু যে রাজনীতিক চিন্তা বিলেতের আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট, বিলেতে যা জীবন্ত ও গতিবান—তার সঙ্গে ভারতীয় আবহাওয়ার সামঞ্জস্য কোথায়? তাছাড়া যেসব ইংরেজ ভারতে এসেছিল তাদের সঙ্গে রাজনীতি বা সামাজিক বিপ্লবের অতি সামান্যই সম্বন্ধ ছিল। তাদের বেশির ভাগ লোক ছিল রক্ষণশীল দলের। এই রক্ষণশীল দল ছিল ইংলণ্ডের সব চাইতে প্রতিক্রিয়াশীল লোকদের আস্তানা। একথাও মনে রাখতে হবে যে তখনকার দিনে ইংলণ্ডের মত এমন প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল একটা দেশ ইউরোপে খুব কমই ছিল।

ভারতে পাশ্চাত্যসভ্যতার সংঘাতের মধ্যে একটা প্রচণ্ড শক্তি ছিল। একদিকে ছিল একটা স্থিতিশীল সমাজ যার চিন্তাধারা ছিল মধ্যযুগের উপযোগী অর্থাৎ সেকেলে। বৈদগ্ধ্য সত্ত্বেও তার নিজের ভিতরকার কতকগুলি সংকীর্ণতার জন্য সে-সমাজ প্রগতির পথে এগিয়ে চলতে পারছিল না। অন্যদিকে ছিল একটা গতিশীল সক্রিয় সমাজ, যার চিন্তাধারা ছিল সম্পূর্ণ একালের। এই ঐতিহাসিক সংযোগের যারা ছিল নেতা, তারা নিজেদের ব্রতসম্বন্ধে একেবারেই অচেতন ছিল, ফলে ভারতের অগ্রগমনের দিক থেকে ভারতবাসী ইংরেজ সত্যকার সাহায্য করতে পারেনি। ইংলণ্ডে এই রক্ষণশীল শ্রেণীই ইতিহাসের বিধান চেয়েছিল উলটে দিতে। কিন্তু বিপক্ষ দল এমন শক্তিশালী ছিল যে এদের বিরুদ্ধতা প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। নিজেদের দেশের যে ব্যাপক আন্দোলন তারা ঠেকাতে পারেনি, সেই পরিবর্তন ও প্রগতির চেষ্টাকে অংকুরেই বিনাশ করার অপূর্ব সুযোগ তারা পেল এই দেশে। সমাজের দিক থেকে যেসব ভারতীয়েরা ছিল প্রাচীনপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল, ঠিক সেই সব দলকে ইংরেজ প্রশ্রয় দিয়ে শক্তিশালী করে গড়ে তুলল। আর যারা রাজনীতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিল তাদেরই রাখল দমন করে। অদল-বদল যা হল তা হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও—ভারতে তাদের কার্যকলাপের কতকগুলি অভাবিত ফলস্বরূপ এই পরিবর্তন দেখা দিল এখানকার রাষ্ট্রজগতে। মধ্যযুগের পুরাতন কাঠামো ভেঙে দেবার একটা মস্ত কারণ হল বাষ্পীয় শকট ও রেলওয়ের আগমন। অথচ নিজের শাসন কায়েমী করবার জন্য ও বিজিত দেশের প্রত্যন্ত অংশগুলি আরও ভাল করে শোষণ করবার জন্যই ইংরেজ এই যন্ত্রদানব আমদানি করেছিল। ভারতে ব্রিটিশ সরকারের এই স্বার্থান্বেষী কীর্তিকলাপ ও তার অভাবিত ফলের মধ্যে এই যে পরস্পর-বিরোধিতা—এটা অনেক সময় বিভ্রম ঘটায়, ইংরেজের আসল উদ্দেশ্যকে লোকচক্ষুর অগোচরে রাখে। পশ্চিমের সংঘাতে ভারতে পরিবর্তন এসেছিল সত্য, কিন্তু তা এসেছিল ভারতবাসী ইংরেজদের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও। এই পরিবর্তনের গতি তারা এতটা মন্থর করে দিতে পেরেছে যে আজ অবধি নতুন যুগে আমরা উত্তীর্ণ হতে পারিনি।

ইংলণ্ড থেকে যেসব সামন্ত জমিদার বা তৎশ্রেণীর লোক ভারত শাসন করতে এসেছিল—তারা সমস্ত পৃথিবীকেই দেখত একটা বিরাট জমিদারীর মত। ভারত ছিল তাদের কাছে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটা বিরাট দেওয়ানী। জমিদারী তথা প্রজাবর্গের পক্ষে স্বয়ং জমিদার মহাশয়ের চাইতে ভাল মুখপাত্র আর কি হতে পারে।

সুতরাং জমিদার বা সুবাদারই ছিলেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সর্বোপযুক্ত ও তথাকথিত প্রতিনিধি। জমিদারী হস্তান্তর হল, ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্রিটিশ সম্রাটের হাতে ভারতের শাসনভার তুলে দিলেন এবং বিনিময়ে ভারতেরই খরচে প্রভূত সেলামি আদায় করে নিলেন। এইভাবে ভারতেরই টাকায় ভারতকে ক্রয় করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশ ব্রিটিশ সদাগরদের হাতে বাঁধা পড়ল—শুরু হল যাকে বলে ভারতের জাতিগত ঋণ। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তখন থেকে ভারতের জমিদার অথবা জমিদারের স্থলাভিষিক্ত হলেন—জমিদারী মনোবৃত্তি কায়েমী হল। ইংলণ্ডে ভূমির নামে ভূম্যধিকারীর নাম। ডেভনশায়ারের যিনি ডিউক তাঁকে তাঁর বয়স্য ও সমকক্ষেরা ডাকেন কেবল ডেভন-শায়ার বলে। ব্রিটিশ সরকার ঠিক তেমনিভাবে 'ভারত' বনে গেলেন অর্থাৎ ভারত ভূখণ্ডকে আত্মসাৎ করে নিলেন। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী যারা এই জমিদারীতে বসবাস করছে—চাষ করছে জমি, টানছে হাল, বুনছে তাঁত—তারা প্রজাসাধারণ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের কর্তব্য হল কেবল খাজনা দেওয়া, সেস্ গোনা এবং সামন্ত-সমাজের নির্দিষ্ট নিয়ম-মাফিক সমাজের স্তরবিভাগ স্বীকার করে নেওয়া। সমাজের এই শ্রেণী-বিভাগ যারা অস্বীকার করেছে ইংরেজের চোখে তারা যেন অখিল বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ নীতিকে অমান্য করেছে, বিধির বিধানের বিরুদ্ধতা করেছে।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্বপক্ষে এই রকম একটা দার্শনিক যুক্তি অনেক কাল ধরে চলে আসছে, ভাষা বদলেছে কিন্তু পুরাতন বিশ্বাস একটুও বদলায়নি। পুরাতনকালে গলার রক্ত উঠিয়ে খাজনা আদায়ের রেওয়াজ ছিল, সেখানে আজকাল নানা ছলাকলার সাহায্যে তদনুপাত অথবা তদতিরিক্ত প্রাপ্য জমিদার আদায় করছে। একথা অবশ্য সর্বথা স্বীকার্য যে প্রজানুরঞ্জন ও প্রজাদের সুখসুবিধা বৃদ্ধি করা ভূম্যধিকারীর একটা প্রধান কর্তব্য। সদাশয় ব্রিটিশ সরকার এও মেনে নিয়েছিলেন বিশেষভাবে রাজভক্ত বা অনুরক্ত প্রজাদের জমিদারী-সেরেস্তায় কিছু দায়িত্বজনক পদ দিয়ে জমিদারী পরিচালনার কাজে নিযুক্ত করা দরকার। কিন্তু জমিদারী উচ্ছেদের বিরুদ্ধ আন্দোলন—সে অসহ্য। না হয় হস্তান্তরই ঘটেছে, কিন্তু জমিদারী চলবে সেই পুরাতন বনেদী চালে। ঘটনাক্রমে যদি জমিদারী হাত বদল করতেই হয়, তবে বিশ্বস্ত কর্মচারীদের কাজ যাতে বহাল থাকে, যাতে আশ্রিত অনুগত মোসাহেবদের অন্ন মারা না পড়ে, পুরাতন বৃত্তিভোগীরা যাতে নিয়মিত সিধে পান—এ-সমস্ত আদব কায়দা ইংরেজ রপ্ত করেছিল। পূর্বতন জমিদার তিনিও রইলেন। মালিক মুনিবের গদি ছেড়ে তিনি নিযুক্ত হলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বন্ধুমানুষ, রাজ্য পরিচালনায় অমাত্য ও উপদেষ্টা। এইভাবে সামান্য কিছু অদলবদল করে পুরাতন প্রথা নির্বিবাদে কায়েম থাকল।

ভারতকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করার চেষ্টা দেখা যায়—সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ-চালিত অপেক্ষাকৃত উচ্চতর শাসনতান্ত্রিক কাজে। পরবর্তীকালে এই কাজটার ভার নেন একটা সুগঠিত শাসক-গোষ্ঠী যাঁদের বলা হয় ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস্। এই শাসকশ্রেণীর কথা বলতে গিয়ে একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন যে নিজেদের স্বার্থ

সংরক্ষণে এমন অধ্যবসায় পৃথিবীর খুব কম ট্রেড ইউনিয়নেই দেখা যায়। তাঁরা শাসনতন্ত্র এমনভাবে চালাতেন যে তাঁরাই যেন ভারতবর্ষ। তাঁদের স্বার্থে একটু ঘা পড়লে সে যেন হবে ভারতেরই সমূহ ক্ষতি। বিভিন্ন স্তরের ইংরেজ ভারত সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করতেন, সে হল এই উন্নাসিক ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের লোকদের কাছ থেকে উদ্ভূত। শাসকশ্রেণীর ইংরেজদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, ইংরেজ কৃষক-মজুর পর্যন্ত—তাদের পরানুগত দৈন্যদশা সত্ত্বেও—এই সার্ভিসওয়ালাদের প্রভাবে পড়ে ভারতীয় জমিদারী নিয়ে মনে মনে আত্মশ্লাঘা অনুভব করত। এই বিরাট সম্পত্তি, বিস্তীর্ণ জমিদারী—এ হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত—এ কি কম কথা! সুতরাং বিচিত্র কিছুই নয় যে সম্পূর্ণ চাষাড়ে ইংরেজ পর্যন্ত এদেশে এসে ভারতভাগ্যবিধাতা বনে গেছে। ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সুতরাং ইংরেজের মনোমত বিচারকেই সে অভ্রান্ত সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছে। নিদেনপক্ষে ভারতের দৈন্যদুর্দশা দেখে তার মনে হয়তো বা কিছুটা করুণা জেগেছে—কিন্তু চারদিকে এমন বজ্রবাঁধন যে সে-করুণাও ব্যয়কুণ্ঠ কৃপণের হাতে মাপকরা একটা অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার ছাড়া আর কিছু হয়ে উঠতে পারেনি। দীর্ঘ একশো বছর ধরে ইংরেজ ভারত সম্বন্ধে এই রকম একটা ধোঁয়াটে ধারণা পোষণ করে এসেছে, জাতকে জাত এই মনোবৃত্তি নিয়ে ভারতকে দেখেছে। অবশেষে তারা তাদের নিজেদের এই ভুলটাকেই অকাট্য যুক্তি ও অভ্রান্ত সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছে। বিটিশ শ্রমিকদলের একটা কোনো নির্দিষ্ট নীতি নেই, বাইরের জগৎ সম্বন্ধে তাদের খুব সীমাবদ্ধ জ্ঞান। তা সত্ত্বেও দেখি যে এই সেদিনও লেবার পার্টি ভারতের পরাধীন অবস্থা চালু রাখার স্বপক্ষে মত দিয়েছে। নিজেদের দেশ শাসনের বেলা ইংরেজের এক মূর্তি আর ঔপনিবেশিক শাসন চালাবার বেলা আর। এই দুই রকম মনোবৃত্তির মধ্যে যে অসঙ্গতি, বাক্যের সঙ্গে কর্মের যে বিরোধ—এই পরস্পরবিরোধিতা কালেভদ্রে লেবার পার্টির মনে হয়তো বা সংশয় ও দ্বিধা জাগিয়েছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তারা নিজেদের বিবেকবৃত্তিকে প্রশমিত করেছে এই ভেবে যে তারা হল কাজের লোক, সাংসারিক বুদ্ধি তাদের টনটনে—সুতরাং এহেন ইংরেজ সন্তানকে সামান্য বিবেকের টানে টললে তো চলবে না। সংসারবিজ্ঞ যারা তারা চলবে বাঁধা নিয়মে সংস্কারের রাস্তায়। একটা অনির্দিষ্ট নীতি বা অপরীক্ষিত তথ্য নিয়ে মাথা ঘামানো—এ কি কাজের লোকদের সাজে। এ হবে যে নিতান্ত অনিশ্চিতের গহন অন্ধকারে পা বাড়ানো!

সরাসরি ইংলণ্ড থেকে যেসব ভাইসরয় আসেন তাঁদের এই ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের কাঠামোর মধ্যে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে হয়, নির্ভর করতে হয় এই সব রাজকর্মচারীদের উপর। ভাইসরয়রা এমনিতেই হলেন ইংলণ্ডের ধনিক-মালিক-শাসক-শ্রেণীভুক্ত সুতরাং আই. সি. এস.-সুলভ মনোবৃত্তি তাঁরা খুব সহজেই স্বীকার করে নেন। তাঁদের হাবভাবে, কার্যকলাপে একটা গভীর পরিবর্তন দেখা দেয়। আর পরিবর্তন হবে না-ই বা কেন? তাঁদের মত এমন একটা অবিসংবাদিত প্রভুত্ব-গৌরব পৃথিবীর আর কোনো দেশে কোনো রাজপ্রতিনিধির আছে কি না সন্দেহ। কর্তৃত্ব

মানুষের নীতিজ্ঞানকে বিনাশ করে, কর্তৃত্ব যেখানে স্বেচ্ছাচারে পর্যবসিত সেখানে নীতিজ্ঞান সমূলে বিনষ্ট হয়। লক্ষ লক্ষ লোকের উপর ব্রিটিশ ভাইসরয় যেরকম বাধাহীন প্রভুত্ব খাটাতে পারেন, সেরকম দণ্ডমুণ্ডের হর্তা-কর্তা-বিধাতা পৃথিবীর ইতিহাসে দুটি মিলবে না। কি গর্বোদ্ধত তাদের বাচনভঙ্গী! ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী তথা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টও এই ধরনের কথা বলতে সাহস করেন না। এ-বিষয়ে ভাইস-রয়দের সঙ্গে কেবলমাত্র হিটলারেই তুলনীয়। কেবল ভাইসরয় কেন তাঁর মন্ত্রণা সমিতির ইংরেজ সদস্যরা, মহামান্য গভর্নর বাহাদুরেরা, এমনকি হেঁজিপেঁজি বিভাগীয় সেক্রেটারী ও ম্যাজিস্ট্রেটদেরও ওই একই ধরনের হামবড়াই ভাব। সাধারণের অনধিগম্য উত্তুঙ্গ সম্ভ্রমের শিখর থেকে তাঁরা তাঁদের আদেশ-নির্দেশের ফতোয়া জারি করেন। তাঁরা যা বলেন বা করেন সেটাই যে একমাত্র অদ্বিতীয় সত্য—এ-বিষয়ে তাঁদের অণুমাত্র সন্দেহ নেই। তাঁরা নিশ্চিত জানেন যে ইতরজন মনে মনে যাই ভাবুক না কেন এই সত্য তাদের স্বীকার করে নিতে হবে, কারণ তাঁরা সর্বশক্তিমানের গৌরব অধিকার করে নিরঙ্কুশ হয়ে বসে আছেন।

ভাইসরয়ের মন্ত্রণাসভার কোনো কোনো সদস্য সরাসরি ইংলণ্ড থেকে নিযুক্ত হয়ে আসেন। তাঁরা আই. সি. এস.-শ্রেণীভুক্ত নন। সচরাচর দেখা যায় তাঁদের কথা ও কাজের ধরন সিভিলিয়ানদের মত নয়। শাসনতন্ত্রের কাঠামোতে তাঁরা সহজেই খাপ খেয়ে যান সত্য, কিন্তু প্রভুত্বপরায়ণ সিভিলিয়ানদের সহজাত শ্রেষ্ঠত্বগরিমা ও আত্মপ্রসন্ন ভাবটা তাঁরা যেন কখনোই ঠিকমত রপ্ত করতে পারেন না! আধুনিককালে যেসব ভারতীয়দের এই মন্ত্রণাসভায় আসন দেওয়া হয়েছে—তাঁদের তো কথাই নেই। সংখ্যায় বা বুদ্ধিতে তাঁরা যতই গরিষ্ঠ হোন না কেন, তাঁরা মূলগায়েন নন দোহার মাত্র। সিভিল সার্ভিসে যেসব ভারতীয় আছেন পদমর্যাদায় তাঁরা যত বড়ই হোন না কেন, ব্রিটিশ সিভিলিয়ান-দের জাতে তাঁরা উঠতে পারেন না। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ইংরেজ সহকর্মীদের হাবভাব অনুকরণ করার একটা অক্ষম চেষ্টা করেন, কিন্তু সে-চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় ও পরিণামে তাঁদের বাহ্যাড়ম্বর অন্যদের চোখে উপহাসের বিষয় হয়ে ওঠে।

ইংলণ্ড থেকে আধুনিককালে যেসব আনকোরা ব্রিটিশ সিভিলিয়ান এসেছেন, পূর্বগামীদের তুলনায় তাঁদের মতিগতি একটু হয়তো আলাদা। পুরাতন কাঠামোর মধ্যে এঁরা সহজে খাপ খান না। কিন্তু রাজ্যশাসন সত্য সত্য করেন পুরাতন প্রভুরা, সেখানে আধুনিকদের কথায় খুব বেশি আসে যায় না। তাঁদের হয় মামুলী ব্যবস্থা মেনে নিতে হয়, নতুবা কাজে ইস্তফা দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে হয়। এক-আধবার এমন ঘটনা যে ঘটেনি, তা নয়।

ভারতে অবস্থিত ইংরেজ-মালিকরা যেসব ইংরেজি কাগজ এদেশে ছাপতেন, তার কিছু কিছু আমি ছেলেবেলায় দেখেছি। আমার বেশ মনে আছে যে এসব কাগজগুলি থাকত সরকারী খবর ও সরকারমহলের বিবৃতিতে ঠাসা; আর থাকত নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতির খবর এবং এদেশবাসী ইংরেজসমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি তালিকা। পোলো খেলা, ঘোড়দৌড়, বলনাচ, 'অবৈতনিক' নাট্যাভিনয়—কোনোটাই এই

তালিকা থেকে বাদ পড়ত না। ভারতবাসীদের সম্বন্ধে, তাদের সুখ-দুঃখ, তাদের রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে এই সব ইংরেজি কাগজ খুব সামান্যই খবর দিত। কাগজ পড়ে সন্দেহ হত সত্যি সত্যি ভারতে ভারতবাসী বলে কেউ আছে কি না।

বোম্বাই প্রদেশে তখন হিন্দু, মোসলেম, পার্সি ও ইউরোপিয়ান—এই চারদলে একটা চতুর্দলীয় ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হত। ইউরোপীয় দলের নাম ছিল 'বোম্বাই প্রদেশ'। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে অন্য দলগুলি ছিল হিন্দু, মোসলেম, পার্সি; আর বোম্বাই প্রদেশের সত্যকার প্রতিনিধি ছিল যেন ইউরোপীয় দল। আর তিনটা দল ছিল যেন বোম্বাইয়ের বাইরের, কেবল খেলার খাতিরেই যেন এসব বিদেশী দলকে বোম্বাই আহবান করে নিত। এই চতুর্দলীয় ক্রিকেট খেলা বোম্বাইয়ে এখনও হয়—যদিচ ধর্ম হিসাবে দল গঠন করাতে অনেকেরই আপত্তি, এবং সে-বিষয়ে তর্ক-বিতর্কও হয় মাঝে মাঝে। পুরাতন কালের সেই 'বোম্বাই প্রেসিডেন্সী' দল আজকাল ইউরোপীয় দলরূপে খেলতে নামে।

ভারতে ইংরেজ ক্লাবগুলির নাম হয় স্থানবিশেষের নাম অনুসারে, যথা—বেঙ্গল ক্লাব, এলাহাবাদ ক্লাব ইত্যাদি। এই ক্লাবগুলির সভ্যসংখ্যা ইংরেজ তথা ইউরোপীয় জনসমাজের মধ্যেই আবদ্ধ। স্থানবিশেষের নাম গ্রহণ করা অথবা বাইরের লোক দূরে সরিয়ে নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই ক্লাব আবদ্ধ রাখা—এ দুটোর কোনোটাই দূষণীয় বা আপত্তিজনক হতে পারে না। কিন্তু আপত্তির কারণ হল এই যে এ-নামকরণ ব্রিটিশের অহঙ্কার-প্রসূত। তারা ভুলতে পারে না যে তারাই হল সত্যকার বেঙ্গল বা এলাহাবাদ। অন্যেরা আবর্জনা ছাড়া আর কিছু নয়। আবর্জনারও একটা মূল্য আছে যদি সে তার আপনার ঠাঁইটুকু চিনে নেয়। যদি তা না হয়, তাহলে হয় তাকে ঝেঁটিয়ে দূর করতে হয়, নয়তো নাকে কাপড় দিতে হয়। একই অভিরুচি, এক সম্প্রদায় বা সংস্কৃতির লোক অবসর সময়ে খেলাধুলা ও সামাজিক আদান-প্রদানের জন্য পরস্পরের সঙ্গে একত্র হবে এ তো খুবই স্বাভাবিক। ব্রিটিশের ছুৎমার্গ যদি এই পর্যায়ের হত তবে কথা ছিল না; ইংরেজ ভারতীয়কে বর্জন করে তফাত রেখে চলে তার সত্যকার কারণ হল ইংরেজের জাত্যভিমান। ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি যে বিজাতীয় সংসর্গবিহীন ইংরেজ কিংবা ইউরোপীয় ক্লাব গঠিত হলে আমি অন্তত আপত্তি করব না। কিন্তু যেখানে বিজাতীয় বর্জনের পিছনে শাসকসম্প্রদায়ের কৌলিন্য ও অনধিগম্যতা বজায় রাখবার প্রচেষ্টা দেখি, সেখানে আপত্তি না করে পারি না। এতে একটা নৈতিক আদর্শ খর্বিত হয়। বোম্বাইয়ের একটি নামজাদা ক্লাবে নাকি এক খানসামা-বাবুর্চি-চাকর-নোকর ছাড়া অন্য ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার নেই। অন্যান্য কামরার কথা দূরে থাক, এই ক্লাবের বসবার ঘরে পর্যন্ত কোনো ভারতীয় পা দিতে পারে না তা সে রাজাবাদশাই হোক কিংবা শিল্পপতিই হোক।

ভারতে বর্ণবৈষম্য এক অতি অদ্ভুত ব্যাপার। সেখানে সমস্যাটা কেবল ইংরেজ বনাম ভারতবাসীর মধ্যে আবদ্ধ নয়, একদিকে ইউরোপীয় অন্যদিকে এশিয়ান। ভারতে সকল

ইউরোপীয় ব্যক্তি হল শাসকশ্রেণীভুক্ত, তা সে জার্মানই হোক, পোলই হোক বা রুমানীয়ই হোক—শাদা চামড়া থাকলেই হল। রেলগাড়ির কামরায়, স্টেশনের বিশ্রামাগারে, পার্কে বাগানের বেঞ্চিতে—লেখা থাকে 'কেবল ইউরোপীয়দের জন্য'। দক্ষিণ-আফ্রিকায় বা অন্য দেশে এই ধরনের বৈষম্যমূলক প্রথা দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু নিজেদেরই দেশে যদি পদে পদে আমাদের দাসত্বের গ্লানির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় তবে তার চেয়ে বিরক্তিকর লাঞ্ছনা আর কি হতে পারে।

ইংরেজের স্বাজাত্যাভিমান ও সাম্রাজ্যবাদী ঔদ্ধত্যের এই যে বহিঃপ্রকাশ, এটার ক্রমেই রূপান্তর ঘটছিল, সেকথা সত্য। কিন্তু এই পরিবর্তন ঘটছিল খুবই ধীর গতিতে। তারই মাঝে মাঝে এমন সব ব্যাপার ঘটেছে যা থেকে মনে সন্দেহ জেগেছে যে বাইরের রূপ হয়তো বদলেছে কিন্তু ভিতরে ভিতরে ইংরেজের মনোভাব একটুও বদলায়নি। একদিকে রাজনৈতিক চাপ ও অপরদিকে যুযুধান জাতীয় আন্দোলন—এই দুয়ের মধ্যে পড়ে পূর্বের সেই কৌলিন্য-গৌরব অনেকখানি ক্ষুণ্ণ করতে হল। কিন্তু যে-মুহূর্তে এই রাজনীতিক আন্দোলন এমন একটা জায়গায় গিয়ে পেণছেছে যেখানে তাকে ধ্বংস করা দরকার, সেইখানেই আবার ইংরেজ জাত তার পুরাতন গর্বোদ্ধত রূপ নিয়ে রণক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ইংরেজ নিজেদের দেশে খুবই স্পর্শচেতন জাত, কিন্তু ইংরেজ যখন বিদেশ যায় তখন তার মন যেন নিঃসাড় হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষে শাসিত-শাসক সম্পর্কের ফলে এমনিতেই পরস্পর পরস্পরকে বুঝে বা চিনে নেওয়া কঠিন। এই ভারতেই দেখেছি এদেশ বা এদেশের মানুষ ইংরেজের মনে একটুও রেখাপাত করেনি, কোনো সাড়া জাগায়নি। এ দেখে মাঝে মাঝে মনে হয় ওরা হয়তো খানিকটা ইচ্ছা করেই জানতে বা বুঝতে চায় না। যতটুকু দেখা নিরাপদ ততটুকুই দেখে, তার বেশি তলিয়ে দেখতে চায় না। কিন্তু চোখ বুজে থাকলেই তো যা সত্য তা অন্তর্হিত হয়ে যেতে পারে না। ভারতে এমন অনেক ব্যাপার ঘটে যা চোখে আঙুল দিয়ে যেন ইংরেজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমন অঘটন যখন ঘটে তখন ইংরেজ বিরক্ত হয়, রাগ করে—ভাবখানা এমন যে ওকে ঠকাবার জন্যই যেন এরূপ একটা ঘটনার অবতারণা হয়েছে।

এই জাতিবিভাগের দেশে ইংরেজ, এবং বিশেষ করে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসভুক্ত ইংরেজ তার নিজের চারদিকে দুর্ভেদ্য দেয়াল তুলে দিয়েছে। তাদের নিজস্ব আওতার মধ্যে সকলের প্রবেশ নিষেধ। এমনকি সিভিল সার্ভিসের ভারতীয় সদস্যেরাও এদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসতে পায় না যদিচ উভয়ের উর্দি এক এবং একই তালে উভয়কে পা ফেলে চলতে হয়। নিজেদের কৌলিন্য-বিষয়ে এ-জাতটির দৃঢ় বিশ্বাস ধর্মান্ধতার সঙ্গে তুলনীয়। এই অন্ধ গোঁড়ামির চারদিকে নানারূপ পুরান উপাখ্যানও গড়ে উঠেছে। একদিকে এই গোঁড়ামি, অন্যদিকে স্বার্থ কায়েম রাখার চেষ্টা—এই দুয়ের সংযোগ খুবই শক্তিশালী। দুয়ের কোনোটার বিরুদ্ধতা করতে গেলেই জাতকে জাত ক্ষেপে উঠবে, প্রচণ্ড ক্রোধের সঙ্গে তারা চাইবে এই বিরুদ্ধতা প্রতিহত করতে।

২ : বঙ্গদেশ লুণ্ঠন ও ইংলণ্ডে শিল্পোন্নতির নবযুগ

সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সুরাটে একটি কুঠি স্থাপনের অনুমতি লাভ করে। কয়েক বছর পরে তারা দক্ষিণ-ভারতে একখণ্ড জমি কিনে মাদ্রাজ শহর পত্তন করে। ১৬৬২ অব্দে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পোর্টুগালের কাছ থেকে বোম্বাই দ্বীপটি বিবাহের যৌতুকস্বরূপ লাভ করেন। তিনি কোম্পানীর কাছে এই দ্বীপটি হস্তান্তরিত করেন। ১৬৯০ অব্দে কলিকাতা শহর প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইংরেজ তার আস্তানা গাড়ে এবং সমুদ্রের উপকূলভাগে কয়েকটা ঘাঁটি বসায়। ক্রমে ক্রমে তারা দেশের প্রত্যন্ত প্রদেশে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর সর্বপ্রথম একটা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড তাদের আয়ত্তে আসে। কয়েক বছরের মধ্যে তারা বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যা দখল করে বসে, এবং সমগ্র পূর্ব-উপকূলে সর্বেসর্বা হয়। এর প্রায় চল্লিশ বছর পর, ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজ অভিযানের আর একটি বিরাট পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এবার তারা একেবারে দিল্লীর তোরণদ্বারে এসে হানা দেয়। তৃতীয় পর্যায় অনুষ্ঠিত হয় ১৮১৮ অব্দে মারাঠাদের পরাজয়ের পরে। ১৮৪৯ অব্দে শিখ-যুদ্ধের পর ইংরেজ ভারতবর্ষে কায়েম হয়ে বসে।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে ইংরেজ মাদ্রাজ শহরে আছে আজ তিনশো বছরেরও বেশি। বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা একশো-সাতাশি বছর ধরে ইংরেজের শাসনাধীন। একশো-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে দক্ষিণ-ভারতে ইংরেজ তার রাজত্ব বিস্তার করেছে। আজকাল যাকে যুক্তপ্রদেশ বলে অর্থাৎ মধ্য ও পশ্চিম-ভারতে একশো-পঁচিশ বছর আগে ইংরেজ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আজ আমি ১৯৪৪ সালের জুন মাসে এই বই লিখছি। আজকের হিসাবে ইংরেজ পাঞ্জাব অধিকার করে পঁচানব্বুই বছর আগে। আয়তনে ক্ষুদ্র বলে মাদ্রাজকে যদি বাদ দিই, বঙ্গ-বিজয় ও পাঞ্জাব-অধিকার—এই দুটো কাজ সমাধা করতে ইংরেজের লেগেছে একশো বছর। এই একশো বছরের মধ্যে ইংরেজের রাজনীতি ও শাসনপদ্ধতি দুই-ই ঘনঘন বদলেছে। এই সকল পরিবর্তন ঘটেছে মুখ্যত দুটি কারণে, স্বদেশে ইংরেজদের অবস্থার পরিবর্তন ও ভারতে ইংরেজ-শাসন বিস্তার। এই সব রাজনীতিক ও শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ফলে পর পর যেসব দেশ ইংরেজ-কবলিত হয়েছে, সেই সব দেশের প্রতি ইংরেজের ব্যবহার ও আচরণে একটা তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। কারও প্রতি পক্ষপাত কারও প্রতি বিরাগ—এর মূলে রয়েছে কালানুক্রম। এ ছাড়া অপর একটা কারণও ছিল—সে হল ভিন্ন ভিন্ন অংশের দেশীয় রাজন্যদের পারস্পরিক বৈশিষ্ট্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাঙলাদেশের কথা ধরা যাক। এদেশে মুসলমান জমিদার জায়গীরদাররাই ছিলেন হর্তাকর্তা; সুতরাং ইংরেজদের প্রথম লক্ষ্য হয়েছিল বাঙলার মুসলমান জমিদার জায়গীরদারদের উচ্ছেদসাধন। অন্যদিকে পাঞ্জাবের কথা ধরা যাক। এখানে শিখদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া

হয় সুতরাং পাঞ্জাব প্রদেশে ইংরেজে-মুসলমানে তেমন কোনো বিদ্বেষ ছিল না, অন্ততপক্ষে গোড়ার দিকে। ভারতবর্ষের অনেকখানি অংশ নিয়ে ইংরেজের সঙ্গে সবচেয়ে দীর্ঘকাল এবং সবচেয়ে গভীর রেষারেষি চলেছিল মারাঠাদের সঙ্গে।

যেসব প্রদেশ সবচেয়ে দীর্ঘকাল ইংরেজের অধিকারে গেছে, ঠিক সেই সেই প্রদেশগুলিই আজ হৃতসর্বস্ব দরিদ্রতম। এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় ঘটনা। সংখ্যাবিদ্‌দের মত ছক এঁকে নক্সা কেটে, অতি সহজে দেখিয়ে দেওয়া যায় যে যে দেশে ইংরেজশাসন যত দীর্ঘ সেই সেই দেশে দারিদ্র্য তদনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে। কয়েকটা বড় শহর কিংবা শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্র ইতস্তত গড়ে উঠলেও মূলত দেশ যেন চক্রবৃদ্ধি হারে গরীব হয়ে গেছে। এই দারিদ্র্যের মাপকাঠি হল জনসাধারণ। তাদের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই যে বাঙলা. বিহার, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ প্রদেশের কয়েকটা জেলায় কৃষক-মজুরদের যেরূপ দুরবস্থা, তেমন বোধ হয় ভারতের আর কোথাও নয়। অপরপক্ষে দেখি পাঞ্জাব প্রদেশে এই জনসাধারণের জীবিকার ব্যবস্থা অনেক বেশি সুসহ ও স্বচ্ছন্দ। ব্রিটিশ-অধ্যুষিত হবার আগে বাঙলাদেশ ছিল সুজলা সুফলা ঐশ্বর্যমণ্ডিত দেশ। এই যে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের অসমতুল পার্থক্য, এর পিছনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণ নিশ্চয় আছে। কিন্তু একথা সর্বথা স্বীকার্য যে ঐশ্বর্যময়ী বাঙলার আজকের এই শ্রীহীন অবস্থা ঘটেছে ব্রিটিশ আমলেই। দীর্ঘ ১৮৭ বছর ধরে আমাদের শাসকেরা বলে এসেছেন যে তাঁরা নিরন্তর প্রজাসাধারণের মঙ্গল চিন্তায় অধ্যবসায়ী ছিলেন; কিসে তারা স্বাবলম্বী হয়ে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে তার জন্য কর্তাদের নাকি দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। তার ফলে আজ বাঙলাদেশে মন্বন্তর। দারিদ্র্যপীড়িত, অনাহারক্লিষ্ট মুমূর্ষু জনগণের হাহাকারে বাঙলার আকাশ আজ মুখর হয়ে উঠেছে।

বাঙলাদেশ সর্বপ্রথম ব্রিটিশ শাসনের আওতায় আসে ও তার স্বরূপ উপলব্ধি করে। এই শাসনের মূল নীতিই ছিল লুঠতরাজ—ইংরেজ বাঙলাদেশে এমন একটা রাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তন করে যার উদ্দেশ্যই ছিল চাষীদের যথাসর্বস্ব অপহরণ করা। মরলেও খাজনা আদায় না দেওয়ার জো ছিল না। ভারত-ইতিহাসের যুগ্মলেখক এডওয়ার্ড টমসন ও জি. টি. গ্যারেট্ লিখেছেন, 'ইংরেজদের ঐশ্বর্যলিপ্সা একটা যেন রোগের মত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এ-বিষয়ে তারা কোর্টেস্ ও পিৎসারোর আমলের স্প্যানিশদের পর্যন্ত হার মানিয়েছিল। একেবারে নিঃশেষে শোষিত না হওয়া পর্যন্ত বাঙলাদেশের আর শান্তি ছিল না।......ইংরেজ-চরিত্রে অর্থগৃধ্নুতার জন্য এই যে নৈতিক অবনতি ঘটেছিল এর জন্য অনেক অংশে দায়ী ছিলেন ক্লাইভ।'* এই ক্লাইভকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থপতি হিসাবে সম্মান দেখানো হয়, আজও তাঁর মর্মর মূর্তি ইণ্ডিয়া অফিসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। ক্লাইভ যা করে গিয়েছে তাকে নিছক লুঠতরাজ ছাড়া অন্য কোনো নাম দেওয়া চলে না। কল্পতরু অনবরত নাড়লে তারও

* 'রাইজ এ্যাণ্ড ফুলফিলমেণ্ট অফ ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া' : এডওয়ার্ড টমসন ও জি. টি. গ্যারেট (লণ্ডন ১৯৩৫)।

ফলদান ক্ষমতা নিঃশেষিত হতে বাধ্য, সুতরাং বারংবার বাঙলাদেশ দুর্ভিক্ষে মহামারীতে বিধ্বস্ত হবে, এতে আর আশ্চর্য কি! পরে এই লুণ্ঠনেরই নাম দেওয়া হয় বাণিজ্য—কিন্তু নামের তফাতে কি আর আসে যায়। ইতিহাসে এইরকম দিনে-দুপুরে ডাকাতির নিদর্শন খুব অল্পই মেলে। একথা মনে রাখতে হবে যে বাণিজ্যের নামে, কিংবা অন্য কোনো অজুহাতে বা অন্য কোনো রূপ নিয়ে এই লুঠতরাজ অবিচ্ছিন্নভাবে চলে বছরের পর বছর, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। আইনকানুনের মুখোশ পরে ভদ্রবেশে এলেও লুণ্ঠনকে লুণ্ঠনই বলতে হবে। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম অধ্যায়ে যে দুর্নীতি, অন্যায়, অত্যাচার ও অর্থলিপ্সা উদগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল তার তুলনা নেই। ইংরেজী ভাষায় যেসব হিন্দুস্থানী কথা গৃহীত ও স্বীকৃত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম কথাটা যে 'লুট'—এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এডওয়ার্ড টমসন অন্যত্র বলেছেন যে এই লুঠের ব্যাপার কেবল যে বাঙলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তাও নয়। 'ব্রিটিশ ভারতের আদিযুগের ইতিহাস হল অপরের যথাসর্বস্ব আত্মসাৎ করার ইতিহাস—এ-বিষয়ে বোধ হয় ইংরেজ অতুলনীয়।'

এই লুঠতরাজের একটা অবিসংবাদী ফল হল ১৭৭০ অব্দের মন্বন্তর যার ফলে বাঙলা ও বিহারের এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু এসব যা কিছু ঘটেছে সবই তো ঘটেছে ইংলণ্ডকে প্রগতির পথে এগিয়ে দেবার জন্য। ইংলণ্ডে শিল্পোন্নতির নবযুগ উদ্বর্তন করতে বাঙলাদেশ যে সাহায্য করেছে—এটা তো তার পক্ষে গৌরবের কথা। এ-ব্যাপারটা কি করে যে সংঘটিত হয়েছিল তার সম্বন্ধে আমেরিকান লেখক ব্রুক এডাম্‌স বলেছেন : 'ভারত থেকে লুণ্ঠিত রত্নসম্ভার ইংলণ্ডের মূলধন প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়। তার ফলে ইংলণ্ডের উৎসাহ ও শক্তিই যে কেবল বৃদ্ধি পায় তা নয়, জড়তা কাটিয়ে সমস্ত জাতিই যেন একটা নূতন গতির প্রেরণা লাভ করে। পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকেই বাঙলা থেকে পাওয়া লুঠের মাল লণ্ডনে আমদানী হতে আরম্ভ করে। যাঁদের কথা প্রামাণ্য তাঁরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন ১৭৭০ অব্দে ইংলণ্ডে শিল্পোন্নতির যে-নবযুগ শুরু হয় তা এই নবার্জিত ঐশ্বর্যের প্রত্যক্ষ ফল।......পলাশীর যুদ্ধ ঘটে ১৭৫৭ অব্দে; তারপর থেকে কয়েকটা বছর ইংলণ্ডে পরিবর্তনের চাকা এত ঝটিতি ঘুরতে আরম্ভ করে যে এর তুলনা মেলা শক্ত। ১৭৬০ অব্দে বয়নশিল্পে অভূতপূর্ব উন্নতি দেখা দিল, ইস্পাত গলানোর কাজে কাঠের স্থান অধিকার করল কয়লা। ১৭৬৪ অব্দে হারগ্রীভস্‌, ১৭৭৬ অব্দে ক্রম্‌টন, ১৭৮৫ অব্দে কার্টরাইট আবিষ্কার-পরম্পরায় ম্যানচেস্টারের বিরাট বস্ত্রশিল্পের গোড়াপত্তন করলেন। ১৭৬৮ অব্দে ওয়াট্‌ স্টীম ইঞ্জিন কার্যকরী করে তুললেন।......এই সব যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে ইংলণ্ডের শক্তি-সামর্থ্যের ধারা একটা যেন গতি-পথ খুঁজে পেল: কিন্তু এই সব আবিষ্কারই প্রগতির মূল কারণ বলে ভাবলে ভুল করা হবে। যন্ত্রের চাকা ঘুরত না যদি এর পিছনে পুঞ্জীভূত জাতীয় শক্তির ক্রীড়া না থাকত। এই শক্তির উৎস হল মূলধন, যে-অর্থ ভাণ্ডারে সঞ্চিত কেবল নয়, যা উৎপাদনের কাজে বিনিযুক্ত। ভারতীয় ঐশ্বর্য আমদানী হবার আগে নানাবিধ

যান্ত্রিক আবিষ্কার কাজে লাগাবার শক্তির অভাব ছিল।...... এই লুঠের টাকা খাটিয়ে ইংরাজ যতখানি লাভবান হয়েছে, এমন লাভ পৃথিবীর কেউ কোথাও কখনও করতে পারেনি। তার একটা প্রথম ও প্রধান কারণ হল এই যে অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ বছর শিল্পের বাজারে ইংলণ্ডের প্রতিযোগিতা করে এমন একটিও দেশ ছিল না।'*

৩ : ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতের শিল্পাদির বিনাশসাধন ও কৃষিকার্যের ক্রম-অবনতি

গোড়ায় যে-উদ্দেশ্য নিয়ে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে এসেছিল, কোম্পানী গঠনের মূলেই যে-কারণ, সে হল ভারতের নানাপ্রকার শিল্পজাত দ্রব্য, শাল, মসলিন জাতীয় বস্ত্র ও নানাবিধ মসলা প্রভৃতি প্রাচ্যদেশ থেকে পাশ্চাত্যে চালান দেওয়া। ইউরোপে তখন এসব জিনিসের খুব চাহিদা ছিল। ইংলণ্ডে শিল্পকুশলতায় অগ্রণী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একশ্রেণীর শিল্পপতি পুঁজিদারদের আবির্ভাব হল যাঁরা বললেন যে কেবল আমদানী করে চলবে না। ভারতের শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার দেশে আসতে দেওয়া হবে না, বরঞ্চ যাতে ভারতীয় বাজারে ব্রিটিশ মালের চাহিদা বাড়ে—সেই চেষ্টা দেখতে হবে। এই নতুন ধনিকসম্প্রদায়ের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে ব্রিটিশ শাসন পরিষদ (পার্লামেণ্ট) ভারতের ব্যাপারে এবং বিশেষ করে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য বিষয়ে উৎসাহ দেখাতে শুরু করেন। গোড়াতেই নিয়মকানুন বেঁধে ঘোষণা করা হল যে ভারতের পণ্য ইংলণ্ডে প্রবেশ করবে না। যেহেতু ভারতের বহির্বাণিজ্য সর্বতোভাবে কোম্পানীর করতলগত ছিল, সেইজন্য ভারতের পণ্য ইউরোপের অন্য দেশেও প্রবেশাধিকার পেল না। এর পর জোর চেষ্টা চলল কিভাবে আইন বেঁধে শুল্কে বসিয়ে দেশী জিনিস দেশ থেকেই নির্বাসিত করা যায়, কিভাবে বিভিন্ন ভারতীয় শিল্পাদি উৎখাত করা যায়। আইনের বলে ব্রিটিশ পণ্য কিন্তু নির্বিবাদে হু হু করে ঢুকে পড়তে লাগল ভারতবর্ষে। লক্ষ লক্ষ তাঁতি ও অন্যান্য কারিগরদের নিরন্ন করে ভারতের বহু পুরাতন বস্ত্রশিল্প উচ্ছেদ করা হল। বাঙলায় ও বিহারে এই ধ্বংসের কাজ দ্রুত সমাধা হয়ে গেল, অন্যান্য প্রদেশেও ব্রিটিশ শাসন ও রেলপথ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ শিল্প নির্দয়ভাবে নষ্ট করা হল। ঊনিশ শতকের ভারত ইতিহাস হল ধ্বংসপর্বের ইতিহাস—পুরাতন শিল্পাদি নিশ্চিহ্ন করার ইতিহাস। জাহাজী কারবার বন্ধ হল, ধাতব পদার্থের কাজ, কাচ তৈরির কাজ, কাগজ তৈরির কাজ—আরো অনেক শিল্প অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হল।

পুরাতন শিল্পপদ্ধতির সঙ্গে নূতন শিল্পপদ্ধতির সংঘাতের ফলে ভারতীয় শিল্প নানাদিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে—এটা বহুল পরিমাণে অবশ্যম্ভাবী ছিল। কিন্তু এই

* ব্রুক এ্যাডামস্ : 'দি ল অফ সিভিলিজেসন এ্যাণ্ড ডিকে' (১৯২৮) ২৫৯-৬০ পৃঃ, কেট্ মিচেল্ কর্তৃক 'ইণ্ডিয়া' (১৯৪৩) বইতে উদ্ধৃত।

সম্ভাবনা অতি অল্পদিনের মধ্যে সত্য হয়ে উঠল দুটি কারণে—প্রথমত শাসককর্তৃক রাজনীতিক ও অর্থনৈতিক চাপ দেওয়া ও দ্বিতীয়ত নূতন শিল্পপদ্ধতি ভারতে প্রয়োগের ব্যবস্থা না করা। বস্তুতপক্ষে ভারতের শিল্পোন্নতি যাতে না হয়, যাতে শিল্পের দিক থেকে তার অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশ অবনতিলাভ করে—সেইদিকেই ইংরেজের লক্ষ্য ছিল বেশি। যন্ত্রপাতি ভারতে যাতে না আসতে পারে তার জন্য নিয়ম করা হল। বাজারে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করা হল যে ব্রিটিশ পণ্য না হলে যেন ভারতের না চলে। সঙ্গে সঙ্গে বহু লক্ষ লোক হল বেকার, দৈন্যদশায় দেশ ছেয়ে গেল। গঠিত হল আধুনিক কালের 'আদর্শ' উপনিবেশ-শাসনতন্ত্র। ইংলণ্ড দ্রুত তার শিল্পোন্নতির দিকে এগিয়ে চলল, ভারত হয়ে গেল কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশ থেকে সস্তা কাঁচা মাল প্রচুর পরিমাণে চলে গেল ওদেশের কারখানায়, এবং বিলেতের কারখানাজাত শিল্পসম্ভার এই দেশের বাজারেই প্রচুর লাভে বিক্রীত হতে লাগল।

শিল্পীসমাজের ধ্বংসের ফলে বেকার-সমস্যা দেশে প্রবল হয়ে উঠল। লক্ষ লক্ষ লোক যারা এতদিন নিজেদের হাতে-গড়া জিনিস বিক্রয় করে জীবিকানির্বাহ করেছে—এখন কি করবে তারা? কোথায় যাবে? পুরানো কাজে ফিরে যাবার উপায় নেই, নূতন কাজের পথও বন্ধ। একটি মোটে দরজা তাদের পক্ষে খোলা ছিল, সে হল মৃত্যুর দরজা। লক্ষ লক্ষ শিল্পী ও কারিগরকে মুক্তির এই প্রশস্ত পথটিকেই বেছে নিতে হয়েছিল—মৃত্যুর মধ্যে সমাধান হয়েছিল তাদের জীবিকা সমস্যার। ১৮৩৪ অব্দে এই সব হতভাগ্যদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে, ভারতের ইংরেজ বড়লাট লর্ড বেণ্টিংক তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন: 'ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিহাসে এই রকম দুরবস্থার তুলনা খুব কমই মেলে। সমগ্র ভারত ভূখণ্ড তাঁতি জোলা সম্প্রদায়ের অস্থি কঙ্কালে পরিকীর্ণ হয়ে আছে।'

কিন্তু মরে গিয়েও এসব হতভাগ্যরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল না; বরঞ্চ ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতে যত ইংরেজ বাণিজ্যনীতির সংঘাত গিয়ে পেঁছুতে লাগল ততই বেকার শিল্পজীবীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। এদের না ছিল কাজ, না ছিল উপজীবিকা, বহু পুরুষপরম্পরায় অর্জিত এদের শিল্পকুশলতা এদের পক্ষে যেন একেবারেই নিরর্থক হয়ে পড়ল। জমির দিকে এদের তখন নজর পড়ল—আর কিছু না হোক চাষ আবাদ করে অন্তত‌পক্ষে ধানটা গমটা তো মিলবে। কিন্তু জমির মুখাপেক্ষী হয়ে আরও অনেকে রয়েছে, সেখানকার ঠেসাঠেসি ভিড়ের মধ্যে এই বাড়তি লোকদের জায়গা হবে কেমন করে—আর জায়গা যদিই বা হয় এত লোকের অন্ন কেমন করে জোগাবে মাটি? ফলে এরা জমির উপর বিরাট ভারস্বরূপ হয়ে দাঁড়াল, ক্রমে এ বোঝা এমনভাবে বেড়ে গেল যে দেশের দারিদ্র্য অবস্থা চরমে পেঁছাল, সভ্যজগতে যাকে খেয়ে পরে বেঁচে থাকা বলে তার বহু নিচের স্তরে লোকে কোনোমতে প্রাণধারণ করতে লাগল। এই যে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে শিল্পী মজুরদের চাষবাসের দিকে নজর দেওয়া—এর ফলে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশই বেড়ে চলল। পরিশেষে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হল যে বেকার লোকের জীবিকার একমাত্র উপায় হিসাবে

কৃষিকার্যের উপর সবটুকু লক্ষ্য গিয়ে পড়ল। উপায়ের অন্য পথ যেখানে বন্ধ, সেখানে চাষবাস ছাড়া অনুপায়ের আর গতি কি?

ভারতবর্ষ ক্রমেই যেন গ্রাম্য হয়ে পড়ল। ঊনবিংশ শতকের পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখি যে উন্নতিশীল দেশমাত্রেই এই একশো বছরের মধ্যে কৃষিকাজ ছেড়ে শ্রমিকেরা শিল্পের দিকে, কলকারখানার দিকে ঝুঁকেছে বেশি, গ্রাম অঞ্চল থেকে বাস উঠিয়ে লোকে শহরে গেছে উপার্জন করতে। ব্রিটিশনীতির এমনি প্রভাব, ভারতে ঠিক তার উলটোটা ঘটল। আমি কি বলতে চাই, সেটা একটু অঙ্কের হিসাব দিলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে শতকরা পঞ্চান্নজন লোক এদেশে কৃষি দ্বারা জীবিকানির্বাহ করত। সংখ্যাবিদদের মতে এই গড়পড়তা হিসাব বৃদ্ধি পেয়ে এখন দাঁড়িয়েছে এই যে ভারতের শতকরা চুয়াত্তরজনই হল কৃষিজীবী। এই হিসাবটা অবশ্য যুদ্ধপূর্ব কালের হিসাব। যদিচ যুদ্ধের সময় যুদ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পে বহু মজুর যোগ দিয়েছে, তবু দেখতে পাই যে ভারতের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে, ১৯৪১ অব্দের আদমসুমারীতে কৃষিজীবীদের সংখ্যা বেড়ে গেছে বৈ কমেনি। এই-ই তাহলে আমাদের দেশবাসীর ভীষণ দারিদ্র্যের প্রকৃত ও মূলগত কারণ, আর এটা বেশিদিনের কথাও নয়। রোগ, নিরক্ষরতা প্রভৃতি আর যা কিছু এই দুঃখ বৃদ্ধি করে তাও দারিদ্র্য, দীর্ঘকালের অনশন ও পুষ্টির অভাবে এসেছে। লোকসংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধি অবাঞ্ছনীয়, আবশ্যকমত একে দমিত রাখার ব্যবস্থা করা উচিত। তবু দেখা যায় যে দেশের আয়তনের তুলনায় অনেক শ্রমশিল্পে উন্নত দেশ অপেক্ষা আমাদের লোকসংখ্যা বেশি নয়। কৃষিপ্রধান দেশে একে অতিরিক্ত বলে মনে করতে হয়, যদিচ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যথোপযুক্ত হলে অধিক লোকসংখ্যা হতে অধিক অর্থাগম হতে পারত, এবং তাতে দেশের অর্থোন্নতি হত। প্রকৃতপক্ষে লোকসংখ্যার ঘনত্ব বাঙলাদেশ ও গঙ্গার মালভূমিতেই বেশি। অন্য অনেকস্থানে লোকের বসতি তেমন ঘন নয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে গ্রেট বৃটেন-এ লোক-সংখ্যার ঘনত্ব ভারতবর্ষের অপেক্ষা দ্বিগুণেরও অধিক।

যে বিষম গতিপরিবর্তন যন্ত্রশিল্পের জন্য এসেছিল তা অচিরে কৃষিতেও পেঁছে একটা স্থায়ী রকম কঠিন অবস্থা ঘটিয়েছিল। প্রজাদের জমির পরিমাণ দিন দিন কমে যেতে লাগল, এবং এইভাবে হাত বদলানোয় জমিগুলি দিন দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরায় পরিণত হয়ে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করল। কৃষিজীবীদের ঋণভার বৃদ্ধি পাওয়ায় জমি প্রায়ই কুসীদজীবীদের হস্তগত হতে লাগল, এবং ভূমিহীন শ্রমজীবীদের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ বেড়ে উঠল। ভারতবর্ষ যন্ত্রশিল্পের অধিকারী ধনিক সম্প্রদায়ের প্রভুত্বাধীনে, কিন্তু তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পূর্বের ন্যায়ই আছে, আর কেবল তাই নয়, পূর্বের অর্থাগমের অনেক ব্যবস্থাও লোপ পেয়েছে। এদেশ আধুনিক যন্ত্রশিল্পঘটিত অর্থনীতিকে গ্রহণ করার পরিবর্তে একটা নিষ্ক্রিয় অবস্থা বেছে নেওয়ায়, এই নীতির সমস্ত মন্দ ও ক্ষতিকর ফল ভোগ করতে বাধ্য হল, এর কোনো সুবিধা লাভ করল না।

যন্ত্রশিল্পযুগের আগেকার অর্থনৈতিক অবস্থা হতে সে-যুগের অবস্থায় আগমনের

কালে সাধারণ লোকদের বহু দুরবস্থা ও ক্লেশ সহ্য করতে হয়। বিশেষভাবে আগেকার দিনে এটা খুব বেশি ঘটেছে, কারণ তখন কোনোরূপ পরিকল্পনা না করেই পরিবর্তন আনা হয়েছিল, আর এর থেকে যে ক্ষতি হতে পারে সে-বিষয়ে কোনো সাবধানতা অবলম্বন করা হয়নি—প্রত্যেক ব্যক্তি আপন-আপন পথ দেখে নেবে এইরূপ মনে করা হয়েছিল। ইংলণ্ডেও এই পরিবর্তনের কালে লোকের এই প্রকারের ক্লেশই হয়েছিল, তবে মোটের উপর পরিবর্তন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঘটায় অতিরিক্ত মাত্রায় দুঃখ পেতে হয়নি, আর যন্ত্রের আগমনে যারা বেকার হয়ে পড়েছিল নূতন নূতন শিল্পে তারা কাজ পেয়েছিল। তবে একথা বলা চলবে না যে সমৃদ্ধি যা-কিছু এসেছে সেজন্য মানুষকে দুঃখ-কষ্টরূপে পুরো মূল্য দিতে হয়নি। দিতে হয়েছে, তবে ইংলণ্ডের সমৃদ্ধির জন্য সেটা দিয়েছে অপরে—বিশেষভাবে ভারতবর্ষ: আর এই মূল্যটা যে আকারে দিতে হয়েছে তা হল, দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু এবং কর্মের অভাবে অসংখ্য ব্যক্তির বেকার অবস্থাহেতু বহু দুঃখ। ভারতবর্ষ, চীন ও অন্যান্য ঔপনিবেশিক দেশ, যার অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ ছিল ইউরোপীয় কোনো না কোনো শক্তির হাতে, তারাই ইউরোপের যন্ত্রশিল্পযুগে পৌঁছানোর সকল ঝক্কি বহন করতে বাধ্য হয়েছে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সকল কালেই ভারতবর্ষে শ্রম ও শিল্পের উন্নতির অনুকূল অনেক কিছুই ছিল, সুব্যবস্থিতভাবে কাজ চালাবার যোগ্য ও শিল্পপদ্ধতিতে জ্ঞানসম্পন্ন লোক ও নিপুণ কারিগর প্রভৃতির অভাব ছিল না। এমনকি বহুকাল ধরে ভারতের অর্থ বিদেশী দ্বারা শোষিত হলেও শিল্পের জন্য মূলধনও কিছু পাওয়া যেতে পারত। ১৮৪০ খৃস্টাব্দে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের একটি অনুসন্ধান সমিতিতে সাক্ষ্য দেবার কালে ঐতিহাসিক মণ্টগোমারী মার্টিন্ বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষ সমভাবে কৃষি ও শ্রমশিল্পের দেশ। যদি কেউ এই দেশকে কৃষিপ্রধান করে তুলতে চায় বুঝতে হবে যে সভ্যজগতে একে খাটো করাই তার উদ্দেশ্য। ইংরাজ ঠিক এইভাবেই একে খাটো করতে চেষ্টা করেছে বরাবর, এবং জেদের সঙ্গে। কতখানি তারা কৃতকার্য হয়েছে, দেড়শো শতাব্দী ধরে তাদের স্বেচ্ছাচারী শাসনের অধীন থেকে এদেশ যে-অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, তাতেই সেটা প্রকাশ পাচ্ছে। এই প্রায় একশো বছর ধরে এদেশ যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন দাবি করে আসছে। এই দাবির প্রথম থেকেই আমাদের বলা হয়েছে যে ভারতবর্ষ বিশেষভাবে কৃষিপ্রধান দেশ, আর তার পক্ষে কৃষিতে লেগে থাকাই কল্যাণকর। যন্ত্রশিল্পের উন্নতিতে নাকি তার অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে, এবং তার প্রধান ব্যাপার যে কৃষি তারও ক্ষতি হবে। ইংরেজ যন্ত্রশিল্পের অধিনায়ক ও অর্থনীতিকেরা ভারতীয় কৃষকদের কল্যাণের জন্য যে উৎকণ্ঠা প্রদর্শন করেছেন তাতে তো তৃপ্তি অনুভব করারই কথা। কিন্তু তাহলে কি হয়, ভারতীয় ইংরাজ গভর্নমেণ্ট তাদের উপর যে অপার স্নেহ বর্ষণ করে আসছেন তার ফলে তারা জগতে সর্বাপেক্ষা দরিদ্র ও দুর্গত জীব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব দেখে মনে করতেই হয় যে গভর্নমেণ্টের সমস্ত অনুকম্পা ও শুভকামনাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে কোনো সর্বশক্তিসম্পন্ন দুষ্টগ্রহ।

এখন ভারতের শিল্পোন্নতিতে বাধা দেওয়া বড় সহজ নয় কিন্তু এখনও যখনই কোনো বৃহৎ ও দূরপ্রসারী পরিকল্পনা গড়ে তোলা হয় ইংরাজ বন্ধুরা সাবধানবাণী প্রচার করেন যেন কৃষির কোনো ক্ষতি না হয়, কারণ তার স্থান সকলের উপরে। এ'রা এখনও তাঁদের উপদেশ বর্ষণের পালা শেষ করেননি। যে ভারতীয়ের কিছুমাত্র বুদ্ধি আছে সে কি কৃষিকর্মকে তাচ্ছিল্য করতে পারে, না, কৃষককে ভুলতে পারে? ভারতীয় কৃষকই ভারতবর্ষ আর তারই উন্নতি ও কল্যাণের উপর ভারতের উন্নতি নির্ভর করে। কৃষির বর্তমান সঙ্কটময় অবস্থা শিল্পের সংকটময় অবস্থার জন্যই ঘটেছে। এ-দুটিকে পৃথক করে নেওয়াও যায় না, বিচার করাও যায় না। এদের মধ্যেকার অসামঞ্জস্য দূর করা নিতান্তই আবশ্যক।

শিল্পোন্নতির যখন যেটুকু সুযোগ ভারত পেয়েছে, তখনই তা গ্রহণ করে কৃতকার্যতা লাভ করেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে এ-বিষয়ে অধিকতর উন্নতি করার যোগ্যতা ভারতের আছে। ইংরাজ গভর্নমেন্টের এবং ইংলন্ডের যে-সকল লোকের স্বার্থ এদেশে নিহিত আছে, তাদের প্রবল বাধা সত্ত্বেও ভারত এই কৃতকার্যতা লাভ করেছে। এদেশ প্রথম সুযোগ পায় ১৯১৪-১৮ খৃস্টাব্দের যুদ্ধের সময়, কারণ তখন বিলাতী দ্রব্যের আমদানী অনেক পরিমাণে বন্ধ হয়েছিল। ভারত এই সুযোগে লাভবান হতে পেরেছে। কিন্তু ইংরেজদের রাষ্ট্রনীতির কারণে যতটা হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। তারপর থেকে বরাবরই সকল অন্তরায় ও নানা বৈদেশিক স্বার্থের বাধা দূর করে ভারতের শিল্পোন্নতির সুযোগ করে দেবার জন্য গভর্নমেন্টের উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে। উপরে উপরে শিল্পোন্নতির এই নীতি অবলম্বন করলেও গভর্নমেণ্ট প্রকৃত উন্নতিতে, বিশেষভাবে, মূলগত অর্থাৎ বুনিয়াদি শিল্পে, বাধা দিয়েছে। এমনকি ১৮৩৫ সালের সংগঠন আইনে (কন্স্টিটিউশন এ্যাক্ট) বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারতীয় আইন পরিষদগুলি ইংরেজদের যন্ত্রশিল্পঘটিত স্বার্থ যা এদেশে স্থান পেয়েছে তাতে হাত দিতে পারবে না। যুদ্ধের পূর্বে কয়েক বছরে এদেশে মূলগত (বুনিয়াদি) শিল্প ও বৃহৎ যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠা করার জন্য বারবার প্রবল চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু রাজকীয় নীতিতে সে সমস্তই ব্যর্থ হয়েছে। এরূপ বাধার সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যটা ঘটেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে। সে-সময়ে যুদ্ধের জন্যই অধিক পরিমাণে বস্তুসম্ভার প্রস্তুতের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তাতেই বাধা দেওয়া হয়েছে। এমন সঙ্কট-কালের প্রয়োজনও ভারতের শিল্পোন্নতি বিষয়ে ইংরেজের অনিচ্ছা জয় করতে পারেনি। এ সত্ত্বেও যেটুকু হয়েছে তা ঘটনাচক্রে; আর যা বা হয়েছে, তা যতটা হতে পারত, এবং অন্যান্য দেশে যতটা হয়েছে, তার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর।

আগে ভারতের শিল্পোন্নতিতে বাধা দেওয়া হত সাক্ষাৎভাবে, তারপর হতে লাগল গৌণভাবে, কিন্তু তার কুফল হল সমানই। সাক্ষাৎভাবে কর আদায় করার পরিবর্তে পণ্যশুল্ক ও উৎপাদনশুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা হল এবং অর্থনীতি ও মুদ্রানীতির কূটকৌশল চলতে লাগল, আর এই সবের দ্বারা ভারতের ক্ষতির ভিতর দিয়ে ইংলন্ডের লাভ ঘটল।

একটা জাতি বহুকাল ধরে পরাধীন থাকলে অনেক প্রকারের অকল্যাণ এসে পড়ে; আর তার প্রধানটা হয় আত্মার ক্ষেত্রে—লোকে নীতিভ্রষ্ট হয়ে যায়, অন্তর শক্তিহীন হয়। বাইরে থেকে বোঝা গেলেও কিন্তু একে মাপা যায় না। একটা জাতির অর্থনৈতিক অবনতির পরিমাপ অবশ্য আরও নিশ্চিতভাবে করা যায়। ভারতে ইংরেজদের অর্থনীতি সম্বন্ধে চিন্তা করলে ভারতীয়দের দারিদ্র্য যে তারই ফল, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। এ-দারিদ্র্যের তো কোনো গোপন রহস্য নেই, এর কারণগুলি আমরা দেখতেই পাই, আর যে-যে প্রকারে এরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়েছে তাও স্পষ্টভাবেই জানা যায়।

৪ : ভারত এই প্রথম একটা বিদেশের সংযোজিত অংশমাত্র হয়ে দাঁড়াল

ভারতে ইংরাজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা তার ইতিহাসে একটি নূতন শ্রেণীর ঘটনা, কারণ এর আগের আর কোনো বিদেশীয় আক্রমণ কি রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। 'এর আগে ভারত বিজিত হয়েছে, কিন্তু বিজেতৃরা ভারতের মধ্যে বসবাস করে তার অংশই হয়ে গেছে।' (ইংলণ্ডে নরম্যানেরা ও চীনে মাঞ্চুরাও তাই করেছিল।) 'কখনও ভারত তার স্বাধীনতা হারায়নি, কখনও দাসত্বশৃঙ্খলও তাকে পরতে হয়নি। একথার অর্থ এই যে ভারতকে এর আগে, অন্য দেশে যার শক্তির কেন্দ্র, এমন কোনো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অধীন হতে হয়নি। এদেশ এমন কোনো শাসকশ্রেণীর কবলগতও হয়নি যারা চিরকাল মূলত ও চরিত্রে বিদেশী থেকে গেছে।'* এর আগে যে-সকল শাসকেরা ভারত অধিকার করেছে, তারা দেশেরই হোক কি বিদেশেরই হোক, ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের মূল কাঠামো স্বীকার করে নিয়ে তাতে মিলে যেতেই চেষ্টা করেছে। তারা ভারতীয় হয়ে গিয়ে এদেশেই স্থায়ী হয়েছে। এই নূতন শাসকেরা কিন্তু অন্য প্রকারের। তাদের জীবনের ভিত্তিভূমি অন্যত্র, সাধারণ ভারতীয় ও তাদের মধ্যেকার পার্থক্য বিশাল ও দূরপনেয়, কারণ এ-পার্থক্য ঐতিহ্যের দৃষ্টিভঙ্গীর, আর্থিক অবস্থা এবং জীবনযাত্রা প্রভৃতি সকল বিষয়ের। প্রথম প্রথম যে-সকল ইংরেজ এদেশে এসেছিল তারা আপন দেশের সঙ্গে যোগরক্ষা করার সুবিধার অভাবে কিছু কিছু ভারতীয় ধরন-ধারণ গ্রহণ করেছিল, কিন্তু এতে গভীরতা ছিল না, আর ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের মধ্যে চলাচল ও আদান-প্রদানের ব্যবস্থার উন্নতি হতেই এটুকুও জোর করেই পরিত্যাগ করা হয়েছিল। ইংরেজ মনে করতে লাগল যে তাদের ভারতীয়দের হতে পৃথক থেকে, তাদের দূরে রেখে, নিজেদের জন্য একটা উচ্চতর জগৎ গড়ে নিয়ে আপন প্রতিপত্তি বজায় রেখে চলতে হবে। দুটো জগৎ তৈরি হয়ে

* কে. এস্. শেলভানকার : 'দি প্রবলেম্ অফ ইণ্ডিয়া' : (পেঙ্গুইন্ স্পেশ্যাল, লণ্ডন ১৯৪০)।

উঠল : একটা ইংরেজদের, আর একটা কোটি কোটি ভারতীয়ের; আর এই দুয়ের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা ব্যতীত সাধারণ আর কিছুই রইল না। আগে এমন হয়েছে এক জাতি আর এক জাতিতে মিলে গেছে, অথবা অন্তত এরূপ ঘটেছে যে একের সঙ্গে অপরটি মানিয়ে নিয়ে পরস্পর-নির্ভরশীল একটি কাঠামো গড়ে তুলেছে। এখন জাতিস্বার্থই হয়ে উঠল বড় কথা, আর এক্ষেত্রে এটা খুব জোর পেল এইজন্য যে প্রভুত্বসম্পন্ন জাতিটি বাধাবিঘ্নহীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির অধিকারী।

নূতন ধনিকনীতিতে জগতের বাণিজ্য ব্যাপার যেভাবে গড়ে উঠছিল তাতে ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসারই কথা। পল্লীজীবনও পূর্বের মত চলতে পারল না, কর্মবিভাগ দ্বারা নিজের মধ্যেই সকল প্রয়োজন পূর্ণ করার ব্যবস্থা আর চলল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যে পরিবর্তন এল তা অস্বাভাবিক আকারেই এল, এবং তার ফলে ভারতীয় সমাজের অর্থনৈতিক এবং তার মূলগত বিধিব্যবস্থা ভেঙে পড়ল। আগে যে ব্যবস্থা ছিল তা গড়ে উঠেছিল বহুদিনের চেষ্টায়, এবং লোকের চিরাগত সংস্কৃতির অংশরূপে সমাজের মধ্যে তা প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু এখন জোর করে আর এক ব্যবস্থা আনা হল যা বাইরের এবং যার নিয়ন্ত্রণও বাইরে থেকে হতে লাগল। ভারত জগতের ব্যবসায়-ক্ষেত্রে স্থানলাভ করল না, কেবল ইংরেজদের আপন ব্যবস্থায় একটা উপনিবেশরূপে যুক্ত হল, আর তার কাজ হল কৃষি।

এতদিন পর্যন্ত পল্লীসমাজেই ছিল ভারতের অর্থনীতির ভিত্তি। এখন তা নষ্ট হয়ে গেল। স্যর চার্লস্ মেটকাফ্ ইংরেজ রাজকর্মচারীদের মধ্যে একজন বিশেষভাবে যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যা বলেছেন তা প্রায়ই উদ্ধৃত হয়ে থাকে : 'পল্লীসমাজগুলি এক একটি ক্ষুদ্রায়তন সাধারণতন্ত্র রাজ্যের ন্যায়—প্রত্যেকটির যা-কিছু প্রয়োজন তা নিজের মধ্যেই আছে, আর বাইরের সঙ্গে সম্বন্ধ-নিরপেক্ষ হয়ে অবস্থিত। অন্য সব যেখানে ভেঙে পড়ে, পল্লীব্যবস্থাকে সেখানেও টিকে থাকতে দেখা যায়, পল্লীসমাজের এক-একটি সমবায় যেন এক-একটি রাজ্য। এগুলিতে মানুষের সুখ বৃদ্ধি পেয়েছে, আর তারা অনেক পরিমাণে স্বাধীনতা উপভোগ করারও সুযোগ পেয়েছে।'

পল্লীশিল্পের ধ্বংস পল্লীজীবনের উপর দারুণ আঘাতের কারণ হয়েছে। সমাজে কৃষিও ছিল শিল্পও ছিল, এবং এই দুটি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল যে সমাজ-ব্যবস্থা সহজভাবেই চলত। কর্মানুযায়ী সমাজে যে সকল বিভাগ ছিল তাও আর তেমন নেই, এখন অনেক ব্যক্তিকে কোনো কর্মমণ্ডলীতেই খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় না। জমিদারী ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ায় সমাজের গায়ে আঘাতটা সোজাসুজি লাগল কারণ এতে জমির অধিকার সম্বন্ধে ধারণা উল্টে গেল। আগে ধারণা ছিল, জমির উপর সকলের মিলিত অধিকার। ফসলের কতখানি কে পাবে তা-ই ছিল প্রশ্ন, জমির অংশের কথা উঠত না। ইংরাজ শাসকেরা ইংলণ্ডের জমিদারদের শ্রেণীভুক্ত ছিল; তারা ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থার সুবিধা বুঝে উঠতে পারেনি, অথবা নিজেদেরই কোনো কারণে ভারতবর্ষে আপন দেশের ব্যবস্থারই মত একটা ব্যবস্থা প্রচলিত করেছিল। প্রথমত তারা অল্প-দিনের জন্য রাজস্ব আদায়কারী চাষী নিযুক্ত করেছিল, তারা খাজনা ও করাদি আদায়

করে গভর্নমেণ্টে জমা দেবার জন্য দায়ী হত। তারপর এরাই জমিদার হয়ে দাঁড়ায়। জমি ও জমিজাত দ্রব্যাদির ব্যবস্থা বিষয়ে পল্লীসমাজ তার পূর্ব অধিকার হতে বঞ্চিত হল। একদিন যা পল্লীসমাজের বিশেষ যত্নের ও আগ্রহের বিষয় ছিল সেই জমি এখন এই সকল নূতন সৃষ্ট জমিদারদের নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াল। এরই কারণে পল্লীসমাজের মণ্ডলীগত জীবন ভেঙে যাওয়ায় তার মধ্যে সমবেতভাবে কাজ করার ব্যবস্থাও ক্রমে লোপ পেতে লাগল।

এইরূপ ভূসম্পত্তির ব্যবস্থায় কেবল যে গুরুতর অর্থনৈতিক পরিবর্তন এসে পড়ল তা নয়, ভারতে যে সমবেতভাবে মণ্ডলীবদ্ধ জীবন প্রচলিত ছিল তাতেও আঘাত লাগল। একটা নূতন শ্রেণীর মানুষ দেখা গেল, তারা ভূস্বামী। ইংরাজ গভর্নমেণ্টের দ্বারা সৃষ্ট হওয়ায় এরা তারই অঙ্গরূপে পরিচিত হল। পুরাতন ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ায় নূতন নূতন সমস্যা প্রকাশ পেতে লাগল। হিন্দু-মুসলমান সমস্যাও এরই জন্য ঘটেছে বলে মনে হয়। জমিদারী ব্যবস্থা সর্বপ্রথম বাঙলা ও বিহারে প্রবর্তিত হয়; এটা 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' নামে পরিচিত। পরে বোধগম্য হয়েছে যে এটা রাজশক্তির পক্ষে সুবিধাজনক ব্যবস্থা নয়, কারণ রাজস্ব নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়ায় তা বাড়ানো যেত না। এইজন্য ভারতের অন্যান্য স্থানে যে-সকল বন্দোবস্ত করা হয় তা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা হয়েছিল, এবং তাতে মাঝে মাঝে রাজস্ব বৃদ্ধি করা হত। কোনো কোনো প্রদেশে একপ্রকার কৃষিজীবী ভূম্যধিকারীর ব্যবস্থা হয়েছিল। অতিশয় কড়াক্কড়িভাবে রাজস্ব আদায়ের কারণে, বিশেষভাবে বাঙলা দেশে ভদ্রশ্রেণী ভূস্বামীদের উৎসাদন ঘটে এবং অর্থবান ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকেরা তাদের স্থান গ্রহণ করে। এইরূপে বাঙলাদেশ বিশেষভাবে হিন্দু ভূস্বামীদের স্থান হয়ে ওঠে। তাদের প্রজাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের লোক থাকলেও বেশির ভাগই ছিল মুসলমান।

ইংরেজেরা নিজের দেশের ব্যবস্থা অনুযায়ী এদেশে বড় বড় জমিদারের সৃষ্টি করেছিল, কারণ বহুসংখ্যক কৃষকদের অপেক্ষা কয়েকজন ব্যক্তিকে আয়ত্ত রাখা সহজ হত। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যত অধিক অর্থ যত শীঘ্র সম্ভব আদায় করা। যদি কোনো ভূস্বামী যথাসময়ে রাজস্ব আদায় করে দিতে না পারত তাহলে তাকে অধিকারচ্যুত করে আর একজনকে তার স্থানে বসানো হত। এ-ছাড়া, আর এক শ্রেণীর লোক আবশ্যক বলে মনে করা হয়েছিল—যাদের স্বার্থ ইংরেজদের স্বার্থের সঙ্গে হবে এক। ইংরেজ রাজকর্মচারীদের মনে সর্বদাই বিদ্রোহের ভয় থাকত এবং একথা তারা অনেকবার লিখেও গেছে। বড়লাট লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিংক ১৮২৯ খৃস্টাব্দে লিখে গেছেন, 'ব্যাপকভাবে কোনো বিদ্রোহ, কি অন্য কোনো বিপ্লব উপস্থিত হলে, তা হতে রক্ষা পাওয়ার উপায় সম্বন্ধে বলতে চাই যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যদিচ অনেক ব্যাপারে বিফল হয়েছে, কিন্তু এর ফলে অন্তত একটা সুবিধা এই হয়েছে যে বিরাট এক ভূস্বামীর দল সৃষ্টি করা গেছে, যারা সর্বান্তঃকরণে চাইবে যে ইংরেজ রাজত্বই চলুক, আর লোকসাধারণের উপর যাদের সম্পূর্ণ দখল থাকবে।'

এইভাবে ইংরেজ এদেশে আপন স্থান দৃঢ় করে নিয়েছিল এমন একদল লোক সৃষ্টি

করে নিয়ে, যাদের সুখ-সুবিধা ইংরেজ শাসনের স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করত। জমিদার ও দেশীয় রাজারা তো ছিলই, আর তাছাড়া ছিল গভর্নমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের বহু কর্মচারী, পাটওয়ারি বা পল্লীপ্রধান থেকে শুরু করে তার উপরের বিভিন্ন পদস্থ ব্যক্তি পর্যন্ত। গভর্নমেণ্টের দুই প্রধান বিভাগ ছিল রাজস্ব ও পুলিশ। প্রত্যেক জেলায় এই দুই বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিল জেলার কলেক্টর বা ম্যাজিস্ট্রেট্, এবং গভর্নমেণ্টের রথ চলত অনেকটা এ'রই উপর নির্ভর করে। আপন জেলায় ইনি চলতেন স্বেচ্ছাচারী রাজার মত; সকল রাজকার্য, বিচার, রাজস্ব আদায় এবং পুলিশের কাজ একাধারে এই কর্মচারীতেই ন্যস্ত ছিল। তাঁর এলাকার পাশে কোনো দেশীয় রাজ্য থাকলে তিনি তাতে ইংরেজরাজের প্রতিনিধিরূপেও কাজ করতেন।

এ-ছাড়া ছিল ভারতীয় সৈন্যবিভাগ। এই বিভাগ ভারতীয় এবং ইংরাজ দ্বারা সংগঠিত হলেও, সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীই ছিল ইংরাজ। সৈন্যবিভাগকে অনেকবারই পুনর্গঠিত করা হয়েছে, বিশেষত ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পর, আর শেষে একে ইংলণ্ডের সৈন্যবিভাগের সঙ্গে একপ্রকার যোগ করেই নেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর সৈন্যদের মধ্যে একটা সাম্যাবস্থা আনার জন্য এবং সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ইংরেজ সৈন্য বহাল রাখার জন্যই এরূপ করা হয়। ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে যে পুনর্গঠন ঘটে তার রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'প্রথমত ইংরেজ সৈন্য দিয়ে এ-বিভাগে সাম্য রক্ষা করা হয়েছে, আর দেশীয়দের বিরুদ্ধে দেশীয়দেরই প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করে।' এই সকল সৈন্যের প্রথম কাজ ছিল আয়ত্তাধীন নূতন নূতন প্রদেশের উপর প্রভুত্ব বজায় রাখা; এদের অধিকাংশই ছিল ইংরেজ। ভারতের খরচে ভারতেরই সীমান্ত প্রদেশ ইংলণ্ডের সৈন্যদের শিক্ষাক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হত। এই ভারতীয় সৈন্যবাহিনীগুলির বিশেষ একটি কাজই ছিল বিদেশে গিয়ে যুদ্ধ করা, বিদেশে ইংরেজরাজের প্রসারের জন্য অনেক যুদ্ধই তারা করেছে ভারতের খরচে। দেশীয় সৈন্যেরা দেশের সাধারণ লোকের সঙ্গে যাতে মিশতে না পারে সেজন্য বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হত।

এইরূপে দেখা যায় যে ভারতকে তার নিজের পরাজয়ের জন্য নিজে খরচ যোগাতে হয়েছে; আর তাছাড়া ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হতে ইংরাজরাজের কাছে বিক্রি হবার মূল্য, বর্মা ও অন্যান্য স্থানে ইংরেজ রাজত্বের প্রসারের ব্যয়, আফ্রিকা, পারস্য প্রভৃতি দেশে অভিযান প্রেরণের জন্যে যা খরচ হয়েছে, সে সমস্ত এবং ভারতীয়দের কাছ থেকে ইংরেজের ভারত রাজ্য রক্ষা করার ব্যয়ও ভারতকেই দিতে হয়েছে। ভারতকে যে কেবল ইংরেজরাজের যুদ্ধ প্রচেষ্টার কেন্দ্র হতে হয়েছে, এবং তার জন্য খরচের কিছুই ফিরে পায়নি, তাই নয়, উপরন্তু ইংলণ্ডে ইংরেজ সৈন্যের শিক্ষার খরচও তাকে অংশত বহন করতে হয়েছে—মাথা পিছু হিসাব করে। বাস্তবিক ইংলণ্ড নিজে যে-সমস্ত খরচ করেছে তার অনেক কিছুই ভারতের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। চীন ও পারস্যে ইংরাজদের কূটনৈতিক ব্যবস্থা ও প্রতিনিধি রাখার ব্যয়, ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে টেলিগ্রাফের তার বসানোর পূর্ণ মূল্য, ভূমধ্যসাগরে ইংরেজ নৌবাহিনী

রাখার ব্যয়ের অংশ, এমনকি লণ্ডনে তুরস্কের সুলতানকে স্বাগত-অভিনন্দন দেবার ব্যয়ও ভারতকে বহন করতে হয়েছে।

রেলপথ প্রস্তুত অবশ্য নিতান্তই আবশ্যক। কিন্তু ভারতে এ-কাজে অনেক বৃথাব্যয় ঘটেছে। রেলপথের জন্য যা-কিছু মূলধন নিয়োজিত হয়েছিল তার উপর শতকরা ৫৲ হারে সুদের জামিন হয়েছিল ভারত গভর্নমেণ্ট। কোন খরচটা আবশ্যক কোনটা নয়, তা খুঁটিয়ে দেখাও হয়নি আর এজন্য যা-কিছু দরকার সবই ক্রয় করা হয়েছিল ইংলণ্ডে।

গভর্নমেণ্টের বে-সামরিক বিভাগগুলিতে অতিরিক্তমাত্রায়, অত্যন্ত বেহিসেবীরকমে খরচ করা হত আর সমস্ত উচ্চ বেতনের পদগুলি ইউরোপীয়দের জন্য রাখা হত। কর্মপরিচালনার ব্যবস্থায় ভারতবর্ষীয়দের নিয়োগ অত্যন্ত ধীরে চলছিল, বলতে গেলে এই বিংশ শতকেই তা একটুখানি দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। এতে ভারতীয়দের হাতে কোনো শক্তি আসেনি, বরঞ্চ এটা ইংরেজ রাজত্বকে আরো সুদৃঢ় করার উপায়স্বরূপ হয়েছিল। মূল কেন্দ্রীয় পদগুলি ইংরেজদের হাতেই ছিল, ভারতীয় কর্মচারীরা কেবল ইংরেজ শাসনের প্রতিভূস্বরূপ কাজ করতে পারত।

উপরিলিখিত পদ্ধতিগুলি ছাড়াও ইংরেজ শাসনে বরাবর দেশীয়দের মধ্যে একদলকে হীন করে অন্যদলকে তুলে ধরার নীতি অবলম্বন করা হয়েছে। এই শাসনের প্রথম দিকে এই-নীতি প্রকাশ্যভাবে স্বীকৃত হত, আর সত্য কথা বলতে কি, যে-শক্তি সাম্রাজ্য রক্ষা করতে চায় তাকে এই নীতিই অবলম্বন করতে হয়। দেশে জাতীয় আন্দোলন বৃদ্ধি পাওয়ায়, এই নীতি আরও চতুর ও বিপজ্জনক রূপ গ্রহণ করল এবং স্বীকৃত না হলেও এর প্রয়োগ পূর্বাপেক্ষা তীব্রতরভাবে হতে লাগল।

আমাদের গুরুতর সমস্যা প্রায় সকলগুলিই ইংরেজ শাসনের কালে, ইংরেজের শাসননীতির ফলস্বরূপ উদ্ভূত হয়েছে : দেশীয় রাজন্যবর্গ; সংখ্যালঘিষ্ঠ সমস্যা; দেশীয় ও বিদেশীয় নানা স্বার্থ প্রতিষ্ঠান; শিল্পের অভাব এবং উপেক্ষিত কৃষি-সমাজের অনগ্রসর অবস্থা; এবং এই সমস্তের উপরে দেশবাসীর ভীষণ দারিদ্র্য—এগুলিই হল সেই সব সমস্যা। শিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে শাসকদের মনোভাব তাৎপর্যপূর্ণ। ক্যে লিখিত মেটকাফের জীবনীতে আছে 'অবারিতভাবে জ্ঞানের প্রসার সম্বন্ধে ভয় একটা পুরাতন ব্যাধিতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। গভর্নমেণ্টের কর্তাদের এই কথা ভেবে ভেবে একপ্রকার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছিল, তাঁরা ছাপাখানা, বাইবেলের প্রচার প্রভৃতির দুঃস্বপ্নে ভীতির শিহরণ অনুভব করতেন, অঙ্গের লোম খাড়া হয়ে উঠত। সে-কালে আমাদের নীতি ছিল দেশীয় ব্যক্তিদের বর্বরতা ও নিবিড় অশিক্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখা। আমাদের ও দেশীয় রাজ্যগুলির এলাকায় প্রজাদের মধ্যে জ্ঞানালোক বিস্তারে প্রচণ্ডরকম বিরুদ্ধাচরণ ও রোষপ্রদর্শন করা হত।'*

সাম্রাজ্য শাসন এইভাবেই চলে, আর তা না হলে সাম্রাজ্যই টেকে না। এখন যে নূতনতর অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ চলেছে তাতে এরূপ অর্থশোষণ ঘটছে যা আগে

* টমসন্ কর্তৃক উদ্ধৃত।

জানা ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজের ভারত শাসনের বিবরণে একজন ভারতীয় স্বভাবতই ভগ্নোৎসাহ ও রুষ্ট, তবু তাতে অনেক ক্ষেত্রেই ইংরাজদের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, আমাদের অমিল ও দুর্বলতার সুবিধা গ্রহণ করে লাভবান হওয়া সেই কৃতিত্বের একটা। কোনো দুর্বল জাতি কালের গতিতে অগ্রসর হতে না পেরে পিছিয়ে পড়লে বহু বিপদকেই ডেকে আনে, আর শেষ পর্যন্ত এজন্য নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করতে হয়। স্বাভাবিক নিয়মেই ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদের কুফল আসবে তা জানা কথা, আর এর বিরুদ্ধতাও যে দিন দিন বৃদ্ধি পাবে তাও নিশ্চিত. সুতরাং পরিণামের সঙ্গীন অবস্থাটা একদিন উপস্থিত হবেই হবে।

৫ : দেশীয় রাজ্যব্যবস্থার উদ্ভব

ভারতের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির একটি দেশীয় রাজ্যগুলির বিষয়ে। জগতে এরূপ রাজ্য কেবল এদেশেই আছে, আর এগুলির প্রত্যেকটির আয়তন এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিভিন্ন প্রকারের। এদের সংখ্যা ৬০১, তার মধ্যে পনেরোটিকে প্রধান বলা যেতে পারে, আর সেগুলির মধ্যে বৃহত্তম হল : হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, বরোদা, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, কোচিন, জয়পুর, যোধপুর, বিকানির, ভূপাল ও পাতিয়ালা। এর পর কতকগুলি মাঝারি আয়তনের রাজ্য আছে, আর শেষে পাওয়া যায় কয়েকশো খুব ছোট ছোট স্থান, ভারতের মানচিত্রে সূচ্যগ্রের দ্বারা তাদের প্রত্যেকটিকে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। এই ছোট ছোট রাজ্যগুলির অধিকাংশ আছে কাথিয়ওয়ারে, এবং পশ্চিম-ভারত ও পাঞ্জাবে।

এই সকল রাজ্যগুলির মধ্যে আয়তনে ফরাসী দেশের সমান রাজ্য আছে, আবার একজন সাধারণ চাষীর সম্পত্তির সমানও আছে, আর সকল বিষয়েই তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। মহীশূর রাজ্য যন্ত্র ও শ্রমশিল্পে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর : মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর এবং কোচিন শিক্ষায় ইংরেজাধিকৃত ভারত অপেক্ষা অনেক এগিয়ে গেছে।*

অধিকাংশ রাজ্যই কিন্তু অনগ্রসর আর কতকগুলি এখনও সামন্ততান্ত্রিক। এদের সবগুলিরই রাজা স্বেচ্ছাচার শক্তিসম্পন্ন, যদিচ কোনো কোনোটিতে মনোনীত সভ্যের শাসন-পরিষৎ প্রবর্তন করা হয়েছে, কিন্তু তার শক্তি বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। হায়দ্রাবাদ

* প্রজাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, মহীশূর ও বরোদা ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষ অপেক্ষা বহুপরিমাণে অগ্রসর। ত্রিবাঙ্কুরে ১৮০১ খৃস্টাব্দে লোক-সাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হতে আরম্ভ করে। (তুলনা করা যেতে পারে—ইংলণ্ডে এটা আরম্ভ হয় ১৮৭০ খৃস্টাব্দে।) ত্রিবাঙ্কুরে লিখনপঠনক্ষম পুরুষ শতকরা ৫৮ জন, আর স্ত্রীলোক ৪১ জন; ইংরেজ ভারতের এরূপ লোকের শতকরা সংখ্যার চতুর্গুণ ত্রিবাঙ্কুরে। লোকসাধারণের জন্য স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থাও ত্রিবাঙ্কুরে উচ্চতর। ত্রিবাঙ্কুরে স্ত্রীলোকেরা রাজকার্যে ও অন্যান্য সাধারণ প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে থাকে।

সর্বপ্রধান দেশীয় রাজ্য. কিন্তু এখানে এখনও সামন্ততান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা চলছে, আর প্রজাদের শাসন বিষয়ে কোনোপ্রকার অধিকার দেওয়া হয়নি। রাজপুতানা ও পাঞ্জাবের অধিকাংশ রাজ্যের অবস্থাও এইরূপ। প্রজাদের সাধারণ অধিকারের অভাব দেশীয় রাজ্যের সকলগুলিতেই দেখা যায়।

এ-রাজ্যগুলি একত্র হয়ে নেই, দেশময় ছড়িয়ে আছে—ইংরেজাধিকৃত স্থানের দ্বারা পরিবৃত দ্বীপের ন্যায়। তাদের প্রায় সবগুলিই নিজেদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সম্বন্ধে কিছু পরিমাণ স্বাধীনতা বজায় রাখতে অক্ষম; এমনকি বৃহত্তমগুলিও এরূপে অবস্থিত যে তারাও চতুর্দিকবর্তী স্থানগুলির সহযোগিতা ব্যতীত চলতে অক্ষম। যদি কোনো দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অংশের অর্থনৈতিক বিরোধ উপস্থিত হয় তাহলে শুল্ক আদায় দ্বারা ট্যারিফের সাহায্যে কিংবা অন্যান্য বাধা উপস্থিত করে তাদের জব্দ করে দেওয়া সহজ। স্পষ্টই দেখা যায় যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে এই সকল রাজ্য এমনকি এদের বৃহত্তমগুলিও, পৃথক করে স্বাধীন রাজ্যরূপে বিবেচিত হতে পারে না। এরূপভাবে তারা টিকতেও পারবে না এবং সমগ্র দেশেরও তাতে ক্ষতি হবে। তারা দেশময় অপর রাজ্যে পরিবেষ্টিত ছোট ছোট শত্রুভাবাপন্ন স্থান হয়ে উঠবে, আর যদি কোনো বিদেশীয় শক্তির উপর আত্মরক্ষার জন্য নির্ভর করে তাহলে এটাই স্বাধীন ভারতের পক্ষে বরাবর একটা বিপদের কারণ হয়ে পড়বে। বাস্তবিক তারা এতদিন টিকে থাকতে পারত না যদি দেশীয় রাজ্যসহ সমগ্র ভারত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে একটা প্রভুত্বসম্পন্ন শক্তির অধীন হয়ে না থাকত, আর সেই শক্তি এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে রক্ষা করে না চলত। দেশীয় রাজ্য ও তার বহির্বর্তী ভারতের মধ্যে বিরোধ ছাড়াও আরও একটা বিষয় স্মরণ করা আবশ্যক। রাজ্যের প্রজারাও স্বেচ্ছাচার-শক্তিসম্পন্ন রাজার উপর সকল সময়েই স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের জন্য চাপ দিয়ে থাকে। এই স্বাধীনতালাভের সকল প্রচেষ্টা ইংরাজশক্তির সাহায্যে দমিত রাখা হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই রাজ্যগুলি কালের তুলনায় পশ্চাৎপদ হয়ে ওঠে। বর্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষের বহু পৃথক পৃথক স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হওয়ার কথা ভাবাই যায় না। কেবল যে তাতে চিরস্থায়ী বিরোধ উপস্থিত হবে তা নয়। সকল প্রকার পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিও অসম্ভব হয়ে পড়বে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে যখন এই সকল রাজ্য ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে সন্ধি করে তখন ইউরোপও অসংখ্য ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল।

তারপর বহু যুদ্ধ ও বিপ্লবের ফলে ইউরোপের চেহারা বদলে গেছে এবং এখনও বদলাচ্ছে, কিন্তু বাইরের চাপে ভারতবর্ষের রূপ শক্ত পাথরে পরিণত হয়েছে, বদলাবার সুযোগ পায়নি। দেড়শো বছর আগে যে সন্ধিপত্র যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা যুদ্ধের অব্যবহিত পরে দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতি কিংবা রাজার মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল আজ সেই সাময়িক চুক্তির কাগজখানা তুলে ধরে ব্যবস্থাটার চিরস্থায়িত্ব দাবি করলে তা অসঙ্গত বলেই মনে হবে। এই ব্যবস্থায় রাজ্যের প্রজারা কোনো কথাই বলতে পায়নি, আর এই

সন্ধির অন্য তরফ সে-সময়ে একটা ব্যবসায়ী সমবায় মাত্র ছিল, এবং তাদের দৃষ্টি ছিল আপন স্বার্থ এবং লাভের উপর। এই ব্যবসায়ী সমবায়, অর্থাৎ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী, এই কাজ ইংরাজ-রাজের অথবা পার্লামেণ্টের প্রতিভূস্বরূপ করেনি, করেছিল দিল্লীর সম্রাটের প্রতিভূরূপে, কারণ তখন কোম্পানীর এইরূপ অধিকার দিল্লীশ্বরের প্রদত্ত বলে মনে করা হত, যদিচ তার নিজেরই কোনো শক্তি ছিল না। ইংরাজ-রাজ অথবা পার্লামেণ্টের এই সন্ধি বিষয়ে কোনো হাত ছিল না। কোম্পানী যে সনন্দ নিয়ে এদেশে এসেছিল পার্লামেণ্টে মাঝে মাঝে সে-সম্বন্ধে বিচারাদি হত আর কেবল তখনই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা উঠত। কোম্পানী মুঘল সম্রাটের প্রদত্ত দেওয়ানী হতে যে অধিকার লাভ করেছিল তারই জোরে এদেশে কাজ চালাত. সুতরাং ইংরাজ-রাজ কি পার্লামেণ্টের মতামত সম্বন্ধে তাদের স্বাধীনতা ছিল। ইচ্ছা করলে পার্লামেণ্ট কোম্পানীর সনন্দ বাতিল করতে অথবা পুনরায় মঞ্জুর করার সময় নূতন সর্ত যোগ করতে পারত। ইংরাজ-রাজ কিংবা পার্লামেণ্ট কল্পনাতেও দিল্লীর সাক্ষিগোপাল সম্রাটের প্রতিভূরূপে অর্থাৎ তার অধস্তন কর্মচারীরূপে, কোনো কাজ করবে তা ইংলণ্ডে কেউ-ই পছন্দ করেনি, সুতরাং তারা ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাজকর্ম সম্বন্ধে বিশেষভাবে নির্লিপ্ত থাকত। ভারতীয় যুদ্ধগুলিতে যে-অর্থ ব্যয় করা হত তা ভারতেরই অর্থ, ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী তা সংগ্রহ করে নিজেরা খরচ করত।

পরবর্তীকালে, যখন কোম্পানীর আয়ত্তাধীন প্রদেশের আয়তন বৃদ্ধিলাভ করল এবং তার শাসনও বিধিবদ্ধ হল তখন ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল। ভারতীয় বিদ্রোহের পর, ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে, ভারতবর্ষের নিজেরই অর্থের বিনিময়ে কোম্পানী তার ভারতীয় রাজ্য ইংরাজ-রাজের কাছে হস্তান্তরিত করে দেয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশ হতে পৃথকভাবে দেশীয় রাজ্যগুলিকে হস্তান্তরিত করা হয়নি। সমগ্র ভারতবর্ষ একটি রাজ্যরূপে বিবেচিত হয়েছিল আর এর পর ইংরাজ পার্লামেণ্ট ভারত গভর্নমেণ্টের মারফত রাজকার্য পরিচালনা এবং দেশীয় রাজ্যগুলির উপরেও প্রভুত্ব করত। ইংরাজ-রাজ অথবা পার্লামেণ্টের সঙ্গে এই রাজ্যগুলির কোনো পৃথক সম্পর্ক ছিল না। বস্তুত তারা ভারত গভর্নমেণ্টের শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে অংশরূপে চলত। পরবর্তীকালে এই গভর্নমেণ্ট তাদের শাসননীতিতে কোনো পরিবর্তন করলে প্রয়োজনমত চুক্তিপত্রগুলিকেও উপেক্ষা করেছে এবং দেশীয় রাজ্যগুলির উপর জোর প্রভুত্ব পরিচালনা করে আসছে।

ইংরাজ-রাজের সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলির কোনো সম্পর্কই ছিল না। আজকালই এগুলি এক প্রকারের স্বাধীনতা দাবি করছে ও বলছে যে ভারত গভর্নমেণ্টের সঙ্গে তাদের যা সম্পর্ক তা ছাড়াও ইংরাজ-রাজের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে যে-সন্ধির কথা বলা হয়েছে তা কেবল চল্লিশটি রাজ্যের সঙ্গে হয়েছিল, বাকিগুলি পেয়েছে চুক্তিপত্র ও সনদ। সকল দেশীয় রাজ্যগুলির মোট লোকসংখ্যার চারভাগের তিনভাগ আছে এই চল্লিশটি রাজ্যে, আর তাদের মধ্যে ছয়টিতে আছে এই সমগ্র লোক-

সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক।* ১৯৩৫ খৃস্টাব্দের ভারত গভর্নমেণ্ট আইনে সেই সর্বপ্রথম ইংরাজ পার্লামেণ্টের সঙ্গে সম্পর্কে দেশীয় রাজ্য ও অবশিষ্ট ভারতের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। এই রাজ্যগুলি ভারত সরকারের পরিচালনা ও পরিদর্শনের অধীন ছিল, এখন এগুলিকে রাজপ্রতিনিধির অধীনে আনা হয়, এবং এই কাজের জন্য রাজপ্রতিনিধিকে নূতন নাম দেওয়া হয় রাজপ্রতিভূ।† তিনি পূর্ব্ববৎ ভারত সরকারের প্রধান হয়েই রইলেন, কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক বিভাগ, অর্থাৎ যে বিভাগ দেশীয় রাজ্যগুলির জন্য দায়ী থাকত, তা এখন রাজপ্রতিনিধির অধীনে এল, কিন্তু তাঁর ব্যবস্থাপক সভার অধীন রইল না।

এই রাজ্যগুলি হয়েছিল কেমন করে? কয়েকটি রাজ্য নূতন প্রতিষ্ঠিত, ইংরাজেরা তাদের সৃষ্টি করেছে। অন্যগুলি মুঘল সম্রাটের প্রতিনিধিদের অধীন রাজ্য ছিল, পরে ইংরাজেরাও তাদের করদ-রাজ্যরূপে স্বীকার করে নিয়েছে; কতকগুলি আবার মারাঠা প্রধানদের রাজ্য ছিল, তারা ইংরাজদের কাছে যুদ্ধে পরাস্ত হয় ও করদ হয়ে পড়ে। প্রায় সবগুলিরই ইতিহাস এখন থেকে পিছিয়ে ইংরাজ শাসনের সুরু পর্যন্ত টানা যায়; তাদের আরও আগেকার কালের কোনো ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায় না। দু-চারটি রাজ্য অল্পকালের জন্য স্বাধীনভাব ধারণ করেছিল, কিন্তু সে সৌভাগ্য অচিরে শেষ হয়েছিল, হয় যুদ্ধে না হয় যুদ্ধের ভয়েই। রাজপুতানার কয়েকটি মাত্র রাজ্য মুঘলদের সময়ের আগে ছিল। ত্রিবাঙ্কুর প্রায় সহস্র বৎসরের পুরাতন একটি প্রাচীন রাজ্য। কোনো কোনো রাজপুত সম্প্রদায় প্রাগৈতিহাসিক কাল হতে আপনাদের বংশ পরিচয় দিয়ে থাকে। উদয়পুরের সূর্যবংশীয় মহারাণা যে বংশতালিকা দেন তা জাপানের রাজা মিকাডোর বংশতালিকার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু এই রাজপুত প্রধানেরা মুঘলের কাছে করদ হয়েছিল এবং পরে মারাঠাদের কাছে এবং তারও পরে ইংরাজদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছে। এডওয়ার্ড টম্‌সন লিখেছেন যে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিভূরা 'এখন এই সকল রাজাদের নানা বিশৃঙ্খলা থেকে উদ্ধার করে আপন আপন স্থানে বসালেন। যখন তাদের এইভাবে উদ্ধার করা হচ্ছিল তখন এদের অবস্থা এমনই ভেঙে পড়েছিল যে তারা সম্পূর্ণরূপে অসহায় হয়েছিল। ইংরাজ গভর্নমেণ্ট এই সময় সহায় না হলে রাজপুত রাজ্যগুলি লোপ পেত এবং মারাঠা রাজ্যগুলি চূর্ণ হয়ে যেত। অযোধ্যা ও নিজামের রাজ্য তো ছিল ফাঁকি মাত্র, এদুটি যে বেঁচে ছিল তা কেবল যে-শক্তি তাদের রক্ষা করছিল তারই জোরে।'‡

* এই ছয়টি রাজ্য : হায়দ্রাবাদ—১ কোটি ২০ লক্ষ ও ১ কোটি ৩০ লক্ষের মাঝামাঝি; মহীশূর—৭৫ লক্ষ; ত্রিবাঙ্কুর—৬২½ লক্ষ; বরোদা—৪০ লক্ষ; কাশ্মীর—৩০ লক্ষ; গোয়ালিয়র—৩০ লক্ষ—মোট ৩ কোটি ৬০ লক্ষ। দেশীয় রাজ্যগুলির মোট লোকসংখ্যা—প্রায় ৯ কোটি।

† ক্রাউন রেপ্রেজেণ্টেটিভ।

‡ 'দি মেকিং অফ ইণ্ডিয়ান প্রিন্‌সেজ্‌' : পৃঃ ২৭০-৭১ : এই পুস্তকে এবং টমসন-

হায়দ্রাবাদ এখন সর্বাগ্রগণ্য রাজ্য কিন্তু প্রথমে এর আয়তন ছিল ক্ষুদ্র। ইংরাজ কর্তৃক টিপু সুলতানের পরাজয় ও মারাঠা যুদ্ধগুলির পরে দুবার এর সীমানা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই বৃদ্ধি করেছে ইংরাজ, আর এই সর্তে যে নিজাম তাদের অধস্তনরূপে চলবেন। বাস্তবিক টিপুর পরাজয়ের পর তাঁর রাজ্যের কতক অংশ মারাঠা নেতা পেশোয়াকে দেবার প্রস্তাব করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি উপরোক্ত সর্তে তা নিতে অস্বীকার করেন।

কাশ্মীর সর্ববৃহৎ রাজ্যগুলির দ্বিতীয়। এই রাজ্য শিখ-যুদ্ধগুলির পরে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক বর্তমান রাজার প্রপিতামহের নিকট বিক্রয় করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে কু-শাসনের অজুহাতে এরাজ্য ইংরাজ পরিচালনাধীনে গৃহীত হয়েছিল। তারপরে পুনরায় রাজাকে তার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। টিপুর সঙ্গে যুদ্ধের পর বর্তমান মহীশূর রাজ্যের সৃষ্টি হয় এবং এ-রাজ্যও দীর্ঘকাল ধরে ইংরাজ পরিচালনাধীনে ছিল।

প্রকৃতপক্ষে, ভারতে একমাত্র স্বাধীন রাজ্য হল নেপাল। এরাজ্য ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত এবং এর মর্যাদা আফগানিস্থানের ন্যায়, যদিও স্থানটি একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। অন্য সকল রাজ্যই যে-ব্যবস্থার মধ্যে আসে তাকে 'সহায়ক' (সাব্‌সিডিয়ারি সিসটেম) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থায় প্রকৃত ক্ষমতা ইংরাজ গভর্নমেণ্টের হাতেই আছে, স্থানীয় কর্মচারী অথবা প্রতিভূ দ্বারা এই ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়। অনেক ক্ষেত্রে রাজার মন্ত্রীরাও ইংরাজ কর্মচারী হয়ে থাকে—ইংরাজ গভর্নমেণ্ট দ্বারা জবরদস্তি করে এই সকল লোককে রাজার উপর চাপানো হয়। সু-শাসনের ও শাসন-সংস্কারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাজারই, কিন্তু তিনি সৎ-উদ্দেশ্য সত্ত্বেও এরূপ অবস্থায় বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেন না। অনেক ক্ষেত্রে সৎ-উদ্দেশ্য কিংবা তদনুযায়ী কাজ করার যোগ্যতারও অভাব ঘটে। ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে হেন্‌রি লরেন্স লিখেছিলেন, 'দেশীয় রাজা ও তার মন্ত্রীরা বিদেশীয় সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করত এবং ইংরাজ রাজকর্মচারী দ্বারা পরিচালিত হত। এরূপ ক্ষেত্রে কু-শাসন ঘটা নিশ্চিত; কারণ এ অবস্থায় সকলেই যদি ধর্মভীরু ও বিবেচনাশীল হয় তবুও শাসনকার্য সুশৃঙ্খলায় চলতে পারে না। ইংরাজ হোক, দেশীয় হোক, এমন একজন লোক মেলা ভার যার মধ্যে সু-শাসনের জন্য আবশ্যক সকল গুণ বর্তমান, আর এমন তিনজন লোকও পাওয়া যায় না যারা সম্পূর্ণরূপে মিলে মিশে কাজ

এর 'মেটকাফ্‌-এর জীবনী' পুস্তকে হায়দ্রাবাদ, সেখানে ইংরাজ প্রভুত্ব এবং লুটতরাজ ও অত্যাচারের স্পষ্ট ছবি অঙ্কিত করা হয়েছে। দিল্লী এবং রণজিৎ সিং-এর পাঞ্জাবেরও এরূপ ছবি আছে। ইংলণ্ডের গভর্নমেণ্ট দ্বারা ভারতীয় রাজ্যগুলির সমস্যা বিবেচনা করার জন্য গঠিত বাটলার কমিটির (১৯২৮-২৯) বিবৃতিতে আছে : 'এই সকল রাজ্য যখন ইংরাজ-শক্তির সংস্পর্শে আসে তখন তারা স্বাধীন ছিল এরূপ কথা ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে মেলে না। কতকগুলিকে বিপন্মুক্ত করা হয়েছিল, আর কতকগুলিকে ইংরাজেরা সৃষ্টি করেছিল।'

করতে পারে, কিংবা করবে। এই তিনজনের প্রত্যেকেই কিন্তু অপরিমেয় ক্ষতি করতে বেশ পারবে, কিন্তু এদের কেউ-ই অপর দুজনের কারও কাছ থেকে বাধা পেলে কল্যাণকর কিছুই করতে পারবে না।'

আরও আগে ১৮১৭ খৃস্টাব্দে, স্যর টমাস্ মনরো বড়লাটকে লিখেছিলেন: "কোনো প্রকার 'সহায়ক' বলের (সাবসিডিয়ারি ফোর্স) ব্যবহারের বিরুদ্ধে বহু গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি আছে। যেদেশে এরূপ বলের ব্যবহার প্রচলিত হয়—সেখানকার শাসনকার্য দুর্বল ও অত্যাচার-পরায়ণ হয়ে ওঠার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। এছাড়া সেখানে অভিজাত শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে থেকে সকল প্রকার উচ্চ অভিপ্রায় লোপ পেতে থাকে এবং ক্রমে সমগ্র দেশবাসী হীনচিত্ত ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কু-শাসন দূর করার জন্য এদেশে সাধারণত তিনটি পন্থা গৃহীত হতে দেখা গেছে। রাজপ্রাসাদের মধ্যেই নিঃশব্দে একটা বিপ্লব ঘটে গিয়ে শাসনকর্তা পরিবর্তিত হয়েছে, অথবা কোনো দারুণ বিপ্লব উপস্থিত হয়েছে, কিংবা দেশের রাজশক্তি বিদেশীয় বিজেতৃদের হাতে চলে গেছে। কিন্তু এখন ইংরাজ সৈন্যবল সহায়করূপে উপস্থিত থাকায় রাজা ভিতর ও বাহির সকল প্রকার শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য পায়। এইরূপ অবস্থায় নিরাপত্তার জন্য বিদেশীয়দের উপর নির্ভর করায় রাজা আলস্যপরায়ণ হয়, এবং নির্যাতিত প্রজাদের কাছ থেকে বিপদের ভয় না থাকায় হৃদয়হীন ও লোভী হয়ে পড়ে। এইরূপ 'সহায়ক' বলের ব্যবস্থা যেখানেই হোক না কেন, রাজা শক্তিমান না হলে, দেশে অচিরে অমঙ্গল দেখা দেয়, পল্লীগুলি বিনষ্ট হতে থাকে ও রাজ্যের লোকসংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে।...... রাজা স্বয়ং ইংরাজদের সঙ্গে তার যোগ অক্ষুন্ন রাখতে চাইলেও তার প্রধান কর্মচারীদের কারও কারও চেষ্টা থাকে যেন তিনি এ-যোগ ভেঙে ফেলেন; এরূপ পরামর্শও তাঁরা দেন। যতদিন দেশে স্বাধীনতার উচ্চ আদর্শ থাকবে ততদিন এরূপ পরামর্শদাতাও দেখা যাবে, এবং তাঁরা সকল সময়েই বিদেশীয় প্রভুত্ব হতে মুক্ত হতে চাইবেন। ভারতীয়দের সম্বন্ধে আমি যে অভিমত পোষণ করি তদনুসারে আমার মনে হয় এরূপ উচ্চ ভাব এদেশ হতে কখনই একেবারে যাবে না। এই সব বিবেচনা করে আমার মনে এই বিশ্বাস জন্মেছে যে 'সহায়ক' শক্তি অধিষ্ঠিত থেকে যে-যে রাজ্যকে রক্ষা করার ভার নিয়েছে শেষ পর্যন্ত সেগুলির সর্বনাশ সাধন করে ছাড়বে।"*

এইরূপ প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভারতীয় রাজ্যগুলির জন্য 'সহায়ক' শক্তির ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল এবং তার ফলে বহু পাপ বহু অত্যাচার উপস্থিত হয়েছিল। এই সকল স্থানের শাসন-ব্যবস্থা নিন্দনীয় ছিল, আর সম্পূর্ণভাবে হীনশক্তি ছিল। মেট্‌কাফের ন্যায় কয়েকজন রাজপ্রতিভূ সৎ ও বিবেকী ছিলেন কিন্তু অধিকাংশ রাজ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁদের এরূপ গুণ ছিল না, তাঁরা দূষিতচরিত্রা নারীর ন্যায় দায়িত্ব-শূন্যভাবে আপনাদের সুযোগের সুবিধা গ্রহণ করতেন। অনেক বে-সরকারী ইংরাজ আপন জাতির জোরে এবং গভর্নমেণ্টের নিকট হতে সাহায্য পাওয়ায় নিশ্চিন্তভাবে

* টমসন দ্বারা উদ্ধৃত পৃঃ ২২, ২৩।

দেশীয় রাজ্যের অর্থনাশ করেছে। অনেক দেশীয় রাজ্যে বিশেষভাবে অযোধ্যা ও হায়দ্রাবাদে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে-সকল ঘটনা ঘটেছিল তার বিবরণ প্রায় বিশ্বাসই করা যায় না। অযোধ্যা রাজ্যটি ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের বিদ্রোহের অল্প আগে ইংরাজের ভারত রাজ্যের অঙ্গীভূত করা হয়েছিল।

তখন ইংরাজের রাষ্ট্রীয় নীতিই ছিল এইরূপেই রাজ্য অধিকৃত করে নেওয়া, আর যে-কোনো অজুহাতে এটা করা হত। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের বিদ্রোহ হতে বোঝা গেল যে ইংরাজ গভর্নমেণ্টের পক্ষে দেশীয় রাজ্যকে 'সহায়ক' ব্যবস্থার অন্তর্গত করে নেওয়াই সুবিধার কথা। দু-চারটা ছোট ছোট রাজ্যের কথা ছেড়ে দিলে বলা যায় যে দেশীয় রাজারা এই বিদ্রোহে নির্লিপ্ত ভাব গ্রহণ করেছিল এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে বিদ্রোহ দমনে ইংরাজ-রাজকে সাহায্যই করেছিল। এর পর এদের সম্বন্ধে ইংরাজ-রাজের রাষ্ট্রনীতি পরিবর্তিত হয় এবং তখন স্থির হয় যে এই রাজ্যগুলিকে রক্ষা করা, এমনকি এগুলিকে পূর্বাপেক্ষা বলশালী করাও আবশ্যক।

এরপর এই ঘোষণা করা হয় যে এদেশে ইংরাজই সর্বোচ্চ শক্তি। এখন হতে দেশীয় রাজ্যগুলির উপরে ভারত গভর্নমেণ্টের রাষ্ট্রীয় বিভাগের নিয়ন্ত্রণ বরাবর কঠোরভাবে চলতে থাকে। অনেক রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে তাদের শক্তি হরণ করা হয়েছে, আবার অনেকের স্কন্ধে মন্ত্রীরূপে ইংরাজ রাজকর্মচারী চাপানো হয়েছে। এখনও এরূপ অনেক মন্ত্রী দেশীয় রাজ্যে কাজ করে থাকেন। দেশীয় রাজারা এঁদের নামমাত্র মনিব, এঁরা আপন আপন কাজের জন্য ইংরাজ-রাজের কাছেই অধিকতর দায়িত্ববোধ করেন।

দেশীয় রাজাদের মধ্যে কয়েকজন বেশ ভাল, কয়েকজন মন্দ, কিন্তু যাঁরা ভাল তাঁরাও আপন কাজে নানা বাধা পান। এঁরা সকলেই অবশ্য অনগ্রসর শ্রেণীর লোক—এঁদের মনোবৃত্তি সামন্ততান্ত্রিক, এঁদের কর্মপদ্ধতি হল অপরকে দিয়ে হুকুম তামিল করানো, কিন্তু ইংরাজ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আচরণে এঁরা যথেষ্ট বশ্যতা দেখিয়ে থাকেন। শেলব্যাঙ্কার দেশীয় রাজাদের সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন : 'এঁরা ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের পঞ্চম বাহিনী।'

৬ : ভারতে ইংরাজ-শাসনে বৈপরীত্য : রামমোহন রায় : মুদ্রাযন্ত্র স্যর উইলিয়ম জোন্স্ : বাঙলাদেশে ইংরাজি শিক্ষা

ভারতে ইংরাজ-শাসনের ইতিহাস আলোচনা করলে পদে পদে বৈপরীত্য লক্ষিত হয়ে থাকে। বৃহৎ যন্ত্রশিল্প ব্যাপারে ইংরাজেরা অগ্রণী হওয়ায় তারা ভারতে প্রভুত্বলাভ করেছিল এবং জগতে প্রধান শক্তিরূপে পরিগণিত হয়েছিল। ইতিহাসে তারা এক নবশক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছিল, এবং আশা করা গিয়েছিল যে এই শক্তি সমগ্র জগৎকে পরিবর্তিত করবে। এই কারণে তারা নিজেদের অজ্ঞাতেই জগতে পরিবর্তন ও বিপ্লবের অগ্রদূতরূপে পরিচয় লাভ করেছিল। কিন্তু, হলে কি হয়, এদেশে তারাই

নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও সুবিধালাভের জন্য এবং আপন অধিকার পাকা করার প্রয়োজনে যেটুকু আবশ্যক তাছাড়া অন্য সকল প্রকার পরিবর্তনে ইচ্ছাপূর্বক বাধা দিয়েছে। দৃষ্টি পরিসর ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে তারা পশ্চাৎপদ কতকটা এই কারণে যে যারা এসেছিল তারা সমাজের অনগ্রসর স্তরের লোক, কিন্তু প্রধান কারণ দেশের অগ্রগতিতে তারা জোর করে বাধা দিতে চেয়েছে এই ভয়ে যে দেশের লোক উন্নতিলাভ করলে শক্তি সঞ্চয় করবে এবং ফলে ভারতের উপর ইংরাজদের অধিকার দুর্বল হয়ে পড়বে। তাদের সকল চিন্তা ও নীতিতে দেশীয় লোকদের সম্বন্ধে ভয়ের অস্তিত্ব দেখা যায়, কারণ তারা এদের সঙ্গে একীভূত হতে কোনোদিনই চায়নি, পারেওনি, এবং সেইজন্য একটা বিদেশীয় শাসক-সম্প্রদায়রূপে শত্রুভাবাপন্ন অপর ব্যক্তিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকা ছাড়া তাদের আর কোনো পথ ছিল না। পরিবর্তন এসেছে, এবং তার অনেকগুলি উন্নতির দিকেরই পরিবর্তন, কিন্তু এগুলি এসেছে ইংরাজদের শাসননীতি সত্ত্বেও, যদিচ মূল প্রেরণা পাওয়া গেছে ইংরাজদের মধ্যে দিয়ে নবপ্রতীচ্যের সঙ্গে সংঘাতের ফলস্বরূপ। শিক্ষাব্রতী, প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্, সাংবাদিক, ধর্মপ্রচারক ও এই প্রকারের বহু ইংরাজ ব্যক্তিগতভাবে ভারতে প্রতীচ্য-সংস্কৃতি আনয়নের কাজে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছেন, এবং এইজন্য নিজেদেরই গভর্নমেণ্টের বিরাগভাজন হয়েছেন। আধুনিক শিক্ষার প্রচার গভর্নমেণ্টের কাছে ভীতির কারণ বলে গণ্য হয়েছে এবং সেইজন্য তারা এতে বহু বাধা দিয়েছে: তবু যোগ্যতাসম্পন্ন অনেক ইংরাজ আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে এসেছেন এবং উৎসাহশীল ভারতীয় ছাত্রদের একত্র করে তাদের মধ্যে কাজ করেছেন। বস্তুত, এ'দেরই চেষ্টায় ইংলণ্ডীয় চিন্তা, সাহিত্য এবং সুপ্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক রীতিনীতি ভারতে আনীত হয়েছে। (ইংরাজ শব্দ দ্বারা আমি গ্রেট্ ব্রিটন্ ও আয়ারল্যাণ্ডের লোক বোঝাচ্ছি, যদিচ জানি যে এটা ঠিক হচ্ছে না এবং অন্যায় করা হচ্ছে। 'ব্রিটিশার' যে শব্দটি আছে সেটা আমার পছন্দ নয়, আর তাতেও আয়ারল্যাণ্ড-বাসীদের বোঝায় না। এই শব্দ-বিভ্রাটের জন্য আয়ারল্যাণ্ড, স্কট্ল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌স দেশবাসীদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি।) এদেশে কিন্তু এই তিন শ্রেণীর লোক একই-ভাবে কাজ করে ও ভারতীয়দের কাছে তারা একই দলভুক্ত। ইংরাজ গভর্নমেন্ট শিক্ষা-বিরোধী হলেও তাদের ক্রমবর্ধমান সেরেস্তার জন্য কেরানী প্রস্তুতের ব্যবস্থা তাদের করতে হয়েছিল, কারণ এই সকল নিচের দিকের কাজের জন্য ইংলণ্ড হতে লোক আনা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এইভাবে শিক্ষা একটু একটু বৃদ্ধি পেতে থাকে। যদিচ এটা সীমাবদ্ধ ছিল এবং বলতে গেলে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাই ছিল না, তবু নূতন নূতন ভাব ও বেগবান চিন্তার দিকে মনের দুয়ার এতেই খুলে গিয়েছিল।

মুদ্রাযন্ত্র কি অন্যান্য যন্ত্রপাতির প্রচলনে কোনো প্রকার উৎসাহ দেওয়া হত না, কারণ কর্তৃপক্ষীয়েরা মনে করতেন এগুলি ভারতীয়দের মানসিক অবস্থার পক্ষে ভাল নয়, অঘটন ঘটাতে পারে, এবং রাজদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তে পারে, দেশে যন্ত্রশিল্পের উন্নতিও ঘটতে পারে। একটা গল্প প্রচলিত আছে যে হায়দ্রাবাদের নিজাম একবার ইউরোপীয় যন্ত্রাদি দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তখন স্থানীয় রাজকর্মচারী একটি

বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্র ও মুদ্রাযন্ত্র আনিয়ে দেখিয়েছিলেন। নিজামের সাময়িক কৌতূহল নিবৃত্ত হলে দুটি যন্ত্রকেই বিচিত্র সামগ্রী ও উপহার প্রাপ্ত বস্তুর পর্যায়ভুক্ত করে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। কলিকাতায় অবস্থিত গভর্নমেণ্ট যখন এ-খবর পান তখন স্থানীয় কর্মচারীর কার্যে বিরক্তি প্রকাশ করা হয় এবং একটা দেশীয় রাজ্যে মুদ্রাযন্ত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে বিশেষভাবে ভর্ৎসনালাভ করতে হয় এবং কর্মচারীটি বলেন যে গভর্নমেণ্ট যদি চান তাহলে তিনি গোপনে যন্ত্রটি ভেঙে ফেলতে পারেন।

যদিচ বে-সরকারী ছাপাখানা উৎসাহ্‌লাভ করেনি, গভর্নমেণ্টের কাজ ছাপা কাগজ ব্যতীত চলতে পারে না বলে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও অন্যান্য স্থানে সরকারী ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম বে-সরকারী ছাপাখানা ব্যাপ্‌টিস্ট্‌ ধর্মযাজকদের দ্বারা শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়, আর ১৭৮০ খৃস্টাব্দে প্রথম সংবাদপত্র একজন ইংরাজের দ্বারা কলিকাতায় প্রকাশিত হয়।

এই সমস্ত এবং এইরূপ আরও অনেক পরিবর্তন ক্রমে ক্রমে আসে এবং ভারতীয়দের মন আধুনিকভাবে প্রণোদিত করতে থাকে। তবে অল্পসংখ্যক লোকই ইউরোপীয় চিন্তায় প্রভাবান্বিত হয় কারণ ভারতবর্ষ আপন দার্শনিক পটভূমিকা ত্যাগ করেনি, এবং তাকে পাশ্চাত্যের অপেক্ষা উন্নততর বলেই বিবেচনা করে এসেছে। জীবনের কর্মশীল দিকেই পাশ্চাত্যের প্রভাব ও তার সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ বেশি হয়েছে। এ-বিষয়ে পাশ্চাত্য প্রাচ্য অপেক্ষা অগ্রসর ও উন্নত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রেলগাড়ি, মুদ্রাযন্ত্র, অন্যান্য কলকব্জা, যুদ্ধের নিপুণতর আয়োজন ও ব্যবস্থা প্রভৃতির উৎকর্ষ অস্বীকার করা চলে না, আর এগুলি অনেকটা পরোক্ষভাবে আমাদের অজ্ঞাতে এসে পড়ে ভারতীয়দের মনে একটা বিরোধের সৃষ্টি করেছে। একটা গুরুতর অথচ সুস্পষ্ট পরিবর্তন যা হয়েছে তা হল বে-সরকারীভাবে জমির মালিকানা ও জমিদারী স্বত্বের প্রবর্তনা, এতে আবাদী জমি সম্বন্ধে পূর্বের ব্যবস্থা বদলে গেছে। এই সঙ্গে জমিও পণ্যদ্রব্যের মত অর্থের বিনিময়ে হস্তান্তরিত হতে আরম্ভ করেছে। 'পূর্বে যা প্রচলিত রীতিনীতির জোরে দৃঢ়বদ্ধ ছিল তা অর্থের প্রভাবে শিথিল হয়ে পড়েছে।'

ইংরাজ-রাজত্ব ভারতের আর কোনো বিস্তৃত অংশে ছড়িয়ে পড়ার আগে বাঙলাদেশে পঞ্চাশ বছর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই কারণে আবাদী জমি সংক্রান্ত, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া-ঘটিত, এবং শিক্ষা ও মনোবৃত্তি বিষয়ক সকল প্রকার পরিবর্তন বাঙলাদেশেই প্রথমে ঘটেছে। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইঙ্গ-ভারতীয় জীবনে বাঙলাদেশের প্রভাবই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল। বাঙলাদেশ যে কেবল ইংরাজ শাসন-ব্যবস্থার কেন্দ্র হয়েছিল তা নয়, এখানেই ইংরাজি শিক্ষিত প্রথম ভারতীয় সম্প্রদায় গড়ে ওঠে ও ইংরাজ-শক্তির আওতায় ভারতের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে অনেকগুলি বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন ব্যক্তি উত্থিত হন এবং সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে ভারতের অন্যান্য অংশগুলিকেও প্ররোচনা দান করেন, এবং এঁদেরই চেষ্টায় পরিশেষে নব জাতীয় আন্দোলন রূপ গ্রহণ করে।

বাঙলাদেশ যে কেবল অধিককাল ধরে ইংরাজ-শাসনের পরিচয় পেয়েছে তা নয়, যখন প্রথমদিকে এ-শাসন কঠোর ও দুর্দমনীয় ছিল এবং কোনো নিবিড় রূপ গ্রহণ করেনি তখন তা সহ্য করেছে। এ-শাসন উত্তর ও মধ্য-ভারতে স্বীকৃত হবার আগেই বাঙলাদেশ তাকে গ্রহণ করে এবং নিজেকে তার সঙ্গে মানিয়ে নেয়। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের বিরাট বিদ্রোহে বাঙলাদেশে বিশেষ কোনো পরিবর্তন আসেনি, যদিও তার প্রথম স্ফুলিঙ্গ অপ্রত্যাশিতভাবে কলিকাতার সন্নিকটে দমদমে প্রকাশ পেয়েছিল।

ইংরাজ-শাসনের আগে বাঙলাদেশ মুঘল সাম্রাজ্যের একটি দূরবর্তী প্রদেশরূপে ছিল, এবং গুরুত্বসম্পন্ন বিবেচিত হলেও এদেশ কেন্দ্রীয় শক্তি হতে বিচ্ছিন্ন হয়েই ছিল। মধ্যযুগের প্রথম দিকে এখানে হিন্দুদের মধ্যে অনেক প্রকারের হীনশ্রেণীর পূজাপদ্ধতি ও তান্ত্রিক তত্ত্ব ও আচরণ প্রচলিত হয়েছিল। তারপর সামাজিক রীতি-নীতি ও আইনের সংস্কারের জন্য আন্দোলন উপস্থিত হয়, এমনকি উত্তরাধিকার সম্পর্কে সুপরিচিত অনেক আইন সংস্কার করার চেষ্টা ঘটে। শ্রীচৈতন্য ছিলেন একজন পাণ্ডিত্যগুণসম্পন্ন ব্যক্তি। ইনি বিশ্বাস ও হৃদয়াবেগের ভিত্তিতে একভাবের বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করে বঙ্গবাসীকে বিশেষরূপে অনুপ্রাণিত করেন। বাঙলাদেশের লোকেরা উচ্চ মনোবৃত্তি ও সবল হৃদয়াবেগের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ গড়ে তোলে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আর একজন অসাধারণ মহাপুরুষ, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, আপন জীবনে চিরাচরিত প্রেম, বিশ্বাস ও মানব সেবার পরিচয় প্রদান করেন। তাঁর নামে একটি সেবক-মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই প্রতিষ্ঠান মানবসেবায় ও সমাজের কাজে অতুলনীয় কীর্তি অর্জন করেছে। প্রাচীন কালের সেণ্ট ফ্রান্‌সিসের অনুবর্তীদের ন্যায় সর্বসহিষ্ণু সেবাপরায়ণতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, কোয়েকারদের মত নীরবে ও অনাড়ম্বরভাবে এবং যোগ্যতার সঙ্গে, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীরা চিকিৎসালয়, শিক্ষালয় প্রভৃতির কাজ করে চলেছেন, এবং যখনই কোনো বিপদ-আপদ উপস্থিত হয় বিপন্নদের উদ্ধারের জন্য কেবল ভারতের সর্বত্র নয়, বিদেশেও আত্মনিয়োগ করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে চিরাগত ভারতীয় আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। তার পূর্বে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে, আর একজন মহাপুরুষ, রাজা রামমোহন রায়, বাঙলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি আপন জীবনে পুরাতন জ্ঞানের সঙ্গে নূতনের সংমিশ্রণে এক নবতর আদর্শের পরিচয় দিয়ে গেছেন। ভারতীয় চিন্তা ও দর্শনে তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, সংস্কৃত, পারস্য ও আরবী ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল, তখনকার দিনে ভারতীয় বিদ্বৎসমাজের প্রথামত তাঁর মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সমাবেশ ঘটেছিল, ইংরাজেরা এদেশে আসার পর নানা বিষয়ে তাদের উৎকর্ষের পরিচয় পেয়ে কোথায় তাদের সাংস্কৃতিক ভিত্তি তা জানার জন্য তিনি ঔৎসুক্য অনুভব করেন। তাঁর মন ছিল নূতন নূতন বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য ব্যগ্র। তিনি ইংরাজি শিক্ষা করেন, কিন্তু তাতেও সন্তোষলাভ না করায় পাশ্চাত্যের ধর্ম ও সংস্কৃতির উৎসমুখ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে গ্রীক্, ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষা আয়ত্ত করে নেন। পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতির উন্নতি দেখে এগুলির প্রতি তাঁর

মন আকৃষ্ট হল, যদিচ তখনও এই সমস্ত পরবর্তীকালের ন্যায় পরিপুষ্ট হয়ে ওঠেনি। রামমোহন রায়ের মন স্বভাবত দর্শন ও পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট ছিল, সুতরাং তিনি পুরাতন সাহিত্যের আলোচনায় নিবিষ্ট হলেন। প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ মোনিয়র উইলিয়ম্‌স তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, ইনিই 'সম্ভবত জগতে সর্বপ্রথম তুলনামূলক ধর্মবিজ্ঞান বিষয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে অনুসন্ধান করেছেন।' এদিকে আবার রামমোহন রায়ই শিক্ষাকে আধুনিক আকার দিয়ে পুরাতনকালের পাণ্ডিত্যের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা করেছেন। তখনকার দিনেও তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন এবং বড়লাট সাহেবকে গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, শারীর স্থান এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা যে আবশ্যক সে-সম্বন্ধে গুরুত্ব আরোপ করে পত্র লিখেছেন।

তিনি যে কেবল একজন পণ্ডিত ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ছিলেন তা নয়; তিনি বিশেষভাবে ছিলেন সংস্কারক। অল্প বয়সে তিনি ইসলামের প্রভাবলাভ করেছিলেন, এবং পরে খৃস্টধর্মের প্রভাবও তাঁর মনের উপর কতক পরিমাণে কাজ করেছিল, তবু তিনি আপন ধর্মের ভিত্তিমূল দৃঢ়তার সঙ্গে ধরে ছিলেন। কিন্তু তিনি এই ধর্মের সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এর মধ্যে থেকে সকল অপব্যবহার ও অসৎ আচরণ দূর করবেন। বিশেষত তাঁরই আন্দোলনের ফলে ইংরাজ গভর্নমেণ্ট সতীপ্রথা রহিত করেছিলেন। এপ্রথা কোনোদিনই প্রসারলাভ করেনি. কিন্তু উচ্চশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে মাঝে মাঝে দু-একটা ঘটনা ঘটত। সীদীয়-তাতারদের মধ্যে প্রভুর মৃত্যুতে অনুগত লোকেদের আত্মাহুতি দেবার প্রথা ছিল, সম্ভবত তারাই সতীপ্রথাও ভারতে এনেছিল। পুরাতন সংস্কৃত সাহিত্যে এ-প্রথা নিন্দিত হয়েছে। আকবর এটা দূর করতে চেষ্টা করেছিলেন, আর মারাঠারা এর বিরুদ্ধে ছিল।

ভারতে সংবাদপত্রের প্রচলনকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন রামমোহন রায়। ১৭৮০ খৃস্টাব্দ থেকে অনেকগুলি সংবাদপত্র ভারতে আগত ইংরাজদের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলিতে তীব্রভাবে গভর্নমেণ্টের কাজের সমালোচনা করা হত বলে বিরোধ উপস্থিত হয় ও তার ফলে গভর্নমেণ্ট দ্বারা সংবাদ নিয়ন্ত্রণ আরম্ভ হয়। আগেকার কালে যাঁরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন তাঁরা ছিলেন ইংরাজ। তাঁদের মধ্যে জেম্‌স সিল্‌ক্ বাকিংহামের নাম এখনও লোকে ভোলেনি। তাঁকে এদেশ হতে নির্বাসিত করা হয়েছিল। প্রথম ভারতীয় স্বত্বাধিকারী ও ভারতীয় দ্বারা সম্পাদিত ইংরাজি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খৃস্টাব্দে, এবং সেই বছরেই শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট্ ধর্মযাজকেরা বাঙলা ভাষায় একখানি মাসিকপত্র ও একখানি সাপ্তাহিক-পত্র প্রকাশ করেন, এই দুখানিই ভারতীয় ভাষায় প্রচারিত সর্বপ্রথম সাময়িকপত্র। এরপর ইংরাজি ও ভারতীয় ভাষায় সংবাদ ও সাময়িকপত্র কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইনগর হতে দ্রুত একটার পর একটা প্রচারিত হতে থাকে।

ইতিমধ্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ হয়, এবং এখন পর্যন্ত নানা আশা-নিরাশার ভিতর দিয়ে সেই সংগ্রাম চলে আসছে। এই ১৮১৮ খৃস্টাব্দেই

বিখ্যাত তৃতীয় রেগুলেশন প্রবর্তিত হয়। এর জোরে বিনাবিচারে লোককে আটক রাখা যায়। এই রেগুলেশন এখনও বলবৎ আছে এবং ১২৬ বছরের এই পুরাতন বিধানে বহুলোককে আটক রাখা হয়েছে।

রামমোহন রায় অনেকগুলি সংবাদপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি একখানি ইংরাজি-বাঙলা দ্বৈভাষিক পত্রিকা প্রচলিত করেন, এবং পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতময় প্রচারের উদ্দেশ্যে পারস্য ভাষায় একখানি সাপ্তাহিক-পত্র প্রকাশ আরম্ভ করেন, কারণ তখন এই ভাষাকে ভারতের সর্বত্র সংস্কৃতিবান ব্যক্তিদের ভাষারূপে বিবেচনা করা হত। শীঘ্রই এ-পত্রের প্রচার বন্ধ হয়ে যায়, কারণ ১৮২৩ খৃস্টাব্দে মুদ্রাযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের জন্য নূতন বিধান অবলম্বিত হয়েছিল। রামমোহন এবং অন্যেরা এর বিরুদ্ধে বিষম আপত্তি উত্থাপিত করেছিলেন, এমনকি ইংলণ্ডে সপরিষদ রাজার নিকট একখানি আবেদনও পাঠিয়েছিলেন।

পরিশেষে রামমোহন রায়ের সাময়িকপত্র বিষয়ক চেষ্টা তাঁর সংস্কার আন্দোলনের অংশবিশেষ হয়ে ওঠে। তাঁর সংশ্লেষণশীল ও বিশ্বনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পুরাতনপন্থী লোকেদের নিকট নিন্দাভাজন হয় এবং তারা তাঁর প্রস্তাবিত অনেক সংস্কার প্রচেষ্টায় বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা অক্লান্তভাবে তাঁর কাজে সাহায্য করতেন। এ'দের মধ্যে ঠাকুরপরিবারের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক, কারণ এ'রা পরবর্তীকালে বাঙলাদেশে নবযুগের অভ্যুদয়ে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। দিল্লীর বাদশাহের কাজে রামমোহন রায় ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন এবং ব্রিস্টল নগরে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের প্রথম দিকে পরলোকগমন করেছিলেন।

রামমোহন রায়, ঠাকুরপরিবারের লোকেরা এবং আরও কতিপয় ব্যক্তি বাড়িতে ইংরাজি শিক্ষা করেন। তখন কোনো ইংরাজি শিক্ষার বিদ্যালয় ছিল না, এবং গভর্নমেণ্টের শাসননীতি ভারতীয়দের ইংরাজি শিক্ষা দেওয়ার বিরুদ্ধ ছিল। ১৭৮১ খৃস্টাব্দে কলিকাতায় গভর্নমেণ্ট কর্তৃক শিক্ষাদানের জন্য হিন্দু কলেজ ও আরবী শিক্ষাদানের জন্য কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সম্ভবত খৃস্টীয় ধর্মযাজকদের কোনো কোনো বিদ্যালয়ে ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া হত। এই সময়ে গভর্নমেণ্টের লোকেদের মধ্যে একদল ইংরাজি শিক্ষার স্বপক্ষে মত দেন, কিন্তু তা বাধা পায়। যাই হোক, কতকটা পরীক্ষা করে দেখার জন্যই দিল্লীর আরবী বিদ্যালয়ে ও কলিকাতার কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কয়েকটি ইংরাজি পাঠের শ্রেণী যোগ করা হয়। ইংরাজি শিক্ষার স্বপক্ষে যে নির্ধারণ গৃহীত হয় তা ১৮৩৫ খৃস্টাব্দের মেকলে লিখিত শিক্ষাবিষয়ক বিবরণে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এরপরে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কার্য আরব্ধ হয়।

ইংরাজ গভর্নমেণ্ট ভারতীয়দের ইংরাজি শিক্ষাদানে অনিচ্ছুক ছিল, কিন্তু পৃথক কারণে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ইংরাজদের সংস্কৃত শিক্ষা দিতে আরও অধিক আপত্তি উত্থাপিত করেছিলেন। স্যর উইলিয়ম্ জোন্স ছিলেন বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত

ব্যক্তি। তিনি সুপ্রিম্ কোর্টের বিচারপতি হয়ে এদেশে আসেন এবং সংস্কৃত শিক্ষার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই পবিত্র ভাষা একজন বিদেশীয় অনধিকারীকে শিক্ষা দিতে রাজী আছেন এরূপ কোনো ব্রাহ্মণকে পাওয়া যায়নি। এই প্রাচীন ভারতীয় ভাষা শিক্ষায় জোন্সের আগ্রহ এতই অধিক হয়েছিল যে তিনি শেষে একজন চিকিৎসা ব্যবসায়ী বৈদ্যকে বহু কষ্টে সন্ধান করে বের করেন এবং তাঁর বিচিত্র ও কঠোর সর্তে রাজী হন। সংস্কৃতে, বিশেষত প্রাচীন ভারতীয় নাটকে, তিনি মুগ্ধ হন। তাঁরই রচনা ও অনুবাদের মধ্যে দিয়ে ইউরোপ সর্বপ্রথম সংস্কৃত সাহিত্যের কতকগুলি রত্নের আভাস পেয়েছিল। ১৭৮৪ খৃস্টাব্দে স্যর উইলিয়ম্ জোন্স্ বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত করেন, পরে এই প্রতিষ্ঠানের নাম হয় রয়াল্ এশিয়াটিক্ সোসাইটি। দেশের পুরাতন সাহিত্যের পুনরাবিষ্কারের জন্য ভারতবর্ষ জোন্স্ এবং আরও বহু ইউরোপীয় পণ্ডিতের নিকট ঋণী। এর অধিকাংশই অবশ্য সকল যুগেই জানা ছিল, কিন্তু ছিল কতকগুলি বিশেষ দলের লোকের মধ্যে আবদ্ধ. আর পারস্য ভাষা দেশের সংস্কৃতির ভাষা হয়ে ওঠায় মানুষের মন সংস্কৃত হতে অন্য পথে চলে গিয়েছিল। পুঁথির সন্ধান শুরু হওয়াতে অনেক অপরিজ্ঞাত রচনা আবিষ্কৃত হয় এবং যে বিশাল সাহিত্য প্রকাশ পায়, তা আধুনিক সমালোচনামূলক পদ্ধতিতে পণ্ডিতদের দ্বারা বিবেচিত হওয়ায় একটি নূতন পটভূমিকা লাভ করে।

মুদ্রাযন্ত্রের আমদানী ও ব্যবহারে, ভারতের লোকপ্রিয় ভাষাগুলি নতুন প্রেরণা লাভ করে। এইগুলির মধ্যে হিন্দি, বাঙলা, গুজরাটি, মারাঠি, উর্দু, তামিল ও তেলুগু কেবল যে বহুকাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল তা নয়, এগুলিতে সাহিত্যও গড়ে উঠেছিল। এদের অনেক পুস্তক লোকসাধারণের কাছে সুপরিচিত, এই সকল পুস্তক হয় মহাকাব্য, নতুবা কবিতা অথবা গান ও শ্লোকের সমষ্টি, এবং এরূপ যে সহজেই মুখস্থ করা যায়। এই সব ভাষায় তখন গদ্য সাহিত্য ছিলই না বলা যায়। গম্ভীর বিষয়ে রচনা সংস্কৃত অথবা পারস্য ভাষায় লিখিত হত, এবং শিক্ষিত ব্যক্তিরা এদুটির কোনো একটি জানেন এরূপ মনে করা হত। এই দুটি সুপ্রাচীন ভাষা শ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত হওয়ায় সাধারণ প্রাদেশিক ভাষাগুলির উন্নতিতে বাধা পেয়েছিল। পুস্তক ও সংবাদপত্র মুদ্রিত হতে আরম্ভ হওয়ায় প্রাচীন ভাষার গুরুত্ব কমে যায় এবং তখন প্রাদেশিক ভাষায় গদ্য সাহিত্য উন্নতিলাভ করতে থাকে। প্রথম দিকে খৃস্টীয় ধর্মযাজকেরা বিশেষত শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট্ মিশন, এ-বিষয়ে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। প্রথম বে-সরকারী মুদ্রাযন্ত্র তাঁরাই প্রতিষ্ঠা করেন, এবং ভারতীয় ভাষাগুলিতে বাইবেলের অনুবাদ প্রচারের কাজে তাঁদের চেষ্টায় যথেষ্ট ফললাভ হয়েছিল।

সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ভাষাগুলিতে এই কাজে বিশেষ কিছু অসুবিধা উপস্থিত হয়নি। কিন্তু ধর্মযাজকেরা এই কয়েকটিতেই সন্তুষ্ট না থেকে কতকগুলি অপরিণত ভাষাতেও কাজ করেন এবং সেগুলিকে গঠিত করে নিয়ে ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা করেন। তাঁরা অনুন্নত পার্বত্য ও অরণ্যবাসী জাতির ভাষাগুলিকেও লিখিত রূপ দান

করেন। এইরূপে বাইবেল গ্রন্থ যথাসম্ভব বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করার প্রচেষ্টায় খৃস্টীয় ধর্মযাজকদের দ্বারা বহু ভারতীয় ভাষার উন্নতি ঘটেছিল। ভারতে খৃস্টীয় ধর্মযাজনা সকল ক্ষেত্রে সুখকর ও প্রশংসার্হ হয়নি/ কিন্তু ভাষার উন্নতি ও পল্লী-সাহিত্য সংগ্রহ বিষয়ে ভারতের বহু উপকার সাধন করেছে।

ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে শিক্ষা প্রসারে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল তা বিনা কারণে নয়। সেই ১৮৩০ খৃস্টাব্দেও কলিকাতার হিন্দু কলেজের (এখানে কেবল সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হত, ইংরাজি নয়) কতিপয় ছাত্র কতকগুলি সংস্কারের দাবি করে। তারা চায় কোম্পানীর রাজনৈতিক শক্তি সীমাবদ্ধ হোক এবং শিক্ষা বিনা দক্ষিণায় আবশ্যিকভাবে দেওয়া হোক। অতি প্রাচীনকাল হতেই বিনা দক্ষিণায় শিক্ষাদান ভারতবর্ষে সুপরিচিত। অবশ্য সে শিক্ষা চিরাচরিত ধারার শিক্ষা—ভালও নয়, লাভ-জনকও নয়, কিন্তু তা বিনা ব্যয়ে দরিদ্র ছাত্ররাও পেতে পারত, কেবল শিক্ষকের কিছু কিছু কাজ করে দিতে হত। এই বিষয়ে হিন্দু ও মুসলিমের পুরাতন রীতিনীতি একই প্রকারের ছিল।

বাঙলাদেশে নূতন ধারার শিক্ষায় জোর করে বাধা দেওয়া হয়েছিল, আর পুরাতন ধারার শিক্ষাও অনেক পরিমাণে লোপ পেয়েছিল। ইংরাজেরা যখন বাঙলাদেশে শক্তিমান হয় তখন অনেক মুয়াফিজ্ ভূমি ছিল; এ-গুলি নিষ্কর জমি দানরূপে প্রদত্ত। এর অনেকগুলি ব্যক্তিগতভাবে বিলি করা ছিল, কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ব্যয়নির্বাহের জন্য দেওয়া হয়। পুরাতন রীতির বহু প্রাথমিক শিক্ষা-লয়ের ব্যয়সঙ্কুলান এইরূপ ভূমি হতে হত, কতকগুলি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ও এই-রূপে চলত, এবং এগুলিতে প্রধানত পারস্য ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিলাতে তার অংশীদারদের লভ্যাংশ দেবার জন্য দ্রুত অর্থ সংগ্রহ করতে চাইত, আর এর ঊর্ধ্বতন পরিচালকেরা সর্বদাই অর্থের জন্য পীড়াপীড়ি করত। কোম্পানী এখন এই মুয়াফিজ্ জমিগুলি বাজেয়াপ্ত করে নেবার জন্য বদ্ধপরিকর হল। এই সকল দান সম্বন্ধে নির্ভুল প্রমাণ দাবি করা হয়, কিন্তু পুরাতন সনদ ও কাগজপত্র বহুকাল পূর্বেই, হয় হারিয়ে গেছে না হয় উই পোকায় খেয়ে ফেলেছে। এইরূপ মুয়াফিজ্ জমিগুলি কেড়ে নেওয়া হয়, এবং পূর্বের দখলিকারেরা বহিষ্কৃত হওয়ায় বিদ্যালয়গুলির আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায়। যে সমস্ত জমি এইভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয় তা পরিমাণে ছিল বিশাল, এবং সেইজন্য বহু পুরাতন বংশের সর্বনাশ ঘটে। এই সকল ভূমির আয়ে যে-সকল শিক্ষালয়ের ব্যয়সঙ্কুলান ঘটত সেগুলি বন্ধ হয়ে যায়, এবং বহুসংখ্যক শিক্ষাব্রতী ও অন্যান্য ব্যক্তিরা কর্মহীন হয়ে পড়ে।

এইরূপে বাঙলাদেশের অনেক হিন্দু ও মুসলমান সামন্তশ্রেণীর লোক এবং যারা তাদের উপর নির্ভর করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করত তারা সর্বস্বান্ত হয়। মুসলমানদের অধিক ক্ষতি হয়, কারণ তারাই এ-দলে বেশি ছিল, এবং প্রধান প্রধান মুয়াফিজ্‌ধারীও ছিল তারাই। হিন্দুদের মধ্যে অধিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অন্যান্য বৃত্তি গ্রহণ করে জীবিকানির্বাহ করত। এই সকল লোকেরা অধিক সহজে পরিবর্তিত

অবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারত। এই ব্যক্তিরাই তৎপরতার সঙ্গে ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে এবং নিম্নপদগুলির কাজে ইংরাজদের প্রয়োজনে আসে। মুসলমানেরা ইংরাজি শিক্ষা এড়িয়ে চলত এবং বাঙলাদেশে ইংরাজেরা তাদের পছন্দ করত না। এইরূপ আশঙ্কা করা হত যে এই পুরাতন শাসকশ্রেণীর বংশধরেরা কোনো না কোনো মুশকিল বাধাতে পারে। এইরূপ গভর্নমেণ্টের নিচের দিকের চাকরিগুলি একরূপ বাঙালী হিন্দুদের একচেটিয়া হয়েছিল। এরা উত্তর প্রদেশেও প্রেরিত হত। পরবর্তীকালে অল্পসংখ্যক পুরাতন বনেদী মুসলমান পরিবারের লোককেও এই কাজে নেওয়া হয়েছিল।

ইংরাজি শিক্ষার ফলে ভারতীয়দের মানসিক দিগন্তের বিস্তৃতি বৃদ্ধি পেয়েছিল, ইংরাজি সাহিত্য ও সামাজিক বিধি সম্বন্ধে আগ্রহ জন্মেছিল, আর ভারতীয় জীবন-যাত্রার বহু রীতিনীতি বহু খুঁটিনাটি সম্বন্ধে মানুষের মনে বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল। দেশে নানা নূতন নূতন জীবিকা অর্জনের উপায় দেখা দেয়। যারা এই সকল বৃত্তি গ্রহণ করেছিল তারাই এখন রাজনৈতিক আন্দোলনে অগ্রণী হয়ে ওঠে। এ আন্দোলন তখন গভর্নমেণ্টের কাছে আবেদন পাঠানোতেই পর্যবসিত ছিল। ইংরাজি-শিক্ষিত নানা বৃত্তির লোক এবং গভর্নমেণ্টের চাকুরেরা ভারতের সর্বত্রই একটা নূতন শ্রেণীরূপে দেখা দেয়। এরা পাশ্চাত্য চিন্তা ও আচরণের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় ও সাধারণ জনসমাজ হতে পৃথক হয়ে পড়ে। ১৮৫২ খৃস্টাব্দে কলিকাতার ইঙ্গ-ভারতীয় সমিতি (ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ অ্যাসোসিএসন্) প্রতিষ্ঠিত হয়। একে কংগ্রেসের অগ্রদূত বলা যেতে পারে, কিন্তু ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে কংগ্রেস আরম্ভ হওয়ার আগে পুরো এক পুরুষ গত হয়। এই ফাঁকটায় ১৮৫৭-৫৮ সালের বিদ্রোহ ঘটে। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি বাঙলাদেশ এবং উত্তর ও মধ্য-ভারতের মধ্যে এই পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বাঙলাদেশের শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা (অধিকাংশই হিন্দু) ইংরাজি চিন্তা ও সাহিত্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে রাজনৈতিক সংগঠনের সংস্কারের জন্য ইংলণ্ডের দিকে তাকিয়ে থাকে, আর অন্যান্য স্থানের লোকেদের মন বিদ্রোহের ভাবে উদ্বেলিত হয়।

অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বাঙলাদেশেই ইংরাজি শাসন ও পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রথমদিকের ফল অধিকতর স্পষ্টরূপে দেখা গিয়েছিল। জমিজায়গা সংক্রান্ত পুরাতন ব্যবস্থা একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়, পূর্বকালের সামন্তশ্রেণীর লোকেরাও লোপ পায়। এদের স্থানে নূতন ভূম্যধিকারীদের উদয় হয়। ভূমির সঙ্গে এদের যোগ ছিল সামান্যই, আর পূর্বের সামন্তদের অসদ্গুণের অধিকাংশই এদের ছিল, আর সদ্গুণের অল্পই দেখা যেত। চাষীরা দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ও নানা প্রকারে বিপর্যস্ত হয়ে অতিশয় দারিদ্র্যে পতিত হয়। কারিগর শ্রেণীর লোকেরা এক প্রকার লোপই পায়। এই চূর্ণ বিচূর্ণ ভিত্তির উপর ইংরাজ শাসনের ফলে নূতন নূতন দল এবং নূতন প্রকারের লোকের অভ্যুদয় ঘটে।

নূতন ব্যবসায়ীরা আসলে ইংরাজ বণিক ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির দালাল ছিল,

এদেরই উপার্জনের উদ্বৃত্ত অংশে লাভবান হত। এ-ছাড়া ছিল ইংরাজি-শিক্ষিত লোকেরা, কেউ বা গবর্ণমেন্টের ছোট ছোট কাজে নিযুক্ত, কেউ বা কোনো বৃত্তি গ্রহণ করে জীবিকা অর্জনে ব্যাপৃত। এরা সকলেই পাশ্চাত্য চিন্তা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে ইংরাজ-শক্তির দিকে উন্নতির আশায় তাকিয়ে থাকত। হিন্দুসমাজের কঠোর রীতি-নীতি ও বাঁধাবাঁধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব এদেরই মনে বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং এরা ইংরাজের মানসিক উদারতা ও তাদের সামাজিক বিধিব্যবস্থা হতে অনুপ্রাণনা লাভের জন্য সেই দিকেই বদ্ধদৃষ্টি হয়।

এই প্রভাব ঘটেছিল বাঙলাদেশের হিন্দুসমাজের উপরের স্তরে; হিন্দু জনসাধারণের উপর সাক্ষাৎভাবে এ-প্রভাব কার্যকরী হয়নি, আর হিন্দু নেতারা সম্ভবত জনসাধারণের কথা ভাবতই না। দু-চারজন ছাড়া মুসলমানেরা এসব থেকে মুক্ত ছিল, নবপ্রবর্তিত শিক্ষা হতে নিজেদের দূরেই রেখেছিল। আগেই তারা অর্থনৈতিক ব্যাপারে অনুন্নত ছিল, এখন আরও পিছিয়ে পড়ল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহু হিন্দু মনীষী বঙ্গে জন্মগ্রহণ করে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় শোভা পেয়েছিলেন, কিন্তু এই সময়ে বাঙলা-দেশে একটিও শীর্ষস্থানীয় মুসলমান নেতা জন্মেছিলেন বলে বড় একটা জানা যায় না। জনসাধারণের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানে বিশেষ কোনো পার্থক্য দেখা যেত না। আচরণ, জীবনের ধারা ও ভাষায়, আর দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুর্দশায় তাদের মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট প্রভেদ ছিল না। বাস্তবিক, বাঙলাদেশের ন্যায় ভারতের আর কোথাও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ধর্মসম্বন্ধীয় ও অন্যান্য পার্থক্য এত কম হতে দেখা যায়নি। এইরূপই সম্ভবপর বলে মনে করা হয় যে মুসলমানদের শতকরা ৯৮ জন সাধারণত হিন্দুসমাজের নিম্নস্তর হতে ধর্মান্তরিত ব্যক্তি। লোকসংখ্যার হিসাবে, হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানেরা যৎসামান্য বেশি ছিল। (এখন অনুপাত দাঁড়িয়েছে : শতকরা ৫৩ জন মুসলমান, ৪৬ জন হিন্দু এবং ১ জন অন্যান্য লোক।)।

এই যে বাঙলাদেশে, ইংরাজের সঙ্গে সংস্রবের প্রথম ফলস্বরূপ, আর্থিক, সামাজিক এবং বুদ্ধি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল তা ভারতের অন্যত্রও প্রকাশ পেয়েছিল, যদিচ অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে; আর তা ছাড়া, বাঙলার বাইরে সর্বত্র এ ফল একই প্রকারের হয়নি। অন্যস্থানে পুরাতন সামন্ততন্ত্র ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এতটা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়নি, আর যা বা হয়েছিল তা ধীরে। বস্তুত, অপর অনেক স্থানে সামন্তেরা বিদ্রোহী হয়েছিল, এবং বিধ্বস্ত হলেও কতকটা টিকে ছিল। উত্তর-ভারতের মুসলমানেরা সংস্কৃতি ও আর্থিক অবস্থায় তাদের বঙ্গদেশীয় সম-ধর্মীদের অপেক্ষা উন্নত ছিল, কিন্তু তারাও পাশ্চাত্য শিক্ষাকে দূরে রেখেছিল। হিন্দুরা অধিকতর সহজভাবে এই শিক্ষা গ্রহণ করে এবং পাশ্চাত্য প্রভাব লাভ করে। গভর্নমেন্টের নিম্নশ্রেণীর চাকরি ও নানা বৃত্তিতে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু অধিক ছিল। কেবল পাঞ্জাবে এই পার্থক্য এতটা বেশি ছিল না।

১৮৫৭-৫৮ খৃস্টাব্দের বিদ্রোহ প্রজ্জ্বলিত হল এবং বিদ্রোহীরা বিধ্বস্ত হল, কিন্তু বাঙলাদেশকে এ-সব একরূপ স্পর্শই করল না। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে ইংরাজি-

শিক্ষিত নূতন শ্রেণীর লোকেরা—প্রধানত হিন্দু তারা—সপ্রশংস নয়নে ইংলন্ডের দিকে তাকিয়ে ছিল এবং আশা করেছিল যে তারই সাহায্যে ও তার সঙ্গে সহযোগিতা করে উন্নতিলাভ করবে। একটা সাংস্কৃতিক নবযুগ এসেছিল, এবং বাঙলা ভাষা আশ্চর্যরূপে উন্নতিলাভ করেছিল। এ-ছাড়া, বাঙলাদেশের নেতারা সমগ্র রাজনৈতিক ভারতের নেতারূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ পরলোকগমনের অল্পকাল আগে, তাঁর অশীতিতম জন্মদিনে (বৈশাখ ১৩৪৮ সাল), যে মর্মস্পর্শী বাণী লিপিবদ্ধ করে গেছেন তা হতে কতক ধারণা জন্মে ইংলন্ডের উপর কিরূপ বিশ্বাসে, আর পুরাতন সামাজিক বিধানের বিরুদ্ধে কতখানি বিদ্রোহে বঙ্গবাসীর মন পূর্ণ ছিল। তিনি বলেছেন, "জীবন ক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা আজ আমার সম্মুখে প্রসারিত। পূর্বতম দিগন্তে যে জীবন আরম্ভ হয়েছিল তার দৃশ্য অপর প্রান্ত থেকে নিঃসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এবং অনুভব করতে পারছি যে, আমার জীবনের এবং সমস্ত দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে, সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর দুঃখের কারণ আছে।

"বৃহৎ মানব-বিশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আরম্ভ হয়েছে সেদিনকার ইংরেজ জাতির ইতিহাসে। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে উদ্ঘাটিত হোলো একটি মহৎ সাহিত্যের উচ্চ শিখর থেকে ভারতের এই আগন্তুকের চরিত্র পরিচয়। তখন আমাদের বিদ্যালাভের পথ্য পরিবেশনে প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য ছিল না। এখনকার যে বিদ্যা জ্ঞানের নানা কেন্দ্র থেকে বিশ্বপ্রকৃতির পরিচয় ও তার শক্তির রহস্য নতুন নতুন করে দেখাচ্ছে তার অধিকাংশ ছিল তখন নেপথ্যে অগোচরে। প্রকৃতিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা ছিল অল্পই। তখন ইংরেজী ভাষার ভিতর দিয়ে ইংরেজী সাহিত্যকে জানা ও উপভোগ করা ছিল মার্জিতমনা বৈদগ্ধ্যের পরিচয়। দিনরাত্রি মুখরিত ছিল বার্কের বাগ্মিতায়, মেকলের ভাষা প্রবাহের তরঙ্গভঙ্গে, নিয়তই আলোচনা চলত সেক্সপিয়ারের নাটক নিয়ে, বায়রণের কাব্য নিয়ে এবং তখনকার পলিটিক্সে সর্ব মানবের বিজয় ঘোষণায়। তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে, এক সময় আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে, এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। কেননা এক সময় অত্যাচার-প্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংলণ্ডে। যারা স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করছিল তাদের অকুণ্ঠিত আসন ছিল ইংলণ্ডে। মানব-মৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ চরিত্রে, তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ইংরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেম। তখনো সাম্রাজ্য-মদমত্ততায় তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয়নি।

"আমার যখন বয়স অল্প ছিল ইংলণ্ডে গিয়েছিলেম, সেই সময় জন্ ব্রাইটের মুখ থেকে পার্লামেন্টে এবং তার বাহিরে কোনো কোনো সভায় যে বক্তৃতা শুনেছিলেম, তাতে শুনেছি চিরকালের ইংরেজের বাণী। সেই বক্তৃতায় হৃদয়ের ব্যাপ্তি জাতিগত সকল সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে যে পভাব বিস্তার করেছিল সে আমার আজ

পর্যন্ত মনে আছে এবং আজকের এই শ্রীভ্রষ্ট দিনেও আমার পূর্ব স্মৃতিকে রক্ষা করছে। এই পরনির্ভরতা নিশ্চয়ই আমাদের শ্লাঘার বিষয় ছিল না। কিন্তু এর মধ্যে এইটুকু প্রশংসার বিষয় ছিল যে, আমাদের আবহমানকালের অনভিজ্ঞতার মধ্যেও মনুষ্যত্বের যে একটি মহৎ রূপ সেদিন দেখেছি তা বিদেশীয়কে আশ্রয় করে প্রকাশ পেলেও তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের ছিল ও কুণ্ঠা আমাদের মধ্যে ছিল না। কারণ মানুষের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা সংকীর্ণভাবে কোনো জাতির মধ্যে বদ্ধ হোতে পারে না, তা কৃপণের অবরুদ্ধ ভাণ্ডারের সম্পদ নয়। তাই ইংরেজের যে সাহিত্যে আমাদের মন পুষ্টিলাভ করেছিল আজ পর্যন্ত তার বিজয় শঙ্খ আমার মনে মন্দ্রিত হয়েছে।"

তারপর তিনি চিরাচরিত ভারতীয় সদাচারের আদর্শ সম্বন্ধে বলেছেন, "এই নিয়মগুলির সম্বন্ধে প্রাচীনকালে যে ধারণা ছিল সেও একটি সংকীর্ণ ভূগোল খণ্ডের মধ্যে বদ্ধ। সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী যে দেশ ব্রহ্মাবর্ত নামে বিখ্যাত ছিল সেই দেশে যে আচার পারম্পর্যক্রমে চলে এসেছে তাকেই বলে সদাচার। অর্থাৎ এই আচারের ভিত্তি প্রথার উপরেই প্রতিষ্ঠিত, তার মধ্যে যত নিষ্ঠুরতা যত অবিচারই থাক্। এই কারণে প্রচলিত সংস্কার আমাদের আচার-ব্যবহারকেই প্রাধান্য দিয়ে চিত্তের স্বাধীনতা নির্বিচারে অপহরণ করেছিল। সদাচারের যে আদর্শ একদা মনু ব্রহ্মাবর্তে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন সেই আদর্শ ক্রমশ লোকাচারকে আশ্রয় করলে। আমি যখন জীবন আরম্ভ করেছিলুম তখন ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে এই বাহ্য আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেশের শিক্ষিত মনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। রাজনারায়ণবাবু কর্তৃক বর্ণিত তখনকার কালের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যবহারের বিবরণ পড়লে সে কথা স্পষ্ট বোঝা যাবে। এই সদাচারের স্থলে সভ্যতার আদর্শকে আমরা ইংরেজ জাতির চরিত্রের সঙ্গে মিলিত করে গ্রহণ করেছিলেম। আমাদের পরিবারে এই পরিবর্তন, কী ধর্মমতে কী লোকব্যবহারে ন্যায়বুদ্ধির অনুশাসনে পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছিল। আমি সেই ভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলুম এবং সেই সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ ইংরেজকে উচ্চাসনে বসিয়েছিল। এই গেল জীবনের প্রথম ভাগ। তার পর থেকে ছেদ আরম্ভ হোলো কঠিন দুঃখে। প্রত্যহ দেখতে পেলুম সভ্যতাকে যারা চরিত্র উৎস থেকে উৎসারিতরূপে স্বীকার করেছে, রিপুর প্রবর্তনায় তারা তাকে কী অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে।"

৭ : ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের বিরাট বিদ্রোহ : জাতিবৈরিতা

প্রায় একশো বছর ইংরাজ শাসনের পর বাঙলাদেশ তার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিল, এবং তার ফলে কৃষকেরা দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত এবং নূতন নূতন আর্থিক চাপে নিষ্পেষিত হয়েছিল, আর নব শিক্ষায় দীক্ষিত লোকেরা পশ্চিমে তাকিয়েছিল এই আশায় যে ইংরাজের উদারতার কল্যাণে উন্নতিলাভ করবে। ভারতের অন্য স্থানেও

অবস্থাটা এইরূপই দাঁড়িয়েছিল, যেমন দক্ষিণে ও পশ্চিমে, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই প্রদেশে। কিন্তু উত্তর-ভারতে এরূপ মানিয়ে নেওয়া, কি আত্মসমর্পণ, কিছুই ছিল না; সেখানে বিদ্রোহের ভাব দিন দিন বৃদ্ধিলাভ করছিল, বিশেষভাবে সামন্তরাজ ও তাদের অনুবর্তীদের মধ্যে। এমনকি জনসাধারণের মধ্যেও অসন্তোষ এবং ইংরাজ-বিদ্বেষ ব্যাপ্তিলাভ করেছিল। উপরের স্তরের লোকেরা বিদেশীয়দের উদ্ধত ও অসম্মানজনক ব্যবহারে রুষ্ট হয়েছিল। লোকে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের অর্থগৃধ্নুতা ও মূর্খতার জন্য বহু ক্লেশ পেতে থাকে, কারণ এরা পুরাতন রীতিনীতি অগ্রাহ্য করত এবং দেশের লোকেরা কি মনে করে, না করে, সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। বহু লোকের উপর অব্যাহত শক্তি পরিচালনা করে তাদের মাথা ঘুরে গিয়েছিল, তাদের কোনো বাধা, কোনো বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়নি। যে নূতন বিচার-ব্যবস্থা তারা প্রতিষ্ঠা করেছিল তাও লোকের ভয়ের কারণ হয়েছিল। ব্যবস্থাটা ছিল জটিল, আর বিচারপতিদেরও এদেশের ভাষা ও রীতিনীতি কিছুই জানা ছিল না।

অনেক আগে ১৮১৭ খৃস্টাব্দে, স্যর টমাস্ মন্রো বড়লাট লর্ড হেস্টিংসকে ব্রিটিশ শাসন হতে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি বিবৃত করার পর লিখেছিলেন, 'এই সমস্ত সুবিধা অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে ক্রয় করা হয়ে থাকে। স্বাধীনতা, জাতীয় চরিত্র এবং যা কিছু মানুষকে সম্মানার্হ করে রাখে সেই সমস্তের বিনিময়ে এই সুবিধাগুলি ক্রয় করা হয়। ......সুতরাং ইংরাজ-অস্ত্রশক্তিদ্বারা ভারতবিজয়ের ফলে একটি সমগ্র জাতি উন্নতিলাভ করার পরিবর্তে নিতান্ত হীন হয়ে পড়বে। ইংরাজাধিকৃত ভারতে শাসনকার্য হতে যেভাবে দেশীয় লোকদের বহিষ্কৃত করে রাখা হয়েছে আর কোনো বিজিত দেশে এরূপ ঘটার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।'

মন্রো শাসন-ব্যবস্থায় ভারতীয়দের নিয়োগ করার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। আর এক বছর পরে তিনি পুনরায় লিখেছিলেন, 'বৈদেশিক বিজেতারা বিজিত দেশবাসীদের উপর অত্যাচার করেছে, অনেক সময় অতিশয় নির্দয় ব্যবহারও করেছে; কিন্তু আমাদের মত কেউ এত অবজ্ঞা করেনি; কেউ-ই একটা সমগ্র জাতিতে কলঙ্ক আরোপ করে বলেনি যে তারা বিশ্বাসের অযোগ্য, তাদের নিয়োগ করা যেতে পারে কেবল সেই সেই কাজে যে জন্য তাদের না হলে চলবে না। যে-জাতি আমাদের প্রভুত্বাধীনে পতিত হয়েছে তার চরিত্রে এরূপ হীনতা আরোপ করা যে কেবল অনুদারতার পরিচায়ক তা নয়, এটা অধিকন্তু রাষ্ট্রনীতিবিরুদ্ধ ব্যবহার।'*

দুটি শিখ যুদ্ধের পর ১৮৫০ খৃস্টাব্দের মধ্যেই ইংরাজ রাজত্ব পাঞ্জাব পর্যন্ত পেঁৗছেছিল। রণজিৎ সিং পাঞ্জাব পর্যন্ত শিখ-রাজ্য প্রসারিত করেন এবং ১৮৩৯ খৃস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে অযোধ্যা ইংরাজ-শাসনের অন্তর্গত হয়। এই অযোধ্যা ছিল করদ-রাজ্য, এবং বলতে গেলে অর্ধ শতাব্দী ধরে ইংরাজ-শাসনেই ছিল, কারণ এর নামে মাত্র নবাব সহায়হীন ও ক্ষুদ্রচিত্ত হওয়ায় ইংরাজ স্থানীয়

* টমসনের দ্বারা উদ্ধৃত : 'প্রিন্সেজ' ২৭৩, ২৭৪ পৃঃ

কর্মচারী (রেসিডেণ্ট) ছিল সর্বেসর্বা। এই রাজ্যে দুর্দশার শেষ ছিল না। এর দৃষ্টান্ত হতে 'সহায়ক' ব্যবস্থার কুফল সম্বন্ধে বেশ জানা যায়।

১৮৫৭ খৃস্টাব্দের মে মাসে মীরাটে অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহী হয়। এ বিদ্রোহের ব্যবস্থা গোপনে যথোপযুক্তরূপেই করা হয়েছিল কিন্তু যথাসময়ের পূর্বেই আকস্মিকভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ায় নেতৃবর্গের ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যায়। একে কেবলমাত্র সৈন্যবিভাগের বিদ্রোহ মনে করা ভুল। এটা দ্রুত প্রসারিত হয়ে একটা জাতির বিদ্রোহ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একে ভারত-স্বাধীনতার সমর বলা যেতে পারে। দিল্লী, এখনকার যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বিহারে এটা দেশবাসীর বিদ্রোহ হয়ে দাঁড়ায়। মূলত একে সামন্ত রাজাদের বিদ্রোহ বলতে হবে, কারণ তারাই এবং তাদের অনুগত লোকেরা এতে নেতৃত্ব করেছিল, তবে দেশের লোকের মনে বিদেশীদের প্রতি যে বিরুদ্ধতা জমে উঠেছিল তাও এই বিদ্রোহের আগুনে ইন্ধন যুগিয়েছিল। মুঘল রাজবংশের শেষ বংশধরেরা তখনও দিল্লীর প্রাসাদে বসে ছিল। বিদ্রোহীরা তাদের কাছ থেকে অবশ্য সাহায্য পাবার আশা করেছিল, কিন্তু তারা তখন ক্ষীণ, জীর্ণ ও সকল প্রকারে বলহীন। এই বিদ্রোহে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই যোগ দিয়েছিল।

এই বিদ্রোহে ইংরাজ-শাসনের উপর যতদূর সম্ভব টান পড়েছিল। ভারতীয়দের সাহায্যেই এ বিদ্রোহ দমন করা হয়। পুরাতন রাজশক্তির ভিতরকার সমস্ত দুর্বলতা এই বিদ্রোহে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে গেল, কারণ সে-শক্তি এই শেষবার মরিয়া হয়ে বৈদেশিক শাসন দূর করতে চেষ্টা করে অকৃতকার্য হল। সামন্তরাজারা দেশের সুবিস্তীর্ণ অংশে জনসাধারণের নিকট হতে সহানুভূতি লাভ করেছিল, কিন্তু তারা ছিল অকর্মণ্য, অসম্বদ্ধ, এবং ভবিষ্যতের জন্য তাদের কোনো গঠনমূলক পরিকল্পনাও ছিল না। ইতিহাসে যেটুকু স্থান তাদের নেবার তা তারা নিয়েছে, ভবিষ্যতের কোথাও তাদের জন্য স্থান ছিল না। এদের অনেকে, বিদ্রোহীদের সঙ্গে সহানুভূতি থাকলেও, সতর্ক থাকাই বিবেচনার কাজ বলে ধরে নিয়েছিল, এবং এক পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল বিজয়লক্ষ্মী কোনদিকে যান। অনেকে আবার কুইস্‌লিঙ-এর ন্যায় স্বজনদ্রোহী হয়েছিল। দেশীয় রাজারা সকলেই নির্লিপ্ত ছিল, অথবা ইংরাজকে সাহায্য করেছিল, কারণ যেটুকু রাজ্য সংগ্রহ করেছিল, কি বাঁচাতে পেরেছিল, তাও পাছে যায় এই ছিল তাদের ভয়। বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে কোনো জাতীয় ভাব কি একতাবদ্ধ হবার স্পৃহা ছিল না। যা ছিল তা কেবল বিদেশীয়দের প্রতি বিরুদ্ধভাব ও আপনাদের সামন্ত-তান্ত্রিক সুবিধাগুলি রক্ষা করার আকাঙ্ক্ষা। এ নিয়ে বেশি দূর অগ্রসর হওয়া যায় না।

ইংরাজেরা গুর্খাদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিল, আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে শিখেরাও তাদের সাহায্য করেছিল, যদিচ ইংরাজদের শত্রুই ছিল এই শিখেরা, কারণ এর কয়েক বছর আগেই তারা ইংরাজদের কাছে পরাজিত হয়েছিল। শিখদেরও যে তারা আপন পক্ষে আনতে পেরেছিল এটা ইংরাজদের সম্বন্ধে একটা প্রশংসার কথা, তবে এটা শিখদের পক্ষে কতটা প্রশংসা কি অপ্রশংসার কথা তা যিনি আলোচনা করবেন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে। স্পষ্টই জানা যায় যে ভারতবাসীদের

এক করে নিতে পারে এরূপ জাতীয় ভাবের তখন অভাব ছিল। জাতীয়তা বললে এখন যা বোঝায় তা তখনও আসেনি। প্রকৃত স্বাধীনতা পেতে হলে যে-অভিজ্ঞতা আবশ্যক তার পথে এখনও ছিল বহু দুঃখ, বহু শোক ও অনেক বেদনা। সামন্ততন্ত্রের দিন ফুরিয়ে গেছে; তার জন্য যুদ্ধ করে স্বাধীনতা আসবে না।

এই বিদ্রোহে কয়েকজন গেরিলা-যুদ্ধের নেতার দেখা পাওয়া যায়। দিল্লীর বাহাদুর সা-র আত্মীয় ফিরোজ সা ছিলেন একজন গেরিলা-নেতা। তাঁতিয়া টোপি ছিলেন এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। পরাভব আসন্ন জেনেও তিনি ইংরাজকে মাসের পর মাস উত্যক্ত করেছিলেন। শেষে আপনার নিজের লোকদের কাছ থেকে সাদর ব্যবহার ও সাহায্য পাবার আশায় যখন নর্মদা নদী পার হয়ে মারাঠা দেশে উপস্থিত হন তখন পেয়েছিলেন অন্যরূপ ব্যবহার। বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে ধরিয়ে দেওয়া হয়। মাত্র বিশ বছর বয়স্কা ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর নাম এখনও সকলের উপরে, এখনও লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। তিনি যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। যে ইংরাজ সেনাপতি তাঁর বিপক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন তিনি লক্ষ্মীবাঈ সম্বন্ধে বলেছেন যে বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন 'শ্রেষ্ঠতম ও সর্বাপেক্ষা সাহসী।'

কানপুর ও অন্যত্র এই বিদ্রোহে মৃত ব্যক্তিদের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু যে-সকল ভারতীয়ের মৃত্যু হয়েছিল তাদের জন্য কিছুই করা হয়নি। বিদ্রোহী ভারতীয়েরা কখনও কখনও নির্দয়তা ও বর্বরতা প্রদর্শন করেছিল; তারা সুসম্বন্ধ ছিল না, আর প্রায়ই ইংরাজকৃত অত্যাচারের সংবাদে ক্রুদ্ধ থাকত। কিন্তু এই ছবির আর একটা দিকও আছে, আর ভারতবাসীর মনে তা গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। বিশেষভাবে আমার নিজের প্রদেশে তার স্মৃতি কি শহর কি পল্লী সর্বত্র এখনও জীবন্ত রয়েছে। এ অতি ভয়ঙ্কর, বীভৎস ছবি। এমনকি আধুনিক কালের যুদ্ধে এবং নাৎসীদের দ্বারা বর্বরতার যে নূতন মানদণ্ড প্রস্তুত হয়েছে তদনুসারেও, এই ছবিতে মানুষ অতিশয় কদর্য মূর্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। অবিচলিত কিংবা নৈর্ব্যক্তিকভাবে এই ঘটনাটিকে মনে রাখা কিংবা ভুলে যাওয়া তখনই সম্ভবপর হবে যখন এই বিদ্রোহ সত্যকার অতীতে পর্যবসিত হবে, যখন বর্তমানের সঙ্গে এর আর কোনো প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকবে না। কিন্তু যতদিন এর স্মৃতি জাগ্রত রাখবার মত যোগসূত্র অব্যাহত থাকবে, যতদিন এই বিপ্লবের মূলীভূত কারণগুলি অপসৃত না হবে, ততদিন এর স্মৃতি টিকে থাকবে ও অলক্ষ্যে সমগ্র জাতিকে প্রভাবিত করবে। এই দুরপনেয় দুঃখের ছবিকে চাপা দেবার চেষ্টা বৃথা, সেরূপ চেষ্টায় এ-ছবি মুছে না গিয়ে বরঞ্চ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে, মনের গভীরে দাগ কাটে। সহজ ও স্বাভাবিকভাবে এই বিষয়টিকে আলোচনা করলেই বরং এর প্রভাব হ্রাস পেতে পারে। বিদ্রোহ ও তার প্রশমন বিষয়ে অনেক মিথ্যা কাহিনী ইতিহাসের পাতা কলুষিত করেছে। ভারতীয়েরা এ-বিষয়ে কি মনে করে তা ছাপার হরফে বের হয় না। প্রায় ত্রিশ বছর আগে সাভারকর তাঁর ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস (দি হিস্ট্রি অফ দি ওয়ার অফ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্) লিখেছেন, কিন্তু অনতিবিলম্বে সেই পুস্তকের প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়, এখনও সে বইয়ের

প্রচার নিষিদ্ধ আছে। কয়েকজন অকপট সত্যনিষ্ঠ ইংরাজ ঐতিহাসিক আবরণ উন্মোচন করেছেন—এবং তার ফলে আমরা দেখতে পেয়েছি উন্মত্ত জাতিস্বার্থ ও বিচারবিহীন অমানুষিকতা তখন কি প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছিল। কে এবং ম্যালিসন লিখিত সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসে (হিস্ট্রি অফ দি মিউটিনি) টমসন ও গ্যারেট লিখিত ভারতে ইংরাজ শাসনের প্রবর্তন ও পরিণতি (রাইজ এ্যাণ্ড ফুলফিলমেণ্ট অফ ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া) নামক পুস্তকে, যেসব বিবরণ আছে তা পড়লে মনে বিভীষিকার সঞ্চার হয়। 'কোনো ভারতবাসী সে সময়ে ইংরাজদের স্বপক্ষে যুদ্ধে রত না থাকলে তাকে নারীহত্যা ও শিশুহত্যার পাতকী বলে গণ্য করা হত।......দিল্লীর অনেক লোকই ছিল ইংরাজপক্ষ সমর্থনকারী, তবু সাধারণভাবে দিল্লীর অধিবাসী সকলকে হত্যা করার হুকুম ঘোষণা করা হয়েছিল।' এই নূতন বিভীষিকা এতখানি জায়গা জুড়ে এবং এত দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল যে, তৈমুর ও নাদীর শাহের অত্যাচারও এর কাছে হার মেনেছিল। সপ্তাহব্যাপী লুঠতরাজ চলতে পারে এইরূপ সরকারী হুকুম বহাল ছিল, কার্যত এই এক সপ্তাহ মাসাবধিকাল পর্যন্ত গড়াত। লুঠের সঙ্গে সঙ্গে চলত নির্বিচার হত্যাকাণ্ড!

আমাদের শহর ও জেলা এলাহাবাদ এবং তার আশেপাশে জেনারেল নীল বসিয়েছিলেন তাঁর 'খুনখারাবি আদালত' (ব্লডি এ্যাসাইজেজ)। "সৈন্যদলভুক্ত লোক এবং বেসামরিক লোকেরাও কখনও বা এইরূপ আদালত বসিয়ে, কখনও আদালতের বালাই না রেখেই, ছোটবড়, স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে দেশীয় লোকদের হত্যা করত। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট-এ রক্ষিত স-পরিষদ বড়লাট কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদনে লেখা আছে: 'পরিণত বয়স্ক পুরুষ, নারী, এমনকি শিশুদের পর্যন্ত হত্যা করা হচ্ছে—তারা বিদ্রোহের জন্য অপরাধী হোক কিংবা নাই হোক।' অনেককে আবার ইচ্ছা করে ফাঁসী দেওয়া হচ্ছে না, পল্লীতে পল্লীতে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। কেউ কেউ প্রাণ দিচ্ছে দৈবাৎ কোনো গুলির আঘাতে।" "স্বেচ্ছায় ফাঁসী লটকাবার কাজ নিয়ে দল বেঁধে অনেক ঘাতকের দল জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়িয়েছে, জল্লাদের কাজ করার জন্য কোথাও দুর্বৃত্তের অভাব ঘটেনি। এই সব ঘাতকদের মধ্যে একজন সদর্পে বলে বেড়াত কতজন লোককে সে 'শিল্পসম্মত' উপায়ে ফাঁসিতে লটকেছে। আমগাছের ডালকে সে করেছিল ফাঁসিকাঠ, হাতির পিঠে চাপিয়ে সে বধ্য ব্যক্তিকে আমগাছের তলায় এনে গলায় পরাত ফাঁস, অতঃপর হাতিকে নিত সরিয়ে। এই বর্বর বিচারের বলিগুলিকে সে যেন খেলাচ্ছলে ঝুলিয়ে রাখত ইংরাজি 'আট' সংখ্যার (বাঙলা ৪) আকারে।" এইরকম ব্যাপার ঘটেছিল কানপুর, লক্ষ্ণৌ ও যুক্তপ্রদেশের সর্বত্র।

এই পুরাতন ঐতিহাসিক অধ্যায়টি যে স্মরণ করতে হয় এতে লজ্জা হয়, ঘৃণা হয়—কিন্তু যে-মনোবৃত্তি এই সব জঘন্য ঘটনার পশ্চাতে কাজ করেছিল—সে মনোভাব তো এখনও ঘুচে যায়নি। এখনও তা টিকে আছে এবং সঙ্কটকালে যখন বিলাতি স্নায়ুতে টান পড়ে, তখন আবার এদের বর্বর চেহারাটা প্রকট হয়ে পড়ে। অমৃতসর ও জালিয়ানওয়ালাবাগের কথা জগৎশুদ্ধ লোক জানে, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহোত্তর যুগে আরও কত

কি ঘটেছে, নিতান্ত আধুনিককালে যেসব ঘটনা বর্তমান প্রজন্মের বহু নরনারীর মন তিক্ত করেছে—তার সম্বন্ধে পৃথিবীর লোক খুব বেশি জানে না। সাম্রাজ্যবাদ এবং এক জাতির উপর অন্য এক জাতির প্রভুত্ব নিন্দনীয়, আর তেমনি নিন্দনীয় হল জাতি-স্বার্থ। সাম্রাজ্যবাদ যখন জাতিস্বার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রকাশ পায়, তখন তার ফল হয় ভয়ঙ্কর, কারণ তার প্রভাবে সমস্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অধঃপতিত হয়। ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের ইতিহাস যাঁরা লিখবেন তাঁদের বিচার করে দেখতে হবে সে-দেশ আজ যে তার দর্পের উত্তুঙ্গ শিখর হতে অধঃপতিত হল, তার কারণ সাম্রাজ্যবাদ ও অন্ধ জাতিস্বার্থের মধ্যে নিহিত কি না। এই দুটি কারণে ইংলণ্ডের শাসকশ্রেণী কলঙ্কিত হয়েছে। তার নিজের ইতিহাস ও সাহিত্য থেকে ইংলণ্ড যে-শিক্ষালাভ করতে পেরেছিল—তা সে ভুলতে বসেছে।

অখ্যাত অবজ্ঞাত হিটলার যখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল জার্মানির সর্বময় অধিনায়ক-রূপে, তখন আর একবার জাতিস্বার্থ ও নাৎসীবাদের প্রভুজাতির বিষয়ে অনেক কথা শোনা গেল। এখন জাতিসঙ্ঘের নেতারা এই মতকে হেয় ও নিন্দনীয় বলে প্রচার করছেন। প্রাণীতত্ত্বজ্ঞেরা বলেন জাতীয় গৌরব একটা অলীক বস্তু, প্রভুত্বশালী জাতি বলে কিছু নেই। কিন্তু ইংরাজ-শাসন চালু হবার পর থেকে এদেশে আমরা জাতি-স্বার্থের সকল প্রকার চেহারাই দেখে নিয়েছি। ব্রিটিশ-শাসনের মূল কথাটাই হল ঐ প্রভুজাতির আদর্শ, এই ভিত্তির উপরেই ব্রিটিশ-শাসনের প্রতিষ্ঠা। বস্তুত সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে এই প্রভুত্বের ভাবটা অন্তর্নিহিত না থেকে পারে না। এদেশে এই মতবাদ লুকানো-ছাপানো ছিল না, যাদের হাতে ছিল শাসনকর্তৃত্ব তারা খোলাখুলিভাবেই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করতেন। কথার চেয়েও কঠিন হয়েছিল কাজ; বছরের পর বছর পুরুষানুক্রমে জাতি ও ব্যক্তিনির্বিশেষে ভারতীয়েরা ইংরাজদের হাতে লাঞ্ছনা, অপমান ও হীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। আমাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ইংরাজ রাজার জাত, আমাদের শাসন করবার ও আমাদের উপর প্রভুত্ব করবার ভগবদ্দত্ত অধিকার আছে তাদের। আপত্তির কথা উঠলেই 'রাজার জাতের বাঘের মত শক্তির কথা' স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি নিজে ভারতবাসী, এই সকল কথা লিখতে আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে, স্মরণ করেও বেদনা অনুভব করছি। সবচেয়ে বেদনার কথা এই যে এতকাল ধরে আমরা এই অপমান মাথা পেতে নিয়েছি। যদি এরূপ জঘন্য ব্যবহার সহ্য না করে, বেপরোয়াভাবে এই অন্যায়কে যেমন-তেমনভাবেও প্রতিরোধ করা হত, তাহলে আমি খুশি হতাম। সে যাই হোক, ভারতবাসী কিংবা ইংরাজ উভয়েরই এসব কথা জানা দরকার, না জানলে ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের মনস্তত্ত্বঘটিত পটভূমিকা বোঝা যাবে না। মনস্তত্ত্বকে স্বীকার না করে উপায় নেই, জাতির স্মৃতিও দীর্ঘকালস্থায়ী হতে বাধ্য।

ভারতে ইংরাজ কি মনোভাব পোষণ করে এসেছে এবং কিভাবে কাজ করেছে—তা আর একটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি থেকে হৃদয়ঙ্গম করা যাবে। ১৮৮৩ অব্দের ইলবার্ট বিল আন্দোলনের সময়ে ভারত সরকারের তদানীন্তন পররাষ্ট্রসচিব সেটন্ কার্ বলেছেন :

অবাধ্যতা, পলায়ন অথবা বিদ্রোহের শাস্তি ছিল সামরিক জগতের মতই গুরুতর ও ভয়াবহ। কেবল যে এই বেসামরিক বাহিনী গঠিত হয়েছিল তা নয়, এই সরকারী চাকরিতে প্রবিষ্ট হয়ে উন্নতিলাভের আশায় বহুলোক সৎপথ পরিত্যাগ করে নীতিভ্রষ্ট হয়েছিল। সরকারী কাজের খানিকটা গৌরব ও প্রতিপত্তি তো ছিলই, উপরন্তু ছিল জীবিকা সম্বন্ধে একটা সুনিশ্চয়তা ও চাকরির মেয়াদের শেষে অবসরভাতার ব্যবস্থা। উপরওয়ালার কাছে প্রভূত পরিমাণে যো-হুকুমভাব দেখাতে পারলে অন্যান্য ত্রুটি গণ্যই হত না। এই সব কর্মচারীরা ছিল ইংরাজ রাজপুরুষ ও দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যবর্তী সম্প্রদায়—শাসন-ব্যবসার মহাজন। যে-পরিমাণে এরা উপরিতন প্রভুদের কাছে হাতজোড় করে চলত, ঠিক সেই পরিমাণেই এরা নিজেদের অধস্তন কর্মচারী ও জনসাধারণের প্রতি দম্ভ প্রদর্শন করে হুকুম তামিল করিয়ে নিত।

অন্য প্রকার কাজে বা অন্য উপায়ে জীবিকা অর্জনের সুবিধা না থাকায় ভারতীয়দের চোখে সরকারী চাকরি অধিকতর বিশিষ্টতা লাভ করে। অল্প দু-দশজন লোক হয়তো ব্যবহারজীবী কিংবা চিকিৎসক হতে পারত, কিন্তু এসব পেশায় কৃতকার্যতা সম্বন্ধে কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। শ্রমশিল্প একরূপ ছিল না বললেই হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য পুরুষানুক্রমিকভাবে কতকগুলি পেশাদার জাতির মধ্যে আবদ্ধ ছিল, এদের এরূপ কাজে বিশেষ দক্ষতা থাকায় ও পরস্পর সহায়তা করার ফলে তাদের কাজ বহিরাগতদের হাতে যাবার জো ছিল না। নূতন ধরনের শিক্ষার ফলে শিল্প কিংবা ব্যবসার জন্য মানুষ তৈরি হত না, এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই ছিল সরকারী চাকরির জন্য লোক তৈরি করা। শিক্ষার পরিসর এত স্বল্প ছিল যে তা থেকে কোনো জীবিকাবৃত্তির জন্য প্রস্তুতির অবকাশ ছিল না। এক রাজকার্য ছাড়া অন্য কোনো সামাজিক পেশার ব্যবস্থা ছিল না বললেই হয়। সুতরাং সরকারী চাকরি ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। কলেজগুলি থেকে যখন অধিক সংখ্যায় উপাধিধারী ছাত্রেরা জলস্রোতের মত বেরিয়ে এল, তখন দেখা গেল সরকারী চাকরির সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলেও, সকলের জন্য তা যথেষ্ট নয়। সৃষ্টি হল তুমুল প্রতিযোগিতার। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ও অন্যান্য শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে থেকে সরকার সকল সময়েই প্রয়োজনমত লোক নিতে পারত। ক্রমে তারা সরকারী নিযুক্ত স্থায়ী চাকুরেদের কাছে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াল। এইরূপে ভারতে ইংরাজ সরকার কেবল যে সবার বড় চাকরি-দেনেওয়ালা হয়ে উঠল তা নয়, বলতে গেলে (রেলের চাকরি ধরলে) একমাত্র চাকরিদেনেওয়ালা মালিক হয়ে উঠল তারা। সবার উপরে গঠিত হল এক বিরাট আমলাতন্ত্র যা শাসনের সকল দিক দৃঢ়হস্তে উপর থেকে নিয়ন্ত্রিত করত। চাকরির অনুগ্রহসৃষ্টির বিপুল সুবিধা গ্রহণ করে ইংরাজ তার অধিকারের ভিত্তি সুদৃঢ় করার সুযোগ পেল। এ-ছাড়া এই উপায়ে অসন্তোষ সৃষ্টিকারীদের জব্দ করা এবং সরকারের চাকরিপ্রার্থী বিভিন্ন দলের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করে তাদের দুর্বল করাও চলত। এই কারণে দেশে নীতিভ্রষ্টতা ও সংঘর্ষ উপজাত হয়েছিল এবং সরকার প্রজাদের মধ্যে নিজের ইচ্ছামত দলাদলি ঘটিয়ে তুলতে সমর্থ হত।

ভারতীয় সৈন্যবিভাগেও বেশ চেষ্টা করেই রেষারেষির ভাব জাগিয়ে রাখা হত। বিভিন্ন বাহিনীকে এমনভাবে বিন্যাস করা হয়েছিল যেন তাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য-চেতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। জাতি, দল ও সম্প্রদায়গত জিগির তোলা ও বুলি আওড়ানো বিধিমতে উৎসাহিত করা হত। সৈন্যবিভাগ ও দেশের লোকেদের মধ্যে যাতে কোনো যোগাযোগ না থাকে সেজন্য সকল প্রকার চেষ্টা চলত, এমনকি নিতান্ত সাধারণ খবর-কাগজও সিপাহীদের হাতে পেঁছতে পারত না। সেনাবাহিনীর সকল গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি ইংরাজ অফিসারদের একচেটিয়া ছিল, ভারতীয় কোনো ব্যক্তিই রাজানুজ্ঞানুযায়ী উচ্চ সামরিক পদ পেতে পারত না। একজন অনভিজ্ঞ ইংরাজ সেনানী অনায়াসে প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ভারতীয় জমাদার-হাবিলদারের উপর প্রভুত্ব করতে পারত। একমাত্র হিসাববিভাগের নিম্নপদস্থ কেরানী ব্যতীত, অন্য কোনো পদে এদেশীয় কোনো লোক সামরিক বিভাগের কেন্দ্রীয় দপ্তরে নিযুক্ত হতে পারত না। অধিকতর সতর্কতার উদ্দেশ্যে উৎকৃষ্টতর অস্ত্রশস্ত্রাদি কেবল ইংরাজ সৈন্যের ব্যবহারের জন্য রক্ষিত হত, ভারতীয় সৈন্যদের হাতে দেওয়া হত না। ইংরাজ-রাজের নিরাপত্তা রাখার জন্য এদেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে ভারতীয় সৈন্যদলের সঙ্গে ইংরাজ সৈন্য রাখা হত। উদ্দেশ্য ছিল এই যে কোনো গোলযোগ হলে তা যেন সহজে দমন করা যায় এবং জনসাধারণের মনে যেন সদাসর্বদা প্রভুজাতির সম্বন্ধে একটা আতঙ্ক থাকে। ইংরাজ নায়কদের দ্বারা পরিচালিত ইংরাজপ্রধান এই সৈন্যদল দেশের অভ্যন্তরে ইংরাজ অধিকার কায়েম করার জন্য ব্যবহৃত হত, আর ভারতীয় সিপাহীদের অধিকাংশকে প্রস্তুত রাখা হত বিদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হলে সেখানে প্রেরণ করার জন্য। এই সকল ভারতীয় সৈন্য প্রধানত উত্তর-ভারতের বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় থেকে গৃহীত হত— এদের বলা হত সামরিক জাতি।

পূর্বে ভারতে ইংরাজ-শাসনের যে স্ববিরুদ্ধ দিকের কথা উল্লেখ করেছি, আলোচনা প্রসঙ্গে সেই দিকটা পুনরায় চোখে পড়ে। ইংরাজ সরকার খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতে রাজনৈতিক একতা এনে অনেক নূতন নূতন শক্তির উৎস খুলে দিয়েছে। এখন তাই চিন্তার স্রোত বয়ে চলেছে ঐক্যবোধের দিক হতে ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যে। ইংরাজ-শাসন যে-ঐক্য সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে তাকেই চেয়েছে চূর্ণ করতে। দেশকে বহুবিভক্ত করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই ঐক্যকে নষ্ট করবার যে চেষ্টা হয়েছে তা নয়, চেষ্টা হয়েছে জাতীয় ভাবকে এমনভাবে দমন করার যাতে সমগ্র দেশে ইংরাজ-শাসন বরাবরকার মত প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। ঐক্যের বন্ধন ছিন্ন করে জাতীয়ভাব দূরীভূত করার চেষ্টা হয়েছে নানা প্রকারে। দেশীয় রাজ্যগুলিকে এমন প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, যে-গুরুত্ব তাদের কোনোকালেই ছিল না। দেশস্বার্থের বিরোধী ব্যক্তিদের উসকিয়ে দিয়ে তাদের কাছ থেকে সমর্থন লাভের চেষ্টা হয়েছে। দেশবাসীদের প্ররোচিত করা হয়েছে এমনভাবে যাতে নূতন নূতন দলে বিভক্ত হয়ে তারা পরস্পরের মধ্যে বিরোধে নিযুক্ত থাকে। ধর্মের পার্থক্য ও প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার সাহায্যে মানুষের মধ্যে দলাদলির ভাবকে উগ্র করে তোলা

হয়েছে। সংগঠন করা হয়েছে সেই সব দেশদ্রোহীর গোষ্ঠী যারা সকল প্রকার পরিবর্তনকেই সর্বনাশের কারণ মনে করে আতঙ্কগ্রস্ত হয়। অবশ্য একটা বিদেশীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পক্ষে এই সকল উপায় অবলম্বন করা স্বাভাবিক, একথা বুঝতে বেগ পেতে হয় না। ভারতের জাতীয়তার দিক থেকে সমূহ ক্ষতিকর হলেও বিদেশীয় শাসকের এই আচরণে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তবে এটা ঠিক যে পরবর্তীকালে যা-কিছু ঘটেছে তা সম্পূর্ণ বুঝতে গেলে এই সব কথা মনে রাখতে হবে। ইংরাজ সরকার কর্তৃক এই নীতি অনুসৃত হবার ফলে ভারতের জাতীয় জীবনে এমন সব উপসর্গ এসে জোটে যার মূল উদ্দেশ্যই বিভেদ ও বিসংবাদ বৃদ্ধি করা। এই সব খণ্ড খণ্ড অংশগুলিকেই পুনরায় একসূত্রে গ্রথিত করে তোলার প্রয়াস পেতে হচ্ছে।

দেশের প্রগতিপরিপন্থীদের সঙ্গে ইংরাজ রাজশক্তির এই স্বাভাবিক সৌহার্দ্য বর্তমান থাকায়, ইংরাজ এমন সব মন্দ প্রথা ও অসদাচার সমর্থন ও সংরক্ষণ করেছে যা অপর ক্ষেত্রে ইংরাজ হয়তো নিন্দাই করত। ইংরাজ যখন এদেশে আসে তখন ভারতবর্ষ ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন। পুরাতন প্রথার অত্যাচার বড় কঠিন অত্যাচার। প্রথাও তো পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদে দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে পরিবর্তিত হয়। হিন্দু আইন প্রধানত হিন্দুসমাজের প্রথা বা সংস্কারস্বরূপেই রচিত হয়েছিল, প্রথা যেমন যেমন বদলেছে আইনের প্রয়োগেও তেমনি অদলবদল ঘটেছে। সত্যি কথা বলতে কি, হিন্দু আইনে এমন কিছু ছিল না, যা আচারের দ্বারা পরিবর্তিত না হতে পারত। হিন্দুসমাজের পরিবর্তনশীল আচরণীয় নিয়মগুলির স্থানে ইংরাজ হিন্দুশাস্ত্রের ভিত্তিতে রচিত কতকগুলি কানুন সৃষ্টি করেছে। বিচারক 'রায়' দেন এই কানুন অনুসারে; অবশেষে বিচারের এই 'রায়'গুলিই বাঁধা নজীর-হিসাবে পরবর্তীকালে ব্যবহৃত হয়েছে। এতে এইটুকু সুবিধা যে আইনের প্রয়োগ সম্বন্ধে কোনো দ্বিধা সন্দেহের অবকাশ থাকে না, সর্বত্র একভাবে সেগুলিকে ব্যবহার করা চলে। কিন্তু এইরূপ করার ফলে পুরাতন বিধান পরবর্তীকালের প্রথাদির সঙ্গে সম্বন্ধ বিবর্জিত হয়ে একটা চিরস্থায়ী রূপ গ্রহণ করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রথার পরিবর্তন ঘটায় আচরণ বদলালেও আইন অটল হয়ে আছে। আগেকার রীতি অনুসারে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করার সকল চেষ্টা প্রতিহত করা হয়েছে। প্রথাদি সুপ্রমাণিত হলে তা আইন অপেক্ষাও বলবৎ বলে গণ্য করা হয়, তখন প্রথানুসারে বিধানে পরিবর্তন ঘটানো চলে। কিন্তু এদেশের আদালতে সেরূপ করা মোটেই সহজসাধ্য হয়নি। পরিবর্তন সাধিত হতে পারত একমাত্র ব্যবস্থাপক সভার সাহায্যে, কিন্তু সেখানেও ব্রিটিশ সরকার (যাঁদের হাতে ছিল আইন প্রণয়নের ভার) তাঁদের সাহায্যকারী রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধতা করে কোনো নূতন আইন প্রবর্তন করতে চাননি। অংশত নির্বাচিত ব্যবস্থাপক সভাকে কিছু কিছু আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়। দেখতে পাই দেশের সামাজিক উন্নতির জন্য যখনই ব্যবস্থাপক সভা কোনো আইন পাশ করাতে চেয়েছেন, ইংরাজ-রাজ চোখ রাঙিয়ে প্রগতিশীল দলের সমস্ত চেষ্টা ব্যাহত করতে চেয়েছেন, কোনো দিক থেকে তাঁদের এই উন্নতি প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করেননি।

৯ : শ্রমশিল্পের উদ্ভব : প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য

ধীরে ধীরে ১৮৫৭-৫৮ অব্দের বিদ্রোহ-পরবর্তী প্রভাব থেকে দেশ মুক্ত হল। ইংরাজ শাসননীতি সত্ত্বেও এমন অনেকগুলি কারণের সমবায় ঘটল যাতে দেশে একটা পরিবর্তন সংঘটিত হল এবং জেগে উঠল একটা নূতন সামাজিক চেতনা। ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য, পাশ্চাত্যের সঙ্গে যোগাযোগ, বৈজ্ঞানিক উন্নতি—এমনকি পরদাসত্বের দুর্গতি—সব কিছু মিলে নূতন চিন্তাধারার সৃষ্টি করল। ধীরে ধীরে শ্রমশিল্প গড়ে উঠতে লাগল এবং শুরু হল জাতির স্বাধীনতালাভের জন্য আন্দোলন। ভারতের এই নবজাগরণের দুটো দিক আছে—একদিকে সে দৃষ্টি দিয়েছে বাইরে পশ্চিমের দিকে. অন্যদিকে সে নিজের অন্তরের দিকে তাকিয়েছে ও তার প্রাচীন ঐতিহ্যসম্পদের দিকে নজর দিয়েছে।

শ্রমশিল্পের যুগ ভারতে প্রথমে এসেছিল পরোক্ষভাবে বিলাতি পণ্যসম্ভারের আকারে, প্রত্যক্ষভাবে শিল্পোন্নতির অধ্যায় শুরু হল রেলগাড়ি আসার সঙ্গে। ১৮৬০ অব্দে বিদেশী যন্ত্রপাতির উপর আমদানী শুল্ক রহিত হল। এতদিন এই উপায়ে ভারতে শিল্পোন্নতির পথ রুদ্ধ করা হয়েছিল, এখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিলাতি মূলধনের সাহায্যে বড় বড় শিল্প গড়ে উঠতে লাগল। সর্বপ্রথম এল বাঙলার পাট-শিল্প, এই পাটের ব্যবসার কেন্দ্র ছিল স্কটল্যান্ড-এর ডান্ডি শহরে। এর অনেককাল পরে আমেদাবাদ ও বোম্বাই-এ ভারতীয় মূলধনে ও ভারতীয় মালিকানায় কাপড়ের কল বসতে শুরু করল। অতঃপর এল খনিজ-শিল্প। ভারতস্থিত ব্রিটিশ সরকার একটার পর একটা বাধা উপস্থিত করতে লাগলেন। ভারতে প্রস্তুত কলের কাপড় যাতে লাঙ্কাসায়ার-এর বিলাতি কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এ'টে উঠতে না পারে, সেইজন্য ভারতেও দেশী কাপড়ের উপর আবগারী শুল্ক বসানো হল। ভারতে ইংরাজ সরকারের মূলনীতিই ছিল এদেশে একটা পুলিশ রাজত্ব স্থাপন করে শান্তি সংরক্ষণ করা। বিংশ শতকের আগে অবধি সরকারের কৃষি, বাণিজ্য কিংবা শিল্পের কোনো যে দপ্তর ছিল না, তা থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয়। আমি যতদূর জানি একজন আমেরিকান অতিথির বদান্যতার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারে সর্বপ্রথম কৃষিবিভাগ পত্তন করা হয়। এই অভ্যাগত মার্কিন ভদ্রলোক ভারতের কৃষির উন্নতির জন্য কিছু দান করেছিলেন। কৃষিবিভাগ আজও সরকারের একটি উপেক্ষিত নগণ্য দপ্তর। কৃষিবিভাগ খোলবার কিছুদিন পরই ১৯০৫ অব্দে বাণিজ্য ও শিল্পবিভাগ খোলা হয়। এই বিভাগগুলির এমন কিছু কাজ ছিল না। কৃত্রিম উপায়ে ভারতের শিল্পোন্নতির দিকটাকে বাড়তে দেওয়া হয়নি, তার আর্থিক সমৃদ্ধিকে একপ্রকার জোর করেই যেন ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল।

ভারতের জনসাধারণের দারিদ্র্য এতে ঘোচেনি, তারা বরঞ্চ আরও অধিক গরীব হয়ে পড়ছিল দিনে দিনে। নূতন আর্থিক ব্যবস্থায় উপরের দিকের একটা স্তর ক্রমেই ঐশ্বর্যশালী হয়ে মূলধন সঞ্চয় করছিল। এই উপরিস্তরের মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোক

টাকা খাটাবার সুবিধা ও তৎসঙ্গে রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দাবি করে বসল। রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখি ১৮৮৫ অব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। বাণিজ্য ও শিল্প ধীরে ধীরে প্রসারলাভ করতে শুরু করে। একটা লক্ষণীয় বিষয় এই যে শিল্প-বাণিজ্যে যারা যোগদান করল তাদের অধিকাংশই ছিল এমন সব শ্রেণীর লোক যারা শত শত বছর ধরে বংশানুক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্য করে এসেছে। বস্ত্র-ব্যবসার নূতন কেন্দ্র আমেদাবাদ মুঘল এবং তৎপূর্ববর্তী আমল থেকে বাণিজ্যের একটি খ্যাতনামা কেন্দ্র ছিল। এখানকার পণ্য বাইরে রপ্তানি হত। আমেদাবাদের বড় বড় ব্যবসায়ীদের নিজের নিজের জাহাজ ছিল, সেই জাহাজে মাল বোঝাই করে তারা পণ্য পাঠাত সমুদ্র অতিক্রম করে আফ্রিকায় ও পারস্য উপসাগরে। আমেদাবাদের নিকটবর্তী বন্দর—ব্রোচ—গ্রীসীয়-রোমক যুগ থেকে বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল।

গুজরাত, কাথিয়াওয়ার এবং কচ্ছদেশের লোক বহু পুরাতন কাল থেকে স্থলপথে ও জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে আসছে। ভারতে নানা পরিবর্তন ও বিপর্যয়ের মধ্যেও তারা তাদের জাত-ব্যবসা ঠিক চালিয়ে গেছে নূতন কালের সঙ্গে তাল রেখে। দেশের শিল্প-বাণিজ্যের নেতৃস্থানীয় লোকেদের মধ্যে এরা এখনও প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ধর্মমত কিংবা ধর্মান্তরের প্রশ্ন কোনো প্রভেদ সৃষ্টি করে না। তেরশো বছর আগে পার্সিরা এসে গুজরাতে বসবাস স্থাপন করে, ব্যবসা-জগতে তাদের গুজরাতি বলা চলে (আজ বহুকাল ধরে তারা গুজরাতি ভাষাভাষী)। মুসলমানদের মধ্যে ব্যবসা ও শিল্প সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী হল খোজা, মেমন ও বোরা সম্প্রদায়। এরা সকলেই গুজরাত কাথিয়াওয়ার কিংবা কচ্ছ প্রদেশের ধর্মান্তরিত হিন্দু। এই গুজরাতিরা কেবল যে ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের ভাগ্যনিয়ন্তা তা নয়, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, পূর্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অন্যান্য দেশেও এরা প্রসার-প্রতিপত্তি লাভ করেছে।

রাজপুতানার মাড়োয়াড়ীরা অন্তর্বাণিজ্য ও আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করত, ব্যবসা-বাণিজ্যের সমস্ত কেন্দ্রস্থলে তাদের দেখা মিলত। তাদের মধ্যে বড় বড় ব্যাঙ্কারও ছিল আবার ছোট ছোট গ্রাম্য-মহাজনও ছিল। নামজাদা মাড়োয়াড়ী বাড়ির হুন্ডি ভারতের যে-কোনো জায়গায়, এমনকি বিদেশেও, ভাল ব্যাঙ্কের চেক-এর মত স্বীকৃত হত। বড় বড় ব্যাঙ্কিং-প্রতিষ্ঠানে এখনও মাড়োয়াড়ী আধিপত্য করছে—এখন আবার তার সঙ্গে সঙ্গে তারা নানারূপ শ্রমশিল্পও গড়ে তুলছে।

উত্তর-পশ্চিমের সিন্ধীদেরও ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ খুবই প্রাচীন। শিকারপুর এবং সিন্ধু-হায়দ্রাবাদকে কেন্দ্র করে এই সিন্ধী বণিকেরা মধ্য ও পশ্চিম-এশিয়া ভূখণ্ডে ও অন্যান্য নানা দেশে বাণিজ্য চালাত। আজকের দিনে (অর্থাৎ যুদ্ধ ঘটবার আগে) সারা পৃথিবীতে হেন বন্দর নেই যেখানে গুটিকয়েক সিন্ধী দোকান না দেখা যায়। কোনো কোনো পাঞ্জাবীও পুরুষানুক্রমে ব্যবসার ধারা চালিয়ে আসছে। মাদ্রাজের চেট্টিরা বহুকাল ধরে ব্যবসা করে আসছে—বিশেষ করে ব্যাঙ্কিং ব্যবসা। 'চেট্টি' কথাটা এসেছে সংস্কৃত 'শ্রেষ্ঠী' থেকে—এই শ্রেষ্ঠীরা পুরাতনকালে বণিকশ্রেষ্ঠ

বলে স্বীকৃত হত। 'শেঠ' কথাটাও এসেছে শ্রেষ্ঠী থেকে। মাদ্রাজী চেট্টিরা কেবল যে দক্ষিণ-ভারতের ব্যবসার উপর প্রভুত্ব করেছে তা নয়, ব্রহ্মদেশের সর্বত্র এমনকি সুদূর বর্মী পল্লীতে পল্লীতে তারা একচেটিয়া ব্যবসা চালিয়ে এসেছে।

প্রত্যেক প্রদেশেই দেখতে পাই ব্যবসা-বাণিজ্য এমন সব লোকের হাতে যারা পুরাকালে বৈশ্য বলে পরিচিত ছিল এবং বংশানুক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। পাইকারী ও খুচরো দোকান, তেজারতী ও লগ্নী কারবার—সবই ছিল তাদের হাতে। গ্রামে গ্রামে ছিল বেনিয়ার (বেনের) দোকান; গ্রাম্যজীবনের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করত তারা, বেশ চড়া সুদে ধারও দিত গ্রামের লোকেদের। গ্রামে গ্রামে ঋণদানের ব্যাপারটা ছিল এই বেনিয়াদেরই হাতে। এদের অনেকে আবার উপজাতি ও স্বাধীন অঞ্চলে গিয়ে সেখানকার ব্যবসায় নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠ করেছে। দেশ দরিদ্র হওয়ার সঙ্গে, চাষী-ঋণের অঙ্কও হু হু করে বেড়ে যেতে থাকে, জমি বন্ধক রেখে ধারে দেবার ফলে সুদখোর বেনিয়ারা গ্রামের অধিকাংশ জমি আত্মসাৎ করতে থাকে। অবশেষে সুদখোর মহাজন একদিন গাঁয়ের জমিদার হয়ে বসে।

বাণিজ্য, কারবার ও সুদের ব্যবসাদারদের মধ্যে শ্রেণীগত যে-পার্থক্য ছিল তা ক্রমেই নূতন আগন্তুকদের ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবেশলাভের ফলে পূর্বের মত আর স্পষ্ট থাকল না। কিন্তু প্রভেদ বরাবরই ছিল আজও আছে। জাতিভেদ, সংস্কার, কি পূর্ব-পুরুষানুক্রমে অর্জিত দক্ষতার ফলে এটা সম্ভবপর হয়েছে কি না তা ঠিক করে বলা যায় না। এটা সত্য যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য হেয় বলে মনে করা হত। বিত্তসঞ্চয় করাটা সুখকর বলে মনে করলেও তারা বিত্তসঞ্চয়ের সোজাসুজি পথটা একপ্রকার এড়িয়েই চলত, সামন্ততান্ত্রিক যুগের মত জমিদারী থাকাটা বরাবরই সামাজিক সম্ভ্রমের সূচনা করেছে। কিন্তু বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্যকে মানুষ কখনও অর্থসম্পত্তির চাইতে কম সম্মান দেখায়নি। ইংরাজরাজের আমলে সরকারী চাকরী হয়ে দাঁড়াল সম্মান প্রতিপত্তি ও নিরাপদ জীবিকার কেন্দ্রস্বরূপ। পরে যখন ভারতীয়েরা ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস-এ যোগ দেবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হল, তখন এই 'ইন্দ্রপুরী সম্ভূত সার্ভিস' (ইন্দ্রপুরী আর কিছুই নয়, লন্ডনের হোয়াইট হল-এর অতি ক্ষীণ প্রেতছায়া), ইংরাজি-শিক্ষিতশ্রেণীর চোখে স্বর্গতুল্য মনে হতে লাগল। পেশাদার লোকেরা, বিশেষত যেসব আইনজীবী ইংরাজপ্রতিষ্ঠিত নূতন আদালতে প্রচুর ফী উপার্জন করতে লাগল, তাদেরও সম্মান-প্রতিপত্তি কম ছিল না। সেজন্য দেশের যুবকদের মধ্যে আইন পড়বার ঝোঁক দেখা দিল—কালে এই আইন-জীবীরাই রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে লাগলেন। আইনের দিকে সর্বপ্রথম ঝুঁকলো বাঙালীরা, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রখ্যাতনামা ব্যবহারজীবী হয়ে এই পেশাটিকে আকর্ষণের বস্তু করে তুললেন। এ'রাই হয়ে উঠলেন দেশের নেতা। ক্রমবর্ধমান শ্রমশিল্পের জগতে দক্ষতা না থাকার দরুণ কিংবা আর কোনো কারণে এ'রা খুব বেশি পাত্তা পেলেন না। ফলে হল কি, যখন জাতির জীবনে শিল্প প্রাধান্যলাভ করে রাজনীতিকে পর্যন্ত প্রভাবিত করে তুলল, তখন রাজনৈতিক

ক্ষেত্র থেকে বাঙালীর প্রভাব গেল অনেকখানি কমে। সরকারী চাকুরে হিসাবে বা অন্যভাবে বাঙালী যে-ধারা বইয়ে দিয়েছিল অন্যান্য প্রদেশে, এখন সেই ধারাই যেন বিপরীতমুখী হয়ে প্রবেশ করল বাঙলাদেশে এবং বিশেষ করে কলকাতায়। কলকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য সব কিছু প্রভাবিত হতে লাগল বহির্বঙ্গের লোকেদের দ্বারা। ইংরেজ মূলধনের সবার বড় কেন্দ্র ছিল কলকাতা—ইংরাজ ও স্কচদের হাতে ছিল এই শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যের কলকাঠি। এখন প্রতিযোগিতায় মাড়োয়াড়ী ও গুজরাতিরা ইংরাজদের প্রায় ধরে ফেলল বলে। এমনকি অনেক ছোট খাটো কারবারও কলকাতায় বেহাত হয়ে চলে গিয়েছে অবাঙালীদের হাতে। কলকাতার হাজার হাজার ট্যাক্সি-চালকদের প্রায় সকলেই হল পাঞ্জাবী শিখ।

ভারতের মূলধনে প্রতিষ্ঠিত শ্রমশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং ও বীমার কারবারের কেন্দ্র ছিল বোম্বাই শহর। পার্সী, গুজরাতি, মাড়োয়াড়ী সম্প্রদায়ই ছিল এসব কাজে অগ্রবর্তী। স্মরণ রাখা উচিত যে বোম্বাই যদিও একটি আধুনিক কালের সার্বজনিক শহর, তবু এখানকার জনসংখ্যার বেশির ভাগই হল মারাঠি ও গুজরাতি। কিন্তু ব্যবসার দিক থেকে এই মারাঠারা অন্যদের তুলনায় খুবই অনগ্রসর। মারাঠারা কিন্তু বিভিন্ন পেশায়, পাণ্ডিত্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। তারা যে সত্য সত্যই সুনিপুণ যোদ্ধা হবে এতে আর সন্দেহ কি। বহুসংখ্যক মারাঠা কাপড়ের কলে কাজ করে। তাদের চেহারা একহারা অথচ শক্ত সমর্থ। সমস্ত প্রদেশ হিসাবে তাদের সমৃদ্ধ বলা যায় না। শিবাজীকে নিয়ে, তাদের পূর্বপুরুষের কীর্তিকলাপ নিয়ে মারাঠিদের খুব গর্ব। গুজরাতিদের চেহারা অত রুক্ষ নয়—শান্ত, নরম; তারা বিত্তশালী ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সুপটু। বোধ করি ভৌগোলিক কারণে এইসব পার্থক্য দেখা দেয়—মারাঠাদের দেশ রুক্ষ, তরুলতাবিবর্জিত পার্বত্য দেশ, অপরপক্ষে গুজরাত হল শস্য-শ্যামলা উর্বর দেশ।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের এই পরস্পর-পার্থক্য—যা বহুকাল ধরে চলে আসছে—এটা ক্রমান্বয়ে হ্রাস হয়ে আসলেও আজও লক্ষণীয়। মনস্বিতায় শ্রেষ্ঠ মাদ্রাজ বহু দার্শনিক, গণিতজ্ঞ ও বিজ্ঞানীর জন্ম দিয়েছে ও দিচ্ছে। বোম্বাই আজকাল প্রধানত ব্যবসায় নিয়েই আছে—তার সুবিধা-অসুবিধা উভয়ই তাদের ভোগ করতে হচ্ছে। ব্যবসা ও শিল্পে উন্নত না হলেও বাঙলাদেশ অনেকগুলি প্রখ্যাতনামা বিজ্ঞানবিদের জন্মস্থান, শিল্পকলা ও সাহিত্যজগতে বাঙলার দান অনবদ্য। পাঞ্জাব খুব অসাধারণ লোকের জন্ম দেয়নি বটে কিন্তু জীবনের নানা ক্ষেত্রে পাঞ্জাবীরা অগ্রগামী—তারা বেশ বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন, কলকব্জার ব্যাপারে তারা বেশ দক্ষ এবং তাদের মধ্যে অনেকে ছোটখাটো ব্যবসা-বাণিজ্যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পে বেশ কৃতকার্য হয়েছে। যুক্তপ্রদেশে (দিল্লীকেও যদি তার মধ্যে ধরা যায়) বেশ একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছে, এক হিসাবে যুক্তপ্রদেশকে ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যায়। এই প্রদেশ একাধারে পুরাতন হিন্দু সংস্কৃতি এবং আফগান ও মুঘলযুগের আমদানী পারসিক সংস্কৃতির কেন্দ্র—এই দুই ধারার বেশ একটা সংমিশ্রণ এখানে চোখে পড়ে। এই সংশ্লেষণে আর

একটি ধারা এসে যোগ দিয়েছে—সেটা হল পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধারা। অন্য প্রদেশের তুলনায় যুক্তপ্রদেশে প্রাদেশিক সংকীর্ণতা খুবই কম। যুক্তপ্রদেশ বহুকাল ধরে ভারতবর্ষের হৃদয়স্বরূপে কল্পিত ও স্বীকৃত হয়ে এসেছে। সাধারণ লোকে হিন্দুস্থান বলতে এই প্রদেশকেই সচরাচর উল্লেখ করে থাকে।

এই যে প্রাদেশিক পার্থক্যের কথা বলা হল এটা মূলত ভৌগোলিক কারণ ঘটিত, ধর্মের সঙ্গে এর সংস্রব খুবই কম। একজন বাঙালী হিন্দুর সঙ্গে বাঙালী মুসলমানের যে-মিল, সে-মিল পাঞ্জাবী মুসলমান এবং বাঙালী মুসলমানের মধ্যে পাওয়া শক্ত। এই উদাহরণ অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধেও খাটে। কয়েকজন বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমান যদি কোনো সূত্রে, দেশে কিংবা বিদেশে একত্র হয়, তা হলে অচিরে তারা পরস্পরের সঙ্গ সন্ধান করে ও আপনার জনের মধ্যে মেলবার মেশবার একটা আনন্দ পায়। হিন্দু, মুসলমান ও শিখ-নির্বিশেষে পাঞ্জাবীদের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। বোম্বাই প্রদেশের মুসলমানদের (খোজা, মেমন ও বোরা) মধ্যে অনেক হিন্দু আচার পদ্ধতি দেখা যায়। খোজা (এরা হল আগা খাঁর শিষ্য) ও বোরা সম্প্রদায়কে উত্তর-ভারতের মুসলমানেরা আচারভ্রষ্ট বলে মনে করে।

সমগ্র সম্প্রদায় হিসাবে—মুসলমানেরা (বিশেষ করে বাঙলাদেশের ও উত্তর-ভারতের) বহুকাল ইংরাজশিক্ষা হতে দূরে থেকেছে; শিল্পের উন্নতি প্রচেষ্টায় তারা খুব সামান্যই যোগ দিয়েছিল। এটা ঘটেছিল অংশত সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারার জন্য, অংশত কুসীদজীবিকা বিষয়ে ইসলামের নিষেধ (রোম্যান ক্যাথলিকদের সম্বন্ধেও এটা প্রযোজ্য) থাকার দরুন। এই নিষেধ থাকা সত্ত্বেও একটা অদ্ভুত ব্যতিক্রম দেখা যায়। সুদখোর বলে যাদের কলঙ্ক আছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী একদল পাঠান (কাবুলিওয়ালা) উপজাতি। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংরাজি শিক্ষাবিষয়ে মুসলমানেরা ছিল অনগ্রসর সুতরাং একদিক দিয়ে তাদের পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে যোগাযোগ যেমন অসম্পূর্ণ ছিল, তেমনি আবার সরকারি চাকরীর ক্ষেত্রে ও শ্রমশিল্পের দিক থেকেই তারা পড়েছিল পিছিয়ে।

যদিও প্রদেশের শ্রমশিল্প অতি মন্থর গতিতে ও নানা বাধার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছে, তবু নূতন জিনিস বলে একেই অনেকে প্রগতির চিহ্ন বলে ধরে নিয়েছে এবং এর দিকে অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। জনসাধারণের দারিদ্র্য সমস্যা ও চাষের জমির উপর একযোগে বহু লোকের নির্ভরশীলতা এতে কমেনি বললেই হয়। লক্ষ লক্ষ বেকার—তাদের মধ্যে কেউ কেউ সম্পূর্ণ বেকার কেউ বা অংশত—সারা দেশ ছেয়ে রয়েছে। এই বেকারবাহিনীর মুষ্টিমেয় কয়েক সহস্র লোক মাত্র শ্রমশিল্পে নিযুক্ত হতে পেরেছে। জাতির আর্থিকজীবনে শ্রমশিল্প এত যৎসামান্য পরিবর্তনের সূচনা করেছে যে দেশের ক্রমবর্ধমান গ্রামীকরণতা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়নি বললেই চলে। দেশজোড়া বেকার সমস্যা ও জমি নিয়ে কাড়াকাড়ির ফলে বহুসংখ্যক শ্রমিক ভারত ছেড়ে বিদেশে কাজ নিয়ে চলে গেছে। যে-সর্তে অধিকাংশ মজুর গেছে তাকে

আর যাই হোক সম্মানজনক বলা চলে না। তারা গেছে দক্ষিণ-আফ্রিকায়, ফিজিদ্বীপপুঞ্জে, ত্রিনিদাদ, জামাইকা, মরিশাস্, গিয়ানা, সিংহল, ব্রহ্ম, মালয়ে—সর্বত্র এইরকম অপমানকর শর্তে কাজ করবার জন্য। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তি বিদেশী শাসনের আওতায় বেশ একটু সুবিধা করে নিতে পেরেছে সত্য, কিন্তু এদের সঙ্গে দারিদ্র্যক্লিষ্ট জনসাধারণের কোনো যোগ ছিল না। এইসব লোকের হাতে কিছু টাকাও জমেছে, আরও উন্নতির পথ খুলে গেছে এই মূলধন লাভ করে। কিন্তু মূলগত যে সমস্যা—দেশের দারিদ্র্যদশা ও বেকার লোকের সংখ্যাবৃদ্ধি—তার আর কোনো সমাধান হতে পারেনি।

১০ : হিন্দু ও মুসলমান সমাজে সংস্কারমূলক আন্দোলন

ভারতের উপর পশ্চিমের সত্যকার প্রভাব এসে পড়ে উনিশ শতকে—যন্ত্রবিদ্যার উন্নতি ও তার সুদূরপ্রসারী প্রভাবের ফলে। ভাবের রাজ্যেও ওলটপালট ও পরিবর্তন এসে পড়ে। চিন্তার জগৎ এতদিন সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, এখন তা বহুদূর অবধি বিস্তৃত হল। গোড়ার দিকে পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই স্বল্পসংখ্যক ইংরাজি-শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে—তাঁরা নির্বিচারে পশ্চিমের প্রায় সব কিছু শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। হিন্দুধর্মের কয়েকটি সামাজিক প্রথা ও আচারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে অনেক হিন্দু খৃস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বাঙলাদেশের কয়েকজন প্রখ্যাতনামা ব্যক্তি খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেন। নূতন পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রাখবার জন্য এবং যুক্তি ও সমাজসংস্কারের ভিত্তিতে হিন্দুধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ গঠন করেন। পরবর্তীকালে কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে খৃস্টীয় ভাবধারা অল্পাধিক অবতারণা করেন। যদিচ বাঙলাদেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, ধর্ম-হিসাবে একে স্বীকার করে নিয়েছিলেন খুবই স্বল্পসংখ্যক লোক। এই লোকেদের মধ্যেই কিন্তু এমন অনেক ব্যক্তি বা পরিবার ছিলেন যাঁরা বাঙলাদেশের গৌরব বাড়িয়ে গেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকে আবার ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম ও সমাজসংস্কারমূলক কাজটুকুই গ্রহণ করেছেন এবং জীবনদর্শনের দিক থেকে ফিরে গেছেন বেদান্ত দর্শনের সনাতন আদর্শের দিকে।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এই সংস্কারের ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছিল দেখা যায়। একদিকে সমাজের বাঁধাধরা নিয়ম ও অন্যদিকে হিন্দুধর্মের নান্য মত, আচারের অত্যাচার প্রভৃতির ফলে অসন্তোষের একটি হাওয়া বইছিল দেশের সর্বত্র। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একজন গুজরাতী—স্বামী দয়ানন্দ—একটি শক্তিশালী সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। পাঞ্জাবের হিন্দুদের মধ্যে এই আর্যসমাজের বীজ অনুকূল ক্ষেত্র পায়। আর্যসমাজীদের মূলমন্ত্র ছিল, 'বৈদিক যুগে ফিরে যাও।' বেদ পরবর্তী যুগে আর্যধর্মে যে যে বিকৃতি এসেছে, বেদান্তদর্শনের গজদ, অদ্বৈতবাদ, সর্বেশ্বরবাদ—সব কিছু অন্যান্য কুসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে কঠোরভাবে পরিহার করা

হল। বেদেরও ব্যাখ্যা করা হল বিশেষ একটা ধরনে। আর্যসমাজকে ইসলাম ও খৃস্টীয় ধর্মের (বিশেষ করে ইসলামের) বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া বলে অভিহিত করা চলে। এর মধ্যে সংস্কার-প্রচেষ্টার সঙ্গে একটা ধর্মযুদ্ধের ভাব নিহিত ছিল; ভিতরের দিকে চলতে লাগল এই সংস্কারের ক্রিয়া এবং বাইরে বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ করার উদ্যম। শুদ্ধি করে হিন্দুধর্মের আওতায় অন্য ধর্মের লোকদের গ্রহণ করার প্রথা আনে আর্যসমাজ। কাজে কাজেই ইসলাম ও খৃস্টধর্মের মত যেসব ধর্ম ধর্মান্তরিত করায় আস্থাবান—তাদের সঙ্গে লাগল আর্যসমাজের বিরোধ। এদিক থেকে ইসলামের সঙ্গে আর্যসমাজের একটা সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও, এই নূতন সমাজ হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারী হয়ে হিন্দুত্ববিরোধী সব কিছুকে প্রতিহত করতে উদ্যত হল। একটা বিষয় লক্ষণীয় এই সমাজে যাঁরা যোগ দিলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক। একদা সরকার আর্যসমাজের মধ্যে রাজনৈতিক বিপ্লবের বীজ অনুমান করে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু অধিকসংখ্যায় রাজকর্মচারী এই সমাজভুক্ত থাকায় আর্যসমাজকে সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়তে হয়নি। বালক-বালিকাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে, স্ত্রীজাতির কল্যাণে এবং অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতিকল্পে এই সমাজ বহু প্রশংসার্হ কাজ করেছেন।

স্বামী দয়ানন্দের সমসাময়িক অথচ তাঁর হতে বহুলাংশে পৃথক একজন বাঙালী এই সময় ইংরাজি-শিক্ষিত লোকদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেন। ইনি হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। রামকৃষ্ণ ছিলেন সহজ মানুষ, পণ্ডিত ইনি ছিলেন না, ইনি ছিলেন ভক্ত। কোমর বেঁধে ইনি কখনও সমাজসংস্কারের কাজে নামেননি। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও অন্যান্য ভারতীয় সাধুসন্তদের যে-ধারা, সেই ধারায় জন্মেছিলেন রামকৃষ্ণ। ধর্মে ছিল তাঁর গভীর নিষ্ঠা, এত উদার ছিল তাঁর চিত্ত যে আত্ম-উপলব্ধির সন্ধানে তিনি মুসলমান ও খৃস্টীয় সাধুদের কাছে যেতে ইতস্তত করেননি, তাঁদের সঙ্গে থেকেছেন বছরের পর বছর, কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের আচার অনুষ্ঠান স্বীকার করে নিয়েছেন। কলকাতার কাছে দক্ষিণেশ্বরে ইনি বসবাস করতে লাগলেন, এঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রমহত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে বহু ভক্ত আসতেন ঠাকুরের দর্শনলাভের বাসনায়। দর্শনকারীদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল এমন যারা আসত এই সহজ, সিধা মানুষটিকে ঠাট্টা করার জন্য, তারা পর্যন্ত এঁর অলৌকিক প্রভাব অস্বীকার করতে পারত না। এদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন লোকেরা বুঝতে পারত যে এই মহাপুরুষের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যার সন্ধান তারা পূর্বে কখনও পায়নি। ধর্মের মূল বিষয়বস্তুর উপর কেবল তিনি জোর দিতেন সেইজন্য তাঁর মধ্যে হিন্দু-ধর্মের ও হিন্দু দর্শনের একটা যেন সমন্বয় ঘটেছিল। কেবল হিন্দুধর্ম নয়, সকল ধর্মের সারাংশের প্রতি তাঁর একটা গভীর শ্রদ্ধা ও একাত্মবোধ ছিল। সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি তাঁর একটুও ছিল না, তিনি বলতেন, ‘যত মত তত পথ।’ এশিয়া ও ইউ-রোপের প্রাচীন ঐতিহ্যে যে সকল সাধু মহাত্মার কথা পড়ি, রামকৃষ্ণ ছিলেন তাঁদের মত। আধুনিক যুগের সঙ্গে তাঁর চরিত্রগত সঙ্গতি আপাতদৃষ্টিতে বোধগম্য না হলেও

ভারতবর্ষের বিচিত্র পটভূমিকায় তিনি বেশ মানিয়ে গিয়েছিলেন। ভারতের বহুলোক তাঁকে অবতারজ্ঞানে পূজা করেছে। যাঁরা তাঁর দর্শনলাভ করেছেন তাঁদের সকলেই ঠাকুরের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কাছে মাথা নত করেছেন, যাঁরা তাঁকে দেখেননি তাঁদের অনেকেই তাঁর জীবনকথা পড়ে প্রভাবিত হয়েছেন। এই শেষোক্তদের মধ্যে অন্যতম হলেন রম্যাঁ রল্যাঁ—রল্যাঁ ঠাকুর রামকৃষ্ণের ও তাঁর শিষ্যোত্তম স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী লিখে গেছেন।

বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরুভ্রাতারা সেবাধর্মের ব্রত গ্রহণ করে অসাম্প্রদায়িক রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। বিবেকানন্দের জীবনের ভিত্তি ছিল ভারতের অতীত গৌরবের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, এদেশের ঐতিহ্যে তিনি গৌরব অনুভব করতেন, অথচ জীবন-সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তিনি আধুনিক কালোপযোগী মনোবৃত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। এক হিসাবে তাঁকে ভারতের অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সেতুস্বরূপ বলা চলে। বাঙলা ও ইংরাজিতে তাঁর বাগ্মিতা ছিল অসাধারণ, বাঙলা লেখক হিসাবেও তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করে গেছেন। উন্নত ছিল তাঁর দেহ, তেজোময় মুখশ্রী; এমন একটা উদার প্রশান্তির ভাব আছে তাঁর মুখে, দেখে মনে হয় তিনি নিজের সম্বন্ধে ও নিজের ব্রত সম্বন্ধে ছিলেন অটল ও স্থিরনিশ্চয়। অথচ তাঁর মধ্যে ছিল বিরাট একটা শক্তির উৎস, ভারতকে প্রগতির পথে পরিচালিত করার জন্য একটা ঐকান্তিক ইচ্ছা। হিন্দু-মানস যে-সময় ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত, সেই সময় তিনি হিন্দুসমাজে আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনলেন, ভারতের অতীত গৌরবের দিকে অঙ্গুলী সংকেত করলেন। ১৮৯৭ অব্দে চিকাগোতে যে ধর্ম-মহাসম্মেলন হয়, বিবেকানন্দ সেই অধিবেশনে যোগদান করেন। অতঃপর প্রায় এক বছর আমেরিকায় কাটিয়ে তিনি ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন। এই সময়ে তিনি এ্যাথেন্‌স্‌ কনস্তান্তিনোপ্‌ল্‌ হয়ে মিশর অবধি গিয়েছিলেন। চীন ও জাপানেও গিয়েছিলেন তিনি। যেখানেই তিনি গিয়েছেন সেখানেই সকল লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর সৌম্য শান্ত চেহারা, তাঁর বক্তৃতার বিষয়, বাগ্মিতার ভঙ্গীতে এমন কিছু ছিল যার জন্য বিদেশে সাড়া পড়ে যেত। এই হিন্দু সন্ন্যাসীকে যে একবার দেখেছে তার পক্ষে বিবেকানন্দকে কিংবা তাঁর বাণীকে ভুলে যাওয়া সহজসাধ্য হয়নি। আমেরিকায় তাঁকে বলা হত 'প্রলয়ঙ্কর হিন্দু।' পশ্চিম ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনের উপরেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, ইংরাজ জাতির অধ্যবসায় ও মার্কিনদের জীবনীশক্তির প্রাচুর্য ও সমসমাজের আদর্শ তাঁর কাছে খুব ভাল লেগেছিল। একজন ভারতীয় বন্ধুকে তিনি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, 'কোনো একটি ভাবধারা যদি প্রতিষ্ঠিত করতে চাও সারা পৃথিবীতে সবার চাইতে অনুকূল ক্ষেত্র পাবে আমেরিকায়।' পাশ্চাত্যদেশের ধর্মের রূপ ও প্রকাশ তাঁর মনের উপর কোনো দাগ কাটতে পারেনি বরঞ্চ পাশ্চাত্য ভ্রমণের ফলে ভারতের আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা আরও বেশি দৃঢ়ীভূত হয়েছিল। তার প্রাচীন গৌরবের অত্যুচ্চ শিখর থেকে অধঃপতন সত্ত্বেও ভারতবর্ষই যে একদিন পথের আলো দেখাতে পারবে, এ বিশ্বাস তাঁর মনের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল।

বেদান্ত দর্শনের অদ্বৈতবাদ অথবা একেশ্বরবাদ তিনি প্রচার করেছেন, জগতের সমস্ত চিন্তাশীল মানুষের ধর্ম এককালে এই মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, এই বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। যা কিছু ‘আধ্যাত্মিক, যা কিছু বিচার ও যুক্তিসহ, বহিঃপ্রকৃতির বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান দ্বারা যা কিছু সিদ্ধ, এ-সবকিছুর সঙ্গে বেদান্তের সঙ্গতি রয়েছে। ‘বিশ্ববহির্ভূত কোনো ভগবান কিংবা কোনো অলৌকিক প্রতিভা যে এই বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেছেন, তা নয়। বিশ্বচরাচর আপনা থেকে আপনিই সৃষ্ট হয়েছে, আপনা থেকে আপনিই লয় পায়, আপনা থেকে আপনাকে প্রকাশ করে। ব্রহ্ম হলেন এক অসীম সত্তাস্বরূপ।’ বেদান্তের আদর্শ মানবসত্তার সত্যকে স্বীকার করা, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবতাকে অস্বীকার করা। মানুষের মধ্যে দেবতাকে দেখাই হল সত্যকার ভগবদ্দর্শন। সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

কিন্তু ‘বেদান্ত কেবল জল্পনার বস্তু হয়ে থাকলে চলবে না, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় এর কাব্যময় প্রকাশ সত্য হয়ে উঠতে হবে। জটিল পুরাণের জট ছাড়িয়ে বাস্তবজীবনের নীতি সন্ধান করে নিতে হবে। যোগের গোলক ধাঁধা থেকে পথ কেটে বের করে নিতে হবে ব্যবহারগত মনোবিজ্ঞানকে।’ ভারতবর্ষের অধঃপতন ঘটেছে কেন? ভারত নিজেকে সংকুচিত করেছে, শামুকের মত আপন আবরণের মধ্যে তার সত্তাকে প্রকাশকুণ্ঠ করে রেখেছে। বাইরের নানা দেশ ও জাতির সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে আপন সমাধির মধ্যে ভারতের শিলীভূত সংস্কৃতি জড়ত্বপ্রাপ্ত হয়েছে। গোড়াতে যে-জাতিভেদপ্রথা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছিত বস্তু ছিল, তা সাধারণ মানুষকে নিষ্পেষিত করার জন্য দানবিক যন্ত্রে পর্যবসিত হয়েছে। যা হওয়া উচিত ছিল, ঘটেছে ঠিক তার বিপরীতটুকু। যে-জাতিবিন্যাস ছিল সমাজব্যবস্থার অঙ্গ স্বরূপ তা ধর্মমতের সঙ্গে মিলে গিয়ে বহু সমস্যার সূচনা করেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজব্যবস্থারও অদল বদল হওয়া প্রয়োজন। বিবেকানন্দ খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন যে দার্শনিক যুক্তির কূটকচাল, ও ক্রিয়াকলাপে অনুষ্ঠানাদির স্বপক্ষে যুক্তিপ্রয়োগ—এ দুইই সমান অর্থলেশহীন। উচ্চবর্ণের ছুৎমার্গের সমালোচনা করে তিনি বললেন : ‘আমাদের তীর্থস্থান হল রন্ধনশালা। আমাদের ভগবান হল রন্ধন-শালার তৈজসপত্র। আমাদের ধর্মের মূলে সারাক্ষণ এই বুলি—আমায় ছুঁয়ো না আমি অতি পবিত্র।’

বিবেকানন্দ রাজনীতি থেকে দূরে থাকতেন, সমসাময়িক রাজনীতিকদের প্রতি তাঁর কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। কিন্তু বারবার তিনি বলে গেছেন যে পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার, সমাজে সাম্য আনা দরকার, জনসাধারণকে তাদের পঙ্কশয্যা থেকে তুলে ধরা দরকার। ‘বেঁচে থাকতে হলে, জাতীয় জীবনে উন্নতি ও মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন—চিন্তায় ও কর্মে স্বাধীনতা। যেখানে এই স্বাধীনতা নেই সেখানে ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা জাতির ধ্বংস অনিবার্য।’ ‘এই অগণিত জনগণ, এরাই ভারতবর্ষের আশা ভরসা। ভদ্রলোকদের কাছ থেকে কিছু

আশা করি না, কারণ তারা দেহের দিক থেকে ও মনের দিক থেকে মৃতকল্প।' বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম উন্নতির পটভূমিকার সামনে পাশ্চাত্য জগতের প্রগতিকে প্রতিষ্ঠা করতে, 'ভারতের ধর্মের উপর ইউরোপীয় সমাজ গড়ে তোলো।' 'সাম্যের দিক দিয়ে, স্বাধীনতার দিক দিয়ে, কর্ম ও শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যকে হার মানাও, কিন্তু ধর্মসাধনায় ও ধর্মবিশ্বাসে হিন্দুত্ব যেন তোমার অস্থি-মজ্জার মধ্যে মিশে থাকে।' ধীরে ধীরে বিবেকানন্দ আন্তর্জাতীয়তার দিকে অগ্রসর হন : 'রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রেও যেসব সমস্যা একটা বিশেষ কোনো দেশ বা জাতির সমস্যা ছিল, আজ সেইসব সমস্যার সমাধান নিছক জাতীয়তার ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। এই সমস্যাগুলি ক্রমেই বৃহদাকার ধারণ করেছে, বিচিত্ররূপে আমাদের চোখের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে। এখন আন্তর্জাতীয়তার বৃহত্তর ক্ষেত্রেই কেবল এই সমস্যা সমাধান করা চলবে। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সমবায়, আন্তর্জাতিক বিধিব্যবস্থা—এ হল এ-যুগের দাবি। এ হল—আজকের পৃথিবীর সংহত ও একতাবদ্ধ রূপ। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও দেখতে পাই বস্তুসম্বন্ধে মানুষের ধারণা ক্রমেই অতীতের সংকীর্ণ সীমা ছাড়িয়ে একটা বৃহত্তর পরিধিতে ব্যাপ্ত হচ্ছে।' অন্যত্র বলেছেন, 'সারা পৃথিবী যদি তার পিছনে এগিয়ে না যেতে পারে তা হলে তাকে প্রগতি বলা যেতে পারে না। প্রতিদিন আমাদের কাছে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে উঠছে; সেটা এই—দেশগত, কিংবা জাতিগত, কিংবা অনুরূপ কোনো সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান হবে না। প্রত্যেকটি ভাব কিংবা চিন্তাকে এমন উদারভাবে সম্প্রসারিত করতে হবে যেন তা সমস্ত পৃথিবীব্যাপী হয়। সাধনাকে এমনভাবে সমৃদ্ধ করতে হবে যেন সকল মানুষ সমস্ত জীবন তার আওতায় আশ্রয়লাভ করতে পারে।' বিবেকানন্দ বেদান্তদর্শনকে এই প্রকার দৃষ্টিতেই দেখেছিলেন এবং এই-ভাবেই তিনি তাঁর ধর্ম প্রচার করে বেড়িয়েছেন ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য এক প্রান্ত অবধি। 'অপরের সংস্পর্শ পরিহার করে কোনো ব্যক্তি বা জাতি বাঁচতে পারে না। যেখানেই আত্মসম্ভ্রম, জাতীয় গৌরব কিংবা মেকি পবিত্রতা রক্ষা করার অজুহাতে মানুষ মানুষকে এড়িয়ে চলেছে, সেখানেই সংসর্গবিরূপ ব্যক্তি বা জাতির পক্ষে তার ফল হয়েছে সাংঘাতিক।' 'আমাদের আজকের এই অধঃপতনের অন্যতম কারণ হল এই যে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য সব জাতির সংস্রব সযত্নে এড়িয়ে চলেছি। এ থেকে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায় বাইরের পৃথিবী যে-ধারায় বয়ে চলেছে তারই স্রোতে গা ভাসানো। গতিই হল জীবন।'

বিবেকানন্দ একবার লিখেছিলেন : 'আমি সমাজতন্ত্রী; সমাজতন্ত্রের ব্যবস্থা সর্বতোভাবে ভাল বলে আমি মনে করি না, কিন্তু নেই মামার চাইতে কানা মামা ভাল। অন্যান্য রাজনৈতিক মতবাদ কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখা গেছে সেগুলির দ্বারা সমস্যা মেটে না। একবার সমাজতন্ত্র নিয়েই পরীক্ষা করে দেখা যাক না, আর কিছু না হলেও এ একটা নূতন চেষ্টা তো বটে।'

অন্যান্য নানা বিষয়ে বিবেকানন্দ অনেক কথা বলে গেছেন, কিন্তু তাঁর বাক্যে ও

লেখায় মূলমন্ত্র ছিল একটি, সেটি অভয় মন্ত্র—ভয় পরিহার কর, বলীয়ান হও। মানুষ তাঁর চোখে অধম পাপী-তাপী মাত্র ছিল না, মানুষ যে ঈশ্বরের পরমাত্মার অংশবিশেষ। কোনো কিছুতে ভয় পাবে কেন মানুষ? জগতে ভয় বলতে যদি কিছু থাকে তো তা চিত্তের দৈন্য ও দুর্বলতা। দুর্বলতা পরিহার কর, দুর্বলতার মধ্যে মৃত্যুর বীজ নিহিত। এবা মে প্রাণঃ মা বীভেঃ—এই ছিল উপনিষদের মহৎ শিক্ষা। ভয় থেকে পাপ, ভয় থেকে দুঃখ দুর্গতি। অনেকদিন আমরা ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছি, কঠিন হতে পারিনি, 'দেশ এখন চায় এমন সব মানুষ যাদের পেশী হবে লোহার মত কঠিন, স্নায়ু হবে ইস্পাতের মত শক্ত। তাদের ইচ্ছাশক্তি এমন প্রবল হবে যাকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না, এই ইচ্ছার জোরে মানুষ বিশ্বচরাচরের সকল রহস্য ভেদ করে সত্য আবিষ্কার করবে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে—তা সে যেমন করেই হোক না কেন—এ অদম্য ইচ্ছা কোনো বাধা মানবে না—সমুদ্রের অতল গহ্বরে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হলেও এ-ইচ্ছাশক্তি পিছু হটবে না।' কাল্পনিক ও অবাস্তব জিনিসের প্রতি তাঁর ঘৃণা ছিল অসাধারণ, পরলোকতত্ত্ব ও মরমীয়াতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'এসব অবাস্তব ধারণা সরীসৃপের মত। এর মধ্যে সত্য—এমনকি বড় সত্য কিছু একটা থাকতে পারে, কিন্তু এইসব ধোঁয়াটে কল্পনার ফলে জাত প্রায় মরতে বসেছে......সত্যের সবচেয়ে বড় পরিচয় হল এই—যা শারীরিক, মানসিক কিংবা আধ্যাত্মিক দিক থেকে মানুষকে দুর্বল করে তা বিষবৎ পরিত্যাগ কর, তার মধ্যে জীবনের স্পন্দন নেই সুতরাং তা সত্য হবে কেমন করে। সত্য মানুষকে শক্তি দেয়। সত্য পবিত্র; সত্য সর্বজ্ঞ।......এই যে মরমীয়াতত্ত্ব, থাকতে পারে এর মধ্যে কিছু কিছু সত্য, কিন্তু এই তত্ত্ব মানুষকে দুর্বল করে।......যে-দর্শন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত, যা শক্তির আধার, যা আনন্দের উৎস—সেই উপনিষদে ফিরে যাও। কুহকের ছলনায় ভুলো না, সত্যের পথ চিত্তদৌর্বল্যের পথ নয়। সকলের বড় সত্য হল প্রাণধারণের মত সব চাইতে সহজ ব্যাপার।' কুসংস্কার বিষয়ে সাবধান। তোমরা যদি সবাই একান্তভাবে নিরীশ্বরবাদী হও তাও ভাল, কুসংস্কারাচ্ছন্ন নির্বোধ হয়ো না। নিরীশ্বরবাদীর মধ্যে তবু প্রাণের স্পন্দন আছে, তাকে দিয়ে তবু কিছু কাজ করিয়ে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু একবার যদি কুসংস্কার মাথায় ঢোকে তবে মস্তিষ্কের অস্তিত্ব লোপ পায়, বুদ্ধি বিবেচনা থাকে না, প্রাণশক্তি অধঃপতিত হয়......অতীন্দ্রিয় রহস্যে আস্থা এবং ভ্রমাত্মক বিশ্বাস এই দুয়েরই উদ্ভব মানসিক দুর্বলতা থেকে।'*

* অধিকাংশ উদ্ধৃতি বিবেকানন্দ-রচিত 'কলম্বো থেকে আলমোড়া অবধি প্রদত্ত বক্তৃতাবলী' 'লেকচারস্ ফ্রম কলম্বো টু আলমোরা' থেকে গৃহীত। এ-বইটি ১৯৩৩ অব্দে প্রকাশিত হয়েছে। কতকগুলি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে 'স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী' (লেটারস্ অফ স্বামী বিবেকানন্দ) থেকে। এই বইটি অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী, আলমোড়া, থেকে ১৯৪২ অব্দে প্রকাশিত। পত্রাবলীর ৫৯০ পৃষ্ঠায় বিবেকানন্দ কর্তৃক জনৈক মুসলমান বন্ধুকে লিখিত একটি উল্লেখযোগ্য পত্র আছে। সেই পত্র প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন : 'আমরা এই

এইভাবে সুদূর কুমারিকা থেকে আরম্ভ করে উত্তরে হিমালয় অবধি স্বামী বিবেকানন্দ বজ্রনির্ঘোষে তাঁর বাণী প্রচার করে বেড়ালেন। অনবসর ভ্রমণ ও অনবরত পরিশ্রমের ফলে তাঁর জীবনীশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হল। ১৯০২ অব্দে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করলেন।

বিবেকানন্দের সমকালীন অথচ তাঁর তুলনায় অনেক বেশি আধুনিক কালের মানুষ হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঊনিশ শতকে ঠাকুর পরিবার বাঙলাদেশের নানাবিধ প্রগতি আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। এই পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ধর্মসাধক, প্রখ্যাত লেখক ও শিল্পী—এ'দের সবার উপরে মাথা উ'চু করে দাঁড়িয়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কালে তিনি কেবল এই পরিবারে নয় সমগ্র ভারতের চিন্তাজগতে শীর্ষ-স্থান অধিকার করেছিলেন—যেখানে তিনি উঠতে পেরেছিলেন তার ধারে কাছে অন্য কারও স্থান ছিল না। দুই প্রজন্ম অবধি বিস্তৃত তাঁর দীর্ঘজীবন ধরে তিনি অব্যাহতভাবে সৃষ্টির কাজে লিপ্ত ছিলেন, অথচ মনে হয় তিনি যেন আমাদের এই অব্যবহিত বর্তমান যুগেরই মানুষ। রাজনীতিক তিনি ছিলেন না কিন্তু এমন স্পর্শ-কাতর ছিল তাঁর মন, এমন গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর দেশের স্বাধীনতা লাভের

দর্শনকে বেদান্তবাদ বা অন্য যে-কোনো আখ্যা দিতে পারি, তাতে কিছু আসে যায় না। বেদান্তবাদ যে-মতের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে-মতে কি ধর্মের কি চিন্তার চরম কথাটুকু ব্যক্ত হয়েছে। এই দিক থেকে দেখলে পর সকল ধর্ম সকল সম্প্রদায়ের প্রতি প্রীতির ভাব পোষণ করা যায়। আমার বিশ্বাস এই ধর্মমতই ভবিষ্যতের আলোকপ্রাপ্ত-মানুষের ধর্মরূপে গৃহীত হবে। অন্যান্য জাতির তুলনায় হিন্দুরা এই সত্য আবিষ্কারের পথে পুরোগামী হবার গৌরবের অধিকারী হতে পারে হয়তো। মনে রাখতে হবে হিব্রু ও আরব এই উভয় জাতির চেয়ে হিন্দুরা পুরাতন জাতি। কিন্তু সেই সঙ্গে এই কথাও বলে রাখা ভাল যে বাস্তবক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদ প্রয়োগের একটি উত্তম উদাহরণ হল সর্বজীবের মধ্যে আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা। এই সর্বভূতে সমদৃষ্টি হিন্দুসমাজে আসার এখনও অনেক দেরি।

অপরপক্ষে দেখতে পাই কার্যক্ষেত্রে ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যদি অন্য কোনো ধর্ম-মতাবলম্বী অনেকটা এই সাম্যাবস্থার দিকে এগিয়ে গিয়ে থাকে তো সে হল যারা ইসলামে বিশ্বাসী। হতে পারে এই মনোবৃত্তির অন্তর্নিহিত নীতি কিংবা অর্থ তাদের কাছে ততটা স্পষ্ট নয় যতটা স্পষ্ট হিন্দুদের কাছে, তবু একমাত্র ইসলামের মধ্যে সামাজিক কিংবা প্রতিদিনের ক্ষেত্রে এই সমদৃষ্টির পরিচয় দেখতে পাওয়া যায়।

আমাদের মাতৃভূমির একমাত্র ভরসা এই যে একদিন হয়তো আমরা এই দুই ধর্মমতের—হিন্দুত্বের ও ইসলামের—মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে পারব। বৈদান্তিক মাথা ও ঐস্লামিক দেহ—এর চেয়ে অধিকতর কাম্য আর কিছু হতে পারে না। মনশ্চক্ষে আমি যেন দেখতে পাই ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ, সর্বদোষলেশহীন ভারতবর্ষ, সমস্ত বিশৃঙ্খলা, সব কিছু সঙ্ঘাতের ঊর্ধ্বে উন্নতশীর্ষ অপরাজেয় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, জ্ঞানবুদ্ধির দিক থেকে সে বৈদান্তিক, সমাজ সংগঠনের দিক থেকে সে ঐস্লামিক।'

উপরোক্ত চিঠি লেখা হয়েছিল ১০ই জুন ১৮৯৮ অব্দে আলমোড়া থেকে।

জন্য, যে কাব্য ও সঙ্গীতের কল্পলোক থেকে তাঁকে বার বার বেরিয়ে আসতে হত। যখনই কোনো পরিস্থিতি তাঁর দুর্বিষহ মনে হয়েছে, তখনই তিনি বার বার তাঁর কবি-জনোচিত নেপথ্য থেকে বেরিয়ে এসে ইংরাজ সরকার কিংবা স্বদেশীয় লোকেদের প্রতি বজ্রনির্ঘোষে তাঁর সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের ঝড় বয়ে যায়, তখন সেই দুর্গম পথযাত্রীদের পুরোধাস্বরূপ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর যখন তিনি তাঁর 'স্যর'-উপাধি পরিত্যাগ করেন সেই সময় তিনি রাজনৈতিক ভারতবর্ষের পুরোভাগে আর একবার উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হন। শিক্ষার গঠনমূলক যে-কাজ তিনি নিভৃতভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে আরম্ভ করেছিলেন, আজ তার ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থানরূপে শান্তিনিকেতন সাধারণ্যে স্বীকৃত হয়েছে। ভারত-মানসের উপর—বিশেষ করে দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের উপর, তাঁর অসাধারণ প্রভাব গিয়ে পড়েছে। কেবল তাঁর মাতৃভাষা বাঙলাকে নয়, ভারতের আধুনিক সকল ভাষাকেই সম্পূর্ণত না হলেও অংশত তাঁর রচনার প্রভাবে তিনি সুগঠিত ও সমৃদ্ধ করে গেছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন সাধনায় এই উভয় ভূখণ্ডের সমন্বয় সাধনে তিনি যা করে গেছেন তা আর কোনো ভারতবাসী করে যেতে পারেনি। ভারতের জাতীয়তাকে যদি কেউ প্রশস্ততর ভিত্তির উপর স্থাপন করে গিয়ে থাকেন তাহলে তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ। আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য স্থাপনে তিনি ছিলেন ভারতের অগ্রদূত। সর্বজাতির সহযোগিতাসাধনে তিনি ভারতের বাণী বহন করে নিয়ে গেছেন দূর দেশ দেশান্তরে, বিদেশের মৈত্রীর বাণী বহন করে নিয়ে এসেছেন স্বদেশের অঙ্গনে। আন্তর্জাতিক তিনি ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি একান্তভাবে ছিলেন এই ভারতের মাটির মানুষ। ভারতের উপনিষদে যে জ্ঞান ও চিন্তার ধারা, সেই পুরাতন ধারায় অভিষিক্ত ছিল তাঁর চিত্তবৃত্তি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামত বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকতরভাবে যেন প্রগতিপন্থী হয়, সচরাচর এমন ঘটে না বরঞ্চ এর উল্টোটাই হয়ে থাকে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে গভীরভাবে আস্থাবান হওয়া সত্ত্বেও তিনি রুশবিপ্লবের নানাবিধ কীর্তিকলাপের একজন বিশেষ অনুরাগী হন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার, স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে এবং সর্বসাধারণের মধ্যে সাম্যভাব বিস্তারে রুশিয়ার কৃতিত্ব তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে গেছেন। জাতীয়তাবাদ মানুষের চিত্তকে সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রাখতে চায়; পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষের ফলে জাতীয় মনোভাবে নানাপ্রকার ব্যর্থতা ও মানসিক বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পায়। গান্ধীজি যেমন তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্রে ভারতের চিত্তবৃত্তিকে এই সঙ্কীর্ণতাদোষ থেকে মুক্ত করেছেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি তাঁর স্বদেশবাসীকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন কেমন করে সীমাবদ্ধ স্বার্থ অতিক্রম করে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ প্রচেষ্টায় চিত্তকে প্রশস্ত ও উদার করা যায়। ভারতের মানবপ্রেমিকশ্রেষ্ঠ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিংশশতাব্দীর প্রথমভাগে যে-দুজন মহাপুরুষ ভারতের ইতিহাস বিবৃত করে জাতীয়জীবনের শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন—তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি।

এ'দের দুজনের তুলনামূলক আলোচনা থেকে অনেক কিছু শিক্ষালাভ করা যায়। জ্ঞান, বুদ্ধি ও মানসপ্রকৃতির দিক দিয়ে এ'রা ছিলেন পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আভিজাত্য গৌরবের অধিকারী স্রষ্টা ও শিল্পী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, দরিদ্রের প্রতি দরদ নিয়ে তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হন। মূলত তিনি কিন্তু ভারতের সংস্কৃতির প্রতিভূস্বরূপ ছিলেন, তিনি যে-ধারার লোক ছিলেন সেই ধারার লোকেরা জীবনকে ও জীবনের পরিপূর্ণ প্রকাশকে নৃত্যগীত ও আনন্দের মধ্যে দিয়ে স্বীকার করে নিতে চান। গান্ধীজি ছিলেন সাধারণ লোকের প্রতিনিধি, ভারতীয় কৃষকের প্রতীক-মূর্তি। তিনি ভারতীয় সেই ধারার লোক ছিলেন যে-ধারায় জন্মেছেন ত্যাগী ও সন্ন্যাসী। অথচ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রধানত ভাবজগতের লোক এবং গান্ধীজি একাগ্র ও নিরবচ্ছিন্নভাবে ছিলেন কর্মজগতের। তাঁদের পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক হলেও দুজনেই একান্তভাবে ভারতীয় ছিলেন এবং সেই জন্যই সত্যকার বিশ্বমানব হতে পেরেছিলেন। তাঁদের এই পার্থক্যের মধ্যেও কোথাও একটা পারস্পরিক সঙ্গতি ছিল —তাঁরা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হতে পেরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি আমাদের আধুনিক যুগের দেহলিতে এনে দিয়েছেন। আমরা কিন্তু তাঁদের অব্যবহিত পূর্বেকার যুগের প্রসঙ্গ আলোচনা করছিলাম। ভারতের অতীত গৌরবের উপর বিবেকানন্দ ও আরও কেউ কেউ যে-জোর দিয়েছিলেন ও তার ফলে জনসাধারণ এবং বিশেষভাবে হিন্দুসমাজের উপর কি প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল—এই ছিল আমাদের আলোচ্য বিষয়। বিবেকানন্দ নিজে কিন্তু সর্বদা জনসাধারণকে সতর্ক করে দিয়েছেন অতীত নিয়ে আমরা যেন খুব বেশি বাড়াবাড়ি না করি, সামনের দিকে আমরা যেন তাকাই। তিনি লিখে গেছেন, 'হে ভগবান, অনবরত অতীতের মোহ থেকে দেশ কবে মুক্ত হবে।' কিন্তু তিনি স্বয়ং এবং তাঁর সহধর্মী আরও কেউ কেউ এই অতীতের বোধন করেছিলেন। অতীতের একটি অপরিহার্য মোহ আছে যা থেকে কেউ সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে না।

এই পিছন পানে ফিরে চাওয়া ও অতীতের গৌরব নিয়ে মানসিক স্বস্তি ও আত্ম-প্রসাদলাভ করা, অনেক পরিমাণে এর জন্য দায়ী হল অতীতের সাহিত্য ও ইতিহাস নূতন করে পড়া। পূর্বসমুদ্রে ভারতের উপনিবেশগুলি আবিষ্কারের গল্পও এবিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে সহায়তা করেছিল। আধ্যাত্মিক দিক থেকে ও জাতিগত ঐতিহ্যের দিক থেকে হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণীর আস্থা বৃদ্ধির কাজে মিসেস অ্যানি বেশান্তের প্রভাব খুব বেশি কার্যকরী হয়েছিল। এই পুনর্জাগরণের মধ্যে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের পশ্চাতে কাজ করছিল একটা রাজনৈতিক চেতনা। মধ্যবিত্তশ্রেণী তখন সবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে, নিছক ধর্মের সন্ধান তাদের কাম্য ছিল না, তারা মূলত প্রাচীন সংস্কৃতির শিকড়টাকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল। এমন একটা অবলম্বন তারা চাইছিল যা তাদের নিজেদের উপযোগিতা বিষয়ে নিঃসন্দেহ করতে পারে এবং যা বিদেশী-শাসনপ্রসূত ব্যর্থতা ও গ্লানি থেকে তাদের অন্তত আংশিক পরিমাণে মুক্ত

করতে পারে। যে-কোনো দেশেই দেখতে পাই জাতীয়ভাব উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে, কেবল ধর্মের ক্ষেত্রে নয় অন্য দিক থেকেও অতীত গৌরব আবিষ্কারের জন্য একটা অন্বেষণ প্রচেষ্টা চলে। ধর্মবিশ্বাস যথোচিত শক্ত রেখেও ইরান স্বেচ্ছাক্রমে তার প্রাক-ইসলাম-যুগের গৌরবময় অতীতে ফিরে গেছে এবং তখনকার উজ্জ্বল স্মৃতিকে তার আধুনিক জাতীয়তার ভিত্তি শক্ত করবার জন্য কাজে লাগিয়েছে। এরকম অন্য দেশেও ঘটেছে। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে ও মাহাত্ম্যে পুরাতনকালের ভারতবর্ষ হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান সকল ধর্মাবলম্বী লোকেরই সাধারণ উত্তরাধিকার। এই ঐতিহ্য গড়ে তুলেছেন এদের সবাইকার পিতৃপুরুষ। পরবর্তী যুগে ধর্মান্তরিত হবার ফলে তারা এই উত্তরাধিকার থেকে বিচ্যুত হয়নি। গ্রীক ও ইতালিয়ানরা খৃস্ট প্রবর্তিত ধর্ম স্বীকার করেছে সত্য, কিন্তু তাদের পূর্বপুরুষের কীর্তিকলাপ তো বিস্মৃত হয়নি। গ্রীকরা যে কীর্তি রেখে গেছে, রোমানরা যে প্রজাতন্ত্র ও বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল তার গৌরবময় স্মৃতি আজকালকার গ্রীক ও রোমান সন্তানেরা ভুলতে যাবে কেন? আজ যদি সারা ভারতবর্ষের লোক ইসলাম কিংবা খৃস্টধর্ম গ্রহণ করত, তবু তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দ্বারা তারা অনুপ্রাণিত হত এবং এমন একটা স্থৈর্য ও আত্মসম্ভ্রমের অধিকারী হত যা কেবলমাত্র দীর্ঘকালব্যাপী সভ্যতা ও জীবনসমস্যার সমাধানে বহু বিচিত্র মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে মানুষের মধ্যে বর্তায়।

আমরা যদি স্বাধীন জাতি হতাম, এদেশের সকলে মিলে যদি সম্মিলিতভাবে একটা এমন ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারতাম যাতে সকলের সমান অধিকার থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় আমাদের অতীত গৌরবও আমরা সকলে সমানভাবে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিতে পারতাম। সে-গর্ব হত সর্বসাধারণের গর্ব। মুঘল যুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে নবাগত হলেও সম্রাট এবং তার প্রধান প্রধান অমাত্যবৃন্দ এই অতীতকে নিজেদের বলে অঙ্গীকার করে নিয়েছেন এবং সর্বসাধারণের সঙ্গে এই পুরাতন গৌরবের অংশভাক্ হয়েছেন। কিন্তু ইতিহাসের বিধানে ও অন্য নানাবিধ আকস্মিক কারণের ফলে ব্যাপার হয়েছে বিপরীত, এমন সব পরিবর্তন ঘটেছে যা তার নিজস্ব গতিপথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ইতিহাসের ধারাকে অন্য পথে চালনা করেছে। এর জন্য মানুষের কূটনীতি ও দুর্বলতাও অনেক পরিমাণে দায়ী। মনে করা গিয়েছিল পাশ্চাত্যের সংঘাতে, শিল্প ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ফলে, যে-নূতন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়ে উঠল সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে একটা সাধারণ পটভূমিকা থাকবে। এক হিসাবে এটা ঘটেছে। অপরপক্ষে দেখি সামন্তপ্রথা অথবা তদনুরূপ ব্যবস্থার মধ্যে যেসব সাধারণ লোক ছিল, তাদের মধ্যে এমন সব বিভেদ দেখা দিতে লাগল যা হয়তো কোনো কালেই ছিল না অথবা থাকলেও যৎসামান্য ছিল। হিন্দু ও মুসলমান জনতার মধ্যে এককালে কোনো পার্থক্য ছিল না বললেই হয়। পুরাতনকালের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই সৌসাদৃশ্য দেখা যেত, সেখানেও দেখি চালচলন হাবভাব ছিল একই স্তরের। উভয় সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি ছিল অভিন্ন, অনেক আচার-ব্যবহার উৎসব প্রথাদি একই ধরনের

ছিল। বিভেদ সর্বপ্রথম আসে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে—চিত্তবৃত্তি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে।

গোড়াতেই বলে রাখা ভাল এই নূতন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় মুসলমানদের মধ্যে ছিল না বললেই হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা বর্জন, শিল্প-বাণিজ্যাদি পরিহার এবং সামন্তশ্রেণীগত রীতিপদ্ধতি অনুসরণের ফলে মুসলমানেরা পিছিয়ে পড়েছিল, সেই সুযোগে হিন্দু-সমাজ এগিয়ে যায় এবং নিজেদের সুবিধা করে নেয়। দৌড়-প্রতিযোগিতায় যে-পক্ষ এগিয়ে যায়, সচরাচর বাজী তারাই জেতে—হিন্দুদের বেলাও তাই ঘটেছিল। গোড়ার দিকে ইংরাজদের শাসননীতি ছিল হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন ও মুসলমানদের দাবিয়ে রাখা। একমাত্র পাঞ্জাবেই কেবল অন্য প্রদেশের তুলনায় পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানেরা কিঞ্চিদধিক উন্নত ছিল। কিন্তু পাঞ্জাবের বাইরে অন্য সব জায়গায় হিন্দুরা ছিল অগ্রগামী। পাঞ্জাব তো ইংরাজ কবলিত হয় অনেক পরে, তার আগেই হিন্দুরা নিজেদের অবস্থা অনেকখানি গুছিয়ে নিয়েছে। এমনকি পাঞ্জাবেও যদিচ সুযোগ সুবিধা উভয় সম্প্রদায়েরই প্রায় একই প্রকার ছিল, আর্থিক ব্যাপারে হিন্দুদের অবস্থা মুসলমানদের তুলনায় অনেক উন্নত ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। হিন্দু ও মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায় এবং তথাকথিত ইতরজনের মধ্যে বিদেশী-বিদ্বেষ ছিল পুরোমাত্রায়। ১৮৫৭ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয় এই দুই সম্প্রদায়ের সাধারণ প্রচেষ্টার ফলে; কিন্তু এই বিদ্রোহ প্রশমনের দুঃখটা মুসলমানদেরই বেশি করে লাগে কারণ অত্যাচারটাও তাদের উপর দিয়েই বেশি হয়। এই বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর মুসলমান সাম্রাজ্য পুনর্গঠিত করার সকল স্বপ্ন অলীক কল্পনার মত ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ইংরাজ আসরে নামবার আগেই বাস্তবিকপক্ষে এই সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব কিছু ছিল না। মারাঠারা ইতিপূর্বে মুঘল-দর্প চূর্ণ করে দিয়েছিল এবং দিল্লী তখন ছিল তাদেরই আওতার মধ্যে। পাঞ্জাবে রাজত্ব করছিলেন রণজিৎ সিংহ। ইংরাজদের হস্তক্ষেপ করার আগেই উত্তর-ভারতে মুঘল শাসন অন্তর্হিত হয়েছিল আর দক্ষিণ-ভারতে মুঘল প্রভাব তো তার পূর্বেই লয় পেয়েছিল। তবু দিল্লীর প্রাসাদে ছায়ামূর্তির মত, মাত্র নামে একজন সম্রাট বসে ছিলেন এবং যদিচ তিনি প্রথম মারাঠাদের ও তৎপরে ইংরাজদের বরাদ্দ মাসোহারার উপর নির্ভর করতেন, তবু একটা বিখ্যাত বংশের প্রতীকস্বরূপ তিনি ছিলেন তো। সম্রাটের নিজস্ব অক্ষমতা এবং অসহায় অবস্থা সত্ত্বেও বিদ্রোহীরা নিজেদের কাজ হাসিল করবার উদ্দেশ্যে এই প্রতীকটিকে সাক্ষীগোপালরূপে খাড়া করতে চেয়েছিল। বিদ্রোহদমনের সঙ্গে সঙ্গে মুঘল সাম্রাজ্যের এই শেষ চিহ্নটুকুও অপসারিত হয়।

যে-সময়টা লোকে বিদ্রোহের বিভীষিকা থেকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে সে-সময় তাদের মনের মধ্যে ছিল একটা বিরাট শূন্যতা, একটা কিছুর দরকার ছিল তখন এই ফাঁক ভরাবার জন্য। ব্রিটিশ শাসন মেনে না নেওয়ার উপায় ছিল না। কিন্তু পুরাতনকালের সঙ্গে এই বিচ্ছেদের ফলে কেবল একটা নূতন শাসনতন্ত্র এদেশে চালু হল—তা নয়। সঙ্গে সঙ্গে এল একটা দারুণ দিশেহারা সংশয়ের ভাব—যার ফলে মানুষ আত্মপ্রত্যয় হারিয়ে ফেলল। এই যে কালগত বিচ্ছেদ এটা অবশ্য

বিদ্রোহের অনেক পূর্বেই সংঘটিত হয়েছিল এবং এরই ফলে বাঙলাদেশে ও অন্যত্র অনেক নূতন নূতন চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়েছিল। এই মানসিক সমুদ্রমন্থন সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। বাইরের সংঘাতে শামুক যেমন তার নিজের খোলের মধ্যে ঢোকে, মুসলমানেরাও তেমনি পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্রব সযত্নে এড়িয়ে, নিভৃতে নিজেদের মনে মনে মুঘল মসনদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিবাস্বপ্নে ভোর হয়ে কালক্ষেপ করতে লাগল। কিন্তু আর তো স্বপ্ন দেখলে চলে না। বাস্তব অবলম্বন এমন একটা কিছু দরকার যা আঁকড়ে ধরে রাখা চলে। নূতন শিক্ষাব্যবস্থা থেকে এখনও তারা দূরে দূরেই থেকে গেল। ধীরে ধীরে অনেক তর্ক-বিতর্ক, বহু বাধা অতিক্রম করার পর স্যার সুলতান আহ্মদ খান ইংরাজি শিক্ষার দিকে তাদের মনকে চালনা করলেন। এইভাবে আলিগড় কলেজের পত্তন হল। সরকারী চাকরিতে প্রবেশ করার একমাত্র পথ হল ইংরাজি শিক্ষা। চাকরির মোহ এমন জিনিস যার ফলে পুরাতন বিদ্বেষ ও বিরুদ্ধ সংস্কার—সব কিছু জয় করা যায়। হিন্দুরা যে শিক্ষা এবং চাকরির ক্ষেত্রে তাদের পিছনে ফেলে বহুদূর এগিয়ে গেছে—এটা মুসলমানদের ভাল লাগত না—শেষ পর্যন্ত এই ভাল-না-লাগাটাই শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মস্ত বড় একটা যুক্তি হয়ে উঠল। পার্সি এবং হিন্দুরা যে ব্যবসা-বাণিজ্যে এগিয়ে যাচ্ছে, এটা আর তাদের চোখে পড়ল না, তাদের নজর পড়ল এক কেবল সরকারী চাকরির দিকে।

এই নূতন শিক্ষার দিকে মুসলমানদের কর্মপ্রচেষ্টা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এতে সমগ্র মুসলমান সমাজের সন্দেহ ও সংশয়ের ভাব কাটেনি। অনুরূপ অবস্থায় হিন্দুরা তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে দিয়ে একটা সংহতির সন্ধান করেছে। অতীতের দর্শন ও সাহিত্য, শিল্প ও ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে তারা সান্ত্বনা-লাভের প্রয়াস পেয়েছে। রামমোহন রায়, দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ প্রমুখ চিন্তাজগতের নেতারা নূতন নূতন চিন্তাধারা এনে দিয়েছেন। একদিকে তারা ইংরাজি সাহিত্যের সুগভীর উৎস থেকে প্রেরণা লাভ করেছে, অপরদিকে তাদের মনে প্রাচীনকালের ভারতীয় মুনিঋষি ও বীরপুরুষের কীর্তিকাহিনী গভীরভাবে দাগ কেটেছে। পিতৃপুরুষের ভাবনাচিন্তা, কাজকর্ম—পুরাণ ও কিম্বদন্তীসূত্রে শৈশব থেকে তাদের মধ্যে মজ্জাগত হয়ে গেছে।

মুসলমান জনসাধারণ এই ঐতিহ্য সম্পদের সঙ্গে সুপরিচিত ছিল, হিন্দুদের অনেক আচারব্যবহারের সঙ্গে তাদের নাড়ীগত যোগ ছিল। কিন্তু অভিজাত ও ধনী মুসলমানেরা ভাবলেন হিন্দুধর্মের সঙ্গে যোগযুক্ত এই সমস্ত প্রথার সঙ্গে যোগরক্ষা করা তাদের পক্ষে শোভন হবে না, এগুলিকে প্রশ্রয় দিলে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করা হবে। জাতীয় ঐতিহ্যের মূল সন্ধান করতে গেল তারা অন্যত্র। পাঠান ও মুঘল রাজত্বের ইতিহাসে তারা এই ঐতিহ্য কিয়ৎপরিমাণে সন্ধান করে পেল অবশ্য, কিন্তু যতটুকু পেল তাতে মন ভরে না, একটা শূন্যতা থেকে যায়। এইসব রাজত্বকালের ইতিহাস একচেটিয়া মুসলমানদের কীর্তিকলাপের বিবরণ তো নয়, এই সময়কার ঐতিহ্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় যৌথভাবে গড়ে তুলেছিল। হিন্দুরা পাঠান

মুঘলদের অনাহূত বিদেশী আক্রমণকারীরূপে আর দেখত না। মুঘল সম্রাটেরা তাদের কাছে ছিলেন এই ভারতেরই অধিবাসী শাসনকর্তা। এক কেবল ঔরঙ্গজীবের বেলা এই ধারণার ব্যত্যয় ঘটেছিল। এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য, সম্রাট আকবর তাঁর হিন্দু প্রজাদের মনোরঞ্জন করেছিলেন ও তাদের প্রীতি লাভ করেছিলেন, আজকাল আকবরের হিন্দুদের প্রতি অবিদ্বেষভাব অনেক মুসলমানের কাছে সমালোচনা ও কটাক্ষের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত বৎসর ভারতে আকবরের ৪০০তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকল শ্রেণীর লোক—তাদের মধ্যে মুসলমানও অনেকে এই উৎসবে যোগ দিয়েছিল। এক কেবল মুসলিম লীগ এই উৎসব থেকে দূরে দাঁড়িয়েছিল। ভারতের একতার প্রতীক ছিলেন বলেই হয়তো লীগপন্থীরা আকবরকে সুনজরে দেখতে পারেনি।

ঐতিহ্যের মূল খুঁজতে গিয়ে মধ্যবিত্তশ্রেণীর কোনো কোনো ভারতীয় মুসলমান ঐস্লামিক ইতিহাস অনুধাবন করে যে-যুগে যুদ্ধবিগ্রহ তথা সভ্যতাসৃষ্টির ক্ষেত্রে ইসলাম বোগদাদ, স্পেন, কনস্তান্তিনোপ্‌ল্, মধ্য এশিয়া ও অন্যান্য ভূখণ্ডে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল—সেই সব অধ্যায় খুঁজে বের করেছে। এই ইতিহাস এবং প্রতিবেশী ঐস্লামিক রাজ্যের সঙ্গে এদের অল্পবিস্তর যোগাযোগ পূর্ব থেকেই ছিল। এ-ছাড়া ছিল মক্কার হজতীর্থে যাত্রা—সেখানে বহু দেশের মুসলমান একত্র মেলবার সুযোগ লাভ করত। মোটের উপর এসব যোগাযোগ ছিল সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ এবং অগভীর, এতে মুসলমান জনসাধারণের মনে খুব বেশি প্রভাব গিয়ে পড়ত না, তাদের দৃষ্টি মূলত ভারতের সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ থাকত। দিল্লীর পাঠান বাদশাহেরা এবং বিশেষ করে মহম্মদ তুঘলক কায়রোর ধর্মগুরুকে 'খলিফা' বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত কনস্তান্তিনোপ্‌ল্-এর অটোম্যান সম্রাটেরা খলিফা বলে স্বীকৃত হন, ভারতীয় মুসলমানেরা কিন্তু তুর্ক সম্রাটকে খলিফা বলে মেনে নেয়নি। মুঘল সম্রাটেরাও ভারতের বাইরের কোনো ধর্মগুরুকে স্বীকার করে নেননি। উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে মুসলিম শক্তির সম্পূর্ণ পরাভবের পর তুর্কি সুলতানের নাম সর্বপ্রথম ভারতের মসজিদে শোনা যেতে শুরু করে। সিপাহী বিদ্রোহের পর তুর্কি সুলতানকে মুসলমান জগতের ধর্মগুরু করার প্রস্তাব আরও বেশি করে শোনা যেতে থাকে।

ভারতের বাইরে ইসলামের পুরাতন গৌরবের কথা স্মরণ করে ভারতের মুসলমানেরা কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চেয়েছিল। তাদের আত্মপ্রসাদের আর একটি হেতুস্বরূপ ছিল তুরস্ক—এক বোধ হয় তুরস্কই কেবল স্বাধীন মুসলিম শক্তিরূপে তখনও টিকে ছিল। ভারতীয় মুসলমানদের এই আত্মপ্রসাদ তাদের জাতীয় ভাবের পরিপন্থী কিংবা বিরোধী ছিল না। সত্য বলতে কি, বহু হিন্দু ইসলামের প্রাচীন গৌরব ও তাদের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয়সূত্রে যুক্ত হতে চাইতেন ও তাদের ঐতিহ্যের প্রতি রীতিমত শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তুরস্কের প্রতি তাদের আন্তরিক সহানুভূতি ছিল, কারণ তাদের চোখে তুরস্ক যুযুধান ইউরোপ দ্বারা অত্যাচারিত এশিয়ার প্রতিনিধিস্থানীয়। তবে

এ-বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মনোগত একটা পার্থক্য ছিল. মুসলিম ঐতিহ্য স্মরণ করে মুসলমানেরা যেরূপ আত্মগৌরব অনুভব করত, হিন্দুদের বেলা সেরূপ হওয়া সম্ভবপর ছিল না একথা বলাই বাহুল্য।

সিপাহীবিদ্রোহের পর মুসলমান সমাজ ছিল একটা মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে, কোন পথে তারা যাবে এটা ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারছিল না। ব্রিটিশ সরকার স্বেচ্ছাপূর্বক হিন্দুদের চাইতে মুসলমানদের দাবিয়ে রেখেছিল বেশি। এই মুসলমান-দলনের চোটটা পড়েছিল বেশি করে সমাজের এমন একটা শ্রেণীর উপর, যে-শ্রেণী থেকে মুসলমানদের নূতন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অথবা বুর্জোয়া শ্রেণীর উৎপত্তি হতে পারত। এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে হতাশার অন্ত ছিল না, এরা একদিকে হয়ে দাঁড়াল ব্রিটিশ-বিদ্বেষী, অন্যদিকে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল। ১৮৭০ অব্দের কাছাকাছি ব্রিটিশ প্রভুরা এই মুসলমান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতি কিঞ্চিৎ সদয় হতে আরম্ভ করলেন। ভারসাম্য রক্ষার যে-নীতি ইংরাজ এতাবৎকাল অনুসরণ করে এসেছে, এই পরিবর্তন এল তারই ফলে। এটা বলতেই হবে যে এদিক থেকে স্যর সৈয়দ আহমদ খানের দান খুব কম নয়। তিনি একথা স্থিরনিশ্চিতভাবে বুঝেছিলেন যে ব্রিটিশ প্রভুদের সঙ্গে সহযোগিতা করা ছাড়া মুসলমান সমাজের উন্নতির আশা নেই। তিনি বিশেষ আগ্রহভরে চেয়েছিলেন মুসলমানেরা যেন ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণ করে ও তাদের গোঁড়ামির কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে। ইউরোপীয় সভ্যতার যতটুকু পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন তা স্যর সৈয়দের মনের উপর গভীরভাবে রেখাপাত করে—ইউরোপ থেকে লেখা তাঁর কয়েকটি চিঠি থেকে এমনও মনে হয় যে এই নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করে তাঁর চোখ একটু যেন ধাঁধিয়ে গিয়েছিল, তিনি বোধ হয় তাঁর মতামত ও মনোভাবে ঠিক ওজনটা রাখতে পারেননি।

স্যর সৈয়দ আহমদ ছিলেন একজন উৎসাহী সমাজসংস্কারক; তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে ইসলামের সংযোগসাধন করতে চেয়েছিলেন। তিনি জানতেন মূলগত কোনো ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত করে সংস্কার হয় না, ধর্মশাস্ত্রকে বিচার ও যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই তা সম্ভবপর হবে। ইসলাম ও খৃস্টীয় ধর্মের মধ্যে সৌসাদৃশ্যের প্রতি তিনি অঙ্গুলিনির্দেশ করলেন। তিনি পর্দা অর্থাৎ মেয়েদের জেনানার মধ্যে অবরোধপ্রথাকে যুক্তির সাহায্যে আঘাত করলেন। তুরস্কের খিলাফতের প্রতি বশ্যতা স্বীকারে তাঁর আপত্তি ছিল। সর্বোপরি তিনি চাইলেন মুসলমানদের মধ্যে নূতন একটা শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে। জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাতে তিনি আশঙ্কিত হয়েছিলেন, তাঁর ভয় হয়েছিল যে ব্রিটিশ শাসনের কোনোপ্রকার বিরুদ্ধাচরণ করতে গেলে, শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরাজের সহায়তা পাওয়া যাবে না। এই সহায়তা তাঁর কাছে অবশ্য কাম্য মনে হওয়ায় তিনি মুসলমানদের মধ্যে ইংরাজবিদ্বেষ প্রশমিত করতে চাইলেন। জাতীয় মহাসভা অর্থাৎ কংগ্রেসের তখন সবেমাত্র পত্তন হয়েছে, তিনি চাইলেন মুসলমানেরা যেন কংগ্রেস থেকে দূরে দূরে থাকে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আলিগড় কলেজের প্রচারিত উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম উদ্দেশ্য

ছিল 'ভারতীয় মুসলমানকে ইংরাজ সম্রাটের উত্তম ও রাজভক্ত প্রজারূপে পরিণত করা।' কংগ্রেস প্রধানত হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলে যে তিনি তার বিরোধিতা করেছিলেন এমন নয়। তাঁর বিরুদ্ধতার কারণ হল—প্রথমত তিনি ভেবেছিলেন যে কংগ্রেস রাজনীতিক দিক থেকে বড় বেশি উগ্রপন্থী (তখনকার দিনে কংগ্রেসের উগ্রমূর্তি ছিল না বললেই চলে), এবং দ্বিতীয়ত তাঁর লক্ষ্য ছিল ইংরাজের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করা। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায় সিপাহী বিদ্রোহে যোগদান করেনি, এমন অনেক মুসলমান ছিল যারা বিদ্রোহের সময়েও সরকার বাহাদুরের অনুগত ছিল। তাঁকে কিছুতেই হিন্দুবিদ্বেষী কিংবা সাম্প্রদায়িকতাদোষদুষ্ট বলা চলে না। বারবার তিনি বলে গেছেন রাজনীতি কিংবা জাতীয়তার ক্ষেত্রে ধর্মগত পার্থক্যের কোনো স্থান নেই। তিনি বলে গেছেন, 'একই দেশে তোমরা বসবাস কর না কি? মনে রেখ হিন্দু ও মুসলমান এই দু'টি পৃথক নামের স্থান হল কেবল ধর্মের ক্ষেত্রে। ধর্মকে বাদ দিলে হিন্দু, মুসলমান এমনকি খৃস্টানও—যত লোক এদেশের অধিবাসী, তারা সকলেই রাজনীতির ক্ষেত্রে একজাতিভুক্ত।'

স্যর সৈয়দ আহমদ খানের প্রভাব মুসলমান সমাজের কেবল উপরের স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, শহর কিংবা গ্রামাঞ্চলের সাধারণ জনসমাজের উপর এই প্রভাব গিয়ে পড়েনি। এই বিরাট জনসংঘের সঙ্গে অভিজাতশ্রেণীর কোনো যোগাযোগ ছিল না বললেই হয়, বরঞ্চ এদের সঙ্গে অধিকতর নিকট সম্বন্ধ ছিল হিন্দু জনসমাজের সঙ্গে। মুসলিম অভিজাতশ্রেণীর কেউ কেউ ছিল মুঘল আমলের উচ্চতন রাজকর্মচারী শাসকশ্রেণীভুক্ত, সাধারণ লোকের মধ্যে এই রকম পারম্পর্য সম্বন্ধ বা ঐতিহ্য ছিল না বললেই হয়। এদের অধিকাংশ লোক ছিল হিন্দুসমাজের নিম্নতম শ্রেণী থেকে ধর্মান্তরিত। সবচেয়ে দরিদ্র ও সবচেয়ে উৎপীড়িত সর্বহারাদের দলে ছিল এদের স্থান।

স্যর সৈয়দের সহকারীদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন বিশেষভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন খ্যাতনামা লোক। তিনি বিচার ও যুক্তির পথে সমাজসংস্কার করতে চেয়েছিলেন, তাঁর এই কাজে যাঁরা সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে সৈয়দ চিরাগ আলি ও নবাব মোহসিন-উল-মুল্‌ক্‌-এর নাম উল্লেখযোগ্য। শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর কাজে উৎসাহ দিয়েছিলেন মুন্সী কেরামত আলি, দিল্লীর অধিবাসী মুন্সী জাকাউল্লা, ডক্টর নাজির আহমদ, মৌলানা শিবলি নোমানি এবং উর্দুসাহিত্যের একজন নামজাদা কবি —হালি। মুসলমান সমাজে ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্তনে ও রাজনীতিক আন্দোলন থেকে মুসলমানদের দূরে রাখবার কাজে স্যর সৈয়দ কৃতকার্য হতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রেরণায় 'মুসলমান শিক্ষা সম্মেলন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং এর ফলে মুসলিম সমাজের বর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকরির দিকে ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

এসব সত্ত্বেও কোনো কোনো প্রখ্যাতনামা মুসলমান জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান

করেন। ইংরাজদের শাসননীতি ক্রমেই জাতীয় আন্দোলনবিরোধী মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাত দেখাতে শুরু করে। কিন্তু বিংশ শতকের গোড়ার দিকে মুসলমান তরুণ সম্প্রদায় রাজনীতিক কার্যকলাপ ও জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করার আগ্রহ দেখায়। এই উৎসাহ ভিন্ন পথে চালনা করবার উদ্দেশ্যে একটি নিরাপদ রাস্তা আবিষ্কৃত হয় ১৯০৬ অব্দে। ব্রিটিশ সরকারের তাঁবেদার আগা খানের নেতৃত্বে ঐ বছরে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। লীগ-এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দুটি—ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন এবং মুসলমানদের সম্প্রদায়গত স্বার্থসংরক্ষণ।

এটা উল্লেখ করা উচিত যে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে বিদ্রোহ-পরবর্তী-যুগে যাঁরা নেতৃস্থানীয় হয়েছিলেন, এমনকি স্যর সুলতান আহমদ খানও, পুরাতন রীতি অনুসারে মাদ্রাসায় মক্তবে প্রথাগত ঐস্লামিক শিক্ষা আয়ত্ত করেছিলেন। এ'দেরই মধ্যে কেউ কেউ পরবর্তীকালে কিছু কিছু ইংরাজি শিক্ষালাভ করে নূতন চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। নূতন পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যিনি সমাজে খ্যাতিলাভের যোগ্য বিবেচিত হতে পারতেন। উর্দু কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ঊনবিংশ শতকের ভারতীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ঘালিব, বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্বেকার সময়ে তরুণবয়স্ক ছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে মুসলমান বিদ্বৎসমাজে দুই রকমের চিন্তাধারা দেখা যায়। একদিকে দেখি তরুণ সম্প্রদায় জাতীয় আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। অন্যদিকে কেউ কেউ ভারতের সমস্ত বন্ধন—কি অতীতের কি বর্তমানের—ছিন্ন করে, ঐস্লামিক দেশগুলির এবং বিশেষ করে খিলাফতের পীঠস্থান তুরস্কের দিকে ঝুঁকেছে। তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদ যে সর্ব-ঐস্লামীয় আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, সেই আন্দোলনে ভারতীয় মুসলমান সমাজের উপরিস্তরের কোনো কোনো লোক সাড়া দেন। স্যর সৈয়দ আহমদ কিন্তু ভারতীয়দের এই আন্দোলনে যোগ দেবার পক্ষে ছিলেন না। তুরস্ক কিংবা তুরস্কের সুলতানী-বিষয়ে ভারতীয় মুসলমানেরা যেন অনর্থক মাথা না ঘামায়—এরূপ কথাও তিনি লিখেছিলেন। তুরস্কের যুবতুর্কী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল মিশ্র ধরনের। অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমান এই আন্দোলন সম্বন্ধে গোড়ার দিকে শঙ্কা ও সন্দেহ প্রকাশ করেন। সুলতানের প্রতি সাধারণভাবে সকলেরই একটা সহানুভূতির ভাব বর্তমান ছিল। তুরস্কে ইউরোপীয় শক্তিসমূহের কূটনীতিক চাল তিনি প্রতিরোধ করবেন—এই ছিল তাদের বিশ্বাস। আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ কয়েকজন ছিলেন যাঁরা সাগ্রহে যুবতুর্কি আন্দোলনকে স্বাগত করে নেন। এই আন্দোলনের মধ্যে শাসননৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের যে-বীজটুকু প্রচ্ছন্ন ছিল, তা যেন তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন। ১৯১১ সালের ত্রিপোলি যুদ্ধে ইতালি যখন আচমকা তুরস্ক আক্রমণ করে, এবং তারও পরে ১৯১২-১৩ অব্দের বল্কান যুদ্ধের সময় অসহায় তুরস্কের প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের সহানুভূতি এদেশে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। সকল ভারতীয়ই সাধারণভাবে ছিল তুরস্কের প্রতি সহানুভূতিশীল, কিন্তু মুসলমানদের মনোভাবে এমন

একটা দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার প্রকাশ পেয়েছিল যা সচরাচর ব্যক্তিগত ব্যাপারেই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। মুসলমান-শক্তির সর্বশেষ প্রতীক তুরস্ক আজ নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে, ইসলামের ভবিষ্যৎ আশাভরসা নির্মূল হতে চলেছে, এতে কি ভারতীয় মুসলমান স্থির থাকতে পারে। ডক্টর এম. এ. আনসারী কয়েকজন চিকিৎসক ও ওষুধপত্র নিয়ে ছুটে গেলেন তুরস্কে। এই মেডিকেল মিশনের জন্য ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলে অকাতরে চাঁদা দিলেন। এত টাকা উঠল এবং এত সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে, যে এরকমটি পূর্বে কখনও ঘটেনি। ভারতের মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্যও আগে কখনও এত টাকা ওঠেনি। এই এক অর্থসাহায্য দেওয়া ছাড়া তারা আর কিই বা দিতে পারে, কিই বা করতে পারে। তুরস্কের যুদ্ধ শেষ হল। এবার মুসলমানদের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ প্রকাশ পেল খিলাফত আন্দোলনের আকারে।

মুসলিম মানসের পরিণতির দিক থেকে ১৯১২ অব্দ ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয়। ঐ বছরেই মুসলমানেরা দুইটি নূতন সাপ্তাহিক প্রকাশ করে—উর্দুভাষায় 'অল্-হিলাল্' এবং ইংরাজিতে 'দি কমরেড্।' 'অল্-হিলাল্'-এর সূত্রপাত করেন বর্তমান কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আবুল কালাম আজাদ। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৪ বছর। তরুণ বয়সে তিনি কায়রোর অল-অজহর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে এসেছেন এবং অতি অল্প বয়সেই আরবীয় ও ফার্সি সাহিত্যে তাঁর ব্যুৎপত্তি ও গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য বিদ্বৎসমাজে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন। এই গভীর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ছিল তাঁর ভারতবহিঃস্থ ইসলাম জগৎ ও সেখানকার সংস্কার আন্দোলনের বিষয়ে জ্ঞান এবং ইউরোপীয় রাজনীতির সঙ্গে পরিচয়। ইসলামের ঐতিহ্যে পারঙ্গম হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন একান্তভাবে যুক্তিবাদী, এই যুক্তির দিক থেকে তিনি ইসলামের ধর্মগ্রন্থাদির ব্যাখ্যা করতেন। একদিকে ইসলামের অতীত ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ, অন্যদিকে তাঁর ছিল ঈজিপ্ট, তুরস্ক, সীরিয়া, পালেস্তীন, ইরাক ও ইরান প্রভৃতি ঐস্লামিক দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়। এই সব দেশের সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে যেসব ঘটনা ঘটেছিল, সেগুলি আজাদের মনে যেমন দাগ কেটেছিল তেমন বোধ হয় অপর কোনো ভারতীয় মুসলমানের বেলা হয়নি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তুরস্ককে যেসব যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হয়, তার জন্য তুরস্কের প্রতি তাঁর মন গভীর সমবেদনায় পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু তা হলে কি হয়, পরিণত-বয়স্ক মুসলমান নেতারা তুরস্ক-সমস্যাকে যে-দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন, আজাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তা অপেক্ষা নানা দিক থেকে ভিন্ন। তাঁর দৃষ্টি ছিল উদার, তিনি সব জিনিসটা দেখেছিলেন বিচারবুদ্ধির দিক থেকে। যা সামন্ততান্ত্রিক, যা সঙ্কীর্ণভাবে ধর্মসম্প্রদায়গত স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—মোটকথা প্রবীণ মুসলমান নেতৃবৃন্দের তাঁদের স্বধর্মী লোকদের পৃথকীকরণের যেসব চেষ্টা চলছিল—আবুল কালাম আজাদ সে-সমস্ত সযত্নে পরিহার করে নিছক জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীরূপে নিজেকে প্রকাশিত করলেন। তুরস্কে ও অন্যান্য মুসলিম দেশে জাতীয়তাবাদের যে-প্রকাশ তিনি দেখেছিলেন, সেই জ্ঞান তিনি প্রয়োগ করলেন ভারতের ক্ষেত্রে এবং বুঝতে

পারলেন যে এদেশের জাতীয় আন্দোলনে একই প্রকারের সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। অন্যান্য ভারতীয় মুসলমানদের বহির্জগতের এই আন্দোলন সম্বন্ধে কোনো ধারণা একপ্রকার ছিল না বললেই হয়। সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়ার মধ্যে পরিবর্ধিত হওয়ার ফলে অন্যান্য দেশে কি ঘটেছে সে সম্বন্ধে তারা একপ্রকার অজ্ঞই ছিল। তাদের ভাবনা-চিন্তা সবই ছিল ধর্মসম্প্রদায়গত। এই এক ধর্মের বন্ধন ছিল বলেই তুরস্কের বিষয়ে তাদের সহানুভূতির উদ্রেক হয়েছিল। এই গভীর সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও তারা তুরস্কের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি, কারণ তুরস্কের জাতীয় আন্দোলনে ধর্মের বালাই ছিল না, যা ছিল তা হল রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ সংস্কারের চেষ্টা।

'অল্-হিলাল্' কাগজে আবুল কালাম আজাদ একটা নূতন সুরে কথা বললেন। কেবল চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে তাঁর ভাষা যে নূতন ছিল তা নয়, এর গঠন-সৌষ্ঠবও ছিল দৃঢ় ও পৌরুষব্যঞ্জক এবং ফার্সি শব্দ প্রয়োগের জন্য কিঞ্চিৎ জটিল। নূতন ভাবধারাকে রূপায়িত করবার জন্য তিনি নূতন ভাষার সৃষ্টি করলেন। উর্দু-ভাষার আজ যে-চেহারা আমরা দেখতে পাই, এর গঠনে অনেকখানি হাত আছে আজাদের। বলা বাহুল্য, প্রবীণ ও রক্ষণশীল নেতাদের প্রতিক্রিয়া অনুকূল হয়নি, তাঁরা আজাদের মতামত ও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে শুরু করলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে বিদ্যাবত্তায় যাঁরা শ্রেষ্ঠ—তাঁদেরও যুক্তিতর্কের ক্ষেত্রে আজাদের কাছে হার মানতে হয়েছিল। এমনকি ঐস্লামিক শাস্ত্র ও ঐতিহ্যের বিষয়েও আজাদের জ্ঞান তাঁর প্রতিপক্ষদের চেয়ে ঢের বেশি ছিল। মধ্যযুগের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অষ্টাদশ শতকের সূক্ষ্ম যুক্তিবাদ এবং আধুনিক ভাবধারার একটা অতি আশ্চর্য সংমিশ্রণ ঘটেছিল আজাদের মধ্যে।

প্রবীণ ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ আজাদের সমর্থন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন পণ্ডিতপ্রবর মৌলানা শিবলি নোমানি। ইনি স্বয়ং তুরস্কে ভ্রমণ করেছিলেন এবং আলিগড় কলেজ স্থাপনায় স্যর সৈয়দ আহমদ খান-এর সহযোগিতা করেছিলেন। আলিগড় কলেজের ধারা কিন্তু ছিল অন্যরকমের, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আলিগড় ছিল রক্ষণশীল ও প্রগতিবিরোধী। এই কলেজের ন্যাসিকরা ছিলেন নবাব জমিদার শ্রেণীর, এককথায় সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধিস্বরূপ। বছরের পর বছর এই কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিল এমন সব ইংরাজ যারা সরকারীমহলের অন্তরঙ্গ ছিল। এদের আওতায় যে-শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল তা জাতীয়তাবিরোধী ও কংগ্রেসের পরিপন্থী—তার মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম যুবসমাজ নিজেদের যেন পৃথক জাতিরূপে মনে করতে শেখে। লক্ষ্য ছিল আলিগড়ের ছাত্রেরা যেন নিম্নপদস্থ কর্মচারীরূপে সরকারী চাকরিতে প্রবেশলাভ করতে পারে। এই লক্ষ্য সাধন করতে গেলে সরকারপক্ষীয় মনোবৃত্তি থাকা দরকার। সুতরাং গোড়াতেই জাতীয়তাবাদকে বিপ্লবের নামান্তররূপে বর্জন করতেই হবে। মুসলমান সমাজে নূতন যে-বিদ্বৎগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে তার অধিকাংশ লোকই আলিগড় কলেজ দলভুক্ত। কখনও বা

খোলাখুলিভাবে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেপথ্য থেকে, এই দল প্রায় প্রত্যেকটি মুসলমান আন্দোলনকে উস্কানি দিয়েছে। মূলত এদের চেষ্টার ফলেই মুসলিম লীগ-এর উদ্ভব।

রক্ষণশীল গোঁড়ামি ও জাতীয়তাবিরোধী মনোবৃত্তির এই বিরাট অচলায়তনের ভিত্তি আবুল কালাম আজাদের আঘাতে টলমল করে উঠল। সাক্ষাৎ আক্রমণ তিনি করলেন না—এমন সব ভাবধারা তিনি বইয়ে দিলেন যে তলায় তলায় আলিগড়ের ভিত্তি ক্ষয়ে যেতে লাগল। এই তরুণবয়স্ক লেখক ও সাংবাদিক মুসলিম বিদ্বৎসমাজে একটা আলোড়নের সৃষ্টি করলেন। প্রবীণেরা যতই চোখ রাঙান না কেন, তাঁর লেখা পড়ে তরুণ সমাজে একটা সাড়া পড়ে গেল। তুরস্ক, ঈজিপ্ট ও ইরানের ঘটনাবলী, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের বিকাশ—ইত্যাদি নানা কারণে অনুকূল ক্ষেত্র পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিল। আজাদ কেবল এই স্রোতের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন—তিনি দেখালেন যে ইসলাম ও ঐস্লামিক দেশসমূহের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের সঙ্গে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের কোনো বিরোধ নেই। এর ফলে মুসলিম লীগ যেন অনেকটা কংগ্রেসের দিকে এগিয়ে এল। বালক বয়সে আজাদ স্বয়ং ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ-এর প্রথম অধিবেশনে লীগ-এর সভ্যরূপে যোগ দিয়েছিলেন।

ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিরা 'অল্-হিলাল্'-এর প্রতি সদয় ছিলেন না। প্রেস্ অ্যাক্ট্ অনুসারে এই পত্রিকার কাছ থেকে জামানত দাবি করা হয়, শেষ পর্যন্ত ১৯১৪ অব্দে এই পত্রিকার প্রেস্‌টি সরকার বাহাদুর বাজেয়াপ্ত করে নেন। মাত্র দুই বছর চলবার পর এইভাবে 'অল্-হিলাল্'-এর অপমৃত্যু ঘটে। এর পর আজাদ আর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, এর নাম ছিল 'অল-বলাগ্'। ১৯১৬ অব্দে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক আজাদ অন্তরীণ হবার সঙ্গে সঙ্গে এই কাগজটিরও প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় চার বছর আজাদ অন্তরীণ ছিলেন। মুক্তিলাভ করে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আজাদ জাতীয় কংগ্রেস-এর নেতৃবৃন্দের মধ্যে আসনলাভ করেন। তখন থেকে আজ অবধি কংগ্রেস-এর সর্বোচ্চ কর্মপরিষদে তিনি স্থান পেয়ে এসেছেন। বয়সে বৃদ্ধ না হলেও কংগ্রেস মহলে তাঁকে প্রবীণের সম্মান দেওয়া হয়। জাতীয় উন্নতির সর্ববিধ ক্ষেত্রে—সে রাজনৈতিক ব্যাপার হোক কিংবা সাম্প্রদায়িক ব্যাপার হোক—তাঁর মতামত শ্রদ্ধেয় ও মূল্যবান বলে স্বীকৃত হয়। দুইবার তিনি কংগ্রেস-এর রাষ্ট্রপতিরূপে নির্বাচিত হয়েছেন এবং বারংবার তিনি দীর্ঘমেয়াদ কারাবাসে অতিবাহন করেছেন।

১৯১২ অব্দে অ'ল্-হিলাল্ প্রকাশের কয়েক মাস পূর্বে আর একটি যে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় তার নাম ছিল 'দি কমরেড'। এই পত্রিকার ভাষা ছিল ইংরাজি, ইংরাজিশিক্ষিত মুসলমান যুবক মহলেই এর প্রভাবটা ছিল বেশি। 'কমরেড'-এর সম্পাদক মৌলানা মোহাম্মদ আলী ছিলেন এক অদ্ভুত মানুষ—তাঁর মধ্যে ঐস্লামিক সংস্কার ও অক্সফোর্ড-এর শিক্ষার একটা আশ্চর্য সংমিশ্রণ ঘটেছিল। তিনি গোড়াতে ছিলেন আলিগড় দলের লোক, রাজনৈতিক আন্দোলনের উগ্রতার তিনি ছিলেন বিরোধী। কিন্তু নিষ্ক্রিয়তার অনড় অচল কাঠামোর মধ্যে তাঁর মত কর্মীপুরুষ বদ্ধ

হয়ে থাকবেন, এ কখনও হয়? ১৯১১ অব্দে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ রদ করা হয়। এই ঘটনায় ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাঁর আস্থা ভেঙে যায়, তাদের বিশ্বাসভাজনতা সম্বন্ধে তাঁর মনে সন্দেহ জাগে। বলকান যুদ্ধ তাঁর মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয় এবং তিনি গভীর আবেগভরে তুরস্ক ও ঐস্লামিক ঐতিহ্যের সমর্থনকল্পে তাঁর কাগজে লেখেন। ক্রমে ক্রমে তিনি ব্রিটিশবিদ্বেষী হয়ে পড়েন এবং প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্কের বিপন্ন দলে যোগ দেবার পর তাঁর এই বিদ্বেষ মজ্জাগত হয়ে যায়। 'কমরেড'-এ প্রকাশিত তাঁর একটি বিখ্যাত ও সুদীর্ঘ লেখার শিরোনাম ছিল (কি বক্তৃতা, কি প্রবন্ধ লেখায়, তিনি দৈর্ঘ্যের দিক থেকে কৃপণতা করেছেন এমন অপবাদ কেউ তাঁকে দিতে পারেনি) 'তুরস্কের নির্বাচন।' এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর 'কমরেড' ছাপা সরকার কর্তৃক রহিত হয়ে যায়। এর অব্যবহিত পরে সরকার মোহাম্মদ আলী ও তদীয় ভ্রাতা সৌকত আলীকে মহাযুদ্ধের সময়টা এবং তারও পরে এক বৎসর, অন্তরীণ করে রাখেন। ১৯১৯ সালের শেষভাগে মুক্তিলাভ করেই আলী ভ্রাতৃদ্বয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। খিলাফত আন্দোলন সম্পর্কে এবং ১৯২০ সালের গোড়ার দিকে কংগ্রেস আন্দোলনে এঁরা সকলের পুরোভাগে দাঁড়িয়েছিলেন এবং সেজন্য কারাবরণও করেছিলেন। মোহাম্মদ আলী কংগ্রেস-এর এক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং বহুকাল যাবৎ কংগ্রেস-এর সর্বোচ্চ কর্মীপরিষদের সদস্যরূপে কাজ করে গেছেন। ১৯৩০ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

মোহাম্মদ আলীর মধ্যে যে-পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, সেটা এক হিসাবে সমগ্র মুসলমান সমাজের মানসজগতে পরিবর্তনের প্রতীক। যে মুসলিম লীগের উদ্ভব হয়েছিল জাতীয় আন্দোলনের ধারা থেকে মুসলমানদের পৃথক করে রাখার জন্য, যে-লীগের নেতৃত্ব করত প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততন্ত্রী সম্প্রদায়, সেই লীগকেও প্রগতিবাদী তরুণ সমাজের কাছে হার মানতে হয়েছিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও জাতীয়তাবাদের জোয়ারে লীগকে গা ভাসাতে হয়েছিল এবং ক্রমেই লীগ এসে ভিড়ছিল কংগ্রেস-এর কাছাকাছি। ১৯১৩ অব্দে লীগ তার পূর্বেকার নীতি পরিহার করে। পূর্বে তাদের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখা, এখন তার স্থান নিল স্বায়ত্তশাসনের দাবি। 'অল্-হিলাল্' কাগজে তাঁর উদ্দীপনাময় লেখার মাধ্যমে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ভারতীয় মুসলমানজগতে এই নবযুগের সূচনা করেন।

১১ : কামাল পাশা : এশিয়া মহাদেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন : ইকবাল

হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভারতবাসী সকলের কাছে কামাল পাশা জনপ্রিয়তা অর্জন করবেন এতো স্বাভাবিক। কেবল যে তিনি বিদেশী শাসনের অগৌরব থেকে তুরস্ককে মুক্ত করেছিলেন তা নয়, তুরস্ক যে খণ্ডবিচ্ছিন্ন হয়ে ভেঙেচুরে যায়নি এ তাঁরই চেষ্টার ফলে। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির এবং বিশেষ করে

ইংরাজের কূটনৈতিক সমস্ত অপচেষ্টা কামাল ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। ক্রমে যখন আতাতুর্কের শাসননীতির সম্পূর্ণ রূপ প্রকাশ পেতে লাগল, দেখা গেল তিনি ধর্মের ধার ধারেন না, সুলতানের শাসন এবং খিলাফত দুইই তিনি নির্মম হস্তে অবলুপ্ত করে দিলেন, রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থায় তিনি ধর্মবিশ্বাস জড়িত করলেন না, ধর্মের নামে যেসব সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল সেগুলি তিনি ভেঙে দিলেন। তাঁর এই কালা-পাহাড়ী আচরণে পুরাতনপন্থী মুসলমানেরা ক্ষুব্ধ হলেন, তাঁদের কাছে কামালের জনপ্রিয়তা কমে গেল। বরঞ্চ কামালের এই উগ্র আধুনিকতার বিরুদ্ধে একটা নীরব আক্রোশ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে লাগল। এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই তিনি আবার হিন্দু-মুসলিম তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে আরও গভীরভাবে সমাদরের পাত্র হয়ে উঠলেন। বিদ্রোহের পরবর্তী যুগে ভারতীয় মুসলমানেরা মুসলিম গৌরব পুনরুদ্ধারের যে একটি স্বপ্নসৌধ মনে মনে গড়ে তুলেছিল, আতাতুর্ক তা একপ্রকার ভেঙে দিলেন। আবার এল মুসলিম মানসজগতে একটা শূন্যতা। কেউ কেউ ভারতের জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করে সেই ফাঁক ভরতে চেষ্টা করলেন, (অবশ্য ইতি-পূর্বেই অনেকে এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন) কেউ কেউ সন্দেহ ও দ্বিধাভরে দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। আসলে সংঘর্ষ বাধল দুই প্রকার মনোভাবের—একদিকে সামন্ত-তান্ত্রিকতা অপরদিকে আধুনিক যুগোপযোগী চিত্তবৃত্তি। খিলাফত সংক্রান্ত গণ-আন্দোলনের ফলে সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই আন্দোলনই বা টিকতে পারল কত দিন; সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক দিক থেকে গণস্বার্থের সঙ্গে খিলাফত আন্দোলনের সম্পর্ক ছিল খুবই সামান্য। সেইজন্য এই আন্দোলনের ভিত্তি মোটেই শক্ত ছিল না। আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল ভারতের বাহিরে তুরস্কে। সেইদেশে আতাতুর্ক যখন আন্দোলনের লক্ষ্যবস্তু খিলাফতকেই বাতিল করে দিলেন, তখন সমস্ত ইমারত যেন এক মুহূর্তে ধ্বসে পড়ল। এই ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মুসলিম জনসাধারণ দিশেহারা হয়ে পড়ল, এর পর রাজনীতির পথে পা বাড়াতেই যেন তাদের মনে একটা অনিচ্ছা এসে গেল। সামন্ততান্ত্রিক নেতারা এতদিন গা ঢাকা দিয়েছিলেন, এই অনিশ্চয়তার মুহূর্তে আবার তাঁরা বেরিয়ে এলেন সুড়সুড় করে। ইংরাজ কর্তৃপক্ষের শাসননীতিই ছিল এইসব খয়ের খাঁদের জননেতারূপে তুলে ধরা, সুতরাং এবার এই পুরাতনপন্থীর দল মুসলিম রাজনীতির জগতের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু আগেকার সেই প্রতিষ্ঠা আর ফিরে পেলেন না, কারণ ইতিমধ্যে যুগই গেছে বদলে। কিঞ্চিৎ বিলম্বে হলেও মুসলমান সমাজে এবার একটা মধ্যবিত্ত-শ্রেণী মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। উপরন্তু, জাতীয় কংগ্রেসের আওতায় জনজাগরণ ও জনআন্দোলনের ঢেউও এসে লাগল এবার মুসলমানদের মধ্যে।

মুসলমান জনসমাজ এবং বিশেষ করে উক্ত সমাজের নবজাত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানসিক পটভূমিকা মূলত নির্ণীত হয় ঘটনাচক্রের দ্বারা। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এবং বিশেষ করে তরুণ মুসলমানদের উপর ঘটনা ছাড়াও একজন ব্যক্তিবিশেষের প্রভাব এসে পড়ে—এই বিশেষ ব্যক্তিটি হলেন স্যর মোহাম্মদ ইকবাল। জনগণের উপর

তাঁর প্রভাব ছিল অবশ্য যৎসামান্য। মনকে নাড়া দেবার মত জাতীয়তাবাদী ও জনপ্রিয় উর্দু কবিতা লিখে ইকবাল সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন। বলকান যুদ্ধের সময় তিনি বিশেষ করে ইসলামের বিষয়ে কাব্যরচনা করতে শুরু করেন। তদানীন্তন ঘটনাবলী এবং বিশেষ করে মুসলিমজগতের চিত্তবিক্ষেপ দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন, অপরপক্ষে তিনিই আবার মুসলমানদের স্বধর্মবোধ জাগ্রত করবার প্রেরণা দিয়েছিলেন তাঁর কাব্যের মধ্যে দিয়ে। জননেতা বলতে যা বোঝায় ইকবাল কিন্তু তা ছিলেন না। তিনি ছিলেন কবি, তিনি ছিলেন বিদগ্ধ দার্শনিক। সামন্তপ্রথার প্রতি তাঁর সহজাত প্রীতি ছিল। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণবংশে তাঁর জন্ম। উর্দু ও ফার্সি ভাষায় লিখিত উঁচুদরের কাব্যের সাহায্যে তিনি এমন একটি দার্শনিক পটভূমিকা রচনা করেন, যা মুসলমান বিদ্বৎসমাজের প্রয়োজন ছিল। এইভাবে তিনি মুসলমানদের চিত্ত হিন্দুদের অপেক্ষা পৃথক একটি খাতে চালনায় সহায়তা করেন। কবি হিসাবেই তিনি মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর জনপ্রিয়তার মস্ত একটি কারণ হল এই যে মুসলমান চিত্ত যখন একটি অবলম্বনের জন্য হাতড়ে বেড়াচ্ছিল, সেই সময় তিনি তাদের এই প্রয়োজন মেটাতে পেরেছিলেন। পুরাতন সর্ব ঐস্লামীয় আদর্শ তখন একপ্রকার অর্থহীন হয়ে পড়েছে, খিলাফত আর নেই, তুরস্ক প্রমুখ অন্য সব ঐস্লামিক দেশ তখন গভীরভাবে জাতীয়তাবাদী—অপর দেশের মুসলমানদের বিষয়ে তাদের ঔৎসুক্য নেই বললেই হয়। কেবল এশিয়াভূখণ্ডে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র তখন জাতীয়তাবাদ মানুষের মনকে একান্তভাবে অধিকার করে আছে। ভারতে জাতীয় আন্দোলন তখন শক্তি সঞ্চয় করে বারংবার ইংরাজশাসনকে প্রতিরোধ করবার জন্য উদ্যত। ভারতীয় মুসলমানের মনেও এই জাতীয়তাবোধ গভীরভাবে রেখাপাত করেছে, বহু মুসলমান জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রতী হয়েছেন। তবু একথা অনস্বীকার্য যে ভারতের এই জাতীয় আন্দোলনের নেতৃস্বরূপ ছিল হিন্দুরা, আন্দোলনের চেহারাটাই ছিল কেমন যেন হিন্দু ধরনের। সুতরাং বহু মুসলমানের মনে একটা সংশয় জাগল। কেউ কেউ এই জাতীয়তাবোধ মেনে নিয়ে, একে নিজেদের নির্বাচিত পথে চালনা করতে প্রয়াসী হলেন; অনেকে এর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েও অনিশ্চয়তা বশত দূরে দূরে থাকলেন; কেউ কেউ হিন্দুদের অপেক্ষা পৃথক একটি খাতে চলতে শুরু করলেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেদের প্রেরণা জুগিয়েছিল ইকবালের কাব্য ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী।

বিভক্ত ভারতের জন্য মুসলমানদের যে-দাবি, আমার মনে হয় এই ছিল তার পশ্চাৎপট। আরও বহুতর কারণ অবশ্য ছিল, উভয় পক্ষেরই ভুল ত্রুটি ছিল অনেক, সর্বোপরি ছিল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করার জন্য ইংরাজ সরকারের স্বেচ্ছাপূর্বক অনুসৃত নীতি। এই সমস্তের পিছনে ছিল একটা মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকা। কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণের কথা বাদ দিলে দেখা যায় মুসলিম মানসের এই বিপর্যয়ের একটা মস্ত কারণ হল মুসলমান সমাজে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভবে বিলম্ব। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলন ছাড়াও আর একটি অন্তর্দ্বন্দ্ব

দেশের ভিতরে ভিতরে কাজ করছিল, সে হল সামন্তবাদের অন্তিম প্রকাশের সঙ্গে নূতন ভাবধারার সংঘাত। জাতি এবং সম্প্রদায় উভয় ক্ষেত্রেই এই দুই ভাবের দ্বন্দ্ব চলছিল, হিন্দু-মুসলমান ও অন্যান্য গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে। জাতীয় কংগ্রেস যে-আন্দোলনের প্রতীক—সেই আন্দোলনে এই প্রগতিশীল মনোভাবের দিকে একটা আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা দেখতে পাই। পুরাতন মনোভাবের সঙ্গে এই আধুনিক চিন্তাধারার একটা সামঞ্জস্য সাধনের ইচ্ছাও দেখা যায় কংগ্রেসের মধ্যে। এই জন্যই নানা বিভিন্ন চিন্তাধারার লোকের সমাবেশ ঘটেছে কংগ্রেসের আওতায়। হিন্দুসমাজের মধ্যে অপরের সংস্রব এড়িয়ে একটা কঠিন সংস্কারের কাঠামোয় সকলকে ধরে রাখার চেষ্টা দেখা যায়। এই সামাজিক ব্যবস্থা প্রগতির পথে বাধা হয়েছে, অহিন্দুদের মনে আশংকা ও সন্দেহের উদ্রেক করেছে। কিন্তু ক্রমেই হিন্দুসমাজের এই সংস্কার ও আচারগত বন্ধন আলগা হয়ে আসছে, আজ তার এমন শক্তি নেই যে রাজনীতিক ও সামাজিক উন্নতিমূলক আন্দোলনকে তা ব্যাহত করতে পারে। জাতীয় আন্দোলন এখন নিজের থেকেই এমন একটা গতিবেগ সঞ্চয় করেছে যে এসব বাধায় তার আর কিছু আসে যায় না। মুসলমান সমাজের বেলা দেখতে পাই যে সামন্ততান্ত্রিক মনোবৃত্তি পূর্বের মতই সবল আছে এবং উচ্চস্তরের অভিজাত সম্প্রদায় মুসলমান জনগণের উপর তাদের নেতৃত্ব কায়েম রেখেছে। হিন্দু সমাজে ও মুসলমান সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে প্রায় এক প্রজন্ম বা তার চেয়েও অধিকতর কালের ব্যবধানে। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বহুতর ক্ষেত্রে। এই কালগত ব্যবধানের ফলেই মুসলমানদের মনে একটা সংশয়ের ভাব দেখতে পাওয়া যায়।

ভারত বিভাজন প্রস্তাবের প্রত্যক্ষ ফল হল পাকিস্তান পরিকল্পনা। এই পাকিস্তানের কল্পনা বহু মুসলমানদের মনে মোহ সৃষ্টি করেছে সত্য, কিন্তু এতে তাদের সমস্যার সমাধান তো হবেই না বরঞ্চ এতে সামন্তপ্রথা অধিকতর শক্তিশালী হয়ে আরও দীর্ঘ সময়ের জন্য মুসলমান জনসমাজের অর্থনৈতিক উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা করবে। গোড়াতে যদিও ইকবাল পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন, মনে হয় তাঁর শেষ বয়সে তিনি এর মধ্যে নিহিত ভ্রম ও অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে বুঝতে পেরেছিলেন। ইকবালের সঙ্গে তাঁর আলোচনার কথা লিখতে গিয়ে এডওয়ার্ড টমসন এরূপ কথার উল্লেখ করেছেন, আলাপপ্রসঙ্গে ইকবাল তাঁকে বলেছিলেন যে মুসলিম লীগ-এর একটি বাৎসরিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে তিনি পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থন করেছেন সত্য, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা এই যে পাকিস্তান সমস্ত ভারতবর্ষ এবং বিশেষ করে মুসলমানদের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। খুব সম্ভব পূর্বের ধারণা তিনি বদলেছিলেন, হয়তো পূর্বে এই প্রশ্নটিকে তিনি তেমন গুরুত্ব দেননি। তাঁর জীবনাদর্শের সঙ্গে পাকিস্তান পরিকল্পনা কিংবা দ্বিধাবিভক্ত ভারতের কোনো সামঞ্জস্য ছিল না।

শেষ বয়সে ইকবাল ক্রমেই সমাজতন্ত্রবাদের দিকে বেশি করে ঝুঁকেছিলেন।

সোভিয়েট রাশিয়ার অচিন্তিতপূর্ব উন্নতি তাঁকে বিস্ময়াপন্ন করেছিল। এমনকি, তাঁর কাব্যেরও মোড় গিয়েছিল ঘুরে। তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে, মৃত্যুশয্যা থেকে তিনি আমায় আহ্বান পাঠিয়েছিলেন। আমি সানন্দে তাঁর আদেশ শিরোধার্য করেছিলাম। নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে গিয়ে আমি বেশ বুঝেছিলাম কিছু কিছু তফাত থাকলেও, আমাদের উভয়ের মধ্যে বহু ব্যাপারে মিল ছিল এবং খুব সহজেই হয়তো আমরা পরস্পরের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারতাম। তাঁর মনে পুরাতনকালের স্মৃতিকথা ভীড় করে এসেছিল, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যাচ্ছিলেন তিনি, আমি নিজের কথা কিছু না বলে চুপ করে শুনছিলাম তাঁর কথা। ইকবাল ও তাঁর কাব্য—দুয়েরই আমি ছিলাম ভক্ত, কবি যে আমায় স্নেহ করেন ও আমার সম্বন্ধে ভাল ধারণা পোষণ করেন, তাতে আমি খুবই তৃপ্তি অনুভব করে-ছিলাম। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেবার খানিক আগে তিনি আমায় বললেন, 'জিন্না ও তোমার মধ্যে প্রভেদ কোথায় জান? জিন্না হলেন রাজনীতিক আর তুমি হলে সত্যিকার দেশভক্ত।' আমার একান্ত আশা এই যে মিস্টার জিন্না ও আমার মধ্যে এ সত্ত্বেও অনেক মিল আছে। আজকের দিনে আমার দেশভক্ত হওয়াটা এমন কিছু একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়, অবশ্য দেশভক্ত আখ্যাটাকে যদি তার সংকীর্ণ অর্থে নেওয়া হয়। ভারতের প্রতি আমার গভীর অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও, আমি বহুকাল ধরে ভেবে এসেছি যে কেবল দেশভক্তি দিয়ে দেশের সমস্যা বোঝাও যায় না, সমাধানও করা যায় না, সমস্ত পৃথিবীর সমস্যার কথা না হয় বাদই দিলাম। তবে ইকবাল নিঃসন্দেহে একটি সত্যি কথা বলে গেছেন আমার সম্বন্ধে, রাজনীতি আমায় আকৃষ্ট করেছে, পরাভূত করেছে সত্য, কিন্তু রাজনীতিক বলতে যা বোঝায় তা আমি কোনো কালেই হতে পারিনি।

১২ : বৃহদায়তন শ্রমশিল্পের উদ্ভব : তিলক ও গোখলে : পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা

হিন্দু-মুসলমান সমস্যার পটভূমির অন্বেষণে এবং পাকিস্তান ও ভারত বিভাজনের দাবির পিছনে কিরূপ দাবি কাজ করছিল তার বিশ্লেষণ চেষ্টায় আমি প্রায় অর্ধ শতাব্দী কাল একলাফে পেরিয়ে এসেছি। এই সময়ের মধ্যে বহু পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে—শাসনযন্ত্রের বাইরের দিক থেকে শুধু নয়, জনসমাজের চিত্তের ক্ষেত্রেও। ছোটখাটো শাসনতান্ত্রিক উন্নতি এদিকে-ওদিকে দু একটা যে না ঘটেছিল তা নয়। কিন্তু এগুলি সম্বন্ধে যতখানি রটনা করা হয় তেমন একটা কিছু ঘটেনি। ব্রিটিশ সরকারের একচ্ছত্র ও সর্বগ্রাসী কর্তৃত্ব এতে একটুও হ্রাস পায়নি, দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার সমাধানও এ থেকে হয়নি। ১৯১১ অব্দে লোহা ও ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠা করে ভারতে জামশেদজী টাটা বৃহদায়তন শ্রমশিল্পের ভিত্তি স্থাপন করেন। যে-জায়গায় এই কারখানাটি পত্তন হয় তার নাম দেওয়া হয়েছে জামশেদপুর। এইরূপ ভারতীয়দের কর্তৃক শিল্পপ্রতিষ্ঠার উদ্যম সরকার নেকনজরে দেখেননি—উৎসাহদানও

করেননি। মূলত আমেরিকার বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় ইস্পাত তৈরির কারখানা স্থাপিত হয়। শিশু অবস্থায় এই শ্রমশিল্প জীবন্মৃত অবস্থায় কোনোপ্রকারে টিকে ছিল, ১৯১৪-১৮ অব্দের যুদ্ধের ফলে জামশেদপুরের কারখানা অকালমৃত্যুর কবল থেকে কোনো মতে রক্ষা পায়। এর পরেও একটা এমন দুঃসময় গেছে যখন ভাবনা হয়েছিল যে ইংরাজ-উত্তমর্ণদের হাতে হয়তো কারবার তুলে দিতে হবে। জাতীয়তা-বাদীদের চেষ্টায় এই সম্ভাবনা ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল।

ভারতে একটা নূতন শ্রমিকসমাজ গড়ে উঠতে লাগল। সংঘবদ্ধহীন অসহায় তাদের অবস্থা, যে কৃষকশ্রেণী থেকে তাদের উদ্ভব সেই শ্রেণীর মতই অকিঞ্চিৎকর ছিল তাদের জীবিকার ব্যবস্থা। বেতনের হার বৃদ্ধি পাবে কিংবা তাদের অবস্থা উন্নত হবে একথা যেন ভাবাই যেত না। ধর্মঘট করে নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটানো ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার, লক্ষ লক্ষ বেকারে দেশ ভরা, আনাড়ী শ্রমিকের অভাব নেই। ১৯২০ অব্দে সর্বপ্রথম ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস সংগঠিত হয়। এই শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা এমন অধিক ছিল না যাতে ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন আনা সম্ভবপর হয়; কৃষকশ্রেণীর তুলনায় তারা ছিল সমুদ্রে এক বালতী জলের মত। ১৯২০-৩০ সালে সর্বপ্রথম শ্রমিকসঙ্ঘের কণ্ঠ শ্রুতিগোচর হল, কিন্তু তখনও তা নিতান্তই অস্পষ্ট। তাদের বক্তব্যে কেউ হয়তো কানই দিত না যদি ইতিমধ্যে রুশীয় বিদ্রোহ না হত। এই বিদ্রোহের ফলে মানুষের নজর পড়ে শ্রমিকসঙ্ঘের প্রতি, তাদের প্রতি মনোযোগ দেবার আর একটি কারণ হল বড় বড় কয়েকটি সুনিয়ন্ত্রিত সংঘবদ্ধ ধর্মঘট।

কিষাণ ছিল দেশময় ছড়িয়ে, এই কৃষিপ্রধান দেশে এদের সমস্যাই ছিল সমস্ত দেশের সমস্যা। এইসব মূঢ় মূকদের কথা কেউ ভাবত না—না রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ, না সরকার বাহাদুর। আন্দোলনের গোড়ার দিকে নেতৃত্বের স্থান অধিকার করেছিল দেশের উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও উক্ত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ আইনজীবী প্রভৃতি পেশাদার লোক। এদের লক্ষ্য ছিল দেশের শাসন ব্যাপারে কিঞ্চিৎ কর্তৃত্ব করা। জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয়েছিল ১৮৮৫ অব্দে, এই প্রতিষ্ঠান সাবালকত্ব অর্জন করার পর এদেশে এক নূতন ধরনের নেতৃত্ব দেখা দেয়। এরা ছিল নিম্ন মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর অথবা ছাত্র কিংবা তরুণ সমাজের প্রতিনিধি। ভূতপূর্ব নেতাদের মত এরা মোটেই ছিল না—সংঘর্ষ বাধাতে এরা ভয় পেত না, বিনা বাক্যব্যয়ে হুকুম তামিল করার পাত্রও এরা ছিল না, মোটের উপর সরকারকে তোয়াক্কা এরা করত কম। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে যে শক্তিশালী আন্দোলন হয় তার পুরোভাগে ছিলেন এই ধরনের কয়েকজন সুদক্ষ ও কুছপরোয়াবিহীন বাঙালী। কিন্তু এই নূতন যুগমানসের সত্যকার প্রতিনিধি ছিলেন মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক। পুরাতনপন্থীদের নেতাও ছিলেন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক একজন মারাঠি—গোপালকৃষ্ণ গোখলে। চারদিকে তখন বিদ্রোহাত্মক জিগীর তোলা হচ্ছে, মেজাজ হয়ে গেছে তেরিয়া ধরনের, দলে দলে দলা-দলি লাগে লাগে। এরূপ যাতে না ঘটে তার জন্য কংগ্রেসের সর্বজনমান্য মহাস্থবির

দেশের পিতৃপ্রতিম নেতা দাদাভাই নওরোজী তাঁর নিভৃত অবসর-জীবন থেকে বেরিয়ে এলেন শান্তি প্রচেষ্টায়। দলাদলি থামল বটে, কিন্তু সে খুবই অল্পদিনের জন্য। ১৯০৭ অব্দে সংঘর্ষ বাধল, পুরাতন মধ্যপন্থীদল জয়ী হল। এটা সম্ভব হতে পেরেছিল দুটো কারণে, প্রথমত মডারেটরা ছিল অপেক্ষাকৃত সুনিয়ন্ত্রিত দল এবং দ্বিতীয়ত তখন কংগ্রেসের মধ্যে ভোট দেবার অধিকার ছিল খুব স্বল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ। তিলক ও তাঁর গোষ্ঠীর অন্তর্গত লোকেদের প্রতি ভারতের অধিকাংশ লোকের অনুরাগ ছিল এটা অবশ্য নিঃসন্দেহে বলা চলে। সে যাই হোক, কংগ্রেসের গুরুত্ব অনেকখানি কমে যায় এবং দেশের দৃষ্টি পড়ে অন্য নানারূপ কাজকর্মের দিকে। এই সময় বাঙলাদেশে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রথম দেখা দিল। রুশিয়া ও আয়র্ল্যাণ্ড-এর বিদ্রোহাত্মক নানারূপ ঘটনার দৃষ্টান্তে বাঙালী যুবকের প্রাণ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে।

কিছু কিছু মুসলমান তরুণও বিদ্রোহাত্মক ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এই মনোভাব যাতে মাথা চাড়া দিয়ে না উঠতে পারে, তার জন্য চেষ্টা করেছিল আলিগড় কলেজ। এবার সরকার বাহাদুরের প্ররোচনায় আগা খাঁ ও অন্য অনেকে, মুসলমানদের জন্য তাঁদের নিজস্ব একটি রাজনীতি চর্চার প্রতিষ্ঠান পত্তন করলে। কংগ্রেস থেকে মুসলমানদের তফাতে রাখা এই ছিল এর ভিতরকার উদ্দেশ্য। এই প্রতিষ্ঠানই হল মুসলিম লীগ। ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের দিক থেকে আরও একটি গুরুত্ব-পূর্ণ ঘটনা হল মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন। এখন থেকে কেবল-মাত্র মুসলমান নির্বাচক মণ্ডলীই মুসলমান প্রতিনিধি নির্বাচন করবার অধিকার পেল। মুসলমান সম্প্রদায়কে ঘিরে একটি বেড়া তুলে দেওয়া হল, ব্যবস্থা হল ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে মুসলমানদের পৃথগীকরণের। সমন্বয় ও একতা সাধনের জন্য বহু শতাব্দী ধরে একটা যে ঐতিহাসিক ক্রিয়া চলে আসছিল এদেশে, শ্রমশিল্পের উন্নতির ফলে যে-একতা অতি দ্রুত বাস্তব রূপ গ্রহণ করতে চলেছিল, এখন তার উলটোমুখে রাজনীতির ধারা বইয়ে দেওয়া হল। গোড়াতে ব্যবধান খুব বেশি উঁচু হয়ে উঠতে পারেনি কারণ তখন নির্বাচকমণ্ডলী ছিল মাথা গুণতিতে কম। ক্রমে নির্বাচকের সংখ্যা যতই বাড়তে লাগল ততই বিস্ফোটকের মত এর বিষ ছড়িয়ে পড়তে লাগল সমস্ত সমাজদেহে, জীবনের সকল ক্ষেত্র কলুষিত করে দিল এই পৃথক নির্বাচনের প্রথা। পৌরকার্যে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে এর বিষ অল্পদিনের মধ্যেই প্রত্যক্ষ হল, ভেদাভেদ যে কি অবিশ্বাস্য অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে, এবার তা দেখা গেল। এর পরে (বেশ কিছুকাল পরে অবশ্য) মুসলমানদের নানা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল, মুসলমান ট্রেড ইউনিয়ন, মুসলমান ছাত্রসংঘ, মুসলমান বণিক সমাজ ইত্যাদি। এই সমস্ত ব্যাপারে মুসলমানেরা ছিল পিছিয়ে। জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন স্বাভাবিক নিয়মে আপনার জৈবশক্তিতে পুষ্টি ও বৃদ্ধি লাভ করে, এই প্রতিষ্ঠানগুলি কিন্তু সেভাবে আসেনি। সেই পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক যুগধর্মী অভিজাত নেতৃবৃন্দ একপ্রকার জোর করে এইসব প্রতিষ্ঠান চাপিয়ে দিয়েছিলেন মুসলমান সমাজের উপর।

এক দিক থেকে দেখতে গেলে স্পষ্ট মনে হয় যে এর ফলে মুসলমান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এবং সাধারণ জনসমাজ ভারতের প্রগতির ধারা থেকে একপ্রকার বিচ্ছিন্ন হয়েই ছিল। স্বার্থকেন্দ্রিক অনেক প্রতিষ্ঠানই ইংরাজ সরকার সৃষ্টি করেছেন ও পোষণ করেছেন, পৃথক নির্বাচন দ্বারা একটি পুরোপুরি সম্প্রদায়কে তাঁরা শক্তিশালী স্বার্থকেন্দ্রিক গোষ্ঠীরূপে সৃষ্টি করেছেন।

রাজনীতিক বুদ্ধি উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এই পৃথক নির্বাচনের পাপ যে মিলিয়ে যাবে, তার কোনো সম্ভাবনা ইংরাজ রাখেনি। শাসনের কূটনীতিদ্বারা পুষ্ট হয়ে এই পাপ এমন বৃদ্ধি পেল ও প্রসারলাভ করল যে এর কৃষ্ণ যবনিকার অন্তরালে দেশের রাজনীতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্ত সত্যকার সমস্যা চাপা পড়ে গেল। এরই ফলে এল বিভেদ, বিবাদ, বিসম্বাদ; যে-বিভেদ পূর্বে ছিল না তা এখন উঠল প্রকট হয়ে। যে-সম্প্রদায়ের প্রতি ইংরাজ পক্ষপাতিত্ব করেছিল তাদেরই দিল দুর্বল করে। আত্মশক্তির উপর নির্ভর না করে পরের দেওয়া যষ্টির উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার পর-মুখাপেক্ষী শিক্ষা ইংরাজই দিয়েছিল মুসলমান সম্প্রদায়কে।

যে-সব গোষ্ঠী কিংবা সম্প্রদায় সংখ্যায় কম এবং শিক্ষাদীক্ষা ও আর্থিক সঙ্গতির দিক থেকে যারা পিছিয়ে আছে, তাদের উন্নত করতে গেলে সর্বপ্রথম দরকার ঐসব বিষয়ে যদি কিছু বাধা বা অভাব থাকে সেগুলি অপসারিত করা, এবং বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের জন্য অতিরিক্ত সুযোগ ও সাহায্যের ব্যবস্থা করা। মুসলমান ও অন্যান্য অনগ্রসর সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়, এবং বিশেষ করে অনুন্নত হরিজনরা, এই-রূপ সুযোগ-সুবিধা ইংরাজের হাত থেকে পায়নি। যত সব তর্ক বিতর্ক হয়েছে সরকারের অধস্তন পদগুলিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক নিযুক্ত করার বেলা, আসল কাজের বেলা অর্থাৎ সকল দিক থেকে এদের উন্নতিসাধনের বেলা সত্যকার কিছু করা হয়নি। যা হয়েছে তা কেবল যোগ্যতা বিচার না করে, বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের লোককে মাথাগুণতির হিসাবে সরকারের সামান্য সামান্য কাজে বহাল করা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে পৃথকনির্বাচনপ্রথা প্রবর্তনের ফলে দেশের বহু অপকার সাধিত হয়েছে। যেসব সম্প্রদায় এমনিতেই দুর্বল কিংবা অনুন্নত, তাদের শক্তি এর ফলে আরও বেশি করে অপহরণ করা হয়েছে। বিভেদ সৃষ্টি করে জাতীয় একতার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে ও গণতন্ত্রের নীতিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। এই প্রথা প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থকেন্দ্রিক দলসমূহের জন্ম দিয়েছে—সকল দিক থেকে মানুষকে খর্ব করেছে। দেশের যেখানে সত্যকারের সমস্যা—অর্থনৈতিক সমস্যা—দেশবাসীর সকলের পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য, সেই দিকে যাতে লোকের দৃষ্টি না পড়ে তার জন্য ইংরাজের এই ছল কৌশল। প্রথমে কেবল মুসলমানদের জন্য এই সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রবর্তিত হয়, পরে এই প্রথা অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। শেষে পরস্পর-বিভক্ত এই সব বিভিন্ন ভারতীয় সম্প্রদায়ের চেহারাটা দাঁড়ায় ঠিক যেন নানা বর্ণের ও আকারের টালি দিয়ে তৈরি মেঝের মতন। সাময়িকভাবে এই প্রথা হয়তো সম্প্রদায়-বিশেষের মঙ্গলসাধন করে

থাকবে, তা যদি হয়ে থাকে তো এত যৎসামান্য যে চোখে পড়বার মত এমন কিছু নয়। পক্ষান্তরে এই ভেদপ্রথা ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন বিভাগে এমন ক্ষতিসাধন করেছে যে তা অনুমান করাও যায় না। এর থেকে সমস্ত ভেদবুদ্ধির উদ্ভব এবং ভারতকে খণ্ডছিন্ন বিভক্ত করার যে দাবি তারও উদ্ভব এই প্রথার ফলে।

যখন এই পৃথকনির্বাচনের ব্যবস্থা চালু হয় সে-সময় ভারতের সেক্রেটারী অব ষ্টেট ছিলেন লর্ড মর্লি। তিনি বাধা দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু ভাইসরয়ের নির্বন্ধাতিশয্যে তাঁকে এই ব্যবস্থা মেনে নিতে হয়। তিনি তাঁর দিনপঞ্জীতে এই প্রথার মধ্যে নিহিত নানারূপ বিপদের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে এর ফলে প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থার সমস্ত চেষ্টা ব্যাহত হবে। খুব সম্ভব ভাইসরয় ও তাঁর সহকর্মীরা এই প্রকারই চেয়েছিলেন। ভারতের শাসনব্যবস্থার সংস্কার (১৯১৮) নামধেয় মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টেও সাম্প্রদায়িক নির্বাচনপ্রথার সমালোচনা প্রসঙ্গে বেশ জোর দিয়ে বলা হয়েছে : 'ধর্ম ও শ্রেণীহিসাবে বিভাগ সৃষ্টি করলে কতকগুলি পরস্পরবিরোধী রাজনীতিকদল সৃষ্টি করা হয় মাত্র। এ অবস্থায় মানুষ পূর্ণাঙ্গ নাগরিকরূপে তার দায়িত্ব পালন করতে শেখে না, শেখে কেবল দলের অনুবর্তী হয়ে সাম্প্রদায়িক দলাদলি করতে......এইজন্য আমাদের মনে হয় যে যে-কোনো সাম্প্রদায়িক নির্বাচনপ্রথা সর্বতোভাবে স্বায়ত্তশাসননীতির পরিপন্থী।'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অন্তিম পর্যায় (২)

স্বাজাত্যবাদ বনাম সাম্রাজ্যবাদ

১ : মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিঃসহায়তা : গান্ধীজির আবির্ভাব

প্রথম মহাযুদ্ধ উপস্থিত। তথাকথিত চরমপন্থী ও নরমপন্থী এই দুই দলে কংগ্রেস ভাগ হয়ে যাবার ফলে, এবং যুদ্ধকালীন নানা নিয়ম-নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তনের জন্য, রাজনীতির স্রোতে ভাটা পড়েছে। তবু একটা ধারা লক্ষ্য করবার মত : মুসলমানদের মধ্যে যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়ে উঠছিল তারা ক্রমশই জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের দিকে এগিয়ে দিয়েছে, কখনও কখনও তারা এসে হাতও মিলিয়েছে।

যুদ্ধের সময় শ্রমশিল্পের বিশেষ প্রসার ঘটে, বাঙলার পাটকল এবং বোম্বাই ও আহমেদাবাদ প্রভৃতির কাপড়ের কলগুলি শতকরা ১০০৲ থেকে ২০০৲ পর্যন্ত লভ্যাংশ বিতরণ করেছিল। এই লভ্যাংশের কতকটা ডাণ্ডি ও লণ্ডনের বিদেশী মূলধনের অধিকারীদের ভোগে লাগল। কতক বা ভারতীয় লক্ষপতিদের ঐশ্বর্যবৃদ্ধি করল। কিন্তু যে-সকল কর্মীর শ্রমের ফলে এই লাভ, তাদের জীবনযাত্রা যে কি দৈন্যগ্রস্ত তা বিশ্বাস হতে চায় না—নানা ব্যাধির আকর জঞ্জালপূর্ণ বস্তিতে তাদের বাসা, তাতে না আছে জানালা না আছে ধূমনিঃসরণের পথ, আলো নেই, জল নেই, স্বাস্থ্যরক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। ব্রিটিশ মূলধনশাসিত প্রাসাদপুরী কলকাতারই সন্নিকটে এই অবস্থা। ভারতীয় পুঁজিপতিদের অধিকার যেখানে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত সেই বোম্বাইতে এক তদন্ত সমিতি দেখেন, পনেরো ফুট লম্বা বারো ফুট চওড়া একটি ঘরে ছ'টি পরিবার একত্র বাস করছে, বালকবৃদ্ধবনিতা মিলে ত্রিশজন মানুষ। এদের মধ্যে তিনজন মেয়ে আসন্নপ্রসবা। ঐ একটি ঘরে প্রত্যেক পরিবারের আলাদা আলাদা উনন আছে। এগুলি চরম দৃষ্টান্ত, কিন্তু এরকম দৃষ্টান্ত যে আরও মিলবে না তা নয়। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে, অবস্থার যখন কিছু উন্নতি হয়েছে তখনই এই দশা। উন্নতি হবার আগে যে কি অবস্থা ছিল তা কল্পনার অতীত।*

আমি একবার এইরকম কোনো কোনো শ্রমিক-বস্তি দেখতে গিয়েছিলাম। মনে আছে, সেখানে আমার দম আটকে যাচ্ছিল, বিভীষিকাগ্রস্তের মত আমি বেরিয়ে এলাম রাগে আচ্ছন্ন হয়ে। ঝরিয়ার কয়লার খনিতে গিয়ে আমাদের মেয়েরা সেখানে কি

* এই সকল তথ্য বি. শিব রাও-এর 'দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওআর্কার ইন ইন্ডিয়া' (অ্যালেন অ্যাণ্ড আনউইন, লণ্ডন, ১৯৩৯) বই থেকে গৃহীত। ভারতবর্ষের শ্রমিকদের সমস্যা ও অবস্থা এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

অবস্থায় কাজ করে তাও দেখে এসেছি। মানুষকে যে এ অবস্থায় কাজ করতে হয় তা দেখে আমার মনে যে আঘাত লেগেছিল তা ভুলবার নয়। পরে ভূগর্ভে নারীশ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু যুদ্ধের সময় নাকি আরও শ্রমিকের দরকার, তাই সম্প্রতি আবার তাদের সেখানে কাজে খাটানো হচ্ছে। এদিকে লক্ষ লক্ষ পুরুষ উপবাসী বেকার, পুরুষ-শ্রমিকের কোনো অভাব নেই। কিন্তু যে-অবস্থায় কাজ করতে হয় তা এত মন্দ, মজুরি এত কম যে পোষায় না।

ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কর্তৃক প্রেরিত এক প্রতিনিধিদল ১৯২৮ সালে ভারতবর্ষ পরিদর্শনে এসেছিলেন। তাঁদের প্রতিবেদনে তাঁরা বলেছেন, 'ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মানুষের শ্রম, বুভুক্ষা ও নৈরাশ্য প্রতি বৎসর এসে মিশেছে আসামের চায়ে।' বাঙলার জনস্বাস্থ্যসচিব ১৯২৭-২৮ সালের প্রতিবেদনে বলেছেন যে বাঙলার চাষীদের 'যা আহার তা খেয়ে ইঁদুর পর্যন্ত পাঁচ সপ্তাহের বেশি বেঁচে থাকতে পারে না।'

অবশেষে একদিন প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হল। শান্তিস্থাপনের ফলে কোথায় দুর্দশা দূর হবে, উন্নতির আয়োজন হবে, তা নয়, পাঞ্জাবে চলল দমননীতি ও সামরিক আইন। দেশের লোকের মনে তিক্ত গ্লানি ও ক্রোধ, দেশের মনুষ্যত্ব নিষ্পিষ্ট, নির্মম নিরন্তর শোষণে আমাদের দারিদ্র্য ঘনীভূত ও প্রাণশক্তি নিঃশেষিত, এ অবস্থায় রাষ্ট্রবিধি পরিবর্তনের ও বিভিন্ন পদে ভারতীয় নিয়োগের অন্তহীন আলোচনা সবই যেন পরিহাস ও অপমান বলে বোধ হতে লাগল। এ জাতকে দেখবার কেউ নেই।

কিন্তু আমাদের কি করবার উপায় আছে, কিভাবে আমরা এই অমঙ্গল স্রোতের গতিপরিবর্তন করতে পারি? আমরা যেন এক অমিতবল দানবের হাতে নিরুপায়ের মত পড়ে আছি, আমাদের দেহ অবশ, মন বোধশক্তিহীন। কৃষাণসম্প্রদায় দাস্যপ্রবণ ভয়ব্যাকুল, শ্রমিকসম্প্রদায়ের অবস্থাও অনুরূপ। চতুর্দিকের এই অন্ধকারে আলোক-স্বরূপ হয়ে পথনির্দেশ করতে পারবেন যে বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, তাঁরা নিজেরাই এই সর্বব্যাপী নিরানন্দের দ্বারা আচ্ছন্ন। অনেক বিষয়ে তাঁদের অবস্থা চাষীদের চেয়েও বেদনাদায়ক। বহু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের লোক স্বশ্রেণীচ্যুত হয়ে এমন অবস্থায় এসেছেন যখন তাঁদের না আছে মাটির সঙ্গে যোগ, না পারেন তাঁরা কোনো দৈহিক শ্রম বা শিল্পনৈপুণ্যের কাজ করতে; ফলে তাঁরা বেকারসংখ্যা বাড়িয়ে চলেছেন, নিরুপায় নৈরাশ্যের চোরাবালিতে ক্রমশ বেশি করে ডুবে যাচ্ছেন। জনকতক লোক ভাল উকীল, ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার বা কেরানী হয়েছেন তাতে সাধারণের কিছু এসে যায় না। চাষীরা উপবাসী, তবু ভাগ্যের সঙ্গে শত শতাব্দীর দ্বন্দ্বের ফলে তাদের ধৈর্য অসীম, দারিদ্র্য ও উপবাসের মধ্যেও তারা স্থৈর্য হারায় না, অদৃষ্টের শক্তিকে যে রোধ করা যায় না একথা তারা স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের, বিশেষত নূতন 'পেটিবুর্জোয়া' শ্রেণীর অবস্থা অন্যরকম। তারা পুরোপুরি বেড়ে ওঠেনি, মনে তাদের পরাজয়ের গ্লানি, কোন পথে যাবে তারা জানে না, নূতন বা পুরাতন কোনো পথেই তাদের আশা করবার কিছু নেই। সমাজ-প্রয়োজনের সঙ্গে

তাদের জীবন সংগ্রথিত হয়নি, দুঃখ স্বীকার করেও কাজের মত কাজ কিছু করবার যে আত্মপ্রসাদ তা থেকে তারা বঞ্চিত। আচারবিচারে তারা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, প্রাচীন হয়েই তারা জন্মেছে, অথচ প্রাচীন সংস্কৃতির কোনো উত্তরাধিকার পায়নি। আধুনিক চিন্তাধারা তাদের আকর্ষণ করে, কিন্তু তার যে মূলকথা, সমাজচেতনা ও বিজ্ঞানদৃষ্টি, তার চিহ্নও তাদের মধ্যে নেই। অতীতের অর্থহীন অনুষ্ঠানকে অবলম্বন করে অনেকে বর্তমান দুঃখের হাত থেকে স্বস্তি পেতে চেয়েছে; কিন্তু তাতে সান্ত্বনা কোথায়? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আত্মার মধ্যে মৃত্যুকে পোষণ করে লাভ নেই, যা মৃত তা মৃত্যুকেই নিয়ে আসে। আর একদল পাশ্চাত্যের নিষ্ফল নিষ্প্রাণ অনুকরণে প্রবৃত্ত, অধিনায়কহীন অবস্থায়, প্রাণপণ চেষ্টায় দেহমনের আশ্রয় সন্ধানে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে তারা ভারতবর্ষের নিরানন্দ জীবনধারায় ইতস্তত লক্ষ্যহীন গতিতে ভাসমান।

কি আমরা করতে পারি? এই যে দারিদ্র্য ও ব্যর্থতার চোরাবালি ভারতবর্ষকে নিরন্তর নিচের দিকে টানছে, কি করে তার হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করি। কয়েক বছরের উত্তেজনা-উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে নয়, পুরুষানুক্রমে আমাদের দেশের লোকেরা সকল রকম ক্লেশ স্বীকার করে এসেছে, বুকের রক্ত দিয়েছে, দিয়েছে তাদের চোখের জল, দেহের শ্রম। তারই ফলে ভারতের দেহমন দুইই ক্ষীণ হয়েছে, ক্ষয়রোগে যেমন করে শ্বাসযন্ত্র ধীরে ধীরে জীর্ণ হয়, তেমনি আমাদের সমাজজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রই বিষাক্ত হয়েছে। অনেক সময় মনে হয়েছে, এর চেয়ে অন্য কোনো ভাবে যদি সত্বর আমাদের বিনাশ ঘটত—যেমন করে ঘটে বিসূচিকা বা প্লেগমহামারীতে—তাও ভাল ছিল। এসব চিন্তা অবশ্য মুহূর্তেই মিলিয়ে যায়, কারণ অবিমৃষ্যকারিতা দ্বারা কোনো ফললাভ হয় না, হাতুড়ে চিকিৎসায় দীর্ঘকালের ব্যাধি আরোগ্য হবার নয়।

এই সময় গান্ধীজি এলেন—যেন স্নিগ্ধ নির্মল বায়ুপ্রবাহ, আমরা নিশ্বাস নিয়ে স্বস্তি পেলাম, যেন আলোকের রেখায় অন্ধকার ভেদ করে আমাদের নয়নের আবরণ দূর করে দিল, ঘূর্ণিবায়ু এসে যেন সব ওলটপালট করে দিল, বিশেষ করে মানুষের মনকে। তিনি উচ্চশিখর থেকে আমাদের মধ্যে নেমে আসেননি, ভারতের অগণিত সাধারণশ্রেণীর মধ্য থেকেই যেন তিনি বেরিয়ে এলেন, তাদের ভাষাতেই তিনি কথা বলেন, আর তাদের দুঃখদুর্দশার কথাই তিনি সর্বদা আলোচনা করছেন। তিনি বললেন, চাষী-মজুরদের শোষণ করাই যাদের জীবিকা তাদের সে বৃত্তি ত্যাগ করতে হবে; এই দুঃখদুর্দশা যে বিধানের ফল তাকে বর্জন করতে হবে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নূতন রূপ, নূতন অর্থ নিয়ে আমাদের কাছে দেখা দিল। তিনি যা বললেন অনেক ক্ষেত্রে তা আমরা সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারিনি, কখনও কখনও তাঁর কথা সম্পূর্ণই অস্বীকার করেছি। কিন্তু সেসবই গৌণ। তাঁর বাণীর সারকথা হচ্ছে নির্ভয় ও সত্যসন্ধ হয়ে সর্বসাধারণের মঙ্গলকর্মে ব্রতী হও। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে বলেছে, ব্যষ্টির তথা সমষ্টির শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে অভয়ব্রত—কেবল দৈহিক সাহসে হবে না, মন থেকেও ভয়কে নির্বাসিত করতে হবে। আমাদের ইতিহাসের আদিযুগে জনক,

যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি বলে গিয়েছেন যে দেশনায়কদের কর্তব্য হচ্ছে জাতিকে অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত করা। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আমাদের চারদিকে ভয় ঘিরে আছে—সৈন্যের ভয়, পুলিশের ভয়, গুপ্তচরের ভয়; উচ্চকর্মচারীদের ভয়; দমনমূলক আইন ও জেলের ভয়; ভূস্বামীর ভয়; মহাজনের ভয়; বেকার হয়ে উপবাসী থাকবার ভয়—এই সর্বপ্রকার ভয়ই আসন্ন। সর্বব্যাপী এই ভীতিকে উপেক্ষা করে গান্ধীজির শান্ত স্থির কণ্ঠ শোনা গেল—ভয় পেয়ো না। এ কি এতই সহজ? তা ঠিক নয়। তবে একথাও সত্য যে, ভয়ের মায়ামূর্তি বাস্তবের চেয়ে ভীতিজনক—শান্তভাবে বিচার করে বাস্তবকে যদি স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নেওয়া যায় তবে তার ভয়াবহতা অনেকখানিই চলে যায়।

এইভাবে, ভয়ের যে কৃষ্ণযবনিকা দেশবাসীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল অকস্মাৎ যেন তা দূর হয়ে গেল—সম্পূর্ণভাবে নয়, কিন্তু যতটা দূর হল সেটাই খুব আশ্চর্যের বিষয়। ভয় অসত্যের সহচর, সত্য অভয়ের অনুগামী। ভারতবর্ষীয়েরা যে পূর্বের চেয়ে সত্যপরায়ণ হয়ে উঠল, বা তাদের স্বভাব রাতারাতি বদলে গেল তা নয়। তবু অসত্য ও গোপনতার প্রয়োজন কমে যাবার ফলে একটা বিচিত্র পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। এ একটা মানসিক রূপান্তর—যেন কোনো মনঃসমীক্ষণবিৎ রোগীর অতীত জীবন পর্যালোচনা করে কোথায় কোথায় তার গ্রন্থি তা তার দৃষ্টির সামনে তুলে ধরে তাকে আধিমুক্ত করে দিলেন।

দীর্ঘকাল আমরা এমন বিদেশী শাসনকে স্বীকার করেছি যে শাসন আমাদের হীনতাপঙ্কে নিমগ্ন করেছে, ফলাফল যাই হোক এ শাসনকে আর মেনে চলা নয়, এই চেতনাও এই সময় আমাদের মনে জেগেছিল।

পূর্বের চেয়ে সত্যপরায়ণ সম্ভবত আমরা হয়ে উঠিনি; কিন্তু আমাদের মধ্যে চেতনা সঞ্চার করবার জন্য, সত্যের পথে চালিত করবার জন্য আছেন গান্ধীজি, আপসহীন সত্যের প্রতীক। সত্য কি? নিশ্চয় করে এর উত্তর আমি জানি না, সম্ভবত আমরা যাকে সত্য বলি তা আপেক্ষিক, এবং পূর্ণ সত্য আমাদের আয়ত্তের অতীত। বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিভিন্ন লোক সত্যকে কল্পনা করে থাকে, প্রত্যেকের নিজের শিক্ষাদীক্ষা ভাবনা এই দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করে। গান্ধীজির ক্ষেত্রেও এই কথা সত্য। তবে প্রত্যেকেই নিজে যা সত্য বলে অনুভব করে, জানে, ব্যক্তিজীবনে অন্তত তাকেই সত্য বলে স্বীকার করতে হবে। সত্যের এই সংজ্ঞা অনুসারে, গান্ধীজির মত সত্যাগ্রহী আর কেউ আছেন বলে আমার জানা নেই। তাঁর মনের সব কথা তিনি প্রকাশ করে বলেন, তাঁর চিন্তাধারার কখন কি পরিবর্তন ঘটছে তারও চিত্র তিনি সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করে ধরেন—রাজনীতি-ব্যবসায়ীর পক্ষে এরকম ব্যবহার সহজ নয়।

ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষের উপর গান্ধীজির প্রভাব পড়েছে বিভিন্নভাবে। কারও কারও জীবন সম্পূর্ণই পরিবর্তিত হয়ে গেছে; কারও কারও উপরে তাঁর আংশিক প্রভাব পড়েছে; অনেক সময় সে প্রভাব পরে ক্ষীণ হয়ে গেছে, কিন্তু তা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার নয়। গান্ধীজিকে বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে স্বীকার করে নিয়েছে,

কতখানি সে প্রভাব সে প্রশ্নের উত্তরও তাই প্রত্যেকক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র। অনেকের উত্তর মিলবে আলসিবিডিস্-এর এই উক্তিতে : 'অন্য কারও কথা যখন আমরা শুনি তখন তাতে যতই ভাষার ছটা থাকুক না কেন, তা আমরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না। কিন্তু *আপনার কথা যখন শুনি*, বা অতি সাধারণ ভাষায়ও যখন আপনার উক্তির প্রতিধ্বনি *কেউ করে তখন আবালবৃদ্ধবনিতা আমরা মন্ত্রমুগ্ধের* মত তা শুনি। আর আমার *নিজের কথা যদি বলতে হয় তবে* তাঁর বাণী আমার উপর কি অসাধারণ কাজ *করেছে, এখনও করে, তা বলি*। যে মুহূর্তে আমি তাঁর কথা শুনি, আমি হৃদয়ে এক অপূর্ব উদ্দীপনা অনুভব করি, আমার চোখে জল আসে—শুধু আমার নয় আরও বহু লোকেরই এমন হয়।

'পেরিক্লিস ও অন্যান্য সকল শ্রেষ্ঠ বাগ্মীর বক্তৃতাই আমি শুনেছি, অপূর্ব তাঁদের বাক্পটুতা; কিন্তু তাঁদের কথায় আমার এরকম অবস্থা কখনও হয়নি, আমার সমগ্র আত্মায় এরকম আলোড়ন ঘটেনি, আমি যে দীনাতিদীন এ বোধ জাগেনি, যেমন হয়েছে এ'র বাণী শুনে, যার ফলে এই চেতনা আমার মনে জেগেছে যে এমন করে তো আর দিন কাটানো চলে না......

'আমি কখনও আত্মগ্লানি অনুভব করিনি, আমার কাছ থেকে তা কেউ প্রত্যাশাও করে না। এই পৃথিবীতে এক সক্রেটিসই একমাত্র লোক আছেন যাঁর কাছে এসে আমি সংকোচ বোধ করি। তিনি যা আদেশ করেন তা পালন না করে গত্যন্তর নেই, তা পালন করা কর্তব্য, তা আমি জানি। কিন্তু তিনি সামনে থেকে সরে গেলেই আমি দশজনের সঙ্গে মিলে কি করি না-করি সে সম্বন্ধে আমার আর জ্ঞান থাকে না। তাই আমি যতক্ষণ পারি তাঁর কাছ থেকে দূরে পালিয়ে থাকি, যেমন ক্রীতদাস তার প্রভুর কাছ থেকে পালায়। আবার যখন তাঁর কাছে আসি তখন মনে পড়ে এর আগের বার কি বলেছিলাম, তাই মনে গ্লানি অনুভব করি......

'সর্পাঘাতের চেয়ে তীব্র কিছু দ্বারা আমি আক্রান্ত হয়েছি—হৃদয় বল, মন বল সেখানেই এই দংশন, পৃথিবীতে এর চেয়ে তীব্র বেদনা আর কিছু নেই......'*

২ : গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেস

গান্ধীজির এই প্রথম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ; অবিলম্বেই তিনি কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে একে গণতান্ত্রিক জনপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করলেন। কংগ্রেস ইতিপূর্বেও গণতান্ত্রিক ছিল, কিন্তু এর সদস্যসংখ্যা এযাবৎ ছিল পরিমিত, উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এখন চাষীরা দলে দলে এতে যোগ দিল; ফলে কংগ্রেস যেন একটি বিশাল কৃষাণ-সঙ্ঘের রূপ নিল। যন্ত্রকর্মীরাও এসে এতে যোগ দিল, কিন্তু তারা এল ব্যক্তিগতভাবে, স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানগতভাবে নয়।

* এভরিম্যান লাইব্রেরি সংস্করণ : 'দি ফাইভ ডায়ালগ্স্ অব প্লেটো'।

এই নূতন প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি ও লক্ষ্য হল শান্তিপূর্ণ প্রণালীতে কর্মের আয়োজন। এতদিন দুই পথ খোলা ছিল—নয় কেবল বক্তৃতা ও প্রস্তাব গ্রহণ, কিংবা সন্ত্রাসমূলক কাজ। এই দুই পথই এখন পরিত্যক্ত হল; কংগ্রেসের মূলনীতির বিরোধী বলে সন্ত্রাসপন্থা বিশেষভাবে বর্জনীয় বলে ঘোষিত হল। শান্তিপূর্ণ উপায়ে অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং তার ফলে যে দুঃখদৈন্য অবশ্যম্ভাবী—সাগ্রহে তা বরণ—এই এক নূতন কর্মপন্থা গড়ে উঠল। গান্ধীজির শান্তিবাদও বিচিত্র; প্রবল প্রেরণাময় মহাকর্মী তিনি, অদৃষ্টের কাছে নত হবার লোক তিনি নন—সৌজন্য ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে হলেও অন্যায়ের প্রতিরোধে তিনি সর্বদাই উদ্যত।

কর্মের আহ্বান এল দুই ধারায়। একদিকে বিদেশী শাসনের প্রতিরোধ; অপরদিকে আমাদের সমাজের নানা বিকারের শোধন। কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ্য হল শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন—এছাড়া তার প্রধান কর্তব্যসূচী হল জাতীয় ঐক্যপ্রতিষ্ঠা ও সংখ্যালঘিষ্ঠ সমস্যার সমাধান, অবনমিত শ্রেণীর উন্নতিসাধন ও অস্পৃশ্যতা নিবারণ।

গান্ধীজি বুঝেছিলেন যে, ব্রিটিশ শাসনের প্রধান নির্ভর হচ্ছে ভীতি, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সাধারণের সহযোগিতা, এবং ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে যাদের স্বার্থ জড়িত সেই সব শ্রেণীর লোক। গান্ধীজি এই ভিত্তিতেই আঘাত করলেন। উপাধি বর্জন করতে হবে এই নির্দেশ এল; উপাধিধারীরা সে আহ্বানে বিশেষ সাড়া দিলেন না বটে, কিন্তু ব্রিটিশের দান এই সব খেতাবের প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা অন্তর্হিত হল, গ্লানির চিহ্ন হয়ে রইল এসব খেতাব। নূতন আদর্শে ও মানদণ্ডে, রাজপ্রতিনিধি ও রাজন্যবর্গের যে বিলাস-আড়ম্বর একদিন লোককে বিস্মিত করত, অকস্মাৎ তা রুচিহীনতার পরিচায়ক ও পরিহাসযোগ্য বলে তো পরিগণিত হলই, এমনকি, চারদিকের দারিদ্র্য ও দুরবস্থার পরিবেশে তা ধিক্কারযোগ্য বলেও বিবেচিত হতে লাগল। ধনীরা আর আগেকার মতন নিজেদের ধনগৌরবের প্রচারে উৎসুক রইলেন না; লোকব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁদের অনেকে অপেক্ষাকৃত সরল জীবনযাত্রা অবলম্বন করলেন, বেশভূষায় সাধারণ লোকের সঙ্গে তাঁদের বিশেষ পার্থক্য রইল না।

কংগ্রেসের প্রবীণতর নেতা যাঁরা ছিলেন তাঁরা চিরকাল অন্য ধারায় অভ্যস্ত হয়ে এসেছেন, এই নূতন পন্থায় তাঁরা প্রসন্নমনে সায় দিতে পারেননি, বিশেষত জনজাগরণের ফলে তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু দেশময় যে ভাববন্যা বয়ে গেল এমনি তার প্রভাব যে, এই উন্মাদনা তাঁদেরও কতকটা আচ্ছন্ন করে দিল বই কি। কয়েকজন অবশ্য পিছিয়ে গেলেন—এই দলে ছিলেন মিস্টার এম. এ. জিন্না। তিনি যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সংক্রান্ত কোনো মতভেদবশত কংগ্রেস ছেড়ে গেলেন তা নয়, এই নূতন ও প্রাগ্রসর ভাবধারার সঙ্গে তিনি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারলেন না এই হচ্ছে আসল হেতু। তার চেয়েও বড় কারণ, কংগ্রেসে এখন যে জনসঙ্ঘের প্রাধান্য হল, অঙ্গে যাদের দীনবাস, মুখে যাদের হিন্দুস্থানী বুলি, তাদের তিনি সইতে পারলেন না; তাঁর পলিটিক্স হচ্ছে উপরতলার, আইনসভায় ও কমিটিরুমেই তা মানায় ভাল। কয়েক বছর

তিনি কোনো পাত্তাই পাননি, তাই ভারতবর্ষ চিরতরে ত্যাগ করবেন এই রকমই স্থির করেছিলেন। ইংলন্ডে বসবাস শুরু করে সেখানেই বছর কয়েক কাটিয়ে দিয়েছিলেন।

ভারতবর্ষীয় মনোবৃত্তি শান্তিসর্বস্ব, একথার মধ্যে সত্য আছে। সম্ভবত প্রাচীন জাতিদের মধ্যে এই মনোবৃত্তিই প্রধান হয়ে ওঠে; চিরাগত দার্শনিকতাও এর অনুকূল। কিন্তু গান্ধীজি বিশিষ্ট অর্থেই ভারত-সন্তান হয়েও স্থবিরতার সম্পূর্ণ প্রতিকূল; কর্মপ্রেরণার তিনি প্রতিমূর্তি, নিরন্তর কেবল নিজেকে নয় অন্যদেরও তিনি কর্মবেগে প্রবর্তিত করেন। ভারতবাসীর স্থৈর্যপ্রিয় মনোবৃত্তির পরিবর্তন-প্রয়াস এমন করে আর কেউ করেছেন বলে জানি না।

তিনি আমাদের গ্রামে গ্রামে পাঠালেন, নববাণীর এই বার্তাবহদের কর্মগুঞ্জনে দেশ ধ্বনিত হয়ে উঠল, জেগে উঠল চাষী, বেরিয়ে এল তার শান্ত আশ্রয়কোণ থেকে। আমাদের উপর এর প্রভাব দেখা দিল স্বতন্ত্ররূপে, কিন্তু সে প্রভাবও সুদূরগামী—গ্রামের লোককে এই আমরা যেন প্রথম দেখলাম তার মৃৎকুটিরের একান্ততায়, বুভুক্ষার করালছায়া নিরন্তর তার সঙ্গী। বই ও গবেষণাপূর্ণ আলোচনা থেকে ভারতের অর্থনীতি যতটা না শিখেছিলাম এই সকল গ্রামাঞ্চল পরিদর্শন থেকে তার চেয়ে জানলাম অনেক বেশি। মতের পরিবর্তন ভবিষ্যতে যাই হোক না কেন, পুরাতন জীবন-যাত্রায় ও জীবনাদর্শে ফিরে যাবার পথ আর আমাদের রইল না।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য বিষয়ে গান্ধীজির মতামত খুব দৃঢ় ও সুস্পষ্ট; তাঁর সব মতই যে তিনি কংগ্রেসে চালাতে চেষ্টা করেছেন তা নয়, তবে তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর চিন্তাধারার বিকাশসাধন এবং অনেক ক্ষেত্রে তার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে চললেন। তাঁর কোনো কোনো মত অবশ্য তিনি কংগ্রেসে প্রবর্তিত করতেও উদ্যোগী হলেন, শনৈঃপন্থায়, যাতে জনসাধারণ তাঁর পথ গ্রহণ করে। অনেক সময় তিনি এতদূর এগিয়ে গিয়েছেন যে কংগ্রেস তাঁর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি কাজেই তাঁকেই আবার পিছিয়ে আসতে হয়েছে। তাঁর সমগ্র চিন্তাধারা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ অল্প লোকেই করেছে, তাঁর মূল দৃষ্টিভঙ্গীকেই অনেকে স্বীকার করেনি। তবে তাঁর মতামতের যে সংক্ষিপ্ত রূপ কংগ্রেসে প্রবর্তিত হয়, সময়ের ও অবস্থার অনুকূল বলে অনেকে তা গ্রহণ করেছিল। দুই বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারা অপরিস্ফুটভাবে হলেও, বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল—এক, যে-কোনো বিষয়ের গুণাগুণ পরীক্ষায় এইটেই প্রধান বিচার্য যে, তাতে সর্বসাধারণের কতদূর উপকার হবে; দ্বিতীয়, লক্ষ্য সাধু বলেই যে-কোনো উপায়ে তার সাধন করা চলবে তা নয়, কোন পথে আমরা লক্ষ্যে পৌঁছতে চেষ্টা করছি তার দ্বারা লক্ষ্যও নির্ণীত ও পরিবর্তিত হয়।

গান্ধীজি মনেপ্রাণে হিন্দু, একান্তভাবেই তিনি ধর্মাশ্রয়ী, কিন্তু তাঁর ধর্মের সংজ্ঞায় আচার-বিচার-অনুষ্ঠানের কোনো স্থান নেই।* তাঁর ধর্ম নীতিপন্থী, যে পন্থাকে

* ১৯২৮ সালের জানুয়ারিতে ফেডারেশন অব্ ইন্টারন্যাশনাল ফেলোশিপকে গান্ধীজি

তিনি বলেছেন সত্য বা প্রেমের পথ। সত্য ও অহিংসা তাঁর কাছে একই কথা, বা একই বিষয়ের ভিন্ন দিক, এই দুটি শব্দ তিনি প্রায় সমার্থকরূপেই ব্যবহার করেন। হিন্দুধর্মের সার সত্য তিনি মর্মঙ্গম করেছেন এই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস; তাঁর আদর্শ হিন্দুধর্মের সঙ্গে মেলে না এরকম শাস্ত্রবাক্য বা লোকাচারকে তিনি স্বীকার করেন না, তাঁর মতে সে-সকল বাক্য বা আচার প্রক্ষিপ্ত বা পরবর্তীযুগে প্রবর্তিত। তিনি বলেছেন, 'নীতি-বিচারে আমি যা সমর্থন করতে পারি না, বুঝতে পারি না, এমন আচরণের দাসত্ব আমি করতে প্রস্তুত নই।' ফলে একমাত্র নিজের নীতিবিচারেরই বশবর্তী হয়ে তিনি নিজের পন্থা নির্ণয় করে নেন, যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন বাঞ্ছনীয় মনে হয় তা গ্রহণ করেন, নিজের জীবন ও কর্মের আদর্শ স্থির করেন—সেক্ষেত্রে তিনি মুক্তস্বরূপ। এই জীবনাদর্শ ঠিক কি ভুল তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে—কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই, বিশেষত নিজের ক্ষেত্রে তিনি এই একই মাপকাঠি ব্যবহার করেন। রাষ্ট্রক্ষেত্রে, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও, এর ফলে সাধারণ মানুষের পক্ষে নানা অসুবিধার এবং অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। কিন্তু যত অসুবিধাই হোক না কেন, যে ঋজু পথ তিনি বেছে নিয়েছেন তা থেকে তিনি বিচ্যুত হন না, অবশ্য সেই পথ থেকে সরে না গিয়ে অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে যথাসাধ্য সামঞ্জস্যবিধানে তিনি সর্বদাই তৎপর। যে-সকল সংস্কারের প্রস্তাব তিনি করেন, যে উপদেশ তিনি অন্যকে দেন, সর্বদাই তিনি তা নিজের উপর প্রয়োগ করেন, সর্বদাই তিনি নিজেকে দিয়েই পরীক্ষা আরম্ভ করেন—তাঁর কথায় ও কাজে আশ্চর্য মিলন। ফলে, যাই ঘটুক-না কেন, তাঁর সত্য ক্ষুণ্ণ হয় না, তাঁর জীবনের ও কর্মের পূর্ণতা ক্ষীণ হয় না। তাঁর যেসব প্রয়াস আপাতত মনে হয় ব্যর্থ, তাও তাঁকে বড় করে তুলে ধরেছে।

তিনি যে ভারতবর্ষকে নিজের আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তুলতে চেষ্টা করছিলেন সে কোন ভারতবর্ষ, কি তার মানসরূপ? 'আমি এমন ভারতবর্ষ রচনা করতে প্রয়াসী যে দেশের দীনতম লোকও অনুভব করবে যে এ তার নিজের দেশ, যে দেশে তার কথারও দাম আছে, যে দেশে উচ্চ-নীচ বিচার নেই, যে দেশে সকল সম্প্রদায়ের লোকই শান্তিতে থাকতে পারবে......এ ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতার স্থান নেই, পানদোষ এ ভারতবর্ষে থাকতে পারে না......নরনারীর এদেশে সমান অধিকার......এই আমার স্বপ্নের ভারতবর্ষ।' হিন্দুসংস্কৃতির উত্তরাধিকার-গর্বিত তিনি ছিলেন বটে, কিন্তু

বলেন : "দীর্ঘকালের চর্চা ও অভিজ্ঞতার ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি : (১) সব ধর্মই সত্য, (২) সব ধর্মেই কিছু-না-কিছু ত্রুটি আছে, (৩) আমার হিন্দুধর্ম আমার যত প্রিয়, সকল ধর্মের প্রতিই আমার প্রায় সেইরূপ অনুরাগ। আমার নিজ ধর্মে আমার যেরূপ ভক্তি, অন্য ধর্মের প্রতিও তাই। ফলে, ধর্মান্তরীকরণের চিন্তাও আমার পক্ষে অসম্ভব......ফলে, 'ঈশ্বর, আমাকে যে আলোক দেখিয়েছ অন্যদেরও সেই আলোক দেখাও' এ প্রার্থনা আমাদের নয়। আমাদের প্রার্থনা হওয়া উচিত : 'আত্মার শ্রেষ্ঠ বিকাশের জন্য যে আলোক ও সত্যের সাক্ষাৎ প্রয়োজন তাই সকলকে দাও।'"

হিন্দুধর্মকে তিনি বিশ্বজনীন রূপ দিতে চেয়েছিলেন, তাঁর মতে সত্যের অঙ্কে সকল ধর্মেরই স্থান আছে। তাঁর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে তিনি সংকীর্ণরূপে দেখতে চাইতেন না। তিনি লিখেছেন, 'ভারতের সংস্কৃতি একমাত্র হিন্দুসংস্কৃতিও নয়, ইসলাম-সংস্কৃতিও নয়, বস্তুত সকল সংস্কৃতির মিলিত রূপ।' অন্যত্র তিনি বলছেন, 'সর্বদেশের সংস্কৃতির মুক্ত সমীরণই আমার গৃহে প্রবাহিত হোক কিন্তু বাত্যাহত হয়ে আমার পদস্খলন ঘটুক তাতে আমি স্বীকৃত নই। অন্যের ঘরে অনধিকারপ্রবেশ করে ভিক্ষুক বা দাসের মত বাস করতে আমি প্রস্তুত নই।' আধুনিক চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত হলেও স্বীয় সংস্কৃতির মূল থেকে তিনি কখনও বিচ্ছিন্ন হননি।

জাতির আধ্যাত্মিক ঐক্যের পুনরুজ্জীবন, সমাজের উপরতলার পাশ্চাত্য প্রভাবাপন্ন মুষ্টিমেয় গোষ্ঠী ও সর্বসাধারণের মধ্যে মিলনের পথমোচন, অতীতের মধ্যে যে প্রাণ গূঢ় হয়ে আছে তা আবিষ্কার ও তাকে ভিত্তি করে নবসৌধ গঠন, জড়ত্ব ও গতিহীনতা থেকে জনগণকে উদ্ধার করে তাদের মধ্যে গতিসঞ্চার—এই সকল উদ্যোগে তিনি ব্রতী হলেন। তাঁর একমুখী অথচ বহুধা চরিত্রের এই দিকটা সবচেয়ে বড় করে লোকের চোখে পড়ে—সর্বসাধারণের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা, ভাবের ঐক্য, কেবল ভারতবর্ষের নয় সমস্ত পৃথিবীর নিঃসম্বল দরিদ্রের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তাবোধ। এই সব অবনমিতদের উদ্ধারকামনাই তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান চিন্তা, তার তুলনায় ধর্ম কর্ম সবই তাঁর কাছে গৌণ। 'অর্ধভুক্ত জাতির ধর্ম, শিল্প বা সংহতি কিছুই থাকতে পারে না।' 'লক্ষ লক্ষ উপবাসীর প্রয়োজনে যা লাগে আমার কাছে তাই সুন্দর। আগে প্রাণধারণের ব্যবস্থা হলে, জীবনকে যা শ্রীমণ্ডিত অলংকৃত করে তার ব্যবস্থা আপনিই হবে।......আমি চাই এমন সাহিত্য ও শিল্প সর্বসাধারণ যার ভাষা বুঝতে পারে।' এই সব নিঃসহায় লক্ষ লক্ষ দুঃখীর কথা সর্বদা তাঁকে বেদনা দিয়েছে, তাঁর সমস্ত চিন্তা এদেরই কেন্দ্র করে আবর্তিত। কারও চোখে একবিন্দু অশ্রু থাকবে না, সকলের সব দুঃখমোচন করবেন এই তাঁর অভিলাষ।

এই আশ্চর্য প্রাণশক্তিপূর্ণ মানুষ, অশেষ যাঁর আত্মবিশ্বাস, বিচিত্র যাঁর ক্ষমতা, প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকার ও মুক্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে যিনি ব্রতী, যে-উদ্যোগের পটভূমিতে আছে দীনতম মানুষ—তিনি যে ভারতবর্ষের জনগণকে মুগ্ধ ও চুম্বক-শক্তিতে আকৃষ্ট করবেন, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। অতীতকে আগামীর সঙ্গে একসূত্রে তিনি গ্রথিত করেছেন, আজকের যত দৈন্য দুর্গতি তা আশাময় ভবিষ্যতের প্রথম সোপান মাত্র এই আশ্বাস তাঁর বাণীতে—এই দৃষ্টিতেই তাঁকে তারা দেখেছে। কেবল সর্বসাধারণ নয়, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্যেরাও; যদিও তারা অনেক সময় ভাল করে বুঝতে পারেনি, উদ্বিগ্ন হয়েছে, দীর্ঘকালের অভ্যস্ত পথ পরিত্যাগ করা তাদের পক্ষে কঠিনতর হয়েছে। যারা তাঁর অনুগামী কেবল তাদের ক্ষেত্রেই নয়, যারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছে, যারা কি করবে কোন পথে যাবে ভেবে না পেয়ে নিরপেক্ষ থেকেছে তাদের মধ্যেও এক বিরাট মনোবিপ্লব তিনি ঘটালেন।

কংগ্রেস গান্ধীজির নিয়ন্ত্রণাধীন হলেও, এ এক বিচিত্র অধীনতা; নানা বিচিত্র মতের

লোকের স্থান এই বিদ্রোহী-প্রতিষ্ঠানে, নানা দিকে তার কর্মের গতি, কোনো বিশেষ পথে তাকে চালিত করা সহজ নয়। অন্যদের ইচ্ছাকে সম্মান দেবার জন্য অনেক সময় গান্ধীজি নিজের মতকে খাটো করেছেন, অনেক সময় বিরোধী সিদ্ধান্তকেও মেনে নিয়েছেন। তিনি যেসব বিষয়কে মুখ্য বলে বিবেচনা করতেন সেসব ক্ষেত্রে অবশ্য তিনি অদম্য, ফলে একাধিকবার কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটেছে। সে যাই হোক, সর্বদাই লোকচক্ষে তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও জাতীয়তার প্রতীক, ভারতকে যারা দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে চায় তাদের দুর্দম বিরোধী—অন্য অন্য বিষয়ে তাঁর সঙ্গে যতই মতবিরোধ হোক না, স্বাধীনতার প্রতীক তিনি, এই কথা জেনেই সকলে তাঁকে নেতৃত্বে বরণ করেছে। দেশে যখন কোনো সংগ্রাম নেই সে সময় তাঁর নেতৃত্ব যে সর্বদা তারা স্বীকার করেছে তা নয়; কিন্তু সংগ্রাম যখন আসন্ন তখন আর সবই গৌণ, এই প্রতীকই সর্বাগ্রগণ্য।

১৯২০ সালে জাতীয় কংগ্রেস তথা দেশের বহুলাংশ এই নূতন পথ গ্রহণ করল, ব্রিটিশশক্তির সঙ্গে বারে বারে তাদের সংঘর্ষ ঘটতে লাগল। দেশে যে নূতন অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল তাতে সংঘর্ষ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, তবে রাষ্ট্রীয় রণকৌশল পরীক্ষা এই আন্দোলনে বড় কথা নয়, এর মূলে ছিল ভারতবাসীদের মধ্যে শক্তিসঞ্চারের ইচ্ছা, এই শক্তি না থাকলে স্বাধীনতা অর্জন বা রক্ষণ সম্ভব নয়। বারংবার আইন-অমান্য আন্দোলন হতে লাগল—বহু দুঃখের সে আন্দোলন, কিন্তু সে দুঃখকে আমরা বরণ করে নিয়েছিলাম, ফলে তা আমাদের মনে বলসঞ্চারই করেছিল, অনিচ্ছুকের দুঃখ-স্বীকার সে নয়—নৈরাশ্য ও পরাজয়ের গ্লানিতে যা মানুষকে অভিভূত করে। সরকারী উৎপীড়নের বেড়াজালে পড়ে অনিচ্ছুক অনেক লোককেও দুঃখ পেতে হয়েছে এবং স্বেচ্ছাব্রতীও অনেকে ভেঙে পড়েছে তা সত্য; কিন্তু অবিচল ছিল অনেক লোক, দুঃখের অভিজ্ঞতা তাদের চরিত্রকে দৃঢ়তর করেছে। বিদেশী শাসনের কাছে, শক্তিশালীর পায়ে, কংগ্রেস কখনও মাথা নত করেনি, আত্মসমর্পণ করেনি—একান্ত দুঃসময়েও না। ভারতের ঐকান্তিক স্বাতন্ত্র্যকামনা, বিদেশী শাসন প্রতিরোধে তার দৃঢ়তার প্রতিরূপ এই কংগ্রেস, তাই ভারতের অগণিত মানুষ, তাঁদের অনেকে নিজেরা দুর্বল হলেও, বা অবস্থাবৈগুণ্যে কোনো উদ্যোগে যুক্ত হতে না পারলেও, এরই মুখ চেয়ে রয়েছে। এক অর্থে কংগ্রেস একটি দল; কোনো কোনো বিষয়ে বিভিন্ন দলের মিলনভূমি; কিন্তু মূলত কংগ্রেস এসবের ঊর্ধ্বে, জনসঙ্ঘের হৃদয়মনের একান্ত বাসনার প্রতিমূর্তি। কংগ্রেসের সভ্যতালিকা অতি দীর্ঘ, কিন্তু এ দৈর্ঘ্য দ্বারাও দেশবাসীর মনে এর স্থান কত সুবিস্তৃত তা বিচার করা চলে না, দূরদূরান্তরে গ্রামে গিয়ে যারা এর সদস্য হতে চায় তাদের কাছ পর্যন্ত আমরা সব সময় পৌঁছতে পারিনি। অনেক সময় (যেমন এখন) বেআইনী ঘোষিত কংগ্রেসের খাতাপত্র পুলিশ দখল করেছে তখন আইনের চোখে কোনো সত্তাই কংগ্রেসের ছিল না।

আইন-অমান্য আন্দোলন যে-সময় স্থগিত সে-কালেও ভারতে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অসহযোগের প্রবৃত্তি দূর হয়নি, যদিও তার তীব্রতা হ্রাস পেয়েছিল। এর অর্থ যে

সকল ইংরাজ সন্তানের সঙ্গেই অসহযোগ তা নয়। বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠার ফলে শাসনব্যবস্থার সঙ্গে নানাভাবেই সহযোগিতা করতে হয়েছিল। তখনও কিন্তু পটভূমিকার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি; সরকারী কর্তব্যের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে কংগ্রেসীরা কিভাবে চলবেন, এসম্বন্ধে তাঁরা নানা নির্দেশের অধীন ছিলেন। ভারতের জাতীয়তাবাদীর সঙ্গে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর সাময়িক সন্ধিই চলতে পারে, নানা ব্যাপারে নিজেদের মানিয়েও চলতে হয়েছে কিন্তু এ উভয়ের মধ্যে চিরশান্তি কখনও স্থাপিত হতে পারে না: ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে তবেই সে ইংলণ্ডের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে।

৩ : বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী সরকার

কয়েক বছর ধরে কমিশন, কমিটি ও বিতর্ক চালাবার পর ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন পাশ করেন। এই আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও ফেডারাল বা যুক্তরাষ্ট্র পদ্ধতি প্রবর্তনের ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু সে ব্যবস্থা এত বাধানিষেধসংকুল যে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের হাতেই রয়ে গেল। এমনকি শাসন-কর্মীদের অপ্রতিহত ক্ষমতা—শুধু গভর্নমেন্ট ছাড়া আর কারও কাছে যাদের কৈফিয়ৎ দেবার নেই—এই আইনের ফলে অনেক ক্ষেত্রে বেড়েই গেল। যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের আয়োজন এভাবে করা হল যাতে সত্যকার উন্নতি অসম্ভব হয়, এবং ব্রিটিশ-পরিচালিত শাসনতন্ত্রে বাধা দেবার বা পরিবর্তন করবার কোনো পথ যাতে দেশবাসীর সম্মুখে খোলা না থাকে। বিপ্লব না ঘটিয়ে, স্বতই যে কোনো উন্নতি হবে এর কোনো উপায় এই ব্যবস্থায় নেই। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সঙ্গে রাজন্যবর্গ, জমিদারশ্রেণী ও অন্যান্য প্রগতিবিরোধী দলের যোগাযোগ যাতে ঘনিষ্ঠ হয় এই আইনে তারই ব্যবস্থা হল। এই আইনে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে দেশে ভেদবুদ্ধি বেড়ে চলল; ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠালাভের আরও সুব্যবস্থা হল এবং নিয়ম করে দেওয়া হল যে এতে বাধা দেওয়া চলবে না;* ভারতের আর্থিক, সামরিক ও বৈদেশিক ব্যবস্থা সবই ব্রিটিশের হাতে রয়ে গেল; ভাইসরয়ের ক্ষমতা আগের চেয়েও বেড়ে গেল।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে কর্তৃত্বভার অনেকটা

* ব্রিটিশ বাণিজ্যের প্রতিনিধিগণ এখনও এই সকল নিয়ম পরিবর্তনে উগ্রভাবে বাধা দিচ্ছেন। ১৯৪৫ এপ্রিলে কেন্দ্রীয় পরিষদে এই সকল নিয়ম পরিবর্তন দাবি করে এক প্রস্তাব ইংরাজদের অমতেই গৃহীত হয়। ভারতবর্ষের জাতীয়পন্থীগণ, বস্তুত ভারতের সকল দলই এই নিয়ম পরিবর্তনের পক্ষপাতী, এবং ভারতের শিল্পপতিগণ তো এ-বিষয়ে স্বভাবতই বিশেষ উৎসুক। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা যেসব সুবিধা পাচ্ছেন বলে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ক্ষুব্ধ, সিংহলে ঠিক সেই সকল সুবিধাই কোনো কোনো ভারতীয় ব্যবসায়ী চাচ্ছেন। স্বার্থে মানুষ অন্ধ হয়, কেবল সুবিচারের ক্ষেত্রে নয়, সহজ যুক্তির ক্ষেত্রেও।

হস্তান্তরিত হল। তৎসত্ত্বেও লোকায়ত্ত সরকারের অবস্থাটা হল একটু বিচিত্র। ভাইসরয় ও অনপসরণীয় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের বাধাদান-ক্ষমতা তো অব্যাহতই রইল; এমনকি প্রদেশের গবর্নরও বাধা দিতে পারবেন, আইন নাকচ করতে পারবেন, নিজের ক্ষমতা-বলেই আইন প্রবর্তন করতে পারবেন; বস্তুত মন্ত্রীবর্গ ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও তিনি একরকম যা-খুসি-তাই করতে পারবেন।

সরকারী আয়ের একটা বড় অংশ কতকগুলি নির্দিষ্ট খাতে ব্যয়িত হবে এই স্থির আছে, সে টাকায় হাত দেবার উপায় নেই। বড় চাকুরেরা, পুলিশ প্রভৃতির কাজে মন্ত্রীদের হস্তক্ষেপ করবার পথ নেই। তাঁদের ভাবগতিক কর্তৃত্বপ্রিয়, মন্ত্রীদের পরামর্শে না চলে পূর্বের ন্যায় তাঁরা গবর্নরেরই মন জুগিয়ে চলতে লাগলেন; আর এদের নিয়েই লোকায়ত্ত সরকারকে কাজ চালাতে হত। গবর্নর থেকে আরম্ভ করে সামান্য কর্মচারী ও পুলিশ পর্যন্ত জটিল শাসনব্যবস্থার রূপ একই রয়ে গেল, মাঝখানে কেবল কয়েকজন মন্ত্রী, জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত পরিষদের অধীন, তাঁরা যতটুকু পারেন করতে লাগলেন। ব্রিটিশ কর্তৃত্বের প্রতিনিধি গবর্নর ও তাঁর অধীন কর্মীরা যদি মন্ত্রীদের সঙ্গে একমত হয়ে সহযোগিতা করেন, তবেই শাসনযন্ত্র অবাধে চলতে পারে। তা না হলেই নিরন্তর সংঘাত ঘটতে বাধ্য, আর এইটেই বেশি স্বাভাবিক, কারণ লোকানুগ সরকারের রীতি-পদ্ধতি পূর্বতন কর্তৃত্বাভিমানী পুলিশী সরকারের রীতি-পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। গবর্নর ও উচ্চকর্মচারীরা প্রকাশ্য-ভাবে লোকায়ত্ত সরকারের বিরুদ্ধতা না করেও সরকারের কাজে বা ইচ্ছায় বাধা দিতে পারতেন, বিলম্ব ঘটাতে পারতেন বা তার উদ্দেশ্য বিফল করে দিতে পারতেন। ভাইসরয় ও গবর্নর স্বেচ্ছাক্রমে কাজ করলে, এমনকি মন্ত্রীমন্ডলী ও ব্যবস্থাপরিষদের বিরুদ্ধাচরণ করলেও আইনত তাঁদের বাধা দেবার উপায় ছিল না; একমাত্র বাধা ছিল সংঘর্ষের ভীতি; মন্ত্রীরা পদত্যাগ করতে পারেন, অন্য কেউ পরিষদে অধিকাংশের সমর্থন পাবে না এবং এর ফলে নানা জন-আন্দোলন হতে পারে। এ সেই পুরাতন কাহিনী, অন্যত্রও যেমন ঘটেছে—স্বৈরাচারী রাজা ও পার্লামেন্টের দ্বন্দ্ব, ফলে বিদ্রোহ ও রাজার পদচ্যুতি—এ ক্ষেত্রে রাজা বিদেশী আর তার সমর্থক বিদেশী সামরিক ও আর্থিক শক্তি, এবং নিজের গড়া বিশেষ-সুবিধাপ্রাপ্ত সম্প্রদায় ও পোষা কুকুরের দল।

এই সময় ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশ ভারতীয় ও চীনা ব্যাবসায়িক স্বার্থ নিয়ে কলহ চলছিল, এইজন্য ভারতবর্ষীয় ও চীনেদের বিরুদ্ধ মনোবৃত্তি ব্রহ্মদেশীয়দের মধ্যে প্রচার করাই ছিল ব্রিটিশের স্বার্থ। এতে কিছুদিন তাদের সুবিধা হয়েছিল, কিন্তু ব্রহ্মদেশকে স্বাধীনতা দিতে অস্বীকার করবার ফলে এদেশে জাপানের অনুকূলে প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়; ১৯৪২ সালে জাপানী আক্রমণের সময় এই আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে।

ভারতে সকল শ্রেণীর লোকই ১৯৩৫ সালের আইনের তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। গবর্নর ও ভাইসরয়কে প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা ও সংরক্ষণাবলীর জন্য এর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অংশ সমালোচনাভাজন হয়; আরও বেশি প্রতিবাদ হয় যুক্তরাষ্ট্রঘটিত

অংশের। যুক্তরাষ্ট্রতন্ত্র প্রবর্তনে কারও আপত্তি ছিল না, এইরকম একটা পদ্ধতি যে ভারতবর্ষে প্রয়োজন তা সকলেই স্বীকার করেছিল; কিন্তু আলোচ্য প্রস্তাবে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন ও চিরাগত স্বার্থ সংরক্ষণের সুদৃঢ় ব্যবস্থা হয়েছিল। এই আইনের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অংশই কার্যত প্রবর্তিত হয়; কংগ্রেস নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এই সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু এই আইনের বশবর্তী হয়ে প্রাদেশিক শাসনের ভার কংগ্রেস গ্রহণ করবে কি না এ নিয়ে কংগ্রেসে তীব্র বাদবিসম্বাদ উপস্থিত হয়। প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই নির্বাচনে কংগ্রেস জয়লাভ করে; তৎসত্ত্বেও, গবর্নর ও ভাইসরয় কোনো কাজে বাধা দেবেন না এ কথা পরিষ্কার স্বীকার না করা পর্যন্ত কংগ্রেসের পক্ষে মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত হবে কি না, এ নিয়ে দ্বিধা হয়েছিল। কয়েক-মাস পরে এই মর্মে অস্পষ্ট আশ্বাস পাওয়া যায়, এবং ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এগারোটি প্রদেশের মধ্যে আটটি প্রদেশে ক্রমশ কংগ্রেসী সরকার স্থাপিত হয়—সিন্ধু, বাঙলা, ও পাঞ্জাব এই তিনটি বাকি থাকে। সিন্ধু নবগঠিত একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ। বাঙলাদেশের ব্যবস্থাপরিষদে কংগ্রেস দল হিসাবে সবচেয়ে বড় হলেও সংখ্যায় সর্বগরিষ্ঠ নয় বলে শাসনকর্মে যোগ দেয়নি। বাঙলাদেশ (বা কলকাতা) ভারতে ব্রিটিশ বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র এইজন্য তাদের বহু-সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। সংখ্যায় তারা মুষ্টিমেয়, কয়েক হাজার মাত্র, তবু তাদের পঁচিশটি আসন দেওয়া হয়—আর সমস্ত প্রদেশের (তপশীলভুক্তদের বাদ দিয়ে) এক কোটি সত্তরলক্ষ অ-মুসলমানকে দেওয়া হয় পঞ্চাশটি আসন। বাঙলার রাষ্ট্রক্ষেত্রে ব্যবস্থাপরিষদের এই ব্রিটিশদল একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে—মন্ত্রীমণ্ডল ভাঙা-গড়া এদেরই হাতে।

ভারতের সমস্যার সাময়িক সমাধানরূপেও ১৯৩৫ সালের আইনকে গ্রহণ করা কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব ছিল না। পূর্ণ স্বাধীনতাই এর লক্ষ্য, এই আইনকে বাধা দেওয়াই এর ব্রত। তবু প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনভার অধিকাংশের মতে কংগ্রেস গ্রহণ করেছে। এইজন্য তার কর্মপ্রণালী দুই ধারায় চলল : স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ব্যবস্থা-পরিষদের বাহনে সংস্কার ও সংগঠন কার্য। চাষীর সমস্যা সমাধান অবিলম্বেই করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

অন্যান্য দলের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে মন্ত্রীসভা গঠনের প্রশ্নও বিবেচিত হয়েছিল, যদিও তার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ কংগ্রেসী দল ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবু দেশশাসনকার্যে যত বেশি লোকের যোগ থাকে সেইটাই বাঞ্ছনীয়। এরকম সম্মিলনে দোষের কিছু নেই, সীমান্তপ্রদেশ ও আসামে এই ব্যবস্থাই হয়। বস্তুত কংগ্রেসই মুক্তিকামনার সূত্রে গ্রথিত বিভিন্ন দলের এক সম্মিলনক্ষেত্র। কংগ্রেসের নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে যতই বৈচিত্র্য থাকুক, সেই সঙ্গে ছিল শৃঙ্খলা, সমাজদৃষ্টি এবং স্বকীয় শান্তিপূর্ণ পন্থায় সংগ্রামের ক্ষমতা। এর বাইরের গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার অর্থ, এমন লোকদের সঙ্গে যোগ দেওয়া যাদের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক চিন্তাধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, মন্ত্রিত্বের উপরই যাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। এ অবস্থায় সংঘাত ঘটতে বাধ্য—ভাইসরয়,

গবর্নর, উচ্চকর্মচারীবৃন্দ প্রভৃতি ব্রিটিশ স্বার্থের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংঘাত, কৃষাণ ও শ্রমিক সমস্যা নিয়ে জমিদার ও শিল্পপতিদের স্বার্থের সঙ্গে সংঘাত। অ-কংগ্রেসীরা রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সাধারণত রক্ষণশীল; তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কেবল নিজের পদোন্নতি সন্ধানেই ব্যস্ত। এই রকম লোক মন্ত্রীমণ্ডলে প্রবেশ করলে আমাদের সমস্ত কর্মপ্রণালীর সুরটিই নেমে যেতে পারে; অন্তত কর্মের গতি ব্যাহত ও বিলম্বিত হওয়া খুবই সম্ভব। অন্যান্য মন্ত্রীদের অগোচরে গবর্নরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করাও এঁদের পক্ষে সম্ভব। ব্রিটিশ কর্তৃত্বের প্রতিরোধে এক হয়ে দাঁড়ানো একান্ত প্রয়োজন, এতে বাধা পড়লে আমাদের ব্রতের অনিষ্ট হতে পারে। মন্ত্রী-মণ্ডলীর কোনো এক লক্ষ্য থাকবে না, একসূত্রে তাঁদের গেঁথে রাখবার কিছু থাকবে না, এক-একজন এক-এক পথে চলতে থাকবেন।

আমাদের দেশে এরকম লোকও স্বভাবতই আছেন যাঁরা শুধুই পলিটিশিয়ান আর কিছু নন, ভাল-মন্দ দুই অর্থেই যাঁরা উচ্চপদাভিলাষী। কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে দুইরকম লোকই আছেন, একান্ত কর্মিষ্ঠ উৎসাহী স্বদেশপ্রেমিক, অপরদল নিজের প্রতিষ্ঠা সন্ধানে ব্যস্ত। কিন্তু ১৯২০ সাল থেকে কংগ্রেস বলতে কেবল একটি রাষ্ট্র-নৈতিক দল বোঝাত না; বিপ্লবী চিন্তা ও কর্মের পরিবেশ একে ঘিরে থাকত যার ফলে একে অনেক সময় আইনের সীমার বাইরে গিয়ে পড়তে হয়েছে। বিপ্লব বলতে আমরা সাধারণত যে হিংসা, গোপন ষড়যন্ত্র প্রভৃতি বুঝি, কংগ্রেসের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সেসব জড়িত ছিল না বলে যে কংগ্রেস বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান নয়, এরকম মনে করলে ভুল হবে। এই বিপ্লব ঠিক পথে চলেছে না ভুল পথ ধরেছে, এর দ্বারা কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে কি না, এ নিয়ে তর্ক চলতে পারে; কিন্তু এর মূলে যে ছিল অপরিসীম ধৈর্য ও অবিচল সাহস একথা মানতেই হবে। জীবনের সব সুখ একমাত্র মনের বলে পরিত্যাগ করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এইভাবে চলার চেয়ে ক্ষণিকের উদ্দীপনায় মৃত্যুবরণ করাও সম্ভবত সহজ। কোনো দেশে এ পরীক্ষায় অধিক লোক উত্তীর্ণ হতে পারে না—ভারতবর্ষে যে এত লোক পেরেছে এ অতি বিস্ময়ের বস্তু।

কোনো বিপদ এসে ঘিরে ধরবার আগেই, যত সত্বর সম্ভব চাষী ও কর্মীদের অনুকূলে আইন পাশ করিয়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন পরিষদের কংগ্রেসী দল উদগ্রীব হয়ে ছিলেন। আশু বিপৎসম্ভাবনা সর্বদাই ছিল—তৎকালীন পরিস্থিতির মধ্যেই তার বীজ ছিল নিহিত। প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই দ্বিতীয় একটি পরিষৎ ছিল যার সদস্যারা স্বল্প-সংখ্যক লোকের অর্থাৎ জমি ও শিল্পের সঙ্গে যাদের স্বার্থ জড়িত এই রকম লোকের প্রতিনিধি। এছাড়া প্রগতিপন্থী আইন প্রবর্তনের আরও নানা বাধা ছিল। বিভিন্ন দলের সম্মিলনে মন্ত্রীমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হলে এসকল বাধা বহুগুণিত হবে, তাই গোড়ায় আসাম ও সীমান্তপ্রদেশ ব্যতীত অন্যত্র সম্মিলিত মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠা না করাই স্থির হয়।

এই সিদ্ধান্ত যে চিরস্থায়ী তা নয়, ভবিষ্যতে পরিবর্তনের পথ খোলাই রইল, কিন্তু

অবস্থার দ্রুত পরিণতির ফলে পরিবর্তন আরও দুরূহ হয়ে উঠল, নানা গুরুতর সমস্যার আশু সমাধানে বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী সরকারকে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে হল। এই সিদ্ধান্ত কতদূর মঙ্গলজনক হয়েছিল তা নিয়ে পরে অনেক তর্ক-বিতর্ক চলেছে, নানা লোকের নানা মত শোনা গেছে। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে; তবে আমার এখনও এই মত যে, রাজনীতির বিচারে, এবং আমাদের তৎকালীন অবস্থা বিবেচনায়, আমরা যে পথ নিয়েছিলাম তাই স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত। একথা অবশ্য সত্য যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা প্রসঙ্গে এর ফলাফল ভাল হয়নি, মুসলমানদের অনেকে এজন্য ক্ষুব্ধ হয়েছেন। প্রতিক্রিয়াপন্থী অনেকে এই ক্ষোভ কোনো কোনো দলে নিজেদের প্রতিষ্ঠা বিস্তারে ব্যবহার করেছেন।

নূতন আইন প্রবর্তন বা বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠার ফলে রাজনীতি বা আইনের দিক থেকে ব্রিটিশ সরকারী কাঠামোর বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি; প্রকৃত ক্ষমতা এতদিন যাদের হাতে ছিল এখনও তাদের হাতেই রইল। কিন্তু মানসিক পরিবর্তন যা হল সে অসাধারণ, সমস্ত দেশে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। শহর অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলেই এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল বেশি, যদিও বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রের কর্মীদের মধ্যেও একই অনুপ্রাণনা দেখা গেল। বুকের উপর যে জগদ্দল পাথর চেপে ছিল তা দূর হয়ে গেছে, এই ধারণা করে মানুষ শান্তির নিশ্বাস ফেলল; সর্বত্র দেখা গেল, দীর্ঘকাল জনগণের মধ্যে যে শক্তি প্রচ্ছন্ন পীড়িত হয়ে আছে তা যেন আজ ছাড়া পেয়েছে। পুলিশের ভয়, গুপ্তচরের ভয়, ক্ষণকালের জন্য দূর হয়ে গেছে, দীনতম চাষীও আত্মসম্মান আত্মনির্ভর ফিরে পেয়েছে, আজ প্রথম সে বুঝতে পেরেছে তারও একটা বিশেষ স্থান আছে, তার কথা ভুলে থাকা চলবে না। সরকার যেন অদৃশ্য অজ্ঞেয় একটা দানব, মাঝখানে আছে সব কর্ম্মচারীর দল যাদের কাছেই সে ঘেঁষতে পারে না, নিজের কথা তাদের শোনাবে কি, যাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে ছলে বলে কৌশলে তাদের শোষণ করা—এ ধারণা দূর হল। যাঁদের সে কতবার দেখেছে, যাঁদের বক্তৃতা শুনেছে, যাঁদের সঙ্গে কথা বলেছে, কখনও বা যাঁদের সঙ্গে একত্র জেলে কাটিয়েছে, যাঁদের সঙ্গে আছে তার কর্মের যোগ, এইরকম সব লোক আজ সুউচ্চ কর্তৃপদে আসীন।

প্রাদেশিক সরকারের কর্মকেন্দ্রে, পূর্বতন আমলাতন্ত্রের যা ছিল দুর্গস্বরূপ, এখন নানারকম দৃশ্য দেখা যেতে লাগল। সরকারের এই দপ্তরখানায় সব বড় বড় আপিস কেন্দ্রীভূত, এখানে কারও প্রবেশাধিকার ছিল না; এইখান থেকেই সব বিচিত্র আদেশ জারি হত যার প্রতিবাদ করা কারও সাধ্য ছিল না। পুলিশ আর লাল উর্দিপরা আরদালি, কোমরবন্ধে তাদের চকচকে ছোরা, এই দপ্তরখানা পাহারা দিত, ভাগ্যবান, অর্থবান বা দুঃসাহসী না হলে এখানে কেউ প্রবেশ করতে পারত না। এখন হঠাৎ শহর ও গ্রামের লোক দলে দলে এখানে ঢুকে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াতে লাগল; সবকিছুতেই তাদের কৌতূহল, যে বাড়িতে ব্যবস্থাপরিষদের অধিবেশন হয় সেখানে গেল, মন্ত্রীদের ঘরেও উঁকি মেরে দেখল। এদের ঠেকানো কঠিন, আজ আর এরা

বাইরের লোক নয়, এসবই যে তাদের এই বোধ তাদের জেগেছে, যদিও সব ব্যাপারটা তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। পুলিশ আর আরদালিদের আজ আর হাত ওঠে না, বিলাতী পোশাক, কর্তৃত্বের নানা চিহ্ন আজ আর কেউ গ্রাহ্য করে না। এই যে সব চাষী আর শহরের লোক দলে দলে এল এদের থেকে ব্যবস্থাপরিষদের সদস্যদের চিনে নেওয়া কঠিন; উভয়েরই বেশভূষা প্রায় একরকম, পরনে হাতেবোনা কাপড়, মাথায় সুপরিচিত গান্ধীটুপি।

এর কয়েক মাস আগে পাঞ্জাব ও বাঙলায় যে মন্ত্রীমন্ডল গঠিত হয়েছিল তার অবস্থা কিন্তু অন্যরকম। সেখানে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন নিয়ে কোনো সংকটের সৃষ্টি হয়নি, কোনো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি না করে সহজেই সেটা ঘটেছিল। বিশেষ করে পাঞ্জাবে সব ব্যবস্থাই পূর্ববৎ চলতে লাগল, মন্ত্রীরাও অধিকাংশ পুরনো লোক, আগেও তাঁরা সরকারী উচ্চপদে ছিলেন এখনও তাই রইলেন। ব্রিটিশ শাসননীতি রাষ্ট্রিক বিচারে সেখানে সর্বেসর্বা, কাজেই তাঁদের সঙ্গে ব্রিটিশ নীতির কোনো বিরোধের ভাবও দেখা গেল না।

বাঙলা ও পাঞ্জাবের সঙ্গে কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলির প্রভেদ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও রাজনৈতিক বন্দীর ব্যাপারে, বিশেষ স্পষ্ট করে বোঝা গেল। বাঙলা ও পাঞ্জাবে রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্তি পেল না, পুলিশ ও গুপ্তচরদের প্রাধান্য হ্রাস হল না। বাঙলাদেশে মন্ত্রীদের প্রধান নির্ভর ইউরোপীয়দের ভোটের উপর, সেখানে সহস্র সহস্র নরনারী বছরের পর বছর বিনা অভিযোগে বিনা বিচারে বন্দী হয়ে রইল। কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশে প্রথম কাজই হল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান। যেসব বন্দী হিংসাত্মক কর্মের অভিযোগে শাস্তি পেয়েছিলেন তাঁদের বেলায় একটু দেরি হয়েছিল, কারণ গবর্নর এ'দের মুক্তিতে প্রথমে সম্মত হননি। ১৯৩৮ সালের গোড়ায় ব্যাপারটা ঘনিয়ে ওঠে, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা এ নিয়ে পদত্যাগ করেন। তখন গবর্নর তাঁর মত প্রত্যাহার করেন, বন্দীরা মুক্তিলাভ করেন।

৪ : ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রক্ষণশীলতা ও ভারতীয় গতিপন্থার সংঘর্ষ

নূতন প্রাদেশিক পরিষৎগুলিতে পল্লী-অঞ্চলের প্রতিনিধিদের সংখ্যা পূর্বের চেয়ে অধিক, এইজন্য স্বভাবতই ভূসম্পত্তি-ব্যবস্থার সংস্কারের দাবি সর্বত্রই প্রবল হয়ে ওঠে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও অন্যান্য কারণে বাঙলাদেশেই রায়তের অবস্থা সবচেয়ে মন্দ। এই ধারায় পরে পরে আসে বিহার ও যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল যেখানে বিরাট জমিদারির প্রাবল্য, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশ যেখানে একসময় ছিল জমিতে চাষীরই অধিকার—কিন্তু ক্রমশ বড় বড় জমিদারিই যেখানে গড়ে উঠেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাঙলাদেশে কোনো সংস্কারসাধন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলে দিতে হবে এ-বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত, সরকারী একটি কমিশনও এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন, কিন্তু এর সঙ্গে যাদের স্বার্থ জড়িত তাদের

চেষ্টায় এখনও পরিবর্তনের গতি রুদ্ধ হয়েছে। সৌভাগ্যবশত পাঞ্জাব পেয়েছে নূতন জমি।

ভূসম্পত্তি-ব্যবস্থার সংস্কার কংগ্রেসের পক্ষে একটি প্রধান সমস্যা, তাই এ-বিষয়ে আলোচনা ও ইতিকর্তব্য নির্ধারণে কংগ্রেস বহু সময়ক্ষেপ করেছে। বিভিন্ন প্রদেশের অবস্থাভেদে, এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী এই নির্ধারণ বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ভূসম্পত্তি সম্বন্ধে একটি মূলনীতি স্থির করে দিয়েছেন, বিভিন্ন প্রদেশ তাতে যা যোগবিয়োগ করবার করেছে। যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসই এ-বিষয়ে সকলের চেয়ে এগিয়ে গেলেন, স্থির করলেন যে জমিদারি প্রথা সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করতে হবে। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন অনুসারে এটা অবশ্য সম্ভব নয়—তারপরে আছে ভাইসরয় ও গভর্নরের বিশেষ ক্ষমতা, এবং জমিদার-সদস্য প্রধান উচ্চপরিষৎ। কাজেই পুরাতন ব্যবস্থার কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখেই যথাসাধ্য পরিবর্তন আনতে হবে, যদি না কোনো বিপ্লবের ফলে সেই ব্যবস্থাই বিচূর্ণ হয়ে যায়। এই অবস্থায় সংস্কারকার্য অতি দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে, যেরূপ মনে করা গিয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়।

যাই হোক, ভূসম্পত্তি-ব্যবস্থায় প্রভূত সংস্কার সাধিত হয়, গ্রামবাসীর ঋণসমস্যা সমাধানেরও চেষ্টা চলতে থাকে। কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা, জনস্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, প্রাথমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাব্যবস্থা, জনশিক্ষা, শিল্পপ্রতিষ্ঠা, গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি ব্যাপারেও নানা উদ্যোগের সূচনা হয়। পূর্বতন সরকার এসব সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক সমস্যা সমাধানে মনোযোগ দেননি, তাঁদের কাজ ছিল পুলিশ ও আয়-বিভাগ ভাল করে চালানো, অন্য অন্য বিভাগের যা হয় হোক। কখনও কখনও সামান্য চেষ্টা যে না হয়েছে তা নয়, কমিটি তদন্ত-কমিশন নিযুক্ত হয়েছে, দীর্ঘকাল পরিভ্রমণ ও পরিশ্রমের পর তাঁরা প্রকাণ্ড রিপোর্ট দিয়েছেন, তারপর তা দপ্তরজাত হয়েছে আর কিছুই করা হয়নি। সর্বসাধারণ এ-বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করা সত্ত্বেও ঠিকমত তথ্যসংগ্রহ পর্যন্ত হয়নি। প্রয়োজনীয় তথ্যাদির অভাবে অনেক কাজই বাধাগ্রস্ত হয়েছে। দেশশাসনের সাধারণ কর্মসূচী তো আছেই, এছাড়াও নূতন প্রাদেশিক সরকারকে দীর্ঘকালের ঔদাসীন্যে পর্বতপ্রমাণ পুঞ্জীভূত কাজের সম্মুখীন হতে হল, তাঁদের চারদিকেই এমন সমস্যা যার এখনই সমাধান না করলে নয়। পুলিশতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সমাজ-নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রে পরিণত করবার ভার তাঁদের উপরে—স্বভাবতই এ কাজ দুরূহ, তার উপরে আছে তাঁদের ক্ষমতায় বাধা, দেশবাসীর দারিদ্র্য, এবং ভাইসরয়ের অধীন স্বৈরতান্ত্রিক কর্তৃত্বপ্রবণ কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে প্রাদেশিক সরকারের মতানৈক্য, যার ফলে তাঁদের দুরূহ কর্তব্য দুরূহতর হয়েছিল।

এইসব বাধার কথা আমাদের সবই জানা ছিল, একথা আমরা ভাল করেই বুঝেছিলাম যে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন না ঘটলে আমরা বিশেষ কিছু করে উঠতে

পারব না—সেইজন্যই তো এমন মনে প্রাণে আমরা কামনা করছিলাম পূর্ণ স্বাধীনতা —তবু, অন্য যেসকল দেশ আমাদের থেকে নানা বিষয়ে এগিয়ে গেছে তাদের অনুসরণ-বাসনায়, প্রগতির কামনায়, আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ। আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের কথা আমরা ভেবেছি, প্রাচ্যের কোনো কোনো দেশ দেখলাম কত অগ্রসর হয়ে গেল। কিন্তু সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিল সোভিয়েট রাশিয়ার দৃষ্টান্ত, যুদ্ধ ও অন্তঃ-কলহের মধ্য দিয়ে, দুর্নিবার্য বাধাকে অতিক্রম করে, কুড়ি বছরের মধ্যে তার সুদূর-প্রসারী অগ্রগতি। সাম্যবাদ অনেককে আকর্ষণ করেছিল, অনেককে করেনি, কিন্তু শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, দৈহিক স্বাস্থ্যবিধান ও রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে, এবং উপজাতি-সমস্যার সমাধানে তার উদ্যোগ, পুরাতনের ভগ্নাবশেষের উপরে নূতন জগৎ গড়ে তুলবার আশ্চর্য বিরাট আয়োজনে মুগ্ধ হয়নি এমন লোক ছিল না। সাম্যবাদের অনেক বিষয়ের প্রতি বিমুখ এবং একান্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রবীন্দ্রনাথও স্বদেশের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তার তুলনায়—এই নবসভ্যতার অনুরাগী হয়েছিলেন। মৃত্যু-শয্যা থেকে 'দেশবাসীর' প্রতি শেষ সম্ভাষণে তিনি রাশিয়ার উল্লেখ করে বললেন, 'দেখেছি রাশিয়ার মস্কাও নগরীতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আরোগ্য-বিস্তারের কী অসামান্য অকৃপণ অধ্যবসায়। সেই অধ্যবসায়ের প্রভাবে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মূর্খতা ও দৈন্য ও আত্মাবমাননা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। এই সভ্যতা জাতিবিচার করেনি, বিশুদ্ধ মানবসম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে। তার দ্রুত এবং আশ্চর্য পরিণতি দেখে একই কালে ঈর্ষা এবং আনন্দ অনুভব করেছি।...... বহুসংখ্যক পরজাতের উপরে প্রভাব চালনা করে এমন রাষ্ট্রশক্তি আজ প্রধানত দুটি জাতির হাতে আছে—এক ইংরাজ, আর এক সোভিয়েট রাশিয়া। ইংরাজ এই পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করে দিয়ে তাকে চিরকালের মত নির্জীব করে রেখেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ আছে বহুসংখ্যক মরুচর মুসলমান জাতির। আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি, এই জাতিকে সকল দিকে শক্তিমান করে তোলবার জন্য তাদের অধ্যবসায় নিরন্তর।......এইরকম গবর্নমেন্টের প্রভাব কোনো অংশে অসম্মানকর নয় এবং তাতে মনুষ্যত্বের হানি করে না। সেখানকার শাসন বিদেশীয় শক্তির নিদারুণ নিষ্পেষণী যন্ত্রের শাসন নয়।......এরা দেখতে দেখতে চারদিকে উন্নতির পথে, মুক্তির পথে, অগ্রসর হতে চলল। ভারতবর্ষ ইংরাজের সভ্য-শাসনের জগদ্দলপাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে।'

অন্যেরা যদি পেরেছে, তবে আমরা কেন পারব না? আমাদের আস্থা ছিল আমাদের নিজ শক্তিতে, আমাদের বুদ্ধিতে, আমাদের অধ্যবসায়, ধৈর্য এবং সাফল্যলাভের ক্ষমতায়। যত বাধা আছে তা আমাদের জানা ছিল—আমরা দরিদ্র, আমরা পিছিয়ে-পড়া জাত, আমাদের মধ্যে আছে নানা ভেদবিভেদ, প্রতিক্রিয়াপন্থী নানা দল; তবু আমরা প্রস্তুত সে-সবকিছুর সম্মুখীন হতে, তাকে অতিক্রম করতে। জানতাম আমরা যে খুব উচ্চমূল্যই দিতে হবে, কিন্তু আমরা তার জন্য তৈরি, আর আমাদের বর্তমান অবস্থায় দিনের পর দিন যে দাম দিতে হচ্ছে তার চেয়ে আর কি বেশি দিতে হবে।

কিন্তু বাইরে ব্রিটিশ শাসন যতক্ষণ আছে, আমাদের সমস্ত উদ্যোগ ব্যর্থ করে দিচ্ছে— ততক্ষণ আমাদের ভিতরের সমস্যার সমাধান শুরু করব কি করে?

তবু নূতন প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা যখন কিছু সুযোগ পেয়েছি, হোক না তা সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, সেইটুকুই আমরা পুরোপুরি কাজে লাগাব এই স্থির হল। মন্ত্রীদের পক্ষে মর্মান্তিক সে প্রয়াস; দায়িত্ব ও কর্মভারে তাঁরা পীড়িত, স্থায়ী কর্মচারীদের সঙ্গে এ ভার যে ভাগ করে নেবেন সে উপায়ও নেই, কারণ উভয়ের মধ্যে না ছিল কোনো পরস্পর-সঙ্গতি, না ছিল লক্ষ্য সম্বন্ধে মতের কোনো ঐক্য। দুর্ভাগ্যবশত, সংখ্যায়ও মন্ত্রীরা ছিলেন সামান্য। সরল জীবনযাত্রা ও সাধারণের অর্থ ব্যবহারে মিতব্যয়িতার দৃষ্টান্তস্থল তাঁরা হবেন এইরকমই সকলে ধরে নিয়েছিল। সামান্য বেতন তাঁরা গ্রহণ করতেন—এমন আশ্চর্য ব্যাপারও দেখা গেছে যে, মন্ত্রীর সচিব বা আই. সি. এস. অন্য কোনো সহকারী, মন্ত্রীর চেয়ে চার পাঁচ গুণ বেশি বেতন ও ভাতা পাচ্ছেন। সিভিল সার্ভিসের কর্মচারীদের বেতনাদি কমাবার অধিকার আমাদের ছিল না। এও হয়েছে যে, মন্ত্রী রেলগাড়ীতে দ্বিতীয়, এমনকি, তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করছেন কিন্তু তাঁর অধীনস্থ কোনো কর্মচারী যাচ্ছেন প্রথম শ্রেণীতে বা রাজোচিত স্বতন্ত্র গাড়িতে।

উপর থেকে ফরমাস জারি করে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ প্রাদেশিক শাসনকর্মে নিরন্তর হস্তক্ষেপ করেছেন, এমন কথা প্রায়ই শোনা যায়। একথা সম্পূর্ণ অসত্য, আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা হয়নি। কংগ্রেস-কর্তৃসভা কেবল এই-টুকুই ইচ্ছা করেছেন যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের মূল বিষয়ে প্রাদেশিক সরকার সর্বত্রই যেন এক ধারা অনুসরণ করেন, এবং নির্বাচনী ইস্তাহারে কংগ্রেসের যে কার্যক্রম নির্দিষ্ট হয়েছিল তা যেন যথাসাধ্য কার্যে পরিণত করতে চেষ্টা করেন। বিশেষ করে, গবর্নর ও ভারত-সরকার সংক্রান্ত ব্যাপারে কর্মনীতি সর্বত্র এক হবার প্রয়োজন ছিল।

কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রইল, কারও কাছে তার কৈফিয়ত দেবার প্রয়োজন নেই, এদিকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হল--এর ফলে প্রাদেশিক সংকীর্ণতা ও ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি হয়ে ভারতের ঐক্যবোধ ক্ষুণ্ণ হবারই কথা। এইটাই বোধ হয় ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের লক্ষ্য ছিল যাতে তাদের বিভেদসৃষ্টির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহ্যবাহী অপরিবর্তনীয় দায়িত্বহীন ভারত-গবর্নমেন্ট রইল পর্বতের মত অচল হয়ে, বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের ক্ষেত্রে সর্বত্রই তার একই কর্ম-নীতি। দিল্লী-সিমলার নির্দেশবাহী গবর্নররাও একই পথে চললেন। বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী সরকার এক্ষেত্রে অন্য পথ ধরলে, যে যার নিজের পথে চললে তাদের এক-এক দলকে এক-একভাবে বুঝিয়ে দেওয়া চলত। এইজন্য সমস্ত প্রাদেশিক সরকার একসূত্রে বদ্ধ হয়ে সমবেতভাবে ভারত-সরকারকে প্রতিরোধ করা একান্ত আবশ্যক ছিল। অন্য-পক্ষে, ভারত-সরকারেরও বিশেষ বাসনা ছিল যাতে এই ঐক্যসূত্র বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারেন, এবং একই সমস্যার অন্যত্র কিভাবে সমাধান হচ্ছে সে বিষয়ে বিবেচনা না করে প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে বোঝাপড়া করতে পারেন।

বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে, ১৯৩৭ সালে আগস্টমাসে, কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন :

'জাতির পুনর্গঠন ও সমাজব্যবস্থার উন্নতিকল্পে যেসকল গুরুতর সমস্যার সমাধান অপরিহার্য, সে-সকলের পর্যালোচনার জন্য কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ যেন একটি বিশেষজ্ঞ-সমিতি নিয়োগ করেন, কংগ্রেসের কর্মপরিষৎ এই অনুরোধ করেন। এই সমাধানের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক পরিবীক্ষণ-ব্যবস্থা ও তথ্যসংগ্রহ এবং কি লক্ষ্য নিয়ে আমরা সমাজকে গড়তে চাই স্পষ্টভাবে তার নির্ধারণ। অনেক সমস্যা আছে যা প্রত্যেক প্রদেশে স্বতন্ত্রভাবে সম্যক সমাধান করা সম্ভব নয়, বিভিন্ন প্রতিবেশী প্রদেশের স্বার্থ সেক্ষেত্রে পরস্পর-সংবদ্ধ। বন্যা নিবারণ, সেচকর্মে জলের ব্যবহার, ভূমিক্ষয় সমস্যার সমাধান, ম্যালেরিয়া দূরীকরণ এবং হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক প্রভৃতি পরিকল্পনা গ্রহণ সম্পর্কে বিভিন্ন নদনদী ও তার নিম্নভূমি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যসংগ্রহ আবশ্যক, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এসম্বন্ধে বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রয়োজন। বিভিন্ন শিল্পের বিস্তার ও নিয়ন্ত্রণকল্পেও বিভিন্ন প্রদেশের সমবেত ও সুসঙ্গত উদ্যোগ আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে কর্মপরিষদের পরামর্শ এই যে, আমাদের সম্মুখে যে সমস্যা তার স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য, একটি আন্তঃপ্রাদেশিক বিশেষজ্ঞ-সমিতি নিয়োগ করা হোক—এই সমিতি নির্দেশ করে দেবেন কি প্রণালীতে কোন পরম্পরায় এই সকল সমস্যার সমাধান-চেষ্টা করা হবে। বিভিন্ন সমস্যা স্বতন্ত্রভাবে বিচার করে দেখবার জন্য, এবং এপ্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার সম্মিলিত হয়ে কি চেষ্টা করতে পারেন সে-সম্বন্ধে উপদেশ দেবার জন্য বিশেষ সমিতি গঠনের প্রস্তাবও এই সমিতি করতে পারেন।'

এই প্রস্তাব থেকে বোঝা যাবে, প্রাদেশিক মন্ত্রীমন্ডল-সমূহকে কি ধরনের পরামর্শ দেওয়া হত। অর্থনৈতিক ও শিল্পসংক্রান্ত ব্যাপারে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে সহযোগিতা কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ যে কিরূপ প্রার্থনীয় মনে করতেন, তাও এর থেকে বোঝা যায়। এই সহযোগিতা কেবল কংগ্রেস-গবর্নমেন্টগুলিতেই যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, যদিও নির্দেশ যা দেবার তাদেরই দেওয়া হত। নদীসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য-সংকলনের কাজ কোনো বিশেষ প্রদেশে আবদ্ধ থাকতে পারে না; গাঙ্গেয় প্রদেশ-সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধান, গঙ্গানদী কমিশন গঠন—বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই কাজ এখনও আরম্ভ করা যায়নি, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও বাঙলা এই তিন প্রদেশের সহযোগিতা ছাড়া একাজ করা সম্ভব নয়।

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ কংগ্রেস কিরূপ প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন তাও এই প্রস্তাব থেকে বোঝা যায়। যতক্ষণ না কেন্দ্রীয় সরকার লোকায়ত্ত হয়, প্রাদেশিক সরকারসমূহ বন্ধনমুক্ত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এরূপ কর্ম-পদ্ধতি গ্রহণ সম্ভব নয়; তবু আমরা আশা করেছিলাম যে একান্ত প্রয়োজনীয় প্রারম্ভিক কৃত্য সম্পন্ন করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। দুর্ভাগ্যবশত, বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারকে নিজের নিজের সমস্যা নিয়ে এত ব্যস্ত

থাকতে হয়েছিল যে এই প্রস্তাব সত্বর কার্যে পরিণত হতে পারেনি। ১৯৩৮ সালের শেষভাগে ন্যাশন্যাল প্লানিং কমিটি বা জাতীয় পরিকল্পনা সংসদ গঠিত হয়, আমি তার সভাপতি হই।

অনেকসময় আমি কংগ্রেস-সরকারসমূহের কার্যাবলীর সমালোচনা করেছি, তাঁদের উদ্যোগের ধীরগতিতে বিরক্ত হয়েছি। কিন্তু পিছনে তাকিয়ে আজ মনে হয়, নানা বাধাবিঘ্ন ঘিরে থাকা সত্ত্বেও, সামান্য সওয়া দুই বছরের মধ্যে তাঁরা যতটা কাজ করতে পেরেছিলেন তা আশ্চর্য। দুর্ভাগ্যবশত, তাঁদের কোনো কোনো উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয়নি, তার কারণ সেসব চেষ্টা ঠিক যখন সম্পূর্ণ হবার মুখে সেসময় তাঁরা পদত্যাগ করেন; আর তাঁদের স্থলাভিষিক্ত ব্রিটিশ গবর্নর সেসব কাজ চাপা দেন। চাষী ও শ্রমিক দুয়েরই অবস্থার এসময়ে অনেক উন্নতি হয়, তারা নববল লাভ করে। এই সময়কার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থা হল জনগণের মধ্যে বনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন। এই পদ্ধতি শুধু যে আধুনিকতম শিক্ষাতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তা নয়, বিশেষ করে ভারতবর্ষের অবস্থার উপযোগী।

উন্নতির পথে পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করেছে তারা যাদের চিরন্তন স্বার্থ এর বিপক্ষে। কানপুরের বস্ত্রশিল্পের অন্তর্গত শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্য যুক্তপ্রদেশ সরকার যে সমিতি নিযুক্ত করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে মালিকেরা (তাঁরা অধিকাংশই ইউরোপীয়, ভারতীয়ও কেউ কেউ ছিলেন) অত্যন্ত অসৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করেন, সমিতি যেসব তথ্য চেয়েছিলেন অনেকক্ষেত্রেই তা তাঁদের দেওয়া হয়নি। দীর্ঘকাল মালিক ও সরকারের সম্মিলিত ও সংহত বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছে শ্রমিককে, আর পুলিশের সাহায্য তো মালিকরা ইচ্ছা করলেই পেয়েছে। তাই কংগ্রেসী সরকারের আমলে নীতি-পরিবর্তন মালিকদের পছন্দ হয়নি। শ্রীযুক্ত বি. শিবরাও—দীর্ঘকাল ইনি ভারতে শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছেন ধীরপন্থীরূপে—মালিক শ্রেণীর কলকৌশল সম্বন্ধে লিখছেন: 'ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই তাদের পক্ষে একথা বিশ্বাস করা উচিত যে, পুলিশের সহায়তায় মালিকেরা এই সকল ক্ষেত্রে (অর্থাৎ ধর্মঘট প্রভৃতিতে) কি পরিমাণ চাতুর্য ও ন্যায়-অন্যায়বোধের অভাবের পরিচয় দেয়।' অধিকাংশ দেশের গবর্নমেন্টই যেভাবে গঠিত তাতে তারা স্বভাবতই মালিকের প্রতিই অনুকূল। শ্রীযুক্ত শিবরাও দেখিয়েছেন যে এরকম হবার আরও একটি কারণ আছে এদেশে। 'ব্যক্তিগত বিরুদ্ধতার কথা ছেড়ে দিয়েও, ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজকর্মচারীর মনেই এই আশঙ্কা বদ্ধমূল যে, ট্রেড ইউনিয়ন যদি গড়ে উঠতে দেওয়া যায় তাহলে জনগণের মধ্যে চেতনা ছড়িয়ে পড়বে; ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন কিছুকাল পরে পরে যেভাবে অসহযোগ বা আইন-অমান্য-আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে তাতে জনসংগঠন ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।'*

* বি. শিবরাও: 'দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওআর্কার ইন ইন্ডিয়া' (লন্ডন ১৯৩৯)

সরকার কর্মনীতি নির্ধারণ করেন, ব্যবস্থাপরিষদ আইন পাশ করেন; কিন্তু এই নীতি ও আইনের কার্যত কি ব্যবহার হবে শেষ পর্যন্ত তা নির্ভর করে কর্মচারীবৃন্দের উপর। এইজন্য প্রাদেশিক সরকারকে অবশ্যই স্থায়ী কর্মচারীদের উপর নির্ভর করতে হয়েছে, বিশেষত ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ও পুলিশের লোকদের উপর। এই সকল কর্মচারীরা অন্যরকম আবহাওয়ায় কর্তৃত্বপ্রিয়তার ধারায় বর্ধিত—এই নূতন পরিবেশ, সর্বসাধারণের স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা, তাদের স্বীয় পূর্বপ্রতিষ্ঠার হানি, এতদিন যাদের গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে দিতে অভ্যস্ত তাদেরই কাছে নতিস্বীকার—এসব তাদের রুচিকর হয়নি। প্রথমে তারা শঙ্কান্বিত হয়েছিল কি হবে এই কথা ভেবে। কিন্তু এমন ভয়ানক কিছুই ঘটল না, তারা ক্রমশ তাদের পুরাতন অভ্যস্ত পদ্ধতিতেই নিবিষ্ট হল। হাতেকলমে যে কাজ করছে তার কাজে হস্তক্ষেপ করা মন্ত্রীদের পক্ষে সহজ নয়—যেক্ষেত্রে এরূপ হস্তক্ষেপের সুস্পষ্ট কারণ রয়েছে সেক্ষেত্রেই তা করা সম্ভব। এইসকল কর্মচারীরা নিবিড় ঐক্যসূত্রে বদ্ধ—একজনকে অন্যত্র সরিয়ে দিলে তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিও একই পদ্ধতিতে কাজ করে যাবে। এইসকল কর্মচারীদের চিরন্তন প্রতিক্রিয়াপন্থী স্বৈরতান্ত্রিক মনোবৃত্তি অকস্মাৎ পরিবর্তন করা অসম্ভব। এদের কারও কারও মধ্যে পরিবর্তন আসতে পারে, কেউ কেউ চেষ্টা করতে পারে নূতন অবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে—কিন্তু এদের অধিকাংশ, চিন্তায় ও কর্মে এতদিন অন্য পথে চলে এসেছে; হঠাৎ আজ তারা কি করে রূপান্তরিত হয়ে নবযুগের ধ্বজাবাহীতে পরিণত হবে? বড়জোর তারা নিষ্ক্রিয়ভাবে আনুগত্য স্বীকার করতে পারে; যাতে তাদের আস্থা নেই, যা তাদের চিরাগত স্বার্থকে ব্যাহত করছে, এরকম নবপ্রণালীর কাজে তারা জ্বলন্ত উৎসাহে এগিয়ে আসবে এটা স্বাভাবিক নয়। দুঃখের বিষয় এই নিষ্ক্রিয় আনুগত্যও তারা সবসময় স্বীকার করেনি। সিভিল সার্ভিসের দীর্ঘকাল স্বৈর-পন্থায় অভ্যস্ত ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের মধ্যে এই একটা ধারণা জন্মেছিল যে, যে-সকল ব্যাপার বিশেষভাবে তাদেরই বিষয় মন্ত্রী ও ব্যবস্থাপকবর্গ তাতে অনধিকার প্রবেশ করছেন। ভারতবর্ষ বলতে এইসব কর্মচারীদের, বিশেষত তাদের মধ্যে ব্রিটিশ যারা আছে তাদেরই বোঝায়, অন্য যা কিছু আছে সবই গৌণ—দীর্ঘকালের এই ধারণা সহজে যেতে চায় না। নবাগতদের স্বীকার করে নেওয়া সহজ নয়—তাদের আদেশ পালন করে চলা আরও কঠিন। অস্পৃশ্যেরা জোর করে পবিত্র মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে গোঁড়া হিন্দুর যে মনোভাব হয় এদেরও সেই ভাব হয়েছিল। এত পরিশ্রমে গড়া যে জাতিদর্পের সৌধ, যে দর্প প্রায় তাদের ধর্মে পরিণত হয়েছিল—তাতে ফাটল ধরেছে। শোনা যায় চীনেরা ঠাট বজায় রাখতে খুব উদ্‌গ্রীব, কিন্তু এবিষয়ে ভারতে ব্রিটিশের মত মরীয়া তাদের মধ্যেও কেউ আছে কি না আমার সন্দেহ। কেননা, ব্রিটিশের পক্ষে এটা শুধু ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতিগত সম্মানের কথা নয়; এর সঙ্গে তাদের শাসন ও চিরাগত স্বার্থ জড়িত।

তবু এই অনধিকার প্রবেশকারীদের সহ্য না করে উপায় থাকল না; কিন্তু বিপদের আশঙ্কা যত কমে যেতে লাগল, এই ধৈর্যও ততই ক্ষীণ হতে থাকল। শাসনব্যবস্থার

সর্বত্রই এই ভাব বিস্তারলাভ করেছিল, তবে এটা বিশেষ করে লক্ষ্য করা গেল বিভিন্ন জেলায় রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধান কেন্দ্র থেকে দূরে, এবং আইন ও শৃঙ্খলার ব্যাপারে, যে বিষয়টি জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ তাঁদের স্বকীয় ক্ষেত্র বলে মনে করতেন। কংগ্রেস-সরকার ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর জোর দিয়েছিলেন, এই অজুহাতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ এমন সব ব্যাপার ঘটতে দিয়েছিল যা কোনো গবর্নমেন্টই সাধারণত স্বীকার করতে পারে না। বস্তুত এ-বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চয় যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব দুঃখকর ঘটনার প্রেরণা এসেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা পুলিশের কাছ থেকেই। ধর্মসাম্প্রদায়িক যেসব দাঙ্গা ঘটেছে তার নানা কারণ আছে, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিশ যে সব ক্ষেত্রেই নির্দোষ এমন কথা বলা যায় না। অভিজ্ঞতার ফলে দেখা যায় যে, সত্বরতা ও দক্ষতার সঙ্গে প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করলে সহজেই বিশৃঙ্খলার পরিসমাপ্তি ঘটে, কিন্তু বারবার লক্ষ্য করেছি বিস্ময়কর শৈথিল্য, কর্তব্যে স্বেচ্ছাকৃত অবহেলা। স্পষ্টই বুঝতে পারা গিয়েছিল যে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কংগ্রেস-সরকারকে অপদস্থ করা। যুক্তপ্রদেশে শিল্পপ্রধান কানপুর শহরে দেখা গেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চরম অকর্মণ্যতা ও অব্যবস্থার চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত যা ইচ্ছাকৃত না হয়ে যায় না। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষের দিকে ও তৃতীয় দশকের গোড়ার দিকেই বেশি দেখা গেছে ধর্মসাম্প্রদায়িক কলহ ও তার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংঘর্ষ। কংগ্রেস শাসনভার গ্রহণ করবার পর এটা অনেকটা কমে এসেছে। এর পরে এই সংঘর্ষ বিশেষভাবে রাষ্ট্রীয় কলহের আকার গ্রহণ করেছিল—তার পিছনে ছিল এই কলহকে জাগিয়ে তুলবার সংঘবদ্ধ রূপ দেবার চেষ্টা।

কর্মপটুতার একটা সুনাম ছিল সিভিল সার্ভিসের, এই সুনামের অনেকটাই অবশ্য নিজেদেরই রটনা। কিন্তু স্পষ্টই দেখা গেল, নিজেদের অভ্যস্ত কর্তব্যের সংকীর্ণ সীমার বাইরে তাদের কোনোই যোগ্যতা নেই। সর্বসাধারণকে তারা ভয় করেছে, অবজ্ঞাও করেছে, এদের সহযোগিতা ও সমর্থন লাভ করতে পারেনি; গণতন্ত্র-সম্মত বিধিতে কাজ করবার শিক্ষাই তাদের হয়নি; দ্রুত সামাজিক উন্নতিবিধানের জন্য বিরাট কোনো পরিকল্পনা সম্বন্ধে তাদের ধারণামাত্রই নেই—নিজেদের কল্পনা-শক্তির অভাব ও আপিসী কেতা দ্বারা তারা পারে কেবল বাধাসৃষ্টি করতে। বিশেষ কয়েকজনের কথা বাদ দিলে, ব্রিটিশ ও ভারতীয় উভয়শ্রেণীর উচ্চকর্মচারীদের সকলের সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য। তাদের সামনে যে নূতন কর্তব্যভার উপস্থিত তা পালন করতে তারা যে কতদূর অযোগ্য তা দেখলে আশ্চর্য হতে হয়।

সর্বসাধারণের প্রতিনিধি যাঁরা তাঁদের মধ্যেও অযোগ্যতা ও অপটুতার নিদর্শন প্রভূতই দেখা গেছে। কিন্তু সে ত্রুটি মোচন করেছে তাঁদের কর্মপ্রেরণা ও উৎসাহ, জন-সাধারণের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগ, নিজেদের ভ্রম থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও শক্তি। এক্ষেত্রে দেখেছি উচ্ছলিত প্রাণশক্তি, উত্তেজনা, কর্মপ্রেরণা—ব্রিটিশ শাসক-শ্রেণী ও তাদের সমর্থকদের উদ্যমহীনতা ও রক্ষণশীলতার সঙ্গে তুলনা করলে আশ্চর্য হতে হয়। গতানুগতিকতার দেশ এই ভারতবর্ষে এক বিচিত্র ভূমিকা-

বিনিময়ের দৃশ্য দেখা গেল। ব্রিটিশ এদেশে এসেছিল এক গতিমান সমাজের প্রতিনিধি হয়ে; এখন তারাই হয়ে দাঁড়াল স্থাবর, অপরিবর্তনীয় ঐতিহ্যের প্রধান সমর্থক; আর ভারতীয়দের মধ্যে এমন লোক দেখা দিল যারা প্রগতিবাদী, পরিবর্তন ঘটাতে যারা উৎসুক—শুধু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও। অবশ্য এইসব ভারতীয়দের পশ্চাতে ছিল বিরাট নবপ্রেরণা ও শক্তি যার মর্ম তারাও সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। এই ভূমিকা-পরিবর্তনে এই কথাই প্রমাণিত হল যে, অতীতে ব্রিটিশ এদেশে যতই উন্নতিসাধন ও সৃষ্টিকর্মের ধারক হয়ে থাক না কেন, দীর্ঘকাল পূর্বেই তাদের সে-লীলা সাঙ্গ হয়েছে, এখন তারা সকল উন্নতিপ্রয়াসের পথে বাধামাত্র। তাদের কর্মের গতি এমন শ্লথ যে ভারতবর্ষের ঐকান্তিক সমস্যাবলীর সমাধান তাদের সাধ্য নয়। একসময় তাদের উক্তিতে যে সুস্পষ্টতা ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যেত আজ তা মূঢ়চিত্ত শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বরে পর্যবসিত।

দীর্ঘকাল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই এক কাহিনী প্রচার করে আসছেন যে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতে উচ্চকর্মচারীদের সাহায্যে আমাদের স্বায়ত্তশাসনের কঠিন ও সূক্ষ্ম কর্তব্যে দীক্ষিত করছেন। ব্রিটিশরা এদেশে এসে তাঁদের অভিজ্ঞতার সুযোগ দেবার কয়েক সহস্র বছর পূর্ব থেকে আমরা তো যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গেই কাজ চালিয়ে আসছি। আমাদের যেসব গুণ থাকা উচিত তার অনেকগুলি আমাদের নেই একথা সত্য—কোনো কোনো ভ্রান্তমতি লোকে এমন কথাও বলে থাকে যে, ব্রিটিশ-শাসনকালে আমাদের চরিত্রের এ ত্রুটি বেড়ে গিয়েছে। সে যাই হোক, আমাদের যাই ত্রুটি থাকুক, একথা আমরা স্পষ্টই বুঝে নিয়েছি যে এই সকল উচ্চকর্মচারীরা ভারতবর্ষকে উন্নতির পথে নিয়ে যাবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। কেবল আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা যে রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য তার পরিচালনায় যে গুণের প্রয়োজন তাতে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন মেটেনি—ঐ সকল গুণ প্রকৃতপ্রস্তাবে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অন্যকে শিক্ষা দেবার আগে তাদের উচিত নিজেদের পুরাতন শিক্ষা বিস্মৃত হওয়া, বিস্মরণীর জলে অবগাহন করে নিজেদের অতীতকে মার্জন করা।

একদিকে লোকায়ত্ত প্রাদেশিক সরকার, অপর দিকে তার উপরে স্বৈরতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় সরকার, এ উভয়ের ঘাত প্রতিঘাতে নানা বিপরীত ব্যাপার ঘটতে লাগল। কংগ্রেস-সরকার ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রসারে উদ্যোগী; প্রাদেশিক সি. আই. ডি., যাদের কাজ ছিল রাষ্ট্রকর্মীদের ও সরকার-বিরোধী বলে সন্দেহভাজন অন্য সকলের উপর নজর রাখা, তাদের বহুধাবিস্তৃত কার্যকলাপ তারা নিরস্ত করতে, অপরপক্ষে কেন্দ্রীয় সি. আই. ডি-র কার্যকলাপ পূর্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহের সঙ্গে পরিচালিত হতে থাকল। শুধু যে আমাদের চিঠিপত্র পরীক্ষা করে দেখা হতে লাগল তা নয়, মন্ত্রীদের চিঠিপত্রও অনেক সময় পড়ে দেখা হত, যদিচ খুব সাবধানে; আর এরকম যে হত তা কর্তৃপক্ষ অবশ্য কখনও স্বীকার করেননি। গত পঁচিশ বৎসরে দেশে কি বিদেশে যে-কোনো ঠিকানায় আমার লেখা একখানি চিঠিও এদেশের ডাকবিভাগের মারফত

বায়নি যার সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছি যে এ চিঠি কোনো গুপ্ত বিভাগের লোক পড়ে দেখেনি বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে নকল করে রাখেনি। টেলিফোনে কথা বলবার সময়ও আমাকে স্মরণ রাখতে হয়েছে যে কোনো তৃতীয় পক্ষ সম্ভবত এই কথা-বার্তা আমার অজ্ঞাতে শুনছে। আমি যেসব চিঠিপত্র পেতাম তাও পরীক্ষিত হয়ে আসত। একথার অর্থ অবশ্য এ নয় যে, প্রত্যেকটি চিঠি সর্বদাই পরীক্ষা করে দেখা হয়; কোনো কোনো সময় এরকম হয়েছে, আর অন্য সময় কিছু কিছু চিঠি দেখে দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে যুদ্ধকালীন অবস্থার কোনো সম্পর্ক নেই—সে-সময় তো ডবল পরীক্ষা।

সৌভাগ্যবশত, আমরা প্রকাশ্যভাবেই কাজ করে এসেছি, আমাদের রাষ্ট্রীয় কার্য-কলাপের মধ্যে গোপন করবার কিছু ছিল না। তবু আমাদের চিঠি অন্য লোক পড়বে, কথাবার্তা অন্যালোক শুনবে, সর্বদা এটা ভাবতে ভাল লাগে না। ঘাড়ের উপর দিয়ে কেউ দেখছে একথা ভাবলে নিজের ইচ্ছামত লেখা চলে না।

মন্ত্রীরা গুরুতর পরিশ্রম স্বীকার করতে লাগলেন, তার ফলে অনেকের স্বাস্থ্যভঙ্গ হল, তাঁদের নবীনতা ও স্ফূর্তি বিনষ্ট হয়ে তাঁরা জীর্ণশীর্ণ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তবু আদর্শপ্রণোদিত হয়ে তাঁরা কাজ করে চললেন, তাঁদের আই. সি. এস. সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের দ্বারাও যথেষ্ট কাজ করিয়ে নিলেন—অনেক রাত পর্যন্ত তাঁদের আপিসে বাতি জ্বলতে দেখা যেত।

১৯৩৯ সালে নভেম্বরের প্রথমে যখন বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করলেন তখন অনেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল—সরকারী আপিস আবার ঠিক চারটেয় বন্ধ, আবার সেই পূর্বমূর্তিধারণ, সেই চারদিকে ঘেরা বাড়ি যেখানে কোনো গোলমাল নেই, সর্বসাধারণের প্রবেশ যেখানে অবাঞ্ছিত। জীবনে আবার সেই পূর্বধারা ও ধীরগতি ফিরে এল, অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যায় এখন পোলো-টেনিস-ব্রিজের অবসর, ক্লাব-জীবনের নানা সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অবকাশ। একটা দুঃস্বপ্ন যেন কেটে গিয়েছে, ব্যবসা ও খেলা আগেকার মতই চলতে পারে। ইউরোপে যুদ্ধ চলেছে তা সত্য, হিটলারের সৈন্য পোলাণ্ডকে ধ্বংস করেছে বটে—কিন্তু সে তো অনেক দূরের ব্যাপার। সৈন্যেরা তাদের কর্তব্য করছে, যুদ্ধে প্রাণ দিচ্ছে—তা এখানেও তো কর্তব্যের অভাব নেই, শ্বেতচর্মের দায়ও তো বহন করতে হবে সসম্মানে, যোগ্যতার সঙ্গে।

কংগ্রেস-মন্ত্রিসভা যে স্বল্পকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল তার মধ্যেই আমাদের এই পূর্ব-বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়েছিল যে, ব্রিটিশ যে রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো চাপিয়ে দিয়েছে তাই ভারতবর্ষের উন্নতির পথে প্রধান বাধা। একথা সম্পূর্ণ সত্য যে, আমাদের চিরাগত নানা সংস্কার, প্রথা ও লোকাচার আমাদের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করছে, সেগুলি দূর হওয়াই চাই কিন্তু ভারতের অর্থনৈতিক সংগঠনের বিস্তারপ্রবণতা এইসকল প্রথা ও সংস্কারে ততটা ক্ষুণ্ণ হয়নি, যতটা হয়েছে ব্রিটিশের রাষ্ট্রিক ও আর্থিক চাপে। এই কঠিন কাঠামো যদি না থাকত তাহলে প্রসার অবশ্যম্ভাবী ছিল,

আর তার ফলে সামাজিক প্রথার পরিবর্তন ঘটে নানা পুরাতন সংস্কার ও লোকাচারের অপসরণ নিশ্চয়ই ঘটত। এইজন্য সমস্ত মনোযোগ নিবিষ্ট করতে হয়েছিল এই কাঠামো ধ্বংসের কাজে; অন্য ব্যাপারে নিযুক্ত সকল উদ্যম বালুকায় হলকর্ষণের মতই নিষ্ফল হয়েছিল। অতীতের নানা ভগ্নাবশেষ, সামন্ততন্ত্রী ভূস্বত্বপ্রথার ভিত্তিতে এই কাঠামো দাঁড়িয়ে থেকে এইসকল পূর্বপ্রথার আনুকূল্য করে চলেছে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-প্রবর্তিত রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে গণতন্ত্রের কোনো সামঞ্জস্য হতে পারে না, তাই এই দুইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। এইজন্যই ১৯৩৭-৩৯ সালের আংশিক গণতন্ত্র সর্বদাই ছিল সংগ্রামের সম্মুখীন। সরকারী ব্রিটিশ মতে যে বলে, যে ভারতবর্ষে গণতন্ত্র সফল হয়নি তাও এইজন্যই—কারণ তাঁরা যে কাঠামো তৈরি করেছেন যেসব কায়েমী স্বার্থ খাড়া করেছেন তা রক্ষিত হল কি না তা দিয়েই তাঁরা বিচার করে থাকেন। তাঁদের অনুগত পোষা যে গণতন্ত্রের তাঁরা অনুমোদন করতে পারতেন, তা যখন প্রতিষ্ঠিত হল না, নানাবিধ সুদূরপ্রসারী সংস্কার সাধনের চেষ্টা হতে লাগল, তখন গণতন্ত্রের ভণিতা ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করা ছাড়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের আর গত্যন্তর রইল না। এর সঙ্গে ইউরোপে ফ্যাশিজমের উদ্ভব ও বিস্তারের বিশেষ সামঞ্জস্য আছে। ভারতবর্ষে যে আইনের সর্বময়তা ব্রিটিশজাতি গৌরব করতেন তাও চুকে গিয়ে কর্তৃপক্ষের আদেশ ও অর্ডি-ন্যান্সের বলে জবরদখলের শাসন প্রবর্তিত হল।

৫ : সংখ্যালঘু সমস্যা : মুসলিম লীগ : মিস্টার এম. এ. জিন্না

গত সাতবছরে মুসলিম লীগের অভিব্যক্তি ও বিস্তার এক অভিনব ব্যাপার। মুসলমান সম্প্রদায়ের তরুণবর্গকে কংগ্রেস থেকে দূরে রাখবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশের উৎসাহে ১৯০৬ সালে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। দীর্ঘকাল এই লীগ উচ্চশ্রেণীর পরিচালিত একটি ছোট প্রতিষ্ঠানরূপে অস্তিত্ব বাঁচিয়ে চলছিল—মুসলমান জনসাধা-রণের উপরে এর কোনো প্রভাব ছিল না, তারা কেউ এর কথা বড় একটা জানতই না। এর গঠনতন্ত্রই ছিল এরকম যাতে ছোট একটি গোষ্ঠীর মধ্যেই এই লীগ সীমাবদ্ধ ছিল, একই দলের হাতে বরাবর এর পরিচালনভার ন্যস্ত। তৎসত্ত্বেও, ঘটনাচক্রে এবং মুসলমানদের মধ্যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভবে একে কংগ্রেসের অভিমুখে এগিয়ে নিয়ে চলছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের, এবং তুরস্কের খিলাফত ও মুসলমান তীর্থ-স্থলসমূহের অবস্থা-পরিবর্তন ভারতের মুসলমানদের মনে বিশেষ দাগা দিয়েছিল, যার ফলে তারা অত্যন্ত ব্রিটিশ-বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিল। মুসলিম লীগ যেভাবে গঠিত তাতে এই জাগ্রত ও উত্তেজিত জনসংঘকে পথনির্দেশ করা তার সাধ্য ছিল না; বস্তুত লীগ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নিজ অস্তিত্বই একরকম হারিয়ে ফেলে। খিলাফত কমিটি বলে মুসলমানদের একটি নূতন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে ও কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগে কাজ করতে থাকে। বহুসংখ্যক মুসলমান কংগ্রেসে যোগ দিয়ে কাজ করতে থাকেন।

১৯২০-২৩ সালের প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের পর খিলাফত কমিটির অস্তিত্বও ক্রমশ লুপ্ত হয়, কারণ তার অস্তিত্বের মূলে যে তুরস্কের খিলাফত তারই বিলোপ ঘটে। মুসলমান জনগণ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে—হিন্দু জনগণেরও অল্প-বিস্তর সেই অবস্থা। তবে বহুসংখ্যক মুসলমান, বিশেষ করে যাঁরা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়-ভুক্ত, কংগ্রেসের অন্তর্গত হয়ে তার কাজে যুক্ত থাকেন।

এই সময় বিশৃঙ্খলভাবে ছোট ছোট অনেক মুসলমান প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে—অনেক সময় তাদের একের সঙ্গে অপরের সংঘর্ষও ঘটেছে। সাধারণের সঙ্গে তাদের কোনো যোগ ছিল না; ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাদের যতটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছে তাছাড়া রাষ্ট্র-ব্যাপারে তাদের আর কিছু গুরুত্ব ছিল না। তাদের প্রধান কাজ ছিল ব্যবস্থাপরিষদে ও চাকরিক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য বিশেষ সুবিধার ও সংরক্ষণের দাবি জানানো। এ ব্যাপারে তারা অবশ্য মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বই করেছে, কারণ হিন্দুর সংখ্যা-গরিষ্ঠতা, এবং শিক্ষা, বৃত্তি ও শিল্পক্ষেত্রে হিন্দুর উন্নত অবস্থায় মুসলমানদের মনে বিদ্বেষ ও আশঙ্কার একটা ভাব জেগে উঠেছিল। মিস্টার এম. এ. জিন্না ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্র থেকে বিদায় নিলেন—বস্তুত তিনি ভারতবর্ষ থেকেই বিদায় নিয়ে ইংলন্ডে গিয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন।

১৯৩০ সালের দ্বিতীয় আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় মুসলমানদের কাছ থেকে বিশেষ সাড়া পাওয়া যায় যদিও ১৯২০-২৩ সালের মত নয়। এই আন্দোলনে যাঁরা কারারুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্তত দশ হাজার মুসলমান ছিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, যাকে প্রায় সম্পূর্ণ মুসলমান প্রদেশ বলা চলে (শতকরা ৯৫ জন মুসলমান) এই আন্দোলনে প্রধান ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান নিয়েছিল। এই প্রদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রিয় নেতা খাঁ আবদুল গফুর খাঁর ব্যক্তিত্ব ও কৃতির ফলেই প্রধানত এটা সম্ভব হয়েছিল। ইদানীন্তনকালে ভারতবর্ষে যেসব আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর, কিভাবে আবদুল গফুর খাঁ তাঁর দুর্দমনীয় ও দ্বন্দ্বপ্রবণ দেশবাসীকে শান্তিপূর্ণ পথে প্রবর্তিত করলেন, যার ফলে তাদের অপরিসীম দুঃখ স্বীকার করে নিতে হয়েছে। ভয়ঙ্কর এই দুঃখ, যার তিক্ত স্মৃতি এখনও মোছেনি; তবু পাঠানরা একবারের জন্য হাত তোলেনি সরকারী বা অন্য পক্ষের গায়ে যাঁরা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন, এমনি তাদের শৃঙ্খলা ও আত্ম-সংযম। যখন একথা মনে করি যে ভাইয়ের চেয়ে বন্দুক আপন পাঠানের কাছে, কত সহজেই সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, আর কত সামান্য উত্তেজনাতেই সে খুন করতে পারে, তখন এই আত্মসংযম দৈব ঘটনার মত আশ্চর্য বলে বোধ হয়।

আবদুল গফুর খাঁর নেতৃত্বে সীমান্তপ্রদেশ ধীর দৃঢ়ভাবে দাঁড়াল কংগ্রেসের পাশে, সঙ্গে রইলেন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক মুসলমান—রাষ্ট্রচেতনায় যাঁরা উদ্বুদ্ধ। চাষী-মজুর শ্রেণীর মধ্যেও কংগ্রেসের প্রভাব ছিল অসাধারণ, বিশেষত যুক্ত-প্রদেশে, যেখানে তাদের উন্নতির জন্য নানা উদ্যোগের প্রবর্তন হয়েছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও একথা সত্য যে সমগ্রভাবে দেখতে গেলে মুসলমান জনসাধারণ পুনরায় তাদের

পুরাতন স্থানীয় সামন্ততন্ত্রী নেতাদেরই অধীন হয়ে পড়ছিল, হিন্দু ও অন্যান্যের হাত থেকে মুসলমান স্বার্থের রক্ষাকর্তার ছদ্মবেশে যাদের আবির্ভাব।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার মূল কথা হচ্ছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দাবির যথাযথ ব্যবস্থা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অবিচার থেকে তাদের রক্ষার আয়োজন। ভারতবর্ষের সংখ্যালঘু দল ইউরোপের মত জাতি বা উপজাতি-ঘটিত নয়, ধর্মসম্প্রদায়গত। জাতিতাত্ত্বিক বিচারে ভারতবর্ষে নানা বিচিত্র মিশ্রণ ঘটেছে, কিন্তু সেদিক দিয়ে ভারতবর্ষে কোনো সমস্যার উদ্ভব ঘটেনি, ঘটতে পারেও না। বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে যেসব পার্থক্য আছে সেসব অনেক সময় লক্ষ্যগোচরই হয় না, তার চেয়ে উল্লেখযোগ্য ধর্মগত পার্থক্য। ধর্মগত বাধাও চিরন্তন নয়, কারণ এক ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম-গ্রহণ সম্ভব; আর, ধর্মান্তর গ্রহণ করলেই লোক তার জাতি, সংস্কৃতি ও ভাষা-গত ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয় না। ধর্মের নাম করে লোকে নানা সুবিধা করে নিলেও, আধুনিককালে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় সংগ্রামে ধর্মের স্থান সামান্যই। ধর্মগত বৈষম্যে কোনো প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হয় না, কারণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্কে ধৈর্য অপরিসীম। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্মের স্থান নিয়েছে সাম্প্রদায়িকতা—এই সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠী-মনোবৃত্তি ধর্মসম্প্রদায়কে আশ্রয় করে গড়ে উঠলেও বস্তুত এর লক্ষ্য নিজ গোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সুখসুবিধা আদায়।

কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বারংবার চেষ্টা হয়েছে, বিভিন্ন দলের সম্মতিক্রমে এই সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের। এই চেষ্টা অল্পবিস্তর সফলও হয়েছে, কিন্তু মূলে সর্বদাই ছিল এক বাধা—ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের উপস্থিতি ও মতিগতি। স্বভাবতই ব্রিটিশরা চায়নি যে এমন সমাধান ঘটুক যার ফলে তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রিক আন্দোলন, যা ক্রমশ বিশাল আকার ধারণ করেছে, দৃঢ়বদ্ধ হতে পারে। একপক্ষকে বিশেষ সুবিধা দিয়ে অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে তাদের প্রবৃত্ত করবার পথ গভর্নমেন্টের কাছে মুক্ত—অন্য পক্ষেরা বিচক্ষণ হলে এই বাধাও তারা অতিক্রম করতে পারত, কিন্তু তাদের না ছিল বিবেচনা না ছিল দূরদর্শিতা। যখনই সাম্প্র-দায়িক সমস্যার কোনো সমাধান আসন্নপ্রায় হয়েছে, সেই সময়েই গভর্নমেন্ট এমন কোনো চাল দিয়েছে যার ফলে সব আয়োজন বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে।

সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণের জন্য সাধারণত যেসব ব্যবস্থা প্রযুক্ত হয়, যেমন লীগ অব নেশনস-নির্দিষ্ট নীতি, তা নিয়ে কোনো বিরোধ ঘটেনি। সেসব, এবং তার বেশি অনেক কিছুই মেনে নেওয়া হয়েছে। সকলের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রবিধানে আইনত ব্যষ্টি তথা সমষ্টির মৌল অধিকার, ধর্ম সংস্কৃতি ও ভাষা, সকল বিষয়ই সুরক্ষিত হবে একথা স্বীকৃত হয়। এছাড়া, ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসই তো বিভিন্ন সংখ্যালঘুসম্প্রদায় ও উপজাতির প্রতি বিশেষ ধৈর্য ও সহৃদয়তার সাক্ষী-স্বরূপ। ইউরোপে ধর্ম নিয়ে যে সুতীব্র দ্বন্দ্ব ও অত্যাচার চলেছে ভারতবর্ষের ইতিহাসে তার কোনো তুলনা নেই। ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধৈর্যের শিক্ষালাভ করতে আমাদের বিদেশে যেতে হয়নি, ভারতীয় জীবনে সে শিক্ষা সহজাত। ব্যষ্টিগত,

রাষ্ট্রিক ও নাগরিক অধিকারের ব্যাপারে ফরাসী ও আমেরিকান বিপ্লব এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ইতিহাস আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। তার পরে সমাজ-তান্ত্রিক চিন্তা ও সোভিয়েট বিপ্লবের প্রভাব আমাদের চিন্তাধারাকে অর্থনৈতিক বিচারে সচেতন করে তুলেছে।

ব্যষ্টি ও সমষ্টির এই সকল অধিকার তো থাকবেই, তাছাড়া এ কথাও সর্ববাদী-সম্মতিক্রমে স্বীকৃত হয়েছে যে, ব্যষ্টি ও সমষ্টির পূর্ণ বিকাশের প্রতিবন্ধকস্বরূপ যেসকল সমাজ ও লোকাচার-গত বাধা আছে তা দূর করবার জন্য রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সচেষ্ট হতে হবে, শিক্ষাব্যাপারে ও আর্থিক ক্ষেত্রে যেসব শ্রেণী পিছিয়ে আছে তাদের উন্নতির যত বাধা তা যাতে তারা দ্রুত অতিক্রম করতে পারে সেজন্য অবহিত হতে হবে। বিশেষ করে অবনত শ্রেণীসমূহের পক্ষে একথা প্রযোজ্য। এও স্থির হয় যে, নাগরিক ব্যাপারে নরনারীর সম্পূর্ণ অধিকার থাকবে।

কি বাকি থাকল? সংখ্যাগরিষ্ঠেরা পাছে রাষ্ট্রিক ব্যাপারে সংখ্যালঘুদের অভিভূত করে, এই ভয়। সাধারণত, সংখ্যাগরিষ্ঠ বলতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী চাষী-মজুরদেরই বোঝায়, এযাবৎ যারা কেবল বিদেশীদের দ্বারা নয়, দেশের উচ্চশ্রেণীর দ্বারাও শোষিত হয়েছে। ধর্ম ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত অধিকার রক্ষা যেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুত, সেখানে এক অর্থনৈতিক সমস্যাই প্রবল হয়ে উঠতে পারে—তার সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংগ্রাম হওয়া সম্ভব, কিন্তু বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের কোনো কারণ নেই, যদি না ধর্ম কোনো স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। এসব সত্ত্বেও, ধর্মগত বিরোধের ভাবনায় মানুষ এরূপ অভ্যস্ত হয়েছে, এবং সরকারের কার্যকলাপে ও ধর্মসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় এই বিরোধের কথাই তাদের মনে সর্বদা এরূপ জাগিয়ে রাখা হয়েছে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মসম্প্রদায়, অর্থাৎ হিন্দুরা, অন্যদের অভিভূত করে ফেলবে এই ভাবনায় মুসলমানদের মধ্যে অনেকের মনে উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছিল। মুসলমানদের মত প্রবল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়—সাধারণত যারা দেশের বিশেষ বিশেষ অংশে কেন্দ্রীভূত, যেসকল অংশ ভবিষ্যতে স্বায়ত্তশাসন লাভ করবে—সংখ্যাগরিষ্ঠরাও যে কি ভাবে তাদের স্বার্থহানি করতে পারে তা বুঝতে পারা যায় না। কিন্তু ভয় তো যুক্তি মানে না।

মুসলমানদের জন্য (এবং পরে অন্যান্য ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠীর জন্যও) পৃথক নির্বাচন-কেন্দ্রের ব্যবস্থা হল, এবং জনসংখ্যার অনুপাতে তাদের যা প্রাপ্য তার চেয়েও অধিক আসন তাদের দেওয়া হল। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভায় অতিরিক্ত আসন দিয়েও তো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ে পরিণত করা যায় না। বস্তুত পৃথক নির্বাচনপ্রথা প্রবর্তনের ফলে সংরক্ষিত সম্প্রদায়ের কতকটা ক্ষতিই হল, কারণ এর ফলে এদের সম্পর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠদের মনে আর কোনো চেতনাই রইল না; যুক্ত-নির্বাচনপ্রথায় নির্বাচনপ্রার্থীকে সকল সম্প্রদায়েরই আনুকূল্যের উপর নির্ভর করতে হয় তার ফলে পরস্পর যে বিবেচনা ও আদানপ্রদানের সৃষ্টি হয় এক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। কংগ্রেস আরও অগ্রসর হয়ে ঘোষণা করলেন, কোনো সংখ্যালঘু ধর্ম-

সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের বিশেষ স্বার্থ নিয়ে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতভেদ হয় তবে ভোটাধিক্যে সে-বিষয়ের সিদ্ধান্ত হবে না, তার নির্ধারণ হবে নিরপেক্ষ বিচারক-মণ্ডলীর মতে—এমনকি আন্তর্জাতিক বিচার সভার হাতেও এ ভার দেওয়া যেতে পারে—এবং এই নির্ধারণই হবে চূড়ান্ত।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনো সংখ্যালঘু ধর্মসম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার আর কি ব্যবস্থা হতে পারে তা কল্পনা করা কঠিন। একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে কোনো কোনো প্রদেশে মুসলমানরাই সংখ্যাধিক, এবং এইসব স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশে, সর্বভারতীয় কোনো কোনো বিষয় বাদ দিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের যথেচ্ছ ব্যবহার করতে কোনো বাধা নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মপরিচালনায়ও অবশ্যই মুসলমান সম্প্রদায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করতেন। মুসলমান-গরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে এই ধর্ম্মসাম্প্রদায়িক সমস্যা বিপরীত রূপ ধারণ করল, সে-সকল প্রদেশে হিন্দু শিখ প্রভৃতি অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার দাবি জানাতে লাগল। এইভাবে পাঞ্জাবে মুসলমান-হিন্দু-শিখ এই তিন সম্প্রদায় নিয়ে এক ত্রিকোণ-সমস্যার সৃষ্টি হল—মুসলমানদের জন্য যদি পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়, তবে অন্যদেরও আত্মরক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা চাই। একবার পৃথক নির্বাচনপ্রথা প্রবর্তনের ফলে তার থেকে যে কত ভেদবিভেদ কত অসুবিধার সৃষ্টি হল তার শেষ নেই। বলা বাহুল্য এক দলকে নির্বাচনে অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়ার অর্থই হচ্ছে জনসংখ্যানুপাত বিচারে অন্যদের প্রতিনিধি-সংখ্যা হ্রাস করে দেওয়া। এতে বিশেষ করে বাঙলাদেশে এক বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি হল—প্রধানত ইউরোপীয়দের অতিরিক্ত প্রতিনিধি-নির্বাচনাধিকার দেবার ফলে, সাধারণ নির্বাচকদের প্রতিনিধিসংখ্যা অদ্ভুত-রকম কমে গেল। বাঙলার যে বুদ্ধিবৃত্তসমাজ ভারত রাষ্ট্রক্ষেত্রে, স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রধান স্থান অধিকার করে এসেছে অকস্মাৎ তারা দেখতে পেল প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে তাদের প্রভাব অতিশয় ক্ষীণ, আইনের সাহায্যে তাদের এরূপ হীনবল করা হয়েছে।

কংগ্রেস অনেক ভুল করেছে, কিন্তু সে অগ্রসর হবার প্রণালী প্রভৃতি ছোটখাট ব্যাপারে। কংগ্রেস যে অন্তত রাষ্ট্রীয় কারণেও সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করে অগ্রগতির অন্যতম বাধা দূর করতে আগ্রহশীল, একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠান একান্তই সাম্প্রদায়িক তাদের মধ্যে এ আগ্রহ ছিল না, কারণ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের বিশেষ দাবি বিঘোষিত করার উপরেই তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে, এবং তার ফলে, পূর্বানুবৃত্তির সঙ্গে তাদের স্বার্থ জড়িত। কংগ্রেসের অধিক-সংখ্যক সদস্য হিন্দু হলেও, বহু মুসলমান এবং শিখ খৃস্টান প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মাব-লম্বীও অনেকে এর সদস্যশ্রেণীভুক্ত, ফলে সকল বিষয় নিখিল জাতির মঙ্গলের দিক থেকে বিচার করতে কংগ্রেস বাধ্য। জাতির মুক্তি ও স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাই এর প্রধান লক্ষ্য। কংগ্রেস একথা বুঝেছে যে, এই বিরাট ও বিচিত্র দেশের পক্ষে সাধারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকে

সংখ্যালঘুদের দমন করবার, প্রবর্তন করা সম্ভব হলেও সন্তোষজনক বা বাঞ্ছনীয় নয়। ঐক্য অবশ্যই আমরা কামনা করেছি এবং স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছি। কিন্তু ভারতবর্ষের বিচিত্র ও সাংস্কৃতিক মহৈশ্বর্যসম্পন্ন জীবনকে একই ছাঁচে ঢেলে সাজাতে হবে এর কোনো কারণ দেখতে পাইনি। এইজন্য স্বাতন্ত্র্য বহুলাংশেই স্বীকৃত হয়েছে, এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বাধীনতা ও স্বীয় সংস্কৃতির অগ্রগতি যাতে অব্যাহত থাকতে পারে তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা মেনে নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু দুটি বিষয়ে কংগ্রেস দৃঢ়প্রতিজ্ঞা অবলম্বন করেছে, জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্র। এই ভিত্তির উপরেই এর প্রতিষ্ঠা এবং পঞ্চাশবর্ষব্যাপী জীবনে এই কথাগুলিই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে, আমি যতদূর জানি, সর্ব্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম এই কংগ্রেস—কি কথায় কি কাজে। সমস্ত দেশব্যাপী হাজার হাজার শাখাসমিতির মারফত কংগ্রেস দেশবাসীকে গণতন্ত্রের প্রণালীতে শিক্ষিত করে তুলেছে, আশ্চর্য সাফল্য লাভ করেছে এই কাজে। গান্ধীজির মত একজন লোকপ্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও তার মূলে যে গণতান্ত্রিক প্রভাব তা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়নি। বিপদ ও সংগ্রামের সময়, সব দেশেই যেমন হয়ে থাকে, স্বভাবতই লোকে নায়কের নির্দেশ প্রত্যাশা করেছে; আর এরকম বিপদও ঘনিয়ে এসেছে অনেকবার। কংগ্রেসকে কর্তৃত্বপ্রধান প্রতিষ্ঠান আখ্যা দেবার চেয়ে অদ্ভুত কথা আর কিছু হতে পারে না; কৌতুকের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষে যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ হচ্ছে স্বৈরতন্ত্র ও প্রভুত্বপরায়ণতার পরম দৃষ্টান্ত, তারই ঊর্ধ্বতন প্রতিনিধিরা সাধারণত এইরকম অভিযোগ করে থাকেন।

অতীতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টও, অন্তত কথায়, ভারতের ঐক্য ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সমর্থন করেছে। ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—যদিও সে ঐক্যবন্ধন দাসত্বের বন্ধন—এ নিয়ে তারা গর্বও করেছে। এ কথাও আমরা শুনেছি যে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আমাদের গণতান্ত্রিক প্রণালীতে শিক্ষিত করে তুলছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাদের অবলম্বিত পন্থায় ঐক্য ও গণতন্ত্র দুইই অস্বীকৃত হল। ১৯৪০ সালের আগস্ট মাসে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সভা এই কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন যে, ভারতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট শাসনপ্রণালী জনগণের মধ্যে অন্তঃকলহ ও সংঘাতের প্ররোচনা দিচ্ছে। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল লোকেরা প্রকাশ্যভাবে বলতে আরম্ভ করলেন যে ভারতের ঐক্য বিসর্জন দিয়ে অন্য ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে, গণতন্ত্র ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী নয়। স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতবর্ষের যে দাবি তার উত্তরে এইটুকুই তাদের বলবার ছিল। এই উত্তরের মধ্যে একথাই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের যে দুটি প্রধান লক্ষ্য ছিল তাতে তারা অকৃতকার্য হয়েছে। সার্ধ এক শতাব্দী লাগল তাদের একথা বুঝতে।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার সর্বদলগ্রাহ্য সমাধানের সন্ধানে আমরা কৃতার্থ হইনি—এই ত্রুটি আমাদের স্বীকার করতেই হবে, ফলাফলও আমাদের ভোগ করতে হবে। কিন্তু

কোনো গুরুতর প্রস্তাবে বা পরিবর্তনে সকলের সম্মতি সংগ্রহের কি উপায় আছে? প্রতিক্রিয়াশীল একদল লোক সর্বদাই পাওয়া যাবে যারা সকলপ্রকার পরিবর্তনের বিরোধী, অন্য পক্ষে আছে যারা রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের পক্ষপাতী; আর এই দুই দলের অন্তর্বর্তী আছে নানা বিচিত্র গোষ্ঠী। কোনো পরিবর্তন আনাই সম্ভব নয় যদি তা ছোট একটি দলের সম্মতি-নির্ভর হয়। শাসক-সম্প্রদায়ের মূলনীতিই যেক্ষেত্রে এই রকম দলের সৃষ্টি করা ও উৎসাহ দেওয়া, হোক না তারা জনসাধারণের অতিক্ষুদ্র অংশের মুখপাত্র—সেক্ষেত্রে কেবল এক সার্থক বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই পরিবর্তন আসতে পারে। একথা সকলেই জানে যে, ভারতবর্ষে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী আছে অসংখ্য, তার কতক এদেশের মাটিতে স্বভাবতই জন্মেছে, আর কতক হচ্ছে ব্রিটিশের সৃষ্টি। সংখ্যায় তারা হীন হতে পারে, কিন্তু তাদের পিছনে আছে ব্রিটিশ শক্তির সমর্থন।

মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম লীগ ছাড়া আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। এইসকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যেগুলি প্রাচীনতম ও প্রধানতম, জমিয়ত-উল-উলেমা তার মধ্যে—সারা ভারতের ধর্মশাস্ত্রবেত্তা ও প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত এর সদস্য। সাধারণ ব্যাপারে এঁরা রক্ষণশীল ও চিরাচরিতপন্থী; এবং বলা বাহুল্য যে এঁরা ধর্মিষ্ঠ; তবু রাষ্ট্রিক ব্যাপারে এঁরা অগ্রসর ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী। রাষ্ট্রক্ষেত্রে এঁরা অনেক সময়েই কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছেন; এঁদের অনেকে কংগ্রেসের সদস্য এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকেই নিজেদের কর্মক্ষেত্র করে নিয়েছেন। অহ্‌র সংগঠন স্থাপিত হয় আরও পরে, পাঞ্জাবেই এর বিশেষ প্রতিষ্ঠা। এই সংগঠন প্রধানত নিম্নমধ্যবিত্ত মুসলমানদের প্রতিনিধি, কোনো কোনো স্থানে জনসাধারণের উপরও এর খুব প্রভাব ছিল। মোমিনরা (প্রধানত তন্তুবায়শ্রেণী) সংখ্যায় অধিক হলেও মুসলমানদের মধ্যে সব-চেয়ে দরিদ্র ও পিছিয়ে-পড়া শ্রেণী—এঁরা দুর্বল, এঁদের মধ্যে কোনো সংহতি নেই। এঁরা কংগ্রেসের প্রতি সৌহার্দ্যসম্পন্ন, মুসলিম লীগের বিরুদ্ধবাদী। শক্তির অভাবে এঁরা রাষ্ট্রীয় কর্মে অবতীর্ণ হননি। বাঙলা দেশে ছিল কৃষকসভা। জমিয়ত-উল-উলেমা ও অহ্‌র দল এ দুইই কংগ্রেসের সঙ্গে অনেকসময়ই সহযোগিতা করেছে—কি সাধারণ কাজে, কি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সংগ্রামে—এবং এজন্য দুঃখস্বীকারও করেছে। মুসলমানদের সর্ববৃহৎ যে প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে কথার লড়াই ছাড়া আর কোনো লড়াই করেনি সে হচ্ছে মুসলিম লীগ; কালক্রমে তার যতই পরিবর্তন ও বিস্তার ঘটুক, যত অধিক সংখ্যায় লোক এতে যোগ দিক, উচ্চশ্রেণীর নেতৃত্ব থেকে এ কখনও মুক্ত হতে পারেনি।

শিয়া মুসলমানদের স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান ছিল, কিন্তু রাষ্ট্রীয় দাবি জানানো ছাড়া এর আর বিশেষ কোনো কাজ ছিল না। ইসলামের প্রথমযুগে আরবদেশে খিলাফতের উত্তরাধিকার নিয়ে কলহের ফলে শিয়া ও সুন্নি এই দুই দলের সৃষ্টি হয়। এই দলাদলি এখনও চলে আসছে যদিও রাষ্ট্রব্যাপারের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। ইরান ব্যতীত অন্যসকল মুসলমানপ্রধান দেশে, ও ভারতবর্ষের মুসলমানদের

মধ্যে, সুন্নিরাই সংখ্যায় প্রধান। ধর্ম নিয়ে এই দুই দলে কখনও কখনও লড়াই হয়েছে। শিয়া-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠানগত ভাবে মুসলিম লীগ থেকে দূরে থেকেছে, তাদের বিরুদ্ধতা করেছে। এরা যুক্তনির্বাচন প্রথার পক্ষপাতী। তবে লীগে শিয়া সম্প্রদায়-ভুক্ত অনেক সম্ভ্রান্ত সদস্য আছেন।

এই সকল নানা মুসলমান প্রতিষ্ঠান (মুসলিম লীগ বাদে অবশ্য) সম্মিলিত হয়ে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আজাদ মুসলিম সমিতি গঠন করেন। ১৯৪০ সালে দিল্লীতে এই সমিতির প্রথম অধিবেশন বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়, বহু দলের প্রতিনিধি এতে যোগ দিয়েছিলেন।

হিন্দুদের সর্বপ্রধান সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে হিন্দু মহাসভা—মুসলিম লীগের প্রতিকল্প, কিন্তু তার চেয়ে প্রাধান্যে অনেক ন্যূন। লীগেরই মত আক্রমণাত্মক এর সম্প্রদায়বুদ্ধি, জাতীয়তাবাদের দ্যোতক কতকগুলি অস্পষ্ট বুলির সাহায্যে নিজেদের একান্ত সংকীর্ণতাকে আবৃত করে রাখতে চেষ্টা করে মাত্র—এর দৃষ্টিভঙ্গী একেবারেই প্রগতিপন্থী নয়, পুরাতনের পুনরাবর্তনই এর লক্ষ্য। বিশেষ দুর্ভাগ্যের বিষয় এই সভার কোনো কোনো নেতা দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে তীব্রভাষায় সমালোচনা করে থাকেন—মুসলিম লীগের কোনো কোনো নেতাও এরকম করেন। পরস্পরে এই বাগ্‌যুদ্ধের ফলে সর্বদা ক্ষত জাগিয়ে রাখে। কাজের বদলে এই বিতর্ক।

মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি অতীতে অনেকসময়েই যুক্তি মেনে চলেনি, নানা বাধার সৃষ্টি করেছে; তবে হিন্দু মহাসভার ব্যবহারও কিছু যুক্তিসঙ্গত হয়নি। সিন্ধু ও পাঞ্জাবের সংখ্যাল্প হিন্দুরা, এবং পাঞ্জাবের প্রতাপশালী শিখরা সমস্যা নিষ্পত্তির পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। এই সকল ভেদবিরোধকেই জাগিয়ে রাখা, এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধবাদী এই সব সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্ব দেওয়াই ছিল ব্রিটিশ নীতি।

কোনো গোষ্ঠী বা দলের গুরুত্ব কতখানি, জনসাধারণের উপর তার প্রভাব কতদূরে, নির্বাচনের সময় তা একরকম বোঝা যায়। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় হিন্দু মহাসভা সম্পূর্ণই অকৃতকার্য হয়, কোথাও সে স্থান পায়নি। মুসলিম লীগ এতদূর অকৃতকার্য না হলেও, বেশি কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেনি, বিশেষত মুসলমানগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে। পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে এর উদ্যোগ একেবারেই ব্যর্থ হয়; বাঙলাদেশে আংশিক সাফল্যলাভ করে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে পরে কংগ্রেস মন্ত্রিত্বভার গ্রহণ করে। যেসকল প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু সেসব স্থানে লীগ মোটের উপর অধিক কৃতকার্য হয়, তবে স্বতন্ত্র মুসলমান দলও থাকে, কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও অনেক মুসলমান নির্বাচিত হন।

এইসময় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করে। দিনের পর দিন এই এক কথার পুনরাবৃত্তি চলে যে কংগ্রেসী সরকার মুসলমানদের উপর 'অত্যাচার' করছে। এই সকল সরকারে মুসলমান মন্ত্রীও ছিলেন, কিন্তু তাঁরা মুসলিম লীগের সদস্য নন। 'অত্যাচার' বলতে

যে কি বোঝায় তা কখনও স্পষ্ট করে বলা হয়নি; কখনও বা সামান্য স্থানীয় ঘটনা, গভর্নমেন্টের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই, তাকে বিকৃত ও অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের ছোটখাট ত্রুটি, যা অগৌণেই সংশোধিত হয়, তা 'অত্যাচার' বলে আখ্যাত হয়। কখনও কখনও এমন অভিযোগও করা হয় যা সম্পূর্ণই মিথ্যা ও অমূলক। বাস্তব ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন একটি অদ্ভুত বিবরণীও এসম্পর্কে প্রকাশিত হয়। অভিযোগকারীদের বিভিন্ন কংগ্রেসী সরকার আহ্বান করেন তাঁদের অভিযোগ সম্বন্ধে তথ্যের সন্ধান দিতে যাতে এ বিষয়ে তদন্ত করা যায়, বা নিজেরা এসে সরকারের সাহায্যে তদন্ত করতে; এ আহ্বানে কেউ সাড়া দেয়নি। কিন্তু আন্দোলন অব্যাহতভাবেই চলতে থাকে। ১৯৪০ সালের গোড়ায়, কংগ্রেস-মন্ত্রীমণ্ডলীর পদত্যাগের পরে, তৎকালীন কংগ্রেস-সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই মর্মে মিস্টার এম. এ. জিন্নাকে পত্র লেখেন এবং সাধারণ্যে এক বিবৃতিও প্রচার করেন যে, কংগ্রেস গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে যে যে অভিযোগ আছে মুসলিম লীগ তা ফেডারেল কোর্টের সম্মুখে তদন্ত ও বিচারের জন্য উপস্থিত করুন। মিস্টার জিন্না এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন, এবং এইজন্য রয়াল কমিশন নিযুক্ত হবার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। এরকম কোনো কমিশন নিয়োগের কথাই হয়নি—এক ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এরূপ নিয়োগ করতে পারতেন। কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বের যুগে যেসব ব্রিটিশ গভর্নর ছিলেন তাঁদের কেউ কেউ প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেন যে, সংখ্যালঘুদের প্রতি ব্যবহারে দোষাবহ কিছু তাঁরা দেখেননি। ১৯৩৫ সালের আইন অনুসারে সংখ্যালঘুদের রক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে তাঁদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দেওয়া হয়েছিল।

হিটলারের ক্ষমতালাভের পর নাৎসী প্রচার-পদ্ধতি আমি বিশেষভাবে আলোচনা করেছিলাম; ভারতবর্ষেও অনুরূপ ব্যাপার চলছে দেখে আমি বিস্মিত হই। এক বছর পর, ১৯৩৮ সালে, চেকোশ্লোভাকিয়া যখন সুদেতেনল্যান্ড সম্পর্কিত সমস্যার সম্মুখীন, তখন নাৎসীরা সেখানে যে কর্মপ্রণালী অবলম্বন করেছিল, মুসলিম লীগের মুখপাত্ররা অনুমোদনের সঙ্গে তার উল্লেখ করেছিলেন। সুদেতেনল্যান্ডের জর্মানদের অবস্থার সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয় ভারতবর্ষের মুসলমানদের। বক্তৃতায় এবং সংবাদপত্রের লেখায় হিংসাবৃত্তি ও উত্তেজনা বিশেষভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। একজন কংগ্রেসী মুসলমান মন্ত্রী ছুরিকাহত হন, মুসলিম লীগের কোনো নেতা এ ব্যাপারের নিন্দা করে একটি কথাও বলেননি; বস্তুত এটাকে উপেক্ষাই করা হয়। হিংসাবৃত্তির নিদর্শন প্রায়শই আত্মপ্রকাশ করতে থাকে।

অবস্থার এই গতি ও সার্বজনীন ব্যাপারের আদর্শের অবনতি লক্ষ্য করে আমি যারপরনাই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিলাম। হিংসা, অশোভনতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা বেড়েই চলেছে, আর এতে মুসলিম লীগের প্রধান নেতাদেরও অনুমোদন আছে, এইরকমই মনে হত। এই নেতাদের অনেকের কাছে পত্রযোগে আমি মিনতি জানিয়েছি যেন তাঁরা এই ধারাকে নিবৃত্ত করেন, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। কংগ্রেস গভর্নমেন্টের অবশ্য নিজ লক্ষ্যসিদ্ধির জন্যই প্রয়োজন ছিল সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীকে

নিজেদের দলে আনবার, এবং এজন্য তাঁরা চেষ্টার ত্রুটি করেননি। কিন্তু কোনো বিশেষ অভিযোগের প্রতিবিধান বা কোনো বিষয়ে সুবিবেচনা নিয়ে তো কথা নয়। মুসলিম লীগের সদস্য ও সমর্থকদের মধ্যে রীতিমত একটা প্রবল চেষ্টা চলেছিল মুসলমান জনসাধারণের মনে এই বিশ্বাস জন্মাবার জন্য যে, ভয়ানক একটা কিছু ব্যাপার চলেছে, আর কংগ্রেসই হচ্ছে তার মূলে। ভয়ানক ব্যাপারটা যে কি, তা অবশ্য কারও জানা নেই। কিন্তু একটা কিছু ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে এত চীৎকার আর গালা-গালির পিছনে, তা এখানে না হোক অন্য কোথাও। উপনির্বাচনের সময় রব উঠল—"ইসলাম বিপন্ন"—পবিত্র কোরাণের শপথ নিয়ে মুসলিম লীগ প্রার্থীর স্বপক্ষে ভোট দেবার জন্য নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি আদেশ জারি হল।

মুসলমান জনসাধারণের উপর এইসব ব্যাপারের প্রভাব পড়েছিল নিঃসন্দেহ। কত লোক যে তাকে অতিক্রম করতে পেরেছিল, সেইটাই আশ্চর্যের বিষয়। উপনির্বাচনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ জয়লাভ করেছিল, কয়েকটিতে হেরে গিয়েছিল। যেসব ক্ষেত্রে তারা জয়ী হয়েছিল সেখানেও, প্রধানত কংগ্রেসের প্রভাবেই, প্রভূতসংখ্যক মুসলমান নির্বাচক তাদের বিরুদ্ধে গিয়েছে। তবে, মুসলিম লীগ তার ইতিহাসে এই প্রথম জনগণের সমর্থন লাভ করে সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ভুক্ত হবার পথে চলেছিল। ঘটনাপ্রবাহ যে পথে চলেছিল তাতে দুঃখিত হলেও, পূর্বোক্ত ব্যাপারকে একদিক দিয়ে আমি সুলক্ষণ বলেও মনে করেছিলাম, আমি ভেবেছিলাম যে এর ফলে শেষ পর্যন্ত লীগের সামন্ততন্ত্রী নেতৃত্বের পরিবর্তন হতে পারে, প্রগতিশীল মনোবৃত্তিসম্পন্ন যারা আছে তারা এগিয়ে আসতে পারে। এ যাবৎ তার প্রধান বাধা, মুসলমানরা রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যাপারে পিছিয়ে আছে বলে সহজেই প্রতিক্রিয়া-শীল নেতারা তাদের যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে।

মুসলিম লীগের অধিকাংশ নায়কের চেয়ে মিস্টার এম. এ. জিন্না অনেক অগ্রগামী—প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁদের তুলনায় বহু ঊর্ধ্বস্তরের লোক, এই জন্যই তাঁর নেতৃত্ব এমন অপরিহার্য। প্রকাশ্য বক্তৃতায় তিনি তাঁর সহযোগীদের সুবিধাবাদী ব্যবহার ও তার চেয়েও দোষাবহ নানা ত্রুটি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি ভাল করেই জানতেন একথা যে, মুসলমানদের মধ্যে প্রাগ্রসর, স্বার্থবুদ্ধিহীন ও সাহসী বড় একটা দল কংগ্রেসে যোগ দিয়ে কাজ করছে। দৈবক্রমে বা ঘটনাপ্রবাহে তিনি এমন সব লোকের মধ্যে গিয়ে পড়েছেন যাদের প্রতি তাঁর কোনো শ্রদ্ধা নেই। তাদের নায়ক তিনি—কিন্তু তাদের প্রতিক্রিয়াপন্থী আদর্শের জালে নিজেকে আবদ্ধ করে তবেই তিনি তাদের একসূত্রে বেঁধে রাখতে পেরেছেন। তবে আদর্শের দিক থেকে তিনি যে অনিচ্ছায় নিজেকে এরকম আবদ্ধ করেছেন তাও নয়, কারণ বাইরেটা তাঁর যতই আধুনিক হোক, তিনি বস্তুত পুরাতন যুগের লোক যে-যুগের সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার কোনো পরিচয় নেই। সমস্ত পৃথিবীর উপরে আজ যা আপন ছায়া বিস্তার করেছে সেই অর্থনীতির সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলেই মনে হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বের সর্বত্র যে সকল অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছে তাঁর মনে

আপাতদৃষ্টিতে তার কোনো প্রভাবই পড়েনি। কংগ্রেস যখন রাজনৈতিক ব্যাপারে একলাফে এগিয়ে গেল সেই সময় তিনি এই প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে গেলেন। কংগ্রেস যখন অর্থনীতি ও গণ-সচেতন হয়ে উঠল তখন ভেদ আরও বেড়ে উঠল। কিন্তু মিস্টার জিন্না চিন্তাধারার দিক থেকে এক যুগ আগে যেখানে ছিলেন সেখানেই রয়ে গেলেন—এমনকি তার চেয়েও পিছিয়ে গেলেন বলা চলে, কারণ এখন তিনি ভারতের ঐক্য এবং গণতন্ত্র দুইয়েরই বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগলেন। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মত অর্থহীন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কোনো রাষ্ট্রে তারা (মুসলমানেরা) বাস করবে না, এমন কথা তিনি বলেছেন। দীর্ঘ জীবন ধরে যা তিনি সমর্থন করে এসেছেন তা যে অর্থহীন, একথা বুঝতে তাঁর বহু সময় লাগল।

মুসলিম লীগেও তিনি নিঃসঙ্গ, তাঁর একান্ত সহকর্মীদের থেকেও তিনি দূরে থাকেন, বহু লোকের তিনি শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন তবে সে দূর থেকে, তাঁকে লোকে যতটা ভালবাসে তার চেয়ে ভয় করে বেশি। রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে তাঁর ক্ষমতা অবশ্য স্বীকার্য, কিন্তু ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের বিশেষ অবস্থার সঙ্গেই সে ক্ষমতা জড়িত। আইনজ্ঞ, উদ্দেশ্যসাধনের যথোচিত ব্যবস্থাবিধানপটু রাষ্ট্রনেতা হিসাবে, ব্রিটিশ শক্তি ও জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে তিনি পটু। অবস্থা অন্য রকম হলে, রাষ্ট্রিক ও আর্থিক সত্যকার সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হলে তাঁর এই পটুতা কতটা কাজে লাগত তা বলা কঠিন। নিজের সম্বন্ধে তাঁর খুব উচ্চ ধারণা থাকলেও, এ বিষয়ে সম্ভবত তাঁর নিজেরই সন্দেহ আছে। এইজন্যই বোধ হয় তিনি মনে মনে পরিবর্তনের বিরোধী, যা যেমন আছে তেমনি চলুক এই তাঁর ভাব, এবং যারা তাঁর সঙ্গে সকল বিষয়ে একমত নয় তাদের সঙ্গে কোনো সমস্যা ধীরভাবে বিচার-আলোচনা করতে এই জন্যই তিনি পশ্চাৎপদ। বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তিনি খাপ খেয়ে গিয়েছেন, পরিবর্তিত অবস্থায় তিনি বা অন্য কেউ সেরকম উপযোগী হবেন কি না বলা কঠিন। কি তাঁর মনের একান্ত বাসনা, কোন লক্ষ্যে পেঁছবার জন্য তাঁর চেষ্টা? না, তাঁর মনে আর কোনো বাসনা নেই, তাঁর একমাত্র বিলাস রাজনীতির দাবা-খেলায়, যাতে 'কিস্তি' হাঁকবার সুযোগ তাঁর যথেষ্ট। বর্ষবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যা নিজেও বেড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে, সেই কংগ্রেসের প্রতি তাঁর সুগভীর বিরাগ। কার উপর তাঁর বিরক্তি ও বিদ্বেষ তা বুঝতে দেরি হয় না, কিন্তু কিসের প্রতি তাঁর অনুরাগ? তাঁর সমস্ত ক্ষমতা ও দৃঢ়তা সত্ত্বেও তিনি এক বিচিত্র নেতিবাদী পুরুষ, 'না' এই শব্দটি যাঁর উপযুক্ত প্রতীক বলে গণ্য হতে পারে। এইজন্য তাঁর চরিত্রের সদর্থক দিকটা বোঝবার, তার সঙ্গে বোঝাপড়া করবার, সকল চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের পর থেকে মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক যুগোপ-যোগী বিরাট পুরুষ অল্পই জন্মগ্রহণ করেছেন। মুসলমানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে কয়জন জন্মেছেন তাঁরা পুরাতন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যেরই ধারাবাহী, আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে তাঁরা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি। কালের পরিবর্তমান গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার, নূতন যুগের সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের

Kedarnath Bodhuran Pathagar
Call No

মানিয়ে নেবার ক্ষমতার এই অভাব যে তাঁদের সহজাত কোনো অশক্তির পরিচায়ক তা অবশ্য নয়। ইতিহাসগত কতকগুলি কারণে এরকম ঘটেছে—নব-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় উদ্ভবের বিলম্ব এবং মুসলমান সমাজের একান্ত সামন্ততন্ত্রী ঐতিহ্যবশত এরূপ ঘটেছে, যার ফলে বিকাশের পথে বাধা পড়েছে, ক্ষমতার স্ফূর্তি রুদ্ধ হয়েছে। বাঙলা দেশেই মুসলমানরা সব চেয়ে অনগ্রসর, স্পষ্টতই তার কারণ দুটি : প্রথমত, ব্রিটিশ শাসনের আদিযুগে উচ্চতর শ্রেণীগুলি লোপ পেয়েছে; দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের অধিকাংশই হিন্দুসমাজের সেই নিম্নতম শ্রেণী থেকে ধর্মান্তরিত, দীর্ঘকাল ধরে যারা উন্নতির সুযোগলাভে বঞ্চিত ছিল। উত্তর-ভারতে সংস্কৃতিমান উচ্চশ্রেণীর মুসলমানরা তাঁদের পুরাতন ধারা ও ভূমিস্বত্ব আঁকড়ে ছিলেন। সম্প্রতি কয়েক বছরে লক্ষ্য করবার মত পরিবর্তন ঘটেছে, ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে নূতন এক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দ্রুত উদ্ভব হয়েছে, কিন্তু শিল্পে বিজ্ঞানে এখন তারা হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অনেক পিছনে পড়ে আছে। হিন্দুরাও অনগ্রসর বলতে হবে, অনেক সময় তারা মুসলমানদের চেয়ে সংকীর্ণমনা চিরন্তনী চিন্তা ও আচরণের জালে অধিক জড়িত; তবে তাদের মধ্যে শিল্পে, বিজ্ঞানে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে গুণী অনেক জন্মগ্রহণ করেছেন। পার্শীদের মত একটি ছোট সম্প্রদায়ের মধ্যে আধুনিক শিল্পক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় অনেকের জন্ম। মিস্টার জিন্নার যে বংশে জন্ম মূলত তা হিন্দু, এ সংবাদ কৌতুকোদ্দীপক সন্দেহ নেই।

কি হিন্দু, কি মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই মধ্যে যাঁরা গুণী ও শক্তিমান, তাঁদের অনেকে অতীতে সরকারী চাকরি বেছে নিয়েছেন, কারণ এই পথেই সুখসুবিধা সবচেয়ে বেশি। স্বাধীনতার আন্দোলন যখন উগ্র হয়ে উঠল তখন সরকারী চাকরির এই মোহ কমে গেল, ক্ষমতাবান, উৎসাহী ও সাহসী লোক অনেকে এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ লোক তাঁরা এইভাবেই কংগ্রেসে এলেন। সম্প্রতি অনেক মুসলমান যুবক সোশ্যালিস্ট ও কম্যুনিস্ট দলেও যোগ দিয়েছেন। এইসব উৎসাহী ও অগ্রণী দলকে বাদ দিলে, মুসলমানদের মধ্যে আত্মোন্নতির জন্য সরকারী চাকরির প্রতিই লক্ষ্য বেশি, আর তাঁদের নেতৃবর্গও বিশেষ শ্রদ্ধেয় নন। মিস্টার জিন্না অন্য প্রকৃতির মানুষ। তিনি শক্তিমান দৃঢ়গ্রাহী পুরুষ, পদ ও ক্ষমতার লোভে টলবার লোক নন, যে লোভে অন্য অনেককে বিচলিত করেছে। এইজন্য মুসলিম লীগে তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা, এবং এইজন্য তিনি এরকম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছেন—লীগের অন্যান্য অনেক প্রধান ব্যক্তিরা যা পারেননি। দুর্ভাগ্যবশত, তাঁর দৃঢ়গ্রাহিতার ফলে তাঁর মনে নূতন কোনো ভাবের প্রবেশপথ রুদ্ধ; তাঁর স্বীয় প্রতিষ্ঠানে তাঁর অপ্রতিহত প্রভাবের ফলে তিনি অন্য প্রতিষ্ঠান, এবং নিজের দলে যারা তাঁর সঙ্গে একমত নয়, এর কাউকেই সইতে পারেন না। তিনিই হয়ে দাঁড়ালেন মুসলিম লীগ। কিন্তু প্রশ্ন এই : লীগ ক্রমশ গণ-প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠছে; সেক্ষেত্রে এরকম পুরাতনপন্থী সামন্ততন্ত্রী নেতৃত্ব কতদিন চলবে?

আমি যখন কংগ্রেসের সভাপতি ছিলাম সে সময় অনেকবার মিস্টার জিন্নাকে চিঠি

লিখে জানতে চেয়েছি, তিনি আমাদের ঠিক কি করতে বলেন। লীগ কি চায়, লীগের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য কি, একথা আমি জিজ্ঞাসা করেছি। কংগ্রেস-গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে লীগের কি অভিযোগ তাও জানতে চেয়েছি। পত্রযোগে বিষয়টা পরিষ্কার করে নিয়ে, গুরুতর প্রশ্নগুলি সাক্ষাতে আলোচনা করব এই ছিল অভিপ্রায়। মিস্টার জিন্না আমাকে সুদীর্ঘ সব উত্তর দিয়েছেন, কিন্তু কিছুই আমাকে বুঝিয়ে বলেননি। তিনি ঠিক কি চান, লীগের কি অভিযোগ তা আমাকে বা অন্য কাউকেই তিনি বলেননি, শুধু কথা এড়িয়েছেন—এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। বারংবার আমাদের মধ্যে পত্রবিনিময় হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকবারই সেই অস্পষ্ট ভাসা-ভাসা কথা, নিশ্চয় করে আমি কিছু বুঝতে পারিনি। এতে আমি খুব বিস্মিত ও হতাশ বোধ করেছি। এই কথাই মনে হত যে, মিস্টার জিন্না ধরাছোঁয়া দিতে চান না, আর কোনো একটা সমাধানে পৌঁছবার জন্য তাঁর কোনোই আগ্রহ নেই।

অতঃপর গান্ধীজি ও আমাদের মধ্যে আরও কেউ কেউ কয়েকবার মিস্টার জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলেও বেশিদূর তাঁরা অগ্রসর হতে পারেননি। আমাদের প্রস্তাব ছিল এই যে, কংগ্রেস ও লীগ একত্র মিলিত হয়ে তাঁদের সমস্ত পারস্পরিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করুন। মিস্টার জিন্না বলেন, মুসলিম লীগ ভারতবর্ষের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান এই কথা আমরা প্রকাশ্যে স্বীকার করলে, কংগ্রেস নিজেকে কেবলমাত্র হিন্দুপ্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করলে, তবেই আমাদের প্রস্তাব কার্যে পরিণত হতে পারে। এ কথা মেনে নিতে স্পষ্টতই বাধা ছিল। লীগের প্রাধান্য অবশ্যই আমরা স্বীকার করেছি এবং সেইজন্য আমরা তার দ্বারস্থ হয়েছি। কিন্তু দেশে অন্যান্য যেসব মুসলিম প্রতিষ্ঠান আছে, যার কোনো-কোনোটি আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ, তাদের কথা বিস্মৃত হই কি করে? তাছাড়া, কংগ্রেসে ও তার কর্মকর্তাদের মধ্যে বহুসংখ্যক মুসলমান আছেন; মিস্টার জিন্নার দাবি মেনে নেবার অর্থ প্রকৃতপক্ষে এই দাঁড়ায় যে, আমাদের দীর্ঘকালের সহ-কর্মী এই মুসলমানদের কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করে দিতে হয়, বলতে হয় যে, কংগ্রেস তাঁদের জন্য নয়। অর্থাৎ কংগ্রেসের মূলস্বভাব পরিবর্তন করে, সর্বসাধারণের নিকট উন্মুক্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান থেকে একটা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে একে পরিণত করতে হয়। আমাদের পক্ষে এ কল্পনারও অতীত। কংগ্রেসের মত প্রতিষ্ঠান আগে থেকে না থাকলে, সকল ভারতীয়ের প্রবেশাধিকার আছে এমন প্রতিষ্ঠান আমাদের নূতন করে গড়ে তুলতে হত।

এ নিয়ে মিস্টার জিন্না কেন জিদ ধরেছেন, অন্য কথা আলোচনা করতে কেন তিনি পরাঙ্‌মুখ, সে কথা আমাদের বুদ্ধির অতীত। কোনো সমাধান হোক এ তিনি চান না, নিশ্চিত করে কোনো মত প্রকাশ করতে তিনি ইচ্ছুক নন। ঘটনাধারা যে পথে প্রবাহিত হয় হোক, তাতেই তিনি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছ থেকে বেশি সুবিধা আদায় করতে পারবেন এই তাঁর আশা।

মিস্টার জিন্নার দাবি তাঁর এক নবপ্রচারিত তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত—সে তত্ত্ব হচ্ছে

এই যে ভারতবর্ষে দুই নেশন বা জাতি আছে, হিন্দু ও মুসলমান। ধর্ম্মের উপর জাতির নির্ভর হলে মোটে দুই কেন, ভারতবর্ষে তাহলে অনেক জাতি আছে। দুই ভাইয়ের একজন হিন্দু আর একজন যদি মুসলমান হয়, তাহলে এই মতানুযায়ী তারা দুই জাতির লোক। ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক গ্রামে বিভিন্ন সংখ্যায় এই তথা-কথিত দুই জাতির লোক আছে। এই দুই জাতির মধ্যে কোনো ভৌগোলিক সীমা-রেখা নেই, একে অপরের সীমানার মধ্যে এসে পড়ছে। একজন বাঙালী মুসলমান ও একজন বাঙালী হিন্দু, একই ভাষায় তারা কথা বলছে, তাদের আচারব্যবহার সংস্কারও প্রায় এক, কিন্তু তারা দুই জাতির লোক। এসকল ব্যাপার বুঝে ওঠা কঠিন, মনে হয় মধ্যযুগোচিত মনোভাবে আমরা ফিরে যাচ্ছি। নেশন কি, সে কথা ব্যাখ্যা করা দুরূহ। সম্ভবত জাতীয়তাবোধের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে ঐক্যবোধ, সমগ্র মানবসমাজের সামনে এক হয়ে দাঁড়ানো। এই বোধ ভারতবর্ষে এখন কতদূর বর্তমানে তা নিয়ে মতভেদের অবকাশ থাকতে পারে। একথাও বলা যেতে পারে যে অতীতে ভারতবর্ষ বহুজাতিক রাষ্ট্র হিসাবেই গড়ে উঠেছিল, ক্রমশ একজাতিবোধ জেগে উঠেছে। কিন্তু এ সকল তত্ত্বকথায় আজ আমাদের কিছু এসে যায় না। আধুনিককালে সবচেয়ে যেগুলি শক্তিশালী রাষ্ট্র সেগুলি বহুজাতিক অথচ তাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যবোধ আছে, যেমন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র।

মিস্টার জিন্নার দ্বিজাতিবাদ থেকেই পাকিস্তান বা ভারত বিভাগের ধারণার উদ্ভব। এতেও অবশ্য দ্বিজাতিসমস্যার সমাধান হল না, কারণ এই দুই জাতি দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। কিন্তু এতে যা ছিল ভাবমাত্র তা একটা রূপের আশ্রয় পেল। এরই প্রতিক্রিয়ায় অনেকের মনে ভারতের ঐক্যবোধ প্রবলভাবে জেগে উঠল। সাধারণত জাতীয় ঐক্যের প্রসঙ্গ নিয়ে লোকে বিশেষ করে মাথা ঘামায় না; কিন্তু সেই ঐক্যে যখন কেউ আঘাত দেয়, তাকে কেউ বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টা করে, তখনই এই ঐক্যের প্রয়োজন বিশেষ করে অনুভব করা যায়, তা রক্ষা করবার জন্য লোকে অগ্রসর হয়। বিভেদসৃষ্টির ফলেই এইভাবে অনেকসময় ঐক্য দৃঢ়বদ্ধ হয়।

কংগ্রেস ও ধর্মসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহের দৃষ্টিভঙ্গীতেই মূলগত প্রভেদ। সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রধান হচ্ছে মুসলিম লীগ ও তার হিন্দু সংস্করণ, হিন্দু মহাসভা। এই সকল প্রতিষ্ঠানের নামমাত্র লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা, আসলে এদের প্রধান লক্ষ্য নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সুযোগসুবিধা আদায়। এইসব সুবিধা আদায়ের জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মুখাপেক্ষী না হয়ে এদের গত্যন্তর নেই, ফলে গভর্নমেন্টের সঙ্গে দ্বন্দ্ব এড়িয়ে এদের চলতে হয়। কংগ্রেসের লক্ষ্য অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা, আর অন্য সবই তার কাছে গৌণ, ফলে ব্রিটিশশক্তির সঙ্গে তার নিরন্তর সংঘর্ষ। কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধতা করেছে। ভূস্বত্ব, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কারকল্পে কংগ্রেস আত্মনিয়োগ করেছে। মুসলিম লীগ বা হিন্দু মহাসভা এসব সমস্যা নিয়ে কখনও চিন্তাও করেনি, এ সম্পর্কে কোনো কর্মপদ্ধতি নির্ণয়ের উদ্যোগও করেনি।

সোশ্যালিস্ট ও কম্যুনিস্টরা অবশ্য এসব ব্যাপারে উদ্যোগী, তাদের স্বকীয় কর্মপন্থা তারা কংগ্রেসে ও অন্যত্র প্রচার করবার চেষ্টা করেছে।

কংগ্রেস ও ধর্মসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির পদ্ধতি ও কর্মে আরও একটি উল্লেখ-যোগ্য পার্থক্য আছে। রাজনৈতিক আন্দোলন ও ব্যবস্থাপক সভা বর্তমান থাকলে তৎসংক্রান্ত কাজ ব্যতীত, জনগণের মধ্যে সংগঠনকর্ম প্রচারেও কংগ্রেস বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিল। কুটিরশিল্পের প্রচার, অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতিবিধান, বনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন প্রভৃতি এই সংগঠনকর্মের অন্তর্গত। স্বাস্থ্যবিধান ও সহজ চিকিৎসা-ব্যবস্থাও পল্লীমঙ্গল কর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সব কাজের জন্য কংগ্রেসের প্রবর্তনায় স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সঙ্গে এদের সম্পর্ক ছিল না; হাজার হাজার কর্মী অনন্যকর্মা হয়ে এই কাজে ব্রতী হন, আরও বহুসংখ্যক কর্মী যথাসাধ্য এ কাজে সহায় হন। রাষ্ট্রীয় আন্দোলন যে সময় স্তিমিত সে-সময়ও রাষ্ট্র-ব্যাপারের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক এই শান্তিপূর্ণ সংগঠনকর্ম অবিরাম চলেছে, কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে গভর্নমেন্টের প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব উপস্থিত হতে গভর্নমেন্ট এসকল প্রতিষ্ঠানও বন্ধ করে দিয়েছে। এসকল কাজের অর্থনৈতিক মূল্য সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সমাজের দিক থেকে এর প্রয়োজন সংশয়াতীত। এই সকল প্রতিষ্ঠানে এমন একদল অনন্যব্রত কর্মীর শিক্ষার আয়োজন হয়েছিল যারা সর্বসাধারণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে তাদের আত্মশক্তিতে আস্থা ও স্বাবলম্বনের ভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। কংগ্রেসের পুরুষ ও মহিলা কর্মীরা ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষাণ সঙ্ঘের কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন, অনেক ক্ষেত্রে এই সকল প্রতিষ্ঠান তাঁরাই গড়ে তুলেছিলেন। সবচেয়ে বড় ও সুসংগঠিত আহমেদাবাদে বস্ত্রশিল্পের ট্রেড ইউনিয়ন, সেটি কংগ্রেসকর্মীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তাঁদেরই ঘনিষ্ঠ সহযোগে এর কাজ চলেছিল।

এই সকল উদ্যোগের ফলে কংগ্রেসের কাজের যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ধর্ম-সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিতে তার একান্তই অভাব। এই সকল প্রতিষ্ঠান কেবল আন্দোলন-সর্বস্ব, তাও নিয়মিতভাবে নয়, সাধারণত নির্বাচন উপলক্ষ্যে। কংগ্রেস-কর্মীরা সর্বদা যে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে, সরকারের নিপীড়ন-সম্ভাবনা স্বীকার করে কাজ করতেন, এই সকল প্রতিষ্ঠানে তাও ছিল না। ফলে যারা সুবিধাবাদী, যারা যেন-তেন-প্রকারেণ নিজের উন্নতি করতেই ব্যস্ত এই সকল প্রতিষ্ঠানে তারাই যোগ দিত বেশি। তবে অহ্‌রদল ও জমিয়ত-উল-উলেমা, এই দুটি মুসলিম প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই কংগ্রেসের অনুসরণ করে সরকারের বহু উৎপীড়ন স্বীকার করেছে।

নব-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভবের সঙ্গে ভারতবর্ষে যে জাতীয়তাবাদের বিকাশ হয়েছে কংগ্রেস যে শুধু তারই মুখপাত্র হয়েছিল তা নয়; সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য শ্রমিকসম্প্রদায়ের যে কামনা তাও অনেকাংশেই কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে প্রকাশলাভ করেছে। বিশেষত ভূস্বত্বসংক্রান্ত ব্যাপারে কংগ্রেস সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনতে চেয়েছিল। ফলে কংগ্রেসে অনেক সময় অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছে, ভূস্বামী-

শ্রেণী ও শিল্পপতিদের মধ্যে অনেকে জাতীয়তাবাদী হয়েও সাম্যতন্ত্র প্রবর্তনের আশঙ্কায় কংগ্রেস থেকে দূরে থেকেছেন। সোশ্যালিস্ট ও কম্যুনিস্টরাও কংগ্রেসে স্থান পেয়েছে, কংগ্রেসের কর্মনীতিকে প্রভাবিত করতে পেরেছে। সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান, সে হিন্দু হোক কি মুসলমান হোক, সমাজের সামন্ততন্ত্রী রক্ষণশীল অংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ, সমাজব্যবস্থায় বিপ্লবাত্মক কোনো পরিবর্তন-প্রস্তাবের বিরোধী। প্রকৃত কলহ ধর্ম নিয়ে নয়, যদিও ধর্মের ছদ্মবেশে আসল ব্যাপারটাকে অনেক সময় আচ্ছন্ন করা হয়েছে—যারা জাতীয়তাপন্থী, গণতন্ত্রবাদী, সমাজব্যবস্থায় বিপ্লব প্রয়াসী, আর যারা সামন্ততন্ত্রের অবশেষকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, এই দুয়ের মধ্যে বস্তুত দ্বন্দ্ব। সঙ্কটকালে এতে দ্বিতীয় দলের নিশ্চিত নির্ভর সেই বিদেশীর সমর্থনেরই উপর, যারা স্থিতাবস্থাকেই চিরন্তন করে রাখতে উৎসুক।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনায় এক অন্তঃসঙ্কট উপস্থিত হল যার ফলে বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস গভর্নমেন্ট পদত্যাগ করেন। এই ঘটনার পূর্বে অবশ্য কংগ্রেস মিস্টার এম. এ. জিন্না ও মুসলিম লীগের সঙ্গে যোগস্থাপন করতে চেষ্টা করেছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর কংগ্রেস-কর্মসমিতির প্রথম যে সভা হয় তাতে যোগ দেবার জন্য মিস্টার জিন্না আহূত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যোগ দিতে অক্ষম হন। পরে আমরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, আমরা যাতে একই পন্থা গ্রহণ করে বিশ্বজোড়া সংকটের সম্মুখীন হতে পারি তার চেষ্টা করি। বেশিদূর অগ্রসর হতে না পারলেও আলোচনা চালিয়ে যাওয়াই স্থির করি। ইতিমধ্যে যে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার নিয়ে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করেন তাঁর সঙ্গে মুসলিম লীগ ও সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোনো সম্পর্কই ছিল না। কিন্তু মিস্টার জিন্না এই সময়েই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ঘোরতর অভিযান শুরু করলেন, বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী শাসন থেকে 'মুক্তি-দিবস' পালন করতে লীগকে নির্দেশ দিলেন। এর পরে তিনি কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সম্বন্ধে, বিশেষ করে হিন্দু ও মুসলমান সকল দলের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সম্বন্ধে অত্যন্ত অশোভন মন্তব্য করেন। 'মুক্তিদিবস' পালনে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়নি, ভারতবর্ষের কোনো কোনো স্থানে মুসলমানেরা এর বিরুদ্ধতাও প্রকাশ করে কিন্তু এই ব্যাপারে তিক্ততা আরও বৃদ্ধি পেল, এবং এই ধারণাই বদ্ধমূল হল যে, কংগ্রেসের সঙ্গে আপস করবার, বা ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের অগ্রগতিতে সহায় হবার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় মিস্টার জিন্না ও তাঁর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের নেই। যা চলছে তাই চলুক এই তাঁরা চান।*

* এই বই লেখা শেষ করবার পর আমি উইলফ্রিড ক্যান্টওয়েল স্মিথ নামে একজন পণ্ডিতপ্রবরের লেখা বই পড়ি। লেখক ইজিপ্ট ও ভারতবর্ষে কয়েক বৎসর কাটিয়ে গেছেন। ১৮৫৭ সালের ভারতীয় বিদ্রোহের সময় থেকে ভারতীয় মুসলমানদের চিন্তাধারা সম্বন্ধে (মডার্ন ইসলাম ইন ইন্ডিয়া' : লাহোর ১৯৪৩) এই বইতে তিনি যোগ্যতা ও যত্নের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। স্যার সৈয়দ আহমেদের সময় থেকে বিভিন্ন প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াপন্থী আন্দোলন, ও মুসলিম লীগের বিভিন্ন পর্যায় সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন।

৬ : জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি

১৯৩৮ সালের শেষভাগে কংগ্রেসের নির্দেশক্রমে একটি জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির সদস্যসংখ্যা ছিল পনেরো, তাছাড়া ছিলেন প্রাদেশিক সরকারসমূহের ও যে-সকল দেশীয় রাজ্য আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক তাঁদের প্রতিনিধিবর্গ। এই সদস্যমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন সুবিখ্যাত শিল্পপতি, অর্থনীতিবিৎ, অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক, তাছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন ও গ্রাম উদ্যোগ সঙ্ঘের প্রতিনিধিবর্গ। অ-কংগ্রেসী প্রাদেশিক সরকারগুলি (বাঙলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধু) এবং কোনো কোনো বৃহৎ দেশীয় রাজ্য (হায়দরাবাদ, মহীশূর, বরোদা, ত্রিবাঙ্কুর, ভূপাল) এই সমিতির সঙ্গে সহযোগিতা করেন। ভারত-সরকারের কোনো প্রতিনিধি এই সমিতিতে ছিলেন না, তাঁরা এই সমিতির প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করতেন না; সে কথা ছেড়ে দিলে, এই সমিতিকে এক অর্থে বিশেষভাবে প্রতিনিধিস্থানীয় বলে গণ্য করা যেতে পারে; কোনো বিশেষ রাষ্ট্রসীমার মধ্যে এ আবদ্ধ ছিল না, সরকারী ও বেসরকারী এই বিভেদও উত্তীর্ণ হয়েছিল। বাস্তববুদ্ধিপ্রধান বণিক-সম্প্রদায় থেকে আরম্ভ করে আদর্শবাদী, বাস্তববোধহীন তত্ত্বানুসারী, সমাজতন্ত্রী, প্রায়-পূর্ণসাম্যবাদী—সব গোষ্ঠীর লোকই এই সমিতিভুক্ত ছিলেন। প্রাদেশিক সরকার ও দেশীয় রাজ্যের পক্ষ থেকে এসেছিলেন বিশেষজ্ঞ ও শিল্পনিয়ামকরা।

বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের এই বিচিত্র সম্মিলন নিয়ে কাজ কি করে চলবে তা স্পষ্ট অনুমান করা যায়নি। আমি দ্বিধা ও আশঙ্কা নিয়েই এর সভাপতিত্ব স্বীকার করি; কাজটা আমার মনের মতন, আমি এর থেকে দূরে থাকতে পারিনি।

প্রত্যেক বিষয়েই বাধা এসে উপস্থিত হতে লাগল। পরিকল্পনা খাড়া করবার পক্ষে যথেষ্ট উপকরণ সংগৃহীত হয়নি, তথ্য দুষ্প্রাপ্য। ভারত-গভর্নমেন্টের মনোভাব অনুকূল নয়। প্রাদেশিক গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার অভাব না থাকলেও, ভারতব্যাপী পরিকল্পনায় তাঁদের তত উৎসাহ নেই, আমাদের কাজে তাঁরা তত আগ্রহ প্রকাশ করেননি—নিজেদের সমস্যা ও অসুবিধা নিয়েই তাঁরা ব্যতিব্যস্ত। যে কংগ্রেসের উদ্যোগে এই সমিতির প্রবর্তনা, তারও অনেকে একে অবাঞ্ছিত সন্তানের মত বিবেচনা করতে লাগলেন, কারণ এ যে কি রূপ নেবে তা জানা নেই—ভবিষ্যতে এর কর্মপন্থা কি দাঁড়াবে সে সম্বন্ধে তাঁরা সন্দিহান। ব্যবসায়ীরা এর সম্বন্ধে খুবই আশঙ্কা প্রকাশ করতেন ও সমালোচকের দৃষ্টিতে একে দেখতেন, দূরে না থেকে সমিতির মধ্যে থাকলে নিজ স্বার্থরক্ষা বেশি করে করতে পারবেন এই মনে করেই সম্ভবত তাঁরা এতে যোগ দিয়েছিলেন।

একথা স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল, যে-সরকার লোকপ্রিয়তা ও ক্ষমতা-বলে দেশের সামাজিক ও আর্থিক বনিয়াদে সুগভীর পরিবর্তন সাধন করতে পারেন সেই স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত না হলে কোনোরূপ সর্বব্যাপী পরিকল্পনার প্রবর্তন সম্ভব নয়। কোনো পরিকল্পনার পূর্বে তাই একান্ত প্রয়োজন দেশের স্বাধীনতা অর্জন

ও বৈদেশিক প্রভাব বর্জন। আরও অনেক বাধা ছিল—সামাজিক অনগ্রসরতি, প্রথা ও আচার, পুরাতনী দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি—কিন্তু সে-সকল বাধার সম্মুখীন তো হতেই হবে। দাঁড়াল এই যে, বর্তমানের জন্য এই পরিকল্পনা নয়, অজ্ঞাত এক ভবিষ্যতের জন্য, ফলে এর মধ্যে একটা অবাস্তবতার ভাব এসেছিল। তবু, যে ভবিষ্যতে এই পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হবে তা সুদূরে নয় এই আশা মনে রেখে বর্তমানের ভিত্তিতেই তো কাজ করতে হবে। যা উপকরণ পাওয়া যায় তা সংগ্রহ ও সুশৃঙ্খল করে নিয়ে আমরা যদি একটা ছক তৈরি করে নিতে পারি তাহলে আমরা ভবিষ্যতের জন্য কার্যকরী পরিকল্পনার ভিত্তিস্থাপন করতে পারি, এবং ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য ও প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে কোন্ পথে অগ্রসর হওয়া এবং নিজ নিজ সম্পদ বৃদ্ধি করা উচিত হবে সেসম্বন্ধেও তাদের পথনির্দেশ করতে পারি। আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি জাতীয় জীবনের বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে কর্তব্যনির্ণয় এবং সেগুলির পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্যোগ সাধনে আমাদের ও সর্বসাধারণের শিক্ষণীয় বস্তুও অনেক ছিল। নিজ নিজ কর্ম ও চিন্তার সংকীর্ণ ধারা উত্তীর্ণ হয়ে বিভিন্ন সমস্যার পারস্পরিক যোগে সেগুলির বিচার, উদারতর সহযোগিতার দৃষ্টিলাভ, এসব বিষয়ে এতে সাহায্য করেছিল।

পরিকল্পনা-সমিতির মূল কথা ছিল যন্ত্রশিল্পের বিস্তার—'যন্ত্রশিল্পের সহায়তা ব্যতীত দারিদ্র্য, কর্মহীনতা সমস্যার সমাধান, জাতীয় আত্মরক্ষা এবং আর্থিক উন্নতি প্রভৃতির আয়োজন সম্ভব নয়। এই যন্ত্রশিল্প বিস্তারের উপায়স্বরূপ প্রয়োজন বহুব্যাপী জাতীয় পরিকল্পনা। মূলগত বৃহদায়তন শিল্প, মধ্যমাকৃতি শিল্প ও কুটিরশিল্প এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু জনসাধারণের প্রধান আশ্রয় যে কৃষিকর্ম তা বাদ দিয়ে কোনো পরিকল্পনাই চলতে পারে না; সমাজসেবার কথাও সমান বিবেচ্য। এইভাবে এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে উপস্থিত হই; কোনো বিষয়ই স্বতন্ত্র করে দেখা সম্ভব নয়, একদিকে উন্নতি হলেই অপর দিকে উন্নতি। এই পরিকল্পনা-ব্যাপারটি আমরা যতই চিন্তা করে দেখতে লাগলাম ততই এর পরিধি বিস্তারলাভ করতে লাগল, অবশেষে প্রায় প্রত্যেক ব্যাপারই এর অন্তর্গত বলে বোধ হতে লাগল। তার অর্থ এই নয় যে সকল ব্যাপারই আমরা নিয়ন্ত্রণাধীন করতে ইচ্ছুক; তবে পরিকল্পনার একটি অংশ বিচার করতে গিয়ে আমাদের সকল দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়েছে। কাজটি সম্বন্ধে আকর্ষণ আমার ক্রমশই বাড়তে লাগল, অন্যান্য সদস্যেরও বোধ হয় তাই হয়েছিল। কিন্তু এরই মধ্যে একটা অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তার ভাবও প্রবেশ করেছিল। পরিকল্পনার কোনো প্রধান বিভাগের প্রতি নিবিষ্ট না হয়ে আমাদের মনোযোগ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছিল। এরই ফলে আমাদের অনেক উপ-সমিতির কাজ শেষ করতে বিলম্ব ঘটছিল, কারণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো বিশেষ লক্ষ্য স্থির করে কাজ করবার জরুরি তাগিদ তাঁরা বোধ করেননি।

সমিতি যেভাবে গঠিত হয়েছিল তাতে সমাজব্যবস্থা কোন্ মূলনীতির ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে এ সম্বন্ধে সকলের একমত হয়ে কাজ করা সহজসাধ্য ছিল না। এই

মূলনীতি সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনাতে আরম্ভেই দৃষ্টিভঙ্গীর মূলগত পার্থক্য আবিষ্কৃত হয়ে সমিতির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার আশঙ্কা ছিল। কোনো মূলনীতি স্থির না করে নেওয়া কার্যসাধনের একটা প্রধান অন্তরায়, কিন্তু এ বিষয়ে আমরা নিরুপায়। সাধারণভাবে পরিকল্পনা-নীতির বিষয় আলোচনা এবং প্রতিটি সমস্যার তাত্ত্বিক নয়, বাস্তব সমাধান চেষ্টা করব, এবং এই চেষ্টার ফলে মূলনীতি স্বতই নির্ধারিত হবে, আমরা এই স্থির করেছিলাম। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, দৃষ্টি-ভঙ্গী দুরকম হতে পারে; এক সমাজতান্ত্রিকের দৃষ্টি, লাভ-মনোবৃত্তি নির্মূল করে বণ্টন-সামঞ্জস্যের উপর জোর দেওয়া; দ্বিতীয় ব্যবসায়ীর দৃষ্টি, যতদূর সম্ভব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও লাভের কামনায় বাধা না দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি। বৃহৎশিল্পের দ্রুত-বৃদ্ধির যাঁরা অনুকূলে, এবং অপর যাঁরা গ্রাম ও কুটির-শিল্পের বিস্তারসাধন করে বহুসংখ্যক বেকার ও আধাবেকারদের কাজ দেবার পক্ষপাতী, এই উভয় দলের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যও আছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে শেষ পর্যন্ত মতভেদ হতে বাধ্য। সকল তথ্য যদি সংকলিত ও সুসংবদ্ধ হয়, ঐক্য ও পার্থক্যের বিষয়গুলি সুনির্দিষ্ট ও সুবর্ণিত হয়, তাহলে দুই বা ততোধিক প্রতিবেদনেও ক্ষতি নেই। পরিকল্পনা যখন কার্যে পরিণত করবার সময় আসবে, সেসময় তখনকার গণতান্ত্রিক সরকার স্থির করবেন কোন পন্থা গ্রহণযোগ্য। ইতিমধ্যে ক্ষেত্র অনেকদূর প্রস্তুত হয়ে থাকবে, সমস্যার বিভিন্ন দিক সর্বসাধারণ তথা বিভিন্ন প্রদেশ ও রাজ্যের রাষ্ট্রনায়কদের সম্মুখে উপস্থাপিত হবে।

বলা বাহুল্য, সুনির্দিষ্ট সমাজকল্পনা ও লক্ষ্য ব্যতীত কোনো সমস্যার আলোচনা সম্ভব নয়, কোনো পরিকল্পনার বিচার তো নয়ই। জনসাধারণের জীবনযাত্রার সঙ্গত মান যাতে রক্ষিত হয় তার ব্যবস্থা করা, অর্থাৎ লোকের ভয়াবহ দারিদ্র্যের মোচন করাই এই লক্ষ্য বলে ঘোষিত হয়েছিল। টাকার হিসাবে, অর্থনীতিকেরা মাথাপ্রতি মাসিক ১৫৲ থেকে ২৫৲ ন্যূনতম আয় বলে নির্দেশ করেছেন যাতে লোকের কোনো-ক্রমে চলতে পারে। (এই অঙ্ক যুদ্ধপূর্ব কালের।) পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় এ যৎ-সামান্য, কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা-বিবেচনায় এ প্রভূত। মোটামুটি হিসাবে ভারতবর্ষে প্রতি মানুষের গড়পড়তা বার্ষিক আয় ৬৫৲। এই হিসাবের মধ্যে ধনী দরিদ্র, নগর ও পল্লীবাসী সকলেই আছে। ধনী দরিদ্রের অবস্থার মধ্যে বিরাট পার্থক্য এবং স্বল্পসংখ্যক লোকের হাতে প্রভূত অর্থসঞ্চয়ের কথা বিবেচনা করলে অনুমান হয় যে সাধারণ পল্লীবাসীর আয় আরও অনেক কম, সম্ভবত জনপ্রতি বার্ষিক ৩০৲। জনসাধারণের যে কি দুরবস্থা, তাদের দারিদ্র্য যে কি ভয়ঙ্কর, তা এই সব তথ্য থেকে বুঝতে পারা যায়। খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ এবং মনুষ্যজীবন ধারণের জন্য আর যা কিছু একান্তই দরকার তার সবগুলিরই অভাব। এই অভাব মোচন করতে হলে, প্রত্যেকের জন্য জীবনযাত্রার ন্যূনতম মানের ব্যবস্থা করতে হলে, জাতীয় আয় বহুগুণিত করা আবশ্যক, এবং উৎপাদনবৃদ্ধি ব্যতীত, অর্থবণ্টনব্যবস্থাতেও সামঞ্জস্যবিধান আবশ্যক। আমরা হিসাব করে দেখেছি যে, জীবনযাত্রার মানের

উন্নতিবিধান করতে হলে আমাদের জাতীয় সম্পদের ছ-সাত গুণ বৃদ্ধিসাধন আবশ্যক। এতটা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হবে তাই দশ বৎসরে তিন-চারগুণ বৃদ্ধির কথাই আমরা কল্পনা করেছি।

এই পরিকল্পনার কার্যকাল আমরা দশ বৎসর স্থির করি। বিভিন্ন সময় এবং অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন অংশের জন্য বিভিন্ন আদর্শসংখ্যাও নির্দিষ্ট হয়। উন্নতির কতকগুলি বাস্তব নিদর্শনও প্রস্তাবিত হয় :

(১) পুষ্টিসাধন-ব্যবস্থার উন্নতি—প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক কর্মীর জন্য ২৪০০ থেকে ২৮০০ ক্যালরি মূল্যযুক্ত সুসমঞ্জস খাদ্যের ব্যবস্থা।

(২) বস্ত্র-ব্যবস্থার উন্নতি—তৎকালে জনপ্রতি বার্ষিক ১৫ গজ কাপড়ের ব্যবস্থার উন্নতি করে অন্তত ৩০ গজের ব্যবস্থা।

(৩) বাস-ব্যবস্থার উন্নতি—জনপ্রতি অন্তত ১০০ বর্গ ফুট স্থানের ব্যবস্থা। এ ছাড়া উন্নতি নির্দেশক আরও কয়েকটি ব্যবস্থার কথা মনে রাখতে হবে :

(ক) কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধি
(খ) শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধি
(গ) বেকারসমস্যার লাঘব
(ঘ) মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি
(ঙ) অশিক্ষা দূরীকরণ
(চ) সর্বসাধারণের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ব্যবস্থার উন্নতি
(ছ) প্রতি হাজার লোকে এক ইউনিট হিসাবে আরোগ্যসাধনব্যবস্থা
(জ) গড়পড়তা আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি

দেশের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথাসম্ভব দেশেই প্রস্তুত হবে, সমগ্র দেশের দিক থেকে এইটাই লক্ষ্য ছিল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অবশ্যই বর্জনীয় নয়; কিন্তু অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের ঘূর্ণিপাকে আমরা যাতে না পড়ি সেদিকে আমাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধীনতা স্বীকার করতেও আমরা প্রস্তুত নই, আর আমাদের নিজেদের মধ্যে সে প্রবৃত্তি দেখা দেয় তাও আমাদের অভিপ্রেত নয়। দেশের যা খাদ্য, কাঁচা মাল ও শিল্পজাত দ্রব্য প্রয়োজন, দেশের উৎপাদনে সেই প্রয়োজনই প্রথম মেটাবে। তার অতিরিক্ত যা উৎপন্ন হবে তা সস্তায় বিদেশে চালান হবে না, আমাদের যে সব দ্রব্য প্রয়োজন তার বিনিময়ে ব্যবহৃত হবে। বহির্বাণিজ্যের উপর আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক গঠনের যদি ভিত্তি হয় তাহলে অন্যান্য দেশের সঙ্গে একদিন সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা, তাছাড়া বিদেশী বাজার বন্ধ হলে ফল ছত্রভঙ্গ।

তাই আমরা যদিও কোনো সুনিশ্চিত সমাজব্যবস্থার কথা স্বীকার না করেই কাজ আরম্ভ করেছিলাম তবু আমাদের লক্ষ্য সুনির্দিষ্টই ছিল যার ফলে সকলের মিলিত পরিকল্পনার ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল। এই পরিকল্পনার মূল কথা হচ্ছে কর্মপদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলাবিধান। ফলে স্বতন্ত্র উদ্যোগ নিষিদ্ধ না হলেও তার ক্ষেত্র অনেকটা সঙ্কীর্ণ

হয়েছিল। দেশরক্ষার সঙ্গে যে-সকল শিল্পের সম্পর্ক আছে, সেগুলি রাষ্ট্রকর্তৃক অধিকৃত ও পরিচালিত হবে এই স্থির হয়। মূল শিল্পগুলি সম্বন্ধে সমিতির অধিকাংশ সদস্যের মত এই হয় যে এসকল শিল্প রাষ্ট্রের অধিকারে আসা উচিত, আবার অনেকের মতে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হলেই যথেষ্ট। অবশ্য এই নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ট দৃঢ় হওয়া চাই। সর্বসাধারণের নিত্যপ্রয়োজনসাধক যেসকল প্রতিষ্ঠান সেগুলি রাষ্ট্রের কোনো বিভাগের—কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকার, বা লোকাল বোর্ড—অধিকারে থাকা উচিত। লন্ডন ট্রান্সপোর্ট বোর্ডের অনুরূপ কোনো প্রতিষ্ঠান এসকলের পরিচালন করতে পারে। অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিল্প সম্বন্ধে স্থির হয় যে, পরিকল্পনা কার্যকরী করতে হলে কিছু পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ একান্তই আবশ্যক, অবশ্য বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে তার পরিমাণও ভিন্ন হবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসমূহের পরিচালনা সম্বন্ধে প্রস্তাব হয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ন্যাসরক্ষকমণ্ডলী নিয়োগই সমীচীন। এই মণ্ডলী একদিকে যেমন এই সকল শিল্পে সাধারণের অধিকার ও কর্তৃত্ব রক্ষা করবে, অপর পক্ষে পূর্ণগণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে অনেক ক্ষেত্রে যেসকল অসুবিধা ও অপটুতার উদ্ভব হয় তাও নিবারণ করতে পারবে। সমবায় প্রণালীতে শিল্পে স্বত্বাধিকার ও পরিচালনা ব্যবস্থার কথাও প্রস্তাবিত হয়। কোনো পরিকল্পনা কার্যকরী করতে হলে প্রত্যেক শিল্পের প্রত্যেক বিভাগের বিস্তার সম্বন্ধে সূক্ষ্ম আলোচনা এবং কিছুকাল পরে পরে তার অগ্রগতির হিসাব করা প্রয়োজন। শিল্পের বিস্তারের জন্য বিশেষশিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীরও প্রয়োজন এবং এই সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান যাতে এরকম শিক্ষার ব্যবস্থা করেন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সেরকম নির্দেশও দেওয়া যেতে পারে।

ভূ-সংক্রান্ত ব্যাপারে এই সাধারণ নীতি নির্দিষ্ট হয় : 'চাষের জমি, খনি, নদী, ও অরণ্য জাতীয় সম্পত্তি, এর স্বত্ব ভারতের সর্বসাধারণে বর্তাবে।' ভূসম্পদের ব্যবহারে সমবায়নীতি প্রযুক্ত হবে, যৌথ প্রতিষ্ঠানই এর ব্যবস্থা করবে। ক্ষুদ্রায়তন জমিতে চাষীর অধিকার যে তুলে দেওয়া হবে তা নয়; কিন্তু তালুকদার জমিদার প্রভৃতি মধ্যবর্তী যারা আছে যুগান্তরপর্বের পর তাদের অধিকার আর স্বীকার করা হবে না, এদের যা স্বত্বস্বামিত্ব আছে ক্রমশ তা কিনে নেওয়া হবে। যেসকল চাষযোগ্য জমি পতিত আছে তাতে অগৌণেই যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানের সূচনা করতে হবে। যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত বা যৌথ স্বত্বাধিকারভুক্ত হতে পারে। বিভিন্ন রকমের প্রতিষ্ঠানই যাতে গড়ে উঠতে পারে সেই সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, যাতে অভিজ্ঞতালাভের পর বিশেষ রকমের প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করা চলে।

আমরা, অন্তত কেউ কেউ, এই আশা করেছিলাম যে টাকাকড়ি লেনদেনের ব্যাপারও সমাজহিতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স প্রভৃতির জাতীয়করণ যদি না ঘটে, অন্তত সেগুলি রাষ্ট্রের অধীনে আসা উচিত যাতে মূলধন ইত্যাদি বিষয় রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। আমদানি রপ্তানি ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ বাঞ্ছনীয়। এই সকল নানা উপায়ে জমি ও শিল্পের ব্যাপারে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রভূত পরিমাণে স্বীকৃত

হবে—যদিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার পরিমাণভেদ ঘটবে, এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বর্তমান থাকবে।

এইভাবে বিশেষ বিশেষ সমস্যার বিচারের ফলে আমাদের সমাজনৈতিক লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতি সুনির্দিষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। তার মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ ছেদ, অনেকক্ষেত্রে অস্পষ্টতা, এমনকি স্বতোবিরোধিতাও ছিল; তত্ত্ববিচারে সে পরিকল্পনা একেবারেই সুসম্পূর্ণ নয়। কিন্তু আমাদের সমিতির মধ্যে নানা বিরুদ্ধপ্রকৃতির লোকের সমাবেশ সত্ত্বেও যতটা ঐক্যমতের সৃষ্টি হয়েছিল তাতেই আমি বিস্ময় বোধ করেছিলাম। ব্যবসায়ীসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গই আমাদের মধ্যে দল হিসাবে সংখ্যাগুরু এবং অনেক বিষয়ে বিশেষ আর্থিক ও ব্যবসায়সংক্রান্ত তাঁদের মতামত পুরোপুরি সংরক্ষণশীল। তবু দ্রুত অগ্রগতির আকাঙ্ক্ষা, এবং এই পথেই আমরা বেকার ও দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান করতে পারব এই বিশ্বাস আমাদের এত গভীর যে নিজ নিজ সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে এসে নূতন ধারায় চিন্তা করতে আমরা বাধ্য হয়েছি। আমরা তত্ত্ববিচারের পথে যাইনি; প্রত্যেক বাস্তব সমস্যা আমরা বৃহত্তর সমস্যার অঙ্গীভূত করে দেখেছি, ফলে সর্বদাই আমাদের গতি এক বিশেষ ধারারই অভিমুখী হয়েছে। পরিকল্পনা সমিতির সদস্যদের মধ্যে যে সহযোগিতার ভাব ছিল তা আমার একান্ত আনন্দের কারণ হয়েছে, রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রের দ্বন্দ্বকলহের তুলনায় আরও বিশেষ করে। আমরা পরস্পরের মতভেদের কথা জেনেও, বিভিন্ন দিক আলোচনা করে, সর্ববাদিসম্মত বা অধিকাংশের অনুমোদিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেষ্টা করেছি, প্রায়শ কৃতকার্যও হয়েছি।

শুধু সমিতি নয়, ভারতবর্ষে বৃহত্তর ক্ষেত্রেও যে অবস্থা তাতে তখনই সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার প্রবর্তন সম্ভব ছিল না। তৎসত্ত্বেও মূলত সমাজতান্ত্রিক গঠনের অভিমুখেই আমাদের পরিকল্পনা যেন অনন্যগতি হয়েই অভিব্যক্ত হয়ে চলেছিল। স্ব-অর্থোপায়প্রবৃত্তির দমন ও প্রগতির বাধা বিদূরিত হয়ে সমাজ-সংস্থিতি যাতে সুবিস্তৃত হতে পারে তারই চেষ্টা চলছিল। সাধারণ মানুষের যাতে উপকার হয়, তার জীবনযাত্রার মান যাতে বাড়ে, তার যে বুদ্ধি ও শক্তি সুপ্ত হয়ে আছে তা যাতে মুক্তিলাভ করে সেই উদ্যোগই এই পরিকল্পনার ভিত্তি। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে, সাধারণত যাঁরা সমাজতন্ত্রের বিরোধী তাঁদেরই অনেকের প্রভূত সহযোগিতায় এই উদ্যোগ। এই সহযোগিতা লাভ করতে গিয়ে যদি পরিকল্পনা কোনো কোনো বিষয়ে কিঞ্চিৎ ন্যূন করতে হয় তাহলেও এই সহযোগিতা আমার কাছে প্রার্থনীয় বলে বোধ হয়েছিল। সম্ভবত আমার আশা অশেষ। কিন্তু আমি এই অনুভব করেছিলাম যে যদি আমরা মঙ্গলের পথে একবার অগ্রসর হই, তবে সেই গতিবেগই আমাদের উত্তরোত্তর উন্নতির পথে নিয়ে যাবে। সংঘর্ষ যদি এড়াবার উপায় না থাকে তবে আমরা তার সম্মুখীন হব; কিন্তু যদি তা এড়ানো যায়, বা তার তীব্রতা হ্রাস করা যায় তবে স্পষ্টতই সেটা একটা লাভ। বিশেষ যখন রাষ্ট্রক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের অবধি নেই, এবং ভবিষ্যতে অবস্থা সংকটময় হতে পারে। যে-কোনো পরিকল্পনায় সকলের

সমর্থনলাভের তাই বিশেষ মূল্য আছে। কোনো বিশেষ আদর্শের ভিত্তির উপর পরিকল্পনা রচনা করা সহজ, কিন্তু সে পরিকল্পনা সন্তোষজনকভাবে কার্যকরী করতে হলে সর্বসাধারণের যে সম্মতি ও অনুমোদন প্রয়োজন তা আয়ত্ত করা তত সুখসাধ্য নয়।

পরিকল্পনার ফলে নিয়ন্ত্রণাদির প্রবর্তন ও ব্যষ্টির স্বেচ্ছাচরণ কিঞ্চিৎ খর্ব হলেও, ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থাবিচারে সমগ্রভাবে স্বাধীনতা বস্তুত বৃদ্ধিই পাবে। আমাদের কি স্বাধীনতা এখন আছে? স্বাধীনতা আমাদের অর্জন করতে হবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে স্বীকার করে আমরা যদি সমবায়-উদ্যোক্তাকে প্রোৎসাহিত করি তাহলে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে অনেকাংশে আমরা মুক্ত থাকতে আশা করতে পারি।

আমাদের প্রথম অধিবেশনে আমরা সুদীর্ঘ প্রশ্নাবলী রচনা করে বিভিন্ন সরকার ও জনপ্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, বাণিজ্যপরিষৎ, ট্রেড ইউনিয়ন, গবেষণা-পরিষৎ প্রভৃতিতে পাঠিয়েছিলাম। বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে মন্তব্য জ্ঞাপন করবার জন্য ঊনত্রিশটি উপ-সমিতিও গঠিত হয়। এর মধ্যে আটটি কৃষিসংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে, সাতটি শিল্প সম্বন্ধে, পাঁচটি ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে, দুটি যানবাহন সম্বন্ধে, দুটি শিক্ষা সম্বন্ধে, দুটি জনমঙ্গল সম্বন্ধে, দুটি জনতাবর্ণন সংক্রান্ত এবং একটি পরিকল্পনা নারীর স্থান প্রসঙ্গে। এই সব উপ-সমিতির মোট সদস্যসংখ্যা ছিল সাড়ে তিনশো। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই নিজ নিজ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ— ব্যবসায়ী, সরকারী বা পৌরকর্মচারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বা উপাধ্যায়, শিল্পকুশলী, বিজ্ঞানী, ট্রেড ইউনিয়ন-কর্মী বা জনসেবক। এইভাবে দেশে বিদ্বান বুদ্ধিমান যাঁরা আছেন অনেককেই আমরা একত্র করেছিলাম। কেবল ভারত-সরকারের কর্মচারীরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবার অনুমতি পাননি, যদিও অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেরা ইচ্ছুক ছিলেন। এত লোক আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকায় আমাদের অনেক সুবিধা হয়েছিল। আমরা তাঁদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সুযোগ পেয়েছিলাম, তাঁরাও বৃহত্তর ক্ষেত্রের যোগে নিজ নিজ বিষয়ে চিন্তা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন, আর সমগ্র দেশে পরিকল্পনা ব্যাপারে ঔৎসুক্য জেগেছিল। অবশ্য এই সংখ্যাধিক্যের অসুবিধাও ছিল—সারা দেশ থেকে কর্মব্যস্ত লোকদের বারংবার সম্মিলিত হতে বিলম্ব না হয়ে গত্যন্তর ছিল না।

দেশের কাজে নানাদিকে এত শক্তি ও আগ্রহের পরিচয় পেয়ে আমি বিশেষ উৎসাহান্বিত হয়েছিলাম—এই যোগাযোগের ফলে আমিও অনেক শিক্ষালাভ করেছি। আমাদের কর্মপ্রণালী ছিল এই: প্রত্যেক উপ-সমিতির কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি প্রাথমিক বিবরণ পরিকল্পনা-সমিতি একবার বিচার করে তা অনুমোদন বা সমালোচনা করতেন, মন্তব্যসহ তা পুনরায় উপ-সমিতির বিবেচনার্থ ফেরত যেত। তার পরে উপ-সমিতি যে শেষ রিপোর্ট দিতেন তাকেই ভিত্তি করে বিভিন্ন বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত স্থির করতাম। এক বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত হয় অন্যান্য বিষয়ের সিদ্ধান্তের

সঙ্গে যাতে তার সঙ্গতি থাকে এ-বিষয়ে আমাদের চেষ্টা সদাজাগ্রত ছিল। এইরূপ ভাবে সমস্ত রিপোর্ট বিবেচিত হয়ে গেলে পরিকল্পনা-সমিতি বিরাট সমস্যা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে স্বকীয় মন্তব্য সহ নিজ প্রতিবেদন পেশ করবেন, উপ-সমিতির মন্তব্যাবলী তাতে পরিশিষ্টরূপে যুক্ত হবে। বস্তুত উপ-সমিতির মন্তব্য বিবেচনার দ্বারাই আমাদের এই সর্বশেষ প্রতিবেদনের রূপ কি হবে তা নির্ধারিত হচ্ছিল।

কোনো কোনো উপ-সমিতি নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করতে পারেননি, প্রধানত তারই ফলে অনেক সময় বিরক্তির সৃষ্টি হয়েছে সত্য, কিন্তু মোটের উপর আমাদের কাজ দ্রুতই চলছিল, প্রভূত পরিমাণ কাজ আমরা শেষ করেছিলাম। শিক্ষা প্রসঙ্গে দুটি বিশেষ নূতন ধরনের প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করি—শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের অবস্থার নির্দিষ্ট যোগ থাকা উচিত এই প্রস্তাব আমরা করি। সমাজসেবা বা কায়িক কর্ম যাতে আবশ্যিক হয় এইজন্য আমরা প্রস্তাব করি যে প্রত্যেক তরুণ-তরুণীকে ১৮-২২ বছর বয়সের মধ্যে যে-কোনো এক বছর কৃষি, শিল্প বা জনহিতকর যে-কোনো কাজে উৎসর্গ করতে হবে। শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা ব্যতীত অন্য কোনো কারণেই এর অন্যথা হবে না।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল তখন কথা হয় যে জাতীয় পরিকল্পনা-সমিতির কাজ এখন স্থগিত থাকুক। নভেম্বর মাসে বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীগুলি পদত্যাগ করেন, তার ফলে আমাদের আরও অসুবিধা হয়, কারণ বিভিন্ন প্রদেশে রাষ্ট্রপালের একতন্ত্র শাসনে আমাদের কাজে আর কারও ঔৎসুক্য রইল না। ব্যবসায়ীরা যুদ্ধের সুযোগে কি করে টাকা করতে পারেন তাতেই ব্যস্ত, পরিকল্পনায় তাঁদের আর তেমন উৎসাহ রইল না। প্রতিদিন অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে লাগল। আমরা কিন্তু স্থির করলাম যে আমাদের কাজ করে যাব, যুদ্ধের ফলে তা আরও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এর ফলে শিল্পের আরও প্রচার ও প্রবর্তন হবে—আমরা যে কাজ করেছি ও করতে প্রবৃত্ত আছি তাতে এই প্রক্রিয়ার আনুকূল্যই করা হবে। এঞ্জিনিয়ারিং, যানবাহন, রসায়ন প্রভৃতি সংক্রান্ত শিল্প বিষয়ে বিভিন্ন উপ-সমিতির মন্তব্য এইসময় আমরা বিবেচনা করছিলাম—যুদ্ধ প্রসঙ্গে এ সবই বিশেষ মূল্যবান। কিন্তু আমাদের কাজে গভর্নমেন্টের কোনো উৎসাহ ছিল না, বরং তাকে অপ্রীতির চোখেই তাঁরা দেখতেন। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর প্রথম কয়েক মাস তাঁদের নীতিই ছিল ভারতীয় শিল্পচেষ্টাকে উৎসাহ না দেওয়া। পরে ঘটনাচক্রে অগত্যা অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস ভারতবর্ষ থেকেই তাঁদের কিনতে হয়েছে, কিন্তু তখনও ভারতে কোনো বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠনের অনুমোদন করেননি। অনুমোদন না করাটা বস্তুত নিবারণ করাতেই দাঁড়িয়েছে, কারণ সরকারের অনুমতি ব্যতীত কোনো যন্ত্রপাতি আমদানি করবার উপায় ছিল না।

পরিকল্পনা-সমিতির কাজ চলতে লাগল; উপ-সমিতিগুলির প্রতিবেদন বিবেচনার কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়ে এসেছিল। আর যতটুকু বাকি আছে তা শেষ করে আমাদের

বিস্তারিত প্রতিবেদনের বিষয় অতঃপর আমরা আলোচনা করব, এইরকম কথা ছিল। কিন্তু ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে আমি গ্রেপ্তার হই, দীর্ঘকালের জন্য আমি কারারুদ্ধ হই। পরিকল্পনা-সমিতি ও উপ-সমিতিগুলির আরও অনেক সদস্যও বন্দী হন। পরিকল্পনা-সমিতির কাজ চলুক এই আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল. আমার সহকর্মী যাঁরা জেলের বাইরে ছিলেন তাঁদের আমি সেই অনুরোধ করি। কিন্তু আমার অনুপস্থিতিতে তাঁরা সমিতির কাজ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। পরিকল্পনা-সমিতির কাগজপত্র আমি জেলের মধ্যে পাবার চেষ্টা করি যাতে আমি সেগুলি আলোচনা করে খসড়া রিপোর্ট লিখতে পারি, কিন্তু ভারত-সরকার এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে এটা বন্ধ করেন। এ ব্যাপারে কোনো কাগজপত্র আমার কাছে পেঁছয়নি, এ-বিষয়ে কোনো দর্শনপ্রার্থীর সঙ্গে আমাকে আলোচনা করতে দেওয়া হয়নি।

এইভাবে কারাগৃহে আমার দিন কাটতে লাগল, পরিকল্পনা-সমিতিও ক্ষীণদশাপ্রাপ্ত হল। আমরা যেসব কাজ করেছিলাম তা সম্পূর্ণ না হলেও যুদ্ধ সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে তা প্রয়োজনে লাগতে পারত. কিন্তু সেসব আমাদের আপিসের দপ্তরেই আবদ্ধ হয়ে রইল। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে মুক্তিলাভ করে আমি কয়েক মাস কারাগৃহের বাইরে ছিলাম। কিন্তু এসময়টা কি আমার কি অন্যদের পক্ষে পরম উত্তেজনার সময়। ঘটনার গতি নব নব ধারায় প্রবাহিত, প্রশান্ত উপসাগরের যুদ্ধ বেধে উঠেছে, ভারতবর্ষ আক্রান্ত হবে এই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, রাজনৈতিক অবস্থা স্বচ্ছ না হওয়া পর্যন্ত. এই সময়ে বিক্ষিপ্ত সকল সূত্র সংহত করে পরিকল্পনা-সমিতির অসমাপ্ত কাজ পরিচালনা করা সম্ভব নয়। কিছুদিন পরেই আমি আবার কারাগৃহে প্রত্যাবর্তন করি।

৭ : কংগ্রেস ও শিল্প : যন্ত্রশিল্প বনাম কুটির-শিল্প

গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেস দীর্ঘকাল যাবৎ কুটির-শিল্পের, বিশেষত চরকায় সুতো-কাটা ও তাঁতে কাপড় বোনার, পোষকতা করে আসছে। কিন্তু বৃহত্তর শিল্পপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধতা কখনও কংগ্রেস করেনি, ব্যবস্থাপক সভায় বা অন্যত্র যখনই সুযোগ পেয়েছে সে চেষ্টাকে উৎসাহিত করেছে। প্রাদেশিক কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাসমূহও সে-বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে টাটা স্টীল অ্যান্ড আয়রন ওআর্কস যখন বিপন্ন, সে সময়, প্রধানত কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রসভায় কংগ্রেসী দলের আগ্রহাতিশয়েই, এই প্রতিষ্ঠানকে সঙ্কট কাটিয়ে উঠবার জন্য সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। ভারতীয় জাহাজ-নির্মাণ ও জাহাজ চালনার ব্যবসা নিয়ে দীর্ঘকাল সরকার ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটেছে। কংগ্রেস তথা ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল শ্রেণীর মত এই যে, এদের সর্বপ্রকার আনুকূল্য করা হোক; অপরপক্ষে, শক্তিশালী ব্রিটিশ জাহাজ-কোম্পানীগুলির কায়েমী স্বার্থরক্ষাকল্পে সরকার বদ্ধপরিকর। মূলধন, বিশেষ শিল্পজ্ঞান ও পরিচালনক্ষমতার কোনো অভাব না থাকলেও, সরকারী বৈষম্য-

নীতির ফলে ভারতের জাহাজ-ব্যবসা বিস্তারলাভ করতে পারেনি। যেখানেই ব্রিটিশ ব্যবসায়ীর স্বার্থ জড়িত সে ক্ষেত্রেই সর্বদা এইরূপ বৈষম্যনীতির প্রয়োগ দেখা গিয়েছে।

ভারতীয় শিল্পের স্বার্থ বারবার বলি দিয়ে ইম্পীরিয়াল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ নামক বিরাট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অনেক সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে। কয়েক বছর আগে দীর্ঘকালের চুক্তিতে পাঞ্জাবের খনিজসম্পদ কাজে লাগাবার অধিকার এদের দেওয়া হয়। আমার যতদূর জানা আছে, কি সর্তে এই অধিকার দেওয়া হয়েছিল তা সাধারণের নিকট প্রকাশিত হয়নি, সম্ভবত 'সাধারণের মঙ্গলার্থেই' সেকথা গোপন রাখা প্রয়োজন ছিল।

পাওয়ার অ্যালকহল শিল্পবিস্তারে কংগ্রেস-গবর্নমেন্ট বিশেষ উৎসুক ছিলেন। নানা কারণেই এর প্রয়োজন ছিল, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে এর বিশেষ আবশ্যকতা ছিল। ঐ অঞ্চলের চিনির কলগুলিতে প্রচুর পরিমাণে মাতগুড় উৎপন্ন হচ্ছিল সেটা কোনো কাজেই লাগছিল না। পাওয়ার অ্যালকহল উৎপাদনে এর ব্যবহারের প্রস্তাব হয়। প্রস্তুত-প্রণালী অতি সরল, অন্য কোনো বাধাও ছিল না—শুধু এক বাধা, এতে শেল ও বর্মা সমবেত অয়েল কোম্পানির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। ভারত-সরকার এদেরই স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে উৎপাদনের অনুমতি দিতে অস্বীকৃত হলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তৃতীয় বর্ষে যখন বর্মা পরহস্তগত হল, বর্মার পেট্রল ও তেলের আমদানি বন্ধ হল, তখন অবশেষে এই বোধ জন্মাল যে পাওয়ার অ্যালকহল প্রয়োজন, ভারতবর্ষেই তা উৎপন্ন করতে হবে। ১৯৪২ সালে আমেরিকার গ্রেডি কমিটি এবিষয়ে জোর সুপারিশ করেন।

কংগ্রেস বরাবরই ভারতবর্ষে যন্ত্রশিল্পের প্রভূত প্রচার সমর্থন করে এসেছেন; আবার কুটির-শিল্পেরও সমর্থন করেছেন এবং সেজন্য উদ্যোগীও হয়েছেন। এই দুয়ের মধ্যে কি কোনো বিরুদ্ধতা আছে? কিসের উপর জোর দিতে হবে তা নিয়ে হয়তো প্রভেদ আছে; ভারতবর্ষে যেসকল অর্থনীতি ও মানবসম্পর্ক সংক্রান্ত ব্যাপার পূর্বে লক্ষ্যগোচর ছিল না সে-সম্বন্ধে বোধ জন্মেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে যেভাবে ধনতান্ত্রিক যন্ত্রশিল্পের অভ্যুদয় হয়েছে, সেই প্রণালীতেই ভারতবর্ষের শিল্পপতিগণ ও তাঁদের সমর্থক রাষ্ট্রনীতিকেরা চিন্তা করেছেন, তার যেসকল কুফল বিংশ শতাব্দীতে আজ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে সেকথা ভাবেননি। ভারতবর্ষে একশো বছর স্বাভাবিক অগ্রগতি স্থগিত ছিল, তাই এক্ষেত্রে সে ফল আরও সুদূরপ্রসারী হবে বলেই মনে হয়। ভারতবর্ষের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায়, যেসকল মাঝারি আকারের শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হচ্ছে তার ফলে শ্রমিকদের সম্পূর্ণ কার্যে নিয়োজিত করা দূরে থাক বেকারসংখ্যা বাড়িয়েই তুলছে। একদলের হাতে টাকা জড়ো হচ্ছে, অন্য প্রান্তে দারিদ্র্য ও কর্মহীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, বৃহদায়তন শিল্প, যাতে শ্রমজীবীদের পোষণ করতে পারে, তার উপর জোর দিয়ে এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনানুযায়ী চললে এ অবস্থার পরিবর্তন সহজেই হতে পারে।

জনসাধারণের এই ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য গান্ধীজিকে বিশেষভাবে চিন্তান্বিত করে। একথা সত্য যে, আমরা যাকে আধুনিক দৃষ্টি বলি তার সঙ্গে তাঁর জীবনদর্শনের মূলগত প্রভেদ আছে। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্য বিসর্জন দিয়ে যে স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতা ক্রমশই বেড়ে চলেছে তার প্রতি তাঁর কোনো মোহ নেই। সুখসর্বস্ব জীবন যাপনের তিনি প্রতিকূল; তাঁর মতে, কঠিন পথই সরল পথ, বিলাসপ্রিয়তা পরিণামে নিয়ে যায় কুটিলতা ও পাপের পথে। সর্বাপেক্ষা তাঁকে আঘাত করে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অনতিক্রমণীয় বাধা, এই দুই দলের জীবনযাত্রা ও আত্মবিকাশের সুযোগের দুস্তর পার্থক্য। নিজের ব্যক্তিগত ও মানসিক শান্তির জন্য তিনি এই বাধা উত্তীর্ণ হয়ে দীনহীনের দলে গিয়ে আসন নিয়েছেন, দরিদ্রের জীবনযাত্রা ও সামান্য বেশ (যাকে বেশভূষার অভাবই বলা যেতে পারে) তিনি গ্রহণ করেছেন, তাতে যেটুকু উন্নতিবিধান দরিদ্রেরও সাধ্যায়ত্ত সেইটুকুই তিনি স্বীকার করেছেন। মুষ্টিমেয় ধনী ও দৈন্যগ্রস্ত অগণিত জনসাধারণ, এই দুয়ের মধ্যে এরূপ বিরাট প্রভেদের কারণ তাঁর মতে দুটি : বিদেশী শাসন ও তার সাথী শোষণনীতি; এবং পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক সভ্যতা যার প্রতীক হচ্ছে বৃহৎ যন্ত্র। এই দুয়েরই বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়ালেন। অতীত কালের স্বতন্ত্র ও প্রায় আত্মনির্ভর যে পল্লীসমাজ, বস্তুর উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের মধ্যে যেখানে স্বাভাবিক সামঞ্জস্য ছিল, যেখানে রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বর্তমানের মত কেন্দ্রীভূত হয়নি, সমাজের সর্বত্র বিস্তৃত ছিল, সমাজ যেখানে সহজ গণতন্ত্রের নিয়মে শাসিত, ধনীদরিদ্রের মধ্যে দূরত্ব এতটা সুস্পষ্ট হয়নি, যে সমাজে বড় বড় নগরে যে সব অমঙ্গলের আবাস তা দেখা দেয়নি, যে মাটিতে প্রাণের স্পর্শ তার সঙ্গে যোগে উন্মুক্ত পরিবেশের নির্মল বায়ুতে মানুষের বাস—তারই কথা তিনি সাগ্রহে স্মরণ করতেন।

জীবনের অর্থ কি, তাই নিয়ে বহু লোকের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর এই মূলগত পার্থক্য—এই পার্থক্য তাঁর ভাষা তাঁর সকল কর্মকে রঞ্জিত করেছে। যুগে যুগে কেবল ভারতবর্ষে নয়, অন্য দেশেও ধর্ম ও নীতির যে-সকল বাণী উচ্চারিত হয়েছে তারই কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছে তাঁর প্রাণবন্ত শক্তিগর্ভ ভাষা। নৈতিক মূল্যের স্থানই সর্বোপরি, অন্যায়ের পথে মহৎ লক্ষ্যে পেঁছনো চলবে না, এ না হলে কি ব্যক্তির কি জাতির ধ্বংস অনিবার্য।

তাই বলে তিনি যে জীবন থেকে জীবনের সকল সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন আপনগড়া কল্পনালোকবাসী স্বপ্নাচ্ছন্ন মানুষ, তা নয়। ঘোর ব্যবসায়ী বানিয়ার দেশ গুজরাটে তাঁর বাড়ি, ঐ অঞ্চলের গ্রাম-জীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় অদ্বিতীয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলেই তিনি চরকা ও পল্লীশিল্প প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। যদি অগণিত বেকার ও আধাবেকারদের অবিলম্বেই সাহায্য করতে হয়, সমগ্র ভারতময় যে ক্ষয় বিস্তারলাভ করে জনগণকে অবশ করে ফেলেছে তার গতি যদি রুদ্ধ করতে হয়, গ্রামবাসী সকলের জীবনযাত্রার মান যদি সামান্যও উন্নত করতে হয়, অন্যের আনুকূল্যের অপেক্ষায় নিঃসহায়ের মত বসে না থেকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবার

শিক্ষা যদি তাদের দিতে হয়, সামান্য সম্বলের উপর নির্ভর করেই যদি এ সকল সমস্যার সমাধান করতে হয়, তবে অন্য কোনো পথ নেই। বিদেশী শাসন ও শোষণের যে অমঙ্গল, বৃহৎ সংস্কার-উদ্যোগ প্রবর্তন ও কার্যে পরিণত করবার স্বাধীনতার অভাব—এসব ছেড়ে দিলে ভারতবর্ষের সমস্যা হচ্ছে মূলধনের স্বল্পতা ও শ্রমিকের আতিশয্যের সমস্যা—কি করে এই নিষ্ফলা শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানো যায় তাই চিন্তার বিষয়। মানবিক শক্তির সঙ্গে যন্ত্রশক্তির তুলনা নির্বোধের মত অনেকে করে থাকে; বৃহৎ যন্ত্র যে হাজার দশহাজার মানুষের কাজ করতে পারে তা সকলেই জানে; কিন্তু সেই দশহাজার লোক যদি নিষ্কর্মা বসে থাকে বা খেতে না পায়, তাহলে—সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের এক দূরকালের বিষয় বিবেচনায় ছাড়া—সেই যন্ত্রের দ্বারা সমাজের কোনো লাভ নেই। বৃহৎ যন্ত্র না থাকলে তুলনার কথাও ওঠে না; উৎপাদন-ব্যাপারে মানুষের নিয়োগ ব্যক্তিগত ও জাতিগত দুই বিচারেই লাভজনক। এর সঙ্গে যন্ত্রের কোনো অনিবার্য বিরোধ নেই—যদি মানুষকে বেকার না করে মানুষকে কাজে লাগাতেই তা ব্যবহৃত হয়।

পাশ্চাত্যের ক্ষুদ্রায়তন কিন্তু শিল্পগরিষ্ঠ দেশ, বা অপেক্ষাকৃত বিরলবসতি বৃহৎ দেশ—যথা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র—এসবের সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা করা ভ্রমাত্মক। পশ্চিম ইউরোপে শতবর্ষকাল ধরে যন্ত্রশিল্পের বহুল প্রচার ঘটেছে এবং ক্রমশ জনসমাজ সেই ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়েছে: জনসংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, পরে তা নিয়মিত হয়েছে, এখন তা হ্রাসের পথে। রাশিয়ায় ও আমেরিকায় আছে বিস্তৃত ভূখন্ড, আর তার জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, যদিচ তা বৃদ্ধিশীল। কৃষির জন্য ট্র্যাক্টরের ব্যবহার সেদেশে একান্ত আবশ্যক। ঘনবসতি গাঙ্গেয় উপত্যকায় ট্র্যাক্টরের সেরূপ প্রয়োজন আছে কি না সন্দেহ, বিশেষত এত বহুসংখ্যক লোক যদি কৃষির উপরই অনন্যনির্ভর হয়। অন্যান্য সমস্যাও দেখা দেয়, যেমন আমেরিকাতেও দিয়েছে। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের মাটিতে চাষের কাজ চলেছে, ফলে মাটির কাছ থেকে এযাবৎ যথেষ্ট আদায় হয়েছে। ট্র্যাক্টর দিয়ে জমি গভীরভাবে চষে ফেললে মাটির উর্বরতা নষ্ট হবে ও তা ক্ষয়প্রাপ্ত হবে বলে অনেকে সংশয় প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষে রেললাইন পাতবার সময় যখন উঁচু বাঁধ দেওয়া হয় তখন দেশের স্বাভাবিক জলনিকাশব্যবস্থার কথা কেউ ভাবেনি। তাতে এই নিকাশ-ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে এবং তার ফলে বারম্বার বন্যা, জমির ক্ষয় এবং ম্যালেরিয়ার বিস্তারলাভ।

আমি ট্র্যাক্টর ও বৃহৎ যন্ত্রের বিশেষ পক্ষপাতী; এবিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চয় যে জমির উপর অতিরিক্ত চাপ দূর করতে হলে, দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হলে, জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হলে, দেশরক্ষা ও অন্যান্য নানা কারণেই ভারতবর্ষে যন্ত্রশিল্পের দ্রুত বিস্তার একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এ বিষয়েও আমি নিশ্চিত যে, শিল্পপ্রসারের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে হলে, এবং এর নানা বিপদ নিবারণ করতে হলে সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রয়োজন। সুদৃঢ় ঐতিহ্যসম্পন্ন চীন ও ভারতবর্ষের

ন্যায় যে-সকল দেশে উন্নতির প্রবাহ আজ রুদ্ধ সেসব দেশেই এরূপ পরিকল্পনার আবশ্যকতা আছে।

চীনদেশের শিল্প-সমবায়প্রতিষ্ঠান দেখে আমি বিশেষ আকৃষ্ট হই, আমার মনে হয় যে ভারতবর্ষের পক্ষে এইরূপ আন্দোলন বিশেষ উপযোগী। ভারত-বর্ষের পটভূমির সঙ্গে এর সহজেই সামঞ্জস্য হবে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এর দ্বারা গণ-তান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠালাভ করবে, এবং সহযোগিতার প্রবৃত্তি উৎসাহিত হবে। বৃহৎ শিল্পের পরিপূরক এ হতে পারে। একথা স্মরণ রাখতে হবে যে ভারতবর্ষে বৃহদায়তন শিল্পের যত দ্রুতই বিস্তার হোক, ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির-শিল্পের প্রভূত স্থান থাকবে। সোভিয়েট রাশিয়ার শিল্পোন্নতিতেও মালিক-উৎপাদকের সমবায়-প্রতিষ্ঠান বিশেষ কার্যকরী হয়েছে।

বৈদ্যুতশক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অনুকূল, তার সাহায্যে এই শিল্প বৃহদায়তন শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার শক্তি লাভ করে। বিকেন্দ্রীকরণের অনুকূলেও একশ্রেণীর মত গড়ে উঠেছে, এমনকি হেনরী ফোর্ডও এর সমর্থন করেছেন। শিল্পপ্রধান বিরাট শহরের জীবনযাত্রায় মাটির সঙ্গে যোগ হারিয়ে যায়, তাতে প্রাণ-মনের কি ক্ষতি বিজ্ঞানীরা তা দেখিয়েছেন। কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে মানবজাতিকে যদি বাঁচতে হয় তবে তাকে মাটির টানে গ্রামে ফিরে যেতে হবে। সৌভাগ্যবশত বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের পক্ষে এমনভাবে ছড়িয়ে থাকা সম্ভব হয়েছে যাতে সে মাটির কাছাকাছি থেকেও আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে।

সে যাই হোক, আধুনিক কালে ভারতবর্ষের সমস্যা হচ্ছে এই যে, বর্তমান অবস্থায় আমরা বিদেশী শাসন ও তার অনুবর্তী কায়েমী স্বার্থের পাশে যেভাবে আবদ্ধ হয়ে আছি তাতে জনসাধারণের দারিদ্র্য লাঘব করে কি করে তাদের মধ্যে আত্ম-নির্ভরশীলতা জাগিয়ে তোলা যায়। কুটির-শিল্প প্রবর্তনের পক্ষে যুক্তির অভাব কোনো কালেই নেই—আমরা যে অবস্থায় আছি তাতে অবশ্যই এইটাই সর্বাপেক্ষা সঙ্গত। আমরা উপায় যা গ্রহণ করেছিলাম তা হয়তো সর্বোত্তম নয়। সম্মুখে বিরাট, দুরূহ, জটিল সমস্যা, বারংবার সরকারের হাতে আমাদের নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। নানা পরীক্ষা ও ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়ে ক্রমশ আমাদের শিখতে হয়েছে। আমার মনে হয় গোড়া থেকেই সমবায়পদ্ধতির উপর আমাদের জোর দেওয়া উচিত ছিল; গ্রামের কুটির-শিল্পের উপযোগী ছোটখাট যন্ত্রপাতির উন্নতির জন্য বিশেষজ্ঞের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করা কর্তব্য ছিল। বর্তমান এই সকল প্রতিষ্ঠানে সমবায়-পদ্ধতির প্রবর্তন হচ্ছে।

অর্থনীতিনিপুণ জি. ডি. এইচ. কোল বলেন, 'কুটিরজাত বস্ত্রশিল্পের উন্নতির জন্য গান্ধীজির আন্দোলন অতীতের পুনরাবর্তনের পক্ষে কল্পনাবিলাসীর খেয়ালমাত্র নয়, এ গ্রামবাসীর দারিদ্র্য দূর করবার, জীবনযাত্রার মান উন্নত করবার বাস্তব উদ্যোগ।' এ কথা অবিসংবাদিত—তার পরেও কথা আছে। এই আন্দোলন ভারতবর্ষকে

শিখিয়েছে গরিব চাষীকে মানুষ বলে ভাবতে, মুষ্টিমেয় নগরীর চাকচিক্যের পশ্চাতে যে আছে এই দারিদ্র্য ও দুর্ভোগের পঙ্ককুন্ড এই বোধ দিয়েছে—চাষীর দুরবস্থা দূর করাতেই যে ভারতবর্ষের প্রগতি ও স্বাধীনতার প্রকৃত প্রমাণ, কোটিপতি বা ধনী আইনজীবী প্রভৃতির সৌভাগ্যেও নয়, কাউন্সিল-অ্যাসেম্ব্লির প্রতিষ্ঠাতেও নয়, গোড়াকার সেই সত্য সম্বন্ধে চেতনা জাগিয়েছে। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে এক নূতন জাতের সৃষ্টি করেছে—ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত যারা, জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের এক স্বতন্ত্র জগতে তারা বাস করে, প্রতিবাদ জানাবার সময়ও তারা মনিব-দেরই মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সেই বিচ্ছেদ গান্ধীজি অনেকটা মোচন করলেন, তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলেন তাদের আপনার লোকদের দিকে।

মনে হয়, যন্ত্রব্যবহার সম্বন্ধে গান্ধীজির মতামত ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে। 'যন্ত্রে আমার আপত্তি নেই, যন্ত্রের প্রতি অন্ধ আসক্তি সম্বন্ধেই আমার প্রতিবাদ।' 'প্রত্যেক গ্রামের কুটিরে যদি বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা সম্ভব হয় তাহলে তার সাহায্যে পল্লী-বাসীরা তাদের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে আমার আপত্তি নেই।' তাঁর মতে বৃহৎ যন্ত্রের ব্যবহারের অনিবার্য পরিণতি, বিশেষত বর্তমান অবস্থায়, স্বল্পসংখ্যক লোকের হাতে ক্ষমতা ও অর্থের সঞ্চয়। 'আজকের দিনে এইভাবেই যন্ত্রের ব্যবহার হচ্ছে। তিনি বৃহদায়তন শিল্পের প্রয়োজনীয়তাও অনেক ক্ষেত্রে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, যদি তা রাষ্ট্রের সম্পত্তি হয় এবং যে-সকল কুটির-শিল্পের প্রচলন তিনি একান্ত আবশ্যক মনে করতেন তার পথে বাধা না জন্মায়। স্বীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'যদি আর্থিক সাম্যের দৃঢ়ভিত্তির উপর এগুলি প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে কর্মসূচী হবে বালির উপর ঘর বাঁধারই তুল্য।'

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কুটিরশিল্প ও স্বল্পায়তন শিল্পের যাঁরা উৎসাহী সমর্থক তাঁরাও একথা স্বীকার করেন যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৃহদায়তন শিল্পের প্রবর্তন আবশ্যক এবং অনিবার্য; তবে এই প্রয়োজন যতদূর সীমাবদ্ধ করে রাখতে পারা যায় ততই মঙ্গল। বাহ্যত প্রশ্নটা তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে যে, এই দুই প্রণালীর উৎপাদন ও আর্থিক ব্যবস্থার কোনটার উপর জোর দেওয়া হবে, কোনটাকে কতটা স্থান দেওয়া হবে। একথা না মেনে উপায় নেই যে, বর্তমান যুগে কোনো দেশে রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক ব্যাপারে আন্তর্জাতিক পারস্পরিক সম্বন্ধ স্বীকার করেও যতটা স্বতন্ত্র হওয়া সম্ভব তা হতে পারে না, যদি সেদেশে যন্ত্রশিল্পের বহুলপ্রচার না হয় এবং প্রাকৃতিক শক্তির পূর্ণব্যবহার না ঘটে। জীবনের প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্র-শিল্পবিদ্যার ব্যবহার ব্যতীত কোনো দেশে জীবনযাত্রার উচ্চ মান প্রবর্তিত হতে পারে না, দারিদ্র্যও নির্মূল হতে পারে না। শিল্পক্ষেত্রে যেদেশ পিছিয়ে আছে সেদেশ বিশ্বের ভারসাম্যকে সততই বাধাগ্রস্ত করবে, যেসব দেশ এ বিষয়ে অগ্রসর তাদের আক্রমণপ্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলবে। যদি সেদেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বজায় থাকে তবে তা নামমাত্র; আর্থিক অধিকার হস্তান্তরে গিয়ে পড়বার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ফলে স্বীয় জীবনদর্শনের অনুযায়ী সে দেশ যে স্বল্পায়তন শিল্পের ভিত্তিতে নিজ

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছে, এই আর্থিক পরবশতার ফলে সে ভিত্তিও ব্যাহত হবে। কুটির-শিল্পের ভিত্তিতে দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনের চেষ্টা তাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। এই চেষ্টায় দেশের মূলসমস্যার সমাধান হবে না, স্বাধীনতাও রক্ষা করা যাবে না, বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গতিও রক্ষা হবে না, যদি না অবশ্য সেদেশ অন্য দেশের অধীন উপনিবেশ হয়ে থাকতে প্রস্তুত হয়।

একই দেশের দুইরকম অর্থনৈতিক ভিত্তি হতে পারে কি—একদিকে বৃহৎযন্ত্র ও শিল্পের আয়োজন, অন্যদিকে কুটিরশিল্প? এরকম ব্যবস্থা কল্পনাতীত, কারণ এক অপরকে অভিভূত করবেই, আর যদি বলপূর্বক নিবৃত্ত না করা যায় তবে যন্ত্র জয়-যুক্ত হবেই। তাহলেই দেখা যাচ্ছে, এই দ্বিবিধ উৎপাদন ও আর্থিক ব্যবস্থার সমন্বয়ের কোনো কথাই হতে পারে না; এর মধ্যে একটি প্রবল হবে, অন্যটি প্রয়োজনমত তার পরিপূরকের কাজ করবে। আধুনিক শিল্পোন্নতির ভিত্তিতে যে আর্থিক ব্যবস্থা তাই অবশ্য প্রবল হবে। শিল্পনীতি অনুযায়ী যদি বৃহৎ যন্ত্রেরই প্রয়োজন হয়—যেমন আজকের দিনে প্রয়োজন—তবে সে যন্ত্রকে সর্বতোভাবে স্বীকার করে নিতেই হবে। যদি উৎপাদনের বিকেন্দ্রীকরণ শিল্পনীতির অনুমোদিত হয় তবে যথাসাধ্য তা করা বাঞ্ছনীয়। তবে আধুনিকতম শিল্পনীতিকে মেনে নিতেই হবে—সাময়িক ভাবে কাজ চালানো ব্যতীত, সেকেলে উৎপাদন-পন্থার অনুবর্তন করার অর্থ বিস্তার ও অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করা।

আজ যখন সমস্ত পৃথিবীই অবস্থার গতিতে যন্ত্রশিল্পকে স্বীকার করে নিয়েছে এসময়, যন্ত্রশিল্প ভালো কি কুটিরশিল্প, এ নিয়ে যুক্তিজাল বিস্তার করা অবান্তর বলে মনে হয়। ভারতবর্ষেও কোন পথ গ্রহণীয় তা এই অবস্থার গতিই নির্ণয় করে দিয়েছে—এসম্বন্ধে আর সংশয় নেই যে অদূর ভবিষ্যতেই ভারতবর্ষে যন্ত্রশিল্পের দ্রুত প্রসার হবে। সে পথে ভারতবর্ষ ইতিমধ্যেই অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। অনিয়ন্ত্রিতভাবে যন্ত্রশিল্প প্রসারের কুফলের কথা আজ সুবিদিত। এই সব কুফল যন্ত্রশিল্পে অবশ্যম্ভাবী, না যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন তার পটভূমি—তা থেকেই উদ্ভূত সে স্বতন্ত্র কথা। যদি এর জন্য সেই আর্থিক ব্যবস্থাই মূলত দায়ী হয়, শিল্পনীতির অনিবার্য ও বাঞ্ছনীয় বিস্তারকে দোষ না দিয়ে সেই ব্যবস্থার পরিবর্তনেই আমাদের প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য।

নানা পরস্পরবিরোধী উপাদান ও উৎপাদনবিধির সমন্বয়সাধনটা আসল প্রশ্ন নয়, স্বতন্ত্র ও নূতন পথে চলতে হবে, যার ফলে সমাজজীবনেও নানা পরিবর্তন দেখা দেবে—সেইটেই বড় কথা। এই পরিবর্তনের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক দিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই—কিন্তু এর সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক দিকটাও একই রকম উল্লেখ-যোগ্য। বিশেষত ভারতবর্ষে আমরা সুদীর্ঘ কাল অতীতকালের পুরাতন পদ্ধতি, চিন্তা ও কর্ম-প্রণালীতে আসক্ত হয়ে আছি, নূতন অভিজ্ঞতা, নূতন ধারা যা অভিনব ভাবনার দিগন্ত আমাদের সম্মুখে প্রসারিত করে, তা একান্তই আবশ্যক। এই ভাবেই আমাদের জীবনের স্থবিরতা দূর হয়ে তাতে গতি ও প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হবে, আমাদের

মন হবে সক্রিয় ও সাহসী। নূতন অবস্থার সম্মুখীন হলে তার ব্যবস্থা করতে গিয়ে মন আপনাকে তার উপযোগী করে নেয়, নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করে।

একথা এখন সর্বজনস্বীকৃত যে, শিশুর শিক্ষায় কোনো কারুশিল্প বা হাতের কাজের ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকা আবশ্যক। এতে মন উৎসাহ পায়, মনঃশক্তির ব্যবহারের সঙ্গে দৈহিকশক্তি ব্যবহারের যোগাযোগ ঘটে। যন্ত্রের দ্বারাও বিকাশোন্মুখ বালক-বালিকাদের মন উৎসাহ পায়। যন্ত্রের সঙ্গে যথাযথরূপে যোগ হলে—নির্যাতিত কর্মীরূপে অবশ্য নয়—তাদের সম্মুখে নব নব দিগন্ত উন্মীলিত হয়। ছোটখাটো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, অণুবীক্ষণের ব্যবহার, প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা—এই সবের ফলে তাদের মনে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, জীবনের অনেক ঘটনার অর্থ তারা বুঝতে শেখে, বাঁধা বুলির উপর নির্ভর না করে পরীক্ষা করবার, আবিষ্কার করবার প্রবৃত্তি তাদের মনে জাগরিত হয়। আত্মনির্ভর ও সহযোগস্পৃহায় তারা উদ্বুদ্ধ হয়, অতীতের বিষ-বাষ্পে যে নৈরাশ্যের সৃষ্টি তার হাত থেকে তারা মুক্তি পায়। নিয়তপরিবর্তমান ও অগ্রগতিশীল যন্ত্রবিদ্যার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা এই পথেই আমাদের চালনা করে। পুরাতন সংস্কৃতি থেকে বহুলাংশে স্বতন্ত্র এই নবসভ্যতা আধুনিক শিল্পোন্নতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত। এই সভ্যতা যেমন স্বভাবতই নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি করে, তেমনি তা সমাধানের পথও নির্দেশ করে।

শিক্ষার সাহিত্যবিভাগের প্রতি আমার বিশেষ অনুরাগ আছে, চিরন্তন সাহিত্যের আমি একজন ভক্ত। কিন্তু একথাও নিশ্চয় জানি যে, প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষা, যথা পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, বিশেষ করে জীববিদ্যা, এবং বিজ্ঞানের প্রয়োগশিক্ষা ছেলে-মেয়েদের পক্ষে একান্তই প্রয়োজন। এই শিক্ষা দ্বারাই তারা আধুনিক জগৎকে বুঝতে পারবে, তার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে পারবে, এবং তাদের মন বিজ্ঞানবুদ্ধিতে কতকটা উদ্বুদ্ধ হবে। বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার নানা মহৎ কীর্তি—অদূর ভবিষ্যতে যে বিদ্যা অবশ্যই আরও অগ্রসর হবে—বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অপূর্ব কৌশল, বিচিত্র শক্তি অথচ সূক্ষ্ম যন্ত্র, বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসা ও তার ব্যবহার, প্রকৃতির আশ্চর্য কর্মশালা, অগণিত সেবকের উদ্যোগে চিন্তায় ও কর্মে সর্বত্র বিজ্ঞানের ব্যাপ্তি—আর সর্বোপরি এই কথা যে, এসবই সম্ভব করেছে মানুষের মন—এ এক পরম বিস্ময়ের বস্তু।

৮ : সরকার কর্তৃক শিল্পবিস্তার দমন : সমরকালীন উৎপাদন-চেষ্টার ফলে স্বাভাবিক গতির বৈকল্য

ভারতে বিরাটায়তন শিল্পের নিদর্শন জমশেদপুরের টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল ওআর্ক্‌স্। এর সঙ্গে তুলনা চলতে পারে এমন আর একটি প্রতিষ্ঠানও নেই— অন্যান্য সব এঞ্জিনীয়ারিং কর্মশালাতে বস্তুত খুচরো কাজ হয়ে থাকে। সরকারী নীতির ফলে টাটাও ধীরগতিতেই বিস্তার লাভ করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রেলের এঞ্জিন, যাত্রী ও মালবাহী গাড়ির কমতি, সেই সময় টাটা কোম্পানি এঞ্জিন তৈরি করবে বলে স্থির

করে, এবং আমার মনে হয় এজন্য যন্ত্রপাতিও আমদানি করে, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলে ভারত-সরকার এবং রেলওয়ে বোর্ড (এটি কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টেরই একটি বিভাগ) ব্রিটিশ কোম্পানি থেকে মাল কেনাই স্থির করেন। ফলে টাটা কোম্পানিকে এঞ্জিন তৈরি করবার চেষ্টা ত্যাগ করতে হয়, কারণ সমস্ত রেলওয়েই হয় সরকার-পরিচালিত, বা ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত, অন্য কোথাও এঞ্জিন বিক্রি করবার উপায় নেই।

যন্ত্রশিল্প ও অন্যান্য ব্যাপারে ভারতবর্ষের উন্নতিসাধনের জন্য গোড়াতেই তিনটি জিনিস দরকার: এঞ্জিনিয়ারিং ও যন্ত্রনির্মাণ শিল্প, বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিদ্যুদ্বল। সমস্ত পরিকল্পনার গোড়াকার ব্যাপার এইগুলি; জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি এবিষয়ে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। এ তিনটিরই আমাদের অভাব, এবং তার ফলে শিল্পক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি প্রায়ই মধ্যপথে আটকে যাচ্ছিল। প্রাগ্রসরনীতির সাহায্যে এসব বাধা সত্বর দূর হতে পারত, কিন্তু আমাদের সরকারী নীতি বিপরীত গতি, ভারতবর্ষে বিরাটায়তন শিল্পের প্রসার নিবারণ করাই তার কাম্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল, তবু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানির অনুমতি মিলল না; পরে জাহাজের অসুবিধার অজুহাত দেওয়া হয়েছিল। ভারতবর্ষে মূলধন বা যোগ্য কর্মীর অভাব নেই, অভাব কেবল যন্ত্রপাতির, তার জন্য শিল্পপতিরা অভিযোগ করেছেন। যন্ত্রপাতির আমদানির সুযোগ দিলে কেবল যে ভারতের আর্থিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি ঘটত তা নয়, সুদূর প্রাচ্যের রণাঙ্গনে যুদ্ধের গতিই ফিরে যেতে পারত। একান্ত প্রয়োজনীয় যেসব বস্তু বাইরে থেকে সাধারণত বিমানযোগে, বহু ব্যয় ও বাধা স্বীকার করে আনতে হত তা ভারতবর্ষেই তৈরি হতে পারত। ভারতবর্ষ চীন ও প্রাচ্যের অস্ত্রশালায় পরিণত হতে পারত, শিল্পক্ষেত্রে তার অগ্রগতি কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার সমকক্ষ হতে পারত। কিন্তু যুদ্ধকালীন প্রয়োজন যতই একান্ত হোক, ব্রিটিশ শিল্পের ভবিষ্যতের কথা স্মরণে রেখে, যুদ্ধোত্তর কালে যেসব শিল্প ব্রিটিশ শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগী হতে পারে ভারতবর্ষে তার বিস্তার-চেষ্টা অবাঞ্ছনীয় বলে বিবেচিত হয়েছিল। এর মধ্যে গোপন কিছু ছিল না; ব্রিটিশ পত্রিকাগুলিতে এসব কথা প্রকাশ্যতই আলোচিত হয়েছে, এবং বারম্বার সেকথা উল্লেখ করে ভারতবর্ষে তার প্রতিবাদ হয়েছে।

টাটা স্টীলের সুদূরদর্শী প্রতিষ্ঠাতা জমশেদজি টাটার কল্পনা ভবিষ্যদ্দৃষ্টির ফলে বাঙ্গালোরে ভারতীয় বিজ্ঞানপরিষদের প্রতিষ্ঠা। ভারতবর্ষে অল্প যে কয়েকটি গবেষণা-মন্দির আছে এটি তার অন্যতম; অন্যগুলি সরকারী প্রতিষ্ঠান, তার লক্ষ্য সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞান ও শিল্প-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আমেরিকা ও রাশিয়ায় হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান আছে, বাঙ্গালোর পরিষৎ ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বাদ দিলে ভারতবর্ষে তা সম্পূর্ণই উপেক্ষিত হয়েছে বলতে হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে এই গবেষণার কাজে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এবং তা সুফলপ্রসূও হয়েছে।

ভারতবর্ষে জাহাজ ও রেলগাড়ি তৈরির চেষ্টাকে যেমন নিরুৎসাহিত করে তার পথ-

রোধ করা হয়েছে, তেমনি মোটরগাড়ি তৈরির উদ্যোগকে সূচনাতেই বিনষ্ট করা হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার কয়েক বছর আগে এ বিষয়ে চেষ্টা শুরু হয়, আমেরিকার এক বিখ্যাত মোটরগাড়ি তৈরির প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় সব ব্যবস্থা হয়। মোটরগাড়ির বিভিন্ন অংশ জুড়বার যন্ত্রপাতিযুক্ত কারখানা কতকগুলি ভারতবর্ষে আগে থেকেই চলছিল। এখন কথা হল ভারতীয় মূলধনে ও তত্ত্বাবধানে ভারতীয়দের দ্বারা মোটরের বিভিন্ন অংশ তৈরির কারখানা ভারতেই স্থাপিত হবে। আমেরিকান কর্পোরেশনের সঙ্গে যে চুক্তি হয় তার ফলে এই ব্যবস্থা হয়েছিল যে উদ্যোগপর্বে তাঁদের নিজস্ব প্রণালীর সুযোগ পাওয়া যাবে। তাঁদের বিশেষজ্ঞ যন্ত্রীদের তত্ত্বাবধানে কাজ চলবে। বোম্বাইর প্রাদেশিক সরকার তখন কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলী কর্তৃক পরিচালিত, তাঁরা নানাভাবে আনুকূল্য করতে প্রতিশ্রুত হলেন। এই চেষ্টায় পরিকল্পনা-সমিতির বিশেষ আগ্রহ ছিল। আর সবই ঠিক হয়ে গিয়েছিল, কেবল যন্ত্রপাতি আমদানি করলেই হয়। কিন্তু ভারতসচিব এর অনুমোদন করলেন না, যন্ত্র-পাতি আমদানির বিরুদ্ধে আদেশ জারি করলেন। তাঁর মতে 'এখন এই শিল্পপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলে, যুদ্ধের জন্য যে যন্ত্র ও শ্রমিকের প্রয়োজন তা পাওয়া যাবে না, অন্য কাজে লাগানো হবে।' এ হচ্ছে যুদ্ধের গোড়ার দিকের কথা। শ্রমিকের যে অভাব নেই, এমনকি সুদক্ষ শ্রমিকও আছে, প্রকৃতপক্ষে বেকার বসে আছে—তা দেখিয়ে দেওয়া হয়। যুদ্ধের প্রয়োজন, এ এক অদ্ভুত যুক্তি—সেই প্রয়োজনেই তো মোটরগাড়ির দরকার। কিন্তু লন্ডনে বসে আছেন হর্তাকর্তাবিধাতা যে ভারতসচিব, তিনি এসকল যুক্তিতে টললেন না। শোনা গেল আমেরিকার আর এক ক্ষমতাশালী মোটর-প্রতিষ্ঠানের মত নয় যে তাদের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্যোগে ভারতে মোটর-শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়।

যানবাহন যুদ্ধকালে ভারতবর্ষে এক প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। মোটর-ট্রাক্, পেট্রল, রেলগাড়ি, এমনকি কয়লারও অভাব। ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে যুদ্ধের পূর্বে যেসব প্রস্তাব করা হয়েছিল তা যদি বাতিল করে না দেওয়া হত তাহলে অনেক সহজেই এসব সমস্যার সমাধান হতে পারত। রেলগাড়ি, মোটর-ট্রাক এমনকি সাঁজোয়া গাড়ি পর্যন্ত, ভারতবর্ষেই প্রস্তুত হতে পারত। পেট্রলের অভাবে যে অসুবিধা হচ্ছিল পাওয়ার অ্যাল-কোহল দ্বারা তার অনেকটা প্রতিবিধান হতে পারত। ভারতবর্ষে কয়লার কোনোই অভাব নেই, সঞ্চয় যথেষ্ট আছে, কিন্তু তার সামান্যই ব্যবহার হয়। যুদ্ধের কয় বছরে চাহিদা বেড়ে গেলেও কয়লার খনির কাজ কমে গিয়েছে। এইসব খনির অবস্থা এত মন্দ, বেতন এত সামান্য যে শ্রমিক তাতে আকৃষ্ট হয় না। এই বেতনে মেয়েরা কাজ করতে রাজী বলে, খনিতে মেয়েদের কাজ করা সম্বন্ধে যে নিষেধ ছিল শেষটা তা তুলে দেওয়া হয়। এই শিল্পের সংস্কার বা এর অবস্থা বা বেতনাদির উন্নতিসাধন করে শ্রমিকদের আকর্ষণ করবার কোনো চেষ্টা করা হয়নি। কয়লার অভাবে শিল্পবিস্তারে প্রভূত বাধা ঘটেছিল, অনেক পুরাতন কারখানাও বন্ধ হয়ে যায়।

কয়েক শত রেল-এঞ্জিন এবং বহুসহস্র গাড়ি ভারতবর্ষ থেকে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠানো

হয়, ফলে ভারতবর্ষে যানবাহনের অসুবিধা আরও বেড়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে স্থায়ী রেললাইন তুলে নিয়ে অন্যত্র চালান করা হয়। কোনো কিছু না ভেবে চিন্তে, ভবিষ্যতে ফলাফল কি হবে বিবেচনা না করে, যেভাবে এসব ঘটতে থাকে সে এক তাজ্জব ব্যাপার। পরিকল্পনা বা ভবিষ্যদ্দৃষ্টির চিহ্নমাত্র কোথাও দেখা যায়নি, একটা সমস্যার আংশিক সমাধান করতে গিয়ে তখনই বৃহত্তর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

. ১৯৩৯ সালের শেষে কি ১৯৪০ সালের গোড়ায় ভারতবর্ষে বিমানপোত তৈরির কারখানা খুলবার একটা চেষ্টা হয়। আমেরিকার একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আবার সব বন্দোবস্ত হয়, ভারতসরকার ও ভারতে সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে সম্মতি চেয়ে জরুরি তার পাঠানো হয়। কোনোই উত্তর পাওয়া যায়নি। বারম্বার তাঁদের এসম্বন্ধে মনে করাবার পর জবাব এল অসম্মতি জানিয়ে। এরোপ্লেন তো ইংলন্ডে আমেরিকায় কিনতে পাওয়া যায়, তবে তা ভারতবর্ষে তৈরি করা কেন?

যুদ্ধের আগে জার্মানি থেকে অনেক ওষুধপত্র আসত। যুদ্ধের ফলে তা বন্ধ হয়ে যায়। তখনই কথা হয়, বিশেষ দরকারী কতকগুলো ওষুধ ভারতবর্ষে তৈরি করা হোক। কোনো কোনো সরকারী প্রতিষ্ঠানে অনায়াসেই তা করা যেত। ভারতসরকার এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না, তাঁরা বললেন যে এখন তো সবই ইম্পীরিয়াল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজের মারফত পাওয়া যেতে পারে। যখন দেখানো গেল যে, একই জিনিস ভারতবর্ষে অনেক কম খরচে তৈরি করা যেতে পারে, ও ব্যক্তিবিশেষের লাভ না রেখে তা সৈন্যদল তথা সর্বসাধারণের ব্যবহারে লাগানো যেতে পারে, তখন কর্তৃপক্ষ সরকারী কাজের মধ্যে এসব ছোট কথার উল্লেখে যারপরনাই অসন্তুষ্ট হলেন—বললেন, 'গভর্নমেন্ট তো আর একটা ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠান নয়!'

গভর্নমেন্ট ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান না হতে পারে কিন্তু ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের প্রতি তার দরদ ছিল খুবই, ইম্পীরিয়াল কেমিক্যাল তার অন্যতম। এই বিরাট প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে অনেক সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিল। এইসব সুযোগ ছাড়াই তার স্বকীয় যা সহায়সম্পদ ছিল তাতে এক টাটা কোম্পানি ছাড়া আর কোনো ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব ছিল না। এছাড়া ছিল ভারতবর্ষে ও ইংলন্ডে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আনুকূল্য। ভারতে রাজপ্রতিনিধিপদ ত্যাগ করবার পর কয়েক-মাস যেতেই লর্ড লিনলিথগো এক নূতনপদে, ইম্পীরিয়াল কেমিক্যালস্‌এর অন্যতম কর্মকর্তারূপে আবির্ভূত হলেন। ইংলন্ডের বড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ভারত-সরকারের যোগ যে কি ঘনিষ্ঠ, এবং সেই যোগ দ্বারা সরকারী কর্মপদ্ধতি কিভাবে প্রভাবান্বিত হয়, এতে তার নিদর্শন পাওয়া যায়। লর্ড লিনলিথগো যখন ভারতবর্ষে রাজপ্রতিনিধি ছিলেন তখনই হয়তো ইম্পীরিয়াল কেমিক্যাল্‌সে তাঁর মোটা অংশ ছিল। ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগের ফলে তাঁর যে প্রতিষ্ঠা হয়েছে, রাজপ্রতিনিধি হিসাবে তাঁর যেসব কথা জানবার সুযোগ হয়েছে, অন্তত এখন তা তিনি ইম্পীরিয়াল কেমিক্যালস্‌এর ব্যবহারে লাগিয়েছেন।

রাজপ্রতিনিধিরূপে লর্ড লিনলিথগো ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে এই ঘোষণা করেন;

'সরবরাহ ব্যাপারে আমরা অসাধ্যসাধন করেছি। ভারতবর্ষের দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান...যুদ্ধের প্রথম ছ'মাসে কন্ট্রাক্টের পরিমাণ প্রায় ২৯ কোটি টাকা। তার পরের ক'মাসে ১৯৪২ সালের এপ্রিল থেকে অক্টোবরে হয় ১৩৭ কোটি টাকা। প্রথম থেকে ১৯৪২ অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত সর্বসাকুল্যে হয় ৪২৮ কোটি টাকা। এই হিসাবে সামরিক দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুতের কারখানাগুলির হিসাব ধরা নেই, সেখানেও বড় কম কাজ হয়নি।' এসবই সত্য, আর এই উক্তির পর যুদ্ধব্যাপারে ভারতবর্ষের আনুকূল্যের পরিমাণ আরও অনেক বেড়ে গিয়েছে। মনে হতে পারে এর ফলে ভারতের যন্ত্রশিল্পে প্রভূত উন্নতি হয়েছে, উৎপাদন অনেক বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সেদিকে বিশেষ কিছু উন্নতি হয়নি। ভারতবর্ষে যন্ত্রশিল্পের অবস্থানির্দেশক তথ্যসূচীদৃষ্টে জানা যায়, ১৯৩৫ সালের কাজের মাপ ১০০ ধরে নিলে, ১৯৩৮-৩৯-এ তা বেড়ে হয়েছে ১১১·১; ১৯৩৯-৪০এ হয় ১১৪·০; ১৯৪০-৪১ সালে ১১২·১ থেকে ১২৭·০-র মধ্যে উঠানামা করে; ১৯৪২ মার্চে হয় ১১৮·৯ ১৯৪২ এপ্রিলে ১০৯·২তে নামে, তারপরে ক্রমশ বেড়ে ১৯৪২ জুলাইতে হয় ১১৬·২। এই তথ্যতালিকা সম্পূর্ণ নয়, এতে অস্ত্র ও কয়েকটি রাসায়নিক কারখানার হিসাব ধরা হয়নি। তবু এই তালিকা বিশেষ গুরুত্ব ও অর্থপূর্ণ।

এ থেকে এক আশ্চর্য সংবাদ জানা যাচ্ছে যে, অস্ত্রশস্ত্র তৈরির কথা বাদ দিলে, ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে ভারতবর্ষের শিল্পোদ্যোগ যুদ্ধপূর্বকালের চেয়ে সামান্যই বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে আকস্মিক বৃদ্ধির ফলে নির্দেশক সংখ্যা ১২৭·০তে উঠেছিল তার পরে কমে যায়। অথচ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছে গভর্নমেন্টের মাল সরবরাহের কনট্রাক্ট বেড়েই চলেছে—লর্ড লিনলিথগোর উপরি উদ্ধৃত বক্তৃতায়ই তার হিসাব পাওয়া যাবে।

যুদ্ধকালীন এইসব বিরাট অর্ডারের ফলে সমগ্রভাবে যন্ত্রশিল্পের কোনো লাভ হয়নি, উৎপাদনচেষ্টা স্বাভাবিক ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে যুদ্ধের বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে। যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে সর্বসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন অত্যন্ত কমে গিয়েছে। সুদূরপ্রসারী হয়েছে এর ফল। লন্ডনে স্টার্লিং ব্যালান্স ভারতের অনুকূল হতে লাগল, ভারতবর্ষে স্বল্পসংখ্যক লোকের হাতে টাকা জমতে লাগল—কিন্তু দেশে একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব, কাগজের টাকার প্রচার বেড়েই চলল, আর জিনিসপত্রের দাম চড়ে গেল অদ্ভুতভাবে। ১৯৪২ সালেই খাদ্য অভাব দেখা দিয়েছিল; ১৯৪৩ সালের শরৎকালে দুর্ভিক্ষ হয়ে বাঙলাদেশে ও অন্যত্র লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটে। যুদ্ধের বোঝা, সরকারী কর্মনীতির চাপ পড়ল ভারতের সেই লক্ষ লক্ষ লোকের ঘাড়ে যারা এভার বহন করতে সকলের চেয়ে অক্ষম, অগণিত মানুষকে নিষ্পিষ্ট করে দিল তিলে তিলে উপবাসের নিষ্ঠুর মৃত্যুতে।

১৯৪২ সাল পর্যন্ত আমি তথ্যাদি দিয়েছি, তার পরের সংখ্যা আমার কাছে নেই। সম্ভবত তার পরে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, হয়তো শিল্পক্ষেত্রে ভারতবর্ষের ইতিমধ্যে

অনেক উন্নতি ঘটেছে।* কিন্তু ঐসকল তথ্যে যে চিত্র দেখতে পাই তার মূলগত কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। সেই একই নিয়ম কাজ করছে, সেই একই রকম সংকটের পুনরাবৃত্তি ঘটছে, আগেকার মতই জোড়াতাড়া দিয়ে এখনকার মত যা হয় একটা সমাধান করে কাজ চালানো হচ্ছে, সমগ্রদৃষ্টি ও পরিকল্পনার অভাব পূর্ববৎ, ব্রিটিশ শিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য দরদ—এদিকে খাদ্যের অভাবে, সংক্রামক ব্যাধিতে মানুষের মৃত্যুর বিরাম নেই।

একথা সত্য যে, পূর্বপ্রতিষ্ঠিত কোনো কোনো শিল্পের প্রভূত উন্নতি ঘটেছে, যেমন বস্ত্রশিল্প, লৌহজাতশিল্প, পাটশিল্প। শিল্পপতি, সমরোপকরণ সরবরাহকারী, মুনাফালোভী প্রভৃতিদের মধ্যে লক্ষপতি—ক্রোরপতিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রভূত সুপার-ট্যাক্স সত্ত্বেও ভারতবর্ষে উপরিতন স্তরের স্বল্পসংখ্যক লোকের হাতে বহু টাকা পুঞ্জীভূত হয়েছে। কিন্তু শ্রমিক সম্প্রদায়ের বিশেষ কোনো লাভ হয়নি: শ্রমিকনেতা শ্রীযুক্ত এন. এম. যোশী কেন্দ্রীয় পরিষদে বলেছেন যে শ্রমিকের অবস্থা যুদ্ধের সময় আরও দৈন্যগ্রস্ত হয়েছে। জমিদার শ্রেণীর অবস্থার উন্নতি হয়েছে বিশেষত পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে, কিন্তু কৃষিনির্ভর সম্প্রদায় যুদ্ধের ফলে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্য বৃদ্ধিতে ক্রেতাদলকে একেবারে নিষ্পিষ্ট করে ফেলেছে।

১৯৪২ সালে আমেরিকা থেকে গ্রেডী কমিটি ভারতবর্ষে আসেন বর্তমান শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি পর্যবেক্ষণ করে উৎপাদনবৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার উদ্দেশ্যে। তাঁরা অবশ্য স্বভাবতই সমরোপকরণ উৎপাদন প্রসঙ্গেই অধিক উৎসাহী ছিলেন। তাঁদের মন্তব্য কখনও প্রকাশিত হয়নি, সম্ভবত ভারত-সরকার তা প্রকাশে বাধা দিয়েছিলেন বলেই। তাঁদের কোনো কোনো প্রস্তাব অবশ্য বিজ্ঞাপিত হয়। পাওয়ার অ্যালকোহল প্রস্তুত, লৌহজাত শিল্পের বিস্তারসাধন, বিদ্যুৎশক্তির অধিকতর ব্যবহার, অ্যালুমিনিয়ম ও বিশোধিত গন্ধকের উৎপাদনবৃদ্ধি এবং বিভিন্ন শিল্পে শৃংখলাবিধান—এই সব তাঁদের প্রস্তাবের অন্তর্গত ছিল। সরকারী তত্ত্বাবধান থেকে

* বস্তুত তা নয়। ক্যাপিটাল পত্রে (কলিকাতা, মার্চ ৯, ১৯৪৪) প্রকাশিত এই তালিকাতে ভারতবর্ষে শিল্পচেষ্টার হিসাব পাওয়া যায়—(১৯৩৫-৩৬=১০০):

১৯৩৮-৩৯	...	১১১·১
৩৯-৪০	...	১১৪·০
৪০-৪১	...	১১৭·৩
৪১-৪২	...	১২২·৭
৪২-৪৩	...	১০৮·৮
৪৩-৪৪	...	১০৮·০ (মোটামুটি)
জানুয়ারী ১৯৪৪	...	১১১·৭

এতে অস্ত্রাদি নির্মাণের হিসাব ধরা হয়নি। দেখা যাচ্ছে চার বৎসরের অধিক যুদ্ধ চলবার পরও শিল্পক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অবস্থার একরূপ অবনতিই ঘটেছে।

স্বতন্ত্র, উৎপাদন সম্পর্কে যথাবিহিত ব্যবস্থা করবার জন্য আমেরিকার আদর্শে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাবও তাঁরা করেছিলেন। ভারত-সরকারের ঢিলেঢালা নিষ্কর্মার মত কাজের ধরন—সামগ্রিক যুদ্ধেও যার রীতির কোনো পরিবর্তন হয়নি—দেখে তাঁরা মুগ্ধ হননি নিশ্চয়ই। কেবল ভারতীয়দের উদ্যোগে পরিচালিত বিরাট প্রতিষ্ঠান টাটা স্টীল ওআর্কসের কর্মপটুতা ও ব্যবস্থা দেখে তাঁরা অবশ্য চমৎকৃত হয়েছিলেন। গ্রেডী কমিটির প্রাথমিক প্রতিবেদনে এ কথাও উল্লিখিত হয়েছিল যে 'ভারতীয় শ্রমিকের পটুতা ও অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা লক্ষ্য করে সমিতি পরিতুষ্ট হয়েছেন।' হাতের কাজে ভারতীয়েরা কুশলী, যে-অবস্থায় তাদের কাজ করতে হয় তার উন্নতি করলে এবং তাদের জীবিকার স্থায়িত্ববিধান করলে দেখা যায় তারা নির্ভরযোগ্য ও পরিশ্রমী।*

গত দু-তিন বছরে ভারতে রসায়নশিল্পের বিস্তারলাভ ঘটেছে, জাহাজ তৈরির চেষ্টা কতকটা অগ্রসর হয়েছে, বিমানপোত নির্মাণেরও সূচনা হয়েছে। সুপারট্যাক্স সত্ত্বেও পাট ও কাপড়ের কল প্রভৃতি সমরকালীন শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রভূত লাভ করেছে, অনেক মূলধন জমেছে। নূতন শিল্পপ্রচেষ্টায় মূলধন নিয়োগ ভারত-সরকার নিষেধ করেছিলেন। সম্প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা অনেকটা শিথিল হয়েছে, যদিও যুদ্ধের পর ছাড়া নিশ্চিতভাবে কিছু করা চলবে না। এই ক্ষীণ স্বাধীনতার সূত্রেই প্রতিষ্ঠানের বণিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎসাহের সাড়া পড়ে গিয়েছে, নানা বৃহৎ শিল্প-পরিকল্পনা রূপ পরিগ্রহ করছে। এতকাল তার অগ্রগতি বন্ধনদশাগ্রস্ত ছিল; আজ মনে হয় ভারতবর্ষে যন্ত্রশিল্পের প্রভূত প্রসার অতিআসন্ন।

* গ্রেডী কমিটির রিপোর্ট ধামাচাপা দেওয়া সম্বন্ধে মন্তব্য করে 'কমার্স' (বোম্বাই, নভেম্বর ২৮, ১৯৪২) লিখছেন :

'যুদ্ধোত্তর বিশ্বে যাতে পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যদেশ মারাত্মক রকম কোনো প্রতিযোগিতা করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে এদেশে শিল্পবিস্তারে বাধা দেবার জন্য বিদেশে অনেক শক্তিশালী দল তৎপর, একথা অবশ্যস্বীকার্য।'

নবম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

১ : কংগ্রেসের পররাষ্ট্র নীতি

ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের মত জাতীয় কংগ্রেসও দীর্ঘদিন ধরে দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যার বিচার ও নীতি নির্দ্ধারণেই প্রায় পুরোপুরি ব্যস্ত ছিল। বিদেশের ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত বা পর্য্যালোচনা করার দিকে তার একেবারেই নজর ছিল না। এদিকে সর্বপ্রথম কংগ্রেসের দৃষ্টি পড়ে প্রথম মহাযুদ্ধের পর—বর্ত-মান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। এই সময় সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্টদের ছোটখাটো দুই একটি দল ছাড়া অন্য কোনো সংস্থা বৈদেশিক ঘটনাবলী সম্পর্কে তেমন উৎসুক ছিল না।

অবশ্য প্যালেস্টাইনের ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছু কিছু মুসলিম সংস্থা আগ্রহান্বিত ছিল, এবং মাঝে মাঝে আরবী মুসলিমদের সহানুভূতি জানিয়ে তারা প্রস্তাবও গ্রহণ করত। তুরস্ক, মিশর এবং ইরানের সমসাময়িক তীব্র জাতীয় আন্দোলনের দিকেও এরা আকৃষ্ট হত; কিন্তু এসব দেশে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যাপক সংস্কারের ঝড় বয়ে চলেছিল, সে সম্পর্কে এই সমস্ত মুসলিম সংস্থার মনে একটু দ্বিধার ভাব ছিল। কারণ ইসলামী ঐতিহ্য বলতে এরা যা বুঝত, তার সঙ্গে এই সব দেশের জাতীয় আন্দোলন ও তার সংশ্লিষ্ট সংস্কার প্রচেষ্টার পূর্ণ সঙ্গতি ছিল না।

এবিষয়ে গোড়া থেকেই কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গীর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাসত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ এবং স্বাধীন জাতিগুলির পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই কংগ্রেসের পররাষ্ট্রনীতি গড়ে ওঠে। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিও এই নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৯২০ সালেই কংগ্রেস পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি, বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার উপর জোর দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, এই সময় থেকেই আবার একটি মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা সম্বন্ধেও কংগ্রেস মহলে উদ্বিগ্ন চিন্তা শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার বারো বছর আগে ১৯২৭ সালেই কংগ্রেস এই সম্ভাব্য যুদ্ধপরিস্থিতি সম্পর্কে তার নীতি ঘোষণা করে।

১৯২৭ সালে আন্তর্জাতিক পটভূমির যা মোটামুটি ছবি ছিল, তা এই। জার্মানীতে হিটলারের দখলে রাষ্ট্রক্ষমতা আসতে এবং মাঞ্চুরিয়াতে জাপানী ধর্ষণ শুরু হতে তখনও পাঁচ-ছ'বছর বাকি। ইতালীতে যদিও মুসোলিনির আসর ক্রমশই জমে উঠছিল, তখনও পর্যন্ত সেটা বিশ্বশান্তি ধ্বংস করার মত ভয়াবহ আকার ধারণ করেনি।

ফ্যাসিস্ট ইতালীর সঙ্গে ইংলন্ডের পুরোপুরি মৈত্রীভাব বজায় ছিল; এমনকি ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়করা খোলাখুলিভাবে 'দ্যুচে'র প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে এতটুকু সংকোচ করতেন না। সারা ইউরোপ তখন ক্ষুদে ডিক্টেটারে ভর্তি, এবং এদের সকলের সঙ্গেই ব্রিটিশ সরকারের সম্পূর্ণ মৈত্রীভাব বিদ্যমান ছিল। অন্যদিকে, ইংলন্ড ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রীভাব দূরে থাক, কোনো সম্পর্কই ছিল না। দুই রাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়েছিল, এবং নূতন সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আর্কস্ প্রভৃতি বিভিন্ন অভিযানে ইংলন্ডের নেতৃত্ব ছিল খোলাখুলি।

জাতিসংঘ (লীগ অফ্ নেশনস্) ও আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তরে (আই. এল. ও.) ব্রিটিশ এবং ফরাসীদের নীতি পুরোপুরি রক্ষণশীল পন্থী ছিল। নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে অসংখ্য আলোচনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সমস্ত জাতিই বিমান থেকে বোমাবর্ষণ বন্ধ করার পক্ষে থাকলেও, একমাত্র ব্রিটেনই এই মতের বিরোধিতা করে। তথাকথিত শান্তি ও শৃংখলার জন্য নিছক 'পুলিশী কাজে'র অজুহাতে ব্রিটিশ সরকার বহুবছর ধরে ইরাকের গ্রামে ও শহরে এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করে এসেছে। তাই জাতিসংঘে এবং পরে আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে, তারা তাদের এই 'পুলিশী' অধিকার বজায় রাখার পক্ষে বারবার ওজর আপত্তি তুলে নিরস্ত্রীকরণ বানচাল করে দেয়।

হ্বাইমার প্রজাতান্ত্রিক গঠনতন্ত্রে গঠিত নূতন জার্মানী জাতিসংঘে পূর্ণ সভ্য হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। প্রচুর ঢাকঢোল পিটিয়ে লোকার্নো চুক্তিকে ব্রিটিশ নীতির বিরাট জয় এবং নিরবচ্ছিন্ন শান্তির প্রথম ধাপ হিসাবে প্রচার করা হচ্ছিল। অবশ্য সেই সঙ্গে এ ধারণাও অনেকের ছিল যে আসলে এ সবই সোভিয়েট রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে ইউরোপে তার বিরুদ্ধে একটা যুক্ত ফ্রন্ট গড়ে তোলারই প্রচেষ্টা মাত্র। ঠিক এই সময়েই সোভিয়েট মহাসমারোহে অক্টোবর বিপ্লবের দশম বার্ষিকী পালন করে। তুরস্ক, ইরান, আফগানিস্থান ও মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি কয়েকটি প্রাচ্য দেশও ইতিমধ্যে সোভিয়েটের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়।

সুদূর প্রাচ্যে চীনবিপ্লবও প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে চলেছিল। জাতীয় সেনাবাহিনী চীনদেশের প্রায় অর্ধেক এলাকা তাদের কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে এসেছিল। চীনের অভ্যন্তরে এবং বড় বড় শহরে বন্দরে যে সমস্ত বিদেশী, বিশেষ করে ব্রিটিশ কায়েমী স্বার্থের ঘাঁটি ছিল, তাদের সঙ্গে জাতীয় সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল। অবশ্য অল্প কিছুদিন পরেই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকোলাহলের জন্য কুয়োমিনটাং দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়।

আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী পরিষ্কার একটা নূতন সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে চলেছিল। এই সংঘর্ষের একদিকে ছিল ইউরোপীয় কয়েকটি রাষ্ট্রের নেতৃস্বরূপ ইংলন্ড এবং ফ্রান্স, অন্যদিকে ছিল সোভিয়েট রাশিয়াকে কেন্দ্র করে কয়েকটি প্রাচ্য রাষ্ট্র। এই দুই শিবিরের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখনও পর্যন্ত কোনো পক্ষেই যোগ দেয়নি। কমিউনিজ্মের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ তাকে যেমন সোভিয়েট থেকে দূরে রেখেছিল তেমন আবার ব্রিটিশ নীতির প্রতি সন্দিগ্ধতা এবং ব্রিটিশ পুঁজি ও শিল্প স্বার্থের সঙ্গে

প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে তারা ব্রিটিশ পক্ষেও যোগদান করতে পারছিল না। এ ছাড়া ইউরোপীয় স্বার্থসংঘাতের মধ্যে অনাবশ্যকভাবে জড়িয়ে পড়ার ভীতি এবং ইউরোপের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার মনোভাবের জন্যও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপরোক্ত নীতি অনুসরণ করছিল।

আন্তর্জাতিক পটভূমির এই অবস্থায় ভারতের জনমত স্বাভাবিকভাবেই সোভিয়েট রাশিয়া ও প্রাচ্যের সংগ্রামশীল দেশগুলির স্বপক্ষেই ছিল। এর অর্থ এই নয় যে, কমিউনিজমের প্রতি জনসাধারণের ব্যাপকভাবে কোনো অনুমোদন ছিল, যদিচ সোস্যালিস্ট মতবাদের প্রতি ক্রমশই অনেকে আকৃষ্ট হচ্ছিল। চীনবিপ্লবের দুর্জয় অগ্রগতি আমাদের সকলের মনেই একটা প্রচণ্ড আশার সৃষ্টি করেছিল। এশিয়ায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ এবং ভারতের আসন্ন স্বাধীনতার প্রথম ধাপ হিসাবেই আমরা চীনবিপ্লবকে গ্রহণ করি। ডাচ ইস্ট-ইন্ডিজ, ইন্দো-চীন, মিশর ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির জাতীয় আন্দোলনে ক্রমশই আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। অপরদিকে আমাদের মনে হয় যে সিঙ্গাপুর বন্দরের বিরাট শক্তিশালী নৌঘাটিতে রূপান্তর এবং সিংহলের ত্রিঙ্কোমালী বন্দরের পুনর্গঠন আর একটি যুদ্ধপ্রস্তুতিরই অংশস্বরূপ—সে যুদ্ধে বৃটেনের উদ্দেশ্য তার সাম্রাজ্যবাদী আসন আরও সুদৃঢ়, আরও শক্তিশালী করে তোলা আর সোভিয়েট রাশিয়া এবং প্রাচ্যের ক্রমবর্ধমান জাতীয় আন্দোলনগুলিকে সম্পূর্ণ নিষ্পিষ্ট করা।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এই পটভূমিকায় ১৯২৭ সালে জাতীয় কংগ্রেস তার পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের প্রথম চেষ্টা করে। কংগ্রেস ঘোষণা করে যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারতবর্ষ কোনো অংশগ্রহণ করবে না; এবং জনগণের সম্মতি ব্যতিরেকে ভারতকে কোনো যুদ্ধেই লিপ্ত করা চলবে না। পরবর্তীকালে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে বারবার এই নীতিরই পুনর্ঘোষণা করা হয়েছে, এবং এই ভিত্তিতে ভারতের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার চলেছে। ক্রমশ এই নীতি সর্বসাধারণের স্বীকৃতি লাভ করে এবং শুধু কংগ্রেস নয়, সাধারণভাবে ভারতের রাষ্ট্রনীতির মূলভিত্তি হিসাবেই এই নীতি গৃহীত হয়।

ইতিমধ্যে জার্মানীতে হিটলারী নাৎসীবাদের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের পরিস্থিতিতে একটা বিরাট পরিবর্তন শুরু হয়। কংগ্রেসের উপর সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিক্রিয়া হয় এবং এগুলির বিরুদ্ধে কংগ্রেস তীব্র প্রতিবাদ ঘোষণা করে, কারণ হিটলার ও তার নাৎসী মতবাদ সাম্রাজ্যবাদ ও জাতিবৈষম্যমূলক নীতিরই আরও তীব্র একটি রূপ—যে-নীতির বিরুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেস চিরদিন সংগ্রাম করে এসেছে। মাঞ্চুরিয়াতে জাপানী ধর্ষণ নীতিতে কংগ্রেসের উপর তীব্রতর প্রতিক্রিয়া হয়, তার কারণ চীনের প্রতি এবং আবিসিনিয়া, স্পেন, চীন-জাপান সংঘর্ষ, চেকোস্লোভাকিয়া, মিউনিক সম্পর্কে স্বাভাবিক সহানুভূতি কংগ্রেসের ফ্যাসিজম-এর প্রতি বিতৃষ্ণতা বাড়িয়ে তোলে। সঙ্গে সঙ্গে আসন্ন আর একটা বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা কংগ্রেসকে উদ্বিগ্ন করে তোলে।

তবে এই আসন্ন বিশ্বযুদ্ধ হিটলারের অভ্যুত্থানের পূর্বের ধারণা অনুযায়ী

রূপ পরিগ্রহ করবে না, কারণ হিটলারের আগমনে বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। অবশ্য তখন পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার পুরোপুরি ফ্যাসিস্ট ও নাৎসী তোষণ নীতি অনুসরণ করে চলেছে। তারা যে রাতারাতি ভেক বদলে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার ভূমিকায় নামবে একথা কল্পনা করা কঠিন। যাই ঘটুক না কেন, বৃটেন তার গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ও সাম্রাজ্যরক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা থেকে কখনও বিরত হবে না। উপরন্তু, সোভিয়েট রাশিয়া এবং তার আদর্শ ও ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধতা বৃটেন যে করবেই, তাও একেবারে নিশ্চিতই ছিল। কিন্তু ক্রমশ বোঝা গেল যে হিটলারের অন্যায় আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য যতই চেষ্টা চলতে লাগল, ততই আস্তে আস্তে ইউরোপে হিটলারের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। তার ফলে সেটা যে শুধু ব্রিটিশপ্রাধান্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ইউরোপের রাষ্ট্রিক ভারসাম্যকেই বানচাল করে দেবার উদ্যোগ করল তাই নয়, ইউরোপে বৃটিশ কায়েমী স্বার্থের শিকড় উপড়ে ফেলার মত অবস্থা সৃষ্টি করল। সুতরাং জার্মানী ও ইংলন্ডের মধ্যে যুদ্ধ প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল; এই যুদ্ধ যদি বাধে আমরা তখন কোন পক্ষে থাকব? আমরা যেমন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী, তেমন ফ্যাসিস্ট ও নাৎসীবাদেরও বিরোধী। এদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে, আমাদের মূল নীতির এই দুটো ভিত্তির সমন্বয় আমরা কিভাবে করব? কিভাবে আমাদের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা-বোধের সামঞ্জস্য সাধিত হবে? উপস্থিত পরিস্থিতিতে এই সমস্যা আমাদের পক্ষে খুবই জটিল ছিল। কিন্তু আমাদের এই সমস্যার কোনো জটিলতাই থাকত না, যদি এই সময় বৃটিশ সরকার তার সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরিত্যাগ করে ভারতের জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করার সঙ্কল্প ঘোষণা করত।

জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা-বোধ যখন পরস্পরবিরোধী রূপে দেখা দেয়, সে ক্ষেত্রে জাতীয়তা-বোধেরই জয় সুনিশ্চিত। সমস্ত দেশে অনুরূপ সংকটে বারবার তাই ঘটেছে, বিশেষত বিদেশী দাসত্বে শৃংখলিত আমাদের মত পরাধীন দেশে—যে দেশে জনগণের মন প্রতি মুহূর্তে একটানা সংগ্রাম ও নির্যাতনের বেদনাময় স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত—সে দেশে এটাই ছিল অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী। তথাকথিত জাতীয় স্বার্থের খাতিরেই, ইংলন্ড ও ফ্রান্স তাদের আন্তর্জাতিকতা-বোধ বিসর্জন দিয়ে স্পেন ও চেকোস্লোভাকিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। পরে অবশ্য প্রমাণিত হয় যে তাদের এই নীতি ছিল প্রকৃতপক্ষে জাতীয় স্বার্থেরই পরিপন্থী। নাৎসীবাদ ও জাপানী রণচণ্ডী নীতির প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা এবং ইংলন্ড, ফ্রান্স ও চীনের প্রতি প্রকাশ্য সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের সংঘাত থেকে দূরে দূরেই ছিল। পার্ল হারবারে জাপানী বোমাবর্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের এই নীতিই আঁকড়ে ছিল। এমনকি আন্তর্জাতিকতার মূর্ত প্রতীক সোভিয়েট রাশিয়া পর্যন্ত বরাবর জাতীয়তার নীতিই অনুসরণ করে এসেছে, যদিচ সেজন্য সোভিয়েট সুহৃদমহলে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। জার্মানী কর্তৃক অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হওয়াতেই সোভিয়েট রাশিয়া যুদ্ধে নামে। আত্মরক্ষার জন্য নরওয়ে, সুইডেন,

ফিনল্যান্ড এবং হল্যান্ড ও বেলজিয়াম এই যুদ্ধ এড়িয়ে যাবার ও নির্লিপ্ত থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের গোলকধাঁধা তাদের গ্রাস করে। কেবলমাত্র জাতীয় স্বার্থের খাতিরেই তুরস্ক পাঁচবছর ধরে ক্ষণভঙ্গুর নিরপেক্ষতার ক্ষীণ নীতি অনুসরণ করেছিল। নামে স্বাধীন, কার্যত পরাধীন এবং বাস্তবত যুদ্ধের একটা বড় রণাঙ্গন হিসাবে মিশরের অবস্থা ছিল আরও বিচিত্র এবং বিশৃঙ্খল। কারণ সরকারীভাবে যদিচ মিশর যুদ্ধে যোগ দেয়নি, বাস্তবক্ষেত্রে মিত্রশক্তির সামরিকবাহিনীর নেতৃত্বে সমগ্র মিশরকেই যুদ্ধের মধ্যে অংশ নিতে বাধ্য করা হয়েছিল।

বিভিন্ন দেশ ও সরকারের এই সমস্ত নীতি গ্রহণ করার পিছনে যুক্তি বা হেতু হয়তো ছিল। জনসাধারণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত এবং তাদের সক্রিয় সমর্থন লাভ না করে, কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই একটা যুদ্ধের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না। এমনকি একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত দেশেও আগে থেকে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নিতে হয়। কিন্তু যুক্তি বা হেতু যাই থাকুক না কেন, দেখা যায় যে যখনই একটা সংকট উপস্থিত হয়েছে, তখনই জাতির নীতি নির্ধারণে জাতীয় স্বার্থ বা সমসাময়িক কালে যাকে জাতীয় স্বার্থ বলে ধরা হয়েছে, সর্বাগ্রে তা স্থান পেয়েছে এবং জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী যা কিছু কিংবা যে সমস্ত চিন্তাধারা ও নীতির সঙ্গে তার সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়নি, সেগুলিকে এইরূপ সংকটকালে পুরোপুরি বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। ইউরোপে এই সময় শত শত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সংঘ গড়ে উঠেছিল, কিন্তু ভাবলে অবাক হতে হয় যে মিউনিক সংকটের সময় তারা কিরূপ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, এবং ফ্যাসিজ্‌মের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ কতখানি শক্তিহীন ও নিষ্ফল হয়ে পড়েছিল। অবশ্য এ কথা ঠিক যে ব্যক্তি বা ছোটখাটো দল বিশেষের পক্ষে আন্তর্জাতিকতা-বোধ সময় সময় এত গভীর ও দৃঢ় হয় যে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক স্বার্থের কাছে তারা তাদের ব্যক্তিগত বা আশু জাতীয় স্বার্থ তুচ্ছ করে দিতে পারে, কিন্তু একটা সমগ্র জাতির পক্ষে কখনই তা সম্ভব হয় না। জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে যখন আন্তর্জাতিক স্বার্থ দেখা দেয়, কেবলমাত্র তখনই আন্তর্জাতিকতা-বোধ সমগ্র জাতিকে উদ্দীপ্ত করতে সক্ষম হয়। কয়েকমাস আগে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে লন্ডনের 'ইকনমিস্ট' পত্রিকা এ সম্বন্ধে বলেছিল : 'যে পররাষ্ট্রনীতি সব সময় জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে চলে, শুধু সেই নীতির পক্ষেই অবিচলিত অনুসরণের আশা থাকে। কোনো জাতিই আন্তর্জাতিক স্বার্থকে তার নিজের স্বার্থের উপরে স্থান দেয় না। সত্যিকারের আন্তর্জাতিকতা তখনই সম্ভব যখন সেটা জাতীয় সঙ্গে পুরোপুরি সমন্বয় সাধন করতে পারে।'

সত্যিকথা বলতে কি, আন্তর্জাতিকতা-বোধের পূর্ণ বিকাশ একমাত্র স্বাধীন দেশেই সম্ভব। কারণ যে দেশ পরাধীন সে দেশের জনগণের সমস্ত চেতনা ও শক্তি অহরহ আচ্ছন্ন থাকে তাদের নিজস্ব মুক্তি আন্দোলনের চিন্তায়। তাদের মনে জাতীয়তাবোধ এত প্রবল যে আন্তর্জাতিকতা তাদের কাছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। পরাধীন দেশের জাতীয়তাবোধ দেহের অভ্যন্তরে একটি দুষ্ট ক্ষতের সঙ্গে তুলনার

যোগ্য। দুষ্ট ক্ষত শুধু যে মনুষ্যদেহের কোনো একটি প্রত্যঙ্গের বিনাশসাধন করে তাই নয়, সেটা সদাসর্বদা মানসিক বিরক্তি ও মানুষের সমস্ত চিন্তা ও কাজকে আচ্ছন্ন করে রাখে। পরাধীন দেশের জাতীয়তাবোধও সমগ্র জনমনে অনুরূপ অশান্তির সৃষ্টি করে। কারণ পরাধীনতার আবহাওয়ায় আশু সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। এবং এই আশু সংঘর্ষের চিন্তাই সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন ও কেন্দ্রীভূত করে ফেলে, যার ফলে বৃহত্তর ও ব্যাপক আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমশই মন থেকে দূরে সরে যায়। ব্যক্তি ও জাতির চেতনা অতীতের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম ও নির্যাতনের কাহিনীতে ভরপুর। পরাধীনতা সমগ্র চেতনাকে এমন দুর্নিবারভাবে আবিষ্ট করে রাখে, এমন মোহবিস্তার করে যে মূল শিকড়কে উপড়ে না ফেলা পর্যন্ত তার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব। এমনকি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ফেললেও, একদিনেই এই সুস্থতা ফিরে আসে না; কারণ শারীরিক ব্যাধি অপেক্ষা মনোজগতের ব্যাধির আরাম অনেক বেশি সময়সাপেক্ষ।

ইংরাজ দাসত্বে শৃঙ্খলিত ভারতবাসী আমরা দীর্ঘদিন এই চেতনার প্রভাবে লালিত হয়েছি। কিন্তু তবু গান্ধীজি আমাদের জাতীয় আন্দোলনকে এমন একটা নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, যে আমাদের মনে পরাধীনতা থেকে উদ্ভূত নৈরাশ্য ও অসহায় যন্ত্রণার তীব্রতা অনেকখানি কমে যায়। অবশ্য এটা আমাদের মন থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, কিন্তু আমাদের জাতীয় আন্দোলনের মত সম্পূর্ণ অন্ধ ঘৃণা থেকে মুক্ত অন্য কোনো দেশের জাতীয় আন্দোলনের কথা আমি জানি না। গান্ধীজি প্রচণ্ড জাতীয়তাবাদী ছিলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনুভব করেছিলেন যে তাঁর বাণী শুধু ভারতের নয়, সমগ্র বিশ্বের, এবং গান্ধীজি একাগ্রভাবে বিশ্বশান্তি স্থাপন কামনা করতেন। তাঁর জাতীয়তাবোধে ছিল বিশ্বজনীনতা, কিন্তু আক্রমণাত্মক নীতির কোনো স্থান তাতে ছিল না। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় দৃঢ়চিত্ত গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন যে মানুষের মঙ্গলসাধনের একমাত্র পথ, তাতে যত দিনই লাগুক না কেন, পারস্পরিক সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বরাষ্ট্র সংঘ। তিনি বলেছিলেন : 'আমার দেশের স্বাধীনতা অর্জনই আমার জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্য, কিন্তু সমগ্র মানব-সমাজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হলে আমার দেশের সর্বসাধারণ মৃত্যুও বরণ করবে।' তিনি আরও বলেছেন : 'আমি সমগ্র বিশ্বের মাপকাঠিতেই চিন্তা করতে চাই। আমার দেশপ্রেম শুধু ভারতবাসী নয়, সমগ্র মানবসমাজের মঙ্গলের জন্য। সুতরাং ভারতের প্রতি আমার দেশসেবার মধ্যে সকল মানুষের মঙ্গলসাধনের প্রচেষ্টাও অন্তর্নিহিত...বিচ্ছিন্ন ও একক স্বাধীনতা পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। পরস্পরের মধ্যে স্বেচ্ছা-সহযোগিতাই সকলের পক্ষে মঙ্গলজনক। উন্নত-চেতা ব্যক্তিরা আজকের দিনে দ্বন্দ্ব-কোলাহলে লিপ্ত বহুসংখ্যক সার্বভৌম রাষ্ট্রের অস্তিত্বের বিরোধী। তাঁরা চান পারস্পরিক সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত মৈত্রীভাবা-পন্ন বিশ্বরাষ্ট্র সংঘ। অবশ্য এই আকাঙ্ক্ষা কার্যকরী করা হয়তো দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। এবং আমার দেশের পক্ষ থেকে আমিও এখনই এই ধরনের বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষা ঘোষণা করছি না। কিন্তু আমাদের নিজস্ব স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে আমরা এই ধরনের

স্বেচ্ছামূলক পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হতেই বেশি প্রস্তুত একথা বলতে কোনো বাধা আছে বলে মনে করি না। আমি চাই সেই ক্ষমতা, যে ক্ষমতা স্বাধীনতার দাম্ভিকতা ব্যতিরেকেও মানুষকে সবদিক থেকে স্বাধীন করতে পারে।'

জাতীয় আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও আত্মপ্রত্যয় অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর চিন্তায় স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ রূপ নিয়ে কল্পনা শুরু হয়। স্বাধীন ভারত কেমন হবে, সে কি করবে এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে তার কি রকম সম্পর্ক স্থাপিত হবে—এই সব নিয়ে মনের মধ্যে নানা প্রশ্ন ভিড় করে আসে। ভারতবর্ষের সুবৃহৎ আয়তন এবং তার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সামর্থ্যের বিরাটত্বের জন্য ভারতবাসীর মনেও ভবিষ্যৎ ভারতের স্বাধীন রূপ ক্ষুদ্র পরিসর ছেড়ে বিরাট রূপ গ্রহণ করে। স্বাধীন ভারত অন্য কোনো দেশ বা জাতিসমষ্টির উপর নির্ভরশীল হবে না। ভারতের স্বাধীনতা ও অগ্রগতি শুধু এশিয়ায় নয় সমগ্র পৃথিবীতে একটা নূতন পরিবর্তন নিয়ে আসবে বলেই তারা একান্তমনে বিশ্বাস করত। সুতরাং এই ভাবধারা থেকে ভারতবাসী ইংলন্ড ও তার সাম্রাজ্যের সঙ্গে সকল বন্ধন ছিন্ন করে পূর্ণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। এমনকি প্রায় স্বাধীনতা যাকে বলা যায় সেই 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস'-ও পূর্ণ স্বাধীনতা ও উন্নতির পথে অসহ্য বাধা বলে মনে হয়েছিল।

এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত মা ও তার মেয়েদের সম্পর্কের ভাবাধারায় 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস'-এর ভিত্তি। ধরে নেওয়া হয়েছে যে এর অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জাতি একটা সাধারণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। কিন্তু ভারতবর্ষের পক্ষে এটা খাটে না, তাই ভারতের পক্ষে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস'-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া একেবারে অর্থহীন। অবশ্য 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস'-এ কিছু কিছু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা স্থাপনে সুবিধা আছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেটা বৃটিশ সাম্রাজ্য ও তার কমনওয়েল্‌থ্‌-এর বাইরে অন্য কোনো জাতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা ব্যাহত করে। সেইজন্য 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস-এর' ক্ষুদ্র গণ্ডি আমাদের কাছে অসহ্য বলে মনে হয়েছিল। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী তখন ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনার স্বপ্নে ভরপুর, এবং তাই 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস'-এর সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে আমাদের চিন্তা তখন ব্যাপকতর সহযোগিতার কল্পনায় আশ্রয়গ্রহণ করেছে। বিশেষভাবে, পূর্ব ও পশ্চিমে আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলি যেমন চীন, আফগানিস্থান, ইরান ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে নিবিড় মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপন করার কথাও আমরা ভাবছিলাম। এমনকি সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও আমরা বন্ধুত্বসম্পর্ক স্থাপন করার আশা করতাম; কারণ আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ের কাছ থেকেই আমাদের অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। সে সময়ে সকলের মধ্যে একটা ধারণা ছিল এই যে ইংলন্ডের কাছ থেকে আমাদের আর নূতন কিছু শিক্ষণীয় নেই, অন্তুতপক্ষে তাদের সঙ্গে আমাদের এই অস্বাস্থ্যকর বন্ধন ছিন্ন করে যতদিন না সমান মর্যাদার ভিত্তিতে মিলিত হতে পারি ততদিন উভয়পক্ষের এই পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে কোনো লাভ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি ডোমিনিয়ন ও উপনিবেশে জাতি-বৈষম্যের অস্তিত্ব এবং ভারতীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহারের ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকার বিরুদ্ধে আমাদের সংকল্প দৃঢ়তর হয়। বিশেষভাবে বৃটিশ ঔপনিবেশিক নীতির অনুশাসনে পরিচালিত দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব আফ্রিকা ও কেনিয়ার উপর এই সমস্ত কারণে আমরা একেবারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে যাই। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে ব্যক্তিগত-ভাবে ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড-বাসীদের সঙ্গে আমাদের বেশ সদ্ভাব জন্মায়, এর কারণ হয়তো এই যে এই সমস্ত জাতি বৃটিশের সামাজিক রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত একটা নূতন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী।

আমাদের কল্পনায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে আমরা কখনই বিচ্ছিন্নভাবে দেখিনি। মনে হয়, অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা এটা আরও বেশি করে বুঝেছিলাম যে আজকের দিনে পুরানো ভাবধারা অনুযায়ী স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীনতা টিকে থাকতে পারে না। নূতন যুগের পৃথিবী পারস্পরিক সহযোগিতার উপরই প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং আমরা বারবার ঘোষণা করেছি যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কাঠামোর মধ্যেই আমাদের নিজস্ব স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ রাখতে আমরা রাজী আছি। অবশ্য আন্ত-র্জাতিক সহযোগিতার এই কাঠামো বিশ্বের যত বেশি দেশ বা এলাকা নিয়ে গঠিত হবে, ততই ভাল। বৃটিশ কমন্‌ওয়েলথের পরিকল্পনা আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ বিপরীত, যদিচ বৃহত্তর আন্তর্জাতিক কাঠামোর একটা অংশ হিসাবে তার অস্তিত্ব থাকতে পারে।

ভাবলে, বিস্মিত হতে হয় যে তীব্র জাতীয়তাবোধ সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবোধ কি পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। অন্য কোনো পরাধীন দেশের জাতীয় আন্দোলন এতখানি আন্তর্জাতিক চেতনাসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারেনি। তারা সবসময় আন্তর্জাতিক দায়িত্ব এড়িয়েই চলত। ভারতবর্ষের মধ্যেও অবশ্য এমন লোকের অভাব ছিল না, যারা সাধারণতন্ত্রী স্পেন ও চীন এবং আবিসিনিয়া ও চেকোস্লো-ভাকিয়ার প্রতি আমাদের সমর্থনের বিরোধিতা না করেছে। তাদের মত ছিল, এদের সমর্থন করে আমরা ইতালী, জার্মানী ও জাপানের মত শক্তিশালী দেশগুলির বিরাগ-ভাজন হব কেন? বৃটেনের যারা শত্রু, তারাই আমাদের বন্ধু। রাষ্ট্রনীতির মূল কথা শক্তি ও ক্ষমতা এবং কতখানি সুবিধার সঙ্গে আমরা তার ব্যবহার করতে পারি, রাষ্ট্রনীতিতে আদর্শবাদের স্থান নেই—মোটামুটি এই ছিল তাদের যুক্তি। কিন্তু কংগ্রেসের নীতির আদর্শ ভারতের জনচেতনাকে এতখানি উদ্বুদ্ধ করেছিল যে, এই সমস্ত বিরুদ্ধবাদীরা তাদের এই নীতি প্রচার করতেও সাহস করেনি। মুস্‌লিম লীগ অবশ্য বরাবর এসব বিষয়ে নির্বাক ছিল এবং আন্তর্জাতিক কোনো ঘটনা সম্পর্কে তারা কোনোদিন কোনো মতামত প্রকাশ করেনি।

১৯৩৮ সালে ঔষধপত্র ও কয়েকজন চিকিৎসক নিয়ে কংগ্রেস চীনে একটা মেডিক্যাল ইউনিট পাঠায়। কয়েকবছর ধরে এই মেডিক্যাল ইউনিট চীনে বেশ ভাল কাজ করেছিল। যখন এই ইউনিট সংগঠন করা হয়, তখন কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন

সুভাষ বসু। জাপান, জার্মানী বা ইতালী বিরোধী কোনো পন্থা বা কাজ তাঁর মনঃপূত ছিল না। কিন্তু তবুও কংগ্রেসের ভিতর মত এত প্রবল ছিল যে তিনি এই মেডিক্যাল ইউনিট পাঠানোর ব্যাপারে অথবা ফ্যাসিস্ট ও নাৎসী কবলিত জাতিদের প্রতি কংগ্রেসের সহানুভূতি ও সমর্থনের কোনোরূপ বিরোধিতা করেননি। তাঁর সভাপতিত্বকালে আমরা এই সমস্ত বিষয় নিয়ে বহু প্রস্তাব ও অসংখ্য সভা-শোভাযাত্রা করেছি; সবগুলিতে সায় দিতে না পারলেও তিনি এ সবই মেনে নিয়েছিলেন, কারণ তিনি জানতেন এ সবের পিছনে আছে প্রবল জনমত। বৈদেশিক ও আভ্যন্তরিক, উভয় বিষয়েই কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সঙ্গে তাঁর প্রচুর মতবিরোধ ছিল— যার ফলে শেষ পর্যন্ত ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে। ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসের প্রথম দিকে তিনি প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেসের নীতির বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেন। এবং সেই হেতু তিনি একজন প্রাক্তন সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, যা সাধারণত কখনও করা হয় না।

২ : যুদ্ধসম্পর্কে কংগ্রেসের বিশ্লেষণ

সুতরাং আসন্ন যুদ্ধসম্পর্কে কংগ্রেসী নীতির মধ্যে বরাবর এই দ্বিমুখীনতা ছিল। একদিকে আভ্যন্তরিকনীতি ও অপরদেশ ধর্ষণের চেষ্টার জন্য আমরা ফ্যাসিজ্‌ম, নাৎসীজ্‌ম ও জাপানী রণচণ্ডনীতির বিরোধী ছিলাম। এদের কবলিত দেশগুলির প্রতি আমাদের প্রচণ্ড সহানুভূতি ছিল; এবং তাদের এই বর্বর চণ্ডনীতি বন্ধ করার জন্য যে কোনো যুদ্ধে সক্রিয় অংশ নিতে আমরা রাজী ছিলাম। অন্যদিকে, শুধু আমাদের সমস্ত অতীত সংগ্রামের মূল লক্ষ্য হিসাবেই নয়, আগামী যুদ্ধের পরিস্থিতির পটভূমিতেও আমরা ভারতের আশু স্বাধীনতালাভের উপরও জোর দিয়েছিলাম। কারণ, আমরা বারবার এই কথাই ঘোষণা করেছি যে ভারত একমাত্র স্বাধীনভাবেই এই আগামী যুদ্ধে যথাযোগ্য অংশ নিতে পারে; স্বাধীনতার মুক্ত আবহাওয়াই শুধুমাত্র বৃটেনের সঙ্গে ভারতের অতীত সম্পর্কের সমস্ত তিক্ততা মুছে দিতে পারে। জনগণকে উদ্দীপ্ত করতে অথবা ভারতের অসীম সম্পদকে কাজে লাগাতে সক্ষম একমাত্র স্বাধীন ভারতবর্ষ। এই স্বাধীনতার অভাবে আগামী যুদ্ধ ও সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য পরস্পর-বিরোধী সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ ছাড়া অন্য কিছু মনে করা আমাদের পক্ষে খুব কঠিন ছিল। যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমরা এতকাল সংগ্রাম করেছি, তারই সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য আমরা যুদ্ধে যোগদান করব—এটা আমাদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। এবং যদিচ আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে, এটাই কম ক্ষতিকর মনে করে যুদ্ধে যোগদানের কথা চিন্তা করতেন, কিন্তু জনসাধারণের তখন যা মনোভাব ছিল, তাতে তাদের সমর্থন লাভ করা একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। শুধুমাত্র স্বাধীনতাই অতীতের তিক্ততা মুছে দিয়ে একটা আদর্শের প্রেরণায় জনগণের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারত। এ ছাড়া দ্বিতীয় পথ ছিল না। •

কংগ্রেস সোজাসুজি দাবি করেছিল যে জনসাধারণ বা তাদের প্রতিনিধিদের মতামত না নিয়ে ভারতকে কোনো যুদ্ধে টেনে নামানো অথবা কোনো ভারতীয় সৈন্যকে যুদ্ধের জন্য বিদেশে পাঠানো চলবে না। এই শেষোক্ত দাবিটি বিভিন্ন দল ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় আইনসভা পর্যন্ত সমর্থন করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে অন্য দেশ অধিকার বা অন্য জাতির মুক্তি আন্দোলনকে ধ্বংস করবার জন্য এর আগে বহুবার ভারতীয় সৈন্যকে ব্যবহার করা হয়েছে। এই সমস্ত দেশের সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ তো ছিলই না, উপরন্তু এদের মুক্তি আন্দোলনকে আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতাম; সুতরাং বৃটিশ সরকার কর্তৃক ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বিদেশে পাঠানোর ব্যাপারে বহুদিন ধরে আমাদের মনে তীব্র বিদ্বেষ জমে ছিল। সাম্রাজ্যস্বার্থ রক্ষার জন্য বর্মা, চীন, ইরান, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বৃটেন অনেকবার ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ভাড়াটিয়া সৈন্যদল হিসাবে ব্যবহার করেছে। এর ফলে এই সমস্ত দেশের জনসাধারণ ভারতীয় সৈন্যকে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্বার্থরক্ষার প্রতীক হিসাবেই দেখতে শুরু করেছিল এবং সাধারণভাবে ভারতের প্রতি ক্রমশ তাদের একটা বিরুদ্ধভাব গড়ে উঠছিল। জনৈক মিশরবাসীর তিক্ত মন্তব্য আজও আমার স্মরণ আছে। সে বলেছিল : 'তোমরা শুধু নিজেদের স্বাধীনতাই জলাঞ্জলি দাওনি, অন্য দেশকেও দাসত্বের পথে টেনে নামাতে বৃটিশকে সাহায্য করছ।'

সুতরাং আমাদের নীতির দ্বিমুখীনতার মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য রক্ষা করা খুব সহজ ছিল না। এ দুইয়ের মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব ছিল। অবশ্য এই দ্বন্দ্বের সৃষ্টির জন্য আমরা দায়ী নই; কারণ উপস্থিত পরিস্থিতিতে এটা ছিল অবশ্যম্ভাবী এবং আমাদের সমস্ত নীতিবিচারেই এর প্রভাব ছিল অনিবার্য। একই সঙ্গে ফ্যাসিস্ট ও নাৎসী বর্বরতার নিন্দাবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব কায়েম রাখার মধ্যে যে বিরাট অসঙ্গতি আছে বহুবার আমরা তা বলেছি। একথা ঠিক যে ভারতে এবং অন্যত্র আত্মপ্রতিষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদের তুলনায় ফ্যাসিস্ট ও নাৎসীদের বর্বরতার সীমা ছিল না; কিন্তু এই প্রভেদ ছিল শুধু কাল ও পরিমাণগত; প্রকৃতপক্ষে এদের মধ্যে গুণগত কোনো প্রভেদ ছিল না। তা ছাড়া ফ্যাসিস্ট ও নাৎসীদের লীলাক্ষেত্র ছিল ভারত থেকে বহুদূরে এবং শুধুমাত্র পড়াশুনার মারফৎই এদের সম্পর্কে আমাদের ধারণার সৃষ্টি হয়। অথচ দীর্ঘদিন ধরে সাম্রাজ্যবাদ জগদ্দল পাথরের মত আমাদের উপর চেপে ছিল এবং তার অস্তিত্ব আমাদের সমস্ত ভাবনাচিন্তাকে প্রভাবান্বিত করেছিল। অন্যত্র গণতন্ত্রের পতাকা উঁচু করে আমাদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা কতদূর অযৌক্তিক তা আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলাম।

যুদ্ধসম্পর্কে আমাদের সাধারণ নীতির মধ্যে যে অসঙ্গতিই থাকুক না কেন, অপরের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং ফ্যাসিস্ট চন্ডনীতির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম বিষয়ে অহিংসানীতি আমাদের মধ্যে কোনো প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেনি।

১৯৩৮ সালের গ্রীষ্মকালে আমি ইংলন্ড এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সফর করছিলাম। এই সময় আমার বিভিন্ন বক্তৃতা, লেখা ও ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনায়

আমি আমাদের উপরোক্ত নীতিই ব্যাখ্যা করেছি এবং বারবার উপস্থিত পরিস্থিতিতে স্থিতাবস্থা বা গা ভাসানোর নীতির বিপদের কথা উল্লেখ করেছি। 'সুদেতেন' সংকটের চরম সময়ে উদ্বিগ্ন চেক্‌রা আমাকে প্রশ্ন করেছে—যুদ্ধ বাধলে ভারত কোন পক্ষে থাকবে? যুদ্ধের বিরাট ভয়াবহতা তখন তাদের পক্ষে এত বাস্তব ও এত কাছে এসে পড়েছিল যে তাদের পক্ষে যুক্তিতর্কের সূক্ষ্ম সূত্র বা পুরানো অভাব অভিযোগের সারবত্তা বোঝবার মত মানসিক অবস্থা ছিল না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও, আমাদের নীতির যুক্তিযুক্ততা তারা সহানুভূতি নিয়েই বিচার করত।

১৯৩৯ সালের মধ্যভাগে আমরা জানতে পারি যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে সাগরপারে পাঠানো হয়েছে—খুব সম্ভব সিঙ্গাপুর ও মধ্যপ্রাচ্যে। জনগণের প্রতিনিধিদের মতামত না নিয়ে, এইভাবে তাদের বিদেশে পাঠানোর বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে তীব্র প্রতিবাদ উঠতে থাকে। অবশ্য সংকটসময়ে সৈন্যচলাচলের গোপনীয়তা যে থাকা উচিত, তা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু এ বিষয়ে নেতাদের উপর বিশ্বাস রেখে তাদের ওয়াকিবহাল করার বিভিন্ন পন্থা ছিল। কেন্দ্রীয় আইনসভায় তখন বিভিন্ন দলের নেতারা সভ্য ছিলেন এবং সমস্ত প্রদেশে জনসাধারণের নির্বাচিত মন্ত্রীমণ্ডলী ছিল। সাধারণত অনেক ব্যাপারেই কেন্দ্রীয় সরকার এর আগে বহুবার প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছে। কিন্তু এই সৈন্য পাঠানোর বিষয়ে ভারতীয় জনমতের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার জনপ্রতিনিধি অথবা নির্বাচিত মন্ত্রীমণ্ডলীর সামান্যতম মতামত নেবারও অপেক্ষা করেনি। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের সংশোধনেরও চেষ্টা চলছিল। এই সব সংশোধনীর লক্ষ্য ছিল এই যে যুদ্ধ শুরু হলে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত করা। বলা বাহুল্য এটা যদি নির্বাচিত প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলী অথবা জনসাধারণের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে করা হত, তাহলে হয়তো আপত্তির কিছু থাকত না। গণতান্ত্রিক দেশে সাধারণত তাই হয়ে থাকে। আমরা সকলেই জানি যে একটি সংহত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি প্রদেশ বা ইউনিট তাদের আত্মকর্তৃত্ব বজায় রাখতে কতখানি ব্যগ্র; এমনকি চরম সংকটের অবস্থাতেও অনেক সময় তারা তাদের এই ক্ষমতা কেন্দ্রীয় শাসনের হাতে তুলে দেবার বিরোধিতা করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তো এই ব্যাপার নিয়ে দীর্ঘদিন টানাহেঁচড়া চলছে, এবং আমি যখন এই বই লিখছি, এই এখনও অস্ট্রেলিয়াতে শুধুমাত্র যুদ্ধকালীন অবস্থাতে কমনওয়েলথ্ সরকারের ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রস্তাবও গণভোটে পরাজিত হয়েছে। এখানে এই সঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়া উভয়দেশেই কেন্দ্রীয় সরকার এবং আইনসভা তাদের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়েই গঠিত। ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার শুধু যে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত নয়, তাই নয়, তারা বৃটেনের প্রতিনিধি হিসাবেই জনসাধারণ এবং প্রাদেশিক সরকারের মতামত তুচ্ছ করে নিজেদের খুশিমত শাসনব্যবস্থা চালিয়ে যেত। জনসাধারণ বা

প্রদেশের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিন্দুমাত্র দায়িত্ববোধ ছিল না, এবং এখনও নেই; এই অবস্থায় সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার অর্থ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের শেষ ভিত্তিকে ধ্বংস করে দেওয়া, এবং নির্বাচিত প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলীর হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া। এই কারণে বৃটিশ পার্লামেণ্টের উপরোক্ত প্রস্তাব ভারতে তীব্র প্রতিবাদের সৃষ্টি করে। মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করবার সময় বৃটিশ সরকার কংগ্রেসকে যে আশ্বাস দিয়েছিল, এই নূতন সংশোধনে সেই আশ্বাস ভঙ্গ হল, এবং আমরা তখন বুঝতে পারলাম যে এবারও ভারতের জনগণ বা তাদের নেতাদের কোনো মতামত না নিয়েই বৃটিশ সরকার ভারতকে এই আগামী যুদ্ধে লিপ্ত করবার চেষ্টা করছে।

কংগ্রেস এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার ঘোষিত নীতির দিক থেকে বৃটিশ সরকারের এই পন্থা সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল এবং সেইহেতু কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি এর তীব্র প্রতিবাদ করে। কংগ্রেস ঘোষণা করেছিল যে ভারতবর্ষ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে চাপানো কোনো নীতি মানবে না এবং জনগণের মতামত না নিয়ে যুদ্ধসম্পর্কে সুদূর-প্রসারী কোনো নীতি গ্রহণ করবে না। ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসের প্রথমদিকে কংগ্রেস প্রস্তাব নিয়েছিল: 'বর্তমান বিশ্বসঙ্কটে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষায় যারা কৃতসংকল্প সেই সমস্ত জাতির প্রতি কার্যকরী সমিতির সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। ইউরোপ, আফ্রিকা ও সুদূর প্রাচ্যে ফ্যাসিস্ট ও নাৎসী আক্রমণ,এবং চেকোস্লোভাকিয়া ও স্পেনের প্রতি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বাসঘাতকতার তীব্র নিন্দা কংগ্রেস সরকার ঘোষণা করেছে।' কিন্তু এর সঙ্গে একথাও ছিল: 'অতীতের নীতি ও বর্তমানের ব্যবস্থার ফলে আমাদের দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে বৃটিশ সরকার গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার বিরোধী এবং যে কোনো সময়ে নিজের স্বার্থমত এই আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা করবে। ভারতবর্ষ এই রকম কোনো সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অপারগ। নিজের দেশে যখন স্বাধীনতা অনুপস্থিত বা তার প্রতি যখন বিশ্বাস হননের পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে, তখন অন্যত্র গণতান্ত্রিক স্বাধীনতারক্ষার জন্য ভারত তার সম্পদ-সামগ্রী ব্যবহৃত হতে দিতে পারে না।' সুতরাং বৃটিশ সরকারের উপরোক্ত নীতির প্রথম প্রতিবাদ হিসাবে কেন্দ্রীয় আইনসভার পরবর্তী অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকবার জন্য কংগ্রেস তার সভ্যদের নির্দেশ দিল।

যুদ্ধ বাধবার সপ্তাহ তিনেক আগে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি তার উপরোক্ত নীতি ঘোষণা করে। কিন্তু ভারত সরকার এবং তার পিছনে বৃটিশ সরকার বড় বা ছোট যে কোনো বিষয়ে জনমতকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করতে বদ্ধপরিকর ছিল। বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে গভর্নর ও রাজকর্মচারীরা ক্রমশই যে অসহযোগিতার মনোভাব দেখিয়েছিল, তার থেকেই এর প্রমাণ মিলতে লাগল। এর ফলে বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীর অবস্থা বিশেষ জটিল হয়ে উঠেছিল, এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যেও একটা তীব্র উত্তেজনারও সৃষ্টি হয়েছিল। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের মনে হয়েছিল যে পঁচিশ বছর আগে ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে বৃটিশ সরকার যেভাবে ভারতকে যুদ্ধের মধ্যে টেনে নামিয়েছিল, জনসাধারণ বা নির্বাচিত

মন্ত্রীমণ্ডলীর মতামত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এবারও ব্রিটিশ সরকার তাই করবে। এবং ঠিক আগের বারের মত এবারও যুদ্ধের অজুহাতে ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনকে ধ্বংস করা ও সাম্রাজ্যরক্ষার স্বার্থে তার সমস্ত সম্পদ সামগ্রী শোষণ করাই ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য।

কিন্তু গত পঁচিশ বছরে অনেক ঘটনা ঘটেছে, এবং জনসাধারণের মানসিক অবস্থারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ভারতের মত একটা মহান দেশের জনসাধারণের মতামতের প্রতি চরম উপেক্ষা এবং তাকে নিজের লেজুড় হিসাবে রাখবার চেষ্টা ভারতবাসীর মর্মে আঘাত করেছিল। তাদের মনে প্রশ্ন উঠেছিল—গত বিশ বছর ধরে আমরা যে অসহ্য নির্যাতন সহ্য করেও সংগ্রাম চালিয়েছি, তা কি সব বৃথা? এই নিদারুণ অপমান ও অবজ্ঞা মেনে নিলে আমরা কি আমাদের মহান ও পবিত্র জন্মভূমিরই অপমান করব না? অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সংকল্প আমাদের মধ্যে অনেকেরই ছিল, এবং এই অন্যায় শক্তির কাছে নতিস্বীকারের মত লজ্জা আমাদের আর কিছুতে ছিল না। সেই সঙ্গে নতিস্বীকার না করার ফলাফল সম্পর্কেও আমরা সম্পূর্ণ সজাগ ছিলাম।

আমরা ছাড়াও অপেক্ষাকৃত তরুণদের মনকেও এই সমস্ত চিন্তা পীড়িত করে তুলছিল। জাতীয় সংগ্রামের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এদের প্রায় কারুরই ছিল না; এমনকি দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকের আইন-অমান্য আন্দোলনও এদের কাছে একটা অতীত ঘটনা ছাড়া আর কিছু ছিল না। নির্যাতন, নিপীড়ন ও সংগ্রামের জ্বলন্ত অভিজ্ঞতার আগুনে এরা তখনও খাঁটি হয়ে ওঠেনি, এবং অনেক কিছুরই ঠিক মর্যাদা বুঝত না। বয়স্কদের এরা সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখত, কারণ তাদের এরা দুর্বলচিত্ত ও আপোষ-পন্থী বলে মনে করত। এদের ধারণা ছিল যে কড়া কথা জোরগলায় বললেই কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। ব্যক্তিগত নেতৃত্ব অথবা রাজনীতি ও অর্থনীতির সূক্ষ্ম সূত্র নিয়ে দ্বন্দ্বকলহ এদের মধ্যে একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল। অনেক কিছু না বুঝেই এরা আন্ত-র্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে রীতিমত উত্তেজিত আলোচনা করত। এক কথায় এরা ছিল অপরিণত। কঠিন অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জিত শান্ত ও স্থির মানসিক বুনিয়াদ এদের ছিল না। আসলে এদের অন্তর্নিহিত উপাদান ছিল খুব ভাল এবং মহান উদ্দেশ্য পালনে এদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল যথেষ্ট, কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের কর্মনীতির সামগ্রিক ফলাফল মোটেই আশানুরূপ হয়নি এবং সাধারণভাবে সেটা হতাশারই সৃষ্টি করেছে। হয়তো তাদের পক্ষে এই সব দুর্বলতা সাময়িক ছিল, এবং কালে তারা এসব কাটিয়ে উঠতে পারত, এমনকি হয়তো ইতিমধ্যে তাদের যে তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তার ফলে তারা এই সব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছে।

বিভেদ যাই থাকুক না কেন, যুদ্ধের সংকটে বৃটিশ নীতির বিরুদ্ধে কিন্তু সমস্ত দল ও সংগঠন একইভাবে চিন্তা করত। বৃটিশ নীতির ফলে সকলেই ক্রুদ্ধ হয়েছিল, এবং তারা চাইত যে কংগ্রেস এর প্রতিরোধ গড়ে তুলুক। জাতি হিসাবে আমাদের আত্ম-মর্যাদাপূর্ণ ও সংবেদনশীল জাতীয়তাবাদ কিছুতেই বৃটিশের কাছে আমাদের

এই ধরনের চরম অপমানকর নতিস্বীকার করতে দিতে পারে না। এবং এ বিষয়ে এটাই ছিল মুখ্য, অন্য সব কিছুই এক্ষেত্রে গৌণ।

ইউরোপে অবশেষে যুদ্ধ বাধল। সঙ্গে সঙ্গে এখানকার বৃটিশ ভাইসরয়ও ঘোষণা করলেন যে ভারতবর্ষও যুদ্ধে যোগদান করেছে। ঘৃণিত বিদেশী শাসনব্যবস্থার প্রতিনিধি একজন বিদেশী, চল্লিশ কোটি নরনারীকে—তাদের মতামতের অপেক্ষা না রেখে—যুদ্ধে নিক্ষেপ করলেন। চল্লিশ কোটি নরনারীর ভাগ্য নিয়ে যেখানে অনায়াসে এইভাবে খেলা করা যায়, সেই ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণ জঘন্য এবং সে ব্যবস্থায় যে বিশেষ গলদ আছে তা নিঃসন্দেহ। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ডোমিনিয়নে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মতামত গ্রহণ এবং সর্বদিক বিবেচনা করে তর্ক বিতর্ক ও আলোচনা না হওয়া পর্যন্ত এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু ভারতে এসবের যে কোনো প্রয়োজন হয় না তা নিতান্ত বেদনাদায়ক।

৩ : যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া

ইউরোপে যখন যুদ্ধ বাধে, আমি তখন চুংকিং-এ। কংগ্রেস সভাপতির তার পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি ভারতে ফিরে এলাম। কার্যকরী সমিতির জরুরী অধিবেশন শুরু হয়ে গেছে। এই অধিবেশনে যোগদান করবার জন্য মিস্টার এম. এ. জিন্নাও আমন্ত্রিত হন, কিন্তু তিনি তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে অনুপস্থিত থাকেন। এদিকে ভাইসরয় শুধু যে সরকারীভাবে ভারতবর্ষকে যুদ্ধে যোগদান করিয়েছিলেন তাই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কতকগুলি জরুরী অর্ডিন্যান্সও জারি করেন। বৃটিশ পার্লামেন্টেও ইতিমধ্যে ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের কতকগুলো সংশোধনী গৃহীত হয়েছিল। জনগণের প্রতিনিধি ও নেতাদের কোনোরকম মতামত না নিয়ে বৃটিশ সরকার ও তার ভাইসরয় কর্তৃক এই সমস্ত আইন কানুন জারী করায় সর্বত্র বিশেষ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। আসলে এসব আইন বিভিন্ন প্রদেশের জননির্বাচিত মন্ত্রীমণ্ডলীর ক্ষমতা ও অধিকারকেই আঘাত করেছিল। বস্তুত তাদের হাত থেকে প্রায় সমস্ত ক্ষমতাই কেড়ে নেবার চেষ্টা চলছিল। অতীতে বৃটিশ সরকার বারবার যেসব মহান আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার কথা ঘোষণা করেছিল, এখন সেসবও সম্পূর্ণ তুচ্ছ করা হল।

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯। বহু আলাপ আলোচনার পর যুদ্ধের সংকট সম্পর্কে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি একটি দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করেন। এই বিবৃতিতে ভাইসরয় কর্তৃক ঘোষিত নীতি ও অর্ডিন্যান্সগুলি সম্পর্কে বলা হয় যে 'এইগুলি সম্পর্কে কার্যকরী সমিতি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।' বিবৃতিতে ফ্যাসিজ্‌ম ও নাৎসীজ্‌ম বিশেষ করে 'পোল্যান্ডে জার্মান নাৎসী সরকারের অন্যায় আক্রমণের' তীব্র নিন্দা করা হয়, এবং যারা ফ্যাসিজ্‌ম ও নাৎসীজ্‌মের প্রতিরোধ গড়ে তুলছিল, তাদের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি জানানো হয়।

বিবৃতিতে সহযোগিতার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বলা

হয়েছিল যে, 'কার্যকরী সমিতি উপর থেকে চাপানো যে কোনো সিদ্ধান্তেরই বিরোধিতা করতে বাধ্য। মহান উদ্দেশ্যের জন্য সহযোগিতা যদি কাম্য হয়, সে সহযোগিতা জোর জবরদস্তি করে বা উপর থেকে চাপানো কোনো নির্দেশ দিয়ে লাভ করা সম্ভব নয়। বিদেশী শাসকের উপর থেকে চাপানো এই সমস্ত নির্দেশ বা হুকুম ভারতবাসী পালন করবে, এটা কার্যকরী সমিতি কিছুতেই অনুমোদন করতে পারে না। যে উদ্দেশ্যকে উভয় পক্ষই যোগ্য বিবেচনা করে এবং যেখানে উভয় পক্ষই সমান মর্যাদার অধিকারী, কেবলমাত্র সেখানেই সহযোগিতার কথা উঠতে পারে। স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতবাসী ইতিপূর্বে বহু সংগ্রাম, দুর্যোগ ও নির্যাতন বরণ করে এসেছে; সুতরাং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পক্ষেই তাদের সহানুভূতি এবং সমর্থন। কিন্তু সে নিজে যখন পরাধীন এবং তার সীমাবদ্ধ সামান্য স্বাধীনতার অধিকারটুকুও যখন খর্ব করা হচ্ছে, তখন তার পক্ষে তথাকথিত গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে যোগদান করা অসম্ভব।

'কার্যকরী সমিতি জানে যে ফ্যাসিস্ট ধর্ষণের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করার মহান আদর্শের কথাই গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স ঘোষণা করেছে। কিন্তু তাদের বাক্য, তাদের প্রচারিত আদর্শ এবং তাদের কর্মকলাপের আসল উদ্দেশ্যের মধ্যে কতদূর ব্যবধান থাকে তার উদাহরণে অনতিপূর্বকালের ইতিহাস পরিপূর্ণ।' এই সূত্রে গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এবং তার পরবর্তী কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করে কার্যকরী সমিতি বলে : 'মহান আদর্শের উদ্দীপনাপূর্ণ ঘোষণা যে পরে কিভাবে তুচ্ছ করা হয়, গত মহাযুদ্ধের সাম্প্রতিক ইতিহাস তা নতুন করে প্রমাণ করেছে।...আবার ঘোষণা করা হয়েছে যে গণতন্ত্র আজ বিপদগ্রস্ত, তাকে রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। কার্যকরী সমিতি এই ঘোষণার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। তারা বিশ্বাস করে যে ইউরোপের জনসাধারণ এই আদর্শেই অনুপ্রাণিত হয়েছে এবং গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তারা তাদের চরম আত্মত্যাগেও প্রস্তুত। কিন্তু সংগ্রামকালে যারা চূড়ান্ত আত্মত্যাগ করেছে এবং জনসাধারণের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষাকে ইতিপূর্বে বারবারই তুচ্ছ করা হয়েছে, তাদের বঞ্চনা করা হয়েছে।

'এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে সাম্রাজ্যতন্ত্র, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা এবং ঘৃণিত কায়েমী স্বার্থ ও অধিকার বজায় রাখা, তাহলে এই যুদ্ধের সঙ্গে ভারত কোনো সম্পর্ক রাখতে পারে না। কিন্তু সত্যিসত্যিই যদি গণতন্ত্র রক্ষা এবং বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাই এর আসল উদ্দেশ্য হয়, তবে ভারত এই যুদ্ধের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট। কার্যকরী সমিতির দৃঢ়বিশ্বাস যে ভারতীয় গণতান্ত্রিক স্বার্থের সঙ্গে বৃটিশ বা পৃথিবীব্যাপী কোনো গণতান্ত্রিক স্বার্থের কোনো বিরোধ নেই।'

'অপরদিকে, ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য দেশের গণতান্ত্রিক অধিকারের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিস্টবাদের অন্তর্নিহিত সংঘর্ষ ও বিরোধিতা অনিবার্য। গণতন্ত্র রক্ষা ও তার প্রসারের সৎসঙ্কল্পই যদি গ্রেট বৃটেনের থাকে, তাহলে নিজস্ব সাম্রাজ্যতন্ত্রের উচ্ছেদ-সাধনই তার প্রথম কর্তব্য।...অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং অন্যায় আক্রমণ ও ধর্ষণ

থেকে পরস্পরের আত্মরক্ষার জন্য স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ যে কোনো স্বাধীন-দেশের সঙ্গে সানন্দে যোগদান করবে। আসল স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বব্যাপী এক নূতন ব্যবস্থার সৃষ্টি করা এবং মানবসমাজের অগ্রগতি ও ক্রমোন্নতির জন্য পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং সম্পদকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টাতেই স্বাধীন ভারত নিযুক্ত থাকবে।'

পুরোপুরি জাতীয়তাবাদী হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি আন্তর্জাতিক দৃষ্টি নিয়েই এই যুদ্ধের পর্যালোচনা করেছিল। তারা বুঝেছিল যে এই যুদ্ধ শুধু দুটো সশস্ত্র বাহিনীর সংঘাত নয়। তারা ঘোষণা করেছিল: 'বর্তমানে ইউরোপে যে সংকটের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, তা শুধু ইউরোপের নয়, সমগ্র মানবসভ্যতার। পূর্বতন বহু সংকট বা যুদ্ধের ন্যায় প্রচলিত বিশ্বব্যবস্থা অপরিবর্তিত রেখে এ সংকট কেটে যাবে না। মঙ্গল বা অমঙ্গল যে জন্যই হোক, এই সংকট—রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক—সমস্ত দিক থেকে পৃথিবীকে নূতনভাবে গড়ে তুলবে। গত বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই যে সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক অসামঞ্জস্য ও সংঘাত ক্রমশই ভয়াবহ-রূপে আত্মপ্রকাশ করছিল, বর্তমান সংকট তারই অনিবার্য পরিণতি। সুতরাং এই সমস্ত অসামঞ্জস্য ও সংঘাত একেবারে নির্মূল করে নূতন সাম্য ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত এই সংকট থেকে মুক্তি নেই। এক দেশ কর্তৃক অপর দেশের উপর প্রাধান্য ও শোষণকার্যের উচ্ছেদ এবং সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ন্যায়সঙ্গতভাবে পুনর্গঠনের উপরই এই সাম্যব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে উঠতে পারে। এই ব্যাপারে কষ্টি পাথর হল ভারতবর্ষ। কারণ, ভারতবর্ষই আধুনিক সাম্রাজ্যতন্ত্রের সব চেয়ে বড় উদাহরণ; এবং ভারতের মুক্তি উপেক্ষা করে সর্বসাধারণের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর কোনো নূতন ব্যবস্থার পরিকল্পনাই সফল হতে পারে না। প্রচুর সম্পদসামগ্রীর অধিকারী ভারতবর্ষ একান্ত অনিবার্যভাবেই বিশ্বের যে কোনো নূতন ব্যবস্থার সংগঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য। কিন্তু একমাত্র স্বাধীন ভারতের পক্ষেই সে দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব, যখন স্বাধীনতার মুক্ত আবহাওয়ায় তার সমগ্র শক্তি বন্ধনমুক্ত হবে। আজকের দিনে স্বাধীনতা অবিভাজ্য; এবং পৃথিবীর যে কোনো একটা কোণেও সাম্রাজ্যবাদী দাসত্ব বজায় রাখার অতি সামান্য প্রচেষ্টাও নূতনতর ও বৃহত্তর সংকটের সৃষ্টি করবে।'

এই প্রসঙ্গে, ভারতীয় রাজন্যবর্গ কর্তৃক ইউরোপের গণতন্ত্র রক্ষার যুদ্ধে সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া সম্পর্কে কার্যকরী সমিতি বলেন—যাদের নিজেদের রাজ্যে গণতন্ত্র দূরে থাক, চরম স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিষ্ঠিত, তাদের পক্ষে আগে নিজেদের রাজ্যে গণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করাই বেশি শোভন হত।

বিবৃতিতে কার্যকরী সমিতি এই যুদ্ধে সকল প্রকার সহযোগিতা করার আগ্রহ আবারও জ্ঞাপন করেন; কিন্তু অতীত ও বর্তমানে অনুসৃত ব্রিটিশ নীতির প্রতি তাঁদের গভীর সন্দিগ্ধতাও জ্ঞাপন করেন, কারণ এই নীতির গতিভঙ্গী থেকে তাঁরা কোনো ইঙ্গিতই পাননি যে 'আত্মকর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা বা গণতন্ত্রের অগ্রগতির জন্য বৃটিশ

সরকারের কোনো প্রচেষ্টা আছে, অথবা যুদ্ধের বর্তমান অবস্থায় বৃটিশ সরকার যে সমস্ত ঘোষণা করেছে, সেগুলি বর্তমানে বা ভবিষ্যতে কার্যে পরিণত করা হবে।' কার্যকরী সমিতি সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছিলেন : 'বর্তমান ঘটনাবলী এত গুরুত্বপূর্ণ এবং গত কয়েকদিনের মধ্যে তা এত ক্ষিপ্রগতি লাভ করেছে যে সব ক্ষেত্রে মানুষের চিন্তাশক্তি পর্যন্ত তার সঙ্গে তাল রাখতে পারে না। এ বিরোধের মূল বিষয়বস্তু কি, প্রকৃত লক্ষ্য কি, এবং বর্তমানে ও ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের অবস্থা কি দাঁড়াবে, এই সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণ উপলব্ধি করে বিচার করার অপেক্ষায় কার্যকরী সমিতি এই যুদ্ধ সম্পর্কে আপাততঃ কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক।' সেজন্য কার্যকরী সমিতি বলেন : 'গণতন্ত্র ও সাম্রাজ্যতন্ত্র এবং নবপরিকল্পিত বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের যুদ্ধনীতির উদ্দেশ্য কি, এবং সেই উদ্দেশ্যগুলি অবিলম্বে ভারতে কার্যকরী করার জন্য কি কি ব্যবস্থা করা হবে, তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে আমরা বৃটিশ সরকারকে আহ্বান করছি। তাদের উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে সাম্রাজ্যতন্ত্রের উচ্ছেদ কি ধরা হয়েছে? জনগণের মত ও ইচ্ছা অনুযায়ী শাসিত এবং আত্মকর্তৃত্বপূর্ণ ও স্বাধীন হিসাবে তারা কি ভারতকে মানতে রাজী?...যে কোনো ঘোষিত নীতির সত্যাসত্য বিচার করবার একমাত্র পথ হল বর্তমানে তাকে কার্যকরী করে তোলার প্রচেষ্টা; কারণ বর্তমানের বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও ইচ্ছাই ভবিষ্যৎকে রূপদান করবে।...সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসংঘাতই যুদ্ধ এবং মানবসমাজের অবনতির কারণ, এবং এই সর্বনাশা যুদ্ধও যদি সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের কাঠামো অটুট রাখার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়—তবে সে এক চরম দুর্ঘটনা।'

দেড়শো বছরের দাসত্বের ফলে ইংলন্ড এবং ভারতের মধ্যে যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান ও তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল, তা অতিক্রম করার প্রচেষ্টা হিসাবে এবং জনগণের উদ্দীপ্ত সমর্থনসহ এই বিশ্বযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ায় আমাদের ঔৎসুক্যের সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের অদম্য আকাঙ্ক্ষার একটা সামঞ্জস্য আনার উপায় উদ্ভাবন করার উপক্রম হিসাবে কার্যকরী সমিতি বহু উৎকণ্ঠিত গবেষণার পর উপরোক্ত বিবৃতি প্রকাশ করেন। বিবৃতিতে ভারতের স্বাধীনতার যে দাবি করা হয়েছিল তা নূতন নয়। বিশ্বযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতেই শুধু আমরা এই দাবি তুলিনি। দীর্ঘদিন ধরে পুরুষানুক্রমে স্বাধীনতার এই অধিকারবোধই ভারতবাসীর সমস্ত চিন্তা ও কাজে প্রেরণা যুগিয়েছে। উপস্থিত পরিস্থিতি ও যুদ্ধের জরুরী অবস্থাতে আমাদের স্বাধীনতার এই অকুণ্ঠ ঘোষণা পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। বাস্তবত, যুদ্ধের জরুরী প্রয়োজনেই আমাদের স্বাধীনতা অপরিহার্য ছিল। ইংলন্ড যদি ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করত, তাহলে প্রায় সমস্ত অসুবিধাই দূর হয়ে যেত, তারপর যেটুকু বাধা থাকত তা পারস্পরিক আলাপ আলোচনার সাহায্যে দূর করা সম্ভবপর ছিল। প্রত্যেক প্রদেশে প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত ছিল। যুদ্ধের সময়ের জন্য এমন একটা জনপ্রিয় কেন্দ্রীয় সংগঠন উদ্ভাবন করা সম্ভব

ছিল, যার দ্বারা জন-সমর্থনের ভিত্তিতে যুদ্ধব্যবস্থার সুপরিচালনা এবং সেনাবাহিনীর সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা সহজসাধ্য হয়ে উঠত, এবং জনসাধারণের আস্থাভাজন এই কেন্দ্রীয় সংগঠন একদিকে জনগণ ও প্রাদেশিক সরকার, অন্যদিকে ভারত ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার কাজও সবলতর করে দিত। গঠনতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিক অন্যান্য যেসব সমস্যা ছিল সেগুলিকে অনায়াসে যুদ্ধের পরে সমাধানের জন্য মুলতুবী রাখা যেত; যদিচ তার আগেই সেগুলি সমাধান করার প্রচেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা ভারতের স্থায়ী গঠনতন্ত্র রচনা এবং পারস্পরিক স্বার্থের খাতিরে ইংলণ্ডের সঙ্গে চুক্তি স্থাপন করা যেত। আন্তর্জাতিক পটভূমিকা সম্বন্ধে জনসাধারণের প্রায় কোনো জ্ঞানই ছিল না, এবং সাম্প্রতিক বৃটিশনীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে তারা মুখর, এ অবস্থায় কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির পক্ষে ইংলণ্ডের কাছে এরূপ প্রস্তাব করা সহজ ব্যাপার ছিল না। আমরা জানতাম যে দীর্ঘদিনের অবিশ্বাস ও সন্দেহের জন্য ভারতবাসী ও ইংলণ্ডের মধ্যে এমন তীব্র তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে যে শুধু একটা ঘোষণার যাদুমন্ত্রে সে তিক্ততা মুছে যেতে পারে না। কিন্তু তবু আমাদের একান্ত আশা ছিল যে ঘটনাপ্রবাহের জরুরী তাগিদে ইংলণ্ডের নেতারা সাম্রাজ্যতন্ত্রী খাত পরিত্যাগ করে সমগ্র পরিস্থিতি দূরদৃষ্টিতে পর্যালোচনা করে আমাদের প্রস্তাব গ্রাহ্য করবে এবং ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে এই দীর্ঘদিনের তিক্ততা ও সংঘর্ষের অবসান ঘটবে। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধসম্পর্কে ভারতের জনগণের উৎসাহ ও ভারতের যুদ্ধ-সম্পদ দুই-ই উন্মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তা হওয়ার ছিল না, বৃটেন আমাদের প্রত্যেকটি দাবি প্রত্যাখ্যান করল। আমরা বুঝলাম যে এই যুদ্ধে বৃটেন আমাদের সহযোগী বন্ধু হিসাবে চায় না; সে চায় তার হুকুম তামিল করবার জন্য অনুগত দাস। আমরা 'সহযোগিতার' উল্লেখ করেছিলাম তারাও 'সহযোগিতা'র কথা বলেছিল; কিন্তু উভয়ের কাছে একই শব্দের অর্থের প্রভেদ ছিল আকাশপাতাল। আমাদের দিক থেকে সহযোগিতা সমকক্ষ ও সহযোগী হিসাবেই সম্ভব ছিল, আর তাদের কাছে সহযোগিতার অর্থ বিনা প্রতিবাদে তাদের আদেশ-পালন। যে সমস্ত আদর্শ ও নীতি আমাদের প্রত্যেকের জীবনকে সুন্দর ও অর্থময় করে তুলেছে, যার জন্য দীর্ঘকাল আমরা সংগ্রাম করে এসেছি, তার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা না করে, আমাদের পক্ষে বৃটেনের এই অনুজ্ঞা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। আমাদের মধ্যে যদি বা কেউ এতে রাজী হতাম, তাহলে জনসাধারণের সামান্য সমর্থনও কিন্তু মিলত না। ফলে আমরা শুধু যে জাতীয়তাবাদের জীবন্ত প্রবাহ থেকেই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তাম, তাই নয়, আমাদের আন্তর্জাতিকতার পরিকল্পনা থেকেও অনেক দূরে সরে আসতাম।

এদিকে প্রাদেশিক সরকারগুলির অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হয়ে উঠছিল। ভাইসরয় এবং গভর্নর কর্তৃক অবিরাম হস্তক্ষেপ অথবা তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ—প্রাদেশিক সরকারগুলির সামনে তখন এই ছিল বিকল্প। ঊর্ধ্বতন রাজকর্মচারীরা সকলেই গভর্নরের একান্ত অনুগত ছিল, এবং তারা মন্ত্রীদের ও আইনসভাকে তাদের প্রতি-

বন্ধক হিসাবে দেখত। স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র ও তার প্রতিনিধিদের সঙ্গে গণপরিষদের যে অতি পুরাতন সংঘাত, এ তারই এক পুনরভিনয়, এক্ষেত্রে প্রভেদ শুধু এই যে আমাদের দেশে শাসক বা তার প্রতিনিধি সকলেই বিদেশী, এবং তাদের সমগ্র শাসন-ব্যবস্থা শুধু সশস্ত্র সেনাবাহিনীর শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বাঙলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধু—এই তিনটি ছাড়া ভারতের অন্যান্য আটটি প্রদেশে যে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলী ছিল, বৃটিশ সরকারের নীতির প্রতিবাদ হিসাবে তাদের পদত্যাগ করাই সিদ্ধান্ত হল। অবশ্য অনেকের মত ছিল এই যে মন্ত্রীমণ্ডলীগুলি পদত্যাগ না করে গভর্নর কর্তৃক তাদের পদচ্যুতি বরণ করে নিক। যাই হোক, অবস্থার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ও সংঘাত এত প্রবল ছিল এবং তার দৈনন্দিন আত্মপ্রকাশ এত প্রকট ছিল যে আমরা সকলেই বুঝেছিলাম, আজ হোক কাল হোক, গভর্নর ও মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে সংঘাত অবধারিত এবং সেক্ষেত্রে হয় মন্ত্রীমণ্ডলীকে পদত্যাগ করতে হবে, আর নয় গভর্নর মন্ত্রীদের পদচ্যুত করবেন। কিন্তু মন্ত্রীমণ্ডলী সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক পথে পদত্যাগই করে পুরানো আইনসভা ভেঙে দিয়ে নূতন নির্বাচনের প্রয়োজনও সৃষ্টি করলেন। বলা বাহুল্য কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীর পিছনে আইনসভার অধিকাংশ সভ্যের সমর্থন ছিল, এবং এই কারণে কোনো প্রদেশে নূতন কোনো মন্ত্রীসভা গঠন সম্ভব হয়নি। কিন্তু গভর্নররা নূতন নির্বাচনের প্রবর্তন এড়াতে অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব ছিল, কারণ তারা জানত যে এসময়ে আর একটা নির্বাচনে কংগ্রেসই বিপুলভাবে বিজয়ী হবে। সুতরাং তারা প্রাদেশিক আইনসভাগুলিকে ভেঙে না দিয়ে, শুধু সাময়িকভাবে সেগুলির অধিবেশন বিরত রেখে মন্ত্রীমণ্ডলী ও আইনসভার সমস্ত ক্ষমতা গভর্নররা নিজেদের হাতে তুলে নিল। প্রদেশে প্রদেশে এই নূতন স্বেচ্ছাচারীদের সৃষ্টি হল। নির্বাচিত প্রতিনিধি-সংস্থা এবং জনমতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে এরা নিজেদের খুশিমত আইন-কানুন জারী করে শাসন শুরু করল।

পরবর্তীকালে বৃটিশ পক্ষের অনেক মুখপাত্র প্রচার করেছে যে প্রাদেশিক মন্ত্রী-মণ্ডলীর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি স্বেচ্ছাচারিতা করেছে। নাৎসী ও ফ্যাসিস্ট দেশগুলির বাইরে যারা সবচেয়ে বেশি স্বেচ্ছাচারিতার নমুনা দিয়েছে সেই বৃটিশের পক্ষ থেকে আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সত্যিই বিস্ময়কর! আসলে প্রাদেশিক ব্যাপারে শাসনের স্বাধীনতা এবং গভর্নর ও ভাইসরয়ের সকলপ্রকার হস্তক্ষেপের অবসান—এই দুই আশ্বাসের ভিত্তিতেই কংগ্রেস আইনসভার নির্বাচনে এবং মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনে উদ্যোগী হয়েছিল। কিন্তু ভাইসরয় এবং গভর্নরদের যথেচ্ছ হস্ত-ক্ষেপ ক্রমশই বাড়ছিল; এবং শুধু তাই নয়, বৃটিশ পার্লামেন্টে যুদ্ধের অজুহাত দেখিয়ে ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন এ্যাক্টের সংশোধনী এনে প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতাও যথেষ্ট পরিমাণে খর্ব করা হয়েছিল। প্রাদেশিক সরকারের অধিকার রক্ষার জন্য কোনো আইনই অবশিষ্ট রইল না, এবং তাদের অধিকারে কখন কিভাবে হস্তক্ষেপ করা হবে তা বিচার করার ভার কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ শুধু ভাইসরয়েরই উপরই সম্পূর্ণ ন্যস্ত করা হল; সুতরাং প্রাদেশিক সরকারগুলির একমাত্র তাদের মর্জির

উপর নির্ভর করে টিকে থাকা সম্ভব ছিল। ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল তাঁর মনোনীত সভ্যদের নিয়ে গঠিত এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের পূর্ণ সমর্থনে প্রাদেশিক সরকার এবং তার নির্বাচিত আইনসভার যে কোনো সিদ্ধান্ত যুদ্ধের জরুরী অবস্থার অজুহাতে নাকচ করার ক্ষমতা পেয়েছিলেন। দায়িত্বশীল কোনো মন্ত্রীসভাই এই অবস্থায় কাজ চালাতে পারে না। কারণ এইভাবে কাজ চালাতে হলে হয় গভর্নর ও ভাইসরয়ের সঙ্গে সংঘর্ষ অথবা আইনসভা ও জনসাধারণের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল। যে সমস্ত আইনসভায় কংগ্রেস সংখ্যাধিক্য ছিল, সেখানে কংগ্রেসের উপরোক্ত দাবি গৃহীত হয়েছিল, এবং ভাইসরয় কর্তৃক তার প্রত্যাখ্যান এদের পক্ষে সংঘর্ষ অথবা পদত্যাগ অবশ্যম্ভাবী করে দিয়েছিল। সাধারণ জনতার মধ্যে বৃটিশশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করার ইচ্ছাই ছিল প্রবল। কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি অবশ্য যতদূর সম্ভব এই চরমপন্থা এড়াবার চেষ্টা করে এবং যতটা সম্ভব ধীরপন্থা অবলম্বন করেছিল। এই সময় একটা সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে, বৃটিশ সরকার খুব সহজেই ভারতবাসীর মতামত জানতে পারত। কিন্তু সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল জয় সুনিশ্চিত জেনেই বৃটিশ সরকার তা এড়িয়ে গিয়েছিল।

ভারতের দুটো বড় বড় প্রদেশ, বাঙলা ও পাঞ্জাব, এবং একটি ছোট প্রদেশ সিন্ধুতে, মন্ত্রীমণ্ডলী পদত্যাগ করেনি। বাঙলা এবং পাঞ্জাব—উভয় প্রদেশেই গভর্নর ও ঊর্ধ্বতন রাজকর্মচারীরা বরাবর নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী শাসন চালাত; সুতরাং এখানে মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে তাদের বিরোধের সম্ভাবনা ছিল না। কিছুদিন পরে অবশ্য বাঙলার গভর্নরের সঙ্গে তার প্রধানমন্ত্রীর মতবিরোধ হয়, ফলে সেখানকার মন্ত্রীসভাকেও পদ-ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। আরও পরে সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী বৃটিশ সরকারের অনুসৃত নীতির প্রতিবাদ করে ভাইসরয়কে একটি চিঠি লেখেন, এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত সম্মান প্রত্যাখ্যান করেন। অবশ্য তিনি প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করেননি; কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ধরনের প্রতিবাদমূলক চিঠিতে ভাইসরয়ের পদমর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে মনে করে ভাইসরয়ের নির্দেশ অনুযায়ী গভর্নর কর্তৃক তিনি পদচ্যুত হন।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীর পদত্যাগের পর প্রায় পাঁচ বছর কেটে গেছে। এই পাঁচ বছরে প্রদেশে প্রদেশে গভর্নররা পুরোদমে তাদের ব্যক্তিগত 'রাজ' প্রতিষ্ঠা করে-ছিল, এবং যুদ্ধের অনিশ্চিত অবস্থার সুযোগে ভারতে আমাদের উপর উনিশ শতকের চরম স্বেচ্ছাচারিতা প্রবর্তন করেছিল। সরকারী আমলা ও পুলিশ—এরাই ছিল দেশের সর্বেসর্বা। বৃটিশের এই নির্মম দমননীতির পরিচালনায় এই সমস্ত আমলা ও পুলিশের মধ্যে ভারতীয় বা শ্বেতাঙ্গ যে কেউ সামান্যতম শৈথিল্যও দেখাত, তাদের উপর শাসকবর্গ চরম অসন্তোষ প্রকাশ করত। কংগ্রেসী সরকারগুলি তাদের মন্ত্রিত্বের আমলে যে সমস্ত সংস্কার ও উন্নতির পরিকল্পনার প্রবর্তন করেছিল, সে সমস্ত বন্ধ হয়ে গেল। অবশ্য, কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী কর্তৃক যে কয়েকটি কৃষিবিষয়ক আইন চালু হয়েছিল, সেগুলি থেকে গেল, যদিচ কৃষিস্বার্থের বিরোধী বলেই অনেক সময়ে সেগুলির পরিচয় দেওয়া হত।

গত দুবছরে আসাম, উড়িষ্যা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মন্ত্রীসভাগুলি পুনর্গঠন করা হয়েছিল। এর জন্য বৃটিশ শাসকবর্গ খুব সহজ একটা উপায়ের আশ্রয় নিয়েছিল। আইনসভার অনেক সভ্যকে গ্রেপ্তার করা হয়, যার ফলে সংখ্যালঘিষ্ঠদল সহজেই আইন-সভাগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে; এবং এই উপায়ে আসলে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের সাহায্যেই এই নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়। বাঙলার মন্ত্রীসভার অস্তিত্ব ইউরোপীয় দলের সমর্থনের উপর নির্ভর করত। উড়িষ্যার এই মন্ত্রীসভা বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি এবং কিছুদিন পরে সেখানে গভর্নরের একক ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মন্ত্রী-সভার পিছনে আইনসভার বেশির ভাগ সদস্যের সমর্থন ছিল না; সুতরাং আইনসভার কোনো অধিবেশন এড়িয়ে চলে তারা তাদের মন্ত্রিত্ব বজায় রেখেছিল। পাঞ্জাব এবং সিন্ধুতে আইনসভার কংগ্রেসী সদস্যদের উপর (যারা তখনও জেলের বাইরে ছিল) নানারকম নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী হয়, যার ফলে তাঁদের পক্ষে আইনসভার অধিবেশনে যোগ দেওয়া বা জনসাধারণের মধ্যে কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।*

৪ : কংগ্রেসের নূতন প্রস্তাব : ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যান মিস্টার উইনস্টন চার্চিল

ভারতের আটটি প্রদেশে গভর্নররাজের স্বেচ্ছাচারিতার প্রবর্তন মন্ত্রীমণ্ডলীর পরি-বর্তনে যা হয়ে থাকে, সেরূপ শাসনব্যবস্থার উপরের স্তরে কর্মীদের একটা অদলবদল, শুধু তাই নয়, এটা ভারতের সমগ্র রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার ভাবধারা, নীতি ও কর্মপন্থার মধ্যে একটা ব্যাপক ও মূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। সরকারী আমলা ও রাজকর্ম-চারীদের উপর এযাবৎ আইনসভা ও অন্যান্য বিভিন্ন উপায়ে জনগণের যে সর্বতো-বাঞ্ছনীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা অপসারিত হল। সঙ্গে সঙ্গে গভর্নর থেকে শুরু করে আমলা পুলিশ প্রভৃতি সকলেরই জনসাধারণের প্রতি ব্যবহারে একটা তার-তম্য দেখা দিল। কংগ্রেসী মন্ত্রিত্ব গঠিত হবার আগে যে অবস্থা ছিল, শুধু যে সেটাই ফিরে এল, তাই নয়—অবস্থার আরও অবনতি হল। তথাকথিত আইনের ভাষায় উনিশ শতকের সেই উচ্ছৃংখল ও দায়িত্বহীন চরম স্বেচ্ছাচারিতাই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। কার্যত শাসন আরও নির্মম হয়ে উঠল কারণ সুপ্রতিষ্ঠিত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আগেকার দিনের সে আত্মবিশ্বাস অথবা মমত্ববোধ আর ছিল না এবং দীর্ঘদিনের

* ১৯৪৫ সালের প্রথম দিকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বাজেট পাশ করবার জন্য আইনসভার একটা অধিবেশন ডাকতে মন্ত্রীসভা বাধ্য হয়েছিল। এই অধিবেশনে মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে একটা অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবে মন্ত্রীসভা ভোটে পরাজিত হয়ে পদত্যাগ করে। এরপর ডক্টর খাঁ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে আবার কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত হয়।

কায়েমীস্বার্থের আসন্ন ধ্বংসের আশঙ্কায় বৃটিশ শাসকবর্গ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল, কংগ্রেস মন্ত্রিত্বের সোয়া দুই বছরের কার্যকলাপ তাদের পক্ষে সহ্য করা কঠিন হয়েছিল। আগে যাদের কথায় কথায় অনায়াসে গ্রেপ্তার করা যেত, তাদেরই নীতি ও আদেশ পালন করে যাওয়া তাদের পক্ষে খুব সহজ ছিল না। সুতরাং এখন তারা যে শুধু পুরানো ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য আগ্রহান্বিত হল তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত "শান্তিভঙ্গকারীদের"ও উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল। দুবছরের কংগ্রেসী শাসনব্যবস্থায় গ্রামের চাষী, কারখানার মজুর, কারিগর, দোকানদার, শিল্পপতি, সরকারী চাকুরে, মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী, স্কুল-কলেজের তরুণ ছাত্রছাত্রী এমনকি উচ্চ রাজকর্মচারী পর্যন্ত—যে কেউ লোকপ্রিয় গভর্নমেন্টগুলির প্রতি সামান্য উৎসাহের পরিচয় দিয়েছে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া চাই যে সর্বশক্তিমান বৃটিশরাজ আজও বিদ্যমান এবং তার ক্ষমতা আজও অপ্রতিহত। তাদের ভবিষ্যৎ, তাদের সমস্ত উন্নতির সম্ভাবনা বৃটিশরাজই বিচার করবে—এই সাময়িক অনধিকার-প্রবেশকারী নয়। কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বের যারা সেক্রেটারী ছিল, তারাই এখন গভর্নরের আশ্রয়ে পুরানো দিনের কর্তৃত্ব শুরু করল। এবং তাদের চিরন্তন দাম্ভিক চালচলন ফিরে এল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরা আবার তাদের নিজ নিজ জেলার হর্তাকর্তা-বিধাতা হয়ে উঠল; এবং পুলিশের পক্ষে পুরাতন অভ্যাসগুলি কায়েমী করা সহজ হয়ে গেল কারণ তারা জানত যে তারা দুর্ব্যবহার করলেও তাদের পিছনে সহায় ও শক্তির আর অভাব হবে না। যুদ্ধের কুয়াশাপূর্ণ পরিস্থিতিতে সব কিছুই ঢাকা পড়ে যাবে।

কংগ্রেস সরকারের যারা সমালোচক ছিল এই পরিস্থিতিতে তারা পর্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠল। কংগ্রেসী সরকারের গুণগুলি এখন তাদের মনে পড়তে লাগল, পদত্যাগের ব্যাপারে তারা বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল। তাদের মতে ফলাফল যাই হোক না কেন কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীগুলির টিকে থাকা উচিত ছিল। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, এমনকি মুসলিম লীগের সভ্যবৃন্দও উপস্থিত পরিস্থিতিতে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অকংগ্রেসী জনসাধারণ ও কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীর সমালোচকদের মধ্যেই এই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। সুতরাং কংগ্রেসের লক্ষ লক্ষ সভ্য ও সমর্থক এবং আইনসভার সদস্যদের মধ্যে যে কি বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা খুব সহজেই অনুমান করা যায়। মন্ত্রীরা মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করেছিল বটে; কিন্তু তারা অথবা স্পীকার অথবা সভ্যরা কেউই আইনসভা থেকে পদত্যাগ করেনি, তা সত্ত্বেও তাদের সম্পূর্ণ অবহেলা করে সরিয়ে রাখা হল এবং কোনো নূতন নির্বাচন প্রবর্তিত হল না। গোঁড়া নিয়মতান্ত্রিক দিক থেকে দেখলেও এটা বরদাস্ত করা শক্ত এবং এ অবস্থা যে কোনো দেশেই একটা বিরাট সংকটের সৃষ্টি করত। সুতরাং দীর্ঘদিনের নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা-সংগ্রামের ঐতিহ্য যারা বহন করে চলেছে, সেই শক্তিশালী প্রায় বিপ্লবী সংগঠন জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে বিনা প্রতিবাদে এক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত এই স্বেচ্ছাচারী শাসন মেনে নেওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল। নির্লিপ্ত দর্শকের মত ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করা কংগ্রেসের পক্ষে অসম্ভব ছিল, বিশেষত তার নিজের বিরুদ্ধেই

যখন এই আক্রমণ। ভারত সম্পর্কে বৃটিশের সমগ্র নীতি, বিশেষ করে আইনসভা ও সকল রকমের জন-আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করেছিল, তার বিরুদ্ধে অবিলম্বে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলবার জন্য কংগ্রেসের ভিতর থেকে ক্রমবর্ধমান দাবি উঠতে থাকে।

যুদ্ধ সম্পর্কে তাদের লক্ষ্য এবং ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্বন্ধে বৃটিশ সরকারের নীরবতায়, কংগ্রেস ঘোষণা করল : 'আমাদের দাবির যে জবাব আমরা পেয়েছি তা মোটেই সন্তোষজনক নয়; বৃটিশ সরকার প্রধান এবং মূল সমস্যা এড়িয়ে গিয়ে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে...কমিটির মতে বৃটিশ সরকারের বর্তমান নীতির একমাত্র অর্থ হল এই যে তারা খোলাখুলিভাবে তাদের যুদ্ধনীতি এবং ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন সম্পর্কে কিছু ঘোষণা করতে নারাজ। সেই কারণে মূল সমস্যা চাপা দিয়ে তারা তুচ্ছ বিষয়ে অযথা গুরুত্ব আরোপ করছে। আসলে এটা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাহায্যে ভারতে তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব বজায় রাখার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। যুদ্ধের সংকট এবং সেই সংশ্লিষ্ট সমস্ত সমস্যাগুলিকে কংগ্রেস সম্পূর্ণ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই বিচারের চেষ্টা করেছে। এই সংকটের সুযোগ নিয়ে কোনো সুবিধা আদায় করা কংগ্রেসের অভিপ্রায় নয়। কারণ যুদ্ধের লক্ষ্য এবং ভারতের স্বাধীনতা—এই দুটো মূল ও নৈতিক সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোনো কিছুর আলোচনা হতে পারে না। জনসাধারণের প্রতিনিধিদের হাতে সত্যিকারের ক্ষমতা না আসা পর্যন্ত কংগ্রেস কোনো অবস্থাতেই এমনকি সাময়িকভাবেও, শাসনব্যবস্থার কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ অপারগ।'

এই প্রস্তাবে কংগ্রেস আরও বলে যে বৃটিশ সরকার যেসব ঘোষণা করেছে, তার সঙ্গে কংগ্রেস একমত হতে পারেনি। সুতরাং বৃটিশ অনুসৃত নীতির থেকে নিজেদের পৃথক রাখতে কংগ্রেস বাধ্য হয়েছে; এবং বৃটিশের নীতির প্রতি অসহযোগিতার প্রথম ধাপ হিসাবে প্রদেশে প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীর পদত্যাগ করানো হয়েছে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই অসহযোগিতা চলে আসছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত বৃটিশ সরকার তার অনুসৃত নীতির পরিবর্তন না করে, ততক্ষণ এই অসহযোগিতা চলবে। 'এই সঙ্গে কার্যকরী সমিতি অবশ্য কংগ্রেস-সভ্যদের একথাও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, বিরুদ্ধ-পক্ষের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সম্মানজনক আপোষের আপ্রাণ চেষ্টা যে কোনো ধরনের সত্যাগ্রহেই অন্তর্নিহিত...সুতরাং ব্রিটিশ সরকার যদিচ আমাদের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, তবু কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি তাদের সঙ্গে সম্মানজনক মীমাংসার উপায় উদ্ভাবন করার জন্য চেষ্টা করতে থাকবে।'

দেশের মধ্যে তখন বিরাট উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল এবং বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে হিংসাত্মক কর্মপন্থা গ্রহণের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, সেজন্য দেশবাসীকে কংগ্রেস তার অহিংসনীতির কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল এবং অহিংসনীতি থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি সম্বন্ধে সতর্ক করেছিল। কোনো আইন-অমান্য আন্দোলন যদিই বা প্রবর্তিত হয়, তাহলে সে-আন্দোলন শান্তিপূর্ণ রাখতে হবে—এই ছিল কংগ্রেসের

নির্দেশ। 'কারণ সকলের, বিশেষভাবে বিরুদ্ধ পক্ষের হিতকামনা করা—সত্যাগ্রহের মূল কথাই এই।' অবশ্য অহিংসানীতির এই উল্লেখের সঙ্গে বহিরাক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা বা যুদ্ধ পরিচালনার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। শুধু বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার জন্য যে কোনো সংগ্রামের দিক থেকেই এই অহিংসনীতির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল।

এটা ছিল সেই কয়েকমাস যখন পোল্যান্ড বিধ্বস্ত হবার পর থেকে ইউরোপের যুদ্ধ নিশ্চল অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল। এই কয়েকমাসের যুদ্ধকে তথাকথিত 'মেকিযুদ্ধ' বলে অভিহিত করা হত। ভারতের সাধারণ নরনারীর কাছে, আর বিশেষভাবে, একমাত্র রসদসামগ্রীর ব্যাপার ছাড়া, ভারতের বৃটিশ শাসকদের কাছেও যুদ্ধ একটা নিতান্ত দূরবর্তী ঘটনা ছাড়া আর কিছু ছিল না। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তখন, এবং জার্মানী কর্তৃক ১৯৪১ সালের জুন মাসে রুশিয়া আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত, এই যুদ্ধে বৃটিশ যুদ্ধপ্রচেষ্টার সঙ্গে সম্পূর্ণ অসহযোগিতার নীতিই অনুসরণ করেছিল। তাদের সংগঠন তখন পর্যন্ত ছিল বেআইনী এবং তরুণদের কয়েকটি ছোটখাট দলের মধ্যেই তাদের প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যেকোনো প্রচলিত সাময়িক মনোভাবকে কমিউনিস্টরা যেহেতু খুব জোরালো ভাষায় প্রকাশ করতে পারত, সেই কারণে তারা এক ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টিকারী দলে পরিণত হয়েছিল।

এই সময়ে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলির সাধারণ নির্বাচন করা মোটেই কঠিন ছিল না; কারণ যুদ্ধ তার কোনো প্রতিবন্ধক ছিল না। এই সাধারণ নির্বাচন ঘোলাটে আবহাওয়া পরিষ্কার করে দেশের যা আসল অবস্থা তাকেই সকলের সামনে তুলে ধরতে পারত। কিন্তু বৃটিশ সরকারেরও আসল ভয় ছিল এখানেই। তারা বিভিন্ন দলের প্রভাব সম্বন্ধে যে সমস্ত অবাস্তব যুক্তিতর্কের অবতারণা করে আসছিল, সাধারণ নির্বাচন হলে সেগুলির সমাপ্তি ঘটত। কিন্তু ঠিক এই জন্যই এই সময়ে সমস্ত নির্বাচনই চাপা দেওয়া হয়েছিল। প্রদেশে প্রদেশে যথাপূর্ব নিরঙ্কুশ গভর্নররাজ চলতে থাকল; অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে মাত্র তিনবছরের জন্য যে কেন্দ্রীয় আইনসভা নির্বাচিত হয়েছিল তার অস্তিত্বও প্রায় দশবছর হতে চলল। এমনকি ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধবার সময়েই কেন্দ্রীয় আইনসভা ছিল অতি-প্রাচীন এবং তার মেয়াদ দুবছর উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বছরের পর বছর মেয়াদ বাড়িয়ে কৃত্রিম উপায়ে এর আয়ুবৃদ্ধি করা হচ্ছিল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সভ্যরাও ক্রমশ প্রবীণতা লাভ করছিলেন—কেউ কেউ মৃত্যুমুখেও পতিত হন। এমনকি শেষকালে এর নির্বাচনের কথাই সকলে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। নির্বাচন ব্যাপারটাই বৃটিশ সরকার অপছন্দ করত; কারণ নির্বাচন শাসনব্যবস্থার বাঁধা নিয়মে ব্যাঘাত ঘটায় এবং বিভিন্ন দল ও মতের মধ্যে অবিরাম হিংস্র সংঘর্ষে পরিপূর্ণ ভারতের যে চিত্র তারা আঁকত—সে চিত্রকেও ঝাপসা করে দেয়। যে কোনো ব্যক্তি বা দল তাদের সুনজরের উপযুক্ত বিবেচিত হত, নির্বাচন ব্যাপারটা না থাকলে, সেসব ব্যক্তি বা দলের উপর গুরুত্ব আরোপ করা বৃটিশ সরকারের পক্ষে সহজ হত। সমগ্র দেশ, বিশেষভাবে যে সমস্ত প্রদেশে গভর্নররাজ

প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেখানে অবস্থা চূড়ান্তে এসে ঠেকেছিল। স্বাভাবিক কাজকর্মের জন্য অনেক কংগ্রেসকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছিল। ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের সুনজরে পড়বার জন্য পুলিশ এবং সরকারী ক্ষুদে আমলারা কৃষকদের উপর যুদ্ধপ্রচেষ্টার নামে প্রচণ্ড জুলুম শুরু করেছিল; কৃষকরা তাদের দৌরাত্ম্য থেকে রেহাই পাবার জন্য তীব্র আর্তনাদ করছিল। এই অসহ্য অবস্থার প্রতিকারকল্পে সক্রিয়ভাবে কিছু করার দাবি ক্রমশই তীব্রতর হয়ে উঠল। সুতরাং ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে রামগড়ে যে বার্ষিক সম্মেলন হয়, তাতে কংগ্রেস একমাত্র পথ হিসাবে আইন-অমান্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরও কংগ্রেস তখনই সক্রিয়ভাবে আন্দোলন শুরু করেনি—শুধুমাত্র জনসাধারণকে প্রস্তুত হতে আহ্বান করেছিল।

ভারতের আভ্যন্তরিক সঙ্কটের তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে লাগল, এবং সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। যুদ্ধ পরিচালনার অজুহাতে 'ভারত রক্ষা আইন' জারী করে তার সাহায্যে স্বাভাবিক আন্দোলন দমন করা এবং অসংখ্য নরনারীকে গ্রেপ্তার ও অনেককে বিনা-বিচারে বন্দী করা হতে লাগল।

ইতিমধ্যে ইউরোপে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে হঠাৎ একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটার ফলে ডেনমার্ক ও নরওয়ে আক্রমণ এবং অল্প কিছুদিন পরে ফ্রান্সের বিস্ময়কর পতন হওয়াতে জনসাধারণের মনে গভীর রেখাপাত করে। লোকের উপর এর প্রতিক্রিয়া স্বভাবতই হয়েছিল বিভিন্ন রকমের, কিন্তু ফ্রান্সের প্রতি, এবং ডান্‌কার্ক পতনের পর ইংলন্ডের উপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের কালে ইংলন্ডের প্রতি সকলেরই একটা গভীর সহানুভূতি হয়েছিল। কংগ্রেস তখন আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করার মুখে কিন্তু ইংলন্ডের নিজের অস্তিত্বই যখন বিপন্ন এসময়ে এই আন্দোলন শুরু করার কথা কংগ্রেসের পক্ষে চিন্তা করা অসম্ভব। অবশ্য এমন অনেক লোক ছিল যারা ভাবত যে ইংলন্ডের দুর্দশা ও বিপন্ন অবস্থাই ভারতের পক্ষে এক সুযোগ বিশেষ। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ইংলন্ডের এই সর্বনাশা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সুবিধা আদায় করার বিরোধী ছিলেন এবং তাঁরা প্রকাশ্যে এই মত ব্যক্ত করেছিলেন। সুতরাং আপাতত আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখা হল।

এই সময়ে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আপোষ মীমাংসার আর একটা চেষ্টা কংগ্রেস করেছিল। আগের বার ভারতবর্ষের সমস্যা ছাড়াও কংগ্রেস বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে যুদ্ধনীতি ও যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাপক ঘোষণা দাবি করেছিল; কিন্তু এবার শুধু সংক্ষেপে ভারত সম্পর্কেই দাবি করা হল। ভারতের স্বাধীনতার স্বীকৃতি, এবং কেন্দ্রে জাতীয় সরকার গঠন—যার জন্য অবশ্য বিভিন্ন দলের সহযোগিতা প্রয়োজন—মোটামুটি এই ছিল কংগ্রেসের এবারকার দাবি। এই অবস্থায় বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক নূতন কোনো শাসন সংস্কারমূলক আইন পাশ করাবার পরিকল্পনা করা হয়নি। বর্তমান আইনের কাঠামোর মধ্যে ভাইসরয় কর্তৃক জাতীয় সরকার গঠিত হোক—এই ছিল প্রস্তাব। এই পরিবর্তনের গুরুত্ব যথেষ্ট থাকলেও আপোষ ও পারস্পরিক চুক্তি

দ্বারা সেগুলি প্রবর্তন করা যেতে পারত। অবশ্য, এর পর শাসনতান্ত্রিক ও বিধিসঙ্গত আইন প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তাও নিশ্চয়ই ছিল; ভারতের স্বাধীনতা একবার স্বীকৃত হলে এসব পরিস্থিতির উন্নতি ও বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষায় স্থগিত রাখা যেত। এরূপ সর্তেই কংগ্রেস সহযোগিতা দানের প্রস্তাব করে।

শ্রীরাজাগোপালাচারীর উদ্যোগে কংগ্রেস থেকে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরে আমরা যে দাবি করে আসছিলাম এবং কংগ্রেস থেকে বারবার যা ঘোষণা করা হয়েছিল, এই প্রস্তাব তার তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত। এই প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ কার্যে পরিণত করায় আইনগত কোনো অসুবিধা ছিল না। এই প্রস্তাবে ভারতের অন্যান্য সংস্থা ও দলেরও দাবি মেটাবার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল; কারণ জাতীয় সরকার সকল দলের প্রতিনিধি-দের নিয়েই গঠিত হত। এমনকি ভারতে বৃটিশ সরকারের অস্তিত্বের অদ্ভুত পরিস্থিতি পর্যন্ত বিবেচনা করা হয়েছিল। ভাইসরয়ের অস্তিত্ব বজায় থাকতে পারে এই সর্তে যে জাতীয় সরকারের কোনো সিদ্ধান্ত ভাইসরয় নাকচ করবেন না। অবশ্য সমগ্র শাসন-ব্যবস্থার নেতা হিসাবে সরকারের যাবতীয় কাজকর্মের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকবে এটা আমরা ধরে নিয়েছিলাম। সমগ্র যুদ্ধ ব্যবস্থা আগের মতই প্রধান সেনা-পতির কর্তৃত্বাধীনে রইল এবং বৃটিশ সরকারের তৈরি জটিল আমলাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাও বজায় রইল। মুখ্যত, প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে সমগ্র শাসনব্যবস্থার মধ্যে প্রবর্তিত হত একটা নূতন মনোভাব, একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও তেজস্বিতা, এবং যুদ্ধপ্রচেষ্টার ও দেশের বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধানে জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা মিলত। যুদ্ধের পরে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকৃতির ঘোষণা এবং উপস্থিত এইসব পরিবর্তন ভারতে এক নূতন মানসিক পটভূমিকা সৃষ্টি করত, যার ফলে আসত যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ সহযোগিতা।

অতীতের সমস্ত ঘোষণা ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই ধরনের প্রস্তাব উত্থাপন করা খুব সহজ ছিল না, আমাদের মনে হয়েছিল যে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সরকার হয়তো বিশেষ কার্যকরী হবে না, খানিকটা অসহায় অবস্থাতেই থাকবে। কংগ্রেস মহলে এই প্রস্তাবের প্রতি যথেষ্ট বিরোধিতা ছিল, এবং আমি নিজেও বহু উদ্বিগ্ন আলাপ আলোচনা ও চিন্তার পরেই এই প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পেরেছিলাম। সমসাময়িক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিচার বিশ্লেষণই আমার সম্মতির মূল কারণ ছিল। আমার মতে সম্পূর্ণ আত্মসম্মান বজায় রেখে, সম্ভব হলে, এই ফ্যাসিস্ট ও নাৎসী আক্রমণ প্রতিরোধের সংগ্রামে আমাদের সক্রিয় অংশ নেওয়া উচিত।

কিন্তু আমাদের কাছে সবচেয়ে মুশকিলের ব্যাপার হয়ে উঠল গান্ধীজির বিরোধিতা। শান্তিনীতির আদর্শের দিক থেকেই তিনি আমাদের প্রস্তাব পুরোপুরি সমর্থন করতে পারছিলেন না। যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহযোগিতার জন্য আমরা এর আগে যে প্রস্তাব নিয়ে-ছিলাম, ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও তাতে তিনি আপত্তি করেননি। যুদ্ধের প্রায় প্রারম্ভে তিনি ভাইসরয়কে বলেছিলেন যে কংগ্রেস শুধু নৈতিক সহযোগিতা করতে সমর্থ।

কিন্তু গান্ধীজির এই নীতি পরবর্তী সময়ে ঘোষিত কংগ্রেসনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এবার তাঁর বিরোধিতা তীব্র রূপ গ্রহণ করেছিল। কংগ্রেসের এই হিংসাত্মক যুদ্ধপ্রচেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করার বিরুদ্ধে গান্ধীজি এখন স্পষ্টভাবে আপত্তি করলেন। এবিষয়ে তাঁর মত এত দৃঢ় ছিল যে শেষ পর্যন্ত সহকর্মী ও কংগ্রেস সংগঠনের সঙ্গেই তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে। তাঁর সঙ্গে এই বিচ্ছেদ তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের কাছেই চরম বেদনাদায়ক হয়েছিল—আজকের এই কংগ্রেস তো তাঁরই সৃষ্টি। কিন্তু সংগঠন হিসাবে কংগ্রেস যুদ্ধসম্পর্কে তাঁর অহিংসনীতির প্রয়োগ সমর্থন করতে পারেনি, বৃটিশ সরকারের সঙ্গে একটা আপোষমীমাংসা করবার আগ্রহে কংগ্রেস তাদের পরম শ্রদ্ধেয় ও প্রিয়তম নেতার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটতে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

সব দিক থেকে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটছিল। রাজনৈতিক দিক থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধের অবস্থার সুযোগে কিছু কিছু লোকের সুবিধা হলেও, অর্থনৈতিক দিক থেকেও অসংখ্য কৃষক ও শ্রমিকের জীবন দুর্দশার চরম সীমায় গিয়ে ঠেকেছিল। এই অবস্থায় আসলে অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল একমাত্র মুনাফাখোর, যুদ্ধের ঠিকাদার এবং সরকার কর্তৃক কল্পনাতীত বেতনে নিযুক্ত কর্মচারীদের এবং শেষোক্ত বেশির ভাগই শ্বেতাঙ্গ। এবিষয়ে সরকারের ধারণা ছিল এই যে শুধুমাত্র অতিরিক্ত মুনাফার লোভই যুদ্ধপ্রচেষ্টার পূর্ণ সাফল্য আনতে সক্ষম। সরকারী ব্যবস্থায় রন্ধ্রে রন্ধ্রে উৎকোচগ্রহণের অভ্যাস ও স্বজনপ্রিয়তা নগ্নরূপ ধারণ করেছিল, জনসাধারণের তরফ থেকে যার কোনো প্রতিবন্ধক ছিল না। জনসাধারণের তরফ থেকে যে কোনো সমালোচনাই যুদ্ধপ্রচেষ্টার পক্ষে ক্ষতিকর বলে গণ্য হত এবং ভারত রক্ষা আইনের সর্বব্যাপী ক্ষমতার জোরে সমস্ত সমালোচনা কঠোরভাবে দমন করা হত। দৃশ্যটা নিতান্ত নৈরাশ্যজনক।

এই উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই বিশেষ করে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সম্মানজনক মীমাংসার একটা শেষ চেষ্টা আমরা করেছিলাম। কিন্তু মীমাংসার সাফল্যের সম্ভাবনা খুব যে ছিল, তা নয়। বিগত দুই পুরুষ ধরে তারা যা পায়নি, এখন সকলরকম নিয়ন্ত্রণ ও সমালোচনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে স্থায়ী সরকারী শাসনতান্ত্রিক সংগঠন যথেচ্ছাচারের পূর্ণ স্বাধীনতালাভ করেছে। মনঃপূত নয়, এরকম যে কোনো লোককে তারা তাদের খুশিমত গ্রেপ্তার এবং বিচার বা বিনাবিচারে বন্দী করে রাখতে পারে। প্রদেশে প্রদেশে গভর্নররা এখন সমগ্র প্রদেশের সীমাহীন ক্ষমতাশালী সর্বময় কর্তা। সুতরাং নিতান্ত বাধ্য না হলে কেন তারা অবস্থার কোনো পরিবর্তনে রাজী হবে? সমগ্র সাম্রাজ্যতান্ত্রিক কাঠামোর সর্বোচ্চ স্থানে উপযুক্ত আড়ম্বর ও সমারোহের মধ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন ভাইসরয়—লর্ড লিন্‌লিথগো! দৃঢ়াবয়ব ও শ্লথচিত্ত, পাহাড়ের মত কঠিন—নিশ্চল পাহাড়ের মতই পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে কৌতূহলবিহীন, পুরানো গোঁড়া বৃটিশ আভিজাত্যের দোষগুণযুক্ত লর্ড লিন্‌লিথগো এই জটিল অবস্থার সমাধানের একটা পথ খুঁজতে যথার্থ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মানসিক পরিধি ছিল নিতান্ত সংকীর্ণ,

একেবারে আশাহীন ছিলাম না। বৃটিশ সরকার অবশ্য এই প্রস্তাবের উত্তর দিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করেনি। তারা আমাদের সমগ্র প্রস্তাবটা পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করল এবং সে উত্তর এমনভাবে দেওয়া হল যাতে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবার কোনো ইচ্ছাই তাদের নেই।

আমাদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি ও সকলরকম মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা ও চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বৃদ্ধি করার কাজেই তারা আত্মনিয়োগ করল। ভারতে তাদের সাম্রাজ্যবাদী দখল ঢিলে করার চেয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ভারতের সর্বনাশই তাদের কাছে বেশি কাম্য বলে বোধ হল। এই ধরনের প্রত্যুত্তর ও ব্যবহারে যদিচ আমরা এতদিনে প্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, তবু এই প্রত্যাখ্যান আমাদের রূঢ় আঘাত দিল এবং ক্রমেই একটা নিষ্ফলতার অনুভূতি গাঢ় হয়ে উঠল। আমার মনে আছে, এই সময় আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম, যার শিরোনামা ছিল—'পথ বিচ্ছেদ।' দীর্ঘদিন থেকে ভারতের স্বাধীনতার কথা আমি ভেবে এসেছি। জাতি হিসাবে আমাদের অগ্রগতি ও উন্নতি অথবা ইংলন্ডের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ স্বাভাবিক সহযোগিতা স্থাপনে—এই স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না; কিন্তু তবুও আমি ধরে নিয়েছিলাম যে উপস্থিত অবস্থাতেও ইংলন্ডের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভবপর। আজ আমি হঠাৎ বুঝতে পারলাম যে ইংলন্ডের নিজের আমূলে পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে আমাদের এক পথে চলা অসম্ভব। আমাদের গতিপথ ভিন্ন।

৫ : ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ

সুতরাং স্বাধীনতালাভের যে চিন্তা আমাদের মধ্যে অপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করত, এবং আমাদের সকলের কর্মপ্রেরণা জাগ্রত করে এই বিশ্বযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারত, তার থেকে আমরা বঞ্চিত রইলাম, স্বাধীনতার এই অস্বীকৃতি সমগ্র জাতিকে নৈরাশ্যের তীব্র বেদনায় আচ্ছন্ন করল। নিজেদের শাসন ও নীতির আত্মপ্রশংসায় মুখর বৃটিশ সরকার অত্যন্ত ধৃষ্টতার সঙ্গে আমাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করে, ভারতের স্বাধীনতালাভের প্রস্তুতি হিসাবে কতকগুলি অসম্ভব এবং অবাস্তব সর্ত আরোপ করল। পরিষ্কার বোঝা গেল যে ইংলন্ডের পার্লামেন্টে এই বিষয় নিয়ে যে সমস্ত বড় বড় উক্তি ও ক্লেশকর যুক্তিতর্কের অবতারণা হয়েছিল, সেগুলি আসলে রাজনৈতিক চালবাজী—তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য যতদিন পারা যায় ভারতে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব ও শোষণ বজায় রাখা। সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র ও ক্রূর নখরে ভারতের হৃৎপিন্ড ছিন্নভিন্ন হতেই থাকবে। এই হল সেই আন্তর্জাতিক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নমুনা—যা রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করছি বলে বৃটেন দাবি করে।

অবশ্য এ ছাড়া আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ আমরা পেয়েছিলাম। আমাদের প্রতিবেশী বর্মা যুদ্ধপরবর্তী কালে ডোমিনিয়ন স্টেটাস পাওয়ার জন্য নম্র দাবি করেছিল। প্রশান্ত মহাসাগর তখনও যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে ওঠেনি, যুদ্ধকালীন অবস্থার মধ্যে

কোনো ওলটপালট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, কারণ যুদ্ধ শেষ হবার পরেই এর কার্যকরিতা বর্মা চেয়েছিল। তারা পূর্ণস্বাধীনতার দাবিও করেনি, তারা চেয়েছিল শুধু ডোমিনিয়ন স্টেটাস। ভারতের অনুরূপ বর্মাকেও বহুবার শোনানো হয়েছিল যে ডোমিনিয়ন স্টেটাসই বৃটিশ নীতির মূল লক্ষ্য। ভারত ও বর্মার অবস্থার পার্থক্য ছিল; বৃটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতার দাবি উপেক্ষা করবার জন্য যেসব বাস্তব ও অবাস্তব যুক্তিতর্কের অবতারণা করত, ভারতের চেয়ে অনেক বেশি সমমাত্রিক বর্মার ক্ষেত্রে তার কোনোটাই খাটে না। তা সত্ত্বেও বর্মার এই সর্বসম্মত স্বল্প দাবিও বৃটিশ সরকার প্রত্যাখ্যান করল—এবং এবিষয়ে কোনো আশ্বাস পর্যন্ত দিতে তারা রাজী হল না। ডোমিনিয়ন স্টেটাস যে এখনকারই কোনো ব্যাপার নয়, সুদূর ভবিষ্যতে পরবর্তী কোনো যুগে এবং অন্য কোনো পৃথিবীতে অর্জনযোগ্য একটা অস্পষ্ট আধ্যাত্মিক কল্পনা এবং নিঃসার অঙ্গীকার মাত্র। আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবহারযোগ্য এবং ফাঁকা বুলি ছাড়া এর সঙ্গে বর্তমান বা অদূর ভবিষ্যতের কোনো সম্পর্ক নেই বলে মিস্টার উইনস্টন চার্চিল যে ইঙ্গিত করেছিলেন, আসলে সেটাই সত্য। ভারতের স্বাধীনতার দাবির বিরুদ্ধেও তারা অনুরূপ মিথ্যা যুক্তিতর্কের আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের যুক্তি যে শুধুমাত্র উক্তি, তার পিছনে যে বিন্দুমাত্র বাস্তবতা নেই—একথা সকলের কাছেই পরিষ্কার ছিল। ভারতের উপর বৃটেনের প্রভুত্ব বজায় রাখার দৃঢ় ইচ্ছা এবং এই প্রভুত্ব ভেঙে ফেলার জন্য ভারতের অবিরাম ও অদম্য প্রচেষ্টা—এই ছিল সবচেয়ে বাস্তব ঘটনা। অন্য সব কিছু ছিল অর্থহীন প্রলাপ, আইনজ্ঞের জটিল উক্তি অথবা কূটনীতির চাতুর্য। এই পরস্পরবিরোধী বাস্তব ঘটনাদ্বয়ের অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষের পরিণাম ও ফলাফলের সাক্ষ্য দিতে একমাত্র ভবিষ্যতের ইতিহাসই সক্ষম।

অবশ্য বর্মায় বৃটেনের এই সর্বনাশা নীতির পরিণাম ফলতে বেশিদিন লাগেনি। ভারতেও বৃটিশ নীতির ভবিষ্যৎ আস্তে আস্তে সংগ্রাম, তিক্ততা ও লাঞ্ছনার ইতিহাস গড়ে তুলছিল।

বৃটিশ সরকারের অবজ্ঞাসূচক ধৃষ্ট প্রত্যাখ্যানের পর ভারতবর্ষে ঘটনাপ্রবাহ যে ধারায় চলেছিল, তাতে আমাদের পক্ষে নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ ক্রমশই অসম্ভব হয়ে উঠছিল। পৃথিবীর কোটি কোটি নরনারী যখন স্বাধীনতা রক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে অসীম আত্মত্যাগ এবং নির্মম ও ভয়ংকর সংগ্রামে লিপ্ত, তখন যদি বৃটিশ সরকার এই নীতি অনুসরণ করে, তাহলে যখন এই সংকট কাটিয়ে উঠবে, গণশক্তির চাপ যখন কমে আসবে, তখন না জানি বৃটিশ আরও কি সর্বনাশানীতি অনুসরণ করবে! ইতিমধ্যে সমগ্র ভারত থেকে আমাদের লোকজনকে বেছে বেছে গ্রেপ্তার ও বন্দী করা, এবং আমাদের স্বাভাবিক কাজকর্মে ক্রমাগত হস্তক্ষেপ করা ও তা সীমাবদ্ধ করা শুরু হল। এখানে স্মরণযোগ্য এই যে জাতীয় ও শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে ভারতে বৃটিশ সরকারের সংগ্রাম বিরামহীন—তাদের আক্রমণ আইন-অমান্য আন্দোলনের অপেক্ষা রাখে না। এই সংগ্রাম কখনও কখনও তীব্র আকার ধারণ করে সমগ্র জাতির উপর প্রচণ্ড চতুর্মুখী আক্রমণে পরিণত হয়, কখনও বা তাদের আক্রমণের তীব্রতা

হ্রাস পায় কিন্তু এই আক্রমণ কখনও সম্পূর্ণ বিরতি লাভ করে না।* প্রদেশে প্রদেশে যখন কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন এই আক্রমণ সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে এসেছিল মাত্র, কিন্তু তাদের পদত্যাগের পর আবার তা নূতন করে শুরু হল; এবং বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী ও আইনসভার সদস্যদের গ্রেপ্তারের আদেশ দেওয়া ও বন্দী করার মধ্যে আমলাতন্ত্রের যেন একটা অস্বাভাবিক আনন্দ ছিল।

এই অবস্থায় সক্রিয়ভাবে কিছু করা অনিবার্য হয়ে উঠল। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে কিছু না করাটাই অক্ষমতার আসল কারণ হয়ে ওঠে। আমাদের এই সক্রিয় কর্মপন্থা আমাদের দ্বারা স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত নীতি অনুযায়ী একমাত্র আইন-অমান্য আন্দোলনেই রূপায়িত হওয়া সম্ভব ও স্বাভাবিক ছিল। তবুও যাতে এই আন্দোলন একটা গণ আলোড়নে পরিণত না হয় এবং যাতে এটা মনোনীত ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, সেজন্য আমরা বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেছিলাম। আইন-অমান্যের গণ আন্দোলন বলতে যা বোঝায়, এ ছিল তার বিপরীত; এই আন্দোলনকে তখন অভিহিত করা হয়েছিল ব্যক্তিগত আইন-অমান্য আন্দোলন বা ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ বলে। আসলে একটা প্রচণ্ড নৈতিক প্রতিবাদই এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। রাজনীতিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রচলিত শাসনব্যবস্থার মধ্যে একটা ওলটপালট করার উদ্দেশ্য না থাকা এবং শাসকদের পক্ষে 'শান্তিভঙ্গকারী'দের জেলে আটক করার পথ সুগম করে দেওয়া ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিচিত্র। অন্যত্র কোথাও রাজনৈতিক কর্মপন্থা বা বিপ্লব এই পথে পরিচালিত হয়নি। কিন্তু নৈতিক আদর্শের সঙ্গে সমন্বয়যুক্ত এই বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মপন্থা গান্ধীজিরই সৃষ্টি এবং এই ধরনের যে কোনো আন্দোলনের নেতৃত্ব অনিবার্যভাবেই ছিল তাঁর। গান্ধীজি প্রদর্শিত এই পথে আমরা প্রমাণ করেছিলাম যে বৃটিশের কাছে কিছুতেই নতিস্বীকার না করে এবং সমস্ত লাঞ্ছনা ও নির্যাতন স্বেচ্ছায় বরণ করে বৃটিশ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দৃঢ়তা প্রকাশ করা ব্যতিরেকে কোনো বিপর্যয় সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

* অনেক লোক যুদ্ধের আগে থেকেই একটানা কারাজীবন যাপন করছিল। আমার কোনো কোনো তরুণ সহকর্মী একটানা প্রায় ১৫ বছর এই বন্দীজীবন কাটিয়েছে এবং এখনও তারা মুক্ত হয়নি। তাদের যখন প্রথম বন্দী করা হয়, তখন তারা সকলেই কিশোর—সমস্ত যৌবন বন্দী অবস্থায় কাটিয়ে আজ তারা প্রৌঢ় হয়েছে, তাদের মাথার চুল শাদা হয়ে গেছে। যুক্তপ্রদেশের বন্দীশালায় আমার একাধিক কারাজীবনে, তাদের সঙ্গে আমার বারবার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। গ্রেপ্তার হয়ে এসে কিছুদিন কারাজীবন কাটিয়ে আমি আবার মুক্ত হয়ে বাইরে চলে এসেছি। কিন্তু তারা ছিল অনড় ও অচল। যদিচ তারা সকলেই যুক্তপ্রদেশের অধিবাসী ছিল এবং যুক্তপ্রদেশের বন্দীশালাতেই অনেকদিন তারা কাটিয়েছে, কিন্তু তাদের শাস্তি হয়েছিল পাঞ্জাবে এবং পাঞ্জাব সরকারের আদেশেই তারা বন্দী হয়। কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বের আমলে যুক্তপ্রদেশের সরকার তাদের মুক্তির সুপারিশ করেছিল, কিন্তু পাঞ্জাব সরকার তাতে রাজী হয়নি।

ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ প্রথমে খুব একটা সীমাবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। যারা এই আন্দোলনে অংশ নিতে ইচ্ছুক ছিল, তাদের সকলকেই বিশেষভাবে যাচাই করে নেওয়া হত। এবং তাদের সকলেরই অংশগ্রহণ ছিল অনুমতিসাপেক্ষ। মনোনীত ব্যক্তিরা যে কোনো একটা নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে গ্রেপ্তার ও জেল বরণ করতেন। যা সর্বদা হয়ে থাকে, প্রথমেই নির্ব্বাচিত হলেন প্রবীণেরা--কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির নেতৃবৃন্দ, প্রাদেশিক কংগ্রেস গভর্নমেন্টের প্রাক্তন মন্ত্রীরা, আইনসভা, নিখিল ভারত ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিসমূহের সভ্যেরা। ক্রমেই আন্দোলনের পরিধি বিস্তৃত হতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত প্রায় পঁচিশ ত্রিশ হাজার নরনারী কারারুদ্ধ হল। সরকার কর্তৃক অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত বিভিন্ন প্রাদেশিক আইনসভার স্পীকার ও সদস্যবৃন্দও এদের মধ্যে ছিলেন। এইভাবে আমরা প্রমাণ করলাম যে আমাদের দেশের নির্বাচিত আইনসভাগুলির আইনসঙ্গত কাজকর্ম সরকার বন্ধ করে দিলেও আমরা স্বেচ্ছাচারী শাসনের কাছে নতিস্বীকার করা অপেক্ষা কারাবরণই বাঞ্ছনীয় মনে করি।

ব্যক্তিগত আইন-অমান্য আন্দোলনে যারা সক্রিয় অংশ নিয়েছিল, তারা ছাড়াও আরও হাজার হাজার লোককে বক্তৃতা দেওয়া বা অনুরূপ কোনো অপরাধের অজুহাতে গ্রেপ্তার এবং বিনাবিচারে আটক রাখা হয়েছিল। আন্দোলনের শুরুতে একটি বক্তৃতা দেবার অপরাধে আমি নিজেও গ্রেপ্তার এবং চার বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলাম।

১৯৪০ সালের অক্টোবর থেকে পরবর্তী এক বছর এই হাজার হাজার নরনারী বন্দী অবস্থায় ছিল। জেলের ভিতরে যে যৎসামান্য সংবাদ আমরা পেতাম, তার দ্বারাই পৃথিবী ও ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী এবং যুদ্ধের অগ্রগতির খবরাখবর রাখবার চেষ্টা করতাম। জেলে থাকতেই প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ঘোষিত স্বাধীনতার চতুর্বর্গ এবং অ্যাটলান্টিক সনদের বিষয় আমরা জেনেছিলাম। এই সনদের কার্য-কারিতার মধ্যে ভারতের স্থান নেই--মিস্টার চার্চিলের এই উক্তিও আমরা এর অল্প-কাল পরেই জানতে পারি।

১৯৪১ সালের জুন মাসে হিটলার কর্তৃক সোভিয়েটের উপর আকস্মিক আক্রমণে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম; এবং অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে আমরা যুদ্ধের নাটকীয় পরিবর্তন অনুধাবন করবার চেষ্টা করেছিলাম।

১৯৪১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর আমরা অনেকে মুক্তি পেয়ে বাইরে এলাম। ঠিক এর তিনদিন পরে এল পার্ল হারবার, এল প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধ।

৬ : পার্ল হারবারের পর : গান্ধীজি এবং অহিংসানীতি

আমরা জেল থেকে বাইরে এলাম বটে; কিন্তু আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভারত ও ইংলন্ডের পারস্পরিক সম্পর্কের কোনো পরিবর্তন ইতিমধ্যে ঘটেনি। বন্দীদশা বিভিন্ন লোককে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন লোকের উপর জেল-বাসের প্রতিক্রিয়া হয় বিভিন্ন রকমের : কেউ ভেঙে পড়ে এবং দুর্বলচিত্ত হয়ে ওঠে;

অনেকের আবার দৃঢ়তা ও আদর্শনিষ্ঠা তীব্রতর হয়। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকই সাধারণত জনসাধারণের উপর বেশি প্রভাব বিস্তার করে। জাতীয়তার দিক থেকে দেশের কোনো পরিবর্তন যদিচ হয়নি, কিন্তু পার্ল হারবার এবং তার পরবর্তী ঘটনাবলী আমাদের সকলের মধ্যে হঠাৎ একটা নূতন উত্তেজনা ও দৃষ্টিভঙ্গী এনে দিয়েছিল। এই উত্তেজনার আবহাওয়ার মধ্যে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির অধিবেশন হল। জাপানীরা অবশ্য তখনই যে খুব এগিয়ে এসেছে তা নয়, তবে ইতিমধ্যে বিরাট কয়েকটি বিপর্যয়ও ঘটেছিল। ভারতের পক্ষে যুদ্ধ এখন আর দূরবর্তী কোনো ঘটনা নয়—যুদ্ধ তার সমস্ত বিভীষিকা ও সংকট নিয়ে ভারতবর্ষের দরজায় হাজির হল। এই বিপৎসংকুল পরিস্থিতিতে সক্রিয়ভাবে কিছু একটা করার আকাঙ্ক্ষা কংগ্রেস-কর্মীদের মধ্যে ক্রমেই প্রবলতর হতে লাগল—এই অবস্থায় জেল গমন ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অর্থহীন বোধ হতে লাগল। কিন্তু আমাদের সামনে সহযোগিতার কোনো পথ না থাকলে, কিই বা আমরা করতে পারি? কার্যকরী কোনো প্রেরণা না পেলে জন-সাধারণই বা কি করে উদ্বুদ্ধ হবে? আসন্ন বিপদের একটা নেতিমূলক ভীতি সে প্রেরণা দিতে পারে না।

পূর্ববর্তী ইতিহাস ও ঘটনাবলী সত্ত্বেও আমরা যুদ্ধে সহযোগিতা করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলাম—বিশেষভাবে দেশরক্ষার কাজে; অবশ্য এ সহযোগিতা দান করা তবেই সম্ভব যদি সকল দলের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় গভর্নমেন্ট স্থাপিত হয়, যার ফলে দেশের লোক যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে জাতীয় প্রচেষ্টা হিসাবে দেখবে—বিদেশী প্রভুর একটা অনুশাসন হিসাবে নয়। কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে এই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে কোনো মতভেদ ছিল না। কিন্তু অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে নীতি সম্পর্কে একটা বিশেষ মতভেদ দেখা গেল। বহিরাক্রমণ বা বাহ্যিক যুদ্ধ সম্পর্কেও গান্ধীজি তাঁর অহিংস-নীতি পরিত্যাগ করতে নিজেকে অপারগ বোধ করলেন। গান্ধীজির কাছে যুদ্ধের অতিনৈকট্যই তাঁর আদর্শনিষ্ঠার অগ্নিপরীক্ষার রূপ ধারণ করল। এই অগ্নিপরীক্ষায় গান্ধীজি যদি নীতিভ্রষ্ট হতেন, তাহলে প্রমাণিত হত যে আজীবন তিনি যে আদর্শকে কর্মজীবনের সর্বব্যাপী ও মূল নীতি হিসাবে বিশ্বাস করে এসেছেন, অহিংসাবাদ আসলে তা নয়। অন্যদিকে, এই সময় অহিংসাবাদ থেকে তাঁর বিচ্যুতি বা আপোষের চেষ্টায় তাঁর ভ্রান্তিই সুস্পষ্ট হয়ে উঠত। সুতরাং আজীবন যে নীতি ও বিশ্বাস তাঁর সমস্ত কর্মপ্রবাহের প্রেরণা জুগিয়েছে, তা পরিত্যাগ করা গান্ধীজির পক্ষে ছিল একান্ত দুঃসাধ্য; সেই সঙ্গে অহিংসাবাদের এই অনমনীয় সংকল্পের সমগ্র পরিণাম ও পূর্ণ ফলাফলের দায়িত্বও যে তাঁকেই গ্রহণ করতে হবে তাও গান্ধীজি জানতেন।

গান্ধীজির সঙ্গে ঠিক এই ধরনের মতবিরোধ ও সংঘর্ষ এর আগে ঘটেছিল ১৯৩৮ সালের মিউনিক সংকটের সময় যুদ্ধ যখন আসন্নপ্রায় মনে হয়েছিল। আমি তখন ইউরোপে এবং সেই সময় গান্ধীজির সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের এই বিষয়ে যে সমস্ত আলাপ আলোচনা হয়েছিল, আমি তাতে অনুপস্থিত ছিলাম। সংকটের সমাধান ও যুদ্ধ স্থগিত হবার দরুন এই সময় এই মত-সংঘর্ষও চাপা

পড়ে যায়। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে ইউরোপে যখন সত্যই যুদ্ধ বাধল, তখন আমাদের সামনে এই ধরনের কোনো প্রশ্ন দেখা দেয়নি, এবং এ নিয়ে আলোচনা করার অবকাশও আমাদের হয়নি। ১৯৪০ সালের গ্রীষ্মের শেষে গান্ধীজি আবার আমাদের কাছে অহিংসাবাদ সম্পর্কে তাঁর দৃঢ়তা জ্ঞাপন করেন। তিনি আমাদের স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে কোনো হিংস্র যুদ্ধবিগ্রহ তিনি সমর্থন করবেন না এবং তিনি চান যে কংগ্রেসও এই নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করুক। অবশ্য, হিংস্র ও সশস্ত্র যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় নৈতিক ও অন্যান্য সকল-রকম সাহায্য করতে তিনি রাজী ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন কংগ্রেস স্বাধীন ভারত সম্পর্কেও যে অহিংসনীতি মেনে চলবে এই মর্মে এক ঘোষণা করুক। তিনি জানতেন যে দেশের অনেক লোক, এমনকি কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যেও এমন অনেকে আছে অহিংসনীতির প্রতি যাদের সেরূপ আস্থা নেই। তিনি জানতেন যে স্বাধীন ভারতে দেশরক্ষার প্রশ্ন উঠলে স্বাধীন ভারতের গভর্নমেন্ট সম্ভবত অহিংসনীতি বর্জন করবে এবং সশস্ত্র সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী গড়ে তুলতে বাধ্য হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি চেয়েছিলেন যে অন্তত পক্ষে কংগ্রেস অহিংসনীতির পতাকা খাড়া রাখবে এবং তা থেকে জনমন এমন শিক্ষালাভ করবে যে ক্রমে তাদের চিন্তার ধারা শান্তিপূর্ণ আচরণের প্রতি প্রবাহিত হবে। ভারতবর্ষকে সামরিক দেশ হিসাবে গড়ে তোলার কল্পনা তাঁর কাছে একটা বিভীষিকা ছিল। কল্পনায় তিনি দেখতেন যে ভারতবর্ষ অহিংসাবাদের মূর্ত প্রতীক হিসাবে রূপায়িত হয়েছে এবং তার অহিংসনীতির বিশুদ্ধ আদর্শে সমগ্র পৃথিবীকে হিংস্র সঙ্ঘর্ষের পথ পরিত্যাগ করতে অনুপ্রাণিত করেছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিচালনা এবং জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলবার প্রচেষ্টায় কংগ্রেস দীর্ঘদিন থেকে অহিংসনীতির আদর্শ ও কর্মপন্থা অনুসরণ ও স্বীকার করে এসেছে। এর বাইরে, যথা বহিরাক্রমণ থেকে দেশরক্ষা বা আভ্যন্তরীণ অশান্তি দমনের ব্যাপারে কংগ্রেস কখনও এই নীতির কার্যকারিতা সমর্থন করেনি। শুধু তাই নয়, ভারতীয় সেনাবাহিনীর উন্নতি সম্পর্কে কংগ্রেস বরাবর উৎসুক ছিল এবং সেনা-বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের ভারতীয়করণের দাবি কংগ্রেস বহুবার করেছে। কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেসী সদস্যবৃন্দ বহুবার এ-বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন অথবা সমর্থন করেছে। বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পুনঃ-সংগঠন ও ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের ভারতীয়করণের জন্য যে স্কীন কমিটি নিযুক্ত হয়েছিল, তদানীন্তন কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেসীদলের নেতা হিসাবে আমার পিতৃদেব এই কমিটির সভ্যপদ গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য, পরবর্তীসময়ে তিনি এই কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই পদত্যাগের কারণ রাজনৈতিক—তার সঙ্গে অহিংসনীতির কোনো সম্পর্ক ছিল না। ১৯৩৭-৩৮ সালে সমস্ত প্রাদেশিক সরকারগুলির সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেসীদল ভারতীয় সেনাবাহিনীর সংস্কার সম্পর্কীয় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল। সেনা-বাহিনীর পরিবর্ধন, আধুনিক অস্ত্রসজ্জায় সুসংগঠন, প্রায় অস্তিত্বহীন নৌ ও

বিমানবাহিনীর দ্রুত প্রসার এবং ক্রমে ক্রমে ভারতীয় সেনাবাহিনীর দ্বারা বৃটিশ সেনাবাহিনীর স্থানগ্রহণ—এগুলিই ছিল প্রস্তাবের মূল সুপারিশ। ভারতে বৃটিশ সেনাবাহিনী রাখতে ভারত সরকারের যে পরিমাণ ব্যয় হত, ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য ব্যয় হয় তার এক-চতুর্থাংশ। সেজন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী যদি বৃটিশ সেনাবাহিনীর স্থান গ্রহণ করত তাহলে প্রায় একই ব্যয়ে ভারত সরকার তাকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করতে পারত। মিউনিক সঙ্কটের সময় এই কংগ্রেসীদলই বিমানবাহিনীর দ্রুত উন্নতির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিল; কিন্তু সরকারপক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে বিশেষজ্ঞরা এবিষয়ে দ্বিমত। ১৯৪০ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভার অধিবেশনে কংগ্রেসীদল বিশেষভাবে উপস্থিত থাকে এই প্রস্তাবগুলির পুনরুল্লেখ করার জন্য। উপরন্তু দেশরক্ষার ব্যবস্থার আয়োজনে ভারত সরকার ও তার সামরিক বিভাগ যে কতদূর অপদার্থ সেদিকে কংগ্রেসীদল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

সুতরাং, আমি যতদূর জানি, সৈন্য, নৌ বা বিমানবাহিনী এবং পুলিশ সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে আমরা কখনও অহিংসনীতির প্রয়োগ করতে চাইনি। আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে অহিংসনীতির প্রয়োগ শুধু আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। অবশ্য এটা ঠিক যে অহিংসনীতি আমাদের সমগ্র মানসকেই প্রভাবান্বিত করেছিল; এবং আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সকল সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণের পক্ষেই কংগ্রেসের একটা দৃঢ় মত গড়ে উঠেছিল।

প্রদেশে প্রদেশে যখন কংগ্রেসী মন্ত্রিত্ব অধিষ্ঠিত ছিল, তখন কয়েকটি প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সামরিক শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ হয়েছিল; কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতায় এটা সফল হতে পারেনি।

সক্রিয়ভাবে বিরোধিতা না করলেও, এইসব ভাবধারা গান্ধীজির মনঃপূত ছিল না। এমনকি দাঙ্গাহাঙ্গামা দমনে সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর ব্যবহার পর্যন্ত তিনি পছন্দ করতেন না; এবং তাঁর পক্ষে এসব ব্যাপার ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কিন্তু মন্দের ভাল হিসাবেই তিনি এসব সহ্য করে নিতেন এবং এই আশা রাখতেন যে আস্তে আস্তে ভারতের সমগ্র মানস তাঁর শিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে। কংগ্রেসের ভিতরে এই সমস্ত ভাবধারার বিকাশ তাঁর মনোনীত হয়নি, এই কারণে তৃতীয় দশকের গোড়ার দিকে গান্ধীজি সভ্যাহিসাবে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিন্ন করেন। অবশ্য তা সত্ত্বেও আসলে বরাবর তিনিই ছিলেন কংগ্রেসের নিঃসংশয়িত নেতা ও উপদেষ্টা। আমাদের পক্ষে অবস্থাটা ছিল কতকটা গোলমেলে এবং অসুবিধাজনক। কিন্তু গান্ধীজি সম্ভবত অনুভব করতেন যে এই ব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন সময়ে তাঁর নীতি ও আদর্শের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ যে সমস্ত সিদ্ধান্ত কংগ্রেস গ্রহণ করত সেগুলির জন্য ব্যক্তিগতভাবে তিনি দায়িত্ব থেকে মুক্ত রইলেন। একদিকে জাতীয় নেতা, অন্যদিকে শুধু ভারত নয়, সমগ্র বিশ্ব ও মানবসমাজের পথপ্রদর্শক—গান্ধীজির এই দুই সত্তা শুধু তাঁর নিজের ভিতরেই চিরদিন অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে তা নয়,

আমাদের জাতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রেও বহুবার তাঁর এই দুই সত্তা সংঘর্ষের সৃষ্টি করেছে। জীবনের বহুমুখী প্রকাশ ও প্রয়োজনের মধ্যে বিশেষ করে রাজনীতিক্ষেত্রে সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা বজায় রাখা প্রায় দুঃসাধ্য। দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ নরনারীর চিন্তা মোটেই এই সমস্যায় ভারাক্রান্ত নয়। সত্যের প্রতি নিষ্ঠা যদি তাদের আদৌ থাকে, তাহলে সে-সত্যকে মনের একটা কোণে সরিয়ে রেখে ব্যবহারিক প্রয়োজনকেই কর্মজীবনের মাপকাঠি হিসাবে তারা গ্রহণ করে। রাজনীতিক্ষেত্রে এটাই সর্বজনমান্য রীতি। কারণ দুর্ভাগ্যবশত রাজনীতিকরা শুধু যে আসলে সুবিধা-বাদীদেরই একটা গোষ্ঠী তাই নয়, উপরন্তু অধিকাংশ সময়েই ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছা বিসর্জন দিতে তাঁরা বাধ্য হন। অন্যের মধ্যে সক্রিয়তা আনাই তাঁদের প্রধান কাজ, এবং এই ব্যাপারে অন্যান্য সাধারণের বিচার-বিবেচনার সীমাবদ্ধতা এবং সত্য সম্বন্ধে তাঁদের বোধ ও নিষ্ঠাপরায়ণতার স্তরভেদ রাজনীতিককে মনে রাখতে হয়। এই জন্য অনেক সময় উপস্থিত পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুসারে সত্যনিষ্ঠার তারতম্য করতে রাজনীতিক বাধ্য হন। আদর্শচ্যুতির গভীর বিপদ সত্ত্বেও, এই তারতম্য অধিকাংশ সময় অনিবার্যরূপে দেখা দেয়; এবং এই থেকে আস্তে আস্তে সত্যকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে, ব্যবহারিক প্রয়োজনই সমগ্র কর্মপন্থার একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে গড়ে ওঠে।

পাহাড়ের মত দৃঢ় ও অবিচলিত আদর্শনিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও গান্ধীজির আশ্চর্য দক্ষতা ছিল অন্যের মতামত এবং পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার, অপরের শক্তি ও দুর্বলতার সঠিক বিচার করবার। বিশেষভাবে জন-সাধারণের মনোভাব এবং তিনি যেভাবে সত্যকে দেখতেন, তার প্রতি তাদের নিষ্ঠা-পরায়ণতার পরিমাপ বোঝারও একটা অদ্ভুত পারদর্শিতা ছিল গান্ধীজির। কিন্তু মাঝে-মাঝে তাঁর এই আপাতশৈথিল্যে শঙ্কিত হয়ে গান্ধীজি যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতেন এবং আবার তিনি তাঁর কঠোর আদর্শের ঋজু নিষ্ঠায় ফিরে আসতেন। কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে জনগণমানসের সঙ্গে তিনি একসূত্রে গ্রথিত হয়ে পড়তেন এবং তার পরিধি কতখানি তা তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন, সেজন্য তিনি তাদের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারতেন। আবার অন্য অনেক সময়ে তিনি হয়ে উঠতেন তত্ত্বপ্রবণ এবং অনমনীয়। গান্ধীজির রচনা ও কর্মের মধ্যেও বহুক্ষেত্রে অনুরূপ বৈপরীত্য লক্ষিত হয়েছে। যাদের কাছে ভারতের পটভূমিকার সঠিক ছবি অনুপস্থিত তাদের কাছে তো বটেই, এমনকি গান্ধীজির নিজের দেশের জনসাধারণের কাছেও তাঁর উপরোক্ত বৈপরীত্য বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে।

একটা সমগ্র জাতির চিন্তাধারা ও মানস ব্যক্তিবিশেষের প্রভাবে কতখানি প্রভাবান্বিত হতে পারে, তার পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। আমরা জানি বহুবার ব্যক্তিবিশেষ ইতি-হাসের উপর প্রচণ্ডভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। হতে পারে যে, সমসাময়িককালে জনসাধারণের মনে যেসব ভাবধারা বা চিন্তার অস্তিত্ব ছিল, সেগুলিই তারা আরও জোরালোভাবে সর্বসমক্ষে প্রচার করেছে; অথবা সেই যুগের অস্পষ্ট যুগমানসকে

বিরোধিতার তীব্রতা কমানো সম্ভবপর। পুরাতন রীতিনীতির উপর সোজাসুজি আক্রমণ যতটা পারা যায় এড়িয়ে গিয়ে এমনভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত যাতে সত্যের অমোঘ আঘাত আর একটা দিক দিয়ে সাধারণের উপর লাগতে পারে। কিন্তু সত্য-প্রতিষ্ঠার এই পরোক্ষ প্রচেষ্টায় সামান্যতম বিচ্যুতি সম্বন্ধেও যথেষ্ট সাবধান থাকা অবশ্য কর্তব্য; কারণ এই বিষয়ে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা আসলে সত্যপ্রতিষ্ঠার পক্ষেই চূড়ান্ত ক্ষতিকর...অতীতের বিভিন্ন নূতন ভাবধারা ও আদর্শ কিভাবে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছে, সেই ইতিহাসের পর্যালোচনা করলে আমরা বুঝতে পারি যে হঠাৎ একটা নূতন ভাবধারা হিসাবে নয়, আবহমানকাল স্বীকৃত অথচ সমসাময়িক কালে বিস্মৃত আদর্শ বা কর্মপন্থার পুনঃসংস্কার রূপেই সত্যপ্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়েছে। এর জন্য ছলচাতুরীর আশ্রয় নিতে হয়নি—যত্ন সহকারে পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সংযোগসূত্রগুলি আবিষ্কার করার ফলেই এর সাফল্য সম্ভব হয়েছে, যেহেতু 'বিশ্বভূমণ্ডলে নূতন বলতে কিছুই নেই'।"

৭ : উৎকণ্ঠা

১৯৪২ সালের গোড়ার দিকে ভারতে যুদ্ধ সম্পর্কে উৎকণ্ঠা বাড়তে লাগল। ক্রমশই যুদ্ধ কাছে এগিয়ে আসছিল এবং ভারতবর্ষের শহরগুলির উপর বিমান আক্রমণের সম্ভাবনাও দেখা দিল। পূর্বাঞ্চলে যেসব দেশে রীতিমত যুদ্ধ চলছিল, সেসব দেশের ভবিষ্যৎ কি হবে? ইংলন্ড ও ভারতবর্ষের পারস্পরিক সম্পর্ক নূতন কি আকার গ্রহণ করবে? পুরানো দিনের মত পরস্পরের দোষারোপ করে নিষ্ক্রিয় থাকাই কি বর্তমানে আমাদের একমাত্র পথ? অতীত ইতিহাসের তিক্ত স্মৃতির দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান বজায় রেখে আমরা কি অনিবার্যভাবেই সর্বনাশা ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করব? অথবা পরস্পরের এই চরম সংকট উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ভেঙে ফেলতে সক্ষম হবে?

যুদ্ধের আসন্নতায় ভারতবর্ষের সর্বসাধারণ স্বাভাবিক আলস্য ঝেড়ে ফেলে যেন জেগে উঠল। হাটবাজারে পর্যন্ত যেন একটা তীব্র উত্তেজনার ঢেউ বয়ে গেল, নানারকম গুজবে সেগুলি মুখর হয়ে উঠল। বিত্তশালী শ্রেণী আগতপ্রায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ক্রমশই শঙ্কিত হয়ে উঠছিল; কারণ এই ভবিষ্যৎ যেমনই হোক না কেন, তা যে তাদের অভ্যস্ত জীবনধারা এবং তাদের সুবিধা ও স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান সামাজিক কাঠামোতে একটা বিরাট পরিবর্তন আনবে তা তারা বুঝতে পেরেছিল। কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর অবশ্য ভয় পাবার মত কিছু ছিল না, কারণ হারাবার মত তাদের কিছু ছিল না, বর্তমানের দারিদ্র্যপূর্ণ নিপীড়িত জীবনে যে কোনো পরিবর্তনই তাদের কাছে আকাঙ্ক্ষিত ছিল।

ভারতবর্ষে সাধারণত চীনের প্রতি সহানুভূতি বরাবরই প্রবল ছিল, তার ফলে, জাপানের বিরুদ্ধে একটা মনোভাবও সৃষ্ট হয়েছিল। প্রশান্ত মহাসাগরে যখন যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল, তখন সকলেরই মনে হয়েছিল যে এবার চীনের খানিকটা সুবিধা হবে।

জাপানের বিরুদ্ধে সাড়ে চার বছর ধরে চীন একাকী যুদ্ধ চালিয়েছে; এখন তার সঙ্গে শক্তিশালী মিত্রশক্তিও যোগ দিল। আমরা মনে করেছিলাম যে এতে চীনের গুরুভার এবং বিপদাশঙ্কা নিশ্চয়ই কমবে। কিন্তু একটার পর একটা পরাজয়ে মিত্রশক্তি পিছু হঠতে লাগল; এবং দুর্ধর্ষ জাপানী সেনাবাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশের সমগ্র ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য অত্যন্ত আশ্চর্যজনক দ্রুততার সঙ্গে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। অন্তঃসারশূন্য শক্তিহীন তাসের ঘর—এই কি সেই গর্বিত ও স্পর্ধিত বৃটিশ সাম্রাজ্য? আধুনিক সমরোপকরণ কিছুমাত্র না থাকা সত্ত্বেও চীন যেভাবে দীর্ঘদিন জাপানকে যুঝে এসেছিল, তাতে চীনের প্রতিই সাধারণের শ্রদ্ধা অনিবার্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। জাপানের প্রতি বিশেষ যে একটা আকর্ষণ ছিল তা নয়, তবু এশিয়ার একটা শক্তির কাছে ইউরোপের প্রাচীন ও দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি ধ্বসে পড়ায় সকলের মধ্যে একটা আনন্দের ভাবই এসেছিল। বৃটিশের দিক থেকেও অবশ্য এই প্রাচ্য ও এশিয়া সম্পর্কে একটা জাতিগত সংস্কার বরাবরই ছিল। পরাজয়ের লাঞ্ছনা তিক্ত ছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু প্রাচ্য ও এশিয়ার একটি শক্তির কাছে এইভাবে পরাজিত হবার মত লজ্জা এবং তিক্ততা বৃটিশের আর কিছুতে ছিল না। উচ্চপদস্থ জনৈক বৃটিশ কর্মচারী বলেছিলেন যে পীত জাপানীদের হাতে 'প্রিন্স অফ ওয়েলস্' এবং 'রিপাল্‌স্' মগ্ন না হয়ে, জার্মান কর্তৃক হওয়াটাই বরণীয় ছিল।

এই সময়ে জেনারেলিসিমো ও ম্যাডাম চীয়াং কাই-শেক-এর ভারতে আগমন একটি স্মরণীয় ঘটনা। সরকারী অনুষ্ঠানের আড়ম্বর এবং ভারত সরকারের অনিচ্ছার ফলে তাঁদের পক্ষে সাধারণ লোকজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করার সুবিধা হয়নি। কিন্তু এইরকম সংকটপূর্ণ অবস্থায় ভারতবর্ষে তাঁদের উপস্থিতি এবং ভারতের স্বাধীনতার প্রতি তাঁদের প্রকাশ্য সহানুভূতি ভারতের জনসাধারণকে জাতীয়তার সংকীর্ণ পরিধি উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্বসংকটের ব্যাপকতা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছিল। তাঁদের এই আগমনে ভারত ও চীনের মৈত্রীবন্ধন আরও দৃঢ় হল; এবং সকলের শত্রুর বিরুদ্ধে চীন ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাবার ইচ্ছাও প্রবলতর হতে লাগল। আসন্ন সর্বনাশ ও সংকট ভারতের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার মধ্যে যে ব্যবধান ছিল, তা মুছে দিল। যেটুকু বাধা ছিল সেটা হল বৃটিশ সরকারের নীতি।

ভারত সরকারও অবশ্য এই আসন্ন সংকট সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিল। জরুরী অবস্থার তাগিদ ও উৎকণ্ঠা নিশ্চয়ই তাদের মনেও নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ শক্তি এমন কতকগুলো প্রাণহীন অনুষ্ঠানের মধ্যে বাঁধা ছিল, সংকীর্ণ গন্ডি এবং আমলাতন্ত্রের অন্তহীন 'লালফিতা'র বন্ধনে এমন সীমাবদ্ধ ছিল যে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বা কাজে কোনো পরিবর্তন লক্ষিত হল না। জরুরী অবস্থার সে চাঞ্চল্য ও কর্মতৎপরতা কোথায়? যে ব্যবস্থার তারা প্রতীকস্বরূপ, সে ব্যবস্থা পুরানো যুগের ভিন্ন প্রকারের উদ্দেশ্যলাভের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতে বৃটিশ প্রভুত্ব কায়েম রাখা এবং জনসাধারণের স্বাধীনতালাভের যে কোনো প্রচেষ্টা নির্মূল করা—এই ছিল তাদের

সৈন্যবাহিনী এবং শাসনব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। অবশ্য এ-বিষয়ে তারা সক্ষম ছিল, সন্দেহ নেই; কিন্তু শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আধুনিক যুদ্ধ চালানো একটা ভিন্ন ব্যাপার, এবং এই ব্যাপারে তাদের অক্ষমতা ও দুর্বলতা একেবারে সুস্পষ্ট ছিল। শুধু যে মানসিকভাবেই তারা এই নূতন সংকটের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তাই নয়, তাদের বেশির ভাগ শক্তি ভারতে জাতীয় আন্দোলন দমনেই নিযুক্ত ছিল। জাপানী আক্রমণের সামনে বর্মা ও মালয়ের শাসনব্যবস্থা ধূলিসাৎ হওয়ার জ্বলন্ত উদাহরণ থেকেও তারা কোনো শিক্ষাই লাভ করেনি। ভারতের অনুরূপ 'সিভিল সার্ভিস' শাসনযন্ত্রের সাহায্যেই বর্মার শাসনব্যবস্থা চালানো হত; এমনকি কয়েকবছর আগে পর্যন্ত বর্মা ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল; এবং বর্মা ও ভারতের শাসনব্যবস্থার মধ্যে কোনো প্রভেদই ছিল না। এই শাসনব্যবস্থা ও শাসনযন্ত্র যে কি পরিমাণ অপদার্থ ছিল—বর্মার পতনই তা প্রমাণ করেছে। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? ভারতেও ঠিক একই শাসনযন্ত্র নিরুদ্বিগ্নভাবে শাসনব্যবস্থা চালাতে লাগল। ভাইসরয় এবং উচ্চ রাজকর্মচারীরা তাদের পুরাতন রীতিনীতি ও কর্মপন্থা অক্ষুণ্ণ রাখলেন। উপরন্তু, বর্মায় যারা নিজেদের অপদার্থতার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছিল, সেই সমস্ত উচ্চ রাজকর্মচারীরা ভারতে এসে জড় হল। সিমলার পর্বতশিখরে আর একজন লাটসাহেবের প্রতিষ্ঠা হল। এই সময়ে লন্ডনে যেমন অসংখ্য 'প্রবাসী' সরকারের আস্তানা হয়েছিল, সেইরকম আশেপাশের সমস্ত বৃটিশ উপনিবেশ থেকে পরাজিত ও বিতাড়িত রাজকর্মচারীদের আস্তানা দেবার সৌভাগ্যও আমরা পেয়েছিলাম। হাতের পাঁচটা আঙুলের মত এরা ভারতে বৃটিশ শাসনযন্ত্রের মধ্যে পুরোপুরি খাপ খেয়ে গিয়েছিল।

কায়াহীন ছায়ার মত এই সব অসংখ্য উচ্চ রাজকর্মচারীবৃন্দ তাদের পুরানো রীতিনীতি পূর্ববৎ অনুসরণ করতে লাগল। ভারতের জনসাধারণের কাছে তাদের নিঃসাড় ক্ষমতা জাহির করবার জন্য তারা কোনো কিছুর কসুর করেনি। সেই ব্যাপক রাজকীয় অনুষ্ঠান, রাজসভার জটিল সমারোহ, দরবার ও উপাধি বিতরণ, সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ, সান্ধ্যপোশাক আর রাত্রির আহার, এবং আড়ম্বরপূর্ণ অবাস্তব উক্তি—এসবই রুটিনমাফিক চলতে লাগল। নয়াদিল্লীর বড়লাট-প্রাসাদ ছিল এই রাজকীয় যজ্ঞসমারোহের পীঠস্থান—সেখানে প্রধান পুরোহিতের আসন—এছাড়াও সারা দেশ ছেয়ে ছিল তাদের ছোটখাট কত মন্দির আর পুরোহিত। ভারতবাসীকে নিজের প্রতিপত্তি দেখানোই এই সব আড়ম্বর ও সমারোহের আসল লক্ষ্য ছিল। অতীতে অবশ্য ভারতবাসীর উপর এসব কিছুটা প্রভাব বিস্তার করত, কারণ ভারতবাসীও আড়ম্বর, সমারোহ ও অনুষ্ঠানের ভক্ত। কিন্তু ভারতবাসীর মনে আজ নূতন আদর্শ এবং নূতন সংজ্ঞার সৃষ্টি হয়েছে, সুতরাং বৃটিশ শাসকের এই সমস্ত আড়ম্বর ও সমারোহের বিস্তৃত ও ব্যাপক অনুষ্ঠান এখন তাদের কাছে একটা বিদ্রূপ ও ঘৃণার ব্যাপার। রীতিনীতি বিষয়ে ভারতবাসী সাধারণত মন্থরগতি বলেই পরিচিত; সে দ্রুত পরিবর্তনের বিরোধী; কিন্তু সঙ্কটের আসন্নতা তাকে পর্যন্ত নাড়া দিয়েছিল,

কিছু একটা করার জন্য তার ইচ্ছা ও কর্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রাদেশিক কংগ্রেসী সরকারগুলির অন্যান্য অক্ষমতা যাই থাক, তারা যে পুরানো অনেক রীতিনীতির বিরোধিতা করেও সক্রিয়ভাবে কিছু করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল, তা নিঃসন্দেহ। গভীরতম সঙ্কট ও সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভারত সরকার এবং তার অনুচর-বর্গের এই নিষ্ক্রিয়তা এবং মন্থরগতি আমাদের পক্ষে নিতান্তই বিরক্তিজনক ছিল।

এই অবস্থায় আমেরিকানরা ভারতবর্ষে এল। যুদ্ধকে তারা যুদ্ধ হিসাবেই গ্রহণ করেছিল; এবং তার প্রস্তুতি ও প্রয়োজন কত তাড়াতাড়ি মিটানো যায় এই ছিল তাদের লক্ষ্য। মন্থরগতি ভারত সরকারের অবাস্তব আচার অনুষ্ঠানের হালচাল সম্বন্ধে তারা ছিল অজ্ঞ এবং এসব বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে তারা মোটেই ব্যগ্র ছিল না। দীর্ঘ-সূত্রতা মার্কিনদের কাছে অসহ্য ছিল। যুদ্ধ পরিচালনার সর্বাগ্র প্রয়োজনের খাতিরে তারা সব কিছু বাধাবিঘ্ন ও 'লালফিতা'র জটিল আবর্ত তুচ্ছ করে নয়াদিল্লীর শান্ত ও সুষ্ঠু জীবনপ্রবাহ পর্যন্ত ওলটপালট করবার উপক্রম করল। পোশাক পরিচ্ছদের কায়দা কানুন সম্বন্ধে তারা মোটেই সচেতন ছিল না এবং তাদের আচার ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে সরকারের আনুষ্ঠানিক রীতিনীতির বিরোধী হয়ে দেখা দিত। যুদ্ধে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ যদিও সকলের পক্ষেই স্বস্তির কারণ হয়েছিল, কিন্তু ভারত গভর্নমেন্টের উচ্চ কর্মচারী মহল তাদের বিশেষ পছন্দ করত না এবং অনেক সময়েই তাদের পারস্পারিক সম্বন্ধের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হত। সাধারণ ভারত-বাসী মোটের উপর আমেরিকানদের পছন্দই করত। কারণ হাতের কাজ দ্রুত সুসম্পন্ন করবার জন্য তাদের কর্মোৎসাহ ও প্রচেষ্টা লোকের উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলত এবং অপরপক্ষে ভারতের বৃটিশ কর্মচারীদের এই গুণগুলির অভাব আরও ফুটিয়ে তুলত। সরকারী বাধানিষেধের বেড়াজাল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত তাদের সহজ সরল ব্যবহার সকলকে আকর্ষণ করত। ভারত সরকারের শাসনযন্ত্রের সঙ্গে এই নূতন আগন্তুকদের অন্তর্নিহিত মনকষাকষি একটা মজার ব্যাপার ছিল; এবং এই নিয়ে সত্য মিথ্যা নানা গল্পগুজবেরও সৃষ্টি হয়েছিল।

যুদ্ধের ক্রমনৈকট্য গান্ধীজিকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। তাঁর অহিংসাবাদ ও অহিংস কর্মপন্থার সঙ্গে এই নূতন পরিস্থিতির সমন্বয়সাধন খুব সহজ ছিল না। আক্রমণের আশঙ্কা যখন প্রবল এবং যখন পরস্পরবিরোধী দুটি সেনাবাহিনী যুদ্ধে লিপ্ত, এই অবস্থায় আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করার কথাই ওঠে না। অন্যদিকে নিষ্ক্রিয়তা বা আক্রমণ মেনে নেওয়াও অসম্ভব। সুতরাং উপায় কি? বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের বিকল্প হিসাবে এই রকম অবস্থায় অহিংসাবাদের প্রয়োগে গান্ধীজির সহকর্মীরা এবং সাধারণভাবে কংগ্রেসও রাজী হয়নি; এবং গান্ধীজিও এ-ব্যাপারে তাদের মতামতের স্বাধীনতা মেনেই নিয়েছিলেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও এই পরিস্থিতি তাঁকে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল; কারণ নিজের দিক থেকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর পক্ষে কোনো হিংসাত্মক কর্মপন্থায় যোগদান করা একেবারে অসম্ভব ছিল। কিন্তু তাঁর সত্তা শুধু তো তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বেই সীমাবদ্ধ ছিল না; জাতীয় আন্দোলনের ভিতর

তিনি কংগ্রেসের ভারপ্রাপ্ত সদস্য হিসাবে থাকুন বা নাই থাকুন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে তাঁর স্থান ছিল অনিবার্য এবং কোটি কোটি নরনারী তাঁর বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠত।

অতীত বা বর্তমানের অন্য অনেক নেতার তুলনায় গান্ধীজি ভারতবর্ষকে বিশেষ-ভাবে ভারতের জনগণকে অনেক বেশি বুঝতেন। শুধু যে তিনি ভারতের সর্বত্র বিস্তৃতভাবে ভ্রমণ করেছেন এবং কোটি কোটি জনসাধারণের সংস্পর্শে এসেছেন, তাই নয়, তিনি এমন একটা শক্তির অধিকারী ছিলেন, যার সাহায্যে জনসাধারণের হৃদয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন তাঁর কাছে অনেক সহজসাধ্য ছিল। জনসাধারণের সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণ মিশে যেতে এবং তাদের ভাবনাচিন্তাকে নিজের করে নিতে পারতেন, জন-সাধারণও এ-বিষয়ে সচেতন ছিল এবং তারা তাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিক আস্থা গান্ধীজির কাছে ঢেলে দিয়েছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও গান্ধীজির মানসজগতে ভারত-বর্ষের যে চিত্র—তাকে প্রভাবিত করেছে তাঁর বাল্যাবস্থায় গুজরাতে যেসব আদর্শ ও শিক্ষায় তিনি গড়ে উঠেছিলেন। সাধারণভাবে গুজরাতিরা ছিল একটা শান্তিপ্রিয় বণিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়—তাদের উপর জৈনধর্মের অহিংসাবাদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। ভারতের অন্যান্য অংশে অহিংসাবাদ এতখানি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি, এবং কিছু কিছু অংশ তো সম্পূর্ণভাবে এর প্রভাবমুক্তই ছিল। ভারতের চারদিকে বিস্তৃতভাবে ছড়ানো যোদ্ধা বা ক্ষত্রিয়শ্রেণী তাদের যুদ্ধবিগ্রহ বা বন্যজন্তু শিকারাদি ব্যাপারে কোনোদিন অহিংসাবাদকে গ্রহণ করেনি এটা নিশ্চিত। অন্যান্য শ্রেণী, এমনকি ব্রাহ্মণরা পর্যন্ত, মোটের উপর অহিংসাবাদের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়নি। কিন্তু ভারতীয় চিন্তা ও ইতিহাসের অগ্রগতি সম্বন্ধে গান্ধীজি সর্ব-ধর্মসার, এই দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচারপদ্ধতিই গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বহুবার বহু বিচ্যুতি সত্ত্বেও অহিংসাবাদই ভারতীয় চিন্তা ও ইতিহাসের অগ্রগতির মূল উৎস। অবশ্য তাঁর এই মত কতকটা অযৌক্তিকই মনে হয়—বহু ভারতীয় চিন্তাবিদ ও ঐতিহাসিক সমর্থন করতে পারেননি। মানবসমাজের বর্তমান স্তরে অহিংসাবাদের কার্যকারিতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন ওঠে না; কিন্তু ইতিহাসের দিক দিয়ে গান্ধীজির যে এসম্বন্ধে একটি প্রবল সংস্কার ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

জাতীয় চরিত্র ও ইতিহাস গঠনে ভৌগোলিক তারতম্যের প্রভাব প্রচণ্ড। উত্তুঙ্গ হিমালয় ও সমুদ্রের জলরাশির ব্যবধানে পরিবেষ্টিত ভারতবর্ষে স্বভাবতই সামগ্রিক ঐক্যের ভাব গড়ে উঠেছিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সকলের থেকে পৃথক একটি সত্তাও ভারতের মানসজগতে পরিস্ফুট হয়ে ছিল। ভারতের সুবিস্তীর্ণ এলাকায় একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক ঐক্যের সূত্রে গ্রথিত সমমাত্রিক সভ্যতা জন্ম নিয়েছিল, এবং এই সভ্যতার সামগ্রিক উন্নতি ও ক্রমবিকাশের প্রচুর সম্ভাবনাও ছিল। কিন্তু ভৌগোলিক কারণেই আবার এই ঐক্যের মধ্যেই বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছিল। উত্তর ও মধ্য অঞ্চলের বিস্তীর্ণ সমতলভূমির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের পর্বতসংকুল উঁচুনিচু অঞ্চলের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল; এবং এক একটি ভৌগোলিক এলাকার অন্তর্ভুক্ত জনসমষ্টি বিভিন্ন চারিত্রিক

বৈশিষ্ট্যে এবং স্বকীয়তায় গড়ে উঠেছিল। সুতরাং মাঝে মাঝে পরস্পর পরস্পরকে আবেষ্টন করলেও, উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের ইতিহাস আলাদা আলাদা ভাবেই রূপায়িত হয়েছিল। রুশিয়ার মত ভারতের উত্তরাঞ্চলও ছিল বিস্তীর্ণ ও উন্মুক্ত সমতলভূমি, সেই জন্য এইখানে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্যরূপে দেখা দিয়েছিল। উত্তর এবং দক্ষিণ উভয় অঞ্চলেই বড় বড় সাম্রাজ্য গড়ে উঠলেও উত্তরই ছিল সাম্রাজ্যসৃষ্টির প্রধান কেন্দ্র এবং উত্তরের এই সব সাম্রাজ্য অনেক সময়েই দক্ষিণের সাম্রাজ্যগুলির উপর প্রভুত্বস্থাপন করতে সক্ষম হত। অতীতে, শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অর্থই ছিল স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিষ্ঠা। অন্যান্য আরও অনেক কারণের সঙ্গে মারাঠাদের আক্রমণের ফলেই যে বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল—এটা ইতিহাসের কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। উত্তরাঞ্চলের প্রায় সমস্ত জাতি যখন দাসত্ব ও আত্মসমর্পণ সুলভ মনোভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়েছিল তখন একমাত্র দাক্ষিণাত্যের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী মারাঠারাই শেষ পর্যন্ত নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনের ইতিহাসেও তাই আমরা দেখতে পাই যে উর্বর বাঙলার সমতল ভূমিতেই বৃটিশের প্রথম জয়ের সূচনা হয়েছিল এবং এইখানকার অধিবাসীরা অতি সহজেই বৃটিশের কাছে নতিস্বীকার করেছিল। এইখানে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর বৃটিশরা অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে।

একটা দেশের উপর তার ভৌগোলিক গঠন ও প্রকৃতির প্রভাব কোনোদিনই নগণ্য ছিল না এবং ভবিষ্যতেও হবে না, কিন্তু বর্তমানে অন্যান্য অনেক কিছুই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। আগেকার মত এখন আর পর্বত বা সমুদ্র দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান নয়; অবশ্য তা সত্ত্বেও জাতির চরিত্র গঠনে এবং দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনে এদের প্রভাব বিদ্যমান। দেশের নূতন যে কোনো বিভাগ, বিভেদ ও নূতন পুনর্গঠনের পরিকল্পনায় ভৌগোলিক কার্যকারণকে উপেক্ষা করে চলে না। একমাত্র সমগ্র বিশ্বের পটভূমিতেই এইসব পরিকল্পনায় ভূগোলকে উপেক্ষা করা সম্ভব।

ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসী সম্পর্কে গান্ধীজির জ্ঞান ছিল অপরিসীম। ইতিহাসে গান্ধীজির তেমন ঔৎসুক্য ছিল না; এবং অনেকের মধ্যে ইতিহাসের প্রতি যে ধরনের আকর্ষণ বা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়, গান্ধীজির মধ্যে তার অভাব ছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতবাসীর ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য ও তার উৎস সম্পর্কে গান্ধীজি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং এ-বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল প্রগাঢ়। ভারতবর্ষের বর্তমান সমস্যাগুলিতেই তাঁর সমগ্র চিন্তা ও দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, যদিচ এই সঙ্গে তিনি অন্যান্য ঘটনাবলীও অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে অনুধাবন করতেন। একটা সমস্যা বা পরিস্থিতির আসল ও মূল রূপটি বুঝতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত—অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলি তিনি সহজেই পরিবর্জন করতে পারতেন। যাকে তিনি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বলতেন, তাই দিয়ে তিনি সব কিছুর বিচার করতেন। ফলে সে সমস্যার উপর তাঁর একটা দখল জন্মাত এবং তাঁর দৃষ্টিও বর্তমানের গণ্ডি ছাড়িয়ে সুদূরবিস্তৃত

হয়ে পড়ত। বার্নার্ড শ' বলেছেন যে বহুক্ষেত্রে গান্ধীজির কৌশল ভুল প্রমাণিত হলেও, তাঁর মূল নীতির যথার্থতা অব্যাহত থাকবে। কিন্তু অধিকাংশ লোক বর্তমানের সুবিধা অসুবিধা ও জয় পরাজয় নিয়েই বেশি ব্যস্ত—সুদূর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তারা তত উৎসুক নয়।

৮ : ভারতবর্ষে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের আগমন

পেনাং ও সিঙ্গাপুরের পতন এবং মালয়ে জাপানী অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত অঞ্চল থেকে ভারতীয়রা ভারতে প্রত্যাবর্তন করতে শুরু করেছিল। তাদের চলে আসতে হয় হঠাৎ, সেজন্য পরিধানের পোশাক-পরিচ্ছদ ছাড়া তারা আর কিছুই সঙ্গে আনতে পারেনি। তার পর বর্মা থেকে হাজার হাজার আশ্রয়প্রার্থীর ভিড় বন্যার মত ভারতকে গ্রাস করল। তাদের এই চরম সঙ্কটসময়ে সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষ কি রকম নিষ্ঠুরভাবে তাদের পরিত্যাগ করেছে, তার কাহিনী ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। শত্রুপরিবেষ্টিত অবস্থায় দুর্গম পাহাড়পর্বত এবং গহন অরণ্যের মধ্য দিয়ে শত শত মাইল পথ এই সমস্ত আশ্রয়প্রার্থীদের পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে হয়েছে। এর মধ্যে গুপ্তশত্রুর ছুরিকাঘাতে, রোগে, অনাহারে পথের মধ্যেই বহুলোক মৃত্যু-মুখে পতিত হয়েছিল। যুদ্ধের সর্বনাশা পরিণাম হিসাবেই এই চরম দুর্দশাকে আমরা স্বীকার করে নিয়েছিলাম। কিন্তু বৃটিশ ও ভারতীয় আশ্রয়প্রার্থীদের সম্পর্কে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ যে বিরাট তারতম্য দেখিয়েছিল, তার তুলনা ইতিহাসে বিরল। বৃটিশ আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্য ও প্রত্যাবর্তনের সমস্ত বন্দোবস্ত কর্তৃপক্ষ করেছিল। বর্মার যে স্থানটি আশ্রয়প্রার্থীদের কেন্দ্র ছিল, সেখান থেকে ভারতে আসবার দুটো প্রধান রাস্তা ছিল; এর মধ্যে যেটা সবচেয়ে ভাল ছিল, সেটাকে বৃটিশ ও ইউরোপীয় আশ্রয়-প্রার্থীদের জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছিল। এবং এই রাস্তাটি "শ্বেত রাস্তা" বলে সাধারণভাবে অভিহিত হত।

জাতিবৈষম্যের এই সমস্ত চরম নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতনের কাহিনী একে একে আমাদের কানে আসতে লাগল; এবং জীর্ণ শীর্ণ অবশিষ্ট আশ্রয়প্রার্থীর দল ভারতের সর্বত্র যতই ছড়িয়ে পড়তে লাগল, ততই এই সমস্ত কাহিনী ভারতের জনমনে একটা প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করল।

ঠিক এই সময়েই ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভার পক্ষ থেকে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ কতকগুলি প্রস্তাব নিয়ে ভারতবর্ষে এলেন। গত আড়াই বছরে এই সব প্রস্তাব নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে—সেসব এখন অতীত ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে আপোষ-মীমাংসার আলাপ-আলোচনায় যারা অংশ নিয়েছিল, তাদের পক্ষে এই সম্বন্ধে কোনো বিস্তৃত আলোচনা করতে গেলে এমন সব কথা বলা অনিবার্য হয়ে পড়ে যা ভবিষ্যতে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় রাখাই ভাল। প্রকৃতপক্ষে এই প্রস্তাব সম্পর্কে যাবতীয় সমস্যা ও প্রশ্নের আলোচ্য বিষয় ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, যখন আমি প্রথম এই প্রস্তাবগুলি পড়ি, তখন আমার মনে একটা নিদারুণ হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল, কারণ উপস্থিত পরিস্থিতির প্রয়োজনবোধের খাতিরে এবং বিশেষত ব্যক্তিগতভাবে স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের কাছ থেকে আমি এর থেকে বেশি কিছু আশা করেছিলাম। যতই আমি এই প্রস্তাবগুলি পড়েছি এবং এর অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝবার চেষ্টা করেছি, ততই আমার মধ্যে হতাশা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি বুঝি ভারতবর্ষের পরিস্থিতির সঙ্গে অপরিচিত কোনো লোকের পক্ষে ভাবা সম্ভব যে, এই প্রস্তাবগুলি আমাদের দাবি অনেকাংশে মিটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রস্তাবগুলি বিশ্লেষণ করার পরে দেখা গেল যে, সেগুলি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ এমনকি আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি পর্যন্ত এমন অসংখ্য বাধাবন্ধনে আষ্টেপৃষ্টে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে যে তাতে আমাদের সমগ্র ভবিষ্যৎই বিপন্ন।

প্রস্তাবগুলির মূল বিষয়বস্তু ছিল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে—বর্তমান যুদ্ধবিগ্রহ শেষ হবার পর। অবশ্য বর্তমান সম্পর্কেও একটা অস্পষ্ট সহযোগিতার আহ্বান প্রস্তাবে ছিল। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রস্তাবে যদিও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল, তার মধ্যে প্রদেশগুলিকে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ না দিয়ে পৃথক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এই সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলিকেও সেই একই অধিকার দেওয়া হয়েছিল; অর্থাৎ ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়া তাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল না। এখানে মনে রাখা দরকার, প্রায় ছয় শত দেশীয় রাজ্য ভারতে বিদ্যমান, তার মধ্যে কয়েকটি বৃহৎ কিন্তু অধিকাংশই ক্ষুদ্রাকার। প্রস্তাবের সুপারিশ অনুযায়ী এই সমস্ত দেশীয় রাজ্য এবং প্রদেশগুলি স্বাধীন ভারতের গঠনতন্ত্র রচনায় পূর্ণ অংশ গ্রহণ করার ক্ষমতা পেয়েছিল, এবং সেই হেতু স্বাভাবিক ভাবেই সেই গঠনতন্ত্রকে অনেকটা নিজেদের প্রভাবে প্রভাবিত করতে তারা সক্ষম ছিল, এবং তার পর ইচ্ছানুযায়ী স্বতন্ত্রতার অজুহাতে সেই গঠনতন্ত্রের কাঠামো থেকে বাইরে চলে আসার অধিকারও তাদের ছিল। এর ফলে সমগ্র পটভূমিকা হত বিভেদ ও বিচ্ছেদে বিস্তীর্ণ এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভৃতি দেশের আসল সমস্যাগুলিই পিছনে পড়ে যেত। তা ছাড়া পরস্পরবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ একজোট হয়ে একটা শক্তিশালী, প্রগতিশীল ও ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র গঠন বানচাল করে দেবার সুবিধা পেত। সব সময় ইউনিয়ন থেকে বাইরে চলে আসবার ভয় দেখিয়ে এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি গঠনতন্ত্রের মধ্যে নানারকম অবাঞ্ছনীয় সূত্র ও সর্ত আরোপ করতে পারত, ফলে কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্ট দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়ত। এবং হয়তো শেষ পর্যন্ত তারা ইউনিয়নের বাইরেই চলে আসত। তখন আবার নূতন করে বাকি প্রদেশ ও রাজ্যগুলির জন্য কাজ চালাবার উপযোগী একটা গঠনতন্ত্র সৃষ্টি করা কঠিন হত। ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পৃথক নির্বাচনের যে ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, সে ব্যবস্থা অনুযায়ীই গঠনতন্ত্ররচনা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার কথা প্রস্তাবে ছিল। এটা ছিল সব চেয়ে অবাঞ্ছনীয়, কারণ এতে পুরানো ভেদাভেদের ভাবই সবাইকে

আচ্ছন্ন করে ফেলত, অবশ্য উপস্থিত পরিস্থিতিতে এটা ছিল অনিবার্য। অপর দিকে আবার দেশীয় রাজ্যগুলিতে নির্বাচনের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। এবং এই সব দেশীয় রাজ্যের প্রায় নয় কোটি জনগণ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়েছিল। দেশীয় রাজ্যের আধা-সামন্ত নৃপতিরাই এবিষয়ে ছিলেন সর্বেসর্বা—জনসংখ্যার অনুপাতে গঠনতন্ত্ররচনা পরিষদের সভ্য তাঁরাই মনোনয়ন করার অধিকার পেয়েছিলেন। তাঁদের মনোনীত এই সব সদস্যদের মধ্যে হয়তো দুচার জন কার্যক্ষম ও উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব হত না; কিন্তু এটা ঠিক যে, এরা সকলেই দেশীয় রাজ্যগুলির জনসাধারণের প্রতিনিধি নয়, এরা স্বেচ্ছাচারী সামন্ত নৃপতিদেরই পুরোপুরি প্রতিনিধিত্ব করত। গঠনতন্ত্ররচনা পরিষদের মোট সভ্যসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ ছিল এরা; এবং খুবই স্বাভাবিক যে, সামাজিক দিক থেকে পশ্চাৎপর এই সমস্ত সভ্য ইউনিয়ন থেকে পৃথক থাকবার অবিরাম ভয় দেখিয়ে এবং সংখ্যায় ভারি হবার জোরে গঠনতন্ত্রকে অনেকখানি প্রভাবিত করতে সক্ষম হত। নির্বাচিত ও মনোনীত সভ্যদের নিয়ে গঠিত এই গঠনতন্ত্ররচনা পরিষদ একটা জগাখিচুড়ী তৈরি হত। নির্বাচিতদের মধ্যে কিছু অংশ ধর্মের ভিত্তিতে এবং অপর অংশ কায়েমী স্বার্থের দ্বারা নির্বাচিত হত, অপর দিকে নির্বাচিত নয় এমন সব সভ্যই দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের দ্বারা মনোনীত হত। প্রস্তাবে আরও ছিল যে, সকলের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির স্বীকৃতি বাধ্যতামূলক নয়, সুতরাং মিলিত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্বীকার করা থেকে যে বাস্তব দায়িত্ববোধের সৃষ্টি হয়, গঠনতন্ত্র থেকে সেটাই থাকত অনুপস্থিত। এতে বহু সভ্য নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী গঠনতন্ত্র রচনায় দায়িত্বহীন মনোভাব নিতে পারতেন, কারণ তাঁরা জানতেন যে, কোনো সিদ্ধান্তই তাঁদের পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল না এবং যে কোনো সময় যে কোনো অজুহাতেই তাঁরা গঠনতন্ত্ররচনা পরিষদ থেকে বাইরে চলে আসতে পারতেন।

ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করবার যে কোনো প্রস্তাবের চিন্তাই আমাদের পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল। যে গভীর ভাবাবেগ ও বিশ্বাস সমগ্র জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, এটা ছিল তার বিরোধী। প্রকৃতপক্ষে ভারতের অবিচ্ছিন্ন ঐক্যের ভিত্তিতেই ভারতের সমগ্র জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। শুধু বর্তমানের জাতীয়তাবোধই এই ভাবাবেগের সৃষ্টি করেনি, এর উৎস ছিল প্রাচীন ও গভীরতর। ভারতীয় ইতিহাসের সুদূর অতীতেই এর উৎসের সন্ধান মেলে। ভারতীয় ঐক্যের প্রতি এই ভাবাবেগ ও নিষ্ঠা আধুনিক কালে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং বর্তমানে ভারতের অসংখ্য জনগণের কাছে এই ভাবাবেগ অপরিত্যাজ্য ও সন্দেহাতীত ধর্মবিশ্বাসের মত স্থান গ্রহণ করেছে। অবশ্য পরবর্তীকালে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটা আঘাত এসেছিল; কিন্তু খুব কম লোকই এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল, এমনকি মুসলমানদের মধ্যে পর্যন্ত অনেকেই মুসলিম লীগের সঙ্গে এবিষয়ে দ্বিমত ছিল। দেশবিভাগের একটা অস্পষ্ট পরিকল্পনার ইঙ্গিত থাকলেও মুসলিম লীগের বক্তব্যের মধ্যে আঞ্চলিক বিভাগই আসল কথা ছিল না। ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মধ্যযুগীয় জাতিত্ববোধই ছিল মুসলিম

লীগের দ্বিজাতিতত্ত্বের মূল ভিত্তি। ধর্মের ভিত্তিতে বিচার করলে ভারতের প্রত্যেকটি গ্রামেই দুই বা ততোধিক জাতির অস্তিত্ব আছে; সুতরাং এই ধরনের পরস্পরব্যাপ্ত ধর্মমূলক জাতিত্বের ভিত্তিতে কোনো রকমের দেশবিভাগই যুক্তিযুক্ত নয়। প্রকৃত-পক্ষে, যে সব সমস্যার সমাধানকল্পে দেশবিভাগ পরিকল্পনা করা হয়েছিল, এই ধরনের দেশবিভাগ আসলে সেই সব সমস্যাকেই তীব্রতর করে তুলত।

শুধু ভাবাবেগ নয়। দেশবিভাগের বিরুদ্ধে বহু অমোঘ যুক্তিও ছিল। বৃটিশ গভর্নমেন্টের অনুসৃত নীতির ফলে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সংকটের আকার ধারণ করেছিল; সুতরাং চূড়ান্ত বিপর্যয় থেকে মুক্তিলাভের জন্য ভারতের সর্বব্যাপী ও দ্রুত অগ্রগতির প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ভারতের বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার ভিত্তিতে একটা ব্যাপক ও কার্যকরী পরিকল্পনাই ভারতের এই অগ্রগতি সাধনে সক্ষম ছিল, কারণ তার বিভিন্ন অংশ পরস্পরের অভাবের পরিপূরক। সমগ্রভাবে ভারত শক্তিশালী ও অনেকাংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু তার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অংশের একটিকে আলাদা করে নিলে সেটি হবে দুর্বল এবং পরনির্ভরশীল। অতীতে এই সমস্ত যুক্তিতর্কের সত্যতা স্বীকৃত হয়েছে। আধুনিক কালের উন্নততর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বর্তমানে ভারতীয় ঐক্যের পক্ষে এই সমস্ত যুক্তিতর্ক আরও বেশি সত্য। পৃথিবীর সর্বত্রই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বতন্ত্রতার বিলোপ ঘটছিল—এই সব রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিক ও অন্যান্য স্বার্থে বড় বড় রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ছিল। অনেকগুলি রাষ্ট্র নিয়ে এক একটা রাষ্ট্রসমষ্টি বা রাষ্ট্রসংঘ গড়ে তোলার অনিবার্যতাই এই সময় বিশেষভাবে লক্ষিত হয়েছিল। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরিবর্তে বহু জাতির মিলিত একটি রাষ্ট্রের পরিকল্পনাই ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। এবং এই থেকে আস্তে আস্তে ভবিষ্যতে একটা সামগ্রিক বিশ্বরাষ্ট্র সংঘের লক্ষ্যও অনেকের কল্পনায় আশ্রয় নিয়েছিল।

বিপর্যয়ের চাপে এবং ঘটনার জরুরী তাগিদে অনেক সময় অনেককে নানা অবাঞ্ছনীয় ঘটনাকেও ইচ্ছার বিরুদ্ধেই স্বীকার করে নিতে হয়। যুক্তির দিক দিয়ে বা সাধারণ-ভাবে যেটা অবিভাজ্য, পরিস্থিতির নির্দেশ অনুযায়ী হয়তো তারই বিভাগ মাথা পেতে মানতে হয়। কিন্তু বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব এসেছিল, তাতে দেশ বিভাগের কোনো সুনির্দিষ্ট ও পরিষ্কার পরিকল্পনা ছিল না। তাদের প্রস্তাব এমন ছিল যে, এতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের মধ্যে অসংখ্য বিভেদ বিভাগের সূচনা হত। এই প্রস্তাবে দেশের যাবতীয় প্রতিক্রিয়াশীল, সামন্ততান্ত্রিক ও সামাজিক ভাবে পশ্চাৎপর শক্তিসমূহ সকলেই নিজের নিজের স্বার্থে অসংখ্য বিভাগের জন্য উৎসাহিত হয়ে উঠত। এরা যে সকলেই বাস্তবত আলাদা হতে চেয়েছিল তা নয়, কারণ নিজের পায়ে দাঁড়াবার মত ক্ষমতা এদের কারুরই ছিল না, কিন্তু ভারতের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের বিরুদ্ধে এরা অনেক কিছু বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করে তাতে অনেক বিলম্ব ঘটাতে পারত। ভবিষ্যতে তারা যদি বৃটিশ সরকারের উৎসাহ ও

পৃষ্ঠপোষকতা পেত—যার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল—তা হলে ভারতের স্বাধীনতা আগামী বহু দিনের জন্য মিথ্যা হয়ে যেত। বৃটিশের এই ভেদনীতি সম্পর্কে আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে এবং আমরা দেখেছি যে প্রতি ক্ষেত্রে এই নীতি কি ভাবে ভেদ-বিভেদের বিষাক্ত ভাবধারাকে পরিপুষ্ট করেছে। বৃটিশ যে এই ভেদ-নীতিই অনুসরণ করে চলবে না, এবং এই নীতি অনুসরণ করে পরে বলবে না যে, স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারত সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত নয়, তার কোনো নিশ্চিতি আমাদের সামনে ছিল না, বরঞ্চ আমাদের মনে হয়েছিল যে, এর সম্ভাবনাই সম্পূর্ণ।

সুতরাং বৃটিশ সরকারের এই প্রস্তাবে শুধু পাকিস্থান বা এই ধরনের কোনো সুনির্দিষ্ট দেশবিভাগের পরিকল্পনা ছিল না; সেটা যতই মন্দ হোক না কেন, এতে তার থেকেও অনেক বেশি ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। কারণ, এই প্রস্তাবের স্বীকৃতি ভারতবর্ষকে অসংখ্য খন্ড খন্ড বিভাগের সম্মুখে এনে হাজির করত। ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে এবং দীর্ঘদিন ধরে যে আশ্বাস আমাদের দেওয়া হয়েছিল তার কার্যকরিতার পক্ষে এটা একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করত।

প্রস্তাবে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎও জনসাধারণ বা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্ধারিত হবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না; এ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী নৃপতিরাই ছিলেন সর্বেসর্বা। এ ব্যবস্থা আমরা যদি স্বীকার করে নিতাম, তা হলে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে এত কাল আমরা যে নীতি ও আদর্শ ঘোষণা করে এসেছি, তারই বিরুদ্ধাচরণ করা হত; এবং স্বেচ্ছাচারী শাসনের অধীনে থাকতে বাধ্য করে আমরা দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করতাম। অবশ্য, সাম্রাজ্যবাদী কাঠামো থেকে গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের যুগে সহযোগিতা লাভের জন্য আমরা দেশীয় রাজ্যের নৃপতিবর্গের সমস্ত সুবিধা অসুবিধা সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করতে রাজী ছিলাম; এবং এটাও ঠিক যে বৃটিশের মত একটি তৃতীয় পক্ষ যদি না থাকত, তা হলে এবিষয়ে আমরা যে সাফল্য লাভ করতাম তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাদের স্বেচ্ছাচারিতার পিছনে যতদিন বৃটিশ সমর্থন থাকত এবং গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য তারা যতদিন বৃটিশ সামরিক শক্তির সাহায্যের উপর নির্ভর করতে পারত, ততদিন তারা ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে সম্ভবত আলাদা থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করত। এমনকি আমাদের বলা হয়েছিল যে, যদি সেরূপ পরিস্থিতি হয় তা হলে এই সমস্ত দেশীয় রাজ্যে বিদেশী সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখার ব্যবস্থা করা হবে। যেহেতু প্রস্তাবিত ভবিষ্যৎ ভারতীয় ইউনিয়নের অভ্যন্তরে দেশীয় রাজ্যগুলি ছিল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জের মত, সেজন্য বিদেশী সৈন্যবাহিনী কিভাবে এই সমস্ত রাজ্যে প্রবেশ করবার রাস্তা পাবে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। এবং এর সঙ্গে ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে বিদেশী সৈন্যবাহিনীর চলাচলের অধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নও জড়িত হয়ে পড়েছিল।

গান্ধীজি বহুবার ঘোষণা করেছিলেন যে, দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের সঙ্গে তাঁর কোনো শত্রুতা নেই। জনগণকে প্রাথমিক অধিকারগুলি থেকে বঞ্চিত করার জন্য এবং

শাসনব্যবস্থার স্বেচ্ছাচারিতা প্রসঙ্গে যদিচ তিনি মাঝে মাঝে তাঁদের সমালোচনা করেছেন, কিন্তু দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের প্রতি গান্ধীজির বরাবর একটা মিত্রভাবই ছিল। দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ থেকে তিনি বহুদিন কংগ্রেসকে বিরত করে এসেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, নিজেদের শক্তি ও আত্মবিশ্বাস অর্জন করে দেশীয় রাজ্যের জনগণই এই ব্যাপারে উদ্যোগী হবে। আমরা অনেকেই তাঁর এই নীতি সমর্থন করতে পারিনি। কিন্তু তবু তাঁর এই নীতি একটি মূল আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ-বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন 'এ-বিষয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি মূল আদর্শ হল এই যে, কোনো অবস্থাতেই আমি দেশীয় রাজ্যের জনগণের মৌলিক অধিকার খর্ব কখনও সমর্থন করব না—এমনকি বৃটিশ ভারতের জনসাধারণের স্বাধীনতার খাতিরেও নয়।' দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে গান্ধীজির (এবং কংগ্রেসের) এই দাবিকে ঔপনিবেশিক ও ভারতীয় গঠনতন্ত্র বিশারদ বিশিষ্ট অধ্যাপক বেরীডেল কীথ-ও সমর্থন করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন 'প্রদেশগুলির অধিবাসীরা যে অধিকার অর্জন করেছে দেশীয় রাজ্যের জনগণকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার পক্ষে সম্রাটের উপদেষ্টাদের কোনো যুক্তিই গ্রাহ্য নয়। তাদের উচিত সম্রাটের ক্ষমতা প্রয়োগ করে দেশীয় রাজ্যসমূহে অদূর ভবিষ্যতে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের সূচনা হিসাবে এখনি গঠনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনে এই সমস্ত নৃপতিদের বাধ্য করা। দায়িত্বহীন ও স্বেচ্ছাচারী নৃপতিদের মনোনীত ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রদেশসমূহের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একই সঙ্গে বসতে বাধ্য করে, এমন কোনো সংহত রাষ্ট্রের পরিকল্পনাই ভারতের স্বার্থের অনুকূল নয়। সম্রাট কর্তৃক জনগণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের পক্ষেও সেটা বাধ্যতামূলক—মিস্টার গান্ধীর এই যুক্তি খণ্ডন করা দুঃসাধ্য।' বৃটিশ গবর্নমেন্টের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে যে ফেডারেশনের প্রস্তাব এসেছিল সেই সম্পর্কেই অধ্যাপক কীথ এই মতামত প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের বর্তমান প্রস্তাবাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সে অভিমত অনেক বেশি প্রযোজ্য।

প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে আমরা যতই চিন্তা করেছি ততই সেগুলি আমাদের কাছে অসম্ভব অবাস্তব বলে মনে হয়েছে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী ভারত নামে মাত্র স্বাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন অসংখ্য রাজ্যসমষ্টিতে পরিণত হত। এই রাজ্যগুলির মধ্যে অনেকগুলিই তাদের স্বেচ্ছাচারী শাসন বজায় রাখবার জন্য বৃটিশ সমরশক্তির মুখাপেক্ষী। প্রস্তাবে ভারতের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ঐক্যসাধনের কোনো ইঙ্গিতই ছিল না। এবং এই সমস্ত ছোটখাট অসংখ্য দেশীয় রাজ্যের উপর কর্তৃত্বের সাহায্যে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপর আসলে বৃটিশ প্রভুত্ব কায়েম রাখা ছিল সহজসাধ্য।*

* বৃটিশশক্তি ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর দেশীয় রাজ্যগুলির পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতা সম্পর্কে স্যর জিওফ্রে দ্য মন্টমরেন্সী তাঁর 'দি ইন্ডিয়ান স্টেট্‌স্ অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ফেডা-

ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বৃটিশ সমর-মন্ত্রীসভার কি মনোভাব ছিল, তা আমি জানি না। কিন্তু আমার মনে হয় যে, ভারতের প্রতি একটা শুভেচ্ছা স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের ছিল এবং স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ভারত দেখবারই তিনি আশা করেছিলেন। কিন্তু বিষয়টি ছিল ব্যক্তিগত মতামত বা শুভেচ্ছার ঊর্ধ্বে। আমাদের সামনে ছিল একটা রাষ্ট্র দলিল—ইচ্ছাকৃত অস্পষ্টতা সত্ত্বেও অত্যন্ত যত্ন সহকারে এই দলিল রচিত হয়েছিল এবং এই দলিলকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ বা বিসর্জন করতে আমাদের বলা হয়েছিল। শতাধিক বছর ধরে বৃটিশ গবর্নমেন্ট ভারতে যে বিভেদ নীতির অনুসরণ এবং জাতীয় উন্নতি ও স্বাধীনতা অর্জনের পথে চিরদিন যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এসেছে—এই দলিলের মূল উৎস ছিল সেই পুরানো বৃটিশ নীতি। ইতিপূর্বে বৃটিশ সরকার যে সমস্ত সংস্কার ঘোষণা করেছিল, তার প্রত্যেকটিকেই তারা অনুরূপ সর্তাবলী দিয়ে সীমাবদ্ধ ও সংকুচিত রেখেছিল। আপাতদৃষ্টিতে এই সব সর্তাবলী তুচ্ছ মনে হলেও, পরে প্রমাণিত হয়েছিল যে, সেগুলিই ছিল আসল ক্ষমতা অর্জনের পথে প্রধান বাধাবিঘ্ন।

অবশ্য এই প্রস্তাবাবলীর যে সমস্ত সর্বনাশা ফলাফলের সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল হয়তো ভবিষ্যতে তার প্রত্যেকটাই রূপগ্রহণ করত না। কারণ ভারত ও বিশ্ব সম্পর্কে একটা বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিচার-বিবেচনা ও দেশাত্মবোধ অনেককে এমনকি দেশীয় রাজ্যের নৃপতিবর্গ ও তাদের মন্ত্রীদেরও প্রভাবিত করতে সক্ষম হত। ব্যাপারটা আমাদের নিজেদের মধ্যে ছেড়ে দিলে, আমরা আত্মনির্ভরতাসহ পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে প্রত্যেকটি দলের জটিল সমস্যাগুলির বিস্তৃত আলোচনায় অগ্রসর হতাম, এবং প্রত্যেকের সুবিধা-অসুবিধার বিচার করে একটা সাধারণ মিলিত মীমাংসার সিদ্ধান্ত করতে সক্ষম হতাম। কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ইঙ্গিত সত্ত্বেও আমাদের পরস্পরের উপর মীমাংসার ভার ছেড়ে দেওয়া হয়নি। বৃটিশ গভর্নমেন্টের অস্তিত্ব আমরা সব সময় অনুভব করেছি, এবং এই সব আলাপ আলোচনার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে তারা আমাদের মধ্যে মীমাংসার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে সব সময় উদ্যোগী ছিল। ভারত গভর্নমেন্টের সমগ্র শাসনযন্ত্রের কর্তৃত্বই যে শুধু বৃটিশের দখলে ছিল তাই নয়, রেসিডেন্ট এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের মারফত তারা দেশীয় রাজ্যেও তাদের অবাধ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। জনসাধারণের উপর যাঁরা চরম স্বেচ্ছাচারিতা চালাতেন সেই সমস্ত দেশীয় রাজ্যের নৃপতিরা ভাইসরয়ের নিজের ব্যক্তিগত কর্তৃত্বাধীনে 'রাজনৈতিক দপ্তরের' সম্পূর্ণ

রেশন' নামক পুস্তকে (১৯৪২) লিখেছেন: "দেশীয় রাজ্যগুলির সংখ্যাধিক্য ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতির সামনে একটা বিরাট সমস্যা—যার সমাধানের কোনো সম্ভাবনা আপাতত দেখা যাচ্ছে না...অবশ্য যদি কোনো সময় ভারতে বৃটেনের সার্বভৌমত্বের অবসান হয়, তখন এই সমস্ত দেশীয় রাজ্যের পৃথক অস্তিত্বের বিলোপ সাধন এবং ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তি অবশ্যম্ভাবী।"

আজ্ঞাবহ ছিলেন। বহু দেশীয় রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিত্বপদে বৃটিশ কর্মচারীরাই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বৃটিশ প্রস্তাবাবলীর যে সমস্ত ফলাফলের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলির সবই যদি কার্যকরী নাও হত, তবু এমন কতকগুলি সর্ত ও সূত্র এই প্রস্তাবে ছিল, যেগুলি ভারতের স্বাধীনতাকে ব্যাহত ও বিলম্বিত করতে এবং নূতন সঙ্কট ও সমস্যা সৃষ্টি করতে ছিল যথেষ্ট। এক প্রজন্ম আগে প্রবর্তিত ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের সর্বনাশা পরিণামের কথা আমরা সকলেই জানি। এর উপর এই প্রস্তাব দেশের যাবতীয় ভেদাভেদের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। অন্তহীন দেশবিভাগ এবং খণ্ড বিখণ্ড ভারতবর্ষই ছিল এর পরিণতি। যুদ্ধবিগ্রহের পটভূমিকায় এই অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের প্রতিই আমাদের বিশ্বস্ততা জ্ঞাপন করতে বলা হয়েছিল। এবং শুধু জাতীয় কংগ্রেস নয়, রাজনৈতিক দিক থেকে যাঁরা নরমপন্থী, বৃটিশ গভর্ন-মেন্টের সঙ্গে চিরদিন যাঁরা সহযোগিতা করে এসেছেন, তাঁরা পর্যন্ত এই প্রস্তাব মেনে নিতে তাঁদের অক্ষমতা জানিয়ে দিয়েছিলেন।

কংগ্রেস সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও দলগুলির বিশ্বাস ও সহযোগিতা অর্জনে বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিল এবং ভারতীয় ঐক্যের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস ঘোষণা করেছিল যে, ভারতের কোনো অংশকেই তার জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। অবশ্যম্ভাবী হিসাবে কংগ্রেস এমনকি দেশবিভাগেও সম্মত ছিল, যদিও দেশবিভাগের কোনো চিন্তা বা চেষ্টাকে উৎসাহ দিতে কংগ্রেস অনিচ্ছুক ছিল।

ক্রিপস্ প্রস্তাবের উপর গৃহীত প্রস্তাবে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি বলেছিল: 'ভারতের স্বাধীনতা ও ঐক্যের সঙ্গে কংগ্রেস একসূত্রে গ্রথিত। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে জনসাধারণের চিন্তাধারা বৃহত্তর সংহত রাষ্ট্র গঠনের দিকেই অনিবার্য ভাবে পরিচালিত হচ্ছে, এই অবস্থায় ভারতীয় ঐক্যের ভাঙনের পরিকল্পনা শুধু ক্ষতিকরই নয়, চরম বেদনাদায়কও বটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কার্যকরী সমিতি ভারতের কোনো অংশের অধিবাসী জনসাধারণের ঘোষিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে সেই অংশকে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধী। এই নীতি মেনে নিলেও কমিটির মত এই যে, ভারতের বিভিন্ন অংশের সহযোগিতায় যাতে একটা সাধারণ জাতীয় জীবনপ্রবাহ গড়ে ওঠে, তার অনুকূলে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই নীতি স্বীকৃতির অনিবার্য অর্থ হল এই যে, ভারতের অন্তর্ভুক্ত কোনো এলাকায় নূতন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে এমন কোনো পরিবর্তন অথবা সেই এলাকার বিভিন্ন সম্প্র-দায়ের কারো উপর জবরদস্তিমূলক আচরণ করা চলবে না। কেন্দ্রে যেমন শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হবে, তেমন ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি অংশ সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করবে। পারস্পরিক সহযোগিতা ও শুভেচ্ছাই যখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়, তখন বৃটিশ সমর মন্ত্রিসভার এই প্রস্তাব ভারতীয় সংহত রাষ্ট্র বা ইউনিয়ন গঠনের শুরুতেই দেশের ভিতর ভেদাভেদ ও সংঘর্ষকে ডেকে আনবে।

হয়তো সাম্প্রদায়িক দাবি মিটানোর উদ্দেশ্যেই এই প্রস্তাব রচিত হয়েছে, কিন্তু এর সঙ্গে অন্যান্য ফলাফলও জড়িত আছে। এই প্রস্তাবের বাস্তব কার্যকারিতা প্রতিক্রিয়াশীল ও বিভেদপন্থী দলসমূহের শক্তিবৃদ্ধি করে দেশের ভিতর অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে—আসল সমস্যাগুলি সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি নিয়ে আসবে।'

প্রস্তাবের মধ্যে কার্যকরী সমিতি আরও বলেছিল যে, 'আজকের গভীর সংকটজনক পরিস্থিতিতে বর্তমানই সবচেয়ে জরুরী, শুধু তাই নয়, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো প্রস্তাবের সেইটুকুই গুরুত্বপূর্ণ যেটুকু বর্তমানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।' ক্রিপস্ প্রস্তাবে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে সমস্ত উল্লেখ ছিল, তার সঙ্গে কার্যকরী সমিতি দ্বিমত হলেও যাতে দেশরক্ষার কঠিন দায়িত্ব ভারত যোগ্যভাবে সম্পন্ন করতে পারে সেজন্য কার্যকরী সমিতি যে কোনো রকম একটা মীমাংসার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। এ-বিষয়ে অহিংসাবাদের কোনো প্রশ্নই ওঠেনি এবং কার্যকরী সমিতির প্রস্তাবে তার কোনো উল্লেখও ছিল না। বস্তুত, এই সব প্রস্তাবাবলী আলোচনার সময় দেশরক্ষা ব্যাপারে একজন ভারতীয় মন্ত্রী নিযুক্ত করার প্রসঙ্গও আলোচিত হয়েছিল।

এই সময় কংগ্রেসের নীতি ছিল মোটামুটি নিম্নরূপ। যুদ্ধের সংকট তখন ভারতের দ্বারে উপস্থিত, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যাবতীয় প্রশ্ন তারা তখন মুলতুবী রেখে, যুদ্ধে পূর্ণ সহযোগিতা দান করতে সক্ষম জাতীয় সরকার গঠনেই মনোনিবেশ করতে রাজী ছিল। ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নির্দিষ্ট প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে কংগ্রেস সম্মতি দিতে পারেনি; কারণ তার ফলে অনেক ক্ষতিকর সম্ভাবনার উদ্ভব হতে পারে। কংগ্রেস এই সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ করছে না একথা স্পষ্ট জেনে, এই প্রস্তাবগুলি বৃটিশ সরকার প্রত্যাহার করুক অথবা ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের অভিপ্রায়ের সূচক হিসাবে সেগুলি বজায় রাখুক—তাতে আমাদের কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হত না। এবং এই দিক থেকে যুদ্ধাবস্থায় সহযোগিতার পথে এই প্রস্তাবগুলি কোনো অন্তরায়ই ছিল না।

যুদ্ধপরিস্থিতিতে বর্তমান সম্পর্কেও বৃটিশ সরকারের প্রস্তাব ছিল নিতান্ত অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। সমগ্র প্রস্তাবের মধ্যে তারা শুধু একটা বিষয়ই পরিষ্কার করে বলেছিল —ভারতের দেশরক্ষার ব্যাপারে বৃটিশ সরকারই সর্বেসর্বা থাকবে। স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের বহু বিবৃতি থেকেও এই ধারণাই হয়েছিল যে, দেশরক্ষা ছাড়া অন্য সমস্ত ক্ষমতা ভারতীয়দের সক্রিয় কর্তৃত্বাধীনে হস্তান্তরিত করা হবে। এমনকি, ইংলণ্ডের রাজার মত ভাইসরয় শুধু গঠনতান্ত্রিক নেতা হিসাবেই থাকবেন, প্রস্তাবে তারও উল্লেখ ছিল। এতে স্বভাবতই আমাদের মনে হয়েছিল যে কেবলমাত্র দেশরক্ষার বিষয়ে একটি নিষ্পত্তি হলেই মীমাংসা সম্ভব। এ-বিষয়ে আমাদের মত ছিল এই যে যুদ্ধের অবস্থায় দেশরক্ষা ব্যাপার জাতির অন্যান্য সমস্ত ক্রিয়াকর্মকে আবৃত করা সম্ভব এবং করেও। সুতরাং দেশরক্ষার বিষয়টিই যদি জাতীয় সরকারের কর্তৃত্বে না থাকে, তাহলে এই সময় জাতীয় সরকার সত্যকারের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত থাকবে। সশস্ত্র বাহিনী এবং যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে ব্রিটিশ প্রধান সেনাপতিরই যে সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে, সে বিষয়ে আমরা একমত ছিলাম। আমরা এও স্বীকার করে নিয়েছিলাম যে সাধারণ

যুদ্ধকৌশলও ব্রিটিশ সামরিক নেতৃত্বের অধীনেই থাকবে। কিন্তু এ ছাড়া জাতীয় সরকারের মধ্যে একজন ভারতীয় দেশরক্ষা সচিবের দাবিই আমরা করেছিলাম।

আলাপ আলোচনার পর স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ শেষ পর্যন্ত ভারতীয় সদস্যের অধীনে একটি দেশরক্ষা দপ্তর গঠনে রাজী হয়েছিলেন; কিন্তু এই দপ্তরের দায়িত্ব তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিলেন: যুদ্ধসম্পর্কে প্রচার-কার্য, পেট্রোল সরবরাহ, সৈন্যবাহিনীর ক্যান্টিন পরিচালনা, অফিসসংক্রান্ত যাবতীয় সরঞ্জাম, ছাপানোর কাজ পরিচালনা, বৈদেশিক সামরিক দৌত্যের জন্য সামাজিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা, সৈন্যবাহিনীর আনন্দদান ইত্যাদি। দেশরক্ষা দপ্তরের কর্তৃত্বাধীনে এই বিষয়গুলির সীমানির্দেশ বাস্তবিকই অসাধারণ এবং এতে প্রস্তাবিত দেশরক্ষা দপ্তরের ভারতীয় সদস্যের অবস্থা হয়ে পড়ত নিতান্ত হাস্যকর। এর পরে অবশ্য আলাপ আলোচনার ফলে দৃষ্টিভঙ্গির কিছু পরিবর্তন হয়েছিল। দুই তরফের দৃষ্টি-ভঙ্গির মধ্যে ব্যবধান অবশ্যই ছিল, কিন্তু মনে হয়েছিল সে ব্যবধান যেন ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আমরা পরস্পরের দিকে এগিয়ে এসেছিলাম। এই প্রথম অন্যান্য অনেকের মত আমারও মনে হয়েছিল যে, এখন একটি মীমাংসা হওয়া সম্ভব। যুদ্ধপরিস্থিতিতে সংকটের ক্রমবর্ধমান তীব্রতায় আমরা সকলেই একটা মীমাংসার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম।

যুদ্ধের বিপৎসঙ্কুল অবস্থা এবং বহিরাক্রমণের আশঙ্কা ক্রমশই প্রবলতর রূপ ধারণ করছিল, এবং যে করেই হোক তার প্রতিরোধ ছিল অত্যাবশ্যক। এবং বর্তমান ও বিশেষভাবে ভবিষ্যতে এই প্রতিরোধ গড়ে তোলার মাত্র একটি পথই ছিল। জাতির একটি বিশেষ মানসিক মুহূর্তেই এই ধরনের প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব। সে মুহূর্ত যদি পার হয়ে যায়, তাহলে শুধু বর্তমান নয়, আমাদের সমগ্র ভবিষ্যৎই সম্পূর্ণ বিপদ্‌গ্রস্ত হবে। সেজন্য চাই নূতন ও পুরাতন মত ও পথের নূতন ব্যবহার শিক্ষা, নূতন উদ্দীপনা, ব্যাপকতর নূতন পটভূমিকা, অতীত ও বর্তমানের সম্পূর্ণ বিপরীত ভবিষ্যতের উপর অচল বিশ্বাস, বর্তমানে সংঘটিত পরিবর্তনগুলিই যার প্রমাণস্বরূপ। খুব সম্ভবত চূড়ান্ত ব্যগ্রতার ফলেই আমাদের মধ্যে প্রচণ্ড আশার সৃষ্টি হয়েছিল; বৃটিশ শাসক ও আমাদের মধ্যে যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান ছিল, সাময়িকভাবে আমরা তার বিস্তৃতি ও গভীরতা ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু বিপর্যয় ও ধ্বংসের সম্মুখীন হলেই শত শত বৎসরের পুরানো সংঘর্ষ মিটে যায় না; কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই, নিতান্ত বাধ্য না হলে, কোনোদিন স্বেচ্ছায় পরাধীন দেশকে দাসত্বশৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেনি। এই সাম্রাজ্যবাদকে বাধ্য করার মত শক্তি বা দৃঢ়বিশ্বাস কি এই পরিস্থিতিতে নিহিত ছিল? এ সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না; কিন্তু এটাই ছিল আমাদের মনের ইচ্ছা ও আশা।

মীমাংসা সম্বন্ধে যখন আমি সব চেয়ে বেশি আশান্বিত হয়ে উঠেছিলাম, ঠিক সেই মুহূর্তে কতকগুলি অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে শুরু হল। আমেরিকায় একটি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স জাতীয় কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করেন। বৃটিশ সরকারের

সঙ্গে কংগ্রেসের যখন একটা মীমাংসার আলাপ আলোচনা চলছিল, ঠিক সেই সময়ে সুদূর আমেরিকায় তাঁর এই ধরনের বক্তৃতার কারণ খুব স্পষ্ট ছিল না, কিন্তু বৃটিশ সরকারের মতামত ও নীতির পূর্ণ সমর্থন তাঁর বক্তব্যের পিছনে না থাকলে এরূপ বক্তৃতা দেওয়া অসম্ভব। দিল্লীতে আমরা সবাই জানতাম যে ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো এবং ভারত সরকারের সমস্ত ঊর্ধ্বতন কর্মচারীবৃন্দ মীমাংসার বিরোধী ছিলেন, কারণ তাতে তাঁদের ক্ষমতা হ্রাস পেতে বাধ্য। ভিতরে ভিতরে অনেক ঘটনা ঘটছিল, যার সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কিছু জানা যেত না।

দেশরক্ষা সচিবের দায়িত্ব ও কাজ সম্পর্কে নূতন করে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের সঙ্গে আবার যখন আমাদের সাক্ষাৎ হল, তখন জানা গেল যে, ইতিপূর্বের সমস্ত আলোচনাই এখন বিষয়বহির্ভূত, কারণ প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো মন্ত্রীই নিয়োজিত হবে না। ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ্ কাউন্সিল যেমন ছিল তেমনই থাকবে—প্রস্তাবে শুধু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার কথাই ছিল। এই এক্সিকিউটিভ্ কাউন্সিল কোনো অংশে মন্ত্রীসভার তুল্য নয়, এটা ছিল শুধু কতকগুলি বিভাগীয় দপ্তরের কর্তা বা সেক্রেটারীর সমষ্টি এবং আসল সমস্ত ক্ষমতা ভাইসরয়ের হাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল। আমরা জানতাম যে আইনগত বা গঠনতান্ত্রিক পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ, এবং এই জন্যই এই অবস্থায় পরিবর্তনের জন্য আমরা পীড়াপীড়ি করিনি। এক্সিকিউটিভ্ কাউন্সিলকে মন্ত্রীসভার মর্যাদা এবং তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ভাইসরয়ের তরফ থেকে এই রীতির প্রবর্তন ও অনুসরণ—আমরা শুধু এইটুকুই চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হল যে তা সম্ভব নয়; শুধু নামে নয়, কাজেও সমস্ত ক্ষমতা ভাইসরয়ের হাতেই থাকবে। ক্রীপস্ প্রস্তাবের ভিত্তিতে আমাদের সমগ্র আলাপ আলোচনার মধ্যে এটা একটা বিস্ময়কর নূতন বক্তব্য; কারণ পূর্ববর্তী সমস্ত আলাপ আলোচনার ভিত্তিই ছিল অন্য রকম।

বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের প্রতিরোধ কিভাবে শক্তিশালী করা যায়, তাও আমরা আলোচনা করেছিলাম। যুদ্ধের মধ্যে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতীয় সেনা-বাহিনী যাতে জাতীয় সেনাবাহিনী বলে নিজেকে ভাবতে শেখে—সেজন্য আমরা ব্যগ্র ছিলাম। বহিরাক্রমণের সময় দেশরক্ষার জন্য নূতন সেনাবাহিনী, জনসাধারণের সশস্ত্র বাহিনী, হোমগার্ড ইত্যাদি গড়ে তুলতেও আমরা কম উদ্‌গ্রীব ছিলাম না। অবশ্য এই সমস্ত সামরিক সংগঠন প্রধান সেনাপতির পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনেই থাকবে। কিন্তু এখন আমাদের বলা হল যে আমরা এসব উদ্যোগ করতে পারব না। কারণ ভারতীয় সেনাবাহিনী বাস্তবপক্ষে বৃটিশ সেনাবাহিনীরই অন্তর্ভুক্ত অংশ এবং জাতীয় সেনাবাহিনী হিসাবে এর সংজ্ঞা নির্দেশ বা উল্লেখ করা চলতে পারে না। উপরন্তু বোঝা গেল যে, সেনাবাহিনী থেকে পৃথকভাবে জনসাধারণের সশস্ত্রবাহিনী বা হোম-গার্ড সংগঠন করার অধিকারও আমাদের থাকবে কি না তা সন্দেহজনক।

কাজেই ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে সরকারী শাসনযন্ত্র যেমন চলছিল তেমনই চলবে,

ভাইসরয় স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার অধিকারী থাকবেন এবং আমাদের মধ্যে কয়েকজন তাঁর তকমাধারী অনুচরের মত সেনাবাহিনীর ক্যান্টিন পরিচালনা প্রভৃতি কাজগুলি করে যাব। আঠারো মাস আগে মিস্টার আমেরী যে ধৃষ্ট প্রস্তাব আমাদের দিয়েছিলেন এবং যাকে আমরা ভারতের পক্ষে চূড়ান্ত অপমানজনক বলে মনে করেছিলাম, বৃটিশ সরকারের বর্তমান প্রস্তাবাবলীর সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র পার্থক্য ছিল না। অবশ্য এটা ঠিক যে ইতিপূর্বে যা কিছু ঘটেছে তার ফলে একটা মানসিক পরিবর্তন ছিল অবশ্য-ম্ভাবী। তা ছাড়া ব্যক্তিবিশেষের প্রভাবেও খানিকটা তফাৎ হয়। ভাইসরয়ের বেদীর চারপাশ ঘিরে আগের দিনে যে দাসসুলভ শাসনযন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল, নূতন অবস্থায় দৃঢ়চিত্ত ও কর্মক্ষম ব্যক্তিরা নিশ্চয় অন্যভাবে কাজ চালাত।

কিন্তু আমাদের পক্ষে যে কোনো সময়ে, বিশেষ করে ঐ সময়ে এই সমস্ত প্রস্তাব মেনে নেওয়া অসম্ভব ও কল্পনাতীত ছিল। আমরা যদি এই প্রস্তাব মেনে নেবার চেষ্টা করতাম তাহলে আমরা জনসাধারণের সমগ্র বিশ্বাস ও আস্থা হারিয়ে ফেলতাম। প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী সময়ে যখন এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলাপ আলোচনার সমস্ত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছিল, তখন আলোচনা চলাকালীন অবস্থায় আমরা আপোষের যে সামান্য মনোভাব দেখিয়েছিলাম, তার বিরুদ্ধেই তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল।

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের সঙ্গে আমাদের সমগ্র আলাপ আলোচনার মধ্যে কোনো সময় সংখ্যালঘিষ্ঠ বা সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। অবশ্য ভবিষ্যতের শাসনতান্ত্রিক ও গঠনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই এই প্রশ্নের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল, কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বৃটিশ প্রস্তাবের বিপক্ষে আমাদের প্রাথমিক প্রতি-ক্রিয়া হেতু এই সমস্ত সমস্যা ও প্রশ্ন চাপা পড়ে গিয়েছিল। প্রস্তাবে যদি আসল ক্ষমতা হস্তান্তরের ভিত্তিতে জাতীয় সরকার গঠনের স্বীকৃতি থাকত, তবেই এই সমস্ত প্রশ্ন ও সমস্যা দেখা দিত। কারণ জাতীয় সরকারে বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দ্ধারণ এই প্রশ্নগুলির সমাধানের উপরই নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু জাতীয় সরকার সম্পর্কে আলোচনার কোনো স্তরেই আমাদের মধ্যে মতৈক্য হয়নি, সুতরাং এইসব সমস্যা ও প্রশ্ন কোনো সময় আমাদের সামনে উপস্থিত হয়নি। আমাদের পক্ষ থেকে আমরা দেশের প্রধান দলগুলির সমর্থনের উপর জাতীয় সরকার গঠনে এত ব্যগ্র ছিলাম যে প্রতিনিধির সংখ্যা নিয়ে কোনো দ্বন্দ্বের আশঙ্কা আমাদের মনে জাগেনি। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের কাছে লিখিত একটি চিঠিতে কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছিলেন : আমরা একটা বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—আমরা যে সমস্ত প্রস্তাব ও দাবি উপস্থিত করেছি সেগুলি শুধু আমাদের নিজস্ব নয়, সমগ্র ভারতবাসীর অবিসম্বাদিত সমর্থন এর পিছনে আছে। এই সমস্ত বিষয়ে ভারতের বিভিন্ন দলের মধ্যে কোনো মতানৈক্য নেই। মতানৈক্য শুধু সমগ্র ভারতবাসী ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে। ভারতের অভ্যন্তরে বর্তমানে যে মতানৈক্য আছে তা ভবিষ্যতের গঠনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পর্কে। বর্তমান সঙ্কটে দেশরক্ষার চরম দায়িত্ব পালনে যথাসম্ভব ব্যাপকতম ঐক্য গড়ে তোলার জন্য আমরা এই বিষয়গুলি এখন

মুলতুবী রাখতে রাজী আছি। এ ব্যাপারে ভারতের সর্বসাধারণ সম্পূর্ণ একমত হওয়া সত্ত্বেও ভারতের বর্তমান দায়িত্ব, এবং বিশ্বের কোটি কোটি নরনারী যে কারণে স্বেচ্ছায় চরম নির্যাতন ও মৃত্যুবরণেও কুণ্ঠিত নয়, সেই বৃহত্তর দায়িত্ব পালনে যে স্বাধীন জাতীয় সরকারই একমাত্র কার্যকরী হতে পারে তার গঠনে বৃটিশ সরকার বাধা সৃষ্টি করলে নিতান্তই পরিতাপের বিষয় হবে।'

এর পরে তাঁর শেষ চিঠিতে কংগ্রেস সভাপতি বলেছিলেন: 'কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা আসুক সেজন্যই আমরা যে উদ্‌গ্রীব এমন নয়, সমগ্রভাবে ভারতবাসীর স্বাধীনতা এবং তাদের ক্ষমতালাভই আমাদের কাম্য...এ-বিষয়ে আমরা দৃঢ়মত যে বৃটিশ সরকার যদি ভেদাভেদ সৃষ্টির উৎসাহ না দেয়, তাহলে দলমত নির্বিশেষে আমরা পরস্পরের মধ্যে একটা বোঝাপড়া ও সকলের স্বীকৃত একটি কর্মপন্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হব। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে এই চরম সঙ্কট সময়েও বৃটিশ সরকার তার সর্বনাশা নীতি ত্যাগ করতে পারছে না। এর ফলে স্বভাবতই আমাদের মনে এই বিশ্বাসই দৃঢ়তর হচ্ছে যে ভারতের সামনে বর্তমানে যে আক্রমণ ও অভিযানের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তার বিরুদ্ধে দেশরক্ষার কার্যকরী ব্যবস্থা করার চেয়ে, বৃটিশ সরকারের কাছে ভারতে তাদের প্রভুত্ব যতদিন পারা যায় টিকিয়ে রাখাই আজ সব চেয়ে বড় কথা, এবং এই উদ্দেশ্যেই তারা দেশের মধ্যে সকল রকম ভেদাভেদ সৃষ্টিতে উদ্যোগী হয়েছে। আমাদের কাছে, এবং শুধু আমাদের নয়, সমগ্র ভারতবাসীর কাছেই আজ সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—দেশরক্ষা, এবং আমাদের সকল বিচারের মাপকাঠি আজ এইটাই।'

এই চিঠিতে দেশরক্ষা সম্পর্কে আমাদের নীতি ও মতামতও কংগ্রেস সভাপতি পরিষ্কার করে জানিয়ে দেন: 'প্রধান সেনাপতির স্বাভাবিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সঙ্কোচনের কথা কেউ তোলেনি। শুধু তাই নয়, প্রধান সেনাপতিকে যুদ্ধমন্ত্রী হিসাবে আরও কতগুলি ক্ষমতা দেওয়া—এতে পর্যন্ত আমরা রাজী ছিলাম। কিন্তু এখন এটা সুস্পষ্ট যে দেশরক্ষা সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার ও আমাদের ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে প্রচণ্ড পার্থক্য আছে। আমাদের কাছে দেশরক্ষা আজ দেশপ্রেমের দায়িত্ব ও জাতীয় কর্তব্য এবং এই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ভারতের প্রত্যেক নরনারীর প্রতি সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান। জনসাধারণের উপর পূর্ণবিশ্বাস রেখে এই বিরাট যুদ্ধপ্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য তাদের পূর্ণ সহযোগিতাই আমাদের কাম্য। অন্যদিকে, দেশরক্ষা সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান বিশেষত্ব হল এই যে জনসাধারণের উপর সম্পূর্ণ অবিশ্বাস এবং আসল ক্ষমতা থেকে তাদের বঞ্চিত রাখা। দেশরক্ষা সম্বন্ধে আপনি বৃটিশ সরকারের সার্বভৌম দায়িত্ব ও কর্তব্যের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ভারতের জনসাধারণ যদি আজ এই দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ না হয়, তাহলে উপরোক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন অসম্ভব, এবং অনতিপূর্বের ঘটনাবলীই তার প্রমাণস্বরূপ। ভারত সরকারের বোঝা উচিত যে কেবলমাত্র জনগণের যুদ্ধ হিসাবেই এই যুদ্ধের সাফল্যময় পরিচালনা সম্ভব।'

কংগ্রেস সভাপতির লিখিত এই শেষ চিঠির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ বিমানযোগে ইংলন্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু ফিরে যাবার আগে এবং ইংলন্ডে পেণছে তিনি এমন কতকগুলি প্রকাশ্য বিবৃতি দেন যাতে আসল ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত ছবিই ফুটে উঠেছিল। তাঁর এই সমস্ত বিবৃতি ভারতে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। ভারতের বহু দায়িত্বশীল ব্যক্তি এই সব বিবৃতির উপর্যুপরি প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ এবং অন্যান্য বৃটিশ রাজনীতিকরা সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন।

বৃটিশ সরকারের প্রস্তাবাবলী শুধু কংগ্রেস নয়, ভারতের প্রত্যেকটি দল প্রত্যাখ্যান করেছিল। আমাদের মধ্যে রীতিমত নরমপন্থী যেসব রাজনীতিক ছিলেন, তাঁরা পর্যন্ত এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ছিলেন। শুধু মুসলিম লীগ ছাড়া অন্য সকল দলের প্রত্যাখ্যানের যুক্তিতর্ক প্রায় একই প্রকৃতির ছিল। নিজস্ব স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী মুসলিম লীগ অন্যান্য সকলের মতামত শোনার জন্য অপেক্ষা করে, পরে নিজ কারণেই প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছিল।

ইংলন্ডের পার্লামেন্টে এবং অন্যত্র প্রচার করা হয়েছিল যে, কংগ্রেস কর্তৃক এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের আসল কারণ ছিল গান্ধীজির আপোষ বিরোধী মনোভাব। কথাটা সর্বৈব মিথ্যা। প্রস্তাবের মধ্যে অসংখ্য দেশবিভাগের যে সম্ভাবনা পরিস্ফুট ছিল এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের নয় কোটি জনসাধারণের মতামতকে যেভাবে উপেক্ষা করা হয়েছিল, অন্যান্য সকলের সঙ্গে গান্ধীজিও এ বিষয়ে তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। ভবিষ্যৎকে বাদ দিয়ে বর্তমান সমস্যার ভিত্তিতে পরবর্তী যে সমস্ত আপোষ আলোচনা পরিচালিত হয়েছিল, এই সমস্ত আলোচনায় তাঁর স্ত্রীর অসুস্থতা হেতু গান্ধীজি অনুপস্থিত ছিলেন, সুতরাং তাতে গান্ধীজি কোনো অংশই গ্রহণ করেননি। ইতিপূর্বে কয়েকবার অহিংসাবাদ সম্পর্কে গান্ধীজির সঙ্গে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির মতভেদ হয়েছিল; এবং গান্ধীজির মত-বিরোধ সত্ত্বেও বিশেষত দেশরক্ষার দিক থেকে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সহযোগিতার উদ্দেশ্যে কার্যকরী সমিতি জাতীয় সরকার স্থাপন করার জন্য বিশেষ ব্যগ্র ছিল।

যুদ্ধই ছিল সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, এবং এই প্রশ্নই সমগ্র ভারতবাসীর চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আক্রমণের আশঙ্কা ক্রমশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছিল। কিন্তু তবু বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আমাদের মীমাংসার পথে যুদ্ধপরিচালনার ব্যাপার কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করেনি; কারণ আমরা জানতাম যে এ-বিষয়ে সাধারণ লোক নয়, বিশেষজ্ঞদের দায়িত্বই সর্বপ্রধান। যুদ্ধপরিচালনার ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে মীমাংসা খুব সহজসাধ্য ছিল। আসল সমস্যা ছিল জাতীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর। এটা ভারতের জাতীয়তাবোধ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংঘর্ষের সেই চিরন্তন সমস্যা এবং যুদ্ধাবস্থাতেই হোক আর স্বাভাবিক অবস্থাতেই হোক, এ বিষয়ে ইংলন্ড ও ভারতের বৃটিশ শাসকশ্রেণী তাদের প্রভুত্ব কায়েম রাখতে বদ্ধপরিকর ছিল। এদের সকলের পিছনের শক্তি ছিলেন মিস্টার উইনস্টন চার্চিল।

৯ : হতাশা

ক্রীপস্ প্রস্তাবের আলাপ আলোচনার মধ্যপথে সমাপ্তি এবং স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের আকস্মিক প্রত্যাবর্তনে আমরা সকলেই বিস্মিত হয়েছিলাম। আলোচনার মধ্যে যা প্রমাণিত হয়েছিল এবং ইতিপূর্বে বহুবার যার পুনরাবৃত্তি হয়েছে, সেই যৎসামান্য আপোষ প্রস্তাব উপস্থিত করতেই কি বৃটিশ সমরমন্ত্রীসভার একজন বিশিষ্ট সভ্য ভারতে এসেছিলেন? অথবা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে ভ্রান্তিসৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এই সমস্ত আলাপ আলোচনার অনুষ্ঠান করা হয়েছিল? ভারতবর্ষে এর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তীব্র ও তিক্ত। বৃটেনের সঙ্গে একটা মীমাংসা হবার কোনো আশা রইল না, আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এবং দেশরক্ষার জন্য ভারতবাসীর উদগ্র আকাঙ্ক্ষাকে কাজে পরিণত করার কোনো সুযোগের সম্ভাবনা রইল না।

ইতিমধ্যে ক্রমশই আক্রমণের আশঙ্কা ঘনীভূত হয়ে উঠছিল, এবং ভারতের পূর্ব-সীমান্ত থেকে বুভুক্ষু আশ্রয়প্রার্থীরা দলে দলে চলে আসছিল। আক্রমণের আশঙ্কায় ভীতিগ্রস্ত কর্তৃপক্ষ পূর্ববঙ্গে হাজার হাজার নৌকা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন (অবশ্য পরে স্বীকৃত হয়েছিল যে সরকারী একটি আদেশের তাৎপর্যের বিভ্রান্তির ফলেই এটা ঘটেছিল)। পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় নদনদীই ছিল চলাচল ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ এবং এই নৌকাগুলিই ছিল একমাত্র যানবাহন। এগুলি ধ্বংস করে দেওয়ার ফলে পূর্ববঙ্গের অনেকগুলি অঞ্চল একেবারে যোগাযোগহীন হয়ে পড়ে এবং এইসব যান-বাহনহীন অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনধারণের সকল রকম উপায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে বাঙলার ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণও ছিল এইটাই। বাঙলা থেকে ব্যাপক পশ্চাদপসরণের প্রস্তুতি কর্তৃপক্ষ করেছিলেন এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ বর্মায় যা ঘটেছিল, এখানেও তার পুনরাবৃত্তি হবে বলেই সকলের ধারণা হয়েছিল। জাপানী নৌবাহিনীর উপস্থিতি সম্পর্কে একটা বাজে ও অসমর্থিত গুজবের (পরে এটা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল) ফলে মাদ্রাজ শহরের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীবৃন্দ অকস্মাৎ শহর ত্যাগ করেন, এমনকি মাদ্রাজ বন্দরের কিছু কিছু ব্যবস্থাও ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। সরকারী শাসনযন্ত্রের মধ্যে নিদারুণ স্নায়বিক দৌর্বল্য ও বিপর্যয় এসে গিয়েছিল; একমাত্র জাতীয় আন্দোলন দমনেই তারা তখনও পর্যন্ত শক্তিশালী ছিল।

আমাদের কর্তব্য কি ছিল? বিদেশী আক্রমণের কাছে ভারতের কোনো অংশ উপায়-হীন ভাবে নতি স্বীকার করবে—এটা আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিলাম না। সশস্ত্র প্রতিরোধের বিষয়ে সকল দায়িত্ব ছিল সৈন্য ও বিমানবাহিনীর—তাদের অবস্থা যেমনই হোক না কেন। এদিকে মার্কিন সাহায্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল, বিশেষ করে বিমান প্রভৃতির আকারে এবং সমগ্র যুদ্ধ ব্যবস্থায় একটা মৃদু পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। এর মধ্যে আমাদের পক্ষে যে সাহায্য সম্ভব ছিল তা এই: দেশের অভ্যন্তরে সমগ্র চিন্তাধারার একটা পরিবর্তন সাধন; এবং দুর্নিবার প্রতিরোধের

আকাঙ্ক্ষায় জনসাধারণকে উদ্দীপ্ত করে জনসাধারণের সশস্ত্রবাহিনী, হোমগার্ড প্রভৃতি গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই এই পরিবর্তন সাধন সম্ভবপর ছিল। কিন্তু এ-বিষয়ে প্রচণ্ড অন্তরায় ছিল বৃটিশ নীতি। আক্রমণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সেনা-বাহিনীর বহির্ভূত কোনো ভারতীয়ের হাতে বন্দুক তুলে দিতে ভরসা পায়নি, এমনকি গ্রামাঞ্চলে আত্মরক্ষার জন্য আমরা যে সমস্ত নিরস্ত্র নাগরিকবাহিনী গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলাম, সে প্রচেষ্টাও তারা সুনজরে দেখেনি, এবং অনেক ক্ষেত্রে তা দমন করা হত। গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার উৎসাহ দেওয়া দূরে থাক, এ-বিষয়ে বৃটিশ সরকারের রীতিমত ভীতিই ছিল। কারণ দীর্ঘদিন যাবৎ আত্মরক্ষামূলক গণবাহিনীগুলিকে বৃটিশ শাসনের পক্ষে ক্ষতিকর ও বে-আইনী হিসাবেই তারা দেখে এসেছে। তাদের সামনে দুটো পথ ছিল। দেশরক্ষার জন্য জনসাধারণকে সংগঠিত করা এবং তাদের সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সরকার স্থাপন অথবা তাদের পুরানো নীতির অনুসরণ—এর মধ্যে তারা শেষোক্তটিই বেছে নিয়েছিল। তাদের কাছে মধ্যপন্থা কিছু ছিল না। জনসাধারণকে তারা নিজেদের তৈজসপত্র হিসাবে মূক আজ্ঞাবহ বলেই বরাবর মনে করত এবং জনসাধারণের ইচ্ছা অনিচ্ছা, প্রচেষ্টার কোনো মূল্য ছিল না। ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসের শেষের দিকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক সম্মেলনে, কমিটি বৃটিশ সরকারের এই নীতি ও আচরণের তীব্র নিন্দা করেছিল এবং ঘোষণা করেছিল যে বিদেশী শাসকের দাস হিসাবেই একমাত্র যে পথ খোলা আছে, সে পথ আমরা কখনই গ্রহণ করতে পারি না।

অন্যদিকে বিপর্যয় এত আসন্ন হয়ে পড়েছিল যে আমাদের পক্ষে নীরব ও নিষ্ক্রিয় দর্শক হিসাবে থাকা একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। আক্রমণের অবস্থায় জনসাধারণের কর্তব্য কি সে সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে স্বভাবতই আমরা বাধ্য ছিলাম। আমরা তাদের বলেছিলাম যে বৃটিশ নীতির বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ সত্ত্বেও তাদের এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে বৃটিশ বা মিত্রশক্তির সশস্ত্রবাহিনীর যুদ্ধপরিচালনায় বিঘ্নসৃষ্টি হতে পারে; কারণ এই ধরনের বিঘ্নসৃষ্টি পরোক্ষে আক্রমণকারী শত্রুকেই সাহায্য করত। এ ছাড়া, আক্রমণকারী শত্রুর নিকট তারা যেন কিছুতেই আত্মসমর্পণ বা নতিস্বীকার না করে, এবং তার কাছে কোনোরকম সুযোগসুবিধা গ্রহণ না করে। শত্রুসৈন্য যদি জনগণের ভূসম্পত্তি দখল করতে এগিয়ে আসে তাহলে মৃত্যুবরণ করেও তাদের প্রতিরোধ করতে হবে। সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পথেই এই প্রতিরোধ চালাতে হবে—শত্রুর সঙ্গে চরম অসহযোগিতাই হবে এই প্রতিরোধের পরিপূর্ণ রূপ।

আক্রমণকারী শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের রূপ হিসাবে আমাদের এই অহিংস অসহযোগিতা অনেকের কাছে অসম্ভব ও অবাস্তব কল্পনা বলে মনে হয়েছিল; এবং এ নিয়ে অনেক বিদ্রূপাত্মক সমালোচনাও আমাদের শুনতে হয়েছিল। কিন্তু এই অসহযোগিতা কি সত্য সত্যই এতখানি অবাস্তব ছিল? প্রতিরোধ গড়ে তুলতে জনসাধারণের কাছে এর চেয়ে বেশি কার্যকরী ও সাহসী পন্থা আর কি ছিল? সশস্ত্র বাহিনীকে আমরা এই পরামর্শ দিইনি, এবং কোনো ক্ষেত্রেই সশস্ত্র প্রতিরোধের স্থানে

অহিংসনীতি অবলম্বন করতে আমরা বলিনি। আমরা শুধু নিরস্ত্র সাধারণ জনগণকেই এই পরামর্শ দিয়েছিলাম, কারণ আক্রমণকারীর কাছে পরাজিত সশস্ত্রবাহিনী যখন পশ্চাদপসরণ করে তখন সাধারণত এই নিরস্ত্র জনগণ আক্রমণকারীর নিকট নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। সশস্ত্র সেনাবাহিনী ছাড়াও শত্রুকে নাস্তানাবুদ করার জন্য দেশের মধ্যে গেরিলাবাহিনী গড়ে তোলা যেত। কিন্তু আমাদের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না; কারণ এই ধরনের গেরিলাবাহিনী গড়ে তোলার জন্য সামরিক শিক্ষা, অস্ত্রশস্ত্র এবং সেনাবাহিনীর তরফ থেকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা ছিল নিতান্ত অপরিহার্য। তা ছাড়া, কিছু কিছু গেরিলাবাহিনী গড়ে তোলা যদিও বা সম্ভব হত, বাকি জনসাধারণ কি করত? শত্রুর কাছে তারা আত্মসমর্পণ করবে এইটাই স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয়। বস্তুত, জানা গিয়েছিল যে বিপন্ন অঞ্চলগুলির জনসাধারণকে ঠিক এই উপদেশই বৃটিশ কর্তৃপক্ষ দিয়েছিল।

আমরা জানতাম যে অহিংস অসহযোগিতার দ্বারা শত্রু সৈন্যের অগ্রগতি রোধ করা যায় না। আমরা আরও জানতাম যে ইচ্ছা সত্ত্বেও বহুসংখ্যক ব্যক্তির পক্ষে প্রতিরোধ দেওয়া সম্ভবপর হবে না। কিন্তু তবু আমাদের আশা ছিল যে শত্রুকবলিত শহর ও গ্রামাঞ্চলের বিশিষ্ট ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তত কয়েকজন হয়তো শত্রুর আদেশ পালনে এবং তার কাছে নতি স্বীকার করতে অথবা খাদ্যোপকরণ সংগ্রহ করে তাকে সাহায্য করতে রাজী হবে না। অবশ্য এর ফলে চরম শাস্তি এমনকি হয়তো তাদের মৃত্যুও বরণ করতে হত। তবু আমাদের মনে হয়েছিল যে মুষ্টিমেয় এই কয়েকজনের মৃত্যুপণ দুর্জয় প্রতিরোধ ও নতি স্বীকারের বিরোধিতা, শুধু সেই বিশিষ্ট অঞ্চলেই নয় সমগ্র ভারতবর্ষের জনগণের উপরই প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। এবং আমরা আশা করেছিলাম যে এইভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে উঠবে।

মাসকয়েক আগে থাকতেই শহর ও গ্রামাঞ্চলে অনেক ক্ষেত্রে সরকারী বিরোধিতা সত্ত্বেও, আমরা খাদ্য কমিটি ও আত্মরক্ষাবাহিনী গড়ে তুলছিলাম। খাদ্য পরিস্থিতি আমাদের ক্রমশই উদ্বিগ্ন করে তুলছিল; আমরা আশঙ্কা করছিলাম যে যুদ্ধ এবং যানবাহনের ক্রমবর্ধমান অসুবিধার ফলে এই সমস্যা সংকটের আকার ধারণ করবে। এ-বিষয়ে গবর্নমেন্টের কোনো ব্যবস্থাই করার লক্ষণ ছিল না। গ্রামাঞ্চলে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল এক একটা প্রাথমিক গোষ্ঠী গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলাম এবং আধুনিক যানবাহন ব্যবস্থা যদি বিলুপ্ত হয়, সে অবস্থায় গোযান প্রভৃতি আদিম যুগের যানবাহন দিয়েই কাজ চালানো সম্বন্ধে আমরা জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াস করেছিলাম। এ ছাড়া, ঠিক চীন দেশে যা ঘটেছিল, তেমনি ভারতের পূর্ব-সীমান্তে শত্রুর আক্রমণ হলে সেই সব অঞ্চল থেকে হাজার হাজার আশ্রয়প্রার্থী ও বাস্তুত্যাগী ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে চলে আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। তাদের অন্নবস্ত্র ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা করার জন্য আমরা নিজেদের প্রস্তুত রাখতে সচেষ্ট ছিলাম। অবশ্য সরকারী সহযোগিতা ছাড়া এই সব সমস্যার সমাধান প্রায় দুঃসাধ্য; কিন্তু

নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী আমরা এ-বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম। এই সবই ছিল আত্মরক্ষা বাহিনীগুলির প্রধান কাজ—অমূলক ভীতির বিরুদ্ধে নিজ নিজ অঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা তাদেরই কর্তব্য ছিল। এমনকি সুদূর কোনো অঞ্চলে শত্রুবিমান বা শত্রুসৈন্যের আক্রমণের সংবাদই সাধারণ জনগণের মধ্যে যে একটা নিদারুণ ত্রাস সঞ্চার করতে সক্ষম হবে তার খুবই সম্ভাবনা ছিল এবং এই অহেতুক ত্রাস রোধ করা ছিল নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এ-বিষয়ে সরকারের তরফ থেকে যেসব ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল, সেগুলি শুধু যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল তাই নয়, সাধারণ লোকে সেসব সন্দেহের চোখেই দেখত। সে সময় গ্রামাঞ্চলে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতির প্রকোপই বেড়ে চলছিল।

এই সব বিরাট পরিকল্পনা আমরা করেছিলাম এবং এর কিছু কিছু অংশ কার্যকরীও হয়েছিল। কিন্তু যে বিরাট সমস্যা ও সংকটের সম্মুখীন আমরা হয়েছিলাম, তার তুলনায় এ সব প্রায় কিছুই ছিল না। কেবল মাত্র সরকারী শাসনব্যবস্থা এবং জনসাধারণের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতাই এই বিরাট সমস্যার প্রকৃত সমাধান করতে পারত, কিন্তু তা ছিল নিতান্ত অসম্ভব। অবস্থাটা আমাদের কাছে চরম বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছিল। সংকট আমাদের মাথার উপর এসে পড়েছিল এবং তার বিরুদ্ধে সক্রিয় কিছু করবার জন্য আমরাও অধীর হয়ে উঠেছিলাম; কিন্তু যথার্থ কার্যকরী কিছু করার অধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত ছিলাম। ভারতের বুকে সংকট ও বিপর্যয় বিদ্যুদ্গতিতে এগিয়ে আসছিল; কিন্তু নিষ্ক্রিয় এবং অসহায়, তিক্ত এবং বিক্ষুব্ধ ভারতবর্ষের কিছুই করার ছিল না। ভারতবর্ষ শুধু পরস্পরবিরোধী বিদেশী সৈন্যের একটি রণক্ষেত্রস্বরূপ।

যুদ্ধের প্রতি আমার একটা তীব্র বিতৃষ্ণাই ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনায় আমি ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়িনি। এক হিসাবে অন্তরে অন্তরে আমি ভারতে আসন্ন এই যুদ্ধের প্রতি আকৃষ্টই হয়ে উঠেছিলাম, তা যতই সর্বনাশা হোক না কেন। আমি চেয়েছিলাম একটা প্রচণ্ড নাড়াচাড়া—কোটি কোটি ভারতবাসীর ব্যক্তিগত এক অভিজ্ঞতা যা তাদের বৃটেনের সৃষ্ট শ্মশানতুল্য শান্তির সমাধি থেকে টেনে বার করে আনবে। এমন একটা কিছু যা তাদের অতীতের জীর্ণ বাধাবন্ধন থেকে মুক্ত করে বাস্তব বর্তমানের মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহায্য করবে, সংকীর্ণ রাজনীতিক দ্বন্দ্বকলহ এবং সাময়িক সমস্যায় নিবিষ্টচিত্ত ভারতবাসীকে এই সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে উত্তীর্ণ করবে। অতীত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ নয়, কিন্তু অতীতের মধ্যে নিমজ্জিতও থাকতে চাই না। বর্তমানকে উপলব্ধি করতে হবে, ভবিষ্যৎকে দৃষ্টির পরিধির মধ্যে টেনে নিয়ে আনতে হবে......বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জীবনপ্রবাহকে নূতন ছন্দে ছন্দিত করতে হবে। জীবনের উপর যুদ্ধ একটা প্রচণ্ড গুরুভার—তার ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। আমরা যুদ্ধ চাইনি; কিন্তু যখন যুদ্ধ আমাদের উপর এসে পড়েছে, তখন এই যুদ্ধের দ্বারাই জাতিকে দৃঢ়তর ও বলীয়ান করে তুলতে হবে; এই যুদ্ধই জাতীয় মানসকে জ্বলন্ত অভিজ্ঞতার আগুনে দহন করে সমগ্র জাতির নব-

জীবনের পুষ্পিত বিকাশের সূচনা ঘটাবে। অসংখ্য লোককে অনিবার্যভাবে মৃত্যুকেই বরণ করতে হবে; কিন্তু দুর্ভিক্ষে তিলে তিলে মৃত্যুর চেয়ে যুদ্ধের মধ্যে মৃত্যুর আহ্বান অনেক বেশি কাম্য; আশাহীন, হতভাগ্য জীবনযাপন অপেক্ষা মৃত্যু অনেক বেশি শ্রেয়। মৃত্যু থেকেই জীবনের নবজন্ম—যে ব্যক্তি বা যে জাতি মরতে জানে না, সে বাঁচতেও জানে না। 'যেখানেই শ্মশান সমাধি, সেখানেই জীবনের পুনরুন্মেষ।'

ভারতবর্ষের দরজায় যুদ্ধ এসে হাজির হল, কিন্তু তা না আনল আমাদের চিত্তে কোনো তীব্র উত্তেজনা, না আনল কর্মপ্রবণতার চঞ্চলতা—যা যন্ত্রণা ও মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে এমনকি নিজেকে পর্যন্ত তুচ্ছ করে স্বাধীনতা অর্জনের মহান আদর্শে এবং ভবিষ্যতের স্বপ্নে আমাদের বিভোর করে রাখতে পারত। নির্যাতন ও দুঃখই ছিল আমাদের ভাগ্যে, আর ছিল আসন্ন সংকটের ও বিপর্যয়ের একটা উপলব্ধি যা আমাদের অনুভূতিকে করেছিল তীক্ষ্ণতর, বেদনাকে তীব্রতর। অথচ এই বিপর্যয় রোধ করার কোনো প্রচেষ্টা করার অধিকার পর্যন্ত আমাদের ছিল না। পরিণামের শোচনীয়তা আমাদের বিহ্বল করে তুলে ছিল। শুধু ব্যক্তিবিশেষের নয়, সমগ্র জাতির সামনেই ছিল এই শোচনীয় পরিণতি।

যুদ্ধে জয় পরাজয়, কে জিতল কে হারল, তার সঙ্গে ভারতের জাতীয় চেতনার এই বিহ্বলতার কোনো যোগাযোগ ছিল না। চক্রশক্তির জয় আমরা চাইনি, কারণ তাদের জয় সর্বনাশকেই আহ্বান করত। ভারতের সীমানার মধ্যে জাপানীদের ঢুকতে দিতেও আমরা চাইনি। বহুবার আমরা জনসাধারণকে বলেছি যে জাপানী আক্রমণকে যে করেই হোক রুখতে হবে। কিন্তু এ সবই ছিল নেতিমূলক। এই যুদ্ধের আসল লক্ষ্য বা আদর্শ কি? এই যুদ্ধের মধ্য থেকে কি প্রকারের ভবিষ্যৎ রূপায়িত হবে? অতীতের ভুলভ্রান্তি ও পরাজয়ের পুনরাবৃত্তিই কি ঘটবে? মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার নির্মম দলনের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই অন্ধ প্রাকৃত শক্তির জয়ই কি অবশ্যম্ভাবী? ভারতের ভাগ্যই বা কি রূপ পরিগ্রহ করবে?

এক বছর আগে মৃত্যুশয্যা থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বাণী দিয়েছিলেন, আমাদের মনে তাঁর সেই শেষ ঘোষণাই ফুটে উঠেছিল : "......এমন সময় দেখা গেল সমস্ত ইউরোপে বর্বরতা কিরকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানব পীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে' আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে। আমাদের হতভাগ্য নিঃসহায় নীরন্ধ্র অকিঞ্চনতার মধ্যে আমরা কি তার কোনো আভাস পাইনি।

"ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরাজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কি লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম ইউরোপের সম্পদ অন্তরের

ভারতের সরকারী নীতির মূল লক্ষ্য। চতুর্দিক থেকে আমাদের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছিল। ক্রীপ্‌স প্রস্তাবের আলাপ আলোচনা চলাকালীন অবস্থাতেও আমাদের বহু কর্মী কারাজীবন যাপন করছিলেন। এবং মীমাংসা আলোচনা ব্যর্থ হবার পর আমার বহু অন্তরঙ্গ ও বিশিষ্ট বন্ধু ও সহকর্মী ভারতরক্ষা আইনের বিধিতে গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। মে মাসের প্রথম দিকে রফি আহ্‌মেদ কিদোয়াইকে গ্রেপ্তার করা হল। যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীকৃষ্ণ দত্ত পালিওয়াল এবং আরও অনেকে পর পর গ্রেপ্তার হলেন। মনে হল এইভাবে বেছে বেছে আমাদের গ্রেপ্তার করে কর্মক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে। এ সবেরই উদ্দেশ্য ছিল স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে জাতীয় আন্দোলনকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া। নিঃশব্দে এসব মেনে নেওয়া কি আমাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল? না, এই নতিস্বীকারের শিক্ষায় আমরা গড়ে উঠিনি। বৃটিশ সরকারের এই তাচ্ছিল্যপূর্ণ ব্যবহারে আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় আত্মগরিমা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু আক্রমণের আশঙ্কা যখন প্রবল এবং যুদ্ধের সংকট যখন গভীরতম, তখন আমাদের পক্ষে কীই বা করার ছিল? অথচ এ অবস্থায় আমাদের নিষ্ক্রিয়তাও এ ব্যাপারে কোনো সাহায্যস্বরূপ ছিল না, কারণ ঘটনাপ্রবাহের ধারা সাধারণের মধ্যে এমন একটা মনোভাবের সৃষ্টি করেছিল যে আমরা ক্রমশই উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হয়ে উঠছিলাম। সংকটের অবস্থায় আমাদের মত বিরাট দেশে জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ও ভাবধারার সৃষ্টি স্বাভাবিক। জাপানী সমর্থনের মনোভাব সত্য সত্যই কিছু ছিল না, কারণ এক প্রভুর স্থানে আর এক প্রভুকে প্রতিষ্ঠিত করতে কেউই চায়নি, অন্যদিকে চীনের প্রতি ছিল একটা গভীর সহানুভূতি। কিন্তু জনসাধারণের একটি ক্ষুদ্র অংশ পরোক্ষভাবে জাপানীদের সমর্থন করত। তারা মনে করেছিল জাপানী আক্রমণের সুযোগে ভারতের স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামকে সফলকাম করা যাবে। আগের বছর গোপনে ভারতের বাইরে চলে গিয়ে সুভাষচন্দ্র বসু বিদেশ থেকে যেসব বেতার বক্তৃতা করতেন জনসাধারণের এই অংশ তাতেই বেশি প্রভাবিত হয়েছিল। অবশ্য জনসাধারণের অধিক সংখ্যক মোটামুটি নিষ্ক্রিয়ই ছিল, তারা শুধু নির্বাকভাবে ঘটনার অগ্রগতি লক্ষ্য করছিল। দুর্ভাগ্যবশত ভারতের কোনো অংশ যদি এই সময় জাপানী সৈন্যের দখলে আসত, তা হলে এটা ঠিক যে এইসব অঞ্চলে অনেকেই, বিশেষত নিজেদের জীবন ও ধনসম্পদ রক্ষায় ব্যগ্র বিত্তশালীদের একটি বিরাট অংশ জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতাই করত। এই দাসসুলভ সহযোগিতার মনোভাবকে বৃটিশ সরকার অতীতে তার নিজের স্বার্থেই ব্যবহার ও উৎসাহিত করেছিল; এবং এই সব লোক অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে সিদ্ধ ছিল।

দুর্বার প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠা সত্ত্বেও আমরা ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নরওয়ে এবং ইউরোপের নাৎসী অধিকৃত দেশগুলিতে দেখেছি শত্রুর সঙ্গে সহযোগিতা কি

ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে। আমরা দেখেছি যে (পার্টিন্যাক্সের ভাষায়) 'চরম লজ্জাকে সম্মান হিসাবে, ভীরুতাকে সাহস হিসাবে, ক্লীবত্ব ও অজ্ঞতাকে জ্ঞান, আত্মনিগ্রহকে সৎপন্থা এবং জার্মানশক্তির কাছে সর্বান্তঃকরণ নতিস্বীকারকে নৈতিক নবজীবন হিসাবে চালাতে কি অপরিসীম চেষ্টা' ভিসির নায়করা করেছিল। বিপ্লব ও জ্বলন্ত দেশাত্মবোধের পীঠস্থান ফ্রান্সেই যদি এই কুৎসিত অবনতি ঘটে থাকে, তা হলে বৃটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় যেখানে দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের আত্মাবনতি পুরস্কৃত হয়ে আসছে, সেই ভারতবর্ষে অনুরূপ শ্রেণীর পক্ষে এটা ছিল আরও বেশি সম্ভাব্য। বাস্তবত, হয়তো দেখা যেত যে এতদিন ধরে যারা জোরগলায় বৃটিশ শাসনের প্রতি নিজেদের বিশ্বস্ততা ও সহযোগিতা ঘোষণা করে আসছে, তারাই সবচেয়ে আগে আক্রমণকারী জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। শত্রুর সঙ্গে সহযোগিতায় তারা ছিল পারদর্শী; নূতন অবস্থায় কাঠামোর পরিবর্তন হলেও, পুরানো অভ্যাস ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সহযোগিতা চালানো তাদের পক্ষে অনায়াসসাধ্য ছিল। ইউরোপে তাদেরই সমজাত শ্রেণীর মত তাদেরও এমন মনোভাব সৃষ্ট হয়েছিল যে এর পর নূতন প্রভুর স্থানে যদি আবার পুরানো প্রভুই ফিরে আসত, তাহলে স্বচ্ছন্দে আবার তারা পুরানো প্রভুর কাছেই আত্মসমর্পণ করত। ক্রীপস্ প্রস্তাবের ব্যর্থতার পরে দেশের মধ্যে যে নিদারুণ বৃটিশবিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল, প্রয়োজন বুঝলে তারা তার পূর্ণ সুযোগ ব্যবহার করতেও সচেষ্ট হত। এরা ছাড়া আরও অনেকে ছিল যারা ব্যক্তিগত স্বার্থ বা সুবিধার খাতিরে না হলেও এই বৃটিশবিরোধী মনোভাবকে ব্যবহার করত—দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা হারিয়ে ফেলে, বিশ্বের বৃহত্তম স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিত ভুলে গিয়ে। ঘটনাপ্রবাহের এই গতিতে আমাদের মন উদ্বিগ্ন বিষণ্নতায় পূর্ণ হয়েছিল, আমরা বুঝেছিলাম যে বৃটিশ নীতির কাছে এই নিরুপায় নতিস্বীকার দেশের ভবিষ্যৎকে বিপদ্‌গ্রস্ত করে তুলবে, এবং সমগ্র জনসাধারণকে চরম অবনতির ধাপে নামিয়ে নিয়ে যাবে।

সকলের মধ্যে একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে পূর্ব সীমান্তে আক্রমণ ও কিছু কিছু অঞ্চল শত্রু অধিকৃত হলে দেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে শাসনযন্ত্র ভেঙে পড়বে। এবং একটা বিরাট অরাজকতার সৃষ্টি হবে। মালয় এবং বর্মাতে যা ঘটেছিল, আমাদের ভবিষ্যৎও হবে অনুরূপ। একথা অবশ্য প্রায় কেউই ভাবেনি যে যুদ্ধাবস্থা অনুকূল হলেও শত্রুসৈন্য ভারতের বিস্তৃত এলাকা অধিকার করতে সক্ষম হবে। চীনের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, একটা দেশের বিরাটত্বই একটা প্রতিবন্ধক স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু শত্রুকে প্রতিরোধ করবার দুর্বার ইচ্ছা যেখানে অনুপস্থিত, যেখানে শত্রুসৈন্যের আক্রমণের সামনে ভেঙে পড়া ও আত্মসমর্পণের মনোভাবই ছিল প্রবল, সে অবস্থায় শত্রুসৈন্য কতখানি এলাকা দখল করল বা না করল, তাতে কিছু আসে যায় না। বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে খবরও পাওয়া গিয়েছিল যে, আক্রমণের সামনে মিত্রশক্তির সামরিক বাহিনী আত্মরক্ষার জন্য পশ্চাদপসরণ করবে এবং পূর্বাঞ্চলে বিস্তীর্ণ এলাকা শত্রুর সামনে উন্মুক্ত করে দেবে। অবশ্য চীনের মত এখানেও শত্রুসৈন্য হয়তো এই সমগ্র

এলাকাই তাদের অধিকারভুক্ত করতে পারত না। সুতরাং স্বভাবতই এই সব ও অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে শত্রুর আক্রমণে শাসনযন্ত্র ভেঙে পড়বে, সেখানে আমাদের কর্তব্য কি হবে—সে প্রশ্নও দেখা দিয়েছিল। এ-বিষয়ে আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম। ভবিষ্যতে এই ধরনের সংকটে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালু রাখা এবং শান্তিরক্ষার জন্য আমরা স্থানীয় ভিত্তিতে সংগঠন গড়ে তুলছিলাম। এর ভিতর দিয়ে জনসাধারণের মানসিক প্রস্তুতিও গড়ে উঠছিল। সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণকারীকে যেভাবেই হোক প্রতিরোধ করতেই হবে, সে কথাও আমরা বারবার জোর দিয়ে বলেছিলাম।

এতদিন ধরে চীনবাসীরা কেন এইরূপ দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের সংগ্রাম চালাচ্ছে? সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত রুশ ও অন্যান্য জাতি কেমন করে তাদের এই অতুলনীয় বীরত্ব, দৃঢ়তা ও একাগ্রচিত্ততা দেখিয়েছিল? পৃথিবীর অন্যান্য সর্বত্র জনসাধারণ এই যুদ্ধের মধ্যে অতুলবিক্রমে সংগ্রাম করেছে কারণ দেশপ্রেমে তারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, নিজের দেশ শত্রুঅধিকৃত হবার সম্ভাবনা তাদের কাছে ছিল অসহ্য, স্বকীয় জীবনধারা বজায় রাখার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তবু যুদ্ধ প্রচেষ্টার একাগ্রতার দিক থেকে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছিল। অবশ্য অন্যেরাও যুদ্ধের মধ্যে, যেমন ডানকার্ক এবং তারপরে, তাদের অপূর্ব বীরত্ব দেখিয়েছিল; কিন্তু সেটা শুধু আশু সংকটের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। সংকট থেকে উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের প্রচেষ্টায় যেন ভাঁটা পড়ত। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তারা যেন সন্দিহান ছিল, যদিও বর্তমান যুদ্ধে যে করেই হোক তাদের জিততেই হবে। কিন্তু যতখানি খবরাখবর আমরা পেয়েছিলাম তাতে বোঝা গিয়েছিল সোভিয়েট ইউনিয়নের জনসাধারণের কাছে এই যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ বা তর্কের অবকাশ ছিল না, (অবশ্য এসব সম্বন্ধে তর্ক ও আলোচনাকে উৎসাহ দেওয়া হত না), এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের ছিল গভীর বিশ্বাস।

কিন্তু ভারতবর্ষ? এখানে বর্তমানের প্রতি যেমন একটা নিদারুণ বিতৃষ্ণা ছিল, ঠিক সেই অনুপাতে ভবিষ্যৎ ছিল সম্পূর্ণ অন্ধকারময়। এখানে জনসাধারণ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়নি, শত্রু আক্রমণ ও অধিকার এবং আরও চরম দুর্দশা থেকে রক্ষা পাওয়ার একটা কামনা তাদের ছিল। আন্তর্জাতিক সংকটের উপলব্ধি সামান্য কিছু লোককে প্রভাবিত করেছিল। এর সঙ্গে ছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের শোষণ নির্যাতনের প্রতি বিদ্বেষ, এবং তাদের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। যে ব্যবস্থায় একজন স্বেচ্ছাচারীর খামখেয়ালের উপর সবকিছু নির্ভরশীল, সেই ব্যবস্থার মধ্যে একটা মৌলিক অন্যায়ের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। স্বাধীনতা সকলের কাছেই প্রিয়; কিন্তু যারা পরাধীন অথবা যাদের স্বাধীনতা বিপন্ন, তাদের কাছেই স্বাধীনতা সবচেয়ে বেশি প্রিয় এবং কাম্য। অবশ্য বর্তমান বিশ্বে স্বাধীনতার ক্ষেত্র অনেক সীমাবদ্ধ, তার ব্যাপকতা পরিস্থিতিসাপেক্ষ। কিন্তু স্বাধীনতা থেকে যারা বঞ্চিত, তাদের কাছে এই সব সীমাবদ্ধতা দুর্বোধ্য। স্বাধীনতার সংজ্ঞা তাদের মানসে এমন একটা নিরবয়ব

আদর্শে রূপান্তরিত হয়, যে তাদের কাছে এটা হয়ে ওঠে একটা উদগ্র কামনা এবং অস্থির ও দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। যাকিছু তাদের এই আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে খাপ খায় না এবং তার বিপরীত রূপে দেখা দেয় সেসব তারা নিষ্ঠুরভাবে পরিবর্জন করে। যে আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে অতীতে বহুসংখ্যক ভারতবাসী এত কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করেছে, আজ যুদ্ধের মধ্যে সেই আকাঙ্ক্ষা শুধু যে প্রতিহত হল, তাই নয়, এর চরিতার্থতার সম্ভাবনাও যেন সুদূর ও অস্পষ্ট ভবিষ্যতে পিছিয়ে গেল। যে আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপ্ত করে এই বিশ্বসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া যেত, ভারতের দেশরক্ষা ও স্বাধীনতা এবং বিশ্বের স্বাধীনতা রক্ষার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করে যে বিরাট কর্মশক্তিকে জাগ্রত করা যেত, যুদ্ধ তা করতে সক্ষম হল না। ভারতের মানসজগতে যুদ্ধ একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়ে রইল, এবং এই যুদ্ধের মধ্যে ভারতবাসীর কোনো আশা আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত হল না। জনসাধারণকে, এমনকি শত্রুকেও, কখনও আশাশূন্য রাখা উচিত নয়।

অবশ্য ভারতবর্ষেও অনেকে বিভিন্ন যুদ্ধলিপ্তদেশের রাষ্ট্রনীতিকদের সংকীর্ণতা ছাড়িয়ে এই যুদ্ধকে বৃহত্তর ও ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছিল। তারা মর্মে মর্মে এই যুদ্ধের বিপ্লবী তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিল। তারা বুঝেছিল যে এই যুদ্ধ শুধু কতকগুলি সামরিক জয়পরাজয় বা রাজনীতিকদের উক্তি ও চুক্তিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। এই যুদ্ধের পরে যে ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে তার সম্ভাবনা এ সবের চেয়ে অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী। কিন্তু এরকম লোকের সংখ্যা ছিল নিতান্ত পরিমিত, এবং অন্যান্য দেশের মতই, আমাদের দেশেরও গরিষ্ঠ সংখ্যক লোকের দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা ছিল সংকীর্ণ। এই সংকীর্ণ দৃষ্টিকেই তারা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি বলে অভিহিত করত, প্রত্যক্ষ বর্তমানই তাদের সমগ্র ভাবনাচিন্তার কেন্দ্র ছিল। অনেক সুবিধাবাদী বৃটিশনীতির সঙ্গে স্বচ্ছন্দে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিল: বৃটিশের পরিবর্তে অন্য কোনো শক্তি বা নীতির ক্ষেত্রেও তারা ঠিক একই পন্থা অবলম্বন করত। আবার অন্যান্য অনেকে এই নীতিতে প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল; তারা মনে করত যে এই নীতি মেনে নিলে শুধু ভারত নয় সমগ্র বিশ্বের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। আর বেশির ভাগ লোক হয়ে রইল নিষ্ক্রিয়, স্থাণু অনড় হয়ে। যার বিরুদ্ধে আমরা এত দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম চালিয়ে আসছি, সেই পুরাতন অনড় ও অলসভাবই পুনরায় ভারতবাসীকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

ভারতে মানসজগৎ যখন এই অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল এবং একটা অসহায় হতাশার ভাব যখন সকলকেই আচ্ছন্ন করে ফেলছিল, সেই সময় গান্ধীজি কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধগুলি জনসাধারণের চিন্তাধারার মধ্যে একটা নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গি এনে দিল এবং তাদের অনেক অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষাকে নূতন রূপে রূপায়িত করল। সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহের কাছে আত্মসমর্পণ বা নিষ্ক্রিয়তা তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ভারতের স্বাধীনতার দাবিকে স্বীকৃত করে এবং স্বাধীন হিসাবে মিত্রশক্তির সহযোগিতায় শত্রুর অভিযান ও আক্রমণের প্রতিরোধ গড়ে

তোলাই ছিল এই অবস্থার একমাত্র প্রতিকার। স্বাধীনতার দাবি যদি স্বীকৃত না হয়, তাহলে প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দেশবাসীকে শক্তি-পরীক্ষার আহ্বান জানাতে হবে। যে নিষ্ক্রিয়তা এবং আলস্য সমগ্র জাতিকে পঙ্গু করে যে কোনো বহিরাক্রমণের কাছে আত্মসমর্পণের কলঙ্কময় পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তাকে ভেঙে ফেলে দেশবাসীর মধ্যে একটা জাগরণ আনতে হবে।

এ দাবি নূতন নয়; এতকাল আমরা যে কথা বলে আসছি, এ ছিল তারই পুনরুক্তি। কিন্তু গান্ধীজির লেখায় ও বক্তৃতায় এই দাবিই নূতন ব্যগ্রতা ও কামনায় অভিব্যক্ত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, সক্রিয় কর্মপন্থার ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য গান্ধীজির এই বক্তব্য দেশের অধিকাংশ লোকের প্রচলিত মনোভাবের অনুকূল ছিল। জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার মধ্যে সংঘর্ষে জাতীয়তাই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে-ছিল। গান্ধীজির রচনাবলী সমগ্র ভারতে একটা অপূর্ব সাড়া এনে দিয়েছিল। কিন্তু গান্ধীজির এই জাতীয়তাবোধ আন্তর্জাতিকতার বিরোধী ছিল না; শুধু তাই নয় আন্তর্জাতিক দায়িত্ব যথাযোগ্য পালনের জন্যই এই জাতীয়তাবোধ সম্মানজনক উপায় ও কার্যকরী পন্থা নির্ধারণে ব্যগ্র ছিল। গান্ধীজির জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার মধ্যে অপরিহার্য কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না, কারণ পরদেশ-গ্রাসলিপ্সু ইউরোপের আক্রমণশীল জাতীয়তার মত জাতীয়তা এটা ছিল না; এর ভিত্তি ছিল পরস্পরের স্বার্থে পারস্পরিক সহযোগিতা। সত্যকারের আন্তর্জাতিকতার প্রধান ভিত্তি এবং একমাত্র পথ হিসাবেই জাতীয় স্বাধীনতাকে দেখা হয়েছিল; এবং ফ্যাসিস্ট ও নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামের সহযোগিতার মূল ভিত্তিও ছিল এইটাই। অন্যদিকে যে আন্তর্জাতিকতা সম্বন্ধে এত সাড়ম্বর প্রচার চলছিল, সেটা সাম্রাজ্য-বাদের পুরানো নীতিই—একেবারে নূতন না হলেও—মোটামুটি নূতন রূপেই ক্রমশ অভিব্যক্ত হয়েছিল। আন্তর্জাতিকতার মুখোশ এ'টে সেই পুরানো আক্রমণশীল জাতীয়তাবাদই সাম্রাজ্য, কমনওয়েলথ বা ম্যাণ্ডেটের নামে অন্য দেশের জনগণের উপর তার নিজের হুকুমজারীর চেষ্টা করছিল।

গান্ধীজির এই ঘোষণার ফলে যে নূতন পরিস্থিতি সৃষ্ট হয়েছিল, তাতে আমরা খানিকটা উদ্বিগ্নই হয়ে উঠেছিলাম। কার্যকরী না হলে সক্রিয় কর্মপন্থা অর্থহীন অথচ ভারতবর্ষ যখন বহিরাক্রমণের গভীর সংকটের মুখোমুখি তখন এই ধরনের কোনো সক্রিয় কর্মপন্থা যুদ্ধপ্রচেষ্টার মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে বাধ্য। এ-বিষয়ে গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গিও আন্তর্জাতিক স্বার্থের প্রতি উপেক্ষা এবং সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়েছিল। যুদ্ধের গত তিন বছরে আমরা সচেতন-ভাবেই যুদ্ধপ্রচেষ্টায় বিঘ্ন সৃষ্টি না করার নীতিই অনুসরণ করে এসেছি; এবং সক্রিয়ভাবে যা কিছু করেছি সেটা ছিল প্রতীক প্রতিবাদ স্বরূপ। অবশ্য, এই প্রতীক প্রতিবাদই এমন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল যে ১৯৪০-৪১ সালে আমাদের বিশিষ্ট কর্মীদের মধ্যে প্রায় ত্রিশ হাজার নরনারী কারারুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু এই কারাগমন আন্দোলনও মনোনীত ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এবং এটা যাতে

সরকারী শাসনব্যবস্থার ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে অথবা একটা বিরাট গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত না হয়, সে-বিষয়ে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট ছিলাম। আবার এই আন্দোলন শুরু করা আমাদের পক্ষে অর্থহীন ছিল; সুতরাং অন্য ধরনের এবং অধিকতর কার্যকরী নূতন আন্দোলন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু ভারতের সীমান্তে যখন যুদ্ধ উপস্থিত, তখন এই আন্দোলন কি যুদ্ধপরিচালনায় অসুবিধা সৃষ্টি করবে না? তাতে কি শত্রুকেই উৎসাহিত করবে না?

এই প্রশ্নগুলিই ছিল সমস্যাস্বরূপ এবং এসব নিয়ে গান্ধীজির সঙ্গে আমাদের বিশদ আলোচনা হয়েছিল; কিন্তু আমরা কেউই অন্যকে নিজের মতের পক্ষে নিয়ে আসতে পারিনি। সক্রিয় কর্মপন্থা বা নিষ্ক্রিয়তা—এ দুইয়ের সঙ্গেই বহু অসুবিধা, অনিশ্চয়তা এবং সঙ্কট জড়িত ছিল। দুটো পথের মধ্যে কোনটা কম ক্ষতিকর—আমাদের সামনে সমস্যাটা দেখা দিয়েছিল এইভাবে। পারস্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে যেসব ধারণা অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট ছিল, সেগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল; এবং যেসব আন্তর্জাতিক বিশেষত্বের প্রতি গান্ধীজির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল, গান্ধীজিও অনেকাংশে সেগুলির তাৎপর্য স্বীকার করেছিলেন। পরবর্তী-কালে তাঁর রচনাবলীর মধ্যে এর প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়েছিল; এবং গান্ধীজি এর পর থেকে ব্যাপকতর আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই ভারতের সমস্যা পর্যালোচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মূল বক্তব্যের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। বৃটিশের স্বেচ্ছা-চারিতা ও দমন নীতির কাছে নিষ্ক্রিয় নতিস্বীকারের বিরোধিতা এবং এই অসহায় অবস্থার বিরুদ্ধে কিছু একটা করার দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় তিনি ছিলেন দৃঢ়চিত্ত। তাঁর কাছে এই অবস্থায় আত্মসমর্পণের অর্থ ছিল ভারতের আত্মশক্তি চূর্ণ করে দেওয়া; এবং এতে যুদ্ধ যে আকারই গ্রহণ করুক, তার লক্ষ্য যাই থাক, ভারতের জনসাধারণ সেই দাসসুলভ পথেই চলবে—স্বাধীনতা বহুদূরে সরে যাবে। শুধু তাই নয়, সাময়িক সামরিক পরাজয় বা পশ্চাদপসরণ উপেক্ষা করে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ না চালিয়ে জনসাধারণ আক্রমণকারী শত্রুর কাছেও অতি সহজেই নতিস্বীকার করবে। এর ফলে দেশের জনগণের চূড়ান্ত নৈতিক অবনতি অবশ্যম্ভাবী, উপরন্তু গত পঁচিশ বছর ধরে স্বাধীনতার অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তারা যে শক্তি সঞ্চয় করেছে সে শক্তিও তারা হারাবে। এর অর্থ এই হবে যে সমগ্র বিশ্ব ভারতের স্বাধীনতার দাবিকে ভুলে যাবে এবং যুদ্ধপরবর্তী যেসব মীমাংসা চুক্তি অনুষ্ঠিত হবে, সেগুলি সাম্রাজ্য-বাদী আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বারাই প্রভাবিত হবে। যদিচ ভারতের স্বাধীনতা অর্জন গান্ধীজির একটি উদগ্র কামনা ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষকে তিনি শুধু তাঁর প্রিয় মাতৃ-ভূমি হিসাবেই দেখেননি, ভারতবর্ষ তাঁর কাছে তার চেয়েও বেশি কিছু ছিল। ভারতবর্ষ তাঁর কাছে ছিল বিশ্বের ঔপনিবেশিক ও শোষিত জনসাধারণের প্রতীক—যে কোনো নূতন বিশ্বব্যবস্থা বা নীতির মাপকাঠি স্বরূপ। ভারতবর্ষ যদি পরাধীন থাকে, তা হলে পৃথিবীর যাবতীয় ঔপনিবেশিক ও পরাধীন জাতি দাসত্ব শৃঙ্খলেই শৃঙ্খলিত থাকবে, বিশ্বযুদ্ধের সমস্ত লক্ষ্য অর্থহীন হয়ে পড়বে। সুতরাং যুদ্ধের

নৈতিক ভিত্তির পরিবর্তন সাধন একান্ত অপরিহার্য ছিল। সেনা, নৌ ও বিমান-বাহিনী যথাযথ যুদ্ধবিগ্রহ চালিয়ে যাবে এবং হয়তো উন্নততর কৌশলের সাহায্যে জয়লাভও করবে, কিন্তু এই জয়লাভের কোনো সার্থকতাই থাকবে না। সশস্ত্র যুদ্ধবিগ্রহেও নৈতিক সমর্থনের প্রয়োজনীয়তা আছে। এ-বিষয়ে নেপোলিওন না বলেছিলেন যে, 'যুদ্ধে নৈতিক শক্তির তুলনায় শারীরিক শক্তির অনুপাত এক-তৃতীয়াংশ'? পৃথিবীর কোটি কোটি শোষিত ও নির্যাতিত জনগণ যদি এই যুদ্ধকে নিজেদের স্বাধীনতারও যুদ্ধ বলে সত্যি সত্যিই মনে করত, তাহলে সেটা শুধু যুদ্ধের অতি সংকীর্ণ লক্ষ্যের দিক দিয়েই যে গুরুত্বপূর্ণ তাই নয়, যুদ্ধের পর শান্তি প্রতিষ্ঠায় তার গুরুত্ব আরও বেশি। যুদ্ধের রূপে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল, তাতেই যুদ্ধ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দিয়েছিল। প্রয়োজন হয়েছিল এই কোটি কোটি সন্দিগ্ধ ও বিমর্ষ জনগণকে যুদ্ধের উৎসাহে উদ্বুদ্ধ করা। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা যদি বাস্তব রূপ নিত তাহলে চক্রশক্তির বৃহত্তম সামরিক শক্তিও তুচ্ছ হয়ে যেত এবং তাদের পরাজয় হত অবধারিত। বিশ্বব্যাপী এই শক্তিশালী আন্দোলন চক্রশক্তির নিজের দেশের জনগণকেও হয়তো প্রভাবিত করতে সক্ষম হত।

ভারতের পক্ষে জনসাধারণের এই অসহায় নিষ্ক্রিয়তাকে আত্মসমর্পণের বিরোধী এবং দুর্বার প্রতিরোধ স্পৃহায় উদ্বুদ্ধ করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ছিল। বৃটিশ শাসকের স্বেচ্ছাচারী আদেশের বিরুদ্ধেই যদিও এটা শুরু হত, শেষ পর্যন্ত তাকে আক্রমণকারী শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলায় রূপান্তরিত করা যেত। একজনের কাছে নতিস্বীকার বা দাসসুলভ মনোভাব অপরের কাছেও সেই পথেই টেনে নিয়ে যায়—চরম আত্ম-অবমাননা ও অবনতিই হল এর পরিণাম।

এই সমস্ত যুক্তিতর্ক আমরা জানতাম এবং বিশ্বাসও করতাম এবং নিজেরাই বহুবার এই যুক্তি ব্যবহার করেছি। কিন্তু বৃটিশ সরকার কিছুতেই ঘটনার এই রূপান্তরকরণ হতে দিল না এবং যুদ্ধের মধ্যে অন্তত সাময়িকভাবেও ভারতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল, এমনকি যুদ্ধের লক্ষ্য ও আদর্শ ঘোষণার সকল অনুরোধও বৃটিশ সরকার উপেক্ষা করেছিল। মীমাংসার জন্য নূতন আবার কোনো প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হতে বাধ্য, এটাও ছিল নিশ্চিত। সুতরাং আমাদের কর্তব্য কি? যদি সংঘর্ষই বাধে তাহলে নীতি ও যুক্তির দিক দিয়ে আমরা পুরোপুরি দোষমুক্ত থাকতাম তা ঠিক; কিন্তু বহিরাক্রমণের আশংকা যখন প্রবল আকার ধারণ করেছিল, সেই সময়ে এই ধরনের যে কোনো সংঘর্ষই যে যুদ্ধপ্রচেষ্টা ব্যাহত করত, তা ছিল নিঃসন্দেহ। শত যুক্তিতর্ক দিয়েও একে অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই বিপদ আশঙ্কাই আবার আমাদের মধ্যে উপরোক্ত সঙ্কটের সৃষ্টি করেছিল। শত্রুর বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলা যাদের সাধ্যাতীত ছিল, অক্ষম এবং অপদার্থ সেই শাসকবৃন্দ যেভাবে দেশকে ধ্বংসের পথে টেনে নামাচ্ছিল, তাতে আমাদের পক্ষে

নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ একেবারে অসম্ভব ছিল। আমাদের সমগ্র পুঞ্জীভূত আকাঙ্ক্ষা, কামনা ও কর্মশক্তি সক্রিয়তার যে কোনো পথে বিমুক্ত হওয়ার জন্য সচেষ্ট হল।

গান্ধীজি সত্তরের কোঠায় এসে পৌঁছেছিলেন; দীর্ঘদিনের অবিরাম কর্মজীবন এবং অমানুষিক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে তাঁর শরীর জীর্ণ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু জীবনীশক্তি তাঁর অটুট ছিল। উপস্থিত পরিস্থিতির কাছে নতিস্বীকার করলে অথবা যা তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষিত ছিল তা সফল না করতে পারলে, তাঁর সমগ্র কর্মজীবনই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে বলেই তিনি একান্ত মনে বিশ্বাস করতেন। ভারতের স্বাধীনতা এবং বিশ্বের সমস্ত শোষিত জাতির মুক্তির প্রতি অনুরাগের তীব্রতা এখন অহিংসাবাদের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠাকেও অতিক্রম করতে সক্ষম হল। ইতিপূর্বে দেশরক্ষা এবং জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে কংগ্রেস যে নীতি গ্রহণ করেছিল তাতে কতকটা অনিচ্ছুকভাবেই গান্ধীজি সম্মতি দিয়েছিলেন, এবং এ ব্যাপার থেকে তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। এখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে ব্রিটেন ও মিত্র শক্তির সঙ্গে ভারতের মীমাংসার পথে তাঁর এই অর্ধসমর্থনের মনোভাব অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে। এই উপলব্ধির ফলে কংগ্রেস সম্মেলনে তিনি নিজেই অগ্রসর হয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব হবে এই যে আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে দেশের সমগ্র কর্মশক্তিকে নিযুক্ত করা, এবং দেশরক্ষার বিষয়ে ভারতবর্ষ তার নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী সঙ্গে নিয়ে মিত্রশক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবে। গান্ধীজির পক্ষে এই নীতির সমর্থন করা খুবই দুঃসাধ্য ছিল। তা সত্ত্বেও, ভারত যাতে স্বাধীন জাতি হিসাবে আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করতে পারে, সেজন্য যে কোনো উপায়ে একটা মীমাংসা করার দুর্দমনীয় আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে এ নীতি গ্রহণে বাধ্য করেছিল।

গান্ধীজির সঙ্গে আমাদের নীতিগত ও অন্যান্য যেসব মতভেদ ছিল, এখন সেগুলি সবই দূর হয়ে গেল। তবুও যে কোনো সক্রিয় কর্মপন্থাই যে যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে ব্যাহত করবে এ সমস্যা দূর হল না। কিন্তু আমাদের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার গান্ধীজি তখনও বিশ্বাস করতেন যে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আপোষ মীমাংসা সম্ভব, এবং তিনি বলেছিলেন যে এই মীমাংসার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। সুতরাং সক্রিয় কিছু একটা করার উপর জোর দিলেও এই কর্মপন্থা বাস্তবে কি রূপ ও আকার গ্রহণ করবে, সে সম্বন্ধে তিনি তখনও কিছু বলেননি।

এই সব নিয়ে আমাদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক ও দ্বিধা সন্দেহ চলছিল। ইতিমধ্যে দেশের মধ্যে একটা বিপুল পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। জনসাধারণের মধ্যে অসহায় নিষ্ক্রিয়তার ভাব আস্তে আস্তে কেটে গিয়ে আশা আকাঙ্ক্ষায় তারা ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। ঘটনাপ্রবাহ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাবের অপেক্ষা রাখেনি, গান্ধীজির

রচনাবলী ও উক্তি তার মধ্যে ক্রমশ বেগসঞ্চার করেছিল, এখন ঘটনাপ্রবাহ নিজের গতিতেই চলতে শুরু করেছিল। ভুল হোক বা নাই হোক, গান্ধীজি যে জনসাধারণের উপস্থিত ভাবধারার মধ্যে প্রাণসঞ্জীবন করেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। এর মধ্যে ছিল অন্ধ উত্তেজনা এবং ভাবাবেগের এমন একটা তীব্রতা যে জনসাধারণের মনে পরিস্থিতির শান্ত বিশ্লেষণ অথবা যুক্তি তর্কের আর কোনো স্থান ছিল না। ফলাফল যে অজ্ঞাত ছিল তা নয়, উদ্দেশ্য সফল হোক বা নাই হোক, নিদারুণ নির্যাতন যে সহ্য করতে হবে তাও সকলেই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু প্রত্যহ তিলে তিলে যে নিদারুণ মানসিক নির্যাতনে সকলে উৎপীড়িত, সেও তো কম নয়, এবং স্বাভাবিকভাবে এর থেকে মুক্তিরও তো কোনো উপায় নেই। নিষ্ঠুর মন্দভাগ্যের কাছে নীরব আত্মসমর্পণের চেয়ে অনিশ্চিত কর্মসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়া অনেক ভাল। এ রাজনীতিকের পন্থা নয়—এ ছিল ফলাফল তুচ্ছজ্ঞানে জনসাধারণের চরম হতাশার অভিব্যক্তি। কিন্তু তবু এর মধ্যেও যুক্তির প্রতি একটা দরদ ছিল, পরস্পর-বিরোধী ভাবাবেগ অথবা মানবচরিত্রের মূল অসামঞ্জস্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টাও ছিল। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবার লক্ষণ ছিল পরিস্ফুট। আগে বহু বিপর্যয় ঘটে গেছে, পরে আরও হবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু যে পর্যন্ত যুদ্ধলিপ্সুতার মনোভাব ও আকাঙ্ক্ষা শান্ত ও প্রশমিত না হয়, ততদিন যুদ্ধ তার নিজের গতিতেই চলবে। পরাজয়ের চেয়ে অধিকতর বেদনাদায়ক অর্ধসমাপ্ত জয় এবার আর কেউ চায়নি। সামরিক দিক দিয়ে পরিস্থিতি সন্তোষজনক ছিল না; যুদ্ধের মূল লক্ষ্যের দিক দিয়ে অবস্থাটা আরও বেশি অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই সময় আমাদের কোনো সক্রিয় আন্দোলন সম্ভবত এই শেষোক্ত দোষের প্রতিই সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হত, এবং যুদ্ধের একটা নূতন মোড় ফেরাতে সাহায্য করত। আমাদের আন্দোলন তখনি সফলতা লাভ না করলেও আমাদের ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য সফল করতে হয়ত সক্ষম হত; এবং সামরিক ক্ষেত্রে যুদ্ধের মধ্যে একটা নূতন উদ্দীপনা এনে দিত।

জনসাধারণ যে পরিমাণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, সরকারের অসহিষ্ণুতাও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর জন্য সরকারের কোনো ভাবাবেগের প্রয়োজন ছিল না; কারণ এটা ছিল পরাধীন দেশের উপর প্রভুত্ব বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর বিদেশী সরকারের চিরাচরিত সাধারণ ও স্বাভাবিক রীতি। জনসাধারণের উত্তেজনাকে এই সরকার বরঞ্চ সুনজরেই দেখেছিল; কারণ দেশের মধ্যে যে সমস্ত শক্তি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস করেছিল সেগুলিকে নির্মম দমন নীতির দ্বারা ধ্বংস করার এই একটা সুযোগ ও অজুহাত এবং এর জন্য সরকার তার পূর্ণ প্রস্তুতিও গড়ে তুলেছিল।

ঘটনার গতি এগিয়ে চলল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভারতের সম্মানরক্ষা, স্বাধীনতা অর্জন এবং স্বাধীন জাতি হিসাবে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের দাবি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গান্ধীজি যে সক্রিয় কর্মপন্থার কথা এত বলেছিলেন

তিনি তার বাস্তব রূপ সম্পর্কে নীরব রইলেন। এই কর্মপন্থা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ হতেই বাধ্য, কিন্তু উপরন্তু আর কি হবে? এই সময় গান্ধীজি আবার বৃটিশ সরকারের সঙ্গে মীমাংসার সম্ভাবনার উপর জোর দিতে শুরু করলেন, এবং সকলকে জানিয়ে দিলেন যে একটা উপায় উদ্ভাবন করার উদ্দেশ্যে তিনি বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আবার আলাপ-আলোচনা করবেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে তাঁর শেষ বক্তৃতায় মীমাংসার জন্য আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা এবং ভাইসরয়ের সঙ্গে আবার আলাপ-আলোচনা করার দৃঢ় ইচ্ছাই প্রধান হয়ে উঠেছিল। প্রকাশ্য বক্তৃতায় বা কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির ঘরোয়া বৈঠকে, তাঁর সংকল্পিত সক্রিয় কর্মপন্থার প্রকৃতি সম্পর্কে, কেবল একটি বিষয় ছাড়া, কোনো ইঙ্গিতই তিনি দেননি। আমাদের কাছে ঘরোয়াভাবে তিনি বলেছিলেন যে মীমাংসার সকল চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে তিনি একধরনের অসহযোগিতা আন্দোলন এবং এক দিনের প্রতিবাদ-হরতালের আহ্বান জানাবেন। এই হরতাল একটা ব্যাপক সাধারণ ধর্মঘটের আকার নেবে—এক দিনের জন্য দেশের সর্বত্র সকলরকম কাজ বন্ধ থাকবে, এবং এই হরতালই সমগ্র জাতির প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে উঠবে। তাঁর এই প্রস্তাবও খুব স্পষ্ট ছিল না, কারণ একটা মীমাংসার শেষ চেষ্টা না করা পর্যন্ত এ-বিষয়ে তিনি কোনো বিস্তৃত পরিকল্পনা করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। সুতরাং ভবিষ্যতের এই আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি অথবা গান্ধীজি নিজেও প্রকাশ্যে বা ঘরোয়াভাবে কোনো নির্দেশই জানাননি। তাঁরা শুধু জনসাধারণকে প্রস্তুত থাকতে বলেছিলেন; এবং ভবিষ্যতে যে কোনো আন্দোলনে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ও অহিংস থাকতেই নির্দেশ দিয়েছিলেন। এইরকম গোলকধাঁধাঁর মধ্যে মীমাংসার একটা পথ আবিষ্কারের আশা গান্ধীজির যদিচ ছিল, কিন্তু খুব কম লোকই অনুরূপ আশা পোষণ করত। ঘটনা-প্রবাহের ধারা এবং অবস্থার অগ্রগতি অনিবার্য সংঘর্ষের দিকেই চলেছিল। এই রকম পরিস্থিতিতে মধ্যপন্থার কোনো স্থান নেই—কে কোন পক্ষে যাবে অনিবার্য-ভাবে তা প্রত্যেক নরনারীকে ব্যক্তিগতভাবে বেছে নিতে হয়। অবশ্য কংগ্রেসকর্মী এবং কংগ্রেসভক্ত দেশের অগণিত জনসাধারণের পক্ষে এই ধরনের পক্ষ নির্ণয়ের কোনো অবকাশই ছিল না। যে অবস্থায় সরকার তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে আমাদের জাতীয় আন্দোলনকে নিষ্পিষ্ট করার চেষ্টা করবে—যে সংগ্রামে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন জড়িত, সে সংগ্রামে আমাদের মধ্যে কেউ নিষ্ক্রিয় দর্শক থাকবে তা কল্পনাতীত। অবশ্য এমন লোকের অভাব নেই যারা সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও সংগ্রাম থেকে সরে দাঁড়ায়, কিন্তু কোনোও বিশিষ্ট কংগ্রেস-কর্মীর পক্ষে পরিণামের ভয়ে এরূপ আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা যেমনই লজ্জাকর তেমনই অসম্মানজনক। কিন্তু এসব ছাড়াও তাদের কাছে পক্ষ অবলম্বনের স্বেচ্ছানির্ণয়ের কোনো অবকাশই ছিল না। ভারতের অতীত সংগ্রামের ইতিহাস তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে চলেছে, বর্তমানের তীব্র বেদনা ও ভবিষ্যতের শুভ্র আশা তাদের সম্মুখপানে এগিয়ে দিচ্ছে, তাদের প্রত্যেক কর্মপ্রচেষ্টাকে রঞ্জিত করছে। বের্গস* তাঁর

'ক্রিয়েটিভ এভোলিউশ্যান্' পুস্তকে বলেছেন 'অতীতের উপর পশ্চাৎ গিয়ে পুঞ্জীভূত হতে থাকে বিরামহীনভাবে। বাস্তবত, অতীতের অপরিহার্য সংরক্ষণ স্বতঃক্রিয়। সমগ্র অতীত প্রতি মুহূর্তে আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করে চলে...যদিচ আমাদের চিন্তা-ধারায় অতীতের অস্তিত্ব খুব সামান্যই তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটি আকাঙ্ক্ষা, সংকল্প ও কর্ম সমগ্র অতীত এবং আত্মার প্রথম অভীপ্সার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।'

১৯৪২ সালের ৭ই এবং ৮ই আগস্ট বোম্বাইয়ের বৈঠকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি একটি প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রকাশ্য আলোচনা ও তর্কবিতর্ক করে—সেটি পরে 'ভারত ছাড় প্রস্তাব' নামে অভিহিত হয়। দীর্ঘ এবং সর্বব্যাপী এই প্রস্তাবে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান এবং স্বাধীনতার দাবি স্বীকৃতির পক্ষে বহু দুশ্ছেদ্য যুক্তি উপস্থিত করা হয়েছিল: 'ভারতের স্বার্থে এবং মিত্রশক্তির ঘোষিত আদর্শের সাফল্যের জন্যই এই দাবিস্বীকার অপরিহার্য। ব্রিটিশ শাসন বজায় থাকার ফলে ভারত ক্রমেই অবনত হীনবল এবং দেশরক্ষা ও বিশ্বস্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করতে অসমর্থ হয়ে পড়ছে।' 'সাম্রাজ্যের অধিকার শাসকশক্তিকে ক্ষমতাশালী করার পরিবর্তে এখন এই সাম্রাজ্যই তার উপর হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা গুরুভার ও অভিশাপ স্বরূপ। আধুনিক সাম্রাজ্যতন্ত্রের চরম বিকাশভূমি ভারতবর্ষই বর্তমান যুদ্ধের একটি প্রধান সমস্যা এবং ভারতের স্বাধীনতা স্বীকৃতিই বৃটেন ও মিত্রশক্তির সদিচ্ছার মাপকাঠি। ভারতের স্বাধীনতা এশিয়া ও আফ্রিকার অগণিত জনগণকে আশায় ও উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলবে।' প্রস্তাবে জনসাধারণের প্রত্যেকটি বিশিষ্ট অংশের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সম্মিলিত অস্থায়ী সরকার গঠনের আহ্বান জানানো হয়। এই অস্থায়ী সরকারের প্রধান দায়িত্ব হবে 'ভারতের দেশরক্ষা এবং সশস্ত্র ও অহিংস সকল শক্তি প্রয়োগ করে মিত্রশক্তির পূর্ণ সহযোগিতায় আক্রমণকারীর প্রতিরোধ।' ভারতের জনসাধারণের সকল অংশের কাছে গ্রহণযোগ্য এক গঠনতন্ত্র রচনা করার জন্য এই অস্থায়ী সরকার গঠনতন্ত্ররচনা পরিষদের পরিকল্পনা তৈরি করবে। সংযুক্ত ইউনিটগুলির পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার বজায় রেখে এবং তাদের হাতেই 'অবশিষ্ট' ক্ষমতা ন্যস্ত করে এই গঠনতন্ত্র একটি সংহত রাষ্ট্রে রূপায়িত হবে। 'স্বাধীনতা লাভ করলে ভারত জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তি ও সংকল্পে বলীয়ান হয়ে বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সমর্থ হবে।'

ভারতের স্বাধীনতাই হবে এশিয়ার সমস্ত পরাধীন জাতির স্বাধীনতার প্রতীক ও সূচনা। প্রস্তাবে স্বাধীন জাতিত্বের ভিত্তিতে বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘও গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছিল—সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ (ইউনাইটেড্ নেশান্স) থেকেই যার সূচনা করা উচিত।

কমিটি এও বলেন যে: 'আমরা অত্যন্ত ব্যগ্র যে, চীন ও রুশিয়ার স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে অথবা সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের আত্মরক্ষার ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, এমন

কিছু করা না হয়। চীন ও রুশিয়ার স্বাধীনতা অমূল্য এবং তা রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। (এই সময় চীন ও রুশিয়ার বিপদাশঙ্কাই প্রবলতম হয়ে উঠেছিল।) কিন্তু ভারতবর্ষ এবং এই জাতিগুলির বিপদাশঙ্কা ক্রমশই তীব্রতর হয়ে উঠছে; এবং এই অবস্থায় বিদেশী শাসকের কাছে নতিস্বীকার ও নিষ্ক্রিয়তা বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিরোধশক্তিকে এবং দেশরক্ষার সংগ্রামকে দুর্বল করে ফেলছে, এবং তাকে আত্মাবনতির চরমে নামাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সংকটের ক্রমবর্ধমানতার সঙ্গে এই শোচনীয় অবস্থা সামঞ্জস্যবিহীন এবং সম্মিলিত জাতিসংঘের জনগণের স্বার্থের বিপরীত।'

'বিশ্বস্বাধীনতার স্বার্থে' কমিটি আবার বৃটেন ও সম্মিলিত জাতিসংঘের কাছে আবেদন করেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও ঘোষণা করেছিল—এবং প্রস্তাবের প্রধান আঘাতও ছিল এইটাই যে, 'বিশ্বমানব ও নিজের স্বার্থে, সাম্রাজ্যবাদী ও স্বেচ্ছাচারী সরকারের প্রভুত্ব ও দাসত্বের বিরুদ্ধে স্বকীয় সত্তা প্রতিষ্ঠিত করবার যে দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় আজ সমগ্র জাতি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে, জাতিকে এই প্রচেষ্টা থেকে বিরত করার আর কোনো সঙ্গত যুক্তি বা অধিকার কমিটির নেই। সুতরাং ভারতের স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্মগত ও অবিচ্ছেদ্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে, কমিটি গান্ধীজির অনিবার্য নেতৃত্বে সম্পূর্ণ অহিংসপন্থায় গণআন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে।' অবশ্য এই আন্দোলন বাস্তবত শুরু করা সম্পূর্ণভাবে গান্ধীজির সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ ছিল। প্রস্তাব শেষ করা হয়েছিল এই বলে যে, 'নিজের জন্য ক্ষমতালাভের ইচ্ছা কংগ্রেসের নেই। ভারতের হাতে যখন ক্ষমতা আসবে, সমগ্র ভারতবাসীই সেই ক্ষমতার অধিকারী হবে।'

কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং গান্ধীজি তাঁদের শেষ বক্তৃতায় স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে এরপর একবার বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে ভাইসরয়ের সঙ্গে মীমাংসার একটা শেষ চেষ্টা তাঁরা করবেন। সম্মিলিত জাতিসংঘের নেতৃবৃন্দের নিকটও সম্মানজনক মীমাংসার জন্য তাঁরা আবেদন করবেন। সম্মিলিত জাতিসংঘ যদি ভারতের স্বাধীনতার দাবিকে স্বীকার করে নিত, তাহলে আক্রমণশীল চক্রশক্তির বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামকেই তারা আরও শক্তিশালী করে তুলত।

৮ই আগস্ট রাত্রে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল। কয়েক ঘণ্টা পরে, ৯ই আগস্টের প্রত্যুষে বোম্বাই এবং সারা ভারতে ব্যাপক গ্রেপ্তার শুরু হল। অতএব, চল আমেদনগর দুর্গে।

আবার আমেদনগর দুর্গ

১ : নিরবচ্ছিন্ন ঘটনাপ্রবাহ

আমেদনগর দুর্গ : ১৩ই আগস্ট : ১৯৪৪। দুবছরের কিছু বেশি হল, আমরা এখানে এসেছি—এক জায়গায় শিকড় গেড়ে দুটো বছরের পরিবর্তনহীন সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে স্বপ্নের মত এক জীবন—রোজ সেই অতিপরিচিত কয়েকটি মুখ দেখা, আর একঘেয়ে রুটিনমাফিক দিনযাপন। ভবিষ্যতে কোনো সময় আমরা আবার এই স্বপ্ন থেকে জেগে উঠব এবং বাইরের জগতের ব্যাপকতর কর্মচাঞ্চল্য ও জীবনের মধ্যে গিয়ে পড়ব, দেখব সব কিছুই বদলে গেছে। তখন যে সব ব্যক্তি বা বস্তু আমরা দেখব, তার উপর থাকবে রহস্যময় অপরিচিতের ছাপ। নতুন করে তাদের আবার আমরা চিনব, অতীতের ফেলে আসা পরিচয়ের স্মৃতি মনের মধ্যে ভিড় করে আসবে। কিন্তু তবু দুবছর আগে তারা যা ছিল, ঠিক সেরকম থাকবে না—আমরাও ঠিক তাই থাকব না, এবং তাদের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়ানোও তখন হয়তো কঠিন হয়ে উঠবে। তখন হয়তো আবার আমাদের মাঝে মাঝে খটকা লাগবে যে এই দৈনন্দিন জীবনযাপনের নূতন অভিজ্ঞতা এটাই আবার একটা ঘুম, একটা স্বপ্ন নয়তো—যা থেকে হবে হঠাৎ আর একটা জাগরণ? কোনটা স্বপ্ন, কোনটা সত্য? দুটোই কি সমানভাবে বাস্তব? অথবা এই দুটোই অবাস্তব যা ক্ষণচঞ্চল স্বপ্নের মত পিছনে শুধু একটা অস্পষ্ট স্মৃতি রেখে যায়?

কারাজীবন এবং তার সংশ্লিষ্ট একাকিত্ব ও নিষ্ক্রিয়তা স্বভাবতই মনকে চিন্তাক্রান্ত করে তোলে, তাই জীবনের অতীত স্মৃতির রোমন্থন এবং মানবসভ্যতার সুদীর্ঘ ও সুসংবদ্ধ ইতিহাসকে বারবার স্মরণ করে, কারাজীবনের এই ফাঁকা শূন্যতা ভরিয়ে তোলার চেষ্টা করতে হয়। গত চার মাসে এই রচনার মধ্যে বারবার তাই আমার মন ভারতের অতীত ইতিহাস ও গৌরবোজ্জ্বল কাহিনীর দিকে ছুটে গেছে, এবং যে অসংখ্য ছবি ও ভাব আমার মনে ভিড় করে এসেছে, আমি তার থেকে শুধু কয়েকটি সঞ্চয়ন করে এই পুস্তক রচনা করেছি। চার মাস ধরে যা লিখেছি, আজ যখন তার দিকে ফিরে তাকাই, তখন মনে হয় যে এই লেখা খাপছাড়া, অসম্পূর্ণ ও ঐক্যবিহীন রয়ে গেছে। ব্যক্তি-নিরপেক্ষভাবে যে সব বিষয়ের আমি বাস্তব পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট ছিলাম, তার মধ্যেও নিজের কথাই বড় হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত মানসের এই প্রভাব আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই অনবরত যেন আমাকে ঠেলে নিয়ে গেছে। অনেক সময়ে আমি একে ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছি এবং সক্ষমও হয়েছি, আবার কখনও কখনও রাশ ঢিলা করে

লেখনী থেকে প্রবাহিত হতে এবং আমার মনকে আয়নার মত তুলে ধরতে দিয়েছি।

অতীতের কথা লিখতে বসে আমি অতীতেরই বোঝা থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তার সব কিছু জটিলতা আর দুর্বোধ্যতা নিয়ে বর্তমান তো উপস্থিত আছে এবং তাছাড়াও আছে বর্তমানকে অতিক্রম করা সেই অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ —এর বোঝা অতীতের চেয়ে বড় কম নয়। চিরচঞ্চল ভবঘুরে মানুষের মন এখনও তার শান্তিস্বর্গ খুঁজে পায়নি, তাই অস্থির উন্মাদনায় সে শুধু সেই মনের অধিকারীকে নয়, অন্য সকলকেও অশান্ত করে তোলে। সেই সব নিষ্কলুষ মন—চিন্তার দ্বারা যারা আক্রান্ত হয়নি, সংশয়ের ছায়া যার উপর একটি রেখাও পাত করেনি, তাঁদের প্রতি খানিকটা ঈর্ষা হয় বৈকি। কত সহজ কত সরল তাদের জীবন, হোক না তা মাঝে মাঝে দুঃখ বেদনায় ক্লিষ্ট।

একটার পর একটা ঘটনা ঘটে চলেছে—অন্তহীন, অবিরাম সেই ঘটনাপ্রবাহ। কিন্তু সাধারণভাবে আমরা কোনো একটি বিশেষ ঘটনাকে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন করেই বোঝবার চেষ্টা করি, যেন সেখানেই তার শুরু এবং শেষ—ভাবি, অব্যবহিত পূর্বের একটি কারণের ফলাফলই হল এই বিশিষ্ট ঘটনা। কিন্তু সত্যিই শুরু বলতে তার কিছু নেই, কারণ এটা অন্তহীন ও নিরবচ্ছিন্ন ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে অন্যতম একটা যোগসূত্র মাত্র, এর শুরু বা সূত্রপাতের ইতিহাস পূর্ববর্তী সমস্ত ঘটনাপুঞ্জের মধ্যেই নিহিত। পারস্পরিক সমবায় ও সংঘাতে যুগ যুগ ধরে অগণিত মানুষের যে আশা আকাঙ্ক্ষা ও কামনা বাসনা রূপায়িত হয়ে উঠেছে, তা থেকেই উৎসারিত এই ঘটনা। একজন ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছায় কোনো ঘটনা গড়ে ওঠেনি। অবশ্য মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও কামনা বাসনাও তার আগেকার ঘটনাপুঞ্জ ও অভিজ্ঞতার ইতিহাসের দ্বারাই প্রধানত প্রভাবিত এবং নতুন যে ঘটনাটি ঘটল, ভবিষ্যতের রূপায়ণে তারও প্রভাব হবে অনিবার্য। ইতিহাসের এই ঘটনাপ্রবাহে যে মানুষ ভাগ্যের বরপুত্র, যে নেতার প্রভাব লক্ষ লক্ষ লোকের উপর, নিঃসন্দেহে তারও একটা বড় ভূমিকা আছে, তবু সে নিজেও তো অতীতের ঘটনাবলী এবং অতীতের শক্তি সঙ্ঘাতেরই সৃষ্টি এবং এই অতীতই তার প্রভাবকে নিয়ন্ত্রিত করে।

২ : দুটি পটভূমিকা : ভারতীয় ও ব্রিটিশ

১৯৪২ সালের আগস্টে ভারতবর্ষে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল, তা কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়—ভারতের সমগ্র পূর্ববর্তী ইতিহাসের চরম পরিণতিই ছিল এটা। এ সম্বন্ধে বিরুদ্ধে বা স্বপক্ষে নানারকম লেখা, সমালোচনা ও ব্যাখ্যা হয়েছে বটে, কিন্তু এই সব লেখাগুলিতে আসল কথাটাই বাদ পড়েছে। কারণ এই সমস্ত সমালোচনায় গভীরতম এক অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে শুধুমাত্র রাজনৈতিক সুবিধা অসুবিধার মাপকাঠি দিয়ে। আগস্টের ঘটনাবলীর পিছনে ছিল অতি তীব্র

এক অনুভূতি যা এই বিদেশী স্বেচ্ছাচারী শাসনকে বরদাস্ত করে জীবনযাপন অসহ্য করে তুলেছিল। এবং এই অস্থিরতার কাছে অন্য সমস্ত বাদবিচার, যথা—বিদেশী প্রভুত্বকে মেনে নিয়েই কোনোরকম উন্নতি বা অগ্রগতি সম্ভব কি না, অথবা এই শাসনের উচ্ছেদঘোষণার আহ্বান পরিণামে অধিকতর ক্ষতিকর হবে কি না—সব চাপা পড়ে গিয়েছিল। তখন সকলের মনে একটিমাত্র আকাঙ্ক্ষাই তীব্র হয়ে উঠেছিল—যে কোনো উপায়ে, যে কোনো মূল্যদানে এই শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হতেই হবে; একটিমাত্র চেতনাই উদ্দীপ্ত ছিল—ফলাফল যাই হোক, এই অসহ্য অবস্থা আর বরদাস্ত করা যায় না।

জাতির জীবনে এই চেতনা একটা নতুন অনুভূতি নয়, অনেক বছর ধরেই তা ছিল। ইতিপূর্বে বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য এই চেতনার মধ্যে খানিকটা শৃঙ্খলা আরোপ করার চেষ্টা হয়েছিল মাত্র। অবশেষে যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধ-পরিস্থিতি একই সঙ্গে এনেছিল অনেক বাধানিষেধ, আবার মুক্তিরও অবকাশ। যুদ্ধ আমাদের মন ও চেতনাকে উন্মুক্ত করে দিল বিরাট বিকাশ ও বিপ্লবী পরিবর্তনের অভিমুখে, আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সফল হওয়ার সম্ভাবনা আর সুদূরপরাহত রইল না। আবার অনেক কিছু যা আমরা করতে পারতাম তা বাধাগ্রস্ত হল, কারণ—চক্রশক্তির বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে আমরা সাহায্য করতেই চেয়েছিলাম—অন্তত পক্ষে তার কোনো হানি করতে আমরা চাইনি।

কিন্তু যুদ্ধের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশই পরিষ্কার হয়ে উঠছিল যে পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রী শক্তিবৃন্দ উন্নততর কোনো পরিবর্তন সাধনের জন্য যুদ্ধ করছে না—যুদ্ধ করছে সেই পুরনো ব্যবস্থাকে কায়েমী রাখারই জন্য। যুদ্ধের আগে তারা ফ্যাসিস্ট তোষণ-নীতি অনুসরণ করেছিল। শুধু ভবিষ্যৎ ফলাফলের আশঙ্কাই নয়, এর কারণ ছিল ফ্যাসিজমের প্রতি আদর্শ ও নীতিগত সহানুভূতি এবং ফ্যাসিজমের বিকল্প কোনো মতবাদ বা নীতি সম্পর্কে এদের গভীর বিতৃষ্ণা। নাৎসিজম্ ও ফ্যাসিজমের আবির্ভাব ইতিহাসের ধারার মধ্যে আকস্মিক নয়। অতীত ইতিহাসের ঘটনাবলীর মধ্যেই ছিল এর সূত্রপাত। সাম্রাজ্যতন্ত্র ও জাতিবৈষম্য, দাসত্বের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জাতির মুক্তিসংগ্রাম, শক্তি ও ক্ষমতার ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রীকরণ, শিল্প ও বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার—যার অগ্রগতি ও বিকাশ তদানীন্তন সামাজিক কাঠামোর সংকীর্ণতার মধ্যে ব্যাহত হচ্ছিল, এবং গণতান্ত্রিক আদর্শের চরিতার্থতা ও উপস্থিত সমাজব্যবস্থার মধ্যে বৈষম্য—এই সব অসামঞ্জস্যের অস্তিত্বের স্বাভাবিক পরিণতি ফ্যাসিজম্ ও নাৎসিজম্। পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় গণতন্ত্রের বিকাশ শুধু যে জাতি ও ব্যক্তি হিসাবেই উন্নতি ও অগ্রগতির দ্বার খুলে দিয়েছিল তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন ভাবাদর্শ ও শক্তির প্রকাশও সম্ভবপর করেছিল, এবং এই সব নতুন ভাবধারার অবশ্যম্ভাবী লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং সমাজের মধ্যে অন্তঃসংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। সমস্যার এই পরিপ্রেক্ষিতে বিকল্প ছিল দুটি—গণতন্ত্রের ব্যাপকতর বিকাশ

ও প্রয়োগের চেষ্টা অথবা ক্রমশ সংকুচিত করে তার ধ্বংসসাধন। প্রবল বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও গণতন্ত্রের প্রসার ও ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং ক্রমশ গণতান্ত্রিক ভাবধারা ও লক্ষ্য রাজনৈতিক সংগঠনগুলির মূলভিত্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু এই ক্রমবিকাশের পথে এমন একটা সময় এল যখন গণতন্ত্রের প্রসার উপস্থিত সামাজিক কাঠামোকে পর্যন্ত শঙ্কাকুল করে তুলল এবং তখন সেই সমাজব্যবস্থার রক্ষাকর্তারা রুখে উঠল এবং এই অগ্রগতির প্রতিরোধের জন্য তোড়জোড় করতে লাগল। যে দেশের সামাজিক পরিধি যত সংকীর্ণ, সে দেশে সংঘর্ষ তত দ্রুতগতিতে তীব্র আকার ধারণ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে গণতন্ত্রের দমন ও নিষ্পেষণ হয়ে আবির্ভূত হল ফ্যাসিজম্ ও নাৎসীজম্। পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেও এই সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল, যদিচ অন্যান্য কতকগুলি কার্য-কারণ বশত তার দ্রুত পরিণতি খানিকটা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল—হয়তো এই সব দেশের সুদীর্ঘ শান্তি ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যই ছিল এর অন্যতম একটা কারণ। অবশ্য এই সব গণতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে কেউ কেউ বড় বড় সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিল এবং পদানত দেশগুলিতে গণতন্ত্রের চিহ্নও ছিল না, ফ্যাসিজমের সমতুল্য স্বেচ্ছাচারিতাই প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্বাধীনতার দাবিকে পদদলিত করে দেবার জন্য ফ্যাসিস্টদের মত এই সব দেশের শাসকশ্রেণীও প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী ও ক্ষয়িষ্ণু সামন্তশ্রেণীর সঙ্গেই মৈত্রী স্থাপন করেছিল। তারা বলতে শুরু করেছিল যে নিজেদের মাতৃভূমিতে যদিচ আদর্শ হিসাবে গণতন্ত্র নিশ্চয়ই শ্রেয় এবং গ্রহণীয়, কিন্তু তাদের পদানত উপনিবেশগুলির পরিস্থিতি এমন যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সে সব দেশে মোটেই উপযোগী নয়। সুতরাং ফ্যাসিস্ট বর্বরতা ও নৃশংসতার উগ্র অভিব্যক্তিগুলি পুরোপুরি পছন্দ না করলেও, পশ্চিম ইউরোপের গণতান্ত্রিক দেশগুলি যে ফ্যাসিজমের সঙ্গেই একটা আদর্শগত ঐক্য অনুভব করবে—এটা স্বাভাবিক।

নিছক আত্মরক্ষার জন্যই যখন তারা যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছিল, তখনও যে ব্যবস্থার চরম ব্যর্থতা একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, তার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকেই তাদের দৃষ্টি ছিল নিবদ্ধ। যুদ্ধকে তারা প্রধানত আত্মরক্ষামূলক বলেই স্বীকার ও প্রচার করেছিল এবং একদিক দিয়ে তা সত্যও বটে। কিন্তু সামরিক কলাকৌশল ছাড়াও এই যুদ্ধের আর একটা দিক ছিল—নৈতিক দিক। এবং এই দিক দিয়ে এই যুদ্ধ ফ্যাসিস্ট মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গীকেই প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেছিল। কারণ, অনেকেই যে কথা বলেছেন—এই যুদ্ধটা ছিল পৃথিবীর জনগণের আত্মার উন্নতিসাধনের যুদ্ধ। শুধু ফ্যাসিস্ট পদানত দেশগুলিতে নয়, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতেও নতুন পরিবর্তনের বীজ এই যুদ্ধের মধ্যেই ছিল সন্নিহিত। কিন্তু প্রচণ্ড প্রচার প্ররোচনা মারফৎ যুদ্ধের এই নৈতিক দিকটাই বিভ্রান্ত করে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা হয়েছিল। অতীত ব্যবস্থাকে রক্ষা করা ও বর্তিয়ে রাখার উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হত—নূতন ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করার উপর নয়। কিন্তু পাশ্চাত্যে অসংখ্য

নরনারী মনেপ্রাণে যুদ্ধের নৈতিক দিকটাই মেনে নিয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সভ্যতার যে চরম ব্যর্থতা ফুটে উঠেছিল, তার বিরুদ্ধে স্থায়ী গ্যারান্টি হিসাবে তারা একটা নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করতেই চেয়েছিল। পৃথিবীর সর্বত্র লক্ষ লক্ষ জনতা, বিশেষভাবে যারা যুদ্ধ করছিল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যারা প্রাণ দিচ্ছিল, তাদের মনে অস্পষ্ট হলেও এই নূতন পরিবর্তনের কামনাই ছিল উদগ্র। এ ছাড়াও ছিল ইউরোপ এবং আমেরিকা, এবং বিশেষভাবে এশিয়া এবং আফ্রিকায় দাসত্বশৃঙ্খল ও জাতি-বৈষম্যে জর্জরিত ও শোষিত কোটি কোটি জনগণ যারা এই যুদ্ধকে কিছুতেই তাদের অতীতের তিক্ত স্মৃতি এবং বর্তমানের নিদারুণ দুর্দশা থেকে পৃথক করে ভাবতে পারেনি। দুর্দশা সত্ত্বেও তাদের একান্ত আশা ছিল যে, যে সব বোঝা তাদের নিষ্পিষ্ট করছে, এই যুদ্ধ যে কোনো ক্রমে সেগুলি উত্তোলন করতে সক্ষম হবে।

কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নেতৃবর্গের লক্ষ্য ছিল বিপরীত, তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল অতীতে—ভবিষ্যতের দিকে নয়। জনসাধারণের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা শান্ত করার জন্য মাঝে মাঝে তাঁরা অবশ্য ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বড় বড় কথা বলতেন, কিন্তু এগুলির সঙ্গে তাঁদের নীতির কোনো সামঞ্জস্য ছিল না। একটু-আধটু অদলবদল করে ইংলন্ডের পুরাতন সমাজব্যবস্থা এবং তার সাম্রাজ্যের কাঠামো টিকিয়ে রাখাই ছিল মিস্টার উইনস্টন চার্চিলের কাছে এই যুদ্ধের প্রধান অর্থ ও উদ্দেশ্য। যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট অবশ্য মহত্তর ভবিষ্যতের ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অনুসৃত নীতির মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন লক্ষিত হয়নি। তা সত্ত্বেও যুগদ্রষ্টা ও মহান রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে অনেকে তাঁর উপর ভরসা করত।

কাজেই ভারত ও বিশ্বের ভবিষ্যৎ যাতে অতীতের ধারা বজায় রেখে চলে এবং বর্তমানও সেই ধারার অনুবর্তন করতে বাধ্য হয়—ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী সেজন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করবে; এবং এই বর্তমানেই তারা সেই ভবিষ্যতের বীজ বপন করছিল। তাই অগ্রগতির ইঙ্গিত বলে মনে হলেও, ক্রীপ্স্ প্রস্তাব এমন কতকগুলি নূতন ও ক্ষতিকর সমস্যা উপস্থিত করেছিল যে, শেষ পর্যন্ত সেগুলিই ভারতের স্বাধীনতার পথে প্রচণ্ড বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে এরূপ আশঙ্কার সৃষ্টি করেছিল। ইতিমধ্যেই সেই আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হবে এরূপ লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের সর্বব্যাপী জুলুম ও স্বেচ্ছাচারিতা যুদ্ধকালীন অবস্থাতে যুদ্ধের অজু-হাতে অতি-সাধারণ নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার দমন-নীতি চূড়ান্তে নিয়ে ঠেকিয়েছিল। দমনের এই স্বরূপ আমাদের সমসাময়িক যে কোনো লোকেরই অভিজ্ঞতার বহির্ভূত। এই নিদারুণ নির্যাতন বারবার আমাদের পরাধীনতা ও অবমাননার তিক্ত স্মৃতিকেই কণ্টকিত করে তুলছিল। বর্তমানকে দেখেই আমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম, কারণ এই বর্তমানেই তো ভবিষ্যতের সূচনা। এই অবজ্ঞা ও অপমানের কাছে নতিস্বীকারের চেয়ে অন্য কিছু—সে যাই হোক না কেন—তাই আমাদের কাছে ছিল বাঞ্ছনীয়।

ভারতের কোটি কোটি জনগণের মধ্যে ঠিক কতজন এই অনুভূতিতে অস্থির হয়ে

উঠেছিল, তা বলা শক্ত। কারণ দারিদ্র্যদুঃখে ক্লিষ্ট ভারতের কোটি কোটি জনতার মধ্যে বেশির ভাগ লোকেরই মন জড়তাপ্রাপ্ত হয়েছিল। অবশ্য এমন কিছু লোকও ছিল, আত্মস্বার্থে যাদের মন কলুষিত অথবা বিশেষ কোনো অধিকার বা সুবিধার জন্য যাদের মন হয়েছিল লক্ষ্যভ্রষ্ট। তা সত্ত্বেও পরাধীনতা ও দাসত্বের শৃঙ্খল মোচনের আকাঙ্ক্ষা প্রায় সকলের মনেই জেগেছিল। অবশ্য এ আকাঙ্ক্ষার তীব্রতায় বিভিন্ন স্তর ছিল: অনেকের মনে এই আকাঙ্ক্ষা এত তীব্র ছিল যে দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য তারা জীবনপণ করতে পর্যন্ত রাজী ছিল, এবং তারা স্বভাবতই সক্রিয় কর্মপন্থার দিকে ঝুঁকেছিল। আবার দূর থেকে সমর্থন করার লোকের সংখ্যাও বেশ কিছু ছিল। পরাধীনতা ও দাসত্বের আবহাওয়ায় অনেকের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠেছিল—আবার সাধারণ নরনারীর মধ্যে অনেকে অস্বস্তিকর হলেও এই অবস্থার সঙ্গেই কিছুটা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিল।

এই অবস্থায় ভারতের ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর অতীত পটভূমিকা কিন্তু ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতীয় ও ব্রিটিশের মধ্যে ছিল দুর্লঙ্ঘ্য মানসিক ব্যবধান—এবং ভারতের শাসনব্যবস্থার পরিচালনা করতে ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী যে সম্পূর্ণ অযোগ্য তা এতেই স্বতঃপ্রমাণিত হয়ে উঠেছিল। কারণ শাসক ও শাসিতের মধ্যে অন্তত দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার কিছুটা মিল না থাকলে উন্নততর শাসনব্যবস্থা অসম্ভব এবং সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। ভারতের ব্রিটিশ শাসকবর্গ বৃটেনের সবচেয়ে গোঁড়া রক্ষণশীলশ্রেণীরই প্রতিনিধি। উদারনৈতিক বৃটেনের ঐতিহ্যের সঙ্গে তাদের ভেদ ছিল আকাশপাতাল। ভারতে বাস তাদের যত দীর্ঘ হত, ততই তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদের গোঁড়ামি বৃদ্ধি পেত, এবং অবসর গ্রহণ করে এরা যখন ইংলন্ডে ফিরে যেত তখন এরাই ভারতবর্ষ সম্পর্কে পরামর্শ দিতে বিশেষজ্ঞরূপে গণ্য হত। ভারতের শুভ ও মঙ্গলের জন্যই যে ব্রিটিশ শাসনের একান্ত প্রয়োজন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঐতিহ্যবহনকারী হিসাবে নিজেদের দায়িত্ব যে অতি মহান তা এরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বৃটেনের এই প্রভুত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, তাই তাদের চোখে জাতীয় কংগ্রেস ছিল প্রধান শত্রু। ভারতসরকারের তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সভ্য স্যার রেজিন্যাল্ড মাকস্‌ওয়েল ১৯৪১ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভায় যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতেই ব্রিটিশ শাসকসম্প্রদায়ের মনোভাব পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছিল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে বিনাবিচারে কারারুদ্ধ কংগ্রেস, সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট বন্দীদের উপর জেলের ভিতর অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়েছে, এবং জার্মান ও ইতালীয়ান যুদ্ধবন্দীদের চেয়েও খারাপ অবস্থায় এই সমস্ত বন্দীদের রাখা হয়েছে। অভিযোগের জবাবে নিজস্ব নীতির সমর্থনে তিনি বলেছিলেন—যত দোষই থাক জার্মান ও ইতালীয়ান যুদ্ধবন্দীরা তাদের নিজেদের দেশের স্বার্থেই যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু উপরোক্ত বন্দীদের (অর্থাৎ ভারতের কংগ্রেস, সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট) লক্ষ্য ছিল প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন এবং তাই তারা সমগ্র সমাজের শত্রু। কোনো ভারতবাসী

যে কখনো স্বাধীনতা চাইতে পারে অথবা দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন দাবি করতে পারে—এটা বোধহয় তাঁর কাছে একটা অসম্ভব ব্যাপার। ভারতীয় ও জার্মান এবং ইতালীয়ান এ দুই পক্ষের মধ্যে তাঁর সহানুভূতি স্বভাবতই ছিল জার্মান ও ইতালীয়ানদেরই প্রতি যদিচ তাদের সঙ্গে তাঁর নিজের দেশ তখন জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত। তখনও পর্যন্ত সোভিয়েট রুশ যুদ্ধের মধ্যে লিপ্ত হয়নি সুতরাং প্রচলিত সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের যে কোনো প্রচেষ্টাকেই আক্রমণ করা সহজ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগে পর্যন্তও ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থার প্রকাশ্য প্রশংসা করে এসেছে, কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বজায় থাকুক —হিটলার তার 'মাইন কাম্‌ফ্‌' গ্রন্থে এবং পরেও বহুবার এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল।

অবশ্য চক্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে যথাসম্ভব সাহায্য করার জন্য ভারতসরকার যে ব্যগ্র ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু চক্রশক্তির বিরুদ্ধে এই জয়লাভ তাদের কাছে অসম্পূর্ণ বোধ হবে যদি সঙ্গে সঙ্গে তারা আর একটা জয়লাভ না করতে পারে—অর্থাৎ তারা চেয়েছিল এই সঙ্গে ভারতের জাতীয় আন্দোলন এবং সে আন্দোলনের নেতা জাতীয় কংগ্রেসকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করতে। ক্রীপ্‌স্‌ প্রস্তাবের সময়ে মীমাংসার সম্ভাবনায় এরা রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল; এবং ক্রীপ্‌স্‌ আলোচনা যখন ব্যর্থ হয়ে গেল তখন তাদের উল্লাসের সীমা রইল না। কারণ এখন কংগ্রেস ও তার সমর্থকদের চরম আঘাত দেওয়ার পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। তাদের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে এই ছিল প্রকৃষ্ট সময়—ইতিপূর্বে কেন্দ্রে এবং প্রদেশে, ভাইসরয় এবং তার প্রধান সহকর্মীরা কখনও এতখানি স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার অধিকারী হয়নি। যুদ্ধপরিস্থিতিটাই ছিল অস্বাভাবিক; এবং এই অজুহাতে সকলরকম বিরোধিতা বা অশান্তি দমনের পরিকল্পনার পিছনে তারা খানিকটা যুক্তি খাড়া করতে পেরেছিল। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উৎসুক ইংলন্ড ও আমেরিকার উদারনৈতিকদের ক্রীপ্‌স্‌ প্রস্তাব ও পরবর্তী প্রচার দ্বারা শান্ত করা হয়েছিল এবং ইংলন্ডে ভারতবর্ষ সম্পর্কে চিরন্তন আত্মাভিমানী মনোবৃত্তি ক্রমেই বৃদ্ধিলাভ করছিল। সেখানে লোকের মনে একটা ধারণা হয়েছিল যে ভারতবাসীরা—অন্ততপক্ষে তাদের মধ্যে অনেকে—অযথা গণ্ডগোল ও অরাজকতাপ্রবণ, সংকীর্ণ তাদের দৃষ্টিভঙ্গী, যুদ্ধপরিস্থিতির গভীর বিপদ সম্পর্কে তারা অজ্ঞ এবং সম্ভবত জাপানীদের পক্ষসমর্থক। নজির হিসাবে বলা হত যে গান্ধীজির বক্তৃতা ও রচনাবলীই নাকি প্রমাণ করেছে যে তিনি যুক্তিবিচারের অতীত এক ব্যক্তি এবং বর্তমান অবস্থায় কংগ্রেস ও গান্ধীজিকে একেবারে নিষ্পেষিত করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

৩ : গণ-অভ্যুত্থান এবং তার দমন

১৯৪২ সালের ৯ই আগস্টের প্রত্যূষে সারা ভারতে বহুসংখ্যক লোক গ্রেপ্তার হল। তারপর কি ঘটেছিল? জেলের ভিতরে বহু সপ্তাহ পরে আমরা এ সম্বন্ধে

টুকরোটাকরা খবর পেয়েছিলাম এবং এখনও পর্যন্ত সেই ঘটনাবলীর সম্পূর্ণ চিত্র আমরা পাইনি। বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলকেই হঠাৎ গ্রেপ্তার করা হয় এবং অতঃপর কি করা উচিত তা কেউই ঠিক জানত না। প্রতিবাদ হওয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী এবং সর্বত্র বিক্ষোভের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তিও হয়েছিল। এই সমস্ত প্রতিবাদ-সভাগুলিকে লাঠি, গুলি ও কাঁদুনে গ্যাস দিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হল এবং জনসাধারণের প্রতিবাদ ঘোষণার সাধারণ পথগুলি বন্ধ করে দেওয়া হল। কিন্তু দমন ও নির্যাতনের ফলে গণবিক্ষোভ নতুন পথে ফেটে পড়ল। শহরে ও গ্রামে লোকের ভিড় জমতে লাগল এবং পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ বাধতে লাগল। জনসাধারণের মনে যেগুলি ব্রিটিশ শক্তি ও শাসনের উদ্ধত প্রতীকরূপে গাঁথা ছিল, গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে জমায়েত হয়ে জনসাধারণ সেগুলিকেই আক্রমণ করতে শুরু করল। পুলিশখানা, ডাকঘর, রেলপথ—এইগুলিই ছিল তাদের আক্রমণের লক্ষ্য। ব্যাপকভাবে তারা টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কেটে দিতে লাগল। নেতৃত্বহীন নিরস্ত্র জনগণ বহুবার পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হয়েছিল এবং সরকারী বিবৃতি অনুযায়ীই কমপক্ষে তাদের উপর ৫৩৮ বার গুলি চালানো হয়েছিল। নিচু-দিয়ে-ওড়া বিমান থেকে তাদের উপর মেসিনগানের গুলিবর্ষণও করা হয়েছিল। মাসখানেক অথবা মাসদুয়েক কি আরও কিছু বেশি সময় দেশের সর্বত্র এই ধরনের বিক্ষোভ চলতে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে এটা প্রশমিত হয়ে যায়। যদিচ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এখানে সেখানে দু'একটা ঘটনা ঘটতে থাকে। হাউস্ অফ্ কমন্সে মিস্টার চার্চিল ঘোষণা করলেন—'সর্বশক্তি প্রয়োগ করে গভর্ণমেন্ট এই বিক্ষোভ দমন করতে সক্ষম হয়েছে।' এইসঙ্গে 'সাহসী ভারতীয় পুলিশবাহিনীর বিশ্বস্ততা ও দৃঢ়তা এবং ভারতের ঊর্ধ্বতন রাজকর্মচারীদের মতিগতি ও কর্মক্ষমতার' তিনি উচ্চ প্রশংসা করেন। তিনি আরও বলেন যে 'বহু নতুন সৈন্যসামন্ত ভারতে পাঠানো হয়েছে, এবং সমগ্র ব্রিটিশ আমলের ইতিহাসে এত বেশি সংখ্যক শ্বেত-সৈন্য এর আগে কখনও ভারতে ছিল না।' এই সব বিদেশী সৈন্যদল এবং ভারতীয় পুলিশবাহিনী ভারতের নিরস্ত্র কৃষকের সঙ্গে বহু যুদ্ধেই জয়ী হল; এবং যে আমলাতন্ত্র ভারতে 'ব্রিটিশ রাজের' দ্বিতীয় স্তম্ভস্বরূপ তারা এই দমননীতির সাফল্যের জন্য যথেষ্ট সাহায্য করেছিল, তা সক্রিয়ভাবেই হোক বা নিষ্ক্রিয়ভাবেই হোক।

গ্রামাঞ্চলে এবং শহরে, দেশের সর্বত্র, এর প্রতিক্রিয়া তীব্র ও ব্যাপক রূপ ধারণ করেছিল। প্রদেশে প্রদেশে এবং বহু দেশীয় রাজ্যে সরকারী বাধানিষেধ সত্ত্বেও অসংখ্য সভা, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ চলতে লাগল। একদিন, দুদিন থেকে শুরু করে একমাস দেড়মাস পর্যন্ত অনেক জায়গায় দোকান বাজার ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করে হরতাল পালন করা হয়েছিল। শ্রমিকরাও হরতাল করেছিল। তাদের মধ্যে যারা সংগঠিত ও গণশৃংখলায় অভিজ্ঞ তারাও দেশের প্রধান শিল্পকেন্দ্রগুলিতে সরকার কর্তৃক জাতীয় নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ধর্মঘট করেছিল। লৌহনগরী জামশেদপুরের শ্রমিকদের একপক্ষকালব্যাপী ধর্মঘট এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-

যোগ্য। এরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত সুদক্ষ শ্রমিক, এবং কর্তৃপক্ষ যতদিন না প্রতিশ্রুতি দেয় যে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মুক্তিলাভের ও জাতীয় সরকার গঠনের জন্য তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, ততদিন এরা কাজে যোগদান করেনি। ট্রেড ইউনিয়নের বিশেষ কোনো আহ্বান না আসা সত্ত্বেও ভারতের সুতাকল কারখানার প্রধান কেন্দ্র আমেদাবাদ শহরেও শ্রমিকরা পূর্ণ ধর্মঘট করেছিল।* আমেদাবাদের

* উচ্চ সরকারী কর্মচারীরা এবং আরও অনেকে বলেছেন যে শ্রমিকদের এই সমস্ত ধর্মঘট, বিশেষভাবে জামশেদপুর এবং আমেদাবাদের ধর্মঘট, মালিক ও মিল কর্তৃপক্ষের উৎসাহেই ঘটেছিল। কিন্তু ধর্মঘটের ফলে বড় বড় শিল্পপতিদের যে প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়, তা স্বীকার করেও তারা ধর্মঘটে উৎসাহ জোগায় একথা বিশ্বাস করা কঠিন। অবশ্য এটা ঠিক যে বহু শিল্পপতি ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে ব্যগ্র এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তাদের সমর্থনও আছে। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাদের ধারণা এমন যে সে স্বাধীনতা তাদের স্বার্থ পুরোপুরি বজায় রাখবে। বিপ্লবী আন্দোলন বা প্রচলিত সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের চেষ্টা তাদের আদৌ মনঃপূত নয়। হয়তো এও হতে পারে যে ১৯৪২ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বরের গণবিক্ষোভের তীব্র ও ব্যাপক অভিব্যক্তিতে তারা খানিকটা প্রভাবিত হয়েছিল; এবং তার ফলে ধর্মঘট ইত্যাদির সময় তারা পুলিশ ও সরকারের সহযোগিতায় সাধারণত যে দমন ও জুলুম চালায়, এই সময় তা থেকে তারা বিরত ছিল।

ব্রিটিশ সরকার এবং সংবাদপত্র মহলে আর একটা বদ্ধমূল ধারণা গড়ে উঠেছে—ভারতের বড় বড় শিল্পপতিদের অকুণ্ঠ আর্থিক সাহায্যের উপরই ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত। এটাও সর্বৈব মিথ্যা, কারণ বহুবৎসর যাবৎ আমি কংগ্রেসের সভাপতি এবং সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছি, সেজন্য সত্য হলে আমি অন্তত তা জানতে পারতাম। গান্ধীজি এবং কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত কুটিরশিল্প, অস্পৃশ্যতাবর্জন, হরিজন উন্নয়ন, বনিয়াদী শিক্ষা প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারমূলক কাজে কোনো কোনো শিল্পপতি মাঝে মাঝে আর্থিক সাহায্য করেছে বটে; কিন্তু সাধারণ অবস্থাতেও তারা কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মপন্থা থেকে নিজেদের দূরে দূরেই রেখেছে। সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সময়ে তারা যে আরও বেশি দূরে থাকবে, তা বলাই বাহুল্য। তাদের সহানুভূতি ও সমর্থন যাই থাক না কেন, দেশের অন্য পাঁচজন বুদ্ধিমান ও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির মত তাদের কাছেও নিজেদের স্বার্থসংরক্ষণই হল প্রধান লক্ষ্য। এযাবৎ কংগ্রেসের কাজকর্ম প্রধানত তার বিপুল সংখ্যক সভ্যের কাছ থেকে সংগৃহীত সামান্য চাঁদার দ্বারাই চালানো হয়েছে। কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে বেশির ভাগ কর্মীই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও অবৈতনিক ভাবেই কাজ করেছে। শহরে শহরে বিভিন্ন সময় কিছু কিছু ব্যবসায়ী মাঝে মাঝে চাঁদা দিয়েছে। খুব সম্ভব এর একমাত্র ব্যতিক্রম হয়েছিল ১৯৩৭ সালে সাধারণ নির্বাচনের সময়। এই নির্বাচন উপলক্ষে জনকয়েক বড় বড় শিল্পপতি কংগ্রেস নির্বাচন তহবিলে সাহায্য করেছিল। কিন্তু আমাদের কাজের পরিমাণের তুলনায় এই তহবিলও নিতান্ত কম ছিল। গত পঁচিশ বছরে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক আন্দোলন ও সক্রিয় কর্মপন্থা সত্ত্বেও আমরা যে কত নগণ্য তহবিল নিয়ে কংগ্রেসের কাজ চালিয়েছি তা অনেকের কাছেই বিস্ময়কর—

এই সাধারণ ধর্মঘট ভাঙার নানারকম চেষ্টা হওয়া সত্ত্বেও, এই ধর্মঘট প্রায় তিনমাস কাল পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালিত হয়েছিল। দেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রমিকদের এই সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের ফলে তারা যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ ও কষ্টভোগ করেছে, কারণ তখন শ্রমিকদের মজুরির হার মোটামুটি সুউচ্চ ছিল এবং তারা বাইরের থেকে কোনো সাহায্যই পায়নি। অন্যান্য শহরেও ধর্মঘট হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি এমন দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। দেশের আর একটি সূতাকল কেন্দ্র—কানপুরে—শ্রমিকদের কোনো বড় ধর্মঘট হয়নি, কারণ সেখানকার কমিউনিস্ট নেতৃত্ব শ্রমিকদের ধর্মঘট থেকে বিরত করতে সফল হয়েছিল। সরকার পরিচালিত রেলওয়েতে রেলশ্রমিকরা বিশেষ কোনোও ধর্মঘট করেনি। যদিচ সাধারণ বিক্ষোভের ফলে রেল চলাচলব্যবস্থা অনেকবার বন্ধ ছিল।

প্রদেশগুলির মধ্যে একমাত্র পাঞ্জাবেই বোধহয় এই গণবিক্ষোভ সবচেয়ে কম হয়েছিল। অবশ্য কিছু কিছু হরতাল বা ধর্মঘট যে সেখানে ঘটেনি, তা নয়। বিপুল-সংখ্যক মুসলমান অধ্যুষিত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একটা বিশিষ্ট অবস্থা ছিল। প্রথমত, অন্যান্য প্রদেশের মত এখানে সরকারের তরফ থেকে প্রথমে সে রকম কোনো প্ররোচনামূলক কর্মকলাপ বা ব্যাপক গ্রেপ্তার অনুষ্ঠিত হয়নি। এটার একটা কারণ হয়তো এই যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীরা অত্যন্ত জঙ্গী-প্রকৃতির বলে সরকারের একটা ধারণা ছিল। অপরদিকে এও একটা কারণ যে সাধারণভাবে মুসলমানরা এই জাতীয় অভ্যুত্থানের ভিতর নেই, এই ধরনের একটা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করাই সরকারের নীতি ছিল। কিন্তু ভারতের অন্য সমস্ত অঞ্চলে যে সব ঘটনা ঘটেছিল, তার খবর যখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আস্তে আস্তে এসে পৌঁছুতে লাগল, তখন এখানেও প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিল। তখন এখানকার জনগণও ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধনের দৃপ্ত ঘোষণা করে সংগ্রাম শুরু করল। এখানেও অন্যান্য স্থানের মত গুলিবর্ষণ হয়েছিল এবং গণবিক্ষোভ দমনের স্বাভাবিক পন্থাগুলি সরকার গ্রহণ করেছিল। হাজার হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হল, এমনকি বিখ্যাত পাঠান নেতা বাদ্‌শা খাঁ (আবদুল গফ্‌ফর খাঁ এই নামেই জনপ্রিয়) পর্যন্ত পুলিশের বর্বর আঘাতে সাংঘাতিকভাবে আহত হলেন। সরকারের তরফ থেকে এটা ছিল চরম প্ররোচনা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে আবদুল গফ্‌ফর খাঁ তাঁর জনগণের মধ্যে এমনই চমৎকার শৃঙ্খলাবোধ এনেছিলেন যে, এই প্রদেশে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত কোনো হিংসাত্মক দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়নি।

জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের এই বিশৃঙ্খল অভিব্যক্তি প্রচণ্ড সংঘর্ষ ও

পাশ্চাত্যের লোকদের কাছে তো অবিশ্বাস্যই হবে। যে প্রদেশের সঙ্গে আমার পরিচয় সবচেয়ে বেশি এবং যে প্রদেশে কংগ্রেস সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ও সুসংগঠিত সেই যুক্তপ্রদেশের কথা আমি ভালোভাবেই জানি। এখানে সভ্যদের নিকট থেকে মাথাপিছু চার আনা চাঁদা সংগ্রহ করেই আমাদের প্রায় সমগ্র আন্দোলন ও কাজ চালানো হয়েছিল।

ধ্বংসলীলায় পরিণতি লাভ করে এবং পরাক্রান্ত সশস্ত্রবাহিনীর প্রতিরোধ সত্ত্বেও যে এ আন্দোলন থেমে যায়নি—এ থেকেই বোঝা যায় যে জনগণ কতদূর উত্তেজিত হয়েছিল। এ উত্তেজনা তাদের মনে তাদের নেতৃবর্গের গ্রেপ্তারের পূর্ব থেকেই পুঞ্জীভূত হয়েছিল, কিন্তু এই সব গ্রেপ্তার ও গুলিচালনার ফলে তারা সম্পূর্ণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, এবং ক্ষিপ্ত জনতা স্বভাবত যা করে থাকে ভারতের জনগণও ঠিক তাই করেছিল। তারা কি করবে না করবে সে সম্বন্ধে জনগণের মনে কিছুটা অনিশ্চয়তা ছিল। কারণ তাদের সামনে তখন কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ বা কর্মপন্থা ছিল না, এমন কোনো নেতাও তাদের মধ্যে ছিল না যে তাদের সংগঠিতভাবে পরিচালনা করতে অথবা কি করা উচিত তা বলে দিতে পারে, অথচ তাদের ক্রোধ ও উত্তেজনা এমন একটা চরম পর্যায়ে এসে পেঁাছেছিল যে স্থির হয়ে থাকাও তাদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। এ অবস্থায় সাধারণত যা হয়ে থাকে—এলাকায় এলাকায় স্থানীয় নেতা দেখা দিতে লাগল, এবং সেই এলাকার জনসাধারণও তাদের নেতৃত্বে সংগ্রামের পথে এগিয়ে গেল। কিন্তু এই ধরনের স্থানীয় নেতাদের নেতৃত্ব বা পরিচালনার ভূমিকা ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর এবং মূলত এই গণ-অভ্যুত্থানের প্রকৃতি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। ১৯৪২ সালের এই গণ-বিক্ষোভের মধ্যে শান্তিপূর্ণ বা হিংসাত্মক—দুই প্রকারের কর্মপন্থায়ই ভারতের তরুণরা, বিশেষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও একটা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই সময়ে বহু বিশ্ববিদ্যালয় সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই রকম আবহাওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় অনেক নেতা শান্তিপূর্ণ কর্মপন্থা এবং আইন-অমান্য আন্দোলন অনুসরণের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু উপস্থিত পরিস্থিতিতে তাদের এই চেষ্টা সফল হতে পারেনি। গত বিশ বছর ধরে অহিংসার যে বাণী জনসাধারণের মনে গ্রথিত করবার চেষ্টা হয়েছিল, সে বাণী জনসাধারণের মন থেকে মুছে গেল; অথচ মানসিক বা অন্যাদিক দিয়ে কার্যকরী কোনো হিংসাত্মক কর্মপন্থার জন্যও তাদের কোনো প্রস্তুতি ছিল না। অহিংসাবাদের যে মন্ত্রে তারা দীক্ষিত ও শিক্ষিত হয়েছিল, সত্যিকারের কার্যকরী কোনো হিংসাত্মক কর্মপন্থার অনুসরণে এখন সেইটাই তাদের মনে এনে দিল সন্দেহ ও দুর্বলতা। এই অবস্থায় কংগ্রেস যদি তার অনুসৃত নীতি ভুলে গিয়ে এর আগে হিংসাত্মক কর্মপন্থার পক্ষে সামান্যতম ইঙ্গিতও দিত, তাহলে ১৯৪২ সালের আগস্টের পরে ভারতবর্ষে হিংসাত্মক আন্দোলন যে পরিমাণে হয়েছিল, তা শতগুণ বেশি হয়ে আত্মপ্রকাশ করত।

কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই রকম কোনো ইঙ্গিতই দেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, শেষ বাণীতে কংগ্রেস অহিংস কর্মপন্থার উপরই বিশেষ জোর দিয়েছিল। তবু জনমনের উপর কংগ্রেসের আর একটা নীতির প্রভাবও বেশ কিছু কাজ করেছিল। ইতিপূর্বে আমরা কংগ্রেস থেকে ঘোষণা করেছিলাম যে, শত্রু আক্রমণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র দেশরক্ষার অধিকার আমাদের আছে, এবং এটা সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত। সুতরাং দেশের ভিতরে বিভিন্নরূপে যে সমস্ত অত্যাচার নিপীড়ন রয়ে গেছে, তার বিরুদ্ধেও আমরা কেন সশস্ত্র সংগ্রামের পথ গ্রহণ করব না? হিংসাত্মক ও সশস্ত্র

কর্মপন্থার উপর যে বিধিনিষেধ ছিল, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যখন একটা ব্যাপারে সেটা আলগা করে দেওয়া হল, তখন তার ফলাফল আমাদের উদ্দেশ্য অতিক্রম করে গেল, কারণ অহিংসাবাদ এবং শত্রু আক্রমণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের নীতির মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য ছিল, তার তারতম্য সাধারণ জনগণের পক্ষে বোঝা কঠিন ছিল। উপরন্তু পৃথিবীর সর্বত্র তখন হিংসা ও সশস্ত্র সংঘাতসংঘর্ষে পরিপূর্ণ, এবং প্রচার প্ররোচনার মধ্য দিয়ে এই সংঘর্ষই ব্যাপক হয়ে উঠছিল। তাছাড়া তখন জনগণের তীব্র মানসিক উত্তেজনা এবং উপস্থিত পরিস্থিতির সুবিধা অসুবিধার দাবিই তাদের চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য কংগ্রেসের ভিতরে এবং বাইরে এমন আরও অনেক লোক ছিল যাদের কংগ্রেসের এই অহিংসনীতিতে মোটেই আস্থা ছিল না, এবং যারা হিংসাত্মক কর্মপন্থা গ্রহণে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করত না।

কিন্তু মুহূর্তের প্রচণ্ড উত্তেজনায় জনসাধারণ অন্ধ হয়ে গেলেও, কম লোকই চিন্তা করতে সক্ষম। দীর্ঘদিন ধরে যে আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা বাসনা তাদের মনে নিষ্পেষিত হয়ে এসেছে, সেইটাই তাদের অনিবার্যভাবে ঠেলে নিয়ে যায়। সুতরাং ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর এই প্রথম আবার ভারতের অগণিত জনতার বিরাট অভ্যুত্থান হল। ভারতে ব্রিটিশরাজশক্তিকে উচ্ছেদের জন্য তারা আবার শক্তিপরীক্ষার আহ্বান জানালো (নিরস্ত্র জনতার শক্তির ঘোষণা!)। কিন্তু এই সময়ে জনতার এই শক্তিপরীক্ষার আহ্বান অর্থহীন অবিবেচনার কাজই হয়েছিল, কারণ সমস্ত সংগঠিত সশস্ত্র বাহিনীই ছিল অপর পক্ষে এবং সে বাহিনীর শক্তিসমাবেশ তখন ছিল এমন যা ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইতিপূর্বে কখনও হয়নি। জনতার সংখ্যা যতই হোক, সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে তার ক্ষমতা কতটুকু? সুতরাং জনতার এই সংগ্রামের ব্যর্থতা ছিল অবধারিত, যদি না অপর পক্ষের সেই সশস্ত্র বাহিনী তাদের আনুগত্যের পরিবর্তন করে। কিন্তু এত সব বিচার বিবেচনা তখন এই জনতা করেনি—সংঘর্ষের প্রস্তুতি বা তার উপযুক্ত সময়ের কথাও তারা ভাবেনি। ঘটনাটা এসেছিল আকস্মিকভাবে এবং তাদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ—তা ভুলই হোক বা ঠিকই হোক, ভারতের স্বাধীনতার প্রতি তাদের গভীর ভালোবাসা এবং বিদেশী প্রভুত্বের উপর তীব্র ঘৃণারই পরিচায়ক।

এই সংগ্রামের মধ্যে সাময়িকভাবে অহিংসাবাদের উপর আস্থা শিথিল হয়ে এলেও দীর্ঘদিন জনগণ যে অহিংসাবাদের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তার বিশেষ একটা শুভ ফলও দেখা গিয়েছিল। উত্তেজনা ও উন্মাদনা চরমে উঠলেও, জনসাধারণের মনে এই আন্দোলনের কোনো স্তরেই জাতিগত বিদ্বেষ বা আক্রোশের কোনো অভিব্যক্তি প্রায় দেখা যায়নি এবং মোটের উপর শত্রুপক্ষের কাউকে তার শারীরিক জখম করা থেকে এই সংগ্রামী জনতা সব সময় বিরত থাকবার চেষ্টা করেছে। আন্দোলনের মধ্যে ব্যাপকভাবে চলাচলব্যবস্থা বা সরকারী সম্পত্তির ধ্বংসসাধন করা হয়েছে, কিন্তু এই ধ্বংসলীলার মধ্যেও যাতে কোনো প্রাণহানি না হয়, তার দিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছিল। অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই যে এটা সম্ভাব্য ছিল,

তা নয়, বিশেষভাবে পুলিশ বা সশস্ত্র সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে তো নয়ই। যে সমস্ত বেসরকারী বিবরণী আমার নজরে এসেছে, তার থেকেই আমি যতদূর জানতে পেরেছি তাতে ভারতের এই ব্যাপক বিক্ষোভের মধ্যে জনতা কর্তৃক মাত্র একশো জন নিহত হয়েছিল। যে বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে এই বিক্ষোভ প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল এবং পুলিশের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ যে সংখ্যায় ঘটেছিল, তাতে মাত্র একশো জন নিহত হওয়া সংখ্যার দিক দিয়ে নিতান্ত অল্প। এর মধ্যে কেবলমাত্র একটা ঘটনা আমার কাছে খুবই নৃশংস ও শোচনীয় বলে মনে হয়েছিল—বিহারের কোনো এক অঞ্চলের উত্তেজিত জনতা কর্তৃক দুইজন ক্যানাডিয়ান বিমান চালকের হত্যা। কিন্তু সাধারণভাবে এই আন্দোলনের ভিতর জাতিগত ঘৃণা বা আক্রোশের অনুপস্থিতি একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।*

১৯৪২ সালের আন্দোলনে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিচালনার ফলে হতাহত জনগণের সংখ্যা সরকারী মতে এইরূপ: ১০২৮ জন নিহত এবং ৩২০০ জন আহত। বলাবাহুল্য এই সংখ্যা নিতান্ত কম করেই দেখানো হয়েছে; কারণ সরকারী বিবৃতি অনুযায়ীই কমপক্ষে ৫৩৮ বার গুলি চালানো হয়েছিল। তাছাড়া চল্‌তি লরি থেকে জনতার উপর ইতস্তত গুলিবর্ষণ তো ছিলই। এ বিষয়ে মোটামুটি ঠিক এমন একটা সংখ্যা নিরূপণ করাও রীতিমত দুঃসাধ্য। সাধারণ মতে প্রায় ২৫০০০ লোক নিহত হয়েছিল; এটাকে অত্যুক্তি বলে ধরলেও কমপক্ষে যে ১০,০০০ লোক নিহত হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

শহর এবং গ্রামাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় যে ভাবে ব্রিটিশশক্তির কর্তৃত্ব লোপ

* এ বিষয়ে ক্লাইভ ব্রান্‌সন রচিত 'ব্রিটিশ সোল্‌জার লুক্‌স্‌ এ্যাট ইন্ডিয়া' বইতে সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। ক্লাইভ ব্রান্‌সনের লেখা চিঠিগুলো নিয়েই এই বইটি সংকলিত হয়েছে। ব্রান্‌সন ছিলেন শিল্পী এবং একজন কমিউনিস্ট। স্পেনের আন্তর্জাতিক বাহিনীতে (ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড-এ) তিনি লড়াই করেছিলেন এবং ১৯৪১ সালে সার্জেন্ট-এর পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি 'রয়্যাল আর্মার্ড কোরে' যোগদান করেন। ১৯৪২ সালে তাঁর বাহিনীর সঙ্গে তাঁকে ভারতে পাঠানো হয়েছিল এবং ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে বর্মার আরাকান ফ্রন্টে যুদ্ধ করার সময় তিনি নিহত হন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পর ১৯৪২ সালের আগস্টে তিনি বোম্বাইতে ছিলেন; এই সময় ক্রোধ ও উত্তেজনায়, সমগ্র বোম্বাইয়ের জনগণ মত্ত হয়ে উঠেছিল এবং তাদের উপর সর্বদাই গুলি চলছিল। এই সময় ব্রান্‌সন নাকি বলেছিলেন: "তোমাদের (ভারতের) জাতীয়তাবোধ কি অপূর্ব সুস্থ ও সরল! রাস্তায় আমি অনেককে কমিউনিস্ট পার্টির আপিসের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আমার পরিধানে তখন সামরিক বেশ। তখন বোম্বাইয়ের পথে পথে আমার মত লোক নিরস্ত্র ভারতবাসীদের উপর যথেচ্ছ গুলিবর্ষণ করছে। সেজন্য স্বভাবতই আমি একটু উদ্বিগ্ন বোধ করছিলাম। কি জানি আমার ভাগ্যে যে কি আচরণ জুটবে! কিন্তু যাকেই আমি ঠিকানা জিজ্ঞাসা করেছি, সেই আমাকে সাহায্যে করতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে—কেউ আমাকে কোনো অপমান করেনি বা ভুল ঠিকানা দিয়ে হয়রান করেনি।"

পেয়েছিল তাতে বিস্মিত হতে হয়। এই সমস্ত এলাকাকে 'পুনরধিকার' করতে সরকারের অনেক দিন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কয়েক সপ্তাহই লেগেছিল। বিশেষভাবে বিহারে, বাঙলার মেদিনীপুর ও যুক্তপ্রদেশের দক্ষিণপূর্ব জেলাগুলোতেই এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে যুক্তপ্রদেশের বালিয়া জেলায় (যেটা সরকারকে 'পুনরধিকার' করতে হয়েছিল) জনতা কর্তৃক হিংসাত্মক নৃশংসতা বা খুন জখমের কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। পরবর্তী সময়ে যে সমস্ত বিচারাদির অনুষ্ঠান হয়েছিল, তার থেকেই এটা জানা যায়।

ঘটনার রূপ এমন তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে সেটা সাধারণ পুলিশবাহিনীর আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল। সজাগ কর্তৃপক্ষ তাই ১৯৪২ সালের প্রথম দিকেই স্পেশাল আর্মড্ কনস্ট্যাবুলারী (এস. এ. সি) নামে একটি নূতন পুলিশবাহিনী সংগঠিত করেছিল। গণ-আন্দোলন ও বিক্ষোভ দমনের জন্য এদের বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। আয়র্ল্যান্ডের ব্ল্যাক এন্ড ট্যান-এর মতই ছিল নিষ্ঠুর ও নৃশংস এদের কার্যকলাপ এবং ১৯৪২ সালের গণ-আন্দোলন ধ্বংস ও দমনে এদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষভাবে মনোনীত শুধুমাত্র কয়েকটি শ্রেণী ও গোষ্ঠী ছাড়া সাধারণভাবে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে এই বিক্ষোভ দমনের কাজে লাগানো হয়নি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ ও গুর্খা সেনাবাহিনীকেই নিযুক্ত করা হত। কখনও কখনও ভারতীয় সেনাবাহিনী ও স্পেশ্যাল পুলিশবাহিনীকে সুদূর কোনো অঞ্চলে পাঠানো হত। সে সব জায়গার ভাষা না জানায় তারা সেখানকার জনতার মধ্যে অপরিচিত আগন্তুক হিসাবেই দায়িত্ব পালন করে যেত।

জনগণের বিক্ষোভকে যদি আমরা স্বাভাবিক বলেই ধরে নিই, তাহলে তার বিরুদ্ধে সরকারের প্রতিক্রিয়াও খুবই স্বাভাবিক ছিল। জনতার এই উচ্ছৃংখল বিক্ষোভ এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দুই-ই দমন করতে সরকার ছিল বাধ্য এবং আত্মরক্ষার দায়েই যাদের সে শত্রু বিবেচনা করত, তাদের সমূলে ধ্বংস করাও ছিল তার একান্ত প্রচেষ্টা। যে সমস্ত কার্যকারণ, যে আবেগ জনগণকে এই প্রচন্ড বিস্ফোরণের দিকে ঠেলে দিয়েছিল, তা যদি সরকার বুঝতে চেষ্টা করত, বা সেটা বোঝবার মত যদি তার আগ্রহও থাকত, তাহলে ভারতবর্ষে এই সংকটের উদ্ভবই হত না— অনেক আগেই সুষ্ঠুভাবে ভারতের জটিল সমস্যার সমাধান হত। তার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যে কোনো আঘাত আসলে তা চিরদিনের মত ধ্বংস করে দিতে সরকার অনেক আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিল। প্রকৃতপক্ষে ঘটনাবলীর উদ্যোগটা সরকারই করেছিল, এবং তার সুবিধামত সময়ে সে-ই প্রথম আঘাত হেনেছিল। জাতীয় আন্দোলনে বা শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে যারা এ যাবৎ বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিল, সেই রকম হাজার হাজার নরনারীকে গ্রেপ্তার করে সরকার প্রথমেই তাদের জেলে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সারা দেশ জুড়ে জনগণের আক্রোশ ও বিক্ষোভের আকস্মিক বিস্ফোরণে সরকার সাময়িকভাবে হতভম্বই হয়ে গিয়েছিল এবং তার নির্যাতন-নিপীড়ন ও দমনের সকল ব্যবস্থা একেবারে অক্ষম হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু সরকারের শক্তিসম্পদ ছিল প্রচুর এবং ধীরে ধীরে সমস্ত শক্তি সমাবেশ করে সরকার এই বিদ্রোহের হিংসাত্মক ও অহিংস সকল অভিব্যক্তিকেই নির্মমভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিল। ভারতের বিত্তশালী ও ধনিকশ্রেণীর মধ্যেও মৃদু জাতীয়তাবোধ ছিল, মাঝে মাঝে সরকারী নীতির সমালোচনাও তারা করত। কিন্তু ভারতব্যাপী এই গণবিক্ষোভে তারাও ভীতিগ্রস্ত হয়ে উঠেছিল; কারণ তারা জানত যে এই গণ-আন্দোলন কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে, এর লক্ষ্য শুধু রাজনৈতিক পরিবর্তনই নয়, সামাজিক কাঠামোকেও ওলটপালট করা এর উদ্দেশ্য। সুতরাং যেমন যেমন এই গণবিক্ষোভকে সরকার দমন করতে সফল হল, সেই অনুপাতে এই সমস্ত দ্বিধাগ্রস্ত সুবিধাবাদীর দলও সরকারের পিছনে এসে দাঁড়াল; এবং যারা সরকারের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, সেই জনতাকে এরা যেন এখন তারস্বরে নিন্দাবাদ করতে লাগল।

এইভাবে বিদ্রোহের বাহ্যপ্রকাশগুলি ধ্বংস করে সরকার তাকে সমূলে উচ্ছেদ করতে চাইল। কাজেই ভারতের জনগণকে জোর করে ব্রিটিশ শক্তির কাছে সম্পূর্ণ নতিস্বীকার করানোর জন্য সমগ্র শাসনযন্ত্রকে নিযুক্ত করা হল। ভাইসরয়ের নির্দেশ বা অর্ডিনান্স জারী করে রাতারাতি নূতন নূতন আইনকানুন তৈরি হল। ব্রিটিশের সৃষ্টি এবং তার প্রভুত্বের প্রতীক ফেডারেল কোর্ট এবং হাইকোর্টের সিদ্ধান্তগুলিকে প্রকাশ্যভাবে আমলাতন্ত্র লঙ্ঘন ও অবজ্ঞা করতে লাগল; অথবা নূতন অর্ডিনান্স জারী করে এইগুলিকে অকার্যকরী করে দেওয়া হল। এই সময়ে যে সমস্ত বিশেষ বিচারের ট্রাইবিউনাল খাড়া করা হয়েছিল (এবং যেগুলি পরবর্তী কালে বিভিন্ন কোর্টের রায় অনুসারে বেআইনী বলে প্রমাণিত হয়েছিল) সেগুলি আইন কানুনের সাধারণ রীতিনীতি লঙ্ঘন করেই হাজার হাজার লোককে দীর্ঘমেয়াদী বন্দীজীবন এমনকি ফাঁসির হুকুম পর্যন্ত দিয়েছিল। পুলিশ (বিশেষত স্পেশ্যাল আর্মড্ কনস্ট্যাবুলারী) ও গোয়েন্দাবিভাগ সর্বেসর্বা হয়ে উঠল এবং রাষ্ট্রশক্তির প্রধান স্তম্ভ হিসাবে দেখা দিল। বিচার সমালোচনার বাইরে এরা অবাধে এদের বেআইনী ও নৃশংস কার্যকলাপ চালাতে লাগল। দুর্নীতি ও ব্যভিচারে দেশ ছেয়ে গেল। স্কুল কলেজে অসংখ্য ছাত্রকে নানাভাবে পীড়ন ও শাস্তি দেওয়া হল এবং হাজার হাজার তরুণের উপর চাবুক চালানো হল। সরকারের স্বপক্ষে ছাড়া সমস্তরকম আন্দোলন বেআইনী করে দেওয়া হল।

সরকারের এই নির্মম দমননীতির সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী হয়েছিল গ্রামাঞ্চলের সরলহৃদয় দারিদ্র্যপীড়িত নরনারী। যুগ যুগ ধরে দুঃখ, দারিদ্র্য, নির্যাতন, নিপীড়নই ছিল এদের জীবনের ভূষণ। তারাও ক্ষণেকের জন্য মাথা তুলবার সাহস করেছিল, তাদের মনে জেগেছিল সুদিনের আশা ও স্বপ্ন। এমনকি জড়তা ত্যাগ করে তারা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এটা তাদের বোকামি বা ভুল, যাই হয়ে থাকুক না কেন—ভারতের স্বাধীনতার সম্বন্ধে তাদের অটল নিষ্ঠার প্রমাণ তারা দিয়েছে। তারা পরাজিত হয়েছে এবং সেই পরাজয়ের বোঝা গিয়ে চেপেছে তাদের নুয়ে পড়া কাঁধে আর ভগ্ন দেহে। এমন খবর আমাদের কাছে এসেছে যে একটা গোটা গ্রামের সমস্ত

অধিবাসীকেই শাস্তি দেওয়া হয়েছে—সে শাস্তির হার বেত্রাঘাত থেকে শুরু করে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত। বাঙলা সরকারের পক্ষ থেকেই বলা হয়েছিল যে, "১৯৪২ সালের সাইক্লোনের পূর্বে ও পরে তমলুক ও কাঁথি মহকুমার সরকারী ফৌজ প্রায় ১৯৩টি কংগ্রেস ক্যাম্প ও বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়।" সাইক্লোনের ধ্বংসলীলায় এই সমস্ত অঞ্চল একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু সরকারী দমননীতির নির্মম পথে সেটা কোনো প্রতিবন্ধকই সৃষ্টি করেনি।

বিভিন্ন গ্রামে সমগ্র গ্রামের উপর শাস্তিমূলক জরিমানা (পিউনিটিভ ফাইন) হিসাবে প্রচুর টাকা ধার্য হয়েছিল। হাউস অফ কমন্সে মিস্টার আমেরীর বিবৃতি অনুসারে মোট নব্বুই লক্ষ (৯০,০০,০০০) টাকার পিউনিটিভ ট্যাক্স বসানো হয়েছিল আর এর মধ্যে ৭৮,৫০,০০০ টাকা আদায় হয়েছিল। এই বিপুল অর্থ বুভুক্ষা-পীড়িত দারিদ্র্যক্লিষ্ট গ্রামবাসীদের কাছ থেকে কিভাবে যে আদায় করা হয়েছিল, সেটা আলাদা কথা, কিন্তু ১৯৪২ সালে এবং তার পরে যা কিছু ঘটেছিল—পুলিশের গুলিচালনা, অগ্নিকাণ্ড—সমস্ত নির্যাতনের কষ্টদুঃখের ঊর্ধ্বে এই জোর করে বিপুল অর্থ আদায়ের নৃশংস লাঞ্ছনা। একটা গ্রামের উপর যে পরিমাণ জরিমানা ধার্য হত, শুধু যে সেটাই আদায় হত, তা নয়, তার অনেক বেশি আদায় করা হত; আর সেই উদ্বৃত্ত টাকা আদায়ের ক্রিয়াতেই উবে যেত।

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে সব নিয়মকানুন ও কলাকৌশল দিয়ে সাধারণত গভর্নমেন্টের কার্যকলাপকে ঘিরে রাখা হয়, সে আবরণ আর রইল না, জুলুমের নগ্নমূর্তি আত্মপ্রকাশ করল রাজশক্তির প্রতীক হিসাবে। কলাকৌশল বা নিয়মকানুনের প্রতারণার কোনোও প্রয়োজন আর তখন ছিল না; কারণ ব্রিটিশ প্রভুত্বের পরিবর্তে জাতির স্বকীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে যে শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, সাময়িকভাবে হলেও, ব্রিটিশ সরকার তা দমন করতে সক্ষম হয়েছিল। সংগ্রামের যে পর্যায়ে শক্তি ও ক্ষমতাই চূড়ান্ত, যখন অন্য আর সব কিছু অর্থহীন প্রলাপ, সংগ্রামের সেই শেষ শক্তিপরীক্ষার ধাপে ভারতকে পরাজয় স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। ভারতের এই পরাজয়, তার এই ব্যর্থতা শুধু ব্রিটিশ অস্ত্রশক্তির বিপুল বিক্রম অথবা যুদ্ধজনিত জনগণের মানসিক বিভ্রান্তির জন্যই নয়; তার কারণ—স্বাধীনতার সেই শেষ সংগ্রামে ভারতের জনগণ চরম আত্মত্যাগের জন্য তখনও পর্যন্ত প্রস্তুত হতে পারেনি। তাদের এই পরাজয়ে ব্রিটিশ শক্তির ধারণা হল যে তাদের প্রভুত্ব স্বকীয় মহিমায় পুনর্বার সুপ্রতিষ্ঠিত হল এবং সেই প্রভুত্বের বন্ধন বিন্দুমাত্র আলগা করার কোনো কারণ আর নেই।

৪ : বিদেশের প্রতিক্রিয়া

১৯৪২ সালে ভারতে যে ঘটনাবলী ঘটেছিল, তার প্রচার ও খবরাখবর কড়া সেন্সরের দ্বারা চেপে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা হয়েছিল। এমনকি ভারতের সংবাদ-

পত্রগুলিতেও প্রতিদিনকার ঘটনার মধ্যে অনেক কিছুই প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ছিল এবং ভারত থেকে বিদেশে কোনো খবর পাঠানোর ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের নজর ছিল অনেক বেশি সতর্ক ও কড়া। সঙ্গে সঙ্গে সরকারী মহল বিদেশে এই সব ঘটনাবলীর বিকৃত ও মিথ্যা প্রচারের বন্যা সৃষ্টি করেছিল। বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই এই বিকৃত প্রচারের উপর সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়; কারণ যুক্তরাষ্ট্রের মতামতের একটা বিশেষ গুরুত্ব তখন ছিল। সে-সময় বক্তৃতা মারফৎ প্রচার করবার জন্য শত শত ইংরেজ ও ভারতীয় বক্তাকে যুক্তরাষ্ট্রে সফর করতে পাঠানো হয়েছিল। প্রচারের কথা বাদ দিলেও যুদ্ধের গুরুভার ও উদ্বিগ্নতায় ক্লিষ্ট ইংরেজদের পক্ষে ভারতীয়দের প্রতি এ সময় একটা বিরুদ্ধভাব গড়ে ওঠা ছিল স্বাভাবিক—বিশেষত সেই সব ভারতীয়দের প্রতি যারা তাদের এই সংকটকালে বিপদের বোঝা বাড়িয়ে তুলছে। এই বিরুদ্ধভাব আরও তীব্র করে তুলছিল একতরফা প্রচার, কিন্তু এই প্রতিক্রিয়ার মূল কারণ ব্রিটিশ জাতির নিজেদের উদ্দেশ্যের সাধুতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস। অপরের মতামত বা মনোভাব সম্বন্ধে তাদের আশ্চর্য রকম উদাসীনতাই অবশ্য ব্রিটিশ জাতির শক্তির উৎস; এবং সেইজন্যই তারা যাই করুক না কেন সেটার সাফাই করে যেতে পারে; আর যদি কিছু দুর্ঘটনা ঘটে তার জন্য দায়ী নিশ্চয়ই সেই সব লোক যারা নিজ দোষে ব্রিটিশ জাতির সদ্‌গুণগুলি দেখতে পায় না। ব্রিটিশ জাতির সদ্‌গুণ আবার নতুন করে প্রমাণিত হল যখন তারা নিজেদের সশস্ত্রবাহিনী ও ভারতীয় পুলিশের সাহায্যে—যারা ব্রিটিশ জাতির সদ্‌গুণগুলি সম্বন্ধে সন্দিহান হতে সাহসী হয়েছিল—সেই সব লোককে সম্পূর্ণ দমন করতে সক্ষম হল। তাই ভারতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে মিস্টার উইনস্টন চার্চিল সদম্ভ ঘোষণা করলেন : 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দেউলিয়াপনা দেখার জন্য আমি সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী হইনি।' মিস্টার চার্চিলের এই উক্তির পিছনে তাঁর দেশের অধিকাংশ লোকের যে সমর্থন ছিল, তা সন্দেহাতীত—এমন কি ইতিপূর্বে যারা সাম্রাজ্যতন্ত্রের সমালোচনা করত, তারা পর্যন্ত মিস্টার চার্চিলের এই উক্তির সঙ্গে একমত ছিল। সাম্রাজ্যস্বার্থ ও ঐতিহ্য রক্ষায় তারা যে কারও চেয়ে কম নয় তা প্রমাণ করার জন্য ব্রিটিশ লেবার পার্টির নেতৃবৃন্দও উঠেপড়ে লেগেছিলেন, এবং মিস্টার চার্চিলের উক্তি সমর্থন করে তাঁরাও 'যুদ্ধের পর সাম্রাজ্যের ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য ব্রিটিশ জনগণের দৃঢ় ইচ্ছার' উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন।

আমেরিকায় সুদূর ভারতবর্ষের সমস্যা সম্পর্কে জনমত খানিকটা দ্বিধাগ্রস্তই ছিল। ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর গুণাবলী সম্পর্কে তাদের ততটা আস্থা ছিল না, তাছাড়া অন্যান্য জাতির কবলিত সাম্রাজ্যপ্রথাকেও তারা সুনজরে দেখত না। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধপরিচালনায় ভারতের সম্পদসামগ্রী পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগানোর জন্যই বিশেষভাবে তারা ভারতবাসীর শুভ ইচ্ছা লাভ করতে ব্যগ্র ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও একপক্ষীয় মিথ্যা ও বিকৃত প্রচারের খানিকটা ফলাফল অনিবার্যভাবেই দেখা দিয়েছিল, এবং তাদের মধ্যে একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে ভারতের সমস্যা

এত জটিল যে এ ব্যাপারে তাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। তাছাড়া নিজেদের মিত্র ব্রিটেনের নিজস্ব কোনো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা তাদের পক্ষে ছিল কঠিন।

সোভিয়েট রুশিয়ার কর্তৃপক্ষ বা সাধারণ জনগণের মধ্যে ভারত সম্পর্কে কি মনোভাব ছিল তা বলা শক্ত। বিপুল যুদ্ধপ্রচেষ্টায় এবং স্বদেশ থেকে আক্রমণ-কারীকে বিতাড়িত করতে তখন তারা অত্যন্ত ব্যস্ত। যেসব সমস্যার সঙ্গে তাদের আশু কোনো সম্পর্ক নেই সে সম্বন্ধে মাথা ঘামাবার অবকাশই তাদের ছিল না। কিন্তু সাধারণত তারা দূরদৃষ্টি নিয়েই চিন্তা করত, এবং ভারতবর্ষ এশিয়ায় তার সীমান্তপ্রান্তে অবস্থিত, কাজেই ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা তাদের পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয় না। ভারত সম্পর্কে ভবিষ্যতে তারা কি নীতি গ্রহণ করবে তা এখনই অবশ্য বলা যায় না। তবে এটা নিঃসন্দেহ যে তাদের সে নীতি হবে বাস্তবমূলক এবং ইউ. স. স. র.-এর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিবৃদ্ধিই হবে সেই নীতির মূল প্রেরণা। বহুদিন তারা ভারত সম্পর্কে কোনো উল্লেখ পরিহার করে এসেছে। কিন্তু ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে সোভিয়েট বিপ্লবের পঞ্চবিংশতি বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে স্ট্যালিন ঘোষণা করেছিলেন যে সোভিয়েট নীতি হল: 'জাতিবৈষম্যের বিলোপসাধন, ঐক্যবদ্ধ ও সংহত সীমানার ভিত্তিতে সকল জাতির সমানাধিকার, পরাধীন জাতিসমূহের মুক্তি এবং তাদের সার্বভৌমত্ব স্বীকার, প্রত্যেক জাতির আত্মকর্তৃত্ব ও স্বকীয় ব্যাপারে স্বাধীনতা অধিকার স্বীকার, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত জাতিগুলির পুনর্গঠনের জন্য অর্থনৈতিক সাহায্যদান, গণতান্ত্রিক স্বাধী-নতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং হিটলারী ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন।'

চীনে দু'একটি ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্তভাব থাকলেও মোটামুটি জনগণের সমগ্র সমর্থন ও সহানুভূতি ভারতের স্বাধীনতার দিকেই ছিল। এই সহানুভূতির অন্যতম একটা কারণ নিহিত ছিল ইতিহাসের ধারার মধ্যে। এ ছাড়া এটা ছিল খুবই পরিষ্কার যে ভারতবর্ষ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত চীনের স্বাধীনতাও বিপন্ন। শুধু চীনে নয়, সমগ্র এশিয়ায়, মিশরে এবং মধ্যপ্রাচ্যে, ভারতের স্বাধীনতা অন্য সকল পরাধীন জাতির স্বাধীনতার সূচনা এবং প্রতীক হিসাবেই গৃহীত হয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নই ছিল বর্তমানের কষ্টিপাথর আর ভবিষ্যতের পরিমাণের মাপ-কাঠি। 'ওয়ান ওয়ার্লড্' গ্রন্থে ওয়েন্ডেল উইল্‌কি বলেছেন: "আফ্রিকা থেকে আলাস্কা অবধি বারবার অসংখ্য নরনারী আমাকে একটা প্রশ্নই করেছে। সমগ্র এশিয়ার আজ এই প্রশ্নটাই একটা প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে: ভারতবর্ষের কি হবে?...কায়রো থেকে শুরু করে আমাকে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। চীনের সব থেকে বিজ্ঞ ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন: 'ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নকে যখন অস্পষ্ট ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখা হল, তখন সুদূর প্রাচ্যের জনমতের সামনে গ্রেট বৃটেনের কোনো ক্ষতি হয়নি। হয়েছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের।'"

ভারতের এই ঘটনাবলীর ফলে যুদ্ধসঙ্কটের মধ্যেও সারা বিশ্ব ভারতের দিকে অন্তত সাময়িকভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে এবং প্রাচ্যের মূল সমস্যাগুলো সম্বন্ধে চিন্তা

করতে বাধ্য করেছিল। এশিয়ার প্রত্যেকটি দেশের জনগণের হৃদয়ে এই ঘটনা একটা নতুন সাড়া এনে দিয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্রের শক্তিশালী কবলে ভারতের জনগণকে সাময়িকভাবে নিতান্ত অসহায় বলে মনে হলেও এটা স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল যে ভারতবর্ষের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত ভারতে বা এশিয়ায় শান্তির কোনো সম্ভাবনা নেই।

৫ : ভারতের অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়া

কোনো একটা সভ্য সমাজের উপর প্রভুত্ব কায়েম রাখতে বিদেশী শক্তিকে স্বভাবতই কতকগুলি অসুবিধা বরণ করে নিতে হয়; এবং তার ফলে বহু অমঙ্গল ঘটে। প্রথমত প্রভুত্ব কায়েম রাখার জন্য বিদেশী শক্তি পদানত দেশের জনগণের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট অংশের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। কারণ, জনগণের মধ্যে যারা আদর্শবাদী, সংবেদনশীল, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, স্বাধীনতাকামী এবং বিদেশী প্রভুত্বের কাছে নতি স্বীকারের হীনতা বরণ করতে যারা অসম্মত, স্বভাবতই তারা এই বিদেশী শাসন থেকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের আলাদা করে রাখে অথবা ঐ প্রভুত্বের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধে। যে কোনো স্বাধীন দেশের তুলনায়, পরাধীন দেশেই সাধারণত স্বার্থান্বেষী ও সুবিধাবাদীর দল সংখ্যায় বেশি হয়। অন্যদিকে, যে সব স্বাধীন দেশে স্বেচ্ছাচারী শাসন প্রতিষ্ঠিত সেখানেও এমন অনেক সংবেদনশীল ব্যক্তি থাকে যারা কিছুতেই সরকারী কর্তৃত্বের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে পারে না, এই সব দেশেও নতুন নতুন প্রতিভার বিকাশ পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়। বিদেশী শাসক স্বেচ্ছাচারী হতে বাধ্য, কাজেই এসব অসুবিধাগুলো তার মধ্যে নিহিত, উপরন্তু, সব সময় বিরোধ ও দমনের ভিতর দিয়েই সে কার্যকরী হয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে শাসক ও শাসিত—দুই তরফেরই কার্যকলাপের মূল উৎস ভীতি—এবং ফলে স্বভাবতই পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগই হয়ে ওঠে শাসনযন্ত্রের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ।

সরকারের সঙ্গে জনগণের অনিবার্য সংঘর্ষ যখন ফেটে পড়ে, তখন জাতির নিকৃষ্টতম অংশের উপর এই বিদেশী প্রভুর নির্ভরশীলতা আরও বেশি বৃদ্ধি পায়। অবশ্য ভাল লাগুক বা নাই লাগুক, অনেক বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন লোকও পারিপার্শ্বিক বা ঘটনার চাপে সরকারী শাসনযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকতে বাধ্য হয়। কিন্তু শাসনযন্ত্রের শীর্ষস্থানে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত হয় তাদেরই উপর যারা জাতীয়তার তীব্র বিরোধী, বিদেশী প্রভুত্বের তাঁবেদারী করতে যারা লালায়িত এবং দেশবাসীকে অবমানিত, লাঞ্ছিত করার ক্ষমতা যাদের অসীম। বিদেশী প্রভুর কাছে এদের সবচেয়ে বড় গুণ: এরা দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার একান্ত বিরোধী—যদিচ অনেক ক্ষেত্রেই এই বিরোধিতার মূলে আছে ব্যক্তিগত ঈর্ষাবিদ্বেষ, হতাশা ও ব্যর্থতা। এই ধরনের অস্বাস্থ্যকর, কলুষিত ও ঘৃণ্য আবহাওয়ায় মহান আদর্শ বা উচ্চ চিন্তার স্থান নেই—এখানে মোটা বেতন ও উচ্চ পদই জীবনের পুরস্কারস্বরূপ।

সরকারের বিরোধীদের দমনে সাহায্যের পরিমাণই যেখানে সব কিছুর মাপকাঠি, সেখানে স্বভাবত সরকারের বিশ্বস্ত সমর্থকদের সব দোষ ত্রুটি বা অপদার্থতা মেনে নিতেই হয়। ফলে অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যক্তি ও দলের সঙ্গেই সরকারের যোগাযোগ হয় ঘনিষ্ঠ, দুর্নীতি ও হৃদয়হীনতা, জনসাধারণের মঙ্গল ও কল্যাণের প্রতি চরম ও নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যে সমস্ত আবহাওয়া বিষাক্ত ও কলুষিত হয়ে ওঠে।*

জনসাধারণের মধ্যে বিদেশী প্রভুর কার্যকলাপে যে তীব্র ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা জমে ওঠে, তার চেয়ে অনেক বেশি হয় সেই বিদেশী প্রভুর তাঁবেদার ভারতীয় সমর্থকদের আচার ব্যবহারে—এরা যেন রাজার চেয়েও বেশি রাজানুরক্ত। সাধারণ ভারতবাসী এদের মনেপ্রাণে ঘৃণা করে এবং লোকের মনে এরা 'ভিশি'র বিশ্বাসঘাতক অথবা জার্মান ও জাপানীরা যে সমস্ত তাঁবেদার সরকার খাড়া করেছিল, তাদের সমতুল্য। শুধু যে কংগ্রেসের কর্মী বা সমর্থকরাই এদের বিরুদ্ধে এই তীব্র ঘৃণা পোষণ করত, তা নয়, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠন, এমনকি আমাদের দেশের নরমপন্থী রাজনীতিকরাও এদের সম্বন্ধে একই মনোভাব পোষণ করে।†

যুদ্ধপরিস্থিতি গভর্নমেন্টকে ভারতের বিরুদ্ধে নূতন নূতন ধরনের প্রচার এবং জাতীয়তা-বিরোধী ক্রিয়াকলাপ চালাবার যথেষ্ট সুযোগ ও অজুহাত যুগিয়ে দিল। যুদ্ধপ্রচেষ্টার সমর্থনে শ্রমিকদের উৎসাহ বৃদ্ধি করার জন্য সরকারী দানখয়রাতে

*স্যার আর্চিবল্ড রোল্যান্ডস্-এর সভাপতিত্বে গঠিত বাঙলা প্রদেশের শাসন তদন্ত কমিটির ১৯৪৫ সালের মে মাসে প্রকাশিত রিপোর্টে এই দুর্নীতি সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে : 'দুর্নীতি আজ এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছে এবং এ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য এত চরম যে সরকারী শাসনব্যবস্থা এবং জনসাধারণের নৈতিক জীবনকে উন্নত করতে হলে এই দুষ্টব্যাধিকে সমূলে উৎপাটন করার জন্য কঠোর ব্যবস্থার প্রয়োজন।' অত্যন্ত বিস্ময় ও বেদনার সঙ্গে কমিটি লক্ষ্য করেছে যে জনসাধারণের প্রতি কোনো কোনো সরকারী কর্মচারীর আচারব্যবহার মোটেই উপযুক্ত নয়। এদের সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়েছে : 'জনসাধারণ থেকে তারা যেন অনেক উ'চুতে এই রকম একটা মনোভাব সরকারী আমলাদের মধ্যে আছে। প্রাণহীন শাসনযন্ত্রের যান্ত্রিক পরিচালনাই তাদের প্রধান লক্ষ্য—জনসাধারণের মঙ্গল অমঙ্গলের কথা তারা চিন্তাও করে না। জনসাধারণের সেবক বলে নিজেদের মনে না করে, তারা ভাবে যে তারা জনসাধারণের প্রভু।'

† অপরকে নিজের ঘানি টানতে বাধ্য করায় যিনি ওস্তাদ, সেই হিটলার তার 'মাইন কামফ্' নামক গ্রন্থে লিখেছে : 'যারা নিশ্চরিত্র নতি স্বীকারের প্রতীক—তারা হঠাৎ অনুতপ্ত হয়ে বুদ্ধিবৃত্তি বা মানবিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করবে—এটা আশা করাই উচিত নয়। বরঞ্চ এরা এ সব শিক্ষাকে দূরে সরিয়ে রাখবে দেশবাসী যতদিন পর্যন্ত দাসত্বের শৃঙ্খলে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত না হয়ে ওঠে, অথবা দেশের শুভশক্তিগুলির পূর্ণ বিকাশের ফলে এই ঘৃণ্য ব্যক্তিদের কলঙ্কক্রিয়া উৎসারিত হয়। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে এদের মন্দ বোধ করার কোনো কারণ থাকে না, কারণ বিজয়ী প্রভুরা অনেক সময়েই এদের দাস-পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত করে এবং যে কোনো বিদেশী পশুর চেয়েও বেশি হৃদয়হীনভাবে এরা দেশবাসীর উপর অত্যাচার করে।'

এখানে সেখানে ব্যাঙের ছাতার মত শ্রমিক সংগঠন গজিয়ে উঠল; এবং কাগজের স্বল্পতার জন্য ভারতের অন্যান্য সংবাদপত্র যখন প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে, তখন গান্ধীজি ও কংগ্রেস সম্পর্কে জঘন্য নিন্দাবাদ চালানোর জন্য সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বহু নূতন সংবাদপত্রও প্রকাশিত হল। যুদ্ধপ্রচেষ্টার প্রসার ও সাফল্যের উদ্দেশ্যে প্রচারিত সরকারী বিজ্ঞাপনগুলিও এ ব্যাপারে কাজে লাগানো হল। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে অবিরাম বিকৃত প্রচার চালানোর জন্য দেশবিদেশে বহু প্রচারকেন্দ্র খোলা হল; এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার উপর্যুপরি প্রতিবাদ সত্ত্বেও সংগঠিত ডেপুটেসনের অছিলায় অসংখ্য জানা অজানা লোককে দেশবিদেশে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হচ্ছিল—আসলে এরা ব্রিটিশ সরকারের দাবার ঘুঁটি ও ভাড়াটে প্রচারক। অন্যদিকে কিন্তু যারা স্বাধীন মতাবলম্বী অথবা গভর্নমেন্টের নীতির সমালোচক, তাদের পক্ষে বিদেশে যাবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না—কারণ তারা না পেত পাশপোর্ট, না পেত যানবাহনের কোনো সুবিধা।

তথাকথিত 'জন শান্তি ও শৃঙ্খলার' নামে ভারত গভর্নমেন্ট গত দুবছরে এই ধরনের অনেক অপকৌশল ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছে। অবশ্য একথা ঠিক যে অল্পবিস্তর সামরিক কর্তৃত্ব ও শাসনের গুরুভার যে দেশের বুকের উপর চেপে রয়েছে, সেদেশের রাজনৈতিক বা জাতীয় আন্দোলন খানিকটা ব্যাহত হবেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও ঠিক যে অসুখ বা পীড়ার লক্ষণগুলোকে যদি জোর করে চেপে দেবার চেষ্টা হয়, তাহলে সেই অসুখ বা পীড়াই বহুগুণ বেশি বৃদ্ধি পায় এবং সমস্ত দিক থেকে ভারতবর্ষ ছিল তখন চরমভাবে পীড়িত। এমনকি আজীবন যাঁরা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে এসেছেন—ভারতের সেই খ্যাতনামা রক্ষণশীলেরা পর্যন্ত মুখচাপা আগ্নেয়গিরির মত ভারতবাসীর এই বিক্ষুব্ধতায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন—তাঁরাও বলেছেন যে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এত বেশি ঘৃণা ও বিক্ষোভ তাঁরা এর আগে কোনোদিন দেখেননি।

এই দুবছরে আমার দেশের জনসাধারণের চিন্তাধারা কোন পথে গতি নিয়েছে তা আমি জানি না; তাদের সংস্পর্শে না আসা পর্যন্ত আমি বলতে পারব না যে কোন অনুভূতি, কোন বেদনা আজ তাদের চিত্তে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। কিন্তু একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। গত দুবছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই নানাভাবে তাদের মধ্যে পরিবর্তন এনে দিয়েছে। এর মধ্যে নিজের মনকেও আমি বারবার বিশ্লেষণ করেছি এবং ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত আমার মনে কি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তাও বোঝবার চেষ্টা করেছি। অতীতে ইংলন্ডে যাওয়া সম্বন্ধে আমার একটা আগ্রহ ছিল, কারণ সেখানে আমার অনেক পুরাতন স্মৃতির আকর্ষণ ছিল; কিন্তু এখন আমি অনুভব করছি যে আমার মনে ইংলন্ডে যাওয়ার কোনো ইচ্ছাই নেই, যাওয়ার চিন্তাটাই বিতৃষ্ণা জাগায়। এখন আমি যতটা সম্ভব ইংলন্ড থেকে দূরে থাকতে চাই; এমনকি কোনো ইংরেজের সঙ্গে ভারতের সমস্যা আলোচনা করতে পর্যন্ত আমি চাই না। কিন্তু ইংলন্ডে আমার যে সমস্ত বন্ধুবান্ধব আছে, তাদের কথা মনে পড়লে মনটা

আবার কোমল হয়ে আসে, আর মনে হয় একটা সমগ্র জাতিকে এইভাবে বিচার করা হয়তো অন্যায়। মনে পড়ে এই যুদ্ধে কি ভয়ংকর অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে ইংরেজ জাতি, কি গুরুভার বহন করেছে দিনের পর দিন, কত প্রিয়জনকে হারিয়েছে প্রত্যেকে। এ সব কথা ভাবলে আমার মন খানিকটা নরম হয়, কিন্তু মূল প্রতিক্রিয়ার বিতৃষ্ণা মনে রয়েই যায়। হয়তো গতিশীল সময় ও ভবিষ্যৎ আস্তে আস্তে আমার এই মনোভাবকে বদলে দেবে এবং আমার মধ্যে এনে দেবে আর এক দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু ইংলন্ড ও ইংরেজদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে এত বেশি পরিচয় ও সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও আমার মনের প্রতিক্রিয়াই যদি এই হয়, তাহলে যাদের সঙ্গে ইতিপূর্বে কোনো রকম যোগাযোগ ঘটেনি—তাদের মনে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে?

৬ : পীড়িত ভারত : দুর্ভিক্ষ

দেহে মনে ভারত পীড়িত হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধের মধ্যে ভারতের কিছু কিছু লোক বিত্ত ও ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠলেও বেশির ভাগ জনগণের উপর যুদ্ধের গুরু-ভার দুর্বহ হয়ে উঠেছিল; এবং এই অবস্থার ভয়ংকর লক্ষণ হিসাবে বাঙলা ও ভারতের দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলকে গ্রাস করল এক প্রচন্ড দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা। ব্রিটিশ কর্তৃত্বের ১৭০ বছরের ইতিহাসে এই ধরনের ব্যাপক ও সর্বনাশা দুর্ভিক্ষ আর কখনও দেখা দেয়নি। ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে গোড়ার দিকে বাঙলা ও বিহারে ১৭৬৬ থেকে ১৭৭০ পর্যন্ত যে দুর্ভিক্ষ ঘটেছিল, একমাত্র তারই সঙ্গে বর্তমান দুর্ভিক্ষের তুলনা করা চলে। দুর্ভিক্ষের পিছু পিছু এল মহামারী—কলেরা আর ম্যালেরিয়া—আশে পাশের প্রদেশে ও এলাকাতেও তা ছড়িয়ে পড়ল। এবং আজও এই সব রোগের কবলে হাজার হাজার নরনারীকে প্রাণ দিতে হচ্ছে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েছে কিন্তু আজও ভারতের উপর থেকে সে বিভীষিকা অপসারিত হয়নি।*

* ১৯৪৩-৪৪ সালের বাঙলার দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ (ডিপার্টমেন্ট অব এন্থ্রপলজি) বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এ সম্বন্ধে দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত অঞ্চলে ব্যাপক তদন্ত ও অনুসন্ধান করেছিল। তাদের তদন্ত অনুযায়ী বাঙলার দুর্ভিক্ষে মৃত নরনারীর সংখ্যা প্রায় ৩৪,০০,০০০। তাদের এই তদন্তে আরও প্রকাশ যে, ১৯৪৩-৪৪ সালে বাঙলা প্রদেশের শতকরা ৪৬ জন মহামারীতে আক্রান্ত হয়েছিল। গ্রাম্য মাতব্বর ও চৌকিদারের মারফত সংগৃহীত অবিশ্বাস্য তথ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত সরকারী হিসাব মতে অবশ্য এই সংখ্যা অনেক কম। স্যর জন উডহেডের নেতৃত্বে গঠিত সরকারী দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'দুর্ভিক্ষ ও পরবর্তী মহামারীর ফলে প্রত্যক্ষভাবে মৃতের' সংখ্যা শুধুমাত্র বাঙলা প্রদেশেই প্রায় ১৫,০০,০০০। এই সব তথ্য ও সংখ্যা শুধু বাঙলা প্রদেশকে কেন্দ্র করেই সংগৃহীত। যদিচ বাঙলা ছাড়াও অন্যান্য প্রদেশ এবং এলাকাও দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে ভুক্তভোগী।

নগণ্য কিছু লোকের সুখ ঐশ্বর্যের চাকচিক্যের নিচে ভারতের যে চিত্র এই দুর্ভিক্ষ উন্মুক্ত করে দিল—তা দুঃখদারিদ্র্যক্লিষ্ট ভারতবাসীর পুরুষানুক্রম ব্রিটিশ শাসনের পরবর্তী কুৎসিত দারিদ্র্য—মানুষের চরম অবনতির এক চিত্র। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ও পূর্ণতালাভের নিদর্শন এই দুর্ভিক্ষ। প্রাকৃত শক্তির খামখেয়াল বা প্রাকৃতিক কোনো বিপর্যয় এই দুর্ভিক্ষের কারণ নয়; যুদ্ধ-বিগ্রহ বা শত্রুঅবরোধের জন্যও এই দুর্ভিক্ষ ঘটেনি। এ সম্বন্ধে প্রত্যেকটি বিশেষজ্ঞের অভিমত এই যে এই দুর্ভিক্ষ মনুষ্যসৃষ্ট—আগে থেকেই এর সম্ভাবনার লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং চেষ্টা করলে একে প্রতিরোধ করা যেত। এ সম্পর্কে সমগ্র কর্তৃপক্ষ যে চরম ঔদাসীন্য, অপদার্থতা ও আত্মসন্তুষ্টির ভাব দেখিয়েছিল—সে বিষয়ে সকলেই একমত। অনাহারক্লিষ্ট হাজার হাজার ভারতবাসীর মৃতদেহে প্রকাশ্য রাজপথ পর্যন্ত যখন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, তখন পর্যন্তও দুর্ভিক্ষের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হত এবং কড়া সেন্সর দ্বারা সংবাদপত্রে এর কোনো উল্লেখও বন্ধ রাখা হত। কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় অনাহারী ও মুমূর্ষু নারী শিশুর ভয়ঙ্কর ছবিগুলি স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় আইন সভায় ভারত সরকারের জনৈক মুখপাত্র সরকারীভাবে এই 'অতিনাটকীয়তা'র প্রতি-বাদ করেন। বুভুক্ষা ও অনাহারে হাজার হাজার ভারতবাসী প্রত্যহ মারা যাবে—এটা তাঁর কাছে সম্ভবত একটা স্বাভাবিক ঘটনাই ছিল। এ ব্যাপারে অবশ্য সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেন লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিসের মিস্টার আমেরী—দুর্ভিক্ষের অস্তিত্বই সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এবং লম্বা লম্বা বিবৃতি দিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপক দুর্ভিক্ষের অস্তিত্ব যখন অস্বীকার করা অসম্ভব হয়ে উঠল, তখন কর্তৃপক্ষের এক বিভাগ অন্য বিভাগের উপর দোষারোপ করতে শুরু করল। ভারত সরকার নিজের দোষ ও দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে গভর্ণর ও আমলাতন্ত্র শাসিত প্রাদেশিক সরকারের উপরই সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিল। দোষ বা দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের সকলেরই ছিল, কিন্তু এর জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী করা উচিত সেই স্বেচ্ছাচারী গভর্নমেন্টকে—ভাইসরয় যার প্রতীকস্বরূপ। অন্য যে কোনো গণতান্ত্রিক বা আধা-গণতান্ত্রিক দেশে এই নিদারুণ বিপর্যয় ঘটলে এজন্য দায়ী যে কোনো গভর্ণমেন্টই বিলুপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু ভারতবর্ষের কথা আলাদা। এখানে সব কিছুই যথাপূর্ব চলতে লাগল।

যুদ্ধপরিস্থিতির দিক দিয়ে বিচার করলেও দেখা যায়, যে এলাকা সম্ভাব্য বহিরাক্রমণ ও বাস্তব যুদ্ধক্ষেত্রের সবচেয়ে কাছাকাছি, সেখানেই এই ভয়ানক দুর্ভিক্ষ আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই অঞ্চলে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ এবং তার স্বাভাবিক পরিণতি অর্থনৈতিক জীবনের বিশৃঙ্খলা অনিবার্যভাবে দেশরক্ষায় শত্রু-প্রতিরোধ শক্তিই ক্ষীণ করে দিত—শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণের শক্তি তো আরও বেশি। জাপানী আক্রমণের প্রতিরোধে যুদ্ধ এবং দেশরক্ষার দায়িত্ব ভারতসরকার এই ভাবেই পালন করেছিল। শত্রুর আসন্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে 'পোড়ামাটি' নয়, বুভুক্ষা ও দারিদ্র্যে

নিষ্পেষিত লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃতদেহের স্তূপ—এই ছিল ভারত সরকারের অনুসৃত নীতির স্বরূপ।

এই সময়ে ভারতব্যাপী বহু বেসরকারী সংগঠন এবং মানবতা ধর্মে দীক্ষিত ইংলন্ডের 'কোয়েকার'রা দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবায় যথেষ্ট কাজ করেছিল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারও শেষ পর্যন্ত সঙ্কটের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিল এবং দুর্ভিক্ষে সাহায্যদানের কাজে সামরিক বাহিনীকেও নিয়োগ করা হয়েছিল। দুর্ভিক্ষ যাতে অন্যান্য প্রদেশে ছড়িয়ে না পড়ে এবং তার ফলাফল যাতে ততটা তীব্র আকার ধারণ না করে সেজন্যও কিছু প্রচেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু এ সাহায্যদান ছিল সাময়িক, কাজেই দুর্ভিক্ষের ফলাফল দেশকে আজও ভোগ করতে হচ্ছে এবং এর চেয়েও ভয়ঙ্কর একটা দুর্ভিক্ষ যে কোনো সময়ে দেখা দিতে পারে। এই দুর্ভিক্ষ বাঙলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে এবং দুর্ভিক্ষে উত্তীর্ণ গোটা বাঙালী জাতিকে রেখে গেল দুর্বল ও ক্ষীণজীবী।

এমনই যখন অবস্থা, কলিকাতার রাজপথ যখন মানুষের মৃতদেহে আকীর্ণ, তখনও কিন্তু কলিকাতার উচ্চ সমাজের লোকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে কোনো পরিবর্তনই ঘটেনি। বিলাসিতার প্রাচুর্যে, নৃত্যগীতে, আহারে ব্যসনে তাদের জীবন ছিল পরিপূর্ণ। এ সময়ে এবং এর বহুদিন পরে পর্যন্ত খাদ্যসামগ্রীর রেশনিং বলে কিছু ছিল না। এ সময়েও যথারীতি সাপ্তাহিক ঘোড়দৌড় অনুষ্ঠিত হত এবং ফ্যাশানেব্‌ল্‌ লোকের ভিড়ে ঘোড়দৌড়ের মাঠ ভর্তি হয়ে যেত। খাদ্যদ্রব্যের জন্য যানবাহনের অভাব থাকা সত্ত্বেও ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া চলাচলের জন্য বিশেষ ধরনের ওয়াগনের অভাব হত না। ইংরাজ ও ভারতীয় উভয়েই কলিকাতার এই অবিশ্বাস্য প্রমোদ জীবনের অংশ গ্রহণ করত, কারণ যুদ্ধে মুনাফা লাভ করে উভয় পক্ষের অবস্থা তখন স্বচ্ছল—টাকার তখন ছড়াছড়ি। অনেক ক্ষেত্রে এ মুনাফালাভ হয়েছিল—যে খাদ্যের অভাবে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিদিন প্রাণত্যাগ করছিল—সেই খাদ্য থেকেই।

অনেক সময় বলা হয় যে ভারতবর্ষ বৈপরীত্য ও বৈষম্যে পরিপূর্ণ—এখানে মুষ্টিমেয় ক্রোড়পতির পাশে আছে দারিদ্র্যলাঞ্ছিত অসংখ্য জনতা, উগ্র আধুনিকতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মধ্যযুগীয় সংস্কার, এখানে আছে শাসক এবং শাসিত, ব্রিটিশ এবং ভারতীয়। কিন্তু ১৯৪৩ সালের শেষের দিকে দুর্ভিক্ষের ভয়ঙ্কর কয়েকটা মাসে কলিকাতা শহরে এই বৈষম্য ও বৈপরীত্য যতটা চরমভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, ইতিপূর্বে তা কখনও দেখা যায়নি। তার কারণ এই দুই বিপরীত জীবনের মানুষ সাধারণত যারা আলাদা জগতে বাস করে—পরস্পর সম্বন্ধে যারা সম্পূর্ণ অচেতন—হঠাৎ তারা পরস্পরের সান্নিধ্যে এসে পাশাপাশি অবস্থান করতে বাধ্য হল। এর বৈপরীত্য চমকপ্রদ, কিন্তু আরো বেশি চমকপ্রদ এই যে, বেশির ভাগ লোকই এর বিসদৃশতা ও অদ্ভুত অসামঞ্জস্য উপলব্ধি না করে তাদের চিরাচরিত জীবন নির্বিঘ্নে যাপন করতে লাগল। এই সঙ্কট তাদের মধ্যে কি মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, তা বলা যায় না, তাদের আচার ব্যবহার দিয়েই শুধু তাদের বিচার করা

যায়। ইংরাজদের কথা আলাদা, কারণ দূরে সরে থেকে নিজ শ্রেণীর গণ্ডিতে আবদ্ধ জীবনযাপন করতে তারা চিরদিনই অভ্যস্ত। তাদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে কারও মনে ভাববৈলক্ষণ্য হলেও, বাঁধাধরা রুটিনমাফিক জীবনের কোনো নড়চড় করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু যে সব ভারতীয়েরা এই প্রমোদে মত্ত ছিল, নিজের দেশ-বাসীর সঙ্গে তাদের কতখানি ব্যবধান তারই পরিচয় দিয়েছিল তারা—সে ব্যবধান এমনই যা তারা সাধারণ ভদ্রতা বা মনুষ্যত্বের খাতিরেও লঙ্ঘন করতে পারেনি।

জাতির প্রত্যেকটি গভীর সংকটের মত এই দুর্ভিক্ষও ভারতবাসীর দোষগুণকে প্রকট করে তুলেছিল। দায়িত্বশীল ও নেতৃস্থানীয় হাজার হাজার ভারতবাসী তখন জেলের ভিতর বন্দীদশায় অসহায়ভাবে দিন কাটাচ্ছে, কোনো সাহায্যই তারা করতে পারেনি। কিন্তু বেসরকারী সাহায্য-সংগঠনগুলির কাজে বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায় থেকে হাজার হাজার নরনারী সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসেছিল। অসম্ভব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাদের কঠোর পরিশ্রম, কার্যক্ষমতা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও চূড়ান্ত আত্মত্যাগ—সত্যিই প্রশংসনীয়। ভারতীয়দের দোষগুলি প্রকাশ হল তাদের ভিতর দিয়ে—সংকীর্ণ স্বার্থের দলাদলি ও ব্যক্তিগত ঈর্ষাবিদ্বেষে প্রণোদিত যাদের দ্বারা কোনো সহযোগিতা অসম্ভব, যারা এই সংকটের মধ্যেও সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ছিল, এবং সেই মুষ্টিমেয় ব্যক্তি যাদের মধ্যে জাতিত্ব ও মনুষ্যত্ববোধ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হওয়ার ফলে যারা এই সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে একেবারে উদাসীন ছিল।

যুদ্ধপরিস্থিতি এবং কর্তৃপক্ষের দূরদৃষ্টির অভাব ও চরম ঔদাসীন্যের প্রত্যক্ষ ফল—এই দুর্ভিক্ষ। বিন্দুমাত্র বিচারবুদ্ধিও যাঁদের ছিল, এবং এ সম্পর্কে যাঁরা সামান্য চিন্তাও করেছিলেন, তাঁরাই জানতেন যে এই ধরনের একটা ভয়ংকর সংকট এগিয়ে আসছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও শেষমুহূর্ত পর্যন্ত দেশের খাদ্যাবস্থা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের চরম উদাসীনতা আমাদের বিচার বিবেচনার বাইরে। যুদ্ধের প্রথম দিকের কয়েকবছরে যদি দেশের খাদ্যপরিস্থিতি সম্পর্কে বিশেষ নজর দেওয়া হত, তাহলে এটা ঠিক যে দুর্ভিক্ষসংকট প্রতিরোধ করা সম্ভব হত। যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক দেশেই গোড়া থেকেই খাদ্যপরিস্থিতিকে যুদ্ধকালীন অর্থনীতির মধ্যে একটি বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ইউরোপে যুদ্ধ বাধার সোয়া তিন বছর পরে এবং জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধার পুরো এক বছর পরে, এ সম্বন্ধে ভারত সরকারের প্রথম টনক নড়ে, এবং সরকারী খাদ্যদপ্তর খোলা হয়। তাছাড়া বর্মা জাপানীদের হস্তগত হওয়াতে বাঙলার খাদ্যসরবরাহ বিপন্ন হয়েছিল একথা সকলেই জানত। কিন্তু ১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি, অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের প্রারম্ভ পর্যন্ত, খাদ্য সম্পর্কে ভারত গভর্নমেন্টের কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিই ছিল না। বিরুদ্ধবাদীদের দমনের ব্যাপার ব্যতিরেকে জনসাধারণের জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়ে গভর্নমেন্টের চূড়ান্ত দায়িত্বহীনতা ও অক্ষমতা সত্যিই বিস্ময়কর। অথবা এটাই ঠিক যে শিথিল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তার কর্তৃত্ব ও অস্তিত্ব বজায় রাখতেই এই সরকারকে এত বেশি ব্যস্ত থাকতে হয় যে, অন্য কোনো দিকে নজর দেবার ফুরসৎ

তার থাকে না। আবার গভর্নমেন্টের কার্যক্ষমতা ও সদিচ্ছা সম্পর্কে জনসাধারণের চিরন্তন অনাস্থা যে কোনো সংকট উপস্থিত হলে সে সংকটকে তীব্রতর করে তোলে।*

যদিচ এটা ঠিক যে যুদ্ধপরিস্থিতির জন্যই এই দুর্ভিক্ষ সৃষ্ট হয়েছিল, এবং প্রথমেই সতর্ক হলে এ দুর্ভিক্ষ রোধ করা যেত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও ঠিক যে এই দুর্ভিক্ষের গভীরতম কারণ গভর্নমেন্টের সেই মূলনীতি, যে নীতি ভারতবর্ষকে ক্রমশই দরিদ্র করে তুলেছিল, যার ফলে কোটি কোটি ভারতবাসীকে অনাহারে ও অর্ধাহারের প্রান্তরেখায় বাস করতে হয়। ভারতের জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে ইন্ডিয়ান

* কর্তৃপক্ষের দিক থেকে অসংখ্য শোচনীয় ত্রুটিবিচ্যুতি এবং মুনাফাখোরদের অদম্য ব্যক্তিগত লোভ—এরই ফলে যে বাঙলায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, সরকারী দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে (১৯৪৫ সালের মে মাসে প্রকাশিত) তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। রিপোর্ট বলছে : 'বাঙলার দুর্ভিক্ষের কারণ ও গতিধারা তদন্ত করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। একটা বিয়োগান্ত নাট্যের প্রতিচ্ছবি সর্বদা আমাদের মনকে পীড়িত করেছে। যে পরিস্থিতির জন্য তারা আদৌ দায়ী নয়, সেই পরিস্থিতি বাঙলার পনেরো লক্ষ দরিদ্র ব্যক্তিকে গ্রাস করেছে। শাখা-প্রশাখাসহ সমাজ তার দুর্বল অংশকে রক্ষা করতে পারেনি। শুধু যে শাসনযন্ত্রই ভেঙে পড়েছিল তা নয়, বাঙলায় তখন সমস্ত সামাজিক ও নৈতিক শক্তিও ভেঙে পড়েছিল।' রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে প্রদেশে অর্থ-নৈতিক অবস্থার নিম্ন হার; জমির উপর অতিরিক্ত চাপ এবং সে চাপ অপনোদনের উপযোগী শিল্পের দ্রুত প্রসারের অভাব; উপরন্তু জনসাধারণের একটা গোটা অংশ কোনোক্রমে মাত্র জীবনধারণ করতে সক্ষম হত—কোনো অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়ার মত শক্তিই তাদের ছিল না; স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থার অভাব, পুষ্টির অভাব এবং কি স্বাস্থ্য, কি অর্থ, দুই ব্যাপারেই নিরাপত্তা রক্ষা করার মত এতটুকুও সঞ্চয় জনসাধারণের ছিল না। অবশ্য, রিপোর্টে এই দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ কারণগুলিও দেখানো হয়েছে, যথা—সেই মরশুমে ফসলের ঘাটতি; বর্মার পতন ও ফলে বর্মার চালের আমদানী বন্ধ হওয়া; গভর্নমেন্টের 'অস্বীকার' নীতি যার ফলে এক শ্রেণীর দরিদ্র জনসাধারণের সর্বনাশ ঘটে; খাদ্য ও যানবাহনের উপর সামরিক প্রয়োজনের চাপ; এবং গভর্নমেন্টের উপর জনসাধারণের অনাস্থা। এই রিপোর্টে—গভর্নমেন্টের নীতি অথবা কোনো ক্ষেত্রে নীতির অভাব, অথবা প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট উভয় পক্ষের নীতির অসংখ্য পরিবর্তন; গভর্নমেন্টের দূরদর্শিতার অভাব ও আসন্নপ্রায় ঘটনাবলীর জন্য প্রস্তুতির অভাব; গভর্নমেন্টের তরফ থেকে দুর্ভিক্ষের উপস্থিতি অস্বীকার এবং অবস্থার সম্পূর্ণ অনুপযোগী ব্যবস্থা—এ সবই নিতান্ত গর্হিত বিবেচিত হয়েছে। এর পর রিপোর্টে আছে : 'সমস্ত পরিস্থিতি বিচার করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছি যে সময় থাকতে উপযোগী ব্যবস্থা দ্বারা বাঙলা সরকার দুর্ভিক্ষের এই আকার ধারণ নিবারণ করতে পারত।' রিপোর্ট আরও বলেছে যে, 'খাদ্য চলাচল সম্বন্ধে পরিকল্পিত নীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট সময় থাকতে উপলব্ধিই করেনি।' '১৯৪৩ সালে কনট্রোল তুলে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট ও বাঙলা গভর্নমেন্ট সমানভাবেই দায়ী। এর পর, ভারতব্যাপী কনট্রোল-বিহীন ব্যবসা-বাণিজ্যের নীতি প্রবর্তনের জন্য কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব উত্থাপিত

মেডিক্যাল সার্ভিসের ডিরেক্টর জেনারেল স্যার জন ম্যাগঅ ১৯৩৩ সালে একটি রিপোর্টে লিখেছিলেন: 'সমগ্রভাবে ভারতবর্ষের কথা বিবেচনা করলে ডাক্তারদের অভিমত এই যে ভারতের জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৩৯ জন মোটামুটি ভালভাবে পুষ্ট, ৪১ জন স্বল্পপুষ্ট এবং ২০ জন নিতান্তই মন্দপুষ্ট। ডাক্তারদের মতে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে আবার বাঙলার ছবিই অত্যন্ত শোচনীয়। এই প্রদেশের শতকরা মাত্র ২২ জন ভালভাবে পুষ্ট এবং ৩১ জন নিতান্ত মন্দপুষ্ট।'

বাঙলার এই বিপর্যয় এবং উড়িষ্যা, মালাবার ও অন্যান্য অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চূড়ান্ত নিদর্শন। একদিন ব্রিটিশ ভারত ছাড়তে বাধ্য হবে এবং তাদের এই ভারত সাম্রাজ্যও একদিন শুধু একটা পুরাতন স্মৃতিতে পর্যবসিত হবে, কিন্তু যখন যাবে তারা পিছনে কি রেখে যাবে, মনুষ্যত্বের চরম অবনতি আর দুঃখ-দুর্দশার সঞ্চয়? তিন বছর আগে মৃত্যুশয্যা থেকে রবীন্দ্রনাথও ভারতের এই ছবিতে শিউরে উঠেছিলেন: 'কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে!'

৭ : ভারতের দুর্বার জীবনীশক্তি

দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধ, বাধা এবং বিপর্যয় সত্ত্বেও জীবনধারার প্রবাহ থাকে অপ্রতিহত। অন্তর্দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ এই ধারা: এবং এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বাধাবিপত্তি থেকেই সে তার প্রাণশক্তি ও বেগ আহরণ করে। প্রকৃতি নবরূপে পুনরুন্মেষিত হয়, গতদিনের যুদ্ধক্ষেত্র সে ফুলে ফলে ও সবুজ ঘাসে ভরিয়ে দেয়। মানুষের যে রক্ত-পাতে মাটি কলঙ্কিত হয়েছিল, সেই রক্তই প্রাণরসে মাটিকে সিঞ্চিত করে, আর রঙে রসে রূপে সঞ্জীবিত হয় বর্ণোজ্জ্বল নবীন জীবন। মানুষের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য

হয় তা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন এবং এ প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়াই ছিল অনুচিত। অনেকগুলি প্রদেশ এবং কয়েকটি দেশীয় রাজ্য এ প্রস্তাব কার্যে পরিণত হওয়ায় বাধা দিতে সফল হয়েছিল...নচেৎ এর ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সর্বনাশ সংঘটিত হওয়া সম্ভব ছিল।' কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক শাসনযন্ত্রের উদাসীনতা ও অকর্মণ্যতার নিন্দা করার পর রিপোর্ট এও বলেছে যে 'বাঙলার জনসাধারণ, অন্ততপক্ষে তাদের কয়েকটি বিশেষ অংশ এ দুর্ভিক্ষের জন্য কতকাংশে দায়ী। আমরা সে সময়কার লোভ ও ভীতির আবহাওয়ার ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, কনট্রোলের অভাবে এই আবহাওয়ায় দ্রুত মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য। এই দুর্ঘটনা থেকে অনেকে প্রচুর মুনাফা লাভ করেছে, এবং এ অবস্থায় এক দলের মুনাফার মানে অপর এক দলের মৃত্যু। সমাজের এক অংশ যখন অনাহারে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছিল তখন অপর এক গরিষ্ঠ অংশ প্রাচুর্যের মধ্যে জীবনযাপন করছিল এবং তাদের উদাসীনতার সীমা ছিল না। সমস্ত প্রদেশ নৈতিক অবনতির চূড়ান্তে পৌঁছেছিল।' এই অনাহার ও মৃত্যুর ব্যবসা থেকে ১৫০ কোটি টাকা মুনাফা হয়েছে এরূপ অনুমিত হয়। অর্থাৎ এই দুর্ভিক্ষে যদি ১৫ লক্ষ লোক মারা গিয়ে থাকে তাহলে অতিরিক্ত মুনাফার হার জন পিছু এক হাজার টাকা!

স্মৃতিশক্তি, তাই মানুষের অতীত স্মৃতির পরতে পরতে তার জীবন থাকে আবদ্ধ, প্রতি মুহূর্তে নূতন রূপে রূপায়িত হয়ে উঠছে যে পৃথিবী, তার গতির সঙ্গে তাল রাখতে কদাচিৎ সে পারে। জানবার, বোঝবার আগেই ক্ষিপ্রচঞ্চল বর্তমান অতীতে পরিণত হয়। গতকালের শিশুসন্তান যে 'আজ', নিজ সন্তান আগামী কালকে তার স্থান ছেড়ে দিতে হয়। বিজয়ের রঙীন উচ্চাশার পরিসমাপ্তি হয় রক্ত, পঙ্ক ও ক্লেদের মধ্যে; আবার পরাজয়ের বিভীষিকাই সঞ্চারিত করে নূতন শক্তি, ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গী, নূতন উদ্দীপনা। ঘাতপ্রতিঘাতে, যারা দুর্বলচিত্ত তারা টেকে না, বাদ পড়ে যায়, কিন্তু অন্যেরা জীবনবহ্নি বহন করে নিয়ে যায়, তুলে দেয় আগামী কালের পতাকাধারীদের হাতে।

অত্যুগ্র সমস্যা, এবং ভারতের উপর উদ্যত বিপর্যয় ও ধ্বংসের সম্ভাবনা সম্বন্ধে কিছুটা চেতনা জাগিয়েছিল এই দুর্ভিক্ষ। এ সম্বন্ধে ইংলন্ডের জনসাধারণের মনে কি অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল, তা আমি জানি না; কিন্তু জাতিগত রীতি অনুযায়ী তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভারত ও তার জনগণকেই এজন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিল। অভাব ছিল খাদ্যের, চিকিৎসকের, জনস্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থার, চিকিৎসা সামগ্রীর, যান-বাহনের—সব কিছুরই অভাব ভারতে, শুধু মনুষ্য-সংখ্যারই কোনো অভাব নেই। বেহিসাবী জাতির অতিরিক্ত জনসংখ্যা, বিনা নোটিশে হঠাৎ বৃদ্ধিলাভ করেই তো পরম সদাশয় গভর্নমেন্টের সমস্ত পরিকল্পনা অথবা পরিকল্পনার অভাবের ভিতর বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে, কাজেই সব কিছুর জন্য তারাই দায়ী। অতএব, এতকাল যা অনাদৃত হয়েছিল, সেই অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানকেই এখন গভর্নমেন্ট সর্বাগ্রগণ্য বলে স্বীকার করলেন, এবং আমাদের বলা হল যে আপাতত রাজনীতি বা রাজনৈতিক সমস্যার প্রশ্ন কিছুদিন মুলতবী রাখতে হবে, অর্থাৎ যেন দেশের বৃহত্তম ও গভীরতম সমস্যার সমাধান করতে না পারলে রাজনীতির কোনো অর্থ থাকতে পারে না। পৃথিবীতে কয়েকটি মাত্র অবশিষ্ট 'যা চলছে চলুক'-এর ঐতিহ্যবহনকারী ভারত সরকার এখন বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা বলতে শুরু করল, কিন্তু আসলে সংগঠিত পরিকল্পনা সম্বন্ধে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। শাসনের উপস্থিত কাঠামো এবং নিজের কায়েমী স্বার্থের অস্তিত্ব বজায় রাখার বাইরে তারা কোনো কিছু চিন্তা করতেই ছিল অক্ষম।

ভারতের জনগণের মনে কিন্তু এই বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল অনেক বেশি গভীর ও তীব্র, যদিচ ভারতরক্ষা আইন ও তার বাধানিষেধের নাগপাশের মধ্যে তার বহিঃপ্রকাশ অনেকাংশে অবরুদ্ধ ছিল। বাঙলা দেশের অর্থনৈতিক জীবন একেবারে ধ্বসে পড়েছিল। এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তবিকই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বাঙলা দেশ চরম উদাহরণ স্বরূপ, কিন্তু সমগ্র ভারতের ঘটনাবলী থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে পুরানো দিনের অর্থনৈতিক জীবনকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। এমনকি যুদ্ধের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি সুবিধা পেয়েছিল, সেই শিল্পপতিরা পর্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল এবং তাদের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে

বাধ্য হয়েছিল। নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে তারা ছিল সত্যিকারের বাস্তববাদী যদিচ তারা কোনো কোনো রাজনীতিকের আদর্শবাদ সম্বন্ধে সশঙ্কিত ছিল, কিন্তু তাদের এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ তাদের পক্ষে অনেক বেশি সহজসাধ্য ছিল। বোম্বাইয়ের কয়েকজন শিল্পপতি—যাদের মধ্যে বেশির ভাগই টাটা শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গে সংযুক্ত—ভারতের অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য একটি পঞ্চদশ বার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করেন। এই পরিকল্পনা এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়নি এবং তাতে অনেক ফাঁকও রয়ে গেছে। এই পরিকল্পনা স্বভাবতই শিল্পপতিদের দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই অবশ্য করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা ঠিক যে ঘটনাবলীর ক্রমবর্ধমান চাপে শিল্পপতিরা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ ছাড়াও দেশের ও জাতির বৃহত্তর সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছিল, অবশ্য রচয়িতারা পছন্দ করুক বা নাই করুক, এই পরিকল্পনার মধ্যে কিছু কিছু বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত অপরিহার্যভাবেই এসে গিয়েছিল। রচয়িতাদের মধ্যে কেউ কেউ 'জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির' সভ্য ছিলেন এবং এই সমিতির কার্যের অভিজ্ঞতার সুযোগ এঁরা কতকাংশে গ্রহণ করেছেন। এই পরিকল্পনার মধ্যে নানারকম অদলবদল, কাটছাঁট ও ব্যাপকতর গবেষণার প্রচুর প্রয়োজন যদিচ আছে, কিন্তু ভারতের সবচেয়ে রক্ষণশীল অংশের উদ্যোগে রচিত এই পরিকল্পনা ভারতের অগ্রগতি ও উন্নতির পথে একটা উল্লেখযোগ্য ও উৎসাহোদ্দীপক ঘটনা। স্বাধীন ভারত এবং তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঐক্যই এই পরিকল্পনার ভিত্তি। পুঁজি বা মূলধন সম্পর্কে ব্যাঙ্কার-সুলভ রক্ষণশীল মনোভাব এই পরিকল্পনায় নেই—জনশক্তি এবং সম্পদ সামগ্রীই যে দেশের আসল মূলধন, সেটাই বরাবর স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এটি বা যে কোনো একটি পরিকল্পনার সাফল্য তা শুধুমাত্র জাতীয় সম্পদ উৎপাদনের উপরই নির্ভর করে না; উৎপন্ন সম্পদের যথাযথ বণ্টনব্যবস্থার উপরও এই সাফল্য নির্ভরশীল। তাছাড়া, কৃষিসংস্কারও এর প্রয়োজনীয় ভিত্তিবিশেষ।

পরিকল্পনা এবং সুপরিকল্পিত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার আদর্শ কম বেশি পরিমাণে আজ পৃথিবীর সকলেই গ্রহণ করেছে। কিন্তু নিছক পরিকল্পনাতেই কিছু হয় না, সে পরিকল্পনার ফলাফল ভাল হবে কি মন্দ হবে তা নির্ভর করে তার লক্ষ্যের উপর, তার নিয়ন্ত্রণ কর্তাদের উপর এবং কি প্রকারের গভর্নমেন্টের সমর্থন আছে তার পিছনে। পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কি সমগ্র জনসাধারণের কল্যাণ ও উন্নতি? এতে কি সকলকে সমান সুবিধার সুযোগ দেওয়া হয়েছে? এর মধ্যে কি স্বাধীনতার ক্রম-বিকাশের সম্ভাবনা আছে? পারস্পরিক সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত যৌথ সংগঠন ও কর্মধারাকেই কি গ্রহণ করা হয়েছে? উৎপাদনবৃদ্ধির আবশ্যকতা আছে, কিন্তু শুধু উৎপাদনবৃদ্ধির দ্বারা বেশি দূর অগ্রসর হওয়া যায় না, এমনকি আমাদের সমস্যাগুলি আরও জটিল করে তুলতে পারে। পুরাতন সুযোগ সুবিধা ও কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার প্রচেষ্টা পরিকল্পনা ব্যাপারটার মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে দেয়। সত্যিকারের

কোনো বাস্তব পরিকল্পনায় জাতির সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনো বিশেষ শ্রেণী বা অংশের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রচেষ্টার স্থান নেই। এই দিক থেকে ইতিপূর্বে বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী সরকারকে নানা বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কারণ পার্লামেন্টের শাসনবিধির অন্তর্ভুক্ত একটা বিশেষ আইন অনুযায়ী এই সমস্ত কায়েমী স্বার্থের সুযোগসুবিধায় হাত দেওয়ার কোনো উপায় ছিল না। এমনকি প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট এই সময় জমির বিলিবন্দোবস্ত ব্যবস্থার পরিবর্তন ও জমি থেকে আয়ের উপর আয়কর বসানোর কতকটা চেষ্টা করেছিল—এ ব্যাপারে হাত দেওয়ার প্রাদেশিক গভর্নমেন্টের আইনসঙ্গত অধিকার আছে কি না তা নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত হয়েছিল।

বড় বড় শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদের দ্বারা যদি কোনো পরিকল্পনা রচিত হয়, তাহলে স্বভাবতই সে পরিকল্পনা তাদের পরিচিত প্রচলিত সমাজব্যবস্থার কাঠামোর ভিতর আবদ্ধ থাকতে ও বিত্তভোগী সমাজের মুনাফাপ্রবৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য। শত সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই সব শিল্পপতিদের পক্ষে নূতন ধারায় চিন্তা করা অসম্ভব। এমনকি শিল্পকে যখন তারা রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে আনতে চায়, তখনও রাষ্ট্র বলতে তারা বর্তমান রাষ্ট্রের কাঠামোকেই ধরে নেয়।

ভারতবর্ষের রেলশিল্পের মালিক বর্তমান ভারত সরকার এবং সরকারী কর্তৃত্বেই এই রেলশিল্প পরিচালিত। তাছাড়া অন্যান্য শিল্পে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, সাধারণভাবে ভারতের সমগ্র জনসাধারণের জীবনযাত্রার উপর সরকারী হস্তক্ষেপ ও কর্তৃত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সব কারণে মাঝে মাঝে আমরা শুনতে পাই যে বর্তমান ভারত সরকারও সমাজতান্ত্রিক আদর্শপূরণের পথেই চলেছে। কিন্তু জাতির অর্থনৈতিক জীবন ও শিল্পব্যবস্থার উপর গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক কর্তৃত্ব আর বিদেশী শাসকের কর্তৃত্ব এক নয়। ভারত গভর্নমেন্টের অনুসৃত নীতির মধ্যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কিছু কিছু সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা থাকলেও, আসলে কায়েমী স্বার্থের সংরক্ষণই এই নীতির মূল লক্ষ্য। আগের যুগের স্বেচ্ছাচারী ঔপনিবেশিক শাসননীতি একমাত্র কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার ব্যাপার ছাড়া, অন্যান্য অর্থনৈতিক সমস্যা চিরদিন এড়িয়ে চলেছে। কিন্তু এ যুগের নূতন পরিস্থিতির প্রয়োজনের দাবি সেই ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বের 'চলছে চলুক' নীতি দ্বারা মেটানো সম্ভব নয়, অথচ বিদেশী শাসক তার স্বেচ্ছাচারী কর্তৃত্ব এতটুকু ঢিলা করতে রাজী নয়, সেই কারণে তাদের নীতি ফ্যাসিজ্‌ম অভিমুখী হতে বাধ্য হয়। এবং সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ফ্যাসিস্ট নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করার প্রচেষ্টা চলতে লাগল, ব্যক্তিস্বাধীনতা বলতে যা অবশিষ্ট ছিল তা সম্পূর্ণ অপসারিত হল, নিজের স্বেচ্ছাচারী কর্তৃত্ব ও ধনতান্ত্রিক কাঠামোতে একটু অদলবদল করে নূতন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলল। অর্থাৎ অন্যান্য ফ্যাসিস্ট দেশগুলির মত ভারতে একটি এক-চ্ছত্রী রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠতে লাগল, শিল্পব্যবস্থা ও জাতির অর্থনৈতিক জীবন সেই একচ্ছত্রী কর্তৃত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে লাগল, ধনতান্ত্রিক 'স্বাধীন ব্যবসা'

সম্বন্ধেও কতকগুলি সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হল, কিন্তু সব কিছুর ভিত্তিতে রইল সেই পুরাতন ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজতন্ত্রের কোনো সাদৃশ্যই নেই, তাছাড়া বিদেশীর প্রভুত্বাধীন দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উল্লেখই অর্থহীন। জাতির অর্থনৈতিক জীবনের পুনর্গঠনের জন্য এই ধরনের কোনো প্রচেষ্টা অন্তত সাময়িকভাবেও সফল হতে পারে কি না, সে সম্পর্কেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে এবং এরূপ প্রচেষ্টার ফলে উপস্থিত সমস্যাগুলো জটিলতর ও তীব্রতর হয়ে ওঠার আশঙ্কাই বেশি। অবশ্য যুদ্ধপরিস্থিতি এই প্রচেষ্টার জন্য একটি সাফল্যপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র ব্যতীত শিল্পের জাতীয়করণও (তথাকথিত) সম্পূর্ণ বৃথা, কারণ নতুন নতুন পথে শোষণ চলতেই থাকে। জাতীয়করণের ফলে যদিচ শিল্পের মালিক হয় রাষ্ট্র, কিন্তু জনসাধারণ সেই রাষ্ট্রের মালিক নয়।

ভারতবর্ষে আমাদের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল এই যে আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক এবং শিল্প, কৃষি, দেশীয় রাজ্য প্রভৃতি সমস্ত সমস্যাকেই আমরা উপস্থিত ঘটনাপরিস্থিতির কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেই পর্যালোচনা করার চেষ্টা করি। এই কাঠামোর সঙ্গে শ্রেণীবিশেষের যেসব সুযোগ সুবিধা ও কায়েমী স্বার্থ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, সেগুলি বজায় রেখে কোনো সমস্যার প্রকৃত সমাধান সম্ভব নয়। ঘটনার চাপে জোড়াতালি দিয়ে যদিও বা কোনো সমাধানের চেষ্টা হয়, সে সমাধান কিছুতেই স্থায়ী হয় না, সেটা ব্যর্থ হতে বাধ্য। পুরানো সমস্যা থেকেই যায় এবং নূতন নূতন সমস্যা বা পুরানো সমস্যাই নূতন নূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সমস্যা বা সংকট সমাধানের আমাদের এই ধরনের প্রচেষ্টার পিছনে আছে গতানুগতিকতা ও পুরানো অভ্যাসের প্রভাব। কিন্তু এর জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী হল ব্রিটিশ সরকারের শাসনযন্ত্রের 'লোহকাঠামো' যা এই জরাজীর্ণ সমাজব্যবস্থাকে কোনো রকমে বাঁচিয়ে রেখেছে।

ভারতবর্ষের জাতীয় জীবন যে সমস্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যে ক্ষতবিক্ষত ছিল, যুদ্ধ সেইগুলোকেই তীব্রতর করে তুলেছে। রাজনৈতিক দিক দিয়ে আমরা দেখি যে ভারতের স্বাধীনতা ও মুক্তির দাবি নিয়ে আজ অনেক বেশি আলাপ-আলোচনা চলছে। অন্যদিকে ভারতের জনসাধারণের উপর আজ যে চরম স্বেচ্ছাচারী শাসন এবং যে তীব্র ও ব্যাপক দমননীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না এবং আজকের এই অবস্থা থেকেই আগামী কাল জন্ম নেবে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্রিটিশ প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বই সর্বেসর্বা, অথচ ভারতের জাতীয় অর্থনৈতিক জীবন প্রসারলাভের জন্য তার এই শৃঙ্খল ছিন্ন করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। একদিকে আছে দুর্ভিক্ষ এবং নিদারুণ দুর্দশা, অপরদিকে মূলধন ক্রমেই জমে উঠছে। চরম দারিদ্র্যের পাশেই আছে বিপুল সম্পদ, একই সঙ্গে রয়েছে ক্ষয় ও সৃষ্টি, বিভেদ ও ঐক্য, মৃত্যু ও জীবন। আর এই সমস্ত শোচনীয় বৈষম্যের পিছনে আছে এক অন্তর্নিহিত অদম্য জীবনীশক্তি।

উপর উপর দেখলে মনে হয় এই যুদ্ধ ভারতের শিল্পসম্প্রসারণ ও উৎপাদন-বৃদ্ধিকে প্রেরণা যুগিয়েছে কিন্তু এর ফলে নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা কতখানি অথবা পুরানো শিল্পের বিস্তৃতি ও পণ্য উৎপাদনের হেরফের কতখানি তা বিচারসাপেক্ষ। যুদ্ধের কয়েকবছরে শিল্পজগতের কর্মচাঞ্চল্যের মানের সমধিক স্থিরতা লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে শিল্পের মৌলিক কোনো অগ্রগতি প্রকৃতপক্ষে হয়নি। এ সম্পর্কে কয়েকজন বিশিষ্ট ও ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের অভিমত এই যে যুদ্ধ এবং যুদ্ধের মধ্যে ব্রিটিশ অনুসৃত নীতির ফলে ভারতের শিল্পোন্নতি ব্যাহতই হয়েছে। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এবং টাটা শিল্পগোষ্ঠীর অন্যতম ডিরেক্টর ডক্টর জন্ মাথাই সম্প্রতি বলেছেন : 'যুদ্ধ ভারতের শিল্পোন্নতিকে দ্রুতবেগে বাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে বলে যে একটা সাধারণ ধারণা প্রচলিত আছে সেটা নিতান্তই প্রমাণসাপেক্ষ। একথা সত্য যে যুদ্ধের প্রয়োজন মিটানোর জন্য অনেকগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করেছিল; কিন্তু অপরদিকে দেশের পক্ষে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় মূল শিল্প-বিস্তারের যে পরিকল্পনা যুদ্ধের পূর্বে করা হয়েছিল, যুদ্ধের চাপে সেগুলি হয় শেষপর্যন্ত পরিত্যক্ত অথবা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে সর্বদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে যদিচ ক্যানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ায় যুদ্ধ-পরিস্থিতি দ্রুত শিল্পোন্নতির সহায়ক হয়েছিল, ভারতবর্ষে শিল্পের দ্রুত বিস্তারে এই যুদ্ধ বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্য, আমি স্বীকার করি যে দেশের সমগ্র মূল প্রয়োজন মিটানোর মত শিল্প গড়ে তোলার সম্ভাবনা ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে আছে।' যুদ্ধের মধ্যে ভারতের শিল্পজগৎ সম্পর্কে যে সমস্ত সংখ্যাতথ্যাদি পাওয়া যায়, তা থেকে এই মতই দৃঢ়তর হয়। যুদ্ধের পূর্বে ভারতে যে অনুপাতে শিল্প-বিস্তার হচ্ছিল যুদ্ধের কয়েকবছরে যদি সেই মান বজায় থাকত তাহলে এর মধ্যে আমাদের দেশে শুধু যে বহু নূতন শিল্প গড়ে উঠত তাই নয়, সমগ্রভাবে দেশের উৎপাদনশক্তিও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেত।*

* যুদ্ধ ভারতের শিল্পবিস্তার ও শিল্পক্ষমতার বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে গেছে বলে যে ধারণা গড়ে উঠেছিল, ১৯৪৫ সালের ৩০শে মে লন্ডনে একটি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মিস্টার জে. আর. ডি টাটাও তা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন : 'বিচ্ছিন্নভাবে ইতস্তত কিছু কিছু শিল্পের বিস্তার হয়েছে বটে, কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে যুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত অস্ত্রশস্ত্র ও এই ধরনের কয়েকটি শিল্প বাদ দিলে আর কিছু হয়নি। অনেকগুলি নূতন পরিকল্পনা যুদ্ধের জন্য কার্যে পরিণত হয়নি। নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই আমি বলতে পারি যে ইট এবং ইস্পাত ও যন্ত্রপাতির যুদ্ধজনিত দুষ্প্রাপ্যতা হেতু এই ধরনের অনেকগুলো পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হতে বাধ্য হয়েছিল। যারা বলে যে যুদ্ধের কয়েকবছরে ভারতের শিল্প ও অর্থনৈতিক জীবন অনেকখানি এগিয়ে গেছে, তারা সত্যিকারের অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয়।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'এই ভুল ধারণা ভেঙে দেওয়া আমার অবশ্য কর্তব্য। যুদ্ধের মধ্যে নানাভাবে ভারতবর্ষের অগ্রগতি সাধন হয়েছে বলা একটা অর্থহীন প্রলাপমাত্র। কোনো না কোনো কারণে এই যুদ্ধের মধ্যে

যুদ্ধ ভারতের একটি সম্ভাবনাকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে—তা এই যে, সুযোগ এবং সুবিধা পেলে ভারত কি প্রচণ্ড গতিতে তার শিল্পব্যবস্থার উন্নতি ও বিস্তার করতে সক্ষম। প্রচুর বাধা ও অসুবিধা সত্ত্বেও একটা অর্থনৈতিক ইউনিট হিসাবে ভারতবর্ষ যুদ্ধের এই পাঁচ বছরেই প্রভূত পুঁজি সঞ্চয় করতে পেরেছে। স্টার্লিং সিকিউরিটি হিসাবে পরিচিত এই বিরাট পুঁজি থেকে ভারতবর্ষ অবশ্য এখনও পর্যন্ত বঞ্চিতই আছে এবং মাঝে মাঝে শোনা যায় যে এটা নাকি অনাদায়ীই থাকবে। ব্রিটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের পক্ষ থেকে ভারত সরকার যুদ্ধের জন্য যা ব্যয় করেছিল তারই দরুন জমে জমে এই স্টার্লিং সিকিউরিটিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। বুভুক্ষা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী—হীনবীর্য, রুগ্ন, জীর্ণ, ভগ্নস্বাস্থ্য কোটি কোটি ভারতবাসীর অনাহার-মৃত্যুর প্রতীক এই স্টার্লিং সিকিউরিটি।

যুদ্ধের এই পাঁচ বছরে এই বিরাট পুঁজি সঞ্চয় করার ফলে ভারত যে শুধু ব্রিটেনের পাওনা ঋণই পরিশোধ করেছে, তাই নয়, উপরন্তু এখন সে নিজেই ব্রিটেনের উত্তমর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চরম উপেক্ষা ও অব্যবস্থার ফলে ভারতের জনসাধারণকে এই কয়েক বছরে প্রচণ্ড নির্যাতন ও দুর্দশা সহ্য করতে হয়েছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ভারত যে কত অল্প সময়ে কি বিরাট পুঁজি সঞ্চয় করতে পারে, সেটাও এই যুদ্ধের মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। গত একশো বছরে ভারতে যে পরিমাণ ব্রিটিশ পুঁজি খাটানো হয়েছে, যুদ্ধের এই ক'বছরে যুদ্ধসম্পর্কিত ভারতের খরচখরচার পরিমাণ তার চেয়ে অনেক বেশি। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে রেল, সেচ, ও অন্যান্য শিল্প সম্বন্ধে বড় বড় কথা সত্ত্বেও ব্রিটিশ শাসনের একশো বছরে ভারতের অগ্রগতির পরিমাণ কি নগণ্য। আবার এ থেকেই বোঝা যায় যে সুযোগ পেলে সমস্ত দিক থেকে ভারত কত দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে। ভারতের শিল্পোন্নতিকে যে বিদেশী সরকার কোনো সময়েই সুনজরে দেখতে পারেনি, তার আওতায় প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যদি ভারতবর্ষ এই বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জন করতে পারে, তাহলে স্বাধীন জাতীয় গভর্নমেন্টের সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে সামান্য কয়েক-বছরের মধ্যেই ভারতবর্ষের চেহারার আমূল পরিবর্তন সাধিত হতে পারে 'তা নিঃসন্দেহ।

সুদূর অতীতে ভারতবর্ষ বা অন্যত্র যে ধরনের সামাজিক কাঠামো বজায় ছিল, তার সঙ্গে আধুনিক যুগের ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনগুলোর তুলনা করে ইংরাজরা সাধারণত নিজের কৃতিত্ব দাবি করে। এটা তাদের একটা অদ্ভুত

ভারতবর্ষের সত্যিকারের কোনো উন্নতি বা অগ্রগতি হয়নি, বরঞ্চ পশ্চাদ্‌গতিই হয়েছে। আসলে যা ঘটেছিল তা এই : যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসাবে এবং ভারতবর্ষ এর মধ্যে যেটুকু অংশ গ্রহণ করেছিল তার ফলেই বাঙলার দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক মরেছিল। শুধু তাই নয় বস্ত্রেরও নিদারুণ দুর্ভিক্ষ। সুতরাং যুদ্ধের মধ্যে ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে উন্নতির সম্পূর্ণ অভাবই স্পষ্ট ফুটে ওঠে।'

স্বভাব। শত শত বছর আগে ভারতবর্ষ সভ্যতার যে স্তরে ছিল, তার সঙ্গে তাদের শাসনকালে অনুষ্ঠিত নগণ্য পরিবর্তনগুলোর তুলনা করে ইংরাজরা আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তারা যখন এই ভাবে চিন্তা করে তখন তারা ভুলে যায় যে শিল্পবিপ্লব এবং বিশেষভাবে শিল্পবিজ্ঞান ও যন্ত্রপাতির অগ্রগতি গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মানুষের জীবনপ্রবাহে কি প্রচণ্ড বেগ ও গতি এনে দিয়েছে। তারা ভুলে যায় যে ভারতের মাটিতে তারা যখন প্রথম পদার্পণ করে তখন সে ভারত অনুর্বর রুক্ষ ও বর্বর দেশ ছিল না; সভ্যতার উচ্চতম ধাপে অধিষ্ঠিত সুজলা সুফলা শ্যামলা ভারতবর্ষ তখন যন্ত্রশিল্প ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির দিক দিয়ে সাময়িকভাবে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল মাত্র।

এই ধরনের তুলনামূলক আলোচনায় আমরা কোনটাকে আমাদের বিচারের মাপ-কাঠি বা মানদণ্ড বলে ধরে নেব? নিজেদের স্বার্থেই মাত্র আট বছরের মধ্যে জাপানীরা মাঞ্চুকুয়োকে শিল্পোন্নতির পথে প্রচণ্ডভাবে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বহু বছরের ব্রিটিশ শাসনের পরেও ভারতবর্ষে যে পরিমাণ কয়লা উৎপাদিত হত, মাঞ্চুকুয়োতে এই আট বছরের মধ্যেই তার চেয়ে অনেক বেশি কয়লা উৎপন্ন হয়েছিল। অন্যান্য ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের তুলনায় জাপানীশাসনে কোরিয়ার অগ্রগতি ও উন্নতি অনেক বেশি উল্লেখযোগ্য।* অবশ্য এই সব উন্নতি ও অগ্রগতির

* নিউইয়র্ক টাইম্‌স্‌ পত্রিকার সুদূর প্রাচ্যের বহু বছরের সংবাদদাতা হ্যালেট এ্যাবেন্ড তাঁর 'প্যাসিফিক চার্টার' (১৯৪৩) নামক গ্রন্থে লিখেছেন: 'নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে জাপানীরা যে বস্তুতান্ত্রিক দিক থেকে কোরিয়াতে অত্যাশ্চর্য উন্নতিসাধন করেছে তা স্বীকার করতেই হবে। তারা যখন কোরিয়া দখল করে তখন কোরিয়া ছিল অনুন্নত, নোংরা, অস্বাস্থ্যকর এবং চরম দারিদ্র্যদুর্দশালাঞ্ছিত দেশ। বৃক্ষহীন, রুক্ষ ও শুষ্ক ছিল তার পাহাড়পর্বত; উপত্যকাগুলি অবিরাম বন্যার প্রাদুর্ভাবে নিয়ত উপদ্রুত; ভাল রাস্তাঘাট বলতে কিছু ছিল না; জনগণ ছিল নিরক্ষর; টাইফয়েড, বসন্ত, কলেরা, আমাশয়, প্লেগ প্রভৃতি মহামারী তার জনসাধারণের জীবনে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে হানা দিত। কিন্তু আজ শ্যামল বনরাজিতে সে দেশের পাহাড়পর্বত আবৃত; আজ সে দেশে রেলচলাচল, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; সেখানে জনস্বাস্থ্যের ব্যবস্থাও অতি সুদক্ষ; ভাল রাস্তাঘাটের যথেষ্ট প্রাচুর্য; বন্যানিয়ন্ত্রণ এবং সেচব্যবস্থার উন্নতির ফলে খাদ্যদ্রব্যের উপাদান বৃদ্ধি পেয়েছে। নূতন নূতন বন্দর গড়ে তোলা হয়েছে। এই সব উন্নতির ফলে কোরিয়া যে কি পরিমাণ ঐশ্বর্য ও স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠেছে, তার একটা প্রমাণ দেয় তার জনসংখ্যার হার—১৯০৫ সালে কোরিয়ার জনসংখ্যা ছিল ১,১০,০০,০০০। আজ তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২,৪০,০০,০০০। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে কোরিয়াবাসীর জীবনযাত্রার স্তর যা ছিল, তার চেয়ে আজকে তাদের জীবনযাত্রার স্তর অশেষ উন্নতিলাভ করেছে।' কিন্তু মিস্টার এ্যাবেন্ড একথাও বলেছেন যে কোরিয়াবাসীদের সুখ-সুবিধার জন্য জাপানীরা এসব উন্নতিসাধন করেনি, করেছে এই জন্য যে এসব উন্নতির ফলে জাপানীদের মুনাফার হারও বেড়ে যাবে।

পিছনে ছিল দাসত্বের লাঞ্ছনা, নির্মম অবজ্ঞা ও শোষণের গ্লানি, এবং পদানত জাতির জীবন ও চেতনাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার নিরন্তর প্রচেষ্টা। পদানত দেশের জনসাধারণ ও জাতির উপর নির্যাতন নিপীড়ন ও নিষ্পেষণের দিক দিয়ে নাৎসী ও জাপানীদের নৃশংসতা ও বীভৎসতা অতুলনীয়। এই কথাটা মাঝে মাঝে আমাদেরও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে ব্রিটিশরা আমাদের সঙ্গে এতটা দুর্ব্যবহার তো করেনি। তুলনা ও বিচার করতে হলে আমরা কি ধরে নেব যে এটাই এ যুগের নূতন মানদণ্ড?

আজকের ভারত হতাশা ও নৈরাশ্যে আচ্ছন্ন; এর কারণ অনুসন্ধান করা কঠিন নয়—ঘটনাচক্রে আমাদের জনগণ কম নিপীড়িত হয়নি এবং তাদের সামনে ভবিষ্যৎও যে আশ্বাসে পূর্ণ এমন নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে অনুভূত হয় প্রাণবন্যার অস্ফুট কলধ্বনি, নবজীবনের উন্মেষ, অজানা কত নূতন শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ইঙ্গিত। নেতাদের স্থান উপরে; কিন্তু তাঁদের চলার পথের দিক নির্ণয় করে দেয় সেই অতীত অতিক্রান্ত নবজাগ্রত জনগণের নামগোত্রহীন চিন্তাবর্জিত দুর্বার ইচ্ছাশক্তি।

৮ : ভারতের অগ্রগতি রোধ

ব্যক্তির মত জাতির জীবনেও বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে এবং তাদের প্রভাবে জাতীয় জীবনের বিকাশও হয় বিভিন্নমুখী। এই সব বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব এবং ধারা ও প্রভাবগুলি যদি পারস্পরিক নিবিড় যোগসূত্রে যুক্ত থাকে তাহলে সেটা জাতির পক্ষে শুভ ও মঙ্গলজনক; কিন্তু এই যোগসূত্রের অভাবে সৃষ্ট হয় ভেদবিভেদ ও বিপর্যয়। অবশ্য স্বাভাবিক বিবর্তনের পথে এই সমস্ত বিভিন্নমুখী ধারার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টা চলছে অবিরাম এবং সব সময় একটা ভারসাম্য রক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু উন্নতির স্বাভাবিক গতি যদি রুদ্ধ করে দেওয়া হয়, অথবা স্বাভাবিক রীতির বিপরীত এমন কোনো দ্রুত পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাহলে তখনই এই বিভিন্নমুখী ধারার মধ্যে শুরু হয় সংঘর্ষ। দীর্ঘদিন ধরে ভারতের স্বাভাবিক অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে এসেছে, তাই ভারতের সমগ্র চেতনা ও মর্মের মধ্যে এই মূল অসামঞ্জস্য ও দ্বন্দ্বই প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছে। উপরকার ভাসাভাসা ছোটখাট দ্বন্দ্ব-সমস্যার নিচে রয়েছে এই গভীর ও মূল সংঘর্ষ। সুপ্রতিষ্ঠিত এবং প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থার পক্ষে দুটো জিনিস অপরিহার্য—প্রথমত আদর্শের একটা সুসংবদ্ধ ভিত্তি এবং দ্বিতীয়ত সজীব দৃষ্টিভঙ্গী। শেষোক্তটির অভাবে সমাজের গতি হয়ে যায় রুদ্ধ, তার ফলে সেই সমাজব্যবস্থা হয়ে ওঠে ক্ষয়িষ্ণু। আর আদর্শের যদি সুসংবদ্ধ ভিত্তি না থাকে তাহলে সমাজে ভেদাভেদ ও ভাঙনের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব।

আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে এই মূল আদর্শের—যা শাশ্বত, পরম সত্য ও সার্বজনীন—অনুসন্ধান চলেছে। এই সঙ্গে ভারতের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির

মধ্যে একটা গতিশীলতা, এবং জগতের ক্রমপরিবর্তিত জীবনপ্রবাহ সম্বন্ধে সচেতনতা চিরদিন বর্তমান ছিল। এই দুই ভিত্তির উপর ভারতে একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, যদিচ স্থিতিশীলতা, ধ্বংস ও বিলোপের হাত থেকে জাতিকে রক্ষা করাই ছিল এই সমাজব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ আস্তে আস্তে তার চিন্তাধারার এই গতিশীলতা হারিয়ে ফেলেছিল, যার ফলে শাশ্বত ও অবিনশ্বর আদর্শ ও নীতির নামে ভারতের সমাজব্যবস্থা অনড় ও অচল কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ করা হয়। তা সত্ত্বেও অবশ্য সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন ও ক্রমবিবর্তন যে হয়নি এমন নয়, যদিচ মোটামুটিভাবে সামাজিক কাঠামো ও আদর্শবাদে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। আদিম যুগের মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন ও চেতনার প্রকাশ হিসাবে বর্ণভেদ, যৌথপরিবার, গ্রামের পঞ্চায়েতী শাসন প্রভৃতি ছিল ভারতের সেই সমাজকাঠামোর স্তম্ভস্বরূপ—নানা দোষত্রুটি সত্ত্বেও মনুষ্যপ্রকৃতি ও সমাজের মূল প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম বলেই হয়তো এগুলি এখনও পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন গোষ্ঠীর মধ্যে এনে দেয় নিরাপত্তাবোধ; গোষ্ঠী-স্বাধীনতারও বিকাশ হয় সেই সঙ্গে। ভারতবর্ষে আদিম বর্ণভেদ এখনও পর্যন্ত টিকে রয়েছে, কারণ সমাজব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন শক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের বাস্তব প্রকাশই ছিল এই বর্ণভেদ। এই সমাজের মধ্যে শ্রেণীবৈষম্যও দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়েছে, কারণ প্রচলিত আদর্শ বা মতবাদের মধ্যে এর যুক্তিযুক্ততা তো ছিলই, উপরন্তু এর সমর্থনের ভিত্তি ছিল শক্তি, বুদ্ধি বিবেচনা ও চরম আত্মোৎসর্গের উপর প্রতিষ্ঠিত। অধিকার বা স্বার্থসংঘাতের উপর শ্রেণীবৈষম্যের নীতি ও মতবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল না; ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ, নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে এবং এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অপর গোষ্ঠীর পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সংঘাত সংঘর্ষ এড়িয়ে শান্তিপূর্ণ উন্নতি ও অগ্রগতির আদর্শ ও সংজ্ঞাই ছিল এই শ্রেণীবৈষম্যের মূল ভিত্তি। সামাজিক কাঠামো ছিল কঠোর বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, কিন্তু সমাজভুক্ত ব্যক্তির মনের ও চিন্তার স্বাধীনতা ছিল পূর্ণতম।

লক্ষ্যের দিক দিয়ে ভারতীয় সভ্যতা অনেকটা এগিয়েছিল; কিন্তু এই অগ্রগতির মধ্যেই তার জীবনপ্রবাহের ধারা এল শুকিয়ে, কারণ অনমনীয় পরিবর্তনহীন সমাজকাঠামোর মধ্যে সভ্যতা প্রাণবন্ত থাকতে পারে না। যে সব মূল নীতি শাশ্বত ও পরিবর্তনহীন বলে স্বীকৃত—সত্যানুসন্ধানের সজীব স্পৃহা এবং বিরামহীন প্রচেষ্টা যখন আর থাকে না, তখন সেই সব নীতিও নীরস ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে। সত্য, সৌন্দর্য ও স্বাধীনতার আদর্শেও মরচে ধরে যায় এবং বন্দীর ন্যায় অতিশয় নীরস রুটিনবাঁধা গণ্ডির ভিতর আমাদের জীবন অতিবাহিত করতে হয়।

ভারতবর্ষে যার অভাব ছিল সর্বাধিক, আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে দৃষ্টিভঙ্গির সেই প্রাণবন্ত গতিশীলতার প্রাচুর্য ছিল যথেষ্ট। পাশ্চাত্য পরিবর্তমান জগতে নিবিষ্টচিত্ত —শাশ্বত অবিনশ্বর আদর্শ বা মূলনীতি সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন। অপরের প্রতি কর্তব্য বা দায়িত্বপালনের স্পৃহা তাদের নেই, অধিকার প্রতিষ্ঠার উপরই তারা

গুরুত্ব আরোপ করে। তারা সক্রিয়, উগ্রভাব-সম্পন্ন, সম্পদ আয়ত্তে পটু, ক্ষমতা ও প্রভুত্ব স্থাপনে সদা সচেষ্ট। তাদের জীবনে বর্তমানই গুরুত্বপূর্ণ, বর্তমান ক্রিয়া-কলাপের ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গির এই প্রাণবন্ত গতিশীলতার জন্যই তাদের সমাজ প্রগতিশীল, তাদের জীবন প্রাণ-চাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু এ প্রাণচাঞ্চল্য ক্রমে বিকারগ্রস্তের উন্মাদনায় পরিণত হয়েছে এবং ক্রমবর্ধমান হারে সে উন্মাদনার তাপ বৃদ্ধিলাভ করে চলেছে।

ভারতীয় সভ্যতা স্থাণু ও আত্মসমাধিস্থ হওয়ার ফলে যদিচ স্থবির হয়ে পড়েছিল, কিন্তু বিরাট ও ব্যাপক অগ্রগতি সত্ত্বেও আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা যে বিশেষ সাফল্যলাভ করেছে অথবা মানব জীবনের মূল সমস্যাগুলির সমাধান করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। এ সভ্যতাও অন্তর্দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ, মাঝে মাঝে তাই প্রভূত পরিমাণে আত্মধ্বংসের সর্বনাশা লীলায় মত্ত হয়ে ওঠে। কোথায় যেন এর স্থিতি-শীলতার একটা অভাব রয়ে গিয়েছে, মূলগত একটা নীতি বা আদর্শের অভাবে এর মধ্যে জীবনের অর্থ ও সংজ্ঞা গিয়েছে হারিয়ে, অবশ্য এ অভাবগুলি যে কি তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু এই সভ্যতার অন্তস্তলে আছে গতিশীলতার বেগ, তার জীবন প্রাণচাঞ্চল্য ও ঔৎসুক্যে ভরপুর, তাই এই সভ্যতার সাফল্যের আশা আছে।

আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছ থেকে ভারতবর্ষ এবং সেই সঙ্গে চীনেরও অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে, কারণ বর্তমান যুগধর্মের বাহকই তো এই পাশ্চাত্য সভ্যতা। অপরদিকে পাশ্চাত্য জগতেরও অনেক কিছু শিখবার প্রয়োজন আছে। যুগে যুগে দেশে দেশে মনীষীদের চিন্তা ও সাধনার ফল—জীবনের সেই গভীরতম অর্থ ও সংজ্ঞা উপলব্ধি করতে না পারলে পাশ্চাত্য তার যন্ত্র, শিল্প ও বিজ্ঞানের প্রভূত অগ্রগতি সত্ত্বেও কোনো শান্তিলাভ করতে পারবে না।

ভারতের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সেই সঙ্গে ভারত একেবারে অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছে। কোনো পরিবর্তন না হওয়ার অর্থ—মৃত্যু। কিন্তু আজও যে একটা উন্নত ও সুসভ্য জাতি হিসাবে ভারতবর্ষ বেঁচে আছে, তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে ভারতবর্ষে পরিবর্তন ও সমন্বয়ের একটা ক্রিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে এসেছে। ইংরেজরা যখন ভারতবর্ষে আসে, যন্ত্র ও শিল্প-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে পশ্চাৎপর থাকলেও, ব্যবসাবাণিজ্যে ভারতবর্ষ তখন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ ছিল। স্বাভাবিক গতিতে ভারতে যন্ত্র ও শিল্পবিজ্ঞানের উদ্ভব অবশ্যই হত এবং তার ফলে পাশ্চাত্য দেশের মত এদেশেও বিরাট পরিবর্তন ঘটত। কিন্তু ব্রিটিশ শক্তির আবির্ভাবে ভারতের এই স্বাভাবিক অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়। শিল্পের চিন্তা হল ব্যাহত, ফলে সামাজিক প্রগতির পথও হল রুদ্ধ। সমাজের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শক্তিসমূহের পারস্পরিক সামঞ্জস্যবিধান ও ভারসাম্য রক্ষা ক্রমশই অসম্ভব হয়ে উঠল, কারণ সমাজের সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কেন্দ্রীভূত হল জুলুমের উপর প্রতিষ্ঠিত বিদেশী শাসকের হাতে, যে শাসক সমাজের সেই সমস্ত দল বা

শ্রেণীকে প্রশ্রয় দিতে লাগল—সমাজে যারা বৈশিষ্ট্যবর্জিত। ভারতীয় সমাজ-জীবন তাই ক্রমশই কৃত্রিমতাদুষ্ট হয়ে পড়ল, কারণ যে সব শ্রেণী বা ব্যক্তিবিশেষ বিদেশী শাসকের দয়াতে শীর্ষস্থানীয় হয়ে দাঁড়াল, আসলে তারা সমাজে কোনো সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে অক্ষম ছিল। উপস্থিত সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কহীন এই সব শ্রেণী ও অংশের সামাজিক ভূমিকা বহুদিন আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, এবং বিদেশী শাসকের পশুশক্তির আশ্রয় লাভ না করলে, সমাজের নব নব শক্তিপ্রবাহ এদের দূরে ঠেলে দিত। এরা বিদেশী শাসকের শক্তির ফাঁপা খড়ঠাসা প্রতীকমূর্তি বা অনুগ্রহভোগী তাঁবেদারে পরিণত হয়ে জাতির সজীব জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। বৈপ্লবিক বা স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের মধ্যে এই সমস্ত সমাজসম্পর্কচ্যুত শ্রেণী বা অংশগুলো আপনা আপনিই বাদ পড়ে যেত, অথবা এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও পরিবর্তন করে তারাও হয়তো উপস্থিত সমাজের কোনো একটা প্রয়োজনে লাগতে পারত। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী বিদেশী শক্তি যতদিন সমাজের শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত, ততদিন এই ধরনের কোনো অগ্রগতি বা পরিবর্তন সম্ভব ছিল না। সুতরাং জরাজীর্ণ অতীতের এই প্রতীকগুলিতে ভারত ছেয়ে গেল এবং বাস্তব জীবনে যে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন ঘটছিল তা এই কৃত্রিম বেড়ার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। সমাজের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক শক্তির সুসংবদ্ধ সামঞ্জস্য বা একটা নির্ভরযোগ্য ভারসাম্য রইল অনুপস্থিত এবং অবাস্তব তুচ্ছ খুঁটিনাটি বিষয়গুলিই হয়ে দাঁড়াল গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান সমস্যা বিশেষ।

আমাদের সমাজের স্বাভাবিক অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার ফলেই আমাদের বেশির ভাগ সমস্যাগুলির উদ্ভব হয়েছে এবং ব্রিটিশ শাসকই সে সব সমস্যার স্বাভাবিক সমাধানের পথে বাধাসৃষ্টি করে এসেছে। বিদেশী শক্তির অস্তিত্ব না থাকলে দেশীয় নৃপতিদের সম্পর্কে সমস্যার সমাধান সহজেই হতে পারত। আমাদের দেশে সংখ্যালঘুদের সমস্যা, অন্যান্য দেশের সংখ্যালঘু সমস্যার অনুরূপ নয়, আসলে আমাদের এ সমস্যাকে সংখ্যালঘু আখ্যা দেওয়াই কঠিন। এই সমস্যা যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও রূপে রূপায়িত হয়ে উঠেছে সেজন্য অতীত ও বর্তমানে আমাদের নিজেদের কার্যাবলীই দায়ী তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এর পিছনে আছে ব্রিটিশ শক্তির সক্রিয় সমর্থন, কারণ তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ভারতের প্রচলিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো বজায় রাখা এবং এই জন্যই আমাদের সমাজের পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়গুলির অনুন্নত অবস্থা কায়েমী রাখার সকল প্রচেষ্টাকে ব্রিটিশ শাসকেরা সর্বদা প্রশ্রয় দেয়। তারা যে শুধু ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রগতিতে প্রত্যক্ষভাবে বাধা দিয়ে এসেছে তা নয়, দেশের প্রতিক্রিয়াশীল ও কায়েমী স্বার্থসংশ্লিষ্ট অংশের সম্মতির উপরই ভারতের অগ্রগতিকে নির্ভরশীল করে তুলেছে। এই সম্মতির মূল্য এদের বিশেষ বিশেষ সুযোগ সুবিধা কায়েমী রাখতে রাজী হওয়া অথবা ভবিষ্যতের যে কোনো ব্যবস্থায় এদের বিশেষ ক্ষমতা থাকবে তা স্বীকার করে নেওয়া। ফলে ভারতের সত্যকার প্রগতি ও উন্নতির পথে ক্রমে

উঠেছে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। কোনো নূতন গঠনতন্ত্রকে যদি যথার্থ সক্রিয় ও কার্যকরী করতে হয়, তবে তার পিছনে দেশের অধিকাংশ জনগণের সমর্থনলাভই যথেষ্ট নয়, তার ভিতরে সে সময়কালীন সামাজিক শক্তিগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ ও শক্তি-সমন্বয় প্রতিফলিত হওয়াও একান্ত প্রয়োজন। আমাদের দেশে সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার এই যে ব্রিটিশ শাসকেরা এবং এমনকি কোনো কোনো ভারতীয়েরাও, ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নূতন গঠনতান্ত্রিক পরিবর্তনের যেসব পরিকল্পনা করছেন, তাতে দেশের বর্তমান সামাজিক শক্তিগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং বিশেষভাবে, দীর্ঘদিনের গতিরুদ্ধতা কাটিয়ে যেসব নূতন শক্তির উন্মেষ হয়েছে—সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে; উপরন্তু, দেখা যায় যে তারা কতকগুলি অতীত ও বিলীয়মান এবং আজকের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থহীন সামাজিক সম্বন্ধের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটা অনমনীয় ব্যবস্থা দেশবাসীর উপর চাপাবার প্রচেষ্টায়ই নিযুক্ত।

ব্রিটিশের সামরিক প্রভুত্ব এবং তার অনুসৃত নীতিই আজ ভারতে সবচেয়ে বড় বাস্তব সত্য। এই নীতির প্রকাশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং ধোঁয়াটে কথার আড়ালে তাকে ঢেকে রাখার প্রচেষ্টাও হয়েছে, কিন্তু সম্প্রতি সেনাপতি-ভাইসরয়ের আমলে এই নীতি আসলে কি তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে অর্থাৎ যতদিন সম্ভব হয় ততদিন ব্রিটিশরা ভারতে তাদের সামরিক প্রভুত্ব বজায় রাখবে। কিন্তু এটা ঠিক যে শক্তি প্রয়োগেরও একটা সীমা আছে। অবিরত শক্তির প্রয়োগ শুধু যে বিরোধী শক্তিই গড়ে তোলে তা নয়, এই শক্তি প্রয়োগের উপরই যারা নির্ভরশীল তাদের চিন্তার অতীত এমন অনেক সব ফলাফলেরও উদ্ভব সৃষ্টি করে।

ভারতের প্রগতি ও বৃদ্ধির স্বাভাবিক বিকাশ জোর করে স্তব্ধ করে দেওয়ার ফলাফল অবশ্য ইতিমধ্যেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ব্রিটিশ শাসনের নির্বীর্যতা এবং সেই কারণে ভারতীয় জীবনপ্রবাহ কতদূর ব্যাহত হয়েছে। স্বভাবতই বিদেশী প্রভুত্ব পদানত জাতির সৃজনীপ্রতিভা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে বাধ্য হয়। বিশেষত বিদেশী শাসকের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্র ও উৎস যদি অধিকৃত দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত হয়, উপরন্তু যদি সে শাসন জাতিবিদ্বেষে দুষ্ট হয়, তবে এই বিচ্ছেদ হয় আরও সম্পূর্ণ; এবং এর ফলে পদানত জাতির মানসিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ক্রমেই শুষ্ক হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় সে জাতির সমস্ত সৃজনীশক্তি মুক্তি লাভের একমাত্র পথ পায় বিদেশী শাসকের প্রতি যে কোনো প্রকার বিরোধিতার ভিতর দিয়ে। কিন্তু তারও অবকাশ নিতান্ত অল্প, ফলে জাতির মানস ক্রমশ সংকীর্ণ ও একমুখী হয়ে ওঠে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিরোধিতা যেহেতু জাতীয় জীবনের জীবন্ত ও গতিশীল শক্তিগুলির বন্ধনমুক্তির চেতন বা অবচেতন প্রচেষ্টার প্রতীক, সেজন্য তা প্রগতিশীল ও অবশ্যম্ভাবী অভিব্যক্তি হিসাবে গণ্য হতে পারে। তবে এই বিরোধিতার লক্ষ্য শুধু এক দিকেই নিবদ্ধ এবং এর প্রকৃতি নেতিমূলক, সেজন্যই আমাদের জীবনের বিভিন্ন বাস্তব দিককে তা স্পর্শ করতে পারে না। ফলে

ক্রমশ নানাপ্রকার জটিলতা, সংস্কার ও গোঁড়ামি জাতীয় মানসকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তোলে; দল ও সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক মানসপ্রতিমা গড়ে ওঠে; মূল সমস্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের পরিবর্তে লোকে আওড়ায় বাঁধা গৎ, বাঁধা বুলি। বিদেশীর ক্লীব শাসনের আওতায় জাতির কোনো সমস্যারই সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব নয়, সমাধানের অভাবে সে সমস্যাগুলি ক্রমেই তীব্রতর হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষে আজ আমাদের জাতীয় জীবন যেখানে এসে ঠেকেছে, সেখানে কোনো অসম্পূর্ণ প্রচেষ্টা অথবা বিশেষ কোনো এক দিকের অগ্রগতি আর যথেষ্ট নয়। অগ্রগতির পথে আজ সমস্ত জাতিকে সকল দিক দিয়ে প্রচণ্ড এক লম্ফে অগ্রসর হতে হবে, নতুবা এক বিরাট বিপর্যয়ের সম্ভাবনা অতি আসন্ন।

সমগ্র বিশ্বের মত ভারতেও আজ শান্তিপূর্ণ প্রগতি ও পুনর্গঠনের শক্তির সঙ্গে ভেদাবিভেদ ও ধ্বংসের শক্তির পাল্লা চলেছে। জাতির সামনে সঙ্কট যত গভীর হয়ে উঠছে, ততই এই সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সংঘাত সংঘর্ষ ও সম্ভাব্য ধ্বংসের বিভীষিকা আমাদের মনকে হতাশায় অভিভূত করবে অথবা ভবিষ্যৎ বিশ্বাসের আশায় উদ্দীপ্ত করে তুলবে, সেটা আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মানস ও ভাবাবেগের উপর নির্ভরশীল। শুভ ও মঙ্গলের জয়ই শেষ পর্যন্ত অনিবার্য এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরমব্রহ্মের অমোঘ নীতির দ্বারা পরিচালিত, এই যাদের বিশ্বাস তারা অবশ্য ভাগ্য ও বিধাতার উপর দায়িত্ব অর্পণ করে এই সংঘাত সংঘর্ষ থেকে নির্লিপ্ত থাকতে পারে। আশায় ভর করে, ব্যর্থতার জন্য প্রস্তুত হয়ে অন্যদের এই বোঝা নিজের দুর্বল কাঁধে তুলে নিতে হবে।

৯ : ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান

অতীতের অনেক কিছুর সঙ্গেই ভারতকে আজ তার বন্ধন ছিন্ন করতে হবে এবং তার বর্তমান আজ তার অতীত দ্বারা সম্পূর্ণ প্রভাবিত না হয় সেজন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। অতীতের শুষ্ক শিকড়গুলি আজ আমাদের জীবনে বোঝাস্বরূপ; অতীতের যা কিছু মৃত, যা কিছু অকেজো সে সমস্তই আমাদের ছেঁটে ফেলতে হবে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে অতীত ঐতিহ্যের সজীব ধারার সঙ্গে আমাদের সকল সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে হবে, সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। ভারতের মহাজাতি যে আদর্শ এবং লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এসেছে; যুগযুগান্ত ধরে যে স্বপ্নকামনা ভারতের জনগণের অন্তরে অন্তরে সযত্নে লালিত হয়েছে; আমাদের প্রাচীন মনীষীদের আহরিত জ্ঞান; আমাদের পিতৃপুরুষদের উচ্ছলিত জীবনীশক্তি, জীবন ও প্রকৃতির প্রতি তাঁদের গভীর অনুরাগ; তাঁদের অসীম ঔৎসুক্য এবং মানস জগতে রহস্যময় অভিযান; শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁদের অপূর্ব কীর্তিসমূহ; সত্য, সৌন্দর্য ও স্বাধীনতার প্রতি তাঁদের সুগভীর নিষ্ঠা; তাঁদের প্রতিষ্ঠিত জীবনের সব নূতন সংজ্ঞা ও অর্থ; জীবনের রহস্যোভরা গতি

সম্বন্ধে তাঁদের নিবিড় অনুভূতি; দেশবিদেশের জাতিবিজাতির বিভিন্ন সংস্কৃতি, বিভিন্ন মতবাদ ও বিশ্বাসের প্রতি তাঁদের উদার সহনশীলতা ও সেগুলিকে সাদরে গ্রহণ ও আত্মীভূত করবার শক্তি, এবং এ বিচিত্র ভাবধারার সংমিশ্রণে তাঁরা যে বিরাট ও ব্যাপক সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তোলবার আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন---এসব কি আমরা বিস্মৃত হতে পারি? অথবা সেই সব অসংখ্য অভিজ্ঞতা আমাদের মন থেকে বিলুপ্ত হতে পারে—যেসব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে শত শত প্রজন্ম ধরে আমাদের এই সুপ্রাচীন জাতি গড়ে উঠেছিল, যেসব অভিজ্ঞতা আমাদের অবচেতন মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গ্রথিত হয়ে আছে। উত্তরাধিকারসূত্রে যে মহান ঐতিহ্যের আমরা অধিকারী তার গৌরবকে আমরা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না এবং এই ঐতিহ্যের সঙ্গে আজ যদি ভারতের নাড়ীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে ভারতবর্ষ আর ভারতবর্ষ থাকবে না—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমাদের আনন্দঘন গর্ব-বোধ থেকে আমরা বঞ্চিত হব।

ভারতের এই ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হতে আমরা চাই না। ভারতের উপর যুগযুগান্তরের যে ধূলি ও আবর্জনা জমে উঠেছে, যেসব আগাছা ও বিকৃতিপূর্ণ শিকড় গজিয়ে তার মনের বিস্তৃতি রোধ করেছে, তার মনকে প্রস্তরীভূত করে অনমনীয় কাঠামোর ভিতর আবদ্ধ করে রেখেছে—শুধু সেই সমস্তই আমরা ঝেড়ে ফেলতে, ছেঁটে ফেলতে চাই। পরম্পরাগত চিন্তা ও জীবনের ধারা থেকে মুক্ত হবার অভ্যাস আমাদের অর্জন করতে হবে—সেসব চিন্তার ধারা, জীবনের রীতি অতীতে যতই শুভ ও মঙ্গলপ্রদ হয়ে থাকুক না কেন—আজ তার কোনো সার্থকতা নেই। মানবজাতির ইতিহাসে আজ পর্যন্ত যা কিছু অগ্রগতি বা উন্নতি সাধিত হয়েছে, তার সমস্ত কিছুকে আমাদের আপন করে নিতে হবে, এবং সকলের সঙ্গে আমাদেরও যুক্ত হতে হবে মানবজাতির রোমাঞ্চকর অভিযানের পথে। অতীত অপেক্ষা আজ এই অভিযান অনেক বেশি রোমাঞ্চকর, কারণ আজকের মানব অভিযান দেশ বা জাতির সংকীর্ণ গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। জীবন ও প্রকৃতিকে যা অর্থময় করে তোলে সেই সত্য, সৌন্দর্য ও স্বাধীনতা আমাদের নূতন করে উপলব্ধি করতে হবে। আমাদের দৃষ্টিধারার মধ্যে নূতন করে আনতে হবে সেই দুরন্ত গতিশীলতা, অন্তরে নূতন করে জাগাতে হবে রহস্যময় মানস অভি-যানের সেই অদম্য স্পৃহা—আমাদের পূর্বপুরুষদের এসব ছিল বলেই তাঁরা শক্তিসম্পন্ন স্থায়ী ভিত্তির উপর আমাদের এ গৃহ নির্মাণ করে যেতে সক্ষম হয়ে-ছিলেন। আমরা অতি প্রাচীন, কর্মজীবন ও ইতিহাসের প্রথম সূর্যোদয় আমাদের স্মরণায়ত্ত, কিন্তু এ যুগের ধারার সঙ্গে সমতা রাখার জন্য আমাদের আজ আবার তরুণ হতে হবে, আমাদের অন্তরে সঞ্জীবিত করতে হবে তারুণ্যের উদ্দামতা ও প্রাণাবেগ, ভবিষ্যতের উপর তারুণ্যের অটল বিশ্বাস।

শাশ্বত, অবিনশ্বর ও চিরন্তন—এই হল সত্যের আসল রূপ। মানুষের মানস হল সসীম, তাই সত্যের এই আসল রূপ উপলব্ধি করতে সে অপারগ। স্থান ও কালের

পারম্পর্যে আবদ্ধ, মানসিক উন্নতি ও যুগমতের বিশিষ্ট স্তর ও কাঠামোর মধ্যে বন্দী মানুষ এই সত্যের ঠিক ততটুকু অংশই উপলব্ধি করতে পারে। মানস-জগতের ক্রমবিকাশ এবং ব্যাপকতা বিস্তৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে যুগধর্ম বা মতবাদও পরিবর্তিত হয়; এবং শাশ্বত ও চিরন্তন সত্যও নূতন নূতন সংজ্ঞা ও রূপে রূপায়িত হয়ে ওঠে, যদিচ তার অন্তর্নিহিত মূল তত্ত্বটি থাকে অবিচলিত। সুতরাং যুগে যুগে তাই নূতন করে সত্যের অনুসন্ধান করতে হয়, তার নূতন নূতন তাৎপর্য ও সংজ্ঞার আবিষ্কার করতে হয়, যাতে শাশ্বত সত্যের সে উপলব্ধি মানুষের জীবন ও চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের বিশিষ্ট স্তরের সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে পারে। এই সামঞ্জস্য বিধান হলে তবেই মানবজাতির নিকট সত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়, তার অনুসন্ধানী অন্তরের খোরাক মেটায়, তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে পরিচালনা করতে পারে।

কিন্তু সত্যের কোনো একটি অঙ্গ যদি অতীত যুগে কোনো নীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে তার বৃদ্ধি ও অগ্রগতির পথ হয়ে যায় রুদ্ধ এবং মানুষের ক্রমপরিবর্তিত প্রয়োজনবোধের সঙ্গে তার সামঞ্জস্যবিধানও হয়ে ওঠে অসম্ভব। এর ফলে এই সত্যের অন্যান্য রূপগুলিও ঢাকা পড়ে যায় এবং পরবর্তী যুগের অতি প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসার উত্তর তার কাছে আর মেলে না। পরিবর্তনের স্রোতের সঙ্গে তাল রাখার গতিশীলতা হারিয়ে সত্য তখন হয়ে ওঠে কঠোর কঠিন নিশ্চল বিধানমাত্র। তখন জীবনকে প্রাণরসে সিঞ্চিত করতে সে অক্ষম, প্রাণহীন শুষ্ক আচার অনুষ্ঠানের চতুঃসীমানার মধ্যেই সে হয় আবদ্ধ। মানবসভ্যতা ও মানসজগতের অগ্রগতির পথে সে তখন হয়ে দাঁড়ায় বিঘ্নস্বরূপ। অতীতে যে ভাবে এই সত্যের উপলব্ধি হয়েছিল সেই যুগবিশেষের ভাষা ও প্রতীকের দ্বারাই তার সেই বিশিষ্ট রূপ বিকশিত হয়েছিল—আজ সেই উপলব্ধি আছে কি না সন্দেহ। কারণ অতীতের পটভূমিকা আর আজকের পটভূমিকা তো এক নয়; মানসিক পরিপ্রেক্ষিতেরও হয়েছে পরিবর্তন, সমাজে নূতন নূতন রীতিনীতি চালু হয়েছে; সুতরাং এ যুগে অতীতের সেই প্রাচীন লিপির অর্থ উপলব্ধি দূরে থাক পাঠোদ্ধারই হয় কি না সন্দেহ। তাছাড়া, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ যা বলেছেন : প্রত্যেকটি সত্য তার নিজস্ব তাৎপর্যে যদিচ যথার্থ সত্য, কিন্তু প্রত্যেকটি সত্য তার পারস্পরিক যেসব সত্য দ্বারা সীমাবদ্ধ ও সম্পূর্ণ হয়, সেগুলি থেকে সেটিকে যদি বিচ্ছিন্ন করা হয়, তাহলে সেই সত্যটি হয়ে দাঁড়ায় মানুষের বিচারবুদ্ধিকে ফাঁদে ফেলার জাল বিশেষ বা বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী নীতিস্বরূপ। কারণ বাস্তবক্ষেত্রে প্রত্যেকটি সত্য সামগ্রিক সত্যের বুনোটের একটি সুতার সামিল এবং সে বুনোট থেকে একটি সুতাও আলগা করে নেওয়া যায় না।

মানবসভ্যতার অগ্রগতির পথে ধর্ম একটা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে। ধর্মই জীবনের অর্থ ও সংজ্ঞা, আদর্শ ও নীতি নির্দিষ্ট করে মানুষের জীবনযাত্রা পালনের পথনির্দেশ করে এসেছে, কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মধ্যে ধর্ম একদিকে যেমন

মানুষের কল্যাণসাধন করেছে ও আদর্শনিষ্ঠার পথ দেখিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সত্যকে একটা বাঁধাধরা নীতি ও গোঁড়ামির মধ্যে আবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টাও করেছে, অনেক আচার অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেছে যার মৌলিক অর্থ শেষ পর্যন্ত হারিয়ে পদ্ধতিপালনে পরিণত হয়ে গিয়েছে। মানুষের চতুর্দিক ঘিরে আছে যে অজানা—সেই অজানার রহস্য ও শঙ্কা সম্বন্ধে ধর্ম মানুষকে সচেতন করেছে তা ঠিক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই অজ্ঞানাকে সে জানবার, বোঝবার, এমনকি সামাজিক প্রচেষ্টায়ও যা বাধাস্বরূপ তা আবিষ্কার করবার মানুষের সহজাত যে স্পৃহা—ধর্ম তাকে কোনো প্রেরণাই দেয়নি। ধর্ম মানুষের ঔৎসুক্য বা চিন্তাবৃত্তিকে কোনো উৎসাহই দেয়নি বরঞ্চ প্রকৃতির কাছে, প্রতিষ্ঠিত ধর্মবিশ্বাস ও রীতিনীতির কাছে, তার পারিপার্শ্বিক সমাজব্যবস্থার কাছে, অর্থাৎ যা কিছু প্রতিষ্ঠিত ও স্থিতিশীল—তার কাছেই বশ্যতা-স্বীকার করতে শিক্ষা দিয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছু এক অলৌকিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—এই সংস্কার সামাজিক ক্ষেত্রে মানুষকে কতকটা দায়িত্বহীন করে তুলে-ছিল, ফলে মানুষের মনে যুক্তি, জিজ্ঞাসা ও চিন্তার স্থান গ্রহণ করেছে আবেগ ও ভাবালুতা। ধর্ম এবং তার আচারঅনুষ্ঠান অসংখ্য মানুষের মনে শান্তির খোরাক জুগিয়েছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্মই আবার মানবসমাজের অন্তর্নিহিত পরিবর্তন ও অগ্রগতির বৃত্তিকে প্রতি পদে বাধা দিয়ে এসেছে।

দর্শন অবশ্য এসব ত্রুটি এড়িয়ে গিয়েছে এবং মানুষের চিন্তাবোধ, ঔৎসুক্য এবং জিজ্ঞাসারই প্রেরণা দিয়েছে। অপরদিকে দর্শন পর্বতশিখরে আরোহণ করে নিজ সিদ্ধির তপস্যায় মগ্ন থেকে মানুষের জীবন ও তার দৈনন্দিন জীবনের দ্বন্দ্ব সমস্যা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, এবং মানুষের বাস্তবজীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের সঙ্গে সংযোগহীন মূল তত্ত্বানুসন্ধানেই সে প্রেরণা যুগিয়ে এসেছে। যুক্তি ও বিচার দ্বারাই দর্শন পরিচালিত, নিজ মাধ্যমে যুক্তির ব্যাপকতা ও বিকাশে দর্শন প্রভূত সহায়তা করেছে। কিন্তু সে যুক্তি অনেকাংশেই মানসপ্রসূত—বাস্তব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

বিজ্ঞান আবার এই মূল তত্ত্বানুসন্ধানকে উপেক্ষা করে বাস্তবকেই বড় করে দেখেছে। বিজ্ঞান পৃথিবীকে এক লম্ফে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে এসে বিচিত্র এক বর্ণোজ্জ্বল সভ্যতা গড়ে তুলল, জ্ঞানার্জনের অসংখ্য নূতন নূতন পথ উন্মুক্ত করে দিল, এবং মানুষের শক্তি এতদূর বৃদ্ধি করে দিল যে মানুষ এই প্রথম অনুভব করল যে সে তার পারিপার্শ্বিককে জয় করে তার ইচ্ছানুযায়ী তাকে গড়ে তুলতে পারে। এখন মানুষ যেন একটা পার্থিব প্রাকৃতিক শক্তিতেই রূপান্তরিত হল—রসায়ন, পদার্থ ও অন্যান্য বিদ্যার সাহায্যে সে যেন পৃথিবীর রূপই বদলে দিতে শুরু করল। কিন্তু যখন সে অনুভব করল যে এ পৃথিবীর সমস্ত ব্যবস্থা তার আয়ত্তাধীন, তার ইচ্ছানুযায়ী নূতন করে তা গড়ে তুলতে সে সক্ষম, তখনও কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেল, কি একটা মূল উপাদানের যেন অভাব থেকে গেল। তার কারণ মূল তত্ত্ব অথবা আশু লক্ষ্য কোনোটার সন্ধানই বিজ্ঞান তাকে

দিতে পারেনি—জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞান তাকে কোনো নির্দেশই দেয়নি। মানুষ প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় রহস্য ভেদ করে তাকে জয় করে নিজের আয়ত্তে এনেছে, কিন্তু আজ পর্যন্তও মানুষ নিজেকে নিজের আয়ত্তাধীন করতে পারেনি, তাই তার নিজের সৃষ্ট দানবীয় শক্তির উন্মত্ততায় নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। জীববিদ্যা, মনোবিদ্যা এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি এবং বিশেষভাবে জীববিদ্যা ও পদার্থ-বিদ্যার নূতন নূতন ব্যাখ্যা ও প্রয়োগে মানুষ হয়তো নিজেকে বুঝতে ও সুপরিচালিত করতে বেশি সক্ষম হবে। নতুবা হয়তো এসব ক্ষেত্রের অগ্রগতি মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করার পূর্বেই মানুষ তার নিজের সৃষ্ট সভ্যতা ধ্বংস করে ফেলবে এবং নূতন করে আবার তাকে সব গড়ে তুলতে হবে।

বাধাবন্ধনমুক্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশ বা অগ্রগতির সীমা অন্তহীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও হয়তো এটাই ঠিক যে মানুষের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য এবং যে অসীম রহস্যসাগর আমাদের ঘিরে রয়েছে তার সম্পূর্ণ মর্মভেদ করতে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতি অপারগ। দর্শনের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে বিজ্ঞান হয়তো আরও একটু অগ্রসর হতে পারবে, হয়তো বিজ্ঞান সেই রহস্যসাগরেও পাড়ি দিতে সাহস করবে। কিন্তু যদি বিজ্ঞান এবং দর্শন—দুইই আমাদের নিরাশ করে, তখন নিজেদের অন্তরের যেটুকু বোধ ও শক্তি আছে তারই উপর আমাদের নির্ভর করতে হবে। কারণ আমাদের সমগ্র মানস আজ যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাতে একটা সীমারেখা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, চিন্তা ও যুক্তি যাকে অতিক্রম করতে অপারগ।

বুদ্ধি ও যুক্তির এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী পদ্ধতির এই অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এই দুইয়ের আশ্রয়কেই প্রাণপণ শক্তিতে আমাদের ধরে রাখতে হবে; কারণ যুক্তি ও বিজ্ঞানের ভিত্তি এবং পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া কোনো সত্য বা বাস্তব ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যুক্তি দিয়ে কোনো কিছু বোঝবার চেষ্টা না করে জীবনের অসীম রহস্যসাগরে তলিয়ে যাবার চেয়ে, আংশিকভাবেও সত্যকে উপলব্ধি করে, সেইটুকু দিয়েই জীবনকে যাচাই করার চেষ্টা অনেক বেশি কল্যাণকর। বর্তমান জগতে সকল দেশের সকল মানুষের পক্ষে জীবনকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণ দিয়ে যাচাই করা শুধু অনিবার্য নয়, অপরিহার্যও বটে। কিন্তু জীবনের উপর বিজ্ঞানের প্রয়োগই যথেষ্ট নয়। চাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিজ্ঞানের বিশ্লেষণী মনোবৃত্তি ও জ্ঞানার্জনের স্পৃহা, বিশ্লেষণ ও বিচার ব্যতিরেকে কোনো কিছু গ্রহণে অসম্মতি, পূর্বকল্পিত মতবাদের পরিবর্তে দৃষ্ট বাস্তব তথ্যের উপর নির্ভরশীলতা, কঠোর মানসিক নিয়মানুবর্তিতা—বিজ্ঞানের এ সমস্ত গুণ অর্জন করার প্রয়োজন জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োগসাধন করার উদ্দেশ্যে নয়, প্রয়োজন জীবনের কল্যাণার্থে ও জীবনের বহু সমস্যা সমাধানার্থে। বহু বৈজ্ঞানিক যাঁরা বিজ্ঞানকেই ধর্ম বলে গ্রহণ করেছেন, তাঁদের বিশিষ্ট কর্মক্ষেত্রের বাইরে বিজ্ঞানকে আর স্মরণে রাখেন না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোবৃত্তি গড়ে তোলে জীবনের একটা বিশেষ ধারা বা গতি, চিন্তার বিশেষ একটা ভঙ্গি, মানুষের আচার ব্যবহারের বিশেষ একটা

পদ্ধতি। কিন্তু এতটা আশা করাই বৃথা কারণ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জীবন পরিচালনা করতে অল্পসংখ্যক লোকই সক্ষম হতে পারে। কিন্তু ধর্ম ও দর্শন মানুষের উপর যেসব অনুশাসন প্রয়োগ করেছে তাতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব আরও বেশি।

বিশিষ্ট জ্ঞানান্বেষণই বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, কিন্তু বিজ্ঞানপ্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি এই বিশিষ্ট জ্ঞানের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূর প্রসারিত। জ্ঞানার্জন, সত্যোপলব্ধি এবং শিব ও সুন্দরের সাধনা ও প্রীতি—এই হল মনুষ্যজীবনের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানের বাস্তব বিশ্লেষণী পদ্ধতি এগুলির উপর প্রয়োগ করা যায় না এবং জীবনের অনেক কিছু মূল্যবান সম্পদ—যথা শিল্পকলা, কাব্যানুরাগের সংবেদনশীলতা, সৌন্দর্যপ্রীতি থেকে সঞ্চারিত ভাবাবেগ এবং শিব ও শুভের অন্তর-স্বীকৃতি—এসব ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ অসম্ভব। প্রকৃতির রহস্যভেদে ব্যাপৃত উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যাবিশারদ হয়তো প্রকৃতির সমগ্র রূপ রস ও সৌন্দর্যের বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিতই থাকেন, সমাজবিজ্ঞান যাঁর চর্চা মানুষের প্রতি তাঁর হয়তো বিন্দুমাত্র দরদও নেই। কিন্তু যখন আমরা এমন সব স্থানে বিচরণ করি যেখানে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব নেই—দর্শনের আবাস সেই উত্তুঙ্গ পর্বতশীর্ষ, অথবা অসীম অনন্ত মহাব্যোমের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আমাদের হৃদয় আবেগ ও রোমাঞ্চে অভিভূত হয়ে যায়, তখনও সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা বর্তমান থাকে।

ধর্মের পদ্ধতি বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিপরীত। বাস্তব বিশ্লেষণের অতীত বিষয় নিয়েই ধর্ম ব্যাপৃত, সেজন্য আবেগ ও অনুভূতির উপরই সে বিশেষ নির্ভরশীল। জীবনের সব কিছুর উপর ধর্ম তার বিশিষ্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করে, এমনকি যেসব বিষয় বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা, পর্যবেক্ষণ দ্বারা বিচার সম্ভব সে ক্ষেত্রেও ধর্ম তার নিজ পদ্ধতি প্রয়োগ করে। তত্ত্বসংযোগে সংগঠিত ধর্ম যে মনোবৃত্তি সৃষ্টি করে তা বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির সম্পূর্ণ বিপরীত, আসলে সংগঠিত ধর্ম নিজের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখায় যতটা নিবিষ্ট, আধ্যাত্মিক বিষয়ে ততটা নয়। সংগঠিত ধর্ম সৃষ্টি করে সঙ্কীর্ণতা ও অসহিষ্ণু, মূঢ় বিশ্বাস ও কুসংস্কারপ্রবণতা, ভাবাবেগ ও যুক্তিহীনতা। সংগঠিত ধর্ম মানুষের মনকে সঙ্কুচিত ও সীমাবদ্ধ করতে চেষ্টা করে, ধর্মের আওতায় আত্মনির্ভরশীল স্বাধীন মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে না।

ভলটেয়ার বলেছেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি নাও থাকত তাহলেও তাঁর অস্তিত্ব উদ্ভাবন করতে হত। কথাটা হয়তো ঠিক। মানুষ হয়তো চিরদিনই মনে মনে এক দেবতার মূর্তি বা ধারণা গড়ে তুলতে চেষ্টা করে এসেছে এবং সে ধারণা তার মানসিক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিলাভ করেছে। অপরপক্ষে ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি স্বীকার করেই নেওয়া যায়, তা সত্ত্বেও সমস্ত বিষয়ে তাঁর উপর নির্ভরশীল হওয়া, অথবা তাঁর উপর সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়াও হয়তো বিশেষ বাঞ্ছনীয় নয়। অলৌকিক শক্তির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতার ফলে অনেক সময়ই দেখা গেছে যে মানুষের

আত্মপ্রত্যয় হয়েছে বিলুপ্ত, তার মানসিক শক্তি ও সৃজনীপ্রতিভার তীক্ষ্ণতা হয়েছে বিনষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরের আধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধে কিছুটা বিশ্বাস, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও আদর্শগত ধারণা সম্বন্ধে মানুষের কিছুটা আস্থা থাকাও প্রয়োজন, নতুবা জীবনে কোনো খুঁটি, কোনো লক্ষ্য, কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। ঈশ্বরে বিশ্বাস আমাদের থাকুক বা না থাকুক, কিন্তু কোনো একটা কিছুর উপর বিশ্বাস—তাকে আমরা যে নামেই অভিহিত করি না কেন—না থাকলে মানুষের চলে না। তাকে আমরা 'ক্রিয়েটিভ লাইফ গিভিং ফোর্স' অর্থাৎ 'প্রাণ প্রতিষ্ঠাকারী সৃজনীশক্তি' বা 'তার বিবর্তন, পরিবর্তন ও অগ্রগতির মূল বস্তুর অন্তর্নিহিত যে শক্তি' হিসাবেই ব্যাখ্যা করি না কেন, মৃত্যুর তুলনায় জীবন যেমন বাস্তব অথচ অলীক, তেমনি বাস্তব অথচ অলীক কোনো এক শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস না করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সচেতন বা অবচেতন যেভাবেই হোক না কেন, বেশির ভাগ মানুষই অজানা কোন এক দেবতার অদৃশ্য বেদীমূলে অর্ঘস্বরূপ তুলে ধরে কোনো না কোনো এক আদর্শ—তা ব্যক্তিগতই হোক, জাতীয়তামূলকই হোক বা আন্তর্জাতিকতামূলকই হোক; যুক্তি যার অস্তিত্ব স্বীকার করে না—এমন এক সুদূর লক্ষ্য, উন্নততর পৃথিবী ও মহত্তর ব্যক্তিত্বের আদর্শ যেন অহরহ আমাদের আকর্ষণ করতে থাকে। চরম উৎকর্ষের শিখরে পেঁছানো হয়তো অসম্ভব, কিন্তু আমাদের অন্তরে যেন এক বেগবান প্রাণশক্তি আমাদের সামনের দিকে ঠেলে দিতে থাকে—প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমরা তাই সেই চরম উৎকর্ষলাভের পথে যাত্রা করি।

জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে—তার সংকীর্ণ অর্থে ধর্মের ক্ষেত্র সংকুচিত হতে থাকে। জীবন ও প্রকৃতিকে আমরা যত বেশি বুঝতে ও আয়ত্তে আনতে শিখি, অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে ততই আমাদের মনোযোগ হ্রাস পায়। যখনই আমরা কোনো একটা বিষয় বুঝতে এবং আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারি, তখনই তার সব রহস্য ঘুচে যায়। কৃষিকার্যের বিভিন্ন পদ্ধতি, যে খাদ্য আমরা আহার করি, যে বস্ত্র আমরা পরিধান করি, সমাজে আমাদের পারস্পরিক যে সম্বন্ধ—এ সমস্তই একদিন ছিল ধর্ম ও তার পুরোহিতদের বিধানে নিয়ন্ত্রিত। ক্রমে এগুলি ধর্মানুষ্ঠানের পরিধি অতিক্রম করে বৈজ্ঞানিক চর্চার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এসব ধর্মবিশ্বাস ও কুসংস্কারের সঙ্গে একদিন সংশ্লিষ্ট ছিল এবং তার দ্বারা আজও যথেষ্ট প্রভাবান্বিত। অবশ্য জীবনের বহু চরম রহস্য আজও উদ্ঘাটিত হয়নি এবং সেগুলি উদ্ঘাটিত হওয়ার সম্ভাবনাও নিতান্ত অল্প। কিন্তু জীবনের যেসব রহস্য উদ্ঘাটিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং প্রয়োজন আছে, সেগুলির পরিবর্তে চরম রহস্য উদ্ঘাটিত করার প্রচেষ্টায় নিমগ্ন থাকার কোনো অর্থ বা প্রয়োজন যে আছে তা মনে হয় না। কারণ তাছাড়াও জীবনকে পূর্ণ করতে, সমৃদ্ধ করতে, সার্থক করতে আছে বিশ্বপ্রকৃতির অপরূপ রূপসম্ভার, রোমাঞ্চকর নূতন আবিষ্কারের উত্তেজনাভরা আনন্দ, জীবনের নব নব বিকাশ, নব নব অভিব্যক্তি।

অর্থনৈতিক কাঠামো যার ফলে সাধিত হয়েছে—ব্যাপক সামাজিক অগ্রগতি, সুপরিকল্পিত উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থা, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের বহুবিধ প্রয়োগের উন্নতিসাধন, অসংখ্য নূতন প্রতিভার উন্মেষ এবং নেতৃত্বের অপূর্ব বিকাশ। কিন্তু জাতীয় স্মৃতি ও ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কার এবং তাদের বর্তমান যে অতীত থেকে নিঃসৃত সেই অতীতের নবোপলব্ধিও হয়তো তাদের এই দেশাত্মবোধের একটা কারণ। কিন্তু রাশিয়ার এই নূতন জাতীয়তাবাদ তাদের পরম্পরাগত জাতীয়তাবাদের পুনরাবৃত্তি বলে ভাবলে ভুল করা হবে, এটা মোটেই তা নয়। রুশ বিপ্লব ও তার পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে জনগণ যে বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল এবং তাদের পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থার ফলে তাদের যেসব মানসিক পরিবর্তনও সাধিত হয়েছিল—এসবের ছাপ তো রয়েই গেছে। তাছাড়া তাদের এই সমাজব্যবস্থার দরুনই একটা আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠা অনিবার্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাদের এই নূতন জাতীয়তাবাদের উদ্ভব পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবেই হয়েছে এবং সেজন্য জনগণকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের এই উন্নতির সঙ্গে অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির অবস্থার হেরফেরের তুলনা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। সোভিয়েট বিপ্লবের ঠিক পরেই পৃথিবীর সমস্ত দেশে জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষত সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যে বেশ একটা উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। তা থেকেই বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট দল ও পার্টিগুলির উৎপত্তি হয়। তারপর শুরু হয় এই সমস্ত দলের সঙ্গে দেশের জাতীয় শ্রমিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানগুলির সংঘর্ষ। পরে সোভিয়েট পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যুগে দেশবিদেশে আবার একটা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয় এবং এবার শ্রমিক শ্রেণীর চেয়ে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই সম্ভবত উদ্দীপনাটা হয় বেশি। কিন্তু সোভিয়েটে যখন রাষ্ট্রদ্রোহীদের বহিষ্কার ও উচ্ছেদ শুরু হয়, তখন আবার একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তখন কোনো কোনো দেশে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে দমন করা হয়, আবার অন্য কতকগুলি দেশে সেগুলি সমৃদ্ধিলাভ করতে থাকে। কিন্তু সর্বত্রই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংগঠিত জাতীয় শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংঘর্ষ অনিবার্যভাবেই দেখা দিয়েছিল। এজন্য কতকাংশে দায়ী জাতীয় শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলির রক্ষণশীল মনোভাব; কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টিগুলি একটা বিদেশী দলের প্রতিনিধিস্বরূপ, এদের অনুসৃত নীতি নির্ধারিত হয় রাশিয়া থেকে এরূপ একটা ধারণাই এজন্য বিশেষভাবে দায়ী। শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্নিহিত জাতীয়তাবোধ তাদের কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতা গ্রহণ করায় বাধাস্বরূপ ছিল, যদিচ কমিউনিজম-এর দিকে তাদের অনেকেরই বেশ খানিকটা ঝোঁক ছিল। সোভিয়েট নীতির মধ্যে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটছিল, সোভিয়েট ইউনিয়নের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলির তাৎপর্য বোঝা কষ্টকর ছিল না; কিন্তু যখন বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা এই নীতিগুলি অন্যত্র অনুসৃত হল তখন সেগুলি হয়ে দাঁড়াল সম্পূর্ণ অর্থহীন। সেগুলির অর্থ একমাত্র এই ভিত্তিতে বোঝা যায় যদি ধরে নেওয়া যায় যে রাশিয়ার

পক্ষে যা ভাল সারা পৃথিবীর পক্ষে তা অবশ্যই ভাল। এই সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যদিচ সত্যিকারের কার্যক্ষম ও অত্যন্ত উৎসাহী নরনারীর অভাব ছিল না, কিন্তু জনগণের জাতীয় ভাবধারার সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ক্রমে তারা দুর্বল হয়ে পড়ল। সোভিয়েট ইউনিয়ন যখন তার জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে নূতন সংযোগ ও যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত করছিল, তখন এই সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টি সেই জাতীয় ঐতিহ্য ও ভাবধারা থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছিল।

অন্যান্য দেশে কি ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কিছু বলতে পারি না, কিন্তু আমি জানি যে ভারতের জনগণের মন যে জাতীয় ঐতিহ্য ও ভাবধারায় পরিপূর্ণ, সেই ঐতিহ্য থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পূর্ণ বিচ্যুত এবং সে সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাদের ধারণা কমিউনিজম-এর অর্থই হল অতীতের প্রতি ঘৃণা। তাদের মতে ১৯১৭ সালের নভেম্বর থেকেই পৃথিবীর ইতিহাস শুরু হয়েছে এবং এর আগে যা কিছু ঘটেছে তা এই নভেম্বর বিপ্লবেরই প্রস্তুতির পথস্বরূপ। ভারতবর্ষের মত একটা দেশে যেখানে বহু সংখ্যক নরনারীকে অনাহারের সীমাপ্রান্তে বাস করতে হয়, যেখানকার অর্থনৈতিক কাঠামোয় চিড় ধরেছে সেখানে কমিউনিজম-এর প্রতি যথেষ্ট আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। একদিক দিয়ে তাদের ভিতর একটা অস্পষ্ট আকর্ষণ যে নেই তা নয়। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি তার সুযোগ গ্রহণ করতে অক্ষম, কারণ তারা জাতীয় ভাবধারার সুগভীর উৎস থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে এবং তাদের ভাষা এমন যে জনগণের মনে তা সাড়া দেয় না। কর্মিষ্ঠ হলেও এদেশে তারা পরগাছার মত শেকড়বিহীন ছোট একটা দলই রয়ে গেছে।

এই দিক দিয়ে শুধু যে কমিউনিস্ট পার্টিই ব্যর্থ হয়েছে, তাই নয়। এমন অনেকে আছে যারা মুখে আধুনিকতার উগ্র সমর্থক, অথচ আধুনিক ভাবধারা বা পাশ্চাত্য সভ্যতার আসল মর্ম বোঝবার তাদের ক্ষমতা নেই, অপরদিকে আবার তারা নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কমিউনিস্টদের মত তারা কোনো আদর্শে অনুপ্রাণিত নয়, সামনে ঠেলে দেয় এমন কোনো শক্তিও তাদের ভিতরে নেই। পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্যিক রূপ ও আবরণগুলি তারা গ্রহণ করে (এবং অনেক সময় তারা বিশেষ করে অবাঞ্ছনীয় জিনিসগুলিই গ্রহণ করে), মনে করে তারা বুঝি এক প্রগতিশালী সভ্যতার পুরোধায় চলেছে। অল্পবুদ্ধি ও অগভীর, তবু এরা আত্মগর্বে পরিপূর্ণ হয়ে দেশের কয়েকটি শহরে কেন্দ্রীভূত হয়ে এক কৃত্রিম জীবন যাপন করে—সে জীবনে প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্যের কোনো সংস্কৃতিরই সংস্পর্শ নেই।

অতীতের পুনরাবৃত্তি অথবা তার পূর্ণ অস্বীকৃতি—এই দুটোর কোনোটাতেই জাতীয় অগ্রগতি নিহিত নয়। জাতীয় জীবনে নূতন নূতন ধারা সৃষ্টি হতে বাধ্য, কিন্তু পুরাতনের সঙ্গে সেগুলিকে সম্পূর্ণ একীভূত করে নিতে হবে। মাঝে মাঝে নূতন তার সমস্ত পার্থক্য ও বিভিন্নতা নিয়ে পুরাতনের অন্তর্নিহিত রূপেই রূপায়িত হয়ে ওঠে, তাই এগুলি মানুষের সুদীর্ঘ একটা ধারাবাহিক বিবর্তনের প্রতীক

স্বরূপ, জাতির ইতিহাসের দীর্ঘ ধারার এক একটি যোগসূত্রস্বরূপ অনুভূত হয়। ভারতের ইতিহাস এরূপ পরিবর্তন প্রবর্তনের এক অত্যাশ্চর্য তালিকাস্বরূপ, ক্রমপরিবর্তিত পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে ভারতবর্ষ ধারাবাহিকভাবে তার পুরাতন ভাবধারার সামঞ্জস্য বিধান করে এসেছে। পুরাতন ছককে নূতন ছাঁচে ঢেলে এসেছে। ভারতীয় ইতিহাসের এই বিশিষ্টতার জন্যই তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা কোথাও বিচ্ছিন্ন হয়নি, বার বার বহু পরিবর্তন আসা সত্ত্বেও সেই সুদূর ও সুপ্রাচীন মহেন-জো-দারোর যুগ থেকে আমাদের যুগ পর্যন্ত ভারতীয় সংস্কৃতির ধারায় নিরবচ্ছিন্নতা কোথাও ব্যাহত হয়নি। এদেশে অতীত এবং অতীতের ঐতিহ্যের প্রতি চিরদিনই একটা সুগভীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার ভাব ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে মনের স্বাধীনতা ও নমনীয়তা এবং চিত্তের সহিষ্ণুতাও চিরদিন বর্তমান ছিল। সমাজের পুরাতন কাঠামোগুলি যদিচ বজায় থেকেছে, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত সত্তার ক্রমবিবর্তনও চলে এসেছে—তা যদি না হত তাহলে সেই সমাজব্যবস্থা হাজার হাজার বছর ধরে টিকে থাকতে পারত না। প্রাণবন্ত ও গতিশীল চেতনাই পরম্পরাগত বিধিব্যবস্থার কঠোরতা অতিক্রম করতে পারে, ঐ বিধিব্যবস্থাই আবার সমাজের ধারাবাহিকতা ও স্থিতিস্থাপকত্ব বজায় রাখে।

অবশ্য এ দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা সময় সময় অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, এর মধ্যে একটার গুরুত্ব বেশি হয়ে অপরটাকে কতকটা চাপা দিয়ে ফেলে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে ভারতের অনমনীয় সামাজিক কাঠামোর ভিতরে অভাবনীয় মানসিক স্বাধীনতার বিকাশ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই সামাজিক বিধিব্যবস্থা—তত্ত্বের দিক দিয়ে না হলেও—কার্যত এই মানসিক স্বাধীনতা খর্ব করে, মানসিক পরিধি সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করে তুলেছিল। পাশ্চাত্য ইউরোপে মনের এই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ছিল অনুপস্থিত; এবং সামাজিক রীতিনীতি বা কাঠামোও এতখানি কঠোর বা স্থিতিশীল ছিল না। ব্যক্তিমানসের স্বাধীনতার জন্য ইউরোপে দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম চলেছে; এবং সেই সংগ্রামের ফলে তাদের সামাজিক বিধি ব্যবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে।

ব্যক্তিমানসের স্বাধীনতার দিক দিয়ে চীন ভারতের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত ছিল, অতীত ঐতিহ্যের প্রতি চীনের প্রগাঢ় প্রেম ও গভীর নিষ্ঠা সত্ত্বেও সেখানে মনের নমনীয়তা ও সহিষ্ণুতা কোনোদিন লুপ্ত হয়নি। পুরাতন ঐতিহ্য অনেক সময়ে পরিবর্তন আসায় বিলম্ব ঘটিয়েছে, কিন্তু চীনের সে মানস পরিবর্তনকে কোনোদিন ভয় করেনি, যদিচ জীবনের পুরাতন ধারাগুলি বজায় রয়ে গেছে। ভারত অপেক্ষা চীনদেশীয় সমাজব্যবস্থায় অধিক সুনিপুণ ভারসাম্য ও পরিমিতিবোধ স্থাপিত হয়েছিল, হাজার হাজার বছরের অসংখ্য পরিবর্তন সত্ত্বেও যেটা নষ্ট হয়নি। অন্যান্য দেশের সঙ্গে চীনের একটা বিশেষ প্রভেদ এই যে, সে দেশ নীতিতত্ত্বের দাসত্ব ও ধর্মান্ধতার সঙ্কীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা থেকে চিরদিন মুক্ত—যুক্তি ও বিচার এবং সাধারণ বোধের উপরই ছিল তার প্রধান নির্ভর। সম্ভবত অন্য কোনো দেশ ধর্মের

পরিবর্তে ন্যায় ও সুনীতি এবং মনুষ্যজীবনের অন্তহীন বর্ণবৈচিত্র্যের গভীর উপলব্ধিকে তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেনি।

ভারতবর্ষে মানসজগতে স্বাধীনতা ছিল বলেই—কার্যত তা কিছু পরিমাণে সীমাবদ্ধ হলেও—এদেশে নূতন নূতন ভাবধারার গতিরোধ হয়নি। অন্যান্য দেশে, যেখানে জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি সঙ্কীর্ণ ও সংকুচিত, তার তুলনায় ভারতে নূতনের স্বীকৃতি অনেক বেশি দ্রুত। ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ভাবাদর্শ একটা ব্যাপক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেজন্য যে কোনো পারিপার্শ্বিকের সঙ্গেই তা খাপ খেয়ে যায়। বিজ্ঞান ও ধর্মের তীব্র সংঘর্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র ইউরোপে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, ভারতে এরূপ সংঘর্ষের স্থান নেই, কারণ বিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে সমাজ-জীবনে কোনো পরিবর্তন আসার পথে ভারতীয় ভাবাদর্শ কোনো বাধা সৃষ্টি করে না। অবশ্য এই সমস্ত পরিবর্তন অনিবার্যভাবেই ভারতের মনে একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করত (এবং তা করেছেও), কিন্তু সে এই পরিবর্তন অস্বীকার করার বা বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করত না। ভারত তার নিজের বিশিষ্ট ভাবাদর্শ এবং মানসের সঙ্গে নূতনকে মানিয়ে নিয়ে তাকে গ্রহণ করত। এই প্রক্রিয়ায় পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক মৌলিক পরিবর্তনও সন্নিবেশিত হওয়া সম্ভব, কাজেই সেগুলি বাইরে থেকে প্রতিফলিত বলে মনে হয় না—মনে হয় যে জাতির সাংস্কৃতিক পটভূমিকার ভিতর থেকেই সেগুলি স্বচ্ছন্দভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে আজকের দিনে হয়তো এভাবে পরিবর্তন সাধিত হওয়া কঠিন, কারণ দীর্ঘদিন যাবৎ ভারতে যেসব পরিবর্তনের নিতান্ত প্রয়োজন—সেগুলি সব দিক দিয়ে অনেক বেশি বিরাট ও ব্যাপক হওয়া দরকার।

ভারতীয় সভ্যতার মূল ভাবাদর্শের উপর যে সমস্ত রীতিনীতি ও সমাজব্যবস্থার কাঠামো খাড়া হয়ে উঠেছে এবং যার অস্তিত্ব আমাদের শ্বাসরোধের উপক্রম করেছে তার সঙ্গে অবশ্য আমাদের সংঘর্ষ অনিবার্য। কালে অবশ্য এসব রীতিনীতি ও ব্যবস্থা বর্জিত হতে বাধ্য, কারণ সেগুলির ভিতর মন্দের ভাগটাই বেশি এবং সেগুলি যুগাদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। যারা এই গজিয়ে-ওঠা কাঠামোটাকেই বজায় রাখতে চায়, তারা ভারতীয় সংস্কৃতির মৌলিক আদর্শকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে, কারণ ভাল এবং মন্দের পার্থক্য তারা বোঝে না—ফলে তারা ভালটাকেই বিপন্ন করে। অবশ্য ভাল এবং মন্দকে আলাদা করে দুটোর মধ্যে পার্থক্যের সূক্ষ্ম রেখা টানা খুবই দুঃসাধ্য, তাছাড়া এ সম্পর্কে লোকের মতেরও যথেষ্ট অনৈক্য আছে। কিন্তু নেহাৎ তত্ত্ব এবং যুক্তিবিচারের খাতিরেই ভাল এবং মন্দের মধ্যে এরূপ কোনো সীমারেখা টানার কোনো প্রয়োজন নেই; কারণ পরিবর্তনশীল জীবন এবং ঘটনাবলীর নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ অনিবার্যভাবেই এই পার্থক্য ক্রমশ স্পষ্ট করে তুলবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে কোনো ক্রমবিকাশের পথে—সে শিল্পবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হোক বা দর্শনের ক্ষেত্রে হোক, জীবনের সঙ্গে, সামাজিক প্রয়োজনের সঙ্গে এবং জগতের সজীব প্রাণস্পন্দন ও আলোড়নের সঙ্গে সংস্পর্শ রাখা, সংযোগ স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। এই

সংযোগ এবং যোগসূত্রের অভাবে অগ্রগতির পথ হয় রুদ্ধ, জীবনীশক্তি এবং সৃজনী-প্রতিভার বেগ ও উদ্দামতা হ্রাস হয়ে আসে। কিন্তু আমরা যদি এই সংযোগ বজায় রাখতে পারি, যদি তাতে আমরা সাড়া দিতে পারি তাহলে জীবনধারার বঙ্কিম গতিবেগের সঙ্গে আমরা নিজেদের সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারব, অথচ যেসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে আমরা চিরদিন গুরুত্ব দিয়ে এসেছি—সেগুলি হারাতে আমরা বাধ্য হব না।

অতীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রধানত সংশ্লেষণ-মূলক, কিন্তু ভারতের মধ্যেই নিবদ্ধ। দৃষ্টিভঙ্গির এই সীমাবদ্ধতা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি, এবং আস্তে আস্তে সংশ্লেষণের স্থানে বিশ্লেষণই আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এই কারণেই আজ আবার সংশ্লেষণের দিকেই আমাদের জোর দিতে হবে বেশি, সমগ্র বিশ্বকেই এই পরিপ্রেক্ষার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আজ প্রত্যেকটি জাতি ও ব্যক্তির পক্ষেই ক্রমশ এই সংশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক; বিশেষত দীর্ঘদিন যাবৎ চিন্তা ও কর্মের যে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে তারা আবদ্ধ ছিল, সেই সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হতে হলে আজ এটা শুধু আবশ্যক নয়, নিতান্ত অপরিহার্য। বিজ্ঞান এবং সমাজ-জীবনে তার প্রয়োগের ক্রমোন্নতির ফলে এই সংকীর্ণতা দূর করা আজ অনেক সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে; কিন্তু অন্যদিকে নূতন জ্ঞানের অতি-প্রাচুর্যেই আবার তা কতকটা দুঃসাধ্যও করে তুলেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো একটা ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য অর্জনের প্রচেষ্টা আবার ব্যক্তির জীবনের ধারাকে সংকীর্ণ খাতে বন্দী করেছে, এবং শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সমগ্র পরিশ্রম অনেক সময়ই একটা সম্পূর্ণ দ্রব্যের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অংশ উৎপাদনেই থাকে ব্যাপৃত। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কর্মশক্তির এই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ উৎকর্ষসাধনের প্রচেষ্টা অবশ্য বজায় রাখতে হবে, কিন্তু মানুষের জীবন এবং যুগ যুগ ধরে মানুষের অন্তহীন অভিযান সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক সংশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসাহিত করা আজ যেন আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন। এই দৃষ্টিভঙ্গি অতীত এবং বর্তমানকে বিচার করে দেখবে এবং পৃথিবীর সকল দেশ ও সকল জাতিকে এর পরিপ্রেক্ষার অন্তর্ভুক্ত করবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে আমরা শুধু যে আমাদের নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতি ও অতীত ঐতিহ্যকেই উন্নীত করতে সক্ষম হব তাই নয়, অন্যান্য দেশ ও জাতির সংস্কৃতির গুণগ্রাহী হতে পারব, তাদের বুঝতে শিখব, তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারব। এর ফলে হয়তো আজকের খাপছাড়া অসংলগ্ন ব্যক্তিত্বের পরিবর্তে আমরা সুষ্ঠু, সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে পারব। প্লেটোর ভাষায় আমরা তখন সত্যসত্যই 'সর্বপ্রাণী ও সর্বকাল দ্রষ্টা' হয়ে উঠব এবং মানবসভ্যতার যুগান্তর-সঞ্চিত ঐশ্বর্যভাণ্ডার থেকে জীবনের খোরাক আহরণ করব, সেই ভাণ্ডারকে আরও পূর্ণ করব ও ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলতে সেই ঐশ্বর্যকে কাজে লাগাতে পারব।

আধুনিককালে বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি এবং আন্তর্জাতিকতাবোধের ক্রমবিস্তৃত প্রভাব সত্ত্বেও বর্তমানে পৃথিবীতে জাতিবৈষম্য এবং অন্যান্য ভেদপন্থী ধারার বেগ অতীত অপেক্ষা বৃদ্ধিই পেয়েছে—কমেনি। বর্তমান জগতে এটা একটা বিস্ময়কর এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই উন্নতি, বাস্তব জীবনের এই অগ্রগতির মধ্যে এমন একটা অভাব রয়ে গেছে—যার ফলে বিভিন্ন জাতি এবং মানুষের অন্তরাত্মার পারস্পরিক মিলন ও ঐক্যের পথ কিছুতেই সুগম হচ্ছে না। আদিমকাল থেকে আজ পর্যন্ত মনুষ্যজাতির সমগ্র অভিজ্ঞতা ও চেতনার অগ্রগতি ঘনীভূত হয়ে আছে অতীত ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের মধ্যে। এই ঐতিহ্যের সবিনয় স্বীকৃতি এবং সংশ্লেষণমূলক মনোবৃত্তি থাকলে হয়তো আমরা একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনে অধিকতর সামঞ্জস্য খুঁজে পাব। বর্তমানের সীমার মধ্যে বিকারগ্রস্তের মত উত্তেজনাপূর্ণ জীবন যাপন করে যারা অতীতকে প্রায় ভুলতে বসেছে, এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি ও সামঞ্জস্যবোধের তাদেরই বেশি প্রয়োজন। কিন্তু ভারতবর্ষের মত দেশে আমাদের উদ্যোগের প্রকৃতি হওয়া উচিত অন্যরকম, কারণ আমরা বর্তমানকেই উপেক্ষা করে অতীতেই এখনও সম্পূর্ণ নিমজ্জিত। ধর্মান্ধতার সেই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, অলৌকিক এবং আধিভৌতিক বিষয় নিয়ে সেই অফুরন্ত জল্পনা-কল্পনা আমাদের ত্যাগ করতে হবে; আর ছাড়তে হবে সেই সব ধর্মানুষ্ঠান এবং সেই সব দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব সম্বন্ধে ভাবালুতা—যা মনের শৃঙ্খলার বাঁধ আলগা করে দেয় এবং নিজেকে আর পৃথিবীকে সঠিক বিচার করার শক্তি ক্ষয় করে। যে বর্তমানের দিকে আমরা এতকাল মুখ ফিরিয়ে ছিলাম, অনন্ত বর্ণবৈচিত্র্যে যে জীবন, যে জগৎ, যে প্রকৃতি আমাদের ঘিরে রয়েছে—এসমস্তই আমাদের ঠিক দখলে আনতে হবে। হিন্দুদের মধ্যে অনেকে আজও বেদবেদান্তের যুগে ফিরে যাবার কল্পনা করে, অনেক মুসলমান আজও ইসলামতন্ত্র স্থাপনের স্বপ্নে বিভোর। এসব অর্থহীন কল্পনা, অলীক স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়—কারণ অতীতে ফিরে যাওয়া যায় না। এমনকি অতীতের দিকে ফিরে যাওয়াটাই যদি আজ বাঞ্ছনীয় হয় তবুও তা অসম্ভব, কারণ কালের গতিস্রোত একমুখেই প্রবাহিত।

সুতরাং ভারতবর্ষকে ক্রমশ ধর্মাশ্রয়তা কমিয়ে বিজ্ঞানের দিকে মুখ ফিরাতে হবে। ভারতের চিন্তাধারা ও সামাজিক রীতিনীতির গণ্ডি আবদ্ধ সংকীর্ণতা যা তাকে কারারুদ্ধ করেছে, তার মনের বিস্তৃতি বাধাগ্রস্ত করেছে, তার অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে—সেসব তাকে বর্জন করতে হবে। সামাজিক ক্ষেত্রে মেলামেশা ও আদান প্রদানের পথে বাধাস্বরূপ দণ্ডায়মান আমাদের আচারগত শুচিতা রক্ষার সব ধারণা। বস্তুত সনাতনপন্থী হিন্দু তার খাওয়ার বাদবিচার, কার সঙ্গে সে বসে খাবে বা না খাবে এই নিয়েই ব্যস্ত—আধ্যাত্মিক ব্যাপার নিয়ে নয়। তার সমগ্র সামাজিক জীবনই রান্নাঘরের বিধিনিয়ম দ্বারা নির্দিষ্ট। মুসলমানদের মধ্যে অবশ্য ঠিক এই ধরনের সংকীর্ণতা নেই, কিন্তু তাদেরও নিজস্ব সংকীর্ণ রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান আছে যেগুলি রুটিনমাফিক পালন করতে গিয়ে তারা নিজ ধর্মের সর্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ বিস্মৃত হয়। তাদের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভবত হিন্দু-দৃষ্টিভঙ্গি অপেক্ষা

অধিক সঙ্কীর্ণ ও অনুর্বর—যদিচ সেই হিন্দু-দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক হিসাবে আজকের সাধারণ হিন্দু নিতান্তই অক্ষম, কারণ চিন্তাধারার সেই জীবনসমৃদ্ধিকারী ঐতিহ্যগত স্বাধীনতা ও পটভূমিকা—দুইই সে হারিয়ে বসেছে।

বর্ণবৈষম্য হিন্দুদের উন্নাসিকতা ও সংকীর্ণতার মূর্ত প্রতীকস্বরূপ। মাঝে মাঝে একটা মত ব্যক্ত হয় যে বর্ণবৈষম্যের মূল আদর্শ বজায় থাকতে পারে যদিচ পরবর্তী কালে তাকে ঘিরে যে সমস্ত দোষত্রুটি ও ক্ষতিকর প্রভাব গড়ে উঠেছিল, সেগুলিকে অবশ্য বর্জন করতে হবে এবং বর্ণ জন্ম নয়, গুণাগুণের দ্বারা ধার্য হবে। কিন্তু এরূপ মতবাদের কোনো অর্থ নেই, এ শুধু আসল প্রশ্নটাকেই বিভ্রান্ত করে তোলে। বর্ণবৈষম্যের উৎপত্তি এবং অগ্রগতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক পর্যালোচনার খানিকটা সঙ্গতি হয়তো আছে; কিন্তু যে যুগে বর্ণবৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছিল, আজ সে যুগে আমরা ফিরে যেতে পারি না তা সুস্পষ্ট এবং আজকের সমাজ সংগঠনে বর্ণ-বৈষম্যের কোনো স্থান নেই। ব্যক্তি বিশেষের গুণাগুণই যদি আজ চরম মাপকাঠি বলে গৃহীত হয় এবং সকলকে যদি সমান সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়, তাহলে বর্ণবৈষম্যের বর্তমান সমস্ত বৈশিষ্ট্যই বিলুপ্ত হবে এবং সেই সঙ্গে বর্ণবৈষম্যও বিলুপ্ত হবে। অতীতে বর্ণবৈষম্যের চাপে শুধু যে কতকগুলি সমাজগোষ্ঠী বা বর্ণসম্প্রদায়ই নিষ্পেষিত হয়ে এসেছে তাই নয়, এটা তত্ত্বজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যকে কারুশিল্প ও কারিগরি থেকে পৃথক করে দিয়েছিল এবং বাস্তব জীবন ও তার সমস্যা থেকে দর্শনকে করেছিল বিচ্ছিন্ন। গতানুগতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত এই বর্ণবৈষম্য অভি-জাত দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত। এই দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন, কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক পরিস্থিতি ও গণতান্ত্রিক আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। ভারতবর্ষে কর্মবিভাগের উপর যে বিশিষ্ট সমাজ সংগঠন গড়ে উঠেছে, তা হয়তো আরও কিছু-দিন বজায় থাকতে পারে, কিন্তু আধুনিক শিল্প যেমন যেমন নূতন নূতন কর্ম বিভক্তির সৃষ্টি করবে, প্রাচীন বহু কর্ম বিভক্তির ধারা বিলুপ্ত করবে, তেমন তেমন এই সব সমাজ সংগঠনের পরিবর্তন সাধিত হবে। আজ পৃথিবীর সর্বত্রই কর্ম বা দায়িত্বের ভিত্তিতে সমাজ সংগঠনের ধারাই প্রবল, বাস্তবনিরপেক্ষ অধিকারবোধের স্থানে কর্মবোধের সংজ্ঞাই আজ ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ভারতের অতীত আদর্শের সঙ্গে এই নূতন সংজ্ঞার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে।

এ যুগের মর্মই হল সাম্যবোধ, যদিচ কার্যত সর্বত্রই তার বিপরীত ঘটছে। ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তির সঙ্কীর্ণ অর্থে অবশ্য আমরা দাস-প্রথার উচ্ছেদ করেছি; কিন্তু পুরানো এই দাস-প্রথার থেকেও অনেক মন্দ আর একটা নূতন ধরনের দাসত্ব আজ সমগ্র পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আমাদের যুগের পৃথিবীতে আজ যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত, তা ব্যক্তির স্বাধীনতার নামে মানুষকে একটা পণ্যসামগ্রী হিসাবে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করছে। আবার অপর-দিকে যদিচ কোনো ব্যক্তি অপরের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হতে পারে না, কিন্তু এখনও পর্যন্ত একটা দেশ বা জাতিকে আর একটা দেশ বা জাতি তার দাসত্বশৃঙ্খলে বেঁধে

রাখতে পারে, এবং এই গোষ্ঠীবদ্ধ বা জাতিগত দাসত্ব আজও যথারীতি স্বীকৃত হয়েই চলেছে। উপরন্তু জাতিবৈষম্যও এ যুগের একটি বৈশিষ্ট্য, তাই আমাদের যুগে শুধু প্রভু-দেশ নয়, প্রভু-জাতিরও অস্তিত্ব রয়েছে।

তবু যুগাদর্শ এবং যুগধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী। ভারতে অন্ততপক্ষে সাম্যপ্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে শারীরিক, মানসিক বা আত্মিক দিক দিয়ে সকলেই সমান বা সকলেই সমান হতে পারে; কিন্তু এর অর্থ হল এই যে সকলের সামনেই সমান সুযোগসুবিধা উন্মুক্ত করে দেওয়া, এবং ব্যক্তি বা সমষ্টির অগ্রগতির পথে কোনো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক বাধাবন্ধন আরোপ না করা। এর অর্থ মনুষ্যজাতির উপর আস্থা এবং একটা বিশ্বাস যে, সুযোগসুবিধা পেলে যে কোনো জাতি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ই উন্নতি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম; এবং এই উপলব্ধি যে, জাতির অন্তর্ভুক্ত কোনো একটা গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের অনুন্নত অবস্থা বা অবনতির জন্য দায়ী তার নিজস্ব কোনো অক্ষমতা নয়, এর জন্য প্রধানত দায়ী তাদের সুযোগসুবিধার অভাব অথবা অপর কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় কর্তৃক দীর্ঘদিনের নিপীড়ন বা নিষ্পেষণ। জাতীয় ক্ষেত্রেই হোক বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেই হোক, আধুনিক জগতে যেসব সত্যিকার উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা যে সকলের মিলিত প্রচেষ্টায়ই সম্ভবপর হয়েছে, এবং কোনো জাতি পিছিয়ে থাকলে সে যে সকলকেই পিছনে টানবে—একথা স্পষ্ট বোঝা প্রয়োজন। সুতরাং সকলকে শুধু সমান অধিকার ও সুযোগসুবিধা দিলেই হবে না; অনুন্নত ও পশ্চাৎপর সম্প্রদায় বা জাতিকে আজ শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পথে বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ করে দেওয়া সকলের অব্যাহত অগ্রগতির জন্যই নিতান্ত প্রয়োজন। ভারতে আজ সকলের সামনে সমান অধিকার ও সুযোগসুবিধার দ্বার উদ্ঘাটিত করে দিলে সঙ্গে সঙ্গে একটা বিপুল কর্মশক্তি ও কর্মদক্ষতার স্রোতও উন্মুক্ত হবে এবং সমগ্র দেশের রূপ বিদ্যুদ্‌গতিতে পরিবর্তিত হবে।

সাম্য প্রতিষ্ঠাই যদি এ যুগের দাবি হয়, তাহলে তার সঙ্গে খাপ খায় এবং তাকে অনুপ্রাণিত করে এমন একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থারও নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু ভারতে বর্তমানে যে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত তা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। স্বেচ্ছাচারিতা শুধু অসাম্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত নয়, স্বেচ্ছাচারিতা জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই অসাম্যকেই সঞ্জীবিত রাখে। এর নিষ্পেষণে পদানত জাতির সমস্ত সৃজনী ও জীবনীশক্তি দমিত হয়ে যায়, তার প্রতিভা ও কর্মক্ষমতার বিকাশ অবরুদ্ধ হয়ে যায় এবং সর্বপ্রকার দায়িত্ববোধ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। যারা এইভাবে নির্যাতিত হয়, তারা নিজেদের আত্মমর্যাদা-জ্ঞান এবং আত্মবিশ্বাসও হারিয়ে ফেলে। ভারতের সমস্ত সমস্যা অতি জটিল বলে মনে হলেও, সেগুলির মূল কারণ এই—তার পুরানো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও কাঠামো প্রায় সম্পূর্ণভাবে অপরিবর্তিত রেখেই ভারত আজ এগিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। এই কাঠামো এবং এর সংশ্লিষ্ট

কায়েমী স্বার্থের পূর্ণ অস্তিত্ব বজায় রাখার উপরই ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতিকে নির্ভরশীল সাব্যস্ত করা হয়েছে, যদিচ উভয় ব্যাপার সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন হতেই হবে, কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনও নিতান্তই প্রয়োজন। গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত সুপরিকল্পিত সমবায় প্রথার দিকেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এই পরিবর্তনের গতি হওয়া উচিত। আর. এইচ্. ট্যনী বলেছেন: 'অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের দিক দিয়ে প্রশ্ন এই নয় যে আমরা স্বাধীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চাই, না একচেটিয়া ব্যবসা চাই; প্রশ্ন হল এই যে আমরা দায়িত্বহীন ও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত একচেটিয়া ব্যবসা চাই, না ব্যবসার দায়িত্বপূর্ণ ও রাষ্ট্রদখলীভূত জাতীয়করণ চাই।' আজকাল ধনতন্ত্রী দেশগুলিতেও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব-ভুক্ত একায়ত্ত শিল্পবাণিজ্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং আরও বৃদ্ধি পাবে। এর আদর্শ এবং ব্যক্তিগত একচেটিয়াবাদের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সংঘর্ষ রয়েছে, তাও ক্রমেই তীব্র হতে থাকবে যতদিন না এই ব্যক্তিগত একচেটিয়াবাদ বিলুপ্ত হয়। অবশ্য গণতান্ত্রিক সমবায় প্রথার অর্থ ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদসাধন নয়, মূল ও প্রধান শিল্পগুলির জাতীয়করণই হল এর ভিত্তি। এই ব্যবস্থা জমিতে সমবায় ও সমষ্টির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে। মূল শিল্পগুলির জাতীয়করণ ব্যতিরেকে এদেশে অধিকন্তু প্রয়োজন সমবায় প্রথায় পরিচালিত কতকগুলি ছোট ছোট শিল্প এবং কুটিরশিল্পের বিস্তার। এরূপ গণতান্ত্রিক সমবায় প্রথা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজন যত্নকল্পিত ও বিরামহীন পরিকল্পনা, যা সর্বদা জনসাধারণের ক্রমপরিবর্তিত প্রয়োজনবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলবে। এর প্রধান লক্ষ্য হবে, সকল দিক দিয়ে জাতির উৎপাদন ক্ষমতার দ্রুত বৃদ্ধি, এবং সেই সঙ্গে জাতির সমগ্র শ্রমশক্তিকে কোনো না কোনো কাজে নিযুক্ত রেখে বেকার সমস্যার অবসান করা। ইচ্ছানুযায়ী কাজ বেছে নেবার স্বাধীনতা সকলেরই থাকা উচিত। এর ফলে যে সকলের আয়ের হার সমান হয়ে যাবে তা নয়, তবে এখনকার চেয়ে সকলের আয়ের ভাগ অনেক বেশি ন্যায্যতর হবে এবং ক্রমেই সে ভাগ সমান হওয়ার দিকেই অগ্রসর হবে। অন্তুতপক্ষে যেসব বিপুল তারতম্যের উপর আজ শ্রেণীবৈষম্য এবং অন্যান্য অসামঞ্জস্য বর্তমান, সেগুলি ক্রমশ মিলিয়ে যাবে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এই পরিবর্তন অনিবার্যভাবেই মুনাফাবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান শোষণপ্রবণ সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটাবে। পরিবর্তিত এই নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে মুনাফাবৃত্তি কিছু কিছু হয়তো থেকে যাবে, কিন্তু আজকের মত সেটাই মানুষের প্রধান প্রেরণাস্বরূপ থাকবে না এবং তার ক্ষেত্রও আর এত বিস্তীর্ণ থাকবে না। সাধারণ ভারতবাসী মুনাফার জন্য মোটেই লালায়িত নয়—একথা বলা নিতান্তই ভুল হবে, তবে এটা ঠিক যে পাশ্চাত্যের মত ভারতে মুনাফাবৃত্তির অতখানি অনুমোদন নেই। এদেশে বিত্তশালী ব্যক্তি হয়তো ঈর্ষার উদ্রেক করতে পারে, কিন্তু বিশেষ ভক্তি বা শ্রদ্ধা উদ্রেক করতে পারে না। যারা সৎ ও জ্ঞানী, দেশের এবং দশের কল্যাণের জন্য যারা আত্মোৎসর্গ করেছে বা নিজেদের সমস্ত ঐশ্বর্যসম্পত্তি

উৎসর্গ করেছে, দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি আজও তাদেরই প্রতি অর্পিত হয়। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে—এমনকি জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গিতেও ভূরি-সঞ্চয়-প্রবৃত্তি কোনো দিন অনুমোদিত হয়নি।

সমবায় প্রথার সঙ্গে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়গত প্রচেষ্টা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার নিবিড় সংযোগ আছে। সুতরাং এদিক দিয়েও এই ব্যবস্থা প্রাচীন ভারতীয় সমাজ আদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের উপরই ছিল তার ভিত্তি। ব্রিটিশ শাসনের নিষ্পেষণে এই গোষ্ঠী বা যৌথ অর্থনৈতিক জীবন, বিশেষত স্বয়ংশাসিত গ্রাম্য পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, যার ফলে ভারতের জনগণ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যতখানি না হোক মানসিক দিক দিয়ে গভীরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রাচীন ব্যবস্থার পরিবর্তে বাস্তব কোনো নূতন ব্যবস্থা তার স্থান গ্রহণ করল না; ফলে ভারতবাসী তাদের স্বাধীন মনোবৃত্তি, দায়িত্ববোধ, সাধারণ মঙ্গলের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষমতা—সবই ক্রমে হারিয়ে ফেলল। যে গ্রাম পূর্বে ছিল দেশের এক একটি প্রাণবন্ত অঙ্গবিশেষ, আস্তে আস্তে সেই গ্রাম হয়ে উঠল পরিত্যক্ত শ্মশানভূমি; ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি কুঁড়েঘর আর এলোমেলো দু'চার জন ব্যক্তির বসতিতে পরিণত হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই গ্রামগুলি কি এক অদৃশ্য যোগসূত্র আঁকড়ে আছে যা পুরাতন স্মৃতি উদ্বেলিত করে। সুতরাং এই যুগযুগান্তের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের সুযোগ নিয়ে গ্রামদেশে আজ কৃষি ও শিল্পে যৌথ ও সমবায়গত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা অনেকাংশে সহজসাধ্য। অবশ্য আজকের দিনে একটা গ্রাম একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ইউনিট বা একক হিসাবে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না (যদিচ কোনো একটা সমবায় বা যৌথকৃষিকার্য কেন্দ্রের সঙ্গে সেই গ্রাম সংযুক্ত থাকতে পারে); কিন্তু এক একটা গ্রাম শাসনব্যবস্থা ও নির্বাচনের ইউনিট হিসাবে স্বচ্ছন্দে গণ্য হতে পারে এবং এই গ্রামগুলি দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত আত্মকর্তৃত্বসম্পন্ন ও স্বয়ংশাসিত রাষ্ট্রীয় ইউনিট হিসাবে কাজ চালাতে পারে এবং নিজেদের জরুরী প্রয়োজন মিটানোর ভার এদের নিজেদের উপরই ন্যস্ত রাখা যায়। আর যদি এই গ্রামগুলিকে নির্বাচনের এক একটা ইউনিট বা কেন্দ্র হিসাবে ধরা হয়, তাহলে তো প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় নির্বাচনের অসংখ্য জটিলতার সমাধান খুবই সহজসাধ্য হয়ে উঠবে। কারণ এতে প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় নির্বাচনে প্রত্যক্ষ ভোটদাতাদের সংখ্যা অনেক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হবে। গ্রামের সমস্ত সাবালক নরনারী কর্তৃক মনোনীত বা নির্বাচিত গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সভ্যরাই এই সমস্ত প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় নির্বাচনের ভোটদাতা হিসাবে গৃহীত হতে পারে। এই ধরনের পরোক্ষ নির্বাচনপদ্ধতির মধ্যে হয়তো কিছু ত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু ভারতীয় পটভূমিকার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে, আমার নিজের মনে হয় যে গ্রামগুলিকেই নির্বাচনের এক একটা ইউনিট হিসাবে ধরা উচিত। এর সাহায্যে অনেক বেশি খাঁটি ও দায়িত্বশীল প্রতিনিধিত্বের প্রবর্তন হবে।

এলাকার ভিত্তিতে প্রতিনিধিদের উপরোক্ত নির্বাচন ছাড়াও কৃষি ও শিল্পের সমবায় ও যৌথসংগঠনগুলি থেকে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে। এইভাবে সংগঠিত রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সংগঠনের মধ্যে এলাকা এবং কর্মসংগঠন—উভয় ভিত্তিতেই জনগণের প্রতিনিধিত্ব থাকবে আর সমগ্র রাষ্ট্রের ভিত্তিতেই থাকবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন। এবং এই ব্যবস্থা যেমন ভারতের অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে, তেমন বর্তমান প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বজায় রাখবে। এতে আকস্মিক বিচ্ছিন্নতার একটা ভাব দেখা দেবে না (একমাত্র ব্রিটিশ সৃষ্ট অবস্থার সঙ্গে ছাড়া), এবং যে অতীত ঐতিহ্যকে জনসাধারণ মনের মধ্যে সযত্নে লালিত রেখেছে, তারই ক্রমবিকাশ হিসাবেই তারা একে গ্রহণ করবে।

ভারতের এই প্রগতি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্তর্জাতিকতার দিক দিয়েও সামঞ্জস্যপূর্ণ; এর ফলে অন্য কোনো দেশের সঙ্গে বিরোধের সম্ভাবনা নেই, বরঞ্চ সমগ্র এশিয়া এবং বিশ্বের শান্তিপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে। ভাবাবেগ ও ঈর্ষাবিদ্বেষে আমাদের মন বিভ্রান্ত হলেও এবং আমাদের মনে এর স্পষ্ট উপলব্ধি না থাকলেও, অখণ্ড বিশ্বরাষ্ট্রের সৃষ্টি আজ অনিবার্য হয়ে উঠেছে, এই ব্যবস্থার ফলে ভারতবর্ষ সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়ণ করতেও সাহায্য করতে পারে। নির্যাতন, নিপীড়ন ও নৈরাশ্যের চরম বিভীষিকা থেকে মুক্ত ভারতবাসী তাদের সংকীর্ণ জাতীয়তা-বোধ পরিত্যাগ করে আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে। ভারতের অতীত ঐতিহ্যের গর্বে গর্বিত ভারতবাসী অন্যান্য জাতির কাছে তার হৃদয় মনকে আবার করে দেবে উন্মুক্ত, এবং এই বিপুল, বিরাট ও রহস্যময় বিশ্বের নাগরিক হিসাবে তারা অন্য সকলের সঙ্গে একত্রে এগিয়ে যাত্রা করবে মানবজাতির সেই চিরন্তন অভিযানের পথে—যে পথের পথপ্রদর্শক ছিল তাদেরই পূর্বপুরুষ।

১১ : বিভক্ত ভারত না শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্র : অথবা বহুজাতি সম্মিলিত সংহত রাষ্ট্র?

মানুষের আশা এবং আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটা সঠিক ভারসাম্য খুঁজে পাওয়া অথবা নিজের চিন্তার উপর নিজের আকাঙ্ক্ষার প্রভাব নিবারণ করা খুবই কঠিন। এই আশা আকাঙ্ক্ষার সমর্থনেই আমরা যুক্তির অন্বেষণ করি এবং তার সঙ্গে খাপ খায় না যেসব বাস্তব তথ্য বা যুক্তি, তা আমরা উপেক্ষা করতেই চেষ্টা করি। সকল বিষয়ে আমি যাতে নির্ভুল বিচার এবং সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারি, ঠিক এই জন্যই আমি সব সময় নিজের ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষা এবং বাস্তব ঘটনার মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করি, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হতে যে কতখানি বাকি থাকে তা আমি জানি, কারণ যেসব চিন্তা, অনুভূতি ও ভাবাবেগের ভিতর দিয়ে আমার ব্যক্তিজীবন গড়ে উঠেছে, সেসব আমি ত্যাগ করতে পারি না—এক অদৃশ্য প্রাচীরের মত সেগুলি আমাকে ঘিরে রয়েছে। এমনিভাবে অন্যান্য

ব্যক্তিরও নানা ভুলভ্রান্তি ঘটতে পারে। ব্যক্তিমানস এবং জাতীয় ঐতিহ্যের দিক দিয়ে একজন ইংরেজ এবং একজন ভারতীয় অনিবার্যভাবেই পরস্পর বিপরীত; সুতরাং ভারতবর্ষ এবং বিশ্বপরিপ্রেক্ষায় ভারতের গুরুত্ব সম্পর্কে এদের দুজনের মতামত এবং দৃষ্টিভঙ্গিও পরস্পর বিপরীত হতে বাধ্য। নিজের শক্তি এবং কার্যকলাপের দ্বারাই ব্যক্তি বা জাতি তাদের নিজ নিজ ভাগ্য রচনা করে। এই অতীত কীর্তি-কলাপের মধ্যেই বর্তমানের উৎস নিহিত; এবং আজ আমরা যা করছি, তাই আবার রচনা করছে আমাদের আগামীকাল এবং ভবিষ্যৎকে। ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতি এইটাকেই 'কর্ম' বলে অভিহিত করেছে। কার্যকারণের মূল সূত্র, ব্যক্তি ও সমষ্টির ভবিতব্য নির্ধারক হল এই 'কর্ম'। অবশ্য শুধু অতীতের কীর্তিকলাপ এবং ইতিহাসই যে অনিবার্যভাবে এই ভবিতব্য বা ভাগ্যকে রূপায়িত করে, তা নয়, এর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ঘটনা বা পরিস্থিতি এবং মানুষের ইচ্ছাশক্তিও কতক পরিমাণে এই ভবিতব্যকে প্রভাবিত করে। কারণ অতীতের কর্মধারা থেকে উৎসারিত অনিবার্য ফলাফলকে পরিবর্তন করবার ক্ষমতা যদি আমাদের নাই থাকত, তাহলে তো আমরা এতদিনে অনিবার্য ভবিতব্যের অমোঘ ও কঠিন বিধানের মধ্যে প্রাণহীন যন্ত্রবিশেষ হয়ে উঠতাম। কিন্তু অন্যান্য ঘটনা বা শক্তির প্রভাব যতই থাক, ব্যক্তি এবং জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপায়ণে এই অতীত 'কর্ম'ই প্রবলতম প্রভাব। অতীত ঐতিহ্যের ভালমন্দ মিলিয়ে যে জাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠে, তাও এই 'কর্মে'রই ছায়ামাত্র।

ব্যক্তি অপেক্ষা জাতির উপরই সম্ভবত এই অতীত ঐতিহ্যধারার প্রভাবটা বেশি। ব্যক্তিকে ছাপিয়ে ওঠে যে নৈর্ব্যক্তিক এবং অবচেতন আশা আকাঙ্ক্ষা, কামনা বাসনা, জাতিভুক্ত অসংখ্য মানুষ তার দ্বারাই প্রধানত পরিচালিত, এবং তাদের গৃহীত কর্মপন্থা থেকে তাদের নিবৃত্ত করা অনেক বেশি কঠিন। নীতিজ্ঞানের বাদবিচারে ব্যক্তিবিশেষ প্রভাবিত হতে পারে, কিন্তু সমষ্টির উপর তার প্রভাব তত নয়; এবং সমষ্টির আয়তন যত বড় হবে, ততই ঐ প্রভাবের তীব্রতা হ্রাস পাবে। এই জন্য, বিশেষভাবে আধুনিক জগতে, মিথ্যা ও অযৌক্তিক প্রচারের দ্বারা একটা জনসমষ্টি বা জাতিকে বিভ্রান্ত করা আজ অনেক বেশি সহজসাধ্য। আবার অন্যদিকে এক একটা জনসমষ্টি বা জাতিই হয়তো সুনীতি বা উন্নত আদর্শের এমন একটা উঁচু স্তরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে (যদিচ তা নিতান্তই বিরল) যে, তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবিশেষও তাদের আত্মস্বার্থ এবং সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতি বা দল ব্যক্তির সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে না।

যুদ্ধ ব্যক্তি ও জাতির এই বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াকে করে তীব্রতর, এবং যুদ্ধের প্রতি-ক্রিয়ার মধ্যে যা সবচেয়ে প্রকট হয়ে ওঠে তা এই যে বহু আয়াসে প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা ও নীতিগত দায়িত্বের আদর্শ থেকে মানুষের ঘটে সম্পূর্ণ বিচ্যুতি। যুদ্ধ বা ধর্ষণ-নীতির সাফল্যই তার যৌক্তিকতার প্রমাণস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়, ফলে হয় এই নীতির ধারাবাহিক অনুসরণ, এবং সাম্রাজ্যতান্ত্রিক প্রভুত্বপরায়ণতা ও প্রভুজাতিত্ববাদের

উৎপত্তি। অপরদিকে পরাজয়ের ফলে পরাজিতের মধ্যে সঞ্চারিত হয় নৈরাশ্যের ক্ষুব্ধতা, উদ্রিক্ত হয় প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোবৃত্তি। উভয়ক্ষেত্রেই বিদ্বেষ এবং হিংসা-বৃত্তি বাড়তে থাকে। নৃশংসতা ও নির্দয়তার সৃষ্টি হয় এবং উভয় পক্ষের কেউই অপর তরফের দৃষ্টিভঙ্গি কি তা বুঝতে চায় না। এই ভাবেই রচিত হয় ভবিষ্যৎ যা নিয়ে আসে আরও যুদ্ধ, আরও সংঘাত, সংঘর্ষ, এবং সেই সঙ্গে আসে সেসবের সমস্ত ফলাফল।

ভারত এবং ইংলন্ডের মধ্যে গত দুই শতাব্দীর যে দায়-পড়া যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে তার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে যে 'কর্ম' বা ভাগ্য সেটাই তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে দিচ্ছে। এই 'কর্মে'র জালে আমরা বাঁধা পড়ে আছি, তাই যতবারই আমরা অতীতের বোঝা ঝেড়ে ফেলে নূতন পথে নূতন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছি, ততবারই আমরা ব্যর্থ হয়েছি। দুর্ভাগ্যবশত যুদ্ধের গত পাঁচ বছরের ঘটনাপুঞ্জ আমাদের এই দুর্ভাগা 'কর্ম'কেই পরিপোষণ করেছে, ফলে পরস্পরের কোনো আপোষ মীমাংসা অথবা একটা সুস্থ সম্পর্ক স্থাপন করা কঠিন করে তুলেছে। অন্যান্য সব কিছুর মত, গত দুই শতাব্দীর ইতিহাসে ভাল এবং মন্দ দুইই জড়িয়ে আছে। সাধারণ ইংরেজের কাছে এর ভালটাই মন্দকে ছাপিয়ে ওঠে, আবার সাধারণ ভারতবাসীর সামনে মন্দ দিকটাই এত বিরাট যে তা সমগ্র যুগটাকেই অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিন্তু ভাল বা মন্দের একটার ওজন যাই হোক না কেন, এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে জোর করে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তা থেকে শুধু তিক্ত বিদ্বেষ ও বিমুখতারই সৃষ্টি হয়—শুধু অসৎ ফলাফলই প্রসূত হয়।

সুতরাং ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আজ শুধু আবশ্যক নয়, নিতান্ত অনিবার্যও বটে। ১৯৩৯ সালের শেষভাগে অর্থাৎ যুদ্ধ শুরু হবার অল্প কিছুদিন পরে এবং আবার ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে ভারত এবং ইংলন্ডের পারস্পরিক সম্মতিতে এই ধরনের একটা পরিবর্তনের সামান্য সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু মৌলিক কোনো পরিবর্তনের ভীতির জন্য এই সম্ভাবনা এবং সুযোগ নষ্ট হয়। কিন্তু এ পরিবর্তন আসা অনিবার্য। তবে কি আপোষ মীমাংসার পথ একেবারে শেষ হয়ে গেছে? গভীর সংকটের মুহূর্তে অতীতের মোহান্ধতা খানিকটা কেটে যায়, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে তখন বর্তমানকে বিচার করা হয়। কিন্তু আজ সেই অতীত তার শতগুণে বর্ধিত তিক্ততা নিয়ে আবার সামনে দাঁড়িয়েছে। তখনকার আপোষ মীমাংসার মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে আজ সে মনোভাব হয়েছে তিক্ত ও কঠোর। একটা মীমাংসা অবশ্যই হবে, তবে তা আরও সংঘাত-সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে হোক বা না হোক, সেটা আন্তরিক, সহযোগিতামূলক অথবা সত্যিকার মীমাংসা হবে কি না তা সন্দেহজনক। সম্ভবত ঘটনাপরিস্থিতির নিদারুণ চাপে ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়তো উভয় পক্ষই একটা মীমাংসা করতে বাধ্য হবে, কিন্তু সে মীমাংসা পরস্পরের প্রতি অসন্তোষ ও সন্দেহের অবসান করতে পারবে না। যে মীমাংসার ভিতর ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে আবদ্ধ

রাখবার সামান্যতম চেষ্টাও থাকবে, সে মীমাংসা কিছুতেই ভারতবাসী স্বীকার বা গ্রহণ করবে না। যে মীমাংসার ফলে ভারতে মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র বজায় থাকার সম্ভাবনা, সে মীমাংসা কখনই টিকতে পারে না।

ভারতবর্ষে আজ জীবনের মূল্য নিতান্তই সস্তা, তাই সে দারিদ্র্যোদ্ভূত শূন্যতা, কুশ্রীতা, হীনতায় আচ্ছন্ন। অন্তর্নিহিত অথবা বাহ্যিক নানা কারণে ভারতবর্ষের আবহাওয়াই নির্বীর্যতায় পরিপূর্ণ, কিন্তু আসলে এর মূলে আছে দারিদ্র্য ও অভাব। আমাদের দেশে জীবনযাত্রার স্তর অত্যন্ত নিচু, আর মৃত্যুর হার অত্যন্ত উঁচু। শিল্প-বাণিজ্যে উন্নত এবং ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ দেশগুলি অনুন্নত ও দরিদ্র দেশগুলিকে সেই চোখে দেখে, যে চোখে ধনী—দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে। সুখ ঐশ্বর্য ও সমারোহের প্রাচুর্যে ধনী তার জীবনযাত্রার স্তরকে ঊর্ধ্বে তোলে, রুচিবিলাসী হয়ে ওঠে এবং দরিদ্রকে তাদের সুরুচি ও মার্জিত শিক্ষাদীক্ষার অভাবের জন্য দোষী করে, দরিদ্রের উন্নত হবার সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে, সেই দারিদ্র্য ও তার সংশ্লিষ্ট কুফলগুলি দেখিয়েই তাদের আরও বঞ্চিত রাখার যুক্তি প্রমাণ করে।

ভারতবর্ষ দরিদ্র নয়। একটা দেশকে সমৃদ্ধ করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সে সমস্তই ভারতবর্ষের প্রচুর পরিমাণে আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতবাসীর দারিদ্র্য আজ চরম। একটা সুপ্রাচীন ও সুমহান সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হল এই ভারতবর্ষ, এবং তার ভবিষ্যৎ সাংস্কৃতিক বিকাশের সম্ভাবনাও প্রচুর, কিন্তু সাংস্কৃতিক উন্নতির পরিপোষক অনেক কিছু মালমশলার তার অভাব আছে। এর কারণ বিভিন্ন, কিন্তু মূল কারণ এই যে, সেসব থেকে ভারতকে ইচ্ছাকৃতভাবে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। অভাবের কারণ যখন এই, তখন দেশবাসীকে নিজ বলে অগ্রগতির পথে সব বাধা লঙ্ঘন করতে হবে, সকল অভাব পূরণ করে নিতে হবে; এবং তা তারা আজ যে না করছে এমনও নয়। দ্রুত অগ্রগতির জন্য যে সম্পদ, যে বিচক্ষণতা, যে দক্ষতা ও কর্মশক্তি প্রয়োজন তা ভারতের পূর্ণমাত্রায় আছে, তা আজ স্পষ্ট বোঝা যায়। তার পিছনে রয়েছে যুগযুগান্তর সঞ্চিত সাংস্কৃতিক ও মানসিক অভিজ্ঞতা। কি তত্ত্ব, কি প্রয়োগের দিক থেকে বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতিসাধন করে ভারত বিপুল শিল্পবাণিজ্যসম্পন্ন দেশে পরিণত হতে পারে। বিজ্ঞানের প্রয়োগের দিক দিয়ে ভারতের কৃতিত্ব কম নয়, যদিচ নানা দিক দিয়ে সে সীমাবদ্ধ এবং বিজ্ঞানের সেবায় নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ থেকে তার তরুণ তরুণীরা বঞ্চিত। অবশ্য আমাদের দেশের আয়তন এবং সম্ভাবনার কথা স্মরণ করলে এই কৃতিত্ব তেমন বেশি কিছু নয়, কিন্তু যখন দেশের সমস্ত শক্তি উন্মুক্ত হবে, যখন সুযোগসুবিধার অভাব থাকবে না, তখন কি ঘটতে পারে তারই সঙ্কেত পাওয়া যায় এই কৃতিত্বের ইতিহাস থেকে।

ভারতের এই অব্যাহত অগ্রগতির পথে শুধু দুটো অন্তরায় সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। একটা হল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং ভারতের উপর বাহ্যিক ঘটনার চাপ; দ্বিতীয়টি হল দেশের অভ্যন্তরে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতানৈক্য। অবশ্য শেষ পর্যন্ত শেষোক্তটিই প্রধান হয়ে উঠবে। ভারতবর্ষ যদি আজ দ্বিধা বা বহুধা

বিভক্ত হয়ে যায়, এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সে যদি একটা সম্পূর্ণ ইউনিট বা একক হিসাবে না দাঁড়াতে পারে, তাহলে তার অগ্রগতি বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হবে। এর ফলে প্রত্যক্ষভাবে ভারতের শক্তিক্ষয় হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চেয়েও মারাত্মক হবে যারা ভারতকে আবার ঐক্যবদ্ধ করতে চায় এবং যারা চায় না তাদের অন্তরের বিক্ষোভ ও দ্বন্দ্ব। নূতন নূতন কায়েমী স্বার্থ সৃষ্টি হবে, যে-কোনো পরিবর্তন বা প্রগতির পথে যারা প্রাণপণে বাধা সৃষ্টি করবে। 'কর্মে'র নূতন দুষ্ট রূপ আমাদের ভবিষ্যৎকে ধাওয়া করবে। একটা ভুল আর একটা ভুলকেই ডেকে নিয়ে আসে, অতীতে তা প্রমাণিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তাই হতে পারে। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে নিদারুণ বিপর্যয়কে এড়ানোর জন্য হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবে একটা ভুল পথকেই গ্রহণ করতে হয়, এই আপাতবৈষম্যই হল রাজনীতির মূল প্রকৃতি; একথা কেউ জোর করে বলতে পারে না যে, কল্পিত সেই সম্ভাব্য বিপর্যয়টাই বেশি ক্ষতিকর হবে, না বর্তমান ভুলের পরিণামটাই বেশি ক্ষতিকর হবে। অনৈক্যের চেয়ে ঐক্য অনেক বেশি কল্যাণকর, কিন্তু যে ঐক্য জোর করে চাপানো হয়, সে ঐক্য মিথ্যা এবং বিপজ্জনক, বিস্ফোরণের সম্ভাবনায় পূর্ণ। সত্যকার ঐক্যের অর্থ হৃদয় মনের ঐক্য, পরস্পরের নিবিড় একাত্মতা, এবং ঐক্যের প্রতি কোনো আক্রমণকারীকেও একত্র সম্মুখীন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে সমগ্র ভারতবর্ষ এই ঐক্যের সূত্রে গ্রথিত, কিন্তু অন্যান্য নানা শক্তি ও ঘটনার চাপে, এই ঐক্যবোধ আজ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। এই সমস্ত প্রভাব ও শক্তি হয়তো অস্বাভাবিক ও সাময়িক এবং সেগুলি একদিন কেটে যাবে, কিন্তু আজকের দিনে সেগুলি বেশ প্রাধান্য বিস্তার করে আছে এবং কোনো মতেই উপেক্ষণীয় নয়।

এসবের জন্য অবশ্য আমরাই দায়ী, এবং তার ফলাফলও আমাদের ভোগ করতে হবে। কিন্তু ভারতে এ বিভেদ রচনায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে যে অংশ গ্রহণ করেছে তা ভুলে যেতে অথবা ক্ষমা করতে আমি পারি না। ব্রিটিশরা ভারতের অন্য যেসব ক্ষতি করেছে কালে তা পূরণ হয়ে যাবে, কিন্তু এই বিভেদজনিত পীড়া আমাদের আরও অনেকদিন ভোগ করতে হবে। অনেক সময় যখন ভারতের কথা চিন্তা করি তখন আয়র্লান্ড এবং চীনের কথা আমার মনে জাগে। ভারতের সঙ্গে এবং পরস্পরের সঙ্গে তাদের পার্থক্য অনেক, তাদের অতীত ও বর্তমান সমস্যার প্রকৃতিও বিভিন্ন, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই তিন দেশের মিলও আছে অনেক। ভবিষ্যতে আমাদেরও কি সেই একই পথে চলতে হবে?

'জেল জার্নি' গ্রন্থে জিম ফেলান্ কারাজীবন মানুষের চরিত্রকে কিভাবে প্রভাবিত করে, তা বলেছেন, এবং যারাই দীর্ঘদিন কারাবাস করেছে তারা প্রত্যেকেই জানে যে তাঁর উক্তি সম্পূর্ণ সত্য। তিনি লিখেছেন: 'কারাজীবন...মনুষ্য চরিত্রকে শতগুণ বেশি করে প্রতিফলন করে। মানুষের প্রত্যেকটি সামান্যতম দুর্বলতাও পরিস্ফুট হয়, গুরুত্বলাভ করে, জাগ্রত হয়ে ওঠে, ফলে অপরাধী কোনো একটা বিশেষ দুর্বলতা-দুষ্ট আর থাকে না, ক্রমশ সে হয়ে ওঠে অপরাধী-বেশী মূর্তিমান দুর্বলতা।'

বিদেশী শাসন একটা জাতির চরিত্রেও এ ধরনেরই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। অবশ্য এই এক প্রকার প্রতিক্রিয়াই যে হয় তা নয়, অপরদিকে এই শাসনের প্রতিরোধের ভিতর দিয়ে জাতির মহত্তর গুণগুলিরও বিকাশ হয় এবং আত্মপ্রত্যয় গড়ে ওঠে। কিন্তু বিদেশী শাসক দোষগুলিরই প্রশ্রয় দেয় এবং গুণগুলিকে দমন করতে চেষ্টা করে। জেলে যেমন অপরাধীদের ভিতর থেকে ওয়ার্ডার সৃষ্টি হয় যাদের প্রধান গুণ অনান্য অপরাধীদের গতিবিধি সম্বন্ধে গুপ্তচরবৃত্তি, তেমনি আবার বিদেশী-শাসিত দেশে তোষামোদকারী ক্রীড়নক ব্যক্তির অভাব হয় না, যারা কর্তৃত্বের তকমা এঁটে শাসকের অনুজ্ঞা পালনে নিযুক্ত হয়। আবার এমন অনেকে থাকে যারা স্বেচ্ছায় এবং সচেতনভাবে বিদেশী শাসকের পক্ষভুক্ত হতে পারে না; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা প্রভুশক্তির নীতি ও চক্রান্ত দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়।

ভারতবর্ষকে খণ্ডবিখণ্ড করবার নীতি, অথবা ভারতের উপর জোর করে ঐক্য চাপানো হবে না, এই নীতি যদি আমরা গ্রহণ করি, তাহলে হয়তো তার ফলাফল সম্পর্কে শান্তভাবে বিচার করা সম্ভব হবে এবং সকলের মঙ্গলের জন্যই ভারতে ঐক্য-স্থাপন একান্ত প্রয়োজন তা আমরা উপলব্ধি করব। অপরদিকে আবার এই বিপদও ঘটতে পারে যে একবার এই ভুল পথে পা বাড়াবার ফলে আরও অনেক ভুলই আমরা করতে থাকব। ভুল পথে একটা সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে হয়তো আমরা আরও অনেক নূতন সমস্যার সৃষ্টি করব। ভারতবর্ষকে যদি দুই বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত করতে হয়, তাহলে ভারতের মধ্যে দেশীয় রাজ্যগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, কারণ দূরে সরে থাকার এবং নিজেদের স্বেচ্ছাচারী শাসন বজায় রাখার জন্য তারা আরও একটা অছিলা পাবে।*

মুসলিম লীগ আজ হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই ধর্মের ভিত্তিতে ভারতকে

* একথা ঠিক যে সমগ্রভাবে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি নিজেদের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য যেমন উদ্‌গ্রীব, অপরদিকে তারা আবার শক্তিশালী ভারতীয় ফেডারেশান গঠন করার জন্যও খুব ব্যগ্র—এই ফেডারেশানে অবশ্য তারাও হবে সমানাধিকার প্রাপ্ত সভ্য। দেশীয় রাজ্যগুলির বহু বিশিষ্ট মন্ত্রী ও রাষ্ট্রনীতিকরা দেশবিভাগের প্রস্তাবের বিরোধিতাই করেছেন, এবং স্পষ্ট জানিয়েছেন যে এইভাবে দেশবিভাগ হলে ভারতের বেশির ভাগ দেশীয় রাজ্যই সরে দাঁড়াবে এবং বিভক্ত অংশের কোনোটির সঙ্গেই তারা সংযুক্ত হতে অস্বীকার করবে। ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান সার সি. পি. রামস্বামী আয়ার দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রীদের মধ্যে সর্বাধিক দক্ষ এবং অভিজ্ঞ (যদিচ তাঁর স্বেচ্ছাচারিতা ও দমননীতির জন্য তিনি খ্যাত)। দেশীয় রাজ্যের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখার তিনি যেমন একজন উৎসাহী সমর্থক, আবার 'পাকিস্থান' বা অনুরূপ কোনো দেশবিভাগের তিনি তেমনই একাগ্র ও তীব্র বিরোধী। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ্ ওয়ার্লড এ্যাফেয়ার্স-এর বোম্বাই শাখার একটি অধিবেশনে তিনি ১৯৪৪ সালের ৬ই অক্টোবরের বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন : 'যদি এমন একটা ব্যবস্থার প্রচলন হয় যাতে ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ইউনিটগুলির স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অধিকার বজায় থাকবে এবং যাতে বিভিন্ন ইউনিটগুলি

দ্বিখণ্ডিত করবার কথা ভাবছে। কিন্তু এই দুটি ধর্ম ভারতের সর্বত্র যেভাবে বিস্তৃত, তাতে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করলেও এই দুটি সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এমনকি যে যে এলাকায় যে সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেইভাবেই যদি এলাকা ভাগ করা হয়, তাহলেও সেই এলাকায় প্রচুর সংখ্যক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি থেকেই যাবে। সুতরাং সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে একটার পরিবর্তে আরও বহু সমস্যার সৃষ্টি হবে। অন্যান্য ধর্মমতাশ্রয়ীরা, যেমন ধরা যাক শিখ সম্প্রদায়—তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুটো বিভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য হবে। একটা সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার ও স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে অন্যান্য সম্প্রদায়—যদিচ তারা সংখ্যালঘু—তাদের সেই স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হবে এবং স্পষ্ট-ব্যক্ত একান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারত

পরস্পরের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় আইন ও শাসন সংগঠন গড়ে তুলতে এবং কার্যকরী করতে অংশগ্রহণ করতে পারে—এরূপ ব্যবস্থায় প্রত্যেক দেশীয় রাজ্য অবশ্যই যোগদান করবে, অন্ততপক্ষে আমার মতে তাদের প্রত্যেকেরই যোগদান করা কর্তব্য। এরূপ একটি সংগঠন ভারতের অভ্যন্তরে এবং বাইরে সুষ্ঠুভাবে জাতীয় রাষ্ট্রসংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হবে। ভারতের অভ্যন্তরে ইউনিটগুলি সমান মর্যাদা ও অধিকারের সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে—এবং এ সম্পর্কে সার্বভৌমত্বের কোনো প্রসঙ্গই উঠতে পারে না, যদিচ কেন্দ্রীয় শাসন সংগঠনের অবশিষ্ট এবং অন্যপ্রকার সমস্ত অধিকারই দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত ও কার্যকরী করা হবে।' তিনি আরও বলেন, 'আমার মূল বক্তব্য এই যে কোনো একটা ব্যবস্থার ফলে যদি যেসব ব্যাপারে দেশীয় রাজ্য ও ব্রিটিশভারত উভয়ই সমভাবে সম্পৃক্ত, সেসব পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন স্থাপিত হয়, তাহলে ইতিপূর্বে সর্তমূলক অধিকার তার যাই থেকে থাকুক, কোনো দেশীয় রাজ্য যদি এই সংগঠনে যোগদান না করে, অথবা সেই ব্যবস্থানুযায়ী ভারত শাসনের উদ্দেশ্যে যেসব রাজনৈতিক রীতি পদ্ধতি বা আদর্শ স্থাপিত হবে, সেগুলি একনিষ্ঠভাবে পালন না করে, তবে সেই দেশীয় রাজ্যটির অস্তিত্ব লোপ পাওয়াই উচিত।...যদিচ আমি জানি যে এর ফলে খানিকটা বিতর্কের সৃষ্টি হবে তবুও আমি একথাটার উপর জোর দিয়েই বলছি যে কোনো দেশীয় রাজ্য জনসাধারণের সুখসমৃদ্ধির দিক দিয়ে যদি ব্রিটিশ ভারতের চেয়ে অগ্রগামী না হয়, অন্ততপক্ষে তার সমতুল্য না হতে পারলে, সেই দেশীয় রাজ্যটির অস্তিত্ব রক্ষারই কোনো অধিকার নেই।'

রামস্বামী আয়ার আরও বলেছেন যে ভারতের ৬০১টি দেশীয় রাজ্যকে সমভিত্তিতে দেখা অসম্ভব। তাঁর মতে ভারতের নূতন গঠনতন্ত্রে এই সংখ্যা কমিয়ে পনেরো বা কুড়িটিতে নামাতে হবে, অবশিষ্ট রাজ্যগুলি বৃহত্তর দেশীয় রাজ্য অথবা প্রদেশগুলির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তবে রামস্বামী আয়ার সম্ভবত দেশীয় রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ শাসন সংস্কারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না, অথবা তিনি এ ব্যাপারটিকে গৌণ বিবেচনা করেন। যদিচ এই কারণে, বিশেষত যেসব দেশীয় রাজ্য অন্যান্য দিক দিয়ে যথেষ্ট অগ্রসর, এর ফলে সেই সব দেশীয় রাজ্যে কর্তৃপক্ষ ও প্রজাদের মধ্যে সংঘাত সংঘর্ষের বিরতি নেই।

থেকে বিচ্ছিন্ন হতে তাদের বাধ্য করা হবে। এলাকায় এলাকায় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ই সেই এলাকার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে—এই নীতিই যদি আমরা স্বীকার করি, তাহলে বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্ত করবার প্রশ্নে সমগ্র ভারতের ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরুদের মতামতকে গ্রাহ্য না করার কোনো কারণ নেই। এই নীতির যুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকা তার স্বাধীন সত্তার দাবি করতে পারে এবং ফলে ভারতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সৃষ্টি হবে—এটা ভারতের পক্ষে একটা অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য পরিণতি। আর তাও যুক্তিসঙ্গতভাবে কোনো মতে করা যাবে না, কারণ ভারতের ধর্মসম্প্রদায়গুলি সমগ্র দেশের মধ্যে অত্যন্ত বেশি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং পরস্পর-জড়িত।

যেখানে জাতিসমস্যা এই ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে, সেখানেও পৃথগীকরণ দ্বারা সে সমস্যার সমাধান করা অত্যন্ত দুরূহ। কিন্তু ধর্মই যেখানে একমাত্র মাপকাঠি, সেখানে তো এই ধরনের সমস্যার কোনো যুক্তিসঙ্গত সমাধান একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এটা হল মধ্যযুগীয় একটা সংস্কারের দিকে প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টা মাত্র; বর্তমান জগতের পরিস্থিতির সঙ্গে এটা সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন।

বিচ্ছিন্ন হবার প্রশ্নকে যদি আমরা অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষায় বিচার করি, তাহলে দেখা যায় যে সমগ্রভাবে ভারতবর্ষ একটা শক্তিশালী ও প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ইউনিট। যে কোনো ভাগ-বিভাগই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভারতকে দুর্বল করে ফেলবে; তার এক অংশ আর এক অংশের উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হবে। হিন্দু এবং মুসলমান প্রধান এলাকা—এই ভিত্তিতে যদি ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়, তাহলে ভারতের প্রায় সমগ্র খনিজ সম্পদ এবং শিল্প-এলাকা হিন্দু অংশের ভিতরেই অন্তর্ভুক্ত হবে। হিন্দু অঞ্চলগুলি অবশ্য অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ততটা আঘাতপ্রাপ্ত হবে না। কিন্তু মুসলিম অঞ্চলগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনগ্রসর এবং অনেক ক্ষেত্রে ঘাটতি অঞ্চলে পরিণত হবে, বাইরের থেকে অনেকখানি সাহায্য না পেলে সেগুলির টেকাই কঠিন হবে। কাজেই দেখা যায় যে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, আজ বিচ্ছিন্ন হবার দাবি যাদের সবচেয়ে বেশি উগ্র, তারাই হবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। এটা তারা কতকাংশে উপলব্ধি করেছে বলেই আজ তারা বলছে যে, ভারতকে এমনভাবে ভাগ করতে হবে যাতে তাদের ভাগে যেন অর্থনৈতিক ভারসাম্য সুরক্ষিত এলাকা পড়ে। এরূপ বিভাগ কোনো ক্রমেই সম্ভব কি না জানি না, কিন্তু আমার তো এ-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সে যাই হোক, এরূপ কোনো প্রচেষ্টার অর্থই হল যে হিন্দু এবং শিখ অধ্যুষিত বহু এলাকাকে জোর করে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন এই সমস্ত এলাকার সঙ্গে সংযুক্ত করে দিতে হবে। আত্মকর্তৃত্বের নীতি প্রয়োগের এটা একটা অদ্ভুত পদ্ধতি বটে! এ থেকে আমার সেই ব্যক্তির গল্প মনে পড়ে যায়—যে তার পিতামাতাকে হত্যা করে, তারপর বিচারালয়ে গিয়ে অনাথ হিসাবে দয়া প্রার্থনা করে!

এছাড়া আরও একটা অদ্ভুত বৈষম্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদিচ সমস্ত প্রশ্নটা উত্থাপিত হয়েছে আত্মকর্তৃত্বের নীতির দোহাই দিয়ে, অথচ এই আত্মকর্তৃত্ব নির্ধারণের ব্যাপারে

গণভোটের পদ্ধতিকে হয় সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হচ্ছে, অথবা যেখানে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা চলে না সেখানে বলা হচ্ছে যে শুধু মুসলমানদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। বাঙলা এবং পাঞ্জাবে শতকরা ৫৪ জন হল মুসলমান এবং বাকি ৪৬ জন অমুসলমান। গণভোটের উপরোক্ত বিকৃত প্রয়োগ অনুযায়ী ঐ শতকরা ৫৪ জনই ভোটের একমাত্র অধিকারী, তারাই বাকি ৪৬ জনেরও ভাগ্যনির্ধাতা এবং এই ৪৬ জনের কোনো মতামত বা বক্তব্যই গ্রাহ্য নয়। এইভাবে চললে হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে শতকরা মাত্র ২৮ জনই বাকি ৭২ জনের ভাগ্যনির্ধারণ করবে।

কোনো বিবেচক ব্যক্তি কি করে এই ধরনের অসম্ভব ও অবাস্তব পরিকল্পনা পেশ করতে পারে, অথবা অন্যের দ্বারা সেটা স্বীকৃত হবার আশা রাখে, এটা বোঝা শক্ত। তাছাড়া এই সমস্ত অঞ্চলে এই প্রশ্নের উপর সত্যসত্যই কতজন মুসলমান দেশবিভাগের পক্ষে ভোট দেবে, তা ভোটগ্রহণের ব্যাপার সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত, আমি কেন, কেউই বোধহয় এখন বলতে পারে না। তবে আমার ধারণা যে তাদের মধ্যে অনেকেই, এমনকি হয়তো বেশির ভাগই দেশবিভাগের বিপক্ষেই ভোট দেবে। আমাদের দেশে বহু মুসলমান সংগঠনও এর বিরুদ্ধে। আর হিন্দু, শিখ, খৃস্টান, পার্শী প্রভৃতি প্রত্যেক অমুসলমান মাত্রই দেশবিভাগের চরম বিরোধী। আসলে যেসব এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যালঘু এবং যেসব এলাকা শেষ পর্যন্ত ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত থেকে যাবে, শুধু সেই সব স্থানের মুসলমানদের মধ্যেই বিশেষ করে দেশবিভাগের পক্ষপাতী একটা মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। যেসব এলাকা বা প্রদেশে মুসলমান সংখ্যাধিক্য, সেখানে এই মনোভাবটা তাদের মধ্যে তত তীব্র নয়; কারণ সেখানে অন্য সম্প্রদায়গুলিকে ভয় করার কোনো হেতু নেই, তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে সম্পূর্ণ সক্ষম। শতকরা ৯৫ জন যেখানে মুসলমান, সেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এই মনোভাব একেবারেই অনুপস্থিত। সেখানকার পাঠানজাতি সাহসী এবং সম্পূর্ণ আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন, ভীতি-পীড়ায় পীড়িত নয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে মুসলিম লীগের ভারতবিভাগের প্রস্তাব মুসলমান সংখ্যাধিক্য এলাকায় বিশেষ সমর্থন পায়নি, যতটা পেয়েছে সেই সব এলাকায় যেখানে মুসলমানরা আসলে সংখ্যালঘু এবং যেগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্তই থেকে যাবে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, দেশবিভাগের ফলাফল চিন্তা না করেই ক্রমশ অধিক সংখ্যক মুসলমান একটা মনোবেগ থেকে দেশবিভাগের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। বস্তুত এ প্রস্তাবটা এ পর্যন্ত অস্পষ্টই রয়ে গেছে, বহু অনুরোধ সত্ত্বেও এই প্রস্তাবের সংজ্ঞা বা তাৎপর্য ব্যক্ত করার কোনো প্রচেষ্টা আজও হয়নি।

আমার মনে হয় যে, মুসলমানদের মধ্যে এই ধরনের মনোভাব খানিকটা কৃত্রিমভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং মুসলমানদের মানসে তার সত্যকার কোনো শিকড় নেই। কিন্তু সাময়িক কোনো একটা ভাবাবেগের গুরুত্বও অনেক সময় ঘটনাপরিস্থিতিকে প্রভাবিত করতে অথবা নূতন অবস্থার সূচনা করতে সক্ষম হয়। স্বাভাবিক অবস্থায়, সময়ে সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী আপোষ মীমাংসা আপনা থেকেই হয়ে যায়; কিন্তু

ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতি ঠিক স্বাভাবিক নয়, এখানে সমস্ত ক্ষমতাই বিদেশী শাসকের হাতে কেন্দ্রীভূত, কাজেই এ অবস্থায় যে কোনো অঘটনই ঘটতে পারে। এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই যে, মীমাংসাকারী দলগুলির সদিচ্ছা এবং সাধারণ লক্ষ্যের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ব্যতিরেকে কোনো সত্যিকারের মীমাংসা হওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য যুক্তিসঙ্গত যে কোনো আত্মত্যাগেরই সার্থকতা আছে। প্রত্যেক দল বা জাতি শুধু যে নামে বা কার্যত স্বাধীন হবে, এবং সকলেই উন্নতির সুযোগসুবিধা সমভাবে পাবে, তাই নয়, তাদের মনে স্বাধীনতা এবং সমান মর্যাদা লাভের অনুভূতিও সঞ্চারিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আজ যদি যুক্তিহীন ভাবাবেগের অন্ধতা থেকে আমরা নিজেদের মুক্ত করতে পারি, তাহলে কেন্দ্রীয়ভাবে শক্তিশালী সূত্রে গ্রথিত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির যথাসম্ভব বেশি স্বায়ত্তশাসন দান করে আমাদের এরূপ স্বাধীনতা লাভের একটা উপায় উদ্ভাবন করা খুব কঠিন নয়। তাছাড়া সোভিয়েট রাশিয়ার মত এই সমস্ত বড় বড় প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যেই আবার ছোট ছোট স্বয়ংশাসিত ইউনিট স্থাপন করাও অসম্ভব নয়। উপরন্তু, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুবিধা ও স্বার্থ সংরক্ষণের অনুমেয় সকল প্রকার ব্যবস্থাও গঠনতন্ত্রের মধ্যে সন্নিবেশিত করা যেতে পারে।

এ সমস্তই করা সম্ভব, কিন্তু তবু জানা-অজানা কত রকম কার্যকারণ, বিশেষত ব্রিটিশনীতির প্রভাবের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ যে ঠিক কি ভাবে রূপায়িত হয়ে উঠবে, তা আমি এখনও জানি না। বিভক্ত অংশের মধ্যে ক্ষীণ একটা যোগসূত্র রেখে হয়তো ভারতের কোনো একটা বিভাগ জোর করেই করা হবে, কিন্তু তা যদি হয় তাহলেও আমার স্থির বিশ্বাস যে ভারতবাসীর মূল ঐক্যবোধ এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ক্রমবিকাশ এই বিভক্ত অংশগুলিকে আবার কাছে টেনে আনবে এবং তখনই ভারতে সত্যকার ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

ভারতের এই অন্তর্নিহিত ঐক্য তার ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকেই উৎসারিত। তাছাড়া বিশ্বের বর্তমান ঘটনাবলীর ধারাও এই ঐক্যবোধের অনুকূল। আমাদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা যে ভারতবর্ষ মূলত একটি জাতি; মিস্টার জিন্না অবশ্য দুই-জাতি-তত্ত্ব উত্থাপন করেছেন, এবং সম্প্রতি ভারতের অন্যান্য কয়েকটি ধর্মসম্প্রদায়কে উপজাতি হিসাবে বর্ণনা করে তিনি রাজনৈতিক পরিভাষায় আরও একটি বুলি যোগ করেছেন। বস্তুত, একটা জাতি বলতে মিস্টার জিন্না একটা ধর্মকেই বোঝেন। কিন্তু আজকের দিনে সাধারণত জাতিত্বের সংজ্ঞা এইভাবে বিবেচিত হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষ এক জাতি না দুই জাতি হিসাবে গণ্য হবে, তাতে কিছু আসে যায় না; কারণ জাতিত্বের আধুনিক সংজ্ঞা মোটেই রাষ্ট্রভিত্তিক নয়। জাতিভিত্তিতে রাষ্ট্র এত ক্ষুদ্রায়তন হবে যে এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে স্বাধীন সত্তা বজায় রাখাই দুষ্কর। এমনকি বৃহদায়তন জাতীয় রাষ্ট্রগুলি আসলে স্বাধীন কি না তাও সন্দেহজনক। তাই আজ জাতিভিত্তিতে আলাদা আলাদা রাষ্ট্রের পরিবর্তে বহু জাতির সম্মিলিত রাষ্ট্র বা ফেডারেশন গড়ে

তোলবার দিকেই সকলে এগিয়ে চলেছে। এই বিশিষ্ট ভাবধারার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল সোভিয়েট ইউনিয়ন। মূল একটা জাতীয়তাবোধে সুগ্রথিত হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও আসলে বহুজাতি সম্মিলিত রাষ্ট্র। ইউরোপে হিটলারী অভিযানের পিছনে শুধু যে নাৎসীদের জয়লিপ্সা ছিল তা নয়, যে রীতিনীতি থেকে ইউরোপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রাষ্ট্রের অস্তিত্বের উদ্ভব হয়েছিল, সেই রীতি পরিবর্তন কল্পে যেসব নূতন শক্তি উত্থিত হয়েছিল, হিটলারী ধর্ষণনীতি তারই একটা প্রকাশ। এখন অবশ্য হিটলার-বাহিনীগুলি দ্রুতগতিতে পিছু হটে আসছে অথবা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেই সঙ্গে ইউরোপে বৃহত্তর একটা সংহত রাষ্ট্র গড়ে তোলবার পরিকল্পনা একেবারে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে না।

সুপ্রাচীন ত্রিকালদর্শীর মত মিস্টার এইচ্. জি. ওয়েল্স বহুদিন ধরে বলে আসছেন যে মানুষের সভ্যতা আজ একটা যুগাবসানের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে—এ যুগ তার নিজের সমস্ত ব্যবস্থাপরিচালনার ব্যাপারেই বিচ্ছিন্নতার যুগ, তার বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার যুগ, তার অনিয়ন্ত্রিত অসংখ্য ব্যবসা সংগঠনের মুনাফালিপ্সার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে এ যুগ অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতারও যুগ। তাঁর মতে বর্তমান বিশ্বের প্রধান ব্যাধিই হল আত্মকেন্দ্রিক জাতিত্ববোধ এবং সংযোগ ও পরিকল্পনাহীন কর্মপ্রচেষ্টা ও উদ্যোগ। সুতরাং এক জাতিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত সংকীর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থা উচ্ছেদ করে এমন একটা সংঘক্রিয়াবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যার মধ্যে হীনতা বা দাসত্বের কোনো স্থান নেই। বিজ্ঞ বা ত্রিকালদর্শীরা সাধারণত উপেক্ষিতই হয়ে থাকেন, এমনকি তাঁদের সমসাময়িকদের দ্বারা তাঁরা অনেক সময়ই লাঞ্ছিত এবং নির্যাতিত হয়েছেন। সেইজন্য যাঁরা কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত তাঁদের কাছে মিস্টার ওয়েল্স এবং আরও অনেকের এই সতর্কবাণী অরণ্যে রোদনের সমতুল্য। তা সত্ত্বেও তাঁদের এই বাণী অনিবার্য ভবিষ্যতের ধারারই ইঙ্গিত। এই সব ধারার গতি দ্রুত অথবা মন্থর হতে পারে, এবং যাঁরা কর্তৃত্বপদে অধিষ্ঠিত তাঁরা যদি নিতান্ত অন্ধ হন, তাহলে হয়তো এগুলি বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার পূর্বে আরও একটা চরম বিপর্যয়ের অপেক্ষাই করতে হবে।

অতীত ইতিহাস ও ভাবধারা এবং বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ অর্থহীন বাঁধা গৎ, বাঁধা বুলির দ্বারা আমরা অত্যন্ত বেশি প্রভাবিত। বর্তমান পরিস্থিতির সুস্থির বিশ্লেষণ এবং যুক্তিযুক্ত চিন্তার পথে আমাদের প্রধান বাধাই হল এইগুলি। এ ছাড়া, আজকের দিনে অবাস্তব মানসকল্পনা এবং অস্পষ্ট আদর্শ সৃষ্টিরও একটা ঝোঁক রয়েছে। এর মধ্যে কিছু গুণ অবশ্য আছে এবং তা মানুষের ভাবাবেগ ও অনুভূতিকে উদ্দীপ্তও করতে পারে বটে, কিন্তু প্রধানত এর ফলে উদ্ভব হয় মনের অমনোযোগিতা ও অবাস্তবতা। ভারতের ভবিষ্যৎ, বিশেষত দেশবিভাগ এবং ঐক্য সম্পর্কে সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে অনেক কিছু লেখা হয়েছে, বলা হয়েছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে যারা দেশবিভাগ বা পাকিস্থানের প্রস্তাব উত্থাপন করেছে, তারা এ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে কোনো সংজ্ঞানির্দেশ বা দেশবিভাগের ফলাফল সম্পর্কে

মতামত দিতে অস্বীকার করেই এসেছে। তারা এবং দেশবিভাগের যারা বিরোধী তাদের মধ্যেও অনেকেই শুধু ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হয় এবং তাদের মনে কল্পনা ও অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জড়িত আছে তাদের কল্পিত স্বার্থ। উভয়পক্ষই যেখানে ভাবাবেগ এবং কল্পনার আশ্রয় নিয়েছে, সেখানে পারস্পরিক মতৈক্য একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং উভয়েই আজ 'পাকিস্থান' এবং 'অখণ্ড হিন্দুস্থানের' বুলির লড়াইয়েই আত্মনিমগ্ন। গোষ্ঠীগত বা জাতিগত আবেগ, অনুভূতি ও সচেতন বা অবচেতন আশা-আকাঙ্ক্ষার মূল্য নিশ্চয়ই আছে, এবং সেগুলির যথাযথ গুরুত্বও আমাদের দেওয়া উচিত। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও ঠিক যে শুধু আবেগ এবং অনুভূতির প্রলেপ দিয়ে বাস্তব বা প্রকৃত তথ্যকে ঢাকা যায় না, অথবা তাকে উপেক্ষাও করা যায় না। বাস্তব সত্য চিরকালের জন্য চাপা থাকে না হঠাৎ যে কোনো সময়ে এবং হয়তো অত্যন্ত অসুবিধাজনক মুহূর্তে—আকস্মিকভাবে সেগুলি আত্মপ্রকাশ করে বসে। সুতরাং শুধু ভাবাবেগের ভিত্তিতে অথবা আবেগ অনুভূতি যখন সবচেয়ে প্রবল, তখন যে সিদ্ধান্ত আমরা সচরাচর গ্রহণ করি, তা ভুল হবার সম্ভাবনাই বেশি; এবং তার ফলে সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ যে পথই গ্রহণ করুক, এমনকি বাস্তবত যদি দেশ বিভক্তও হয়ে যায়, তাহলেও নানা দিক দিয়ে ভারতের বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সহযোগিতা নিতান্ত অপরিহার্য। স্বাধীন দেশগুলিকেও পরস্পরের সহযোগিতার উপর অনেকখানি নির্ভর করতে হয়; আর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ অথবা দেশবিভাগের পর নূতন যেসব অংশের সৃষ্টি হবে, তাদের পক্ষে তো তা আরও বেশি অপরিহার্য। কারণ এই সমস্ত প্রদেশ বা নূতন এলাকা পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত; এবং উন্নতি বা অবনতি, স্বাধীনতা বা দাসত্ব—যে পথই হোক না কেন, এদের সকলকেই একসঙ্গে একইভাবে চলতে হবে। সুতরাং ব্যবহারিক দিক থেকে প্রথমেই একটা প্রশ্ন ওঠে : উন্নতির পথে অগ্রসর হতে হলে এবং স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে হলে, এমনকি আত্মস্বাধীনতা এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের দিক দিয়েও দ্বিধাবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে ঐক্যবোধ এবং যোগসূত্র নিতান্ত অপরিহার্য, তার স্বরূপ কি? সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিবেচনার বিষয় যে দেশরক্ষা তাতে সন্দেহ নেই; সঙ্গে সঙ্গে তাকে যোগান দেবার জন্য চাই শিল্পব্যবস্থা, যানবাহন এবং চলাচলব্যবস্থা এবং অন্ততপক্ষে কিছু পরিমাণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। এর পর হল শুল্ক, মুদ্রা এবং বিনিময় ব্যবস্থা এবং সমগ্র ভারতে আভ্যন্তরিক ব্যবসাবাণিজ্যের স্বাধীনতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা; কারণ আভ্যন্তরিক শুল্কের প্রবর্তন সমগ্র ভারতের অগ্রগতির পথই রুদ্ধ করবে। এইভাবে আরও এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলি সামগ্রিক এবং আংশিক, উভয় দিক দিয়েই কেন্দ্রীয় এবং সংযুক্ত পরিচালনাসাপেক্ষ। 'পাকিস্থানে'র পক্ষেই হই আর বিপক্ষেই হই, সাময়িক ভাবাবেগ ও উত্তেজনায় আমরা যদি না অন্ধ হয়ে গিয়ে থাকি, তাহলে এই বাস্তব সত্য অস্বীকার করা অসম্ভব। বিমানচলাচলের ব্যবস্থা আজ এত ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করেছে যে ক্রমশই তাকে আন্তর্জাতিক পরিচালনা-

ধীন করবার দাবি উঠছে। বিভিন্ন দেশ এ সম্বন্ধে বিচক্ষণতার পরিচয় দেবে কি না তাতে সন্দেহ আছে। কিন্তু ভারতের পক্ষে আজ এটা নিশ্চিত সত্য যে একমাত্র সমগ্র ভারতের ভিত্তিতেই ভারতবর্ষে বিমানচলাচল ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি ও প্রসার সম্ভব। দ্বিধাবিভক্ত ভারতের এক একটা অংশে আলাদা আলাদা ভাবে বিমানচলাচল ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, তা অবিশ্বাস্য। এ ছাড়া অন্যান্য আরও অনেক বিষয় আছে যা আজ জাতীয় সীমানাই ছাড়িয়ে যাবার উপক্রম করেছে। সমগ্র ভারত এত বড় একটা দেশ যে সেখানে সেসবের উন্নতি ও বিকাশের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে; কিন্তু আংশিক ভারতের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়।

সুতরাং 'পাকিস্থান' হোক বা না হোক, ভারতবর্ষকে যদি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয় এবং অগ্রগতির পথে যদি তাকে এগিয়ে চলতে হয়, তাহলে রাষ্ট্রের কতকগুলি প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতেই পরিচালনা করতে হবে। উপরোক্ত তথ্যের অনিবার্য এবং অনস্বীকার্য সিদ্ধান্তই হল এই। এর বিকল্প হল প্রগতির পথরুদ্ধতা, অবশ্যম্ভাবী ক্ষয় এবং ভাঙ্গন, যার ফল হল সমগ্র ভারত এবং তার বিভক্ত বিভিন্ন অংশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অবসান। জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেছেন: 'বর্তমান যুগ দেশের সামনে অপরিহার্যভাবে দুটো বিকল্প তুলে ধরেছে: ঐক্য এবং স্বাধীনতা অথবা বিভেদ এবং পরাধীনতা।' যদিচ নামের একটা নিজস্ব তাৎপর্য এবং মানসিক মূল্য আছে, তবু ঐক্যকে কি নামে আমরা অভিহিত করি না করি, তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু মূল কথা এই যে এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যেগুলির সুপরিচালনা এবং উন্নততর বিকাশ একমাত্র সর্বভারতীয় ভিত্তিতেই সম্ভব। সম্ভবত অদূর ভবিষ্যতে এগুলি হয়তো আন্তর্জাতিক পরিচালনারই ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াবে। পৃথিবীর পটভূমিকা ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে, দেশগত বা জাতিগত সমস্যা আজ তাই দেশ ও জাতির সীমানা ছাপিয়ে যায়। বিমানের সাহায্যে আজ কোনো এক জায়গা থেকে মাত্র তিন দিনেরও কম সময়ে পৃথিবীর অপর সীমান্তে পেঁছানো যায়, বায়ুমণ্ডলীর মধ্যে চলাচলব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাল হয়তো আরও কম সময়ে তা সম্পন্ন হবে। আন্তর্জাতিক বিমানচলাচল ব্যবস্থায় ভারতবর্ষকে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে হবে। তাছাড়া একদিকে পশ্চিম এশিয়া এবং ইউরোপ, অন্যদিকে বর্মা এবং চীনের সঙ্গে তার রেলপথের যোগাযোগও স্থাপন করতে হবে। ভারতের থেকে বেশি দূরে নয়, হিমালয়ের ঠিক উত্তরেই রয়েছে শিল্পোন্নত এবং ভবিষ্যতের প্রচণ্ড সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ সোভিয়েট এশিয়া। এসব দ্বারা ভারতবর্ষ যথেষ্ট প্রভাবিত হবে এবং ফলে ভারতেও নানা নূতন প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে।

'পাকিস্থান' বা ভারতীয় ঐক্য—এই সমস্যাকে শুধু বাস্তবতাহীন ভাবাবেগ দ্বারা বিচার করলে চলবে না, বিচার করতে হবে বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি এবং বাস্তব ঘটনাবলীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনিবার্যভাবেই কয়েকটি সিদ্ধান্ত তুলে ধরেছে: কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ব্যাপারের পরিচালনায়

একটা সুদৃঢ় যোগসূত্র সমগ্র ভারতের পক্ষেই নিতান্ত অপরিহার্য। এইগুলি ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল বিষয়ে ভারতের সংহত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ইউনিটগুলির পূর্ণ স্বাধীনতা থাকতে পারে এবং থাকা উচিত। তাছাড়া এমন কতকগুলি বিষয়ও আছে যেগুলি সামগ্রিক এবং আলাদা—এই দুই ভাবেই পরিচালনা হওয়ার প্রয়োজন হবে। এই শেষোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে হয়তো কিছু কিছু মতানৈক্য দেখা দেবে; কিন্তু বাস্তবতার ভিত্তিতে বিচার করলে সাধারণত এর মীমাংসা করা কঠিন হবে না।

কিন্তু এই ধরনের ঐক্যপ্রতিষ্ঠার প্রধান ভিত্তিই হল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত পারস্পরিক সহযোগিতার আকাঙ্ক্ষা এবং স্বেচ্ছাসংহতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি ইউনিট এবং ব্যক্তির স্বাধীনতার স্বচ্ছন্দ অনুভূতি। প্রাচীন কায়েমী স্বার্থের বিলোপ হবে, কিন্তু নূতন কোনো কায়েমী স্বার্থ সৃষ্ট না হয় তা দেখতে হবে। যে ব্যক্তিকে নিয়ে গোষ্ঠী, সেই ব্যক্তিকেই বাদ দিয়ে গোষ্ঠী সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকেই অনেকরকম প্রস্তাব উত্থাপন করেছে; এই সব প্রস্তাবে রাজনৈতিকভাবে ব্যক্তিবিশেষ দুইজন অথবা তিনজনের সমতুল্য হয়ে উঠতে সক্ষম, এমনি করেই সৃষ্ট হয় নূতন কায়েমী স্বার্থ। সুতরাং এইরকম কোনো মীমাংসা বা ব্যবস্থা অনিবার্যভাবেই তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করবে; এবং সমগ্র মীমাংসাটিই স্বল্পস্থায়ী হবে।

ভারতীয় ফেডারেশন বা ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সুসংগঠিত ইউনিটগুলি বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার অনেকেই পেশ করেছেন এবং তার সমর্থনে তাঁরা সোভিয়েট রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই যুক্তি বা নীতি খাটে না; কারণ প্রথমত ভারতের অবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা এবং এ দেশে এ অধিকারের বাস্তব কোনো মূল্য নেই। অবশ্য আবেগ এবং অনুভূতি ভারতে যে পরিমাণ তীব্র তাতে বাঁধাবাঁধির হাত থেকে মুক্তি দেবার জন্য ভবিষ্যতে তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার ন্যস্ত রাখাই বোধহয় যুক্তিসঙ্গত হবে। কার্যত, কংগ্রেস এতে রাজীও হয়েছে। কিন্তু এই অধিকারবোধের কার্যকরিতা, ইতিপূর্বে যে সমস্ত সাধারণ বিষয়গুলির উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলির বিবেচনা-সাপেক্ষ। তাছাড়া দেশবিভাগ বা সীমানা বিভাগের সম্ভাবনাতেই গুরুতর সঙ্কট নিহিত, কারণ এরূপ ভাগ-বিভাগের প্রচেষ্টা স্বাধীনতা এবং স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র সংগঠনের সূচনাকেই বিপন্ন করে তুলতে পারে। তখন এমন সব অনতিক্রমণীয় সমস্যার উদ্ভব হবে যে, তাতে আসল ব্যাপারগুলিই চাপা পড়ে যাবে। চারিদিকে এমন একটা ভেদাবিভেদের আবহাওয়া সৃষ্টি হবে যে, সঙ্ঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রগঠনের স্বপক্ষেও যারা ছিল, তারাও হয়তো তখন পৃথক রাষ্ট্র অথবা অন্যায় রকম সুযোগসুবিধার দাবি তুলবে। ভারতে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান আরও কঠিন হয়ে উঠবে এবং দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে বর্তমান পদ্ধতি আবার একটা জীবনের মেয়াদ লাভ করবে। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিও সমাধানের বাইরে চলে যাবে। বস্তুত, এইরকম একটা বিশৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে উঠবে তা ধারণা করা যায় না, যদিই বা গড়ে ওঠে, সেটা হবে অন্তর্বৈষম্য এবং অসংখ্য সমস্যায় ক্ষতবিক্ষত স্বাধীন রাষ্ট্রের পরিহাস মাত্র।

সুতরাং বিচ্ছিন্ন হবার এই অধিকার কার্যকরী করার আগে স্বাধীন ভারতকে সুসংগঠন এবং সুপরিচালনার মধ্য দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। যখন বাহ্যিক প্রভাবগুলি অপসারিত হবে এবং দেশের আসল সমস্যাগুলি যখন সকলের গোচরীভূত হবে, কেবলমাত্র তখনই আজকের এই আবেগচঞ্চলতা থেকে দূরে সরে গিয়ে এই সমস্ত প্রশ্নের নিরপেক্ষ এবং বাস্তব পর্যালোচনা সম্ভব। আর আজকের আবেগপ্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতেই যদি আমরা এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে আমাদের সেজন্য অনুতাপ করতে হবে। সুতরাং এই প্রশ্ন সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে দেওয়াই বোধহয় বাঞ্ছনীয়। ধরা যাক, স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার দশ বছর পরে তার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ইউনিট সেই সমস্ত এলাকার অধিবাসীদের সুস্পষ্ট ইচ্ছা অনুযায়ী এবং সম্পূর্ণ গঠনতান্ত্রিক পথেই বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার লাভ করবে।

ভারতের বর্তমান অবস্থা আমাদের অনেকের পক্ষেই নিতান্ত ক্লেশকর হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এই অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার একটা পথের সন্ধান পেতে আমরা নিরতিশয় ব্যগ্র। অনেকের অবস্থা তো এমন হয়েছে যে সাময়িক স্বস্তির একটা অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষায় তারা একটা খড়কুটো পর্যন্ত আঁকড়ে ধরে এই শ্বাসরোধকারী আবহাওয়া থেকে ক্ষণিকের মুক্তি পেতে চেষ্টা করে। এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু যেসব গুরুতর সমস্যার উপর লক্ষ লক্ষ নরনারীর কল্যাণ, এমনকি বিশ্বের শান্তিও নির্ভর করে, সেসব সমস্যা সম্পর্কে এই সব উত্তেজিত ও দায়িত্বহীন সমাধান-প্রচেষ্টা সমূহ বিপদ ঘটাতে পারে। ভারতবর্ষে আমাদের জীবন নিরবচ্ছিন্ন সংকটের সীমানায় অবস্থিত এবং মাঝে মাঝে এই সংকট তীব্র বিপর্যয়রূপে আমাদের গ্রাস করে—বাঙলা এবং ভারতের অন্যান্য অংশে গত বছর যা ঘটেছিল। বাঙলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এবং তার পরবর্তী বিভীষিকা আকস্মিক একটা শোচনীয় ঘটনা নয়। মানুষের কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার বাইরে এমন কোনো দুর্জ্ঞেয় বা অত্যাশ্চর্য কার্যকারণ থেকে এই দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়নি। যুগের পর যুগ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যে দুষ্টব্যাধি নীরবে, গোপনে এবং অবিরামভাবে ভারতের জীবনীশক্তিকেই ক্ষয় করে চলেছে—এই দুর্ভিক্ষ হল তারই প্রকট এবং নগ্ন আত্মপ্রকাশ। আমাদের সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় আজ যদি আমরা এই দুষ্টব্যাধিকে সমূলে ধ্বংস করতে না পারি, তাহলে এই ব্যাধি আস্তে আস্তে আরও বেশি ভয়াবহ এবং চরম বিপজ্জনক রূপ গ্রহণ করবে। দেশবিভাগের ফলে ভারতের বিভিন্ন অংশ পরস্পরের দিকে সহযোগিতার হাত না বাড়িয়ে, আলাদা আলাদা ভাবে নিজেদের দুঃখসমস্যা মেটাবারই চেষ্টা করবে, ফলে এই দুষ্টব্যাধির প্রকোপ তীব্রতর হয়ে উঠবে, এবং ক্রমশ আমরা আশাহীন, সহায়হীন ভাবে এক নিদারুণ দুর্দশার পঙ্কে নিমজ্জিত হব। এখনই যথেষ্ট বিলম্ব হয়েছে, যে সময় নষ্ট হয়েছে তা আমাদের পূরণ করে নেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। বাঙলার করাল দুর্ভিক্ষ থেকে কোনো শিক্ষাই কি আমরা অর্জন করতে পারিনি? বহু লোক আছে যাদের সমস্ত চিন্তাকেই আচ্ছন্ন করে রেখেছে

শুধু রাজনৈতিক দরকষাকষি—বিশেষ সুবিধা, ভারসাম্য, কায়েমী স্বার্থের সংরক্ষণ, নূতন স্বার্থের কায়েমীকরণ, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের বিরোধিতা—এই সব নিয়েই তারা মেতে থাকে এবং উপর-উপর সামান্য অদল বদল করে তারা ভারতের বর্তমান অবস্থাই কায়েমী করে রাখতে চায়। এর চেয়ে চরম মূঢ়তা, আর কি হতে পারে?

বর্তমান মুহূর্তের সমস্যাই আমাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়, এবং আমাদের সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো এসবের কোনো গুরুত্বই নেই এবং এই সমস্ত বাহ্য ঘটনার নিচে হয়তো অনেক বেশি প্রাণবন্ত শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলছে। সুতরাং আজকের সমস্যাগুলি বিস্মৃত হয়ে যদি আমরা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তাহলে আমাদের দৃষ্টিপটে ভারত রূপায়িত হবে শক্তিশালী একটা ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্ররূপে, স্বাধীন ইউনিটগুলির স্বেচ্ছাসংহত একটা ফেডারেশনরূপে—প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ সেই ভারতবর্ষ সমস্ত বিশ্বজনীন ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করছে। পৃথিবীর মধ্যে সামান্য যে কয়েকটি দেশ নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম, ভারতবর্ষ তাদের অন্যতম। এই রকম মাত্র আর দুটি দেশই আছে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন। গ্রেট বৃটেনকে এই দলভুক্ত করা যায় যদি তার নিজের সম্পদসামগ্রীর সঙ্গে তার সাম্রাজ্যের সম্পদসামগ্রী সামগ্রিকভাবে ধরা যায়, কিন্তু সেই বিক্ষিপ্ত, বিস্তীর্ণ এবং অসন্তোষে পূর্ণ সাম্রাজ্যই আবার তার দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। একমাত্র চীন এবং ভারতই এই স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশের সমকক্ষ হতে পারে। চীন এবং ভারত উভয়েই একটা সুসংবদ্ধ ভৌগোলিক এলাকার অধিকারী। প্রাকৃতিক সম্পদ, জনশক্তি এবং অধিবাসীদের কলাকুশলতা ও কার্যক্ষমতার প্রাচুর্যে তারা উচ্ছ্বলিত। একদিক দিয়ে ভারতের শিল্পক্ষমতা এবং তার বিকাশের সম্ভাবনা চীনের চেয়েও বেশি। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আমদানীর জন্য তার রপ্তানীযোগ্য দ্রব্যের সংখ্যাও যথেষ্ট প্রচুর। এই চারটি দেশ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ এইরকম স্বয়ংসম্পূর্ণ অথবা তার সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ নয়। অবশ্য ভবিষ্যতে ইউরোপে বা অন্যত্র হয়তো অনেকগুলি রাষ্ট্র সম্মিলিত হয়ে বিপুল সংঘবদ্ধ সংহত বহুজাতিক-রাষ্ট্রের উদ্ভব হতে পারে।

ঘটনাপরিস্থিতির প্রবাহধারা যে গতি নিয়েছে তাতে বিশ্বের শক্তিকেন্দ্র হিসাবে অতলান্ত মহাসাগরের পরিবর্তে ক্রমশই প্রশান্ত মহাসাগর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার সম্ভাবনাই বেশি। প্রত্যক্ষভাবে প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্গে যোগসূত্র না থাকলেও, ভারতবর্ষ অনিবার্যভাবেই এই অঞ্চলকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে। ভারত-মহাসাগরের চারদিকে এবং সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ এলাকাতে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও ভারতবর্ষের রয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে ভারতবর্ষ এই সমগ্র অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য নানা ব্যাপারে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

স্থান দখল করে আছে এবং ভবিষ্যতে এইসব অঞ্চলের দ্রুত উন্নতি ও অগ্রগতি অবশ্যম্ভাবী। ভারতের দুইদিকে ভারত মহাসাগরকে ঘিরে যে সমস্ত দেশ অবস্থিত যেমন—ইরান, ইরাক, আফগানিস্থান, সিংহল, বর্মা, মালয়, শ্যাম, জাভা—এরা সকলেই যদি আঞ্চলিকভাবে সংঘবদ্ধ হয়, তাহলে বর্তমানে যে সংখ্যালঘু সম্পর্কিত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তার অবসান ঘটবে; অথবা তা না হলেও এই সমস্যার বিচার ও পর্যালোচনার পটভূমিকাই সম্পূর্ণ বদলে যাবে।

মিস্টার জি. ডি. এইচ্. কোল-এর মত অনুযায়ী ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ একটা বহুজাতিক কেন্দ্র হিসাবে রূপান্তরিত হওয়ারই সম্ভাবনা। অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ অনিবার্যভাবে বহু জাতির সম্মিলিত শক্তিশালী একটা সংহত রাষ্ট্র হিসাবেই গড়ে উঠবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত বিস্তৃত এই রাষ্ট্রের একদিকে থাকবে চৈনিক-জাপানী-সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র, অন্যদিকে থাকবে ইজিপ্ট, আরব ও তুর্কীর সম্মিলিত নূতন এক রাষ্ট্র, আর উত্তরে থাকবে সোভিয়েট ইউনিয়ন। এসবই অবশ্য একটা অনুমান বিশেষ এবং ভবিষ্যতের পৃথিবী ঠিক এইভাবে অগ্রসর হবে কি না, তা আজ কেউই বলতে পারে না। আমার নিজস্ব মত ব্যক্ত করতে হলে বলতে হয় যে, মাত্র কয়েকটি বড় বড় বহুজাতিক সংহত রাষ্ট্রে সমগ্র পৃথিবীকে ভাগবিভাগ করা আমার মনঃপূত নয়; এই কয়েকটা রাষ্ট্রের সকলেই যদি একটা শক্তিশালী এবং দীর্ঘস্থায়ী ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ থাকে, তাহলে অবশ্য অন্য কথা। কিন্তু লোকে যদি মূর্খতা বশত বিশ্ব-ঐক্য এবং কোনো এক ধরনের বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠা করতে না পারে, তাহলে এই সব বিরাট বহুজাতিক অঞ্চলগুলি—নিজ স্বায়ত্তশাসিত ইউনিটগুলির সংহতিতে—এক একটা সুবৃহৎ রাষ্ট্র হিসাবে কার্যকরী হয়ে ওঠার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ আজকের দিনে ছোট ছোট জাতীয় রাষ্ট্রের বিলুপ্তি অনিবার্য। সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এসব দেশ স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়তো পারবে, কিন্তু রাজনৈতিক দিক দিয়ে স্বাধীন দেশ হিসাবে নয়।

এসব যাই হোক না কেন, ভারতবর্ষ যদি তার প্রভাবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়, তাহলে তা সমগ্র বিশ্বের পক্ষেই কল্যাণকর হবে। কারণ ভারতবর্ষ যে প্রভাব বিস্তার করবে, সে প্রভাব হবে বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার স্বপক্ষে এবং আক্রমণপ্রবণতার বিপক্ষে।

১২ : বাস্তববাদ এবং ভূরাষ্ট্রনীতি : বিশ্ববিজয় না বিশ্ব সহযোগিতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন

ইউরোপে যুদ্ধ আজ চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে ঠেকেছে, পূর্বে এবং পশ্চিমে মিত্রশক্তির সেনাবাহিনীর অগ্রগতির সামনে নাৎসীশক্তি ধ্বসে পড়ছে। মানুষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পীঠস্থান, সেই সুন্দর রমণীয় নগরী প্যারিস আজ আবার নিজের

স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে। যুদ্ধের সমস্যাগুলির চেয়েও দুরূহ শান্তির সব সমস্যাগুলি আজ আবার মানুষের মনকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে, এই উদ্বেগের মূলে আছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ইতিহাসের নিদারুণ ব্যর্থতার কালো ছায়া। সবাই বলছে—আর নয়। ১৯১৮ সালেও তারা এই কথাই বলেছিল।

পনেরো বছর আগে ১৯২৯ সালে মিস্টার চার্চিল বলেছিলেন: 'এ যুদ্ধ আজ একটা পুরানো গল্পের সামিল, যার থেকে আমরা ভবিষ্যতের জন্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আহরণ করতে পারি। জাতিগত দ্বন্দ্বকলহ এবং সেই দ্বন্দ্বকলহের অবসানের জন্য যুদ্ধের যে নিদারুণ দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়—এই দুইয়ের পরিমাপের কোনো সামঞ্জস্যই খুঁজে পাওয়া যায় না। যুদ্ধক্ষেত্রের অপরিসীম বীরত্ব এবং আত্মোৎসর্গ কৃত চরম সাহসিকতার প্রতিদান ও পুরস্কার কি নগণ্য হীন! যুদ্ধজয়ের ক্ষণস্থায়ী বিজয়গৌরব; যুদ্ধপরবর্তী দীর্ঘায়িত মন্থর পুনর্গঠন; ভয়ংকর বিপদ কাটাবার সেই অসমসাহসিকতা; নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে শুধু সামান্য এক চুল এদিক ওদিক বা ভাগ্যলক্ষ্মীর মুহূর্তের একটু করুণা অথবা আকস্মিক একটা আকস্মিকতার কৃপায় সেই বিস্ময়কর অব্যাহতি—এসব স্মরণ করেই আর একটা বিশ্বযুদ্ধ রোধ করার প্রচেষ্টা করাই আজ মানবসমাজের প্রধান কাজ হওয়া উচিত।'

মিস্টার চার্চিলের এ সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, কারণ যুদ্ধকালীন অবস্থায় এবং শান্তিপ্রতিষ্ঠায় তিনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বিপদে এবং সংকটে, পরাজয়ে এবং বিজয়ের মধ্য দিয়ে অত্যাশ্চর্য সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে তিনি তাঁর দেশকে পরিচালনা করেছিলেন এবং নিজ দেশ সম্বন্ধে তিনি সুউচ্চ আশা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এসেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ব্রিটিশ সমরশক্তি সমগ্র পশ্চিম এশিয়ায় তার আধিপত্য বিস্তার করে। ভারতবর্ষের সীমাপ্রান্ত থেকে ইরান, ইরাক, প্যালেস্টাইন এবং সিরিয়া ও সুদূরে কনস্তান্তিনোপল্ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এই ভূখণ্ড ব্রিটিশ দখলে চলে আসে। মধ্যপ্রাচ্যে বৃটেন একটি নূতন সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য গড়ে তুলবে—এই ছিল মিস্টার চার্চিলের স্বপ্নকামনা, কিন্তু ভাগ্যের বিধান দাঁড়াল অন্যরূপ। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আজ আবার কি স্বপ্ন তিনি পোষণ করছেন? আমার জনৈক প্রখ্যাত ও বিখ্যাত সহকর্মী, যিনি বর্তমানে কারারুদ্ধ, তিনি একবার লিখেছিলেন: 'যুদ্ধ হল একটা অত্যদ্ভুত রাসায়নিক, যার গোপন সব রসায়নাগারে এমন সব শক্তি ও ক্ষমতা পরিস্রুত হয় যে, এক সময়ে সেগুলি বিজেতা এবং বিজিত—উভয়েরই সকল পরিকল্পনা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেয়। গত মহাযুদ্ধের পরে কোনো শান্তিবৈঠকেই রুশ, জার্মান, অস্ট্রিয়ান এবং অটোমান সাম্রাজ্যকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হোক—এমন কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি, এবং রুশ, জার্মান ও তুরস্ক বিপ্লবও লয়েড জর্জ, ক্লেমসোঁ বা উইলসনের অনুজ্ঞা অনুযায়ী সংঘটিত হয়নি।' যুদ্ধ জয়ের পর বিজেতা জাতিসমূহের নেতারা যখন সম্মিলিত হবেন, তখন তাঁরা কি বলবেন? তাঁদের ব্যক্তিমানসে আজ ভবিষ্যৎ কিভাবে রূপায়িত হয়ে উঠছে এবং এ বিষয়ে তাঁরা পরস্পর একমত না তাঁদের মতানৈক্য আছে? যুদ্ধের সুতীব্র

উত্তেজনা ও আবেগ যখন স্তিমিত হয়ে আসবে এবং লোকে বিস্মৃতপ্রায় শান্তির যুগের জীবনযাত্রায় প্রত্যাবর্তন করতে চেষ্টা করবে, তখন তাদের মধ্যে আর কি কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে? যুদ্ধের মধ্যে ইউরোপে যে দুর্বার গোপন প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠেছে এবং সেই সংগ্রাম যেসব নূতন নূতন শক্তিকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে, সেসবের কি হবে? অভিজ্ঞতায় এবং মানসিকভাবে যারা প্রবীণতর হয়ে উঠেছে সেই যুদ্ধক্লান্ত লক্ষ লক্ষ সৈন্য ঘরে ফিরে এসে কি চাইবে, কি করবে? তাদের যুদ্ধকালীন অনুপস্থিতির মধ্যে জীবনযাত্রায় যেসব বহু পরিবর্তন ঘটেছে সেসবের সঙ্গে তারা নিজেদের কিভাবে খাপ খাওয়াবে? লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তে পবিত্র, ক্ষতবিধ্বস্ত ইউরোপের কি হবে? এশিয়া? আফ্রিকা? মিস্টার ওয়েন্ডেল উইল্‌কি যাকে বলেছেন, 'এশিয়ার শতকোটি মুক্তিকামী জনতার দুর্দমনীয় মুক্তিলিপ্সা'—তারই বা কি পরিণতি হবে? এসব এবং আরও অনেক কিছুরই বা কি হবে তা জিজ্ঞাস্য, কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্নের বিষয় হল ভাগ্যের সেই সব বিচিত্র চক্রান্ত—যা আমাদের নেতাদের যত্নকল্পিত পরিকল্পনাগুলিকে মুহূর্তে পাল্টে দেয়।

যুদ্ধপরিস্থিতির ক্রমাগ্রগতি এবং ফ্যাসিস্টবিজয়ের সম্ভাবনার ক্রমাপসরণের সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নেতৃবর্গের প্রগতিবিরোধিতা এবং রক্ষণশীলতা ক্রমশই দৃঢ়তর হয়ে উঠছে। স্বাধীনতার চতুর্বর্গ এবং অতলান্তিক সনদ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত হিসাবে যদিও খুবই অস্পষ্ট ছিল—সেগুলি আজকের পটভূমিকায় অদৃশ্য হয়ে যেতে বসেছে এবং ভবিষ্যৎ ক্রমেই অতীতের পুনঃপ্রবর্তন হিসাবে পরিকল্পিত হচ্ছে। যুদ্ধ আজ শুধু একটা সমরকৌশলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পশুশক্তির বিরুদ্ধে পশুশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হয়েছে—নাৎসী ও ফ্যাসিস্ট মতবাদকে নির্মূল করার আদর্শ আর এ যুদ্ধে নিহিত নেই। এখন জেনারেল ফ্রাঙ্কো বা ইউরোপের অন্যান্য ছোটখাট সম্ভাব্য স্বেচ্ছাচারী শাসকদেরই প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। সাম্রাজ্যের মহিমাকীর্তনে মিস্টার চার্চিল তো আজও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। জর্জ বার্নার্ড শ' সম্প্রতি বলেছেন: 'বর্তমান পৃথিবীতে অপর আর কোনো শক্তি নেই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মত প্রভুত্বলালসায় এতখানি আচ্ছন্ন। এমনকি উচ্চারণ করতে গেলে সাম্রাজ্য কথাটাই যেন মিস্টার চার্চিলের গলায় বেধে যায়।'*

অবশ্য ইংলন্ড, আমেরিকা এবং পৃথিবীর সর্বত্র বহুলোকই অতীত থেকে সর্বতো-

* এটা আজ খুবই সুস্পষ্ট যে সাম্রাজ্যতন্ত্রের অবসান বা উচ্ছেদ করার কোনো উদ্দেশ্য ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর নেই, বড় জোর তারা তাদের ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় একটু আধুনিকতার আমদানি করার কথা চিন্তা করে। কারণ তারা বিশ্বাস করে যে ইংলন্ডের শক্তি ও সম্পদ-প্রাচুর্যের উৎসই হল উপনিবেশগুলি। বৃটেনের একটা প্রভাবশালী অংশের মুখপাত্র লন্ডনের 'ইকনমিস্ট' পত্রিকা ১৯৪৪ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর সংখ্যায় লিখেছিল : "ব্রিটিশ, ফরাসী বা ওলন্দাজদের তথাকথিত 'সাম্রাজ্যতন্ত্রের' বিরুদ্ধে আমেরিকায় যে মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে অনেকেরই ধারণা হয়েছে যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পুরানো সাম্রাজ্যশক্তির

ভাবে পৃথক নূতন ভবিষ্যৎ রচনা করতেই চায় এবং তা না করতে পারলে তারা আশংকা করে যে এই যুদ্ধের পরবর্তীকালে আরও ব্যাপকতর ও ভীষণতর নূতন নূতন যুদ্ধ ও বিপর্যয় সংঘটিত হবে। কিন্তু আজ যারা শক্তি এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, এসব চিন্তাভাবনায় তারা মোটেই উদ্বিগ্ন নয়, কিংবা হয়তো তারা নিজেরাই এমন সব শক্তি দ্বারা আচ্ছন্ন যা তাদের আয়ত্তাতীত। শক্তির সেই রাজনৈতিক দাবাখেলার পুরানো চালই আজ আবার ইংলন্ড, আমেরিকা এবং রাশিয়ায় আমরা দেখতে পাই। এইটাই আজ বাস্তবতা বলে পরিগণিত—বাস্তব রাজনীতি বলে এইটাই আজ অভিহিত। ভূরাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ জনৈক মার্কিন অধ্যাপক—এন. জে. স্পাইকম্যান তাঁর সাম্প্রতিক একটি গ্রন্থে লিখেছেন: 'বৈদেশিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত রাজনীতিক ন্যায়, সুনীতি এবং সহনশীলতাকে ততটুকুই সমর্থন করেন যতটুকুতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেই রাষ্ট্রের শক্তির ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠা ব্যাহত না হয়, অথবা তার অন্তরায় না হয়ে দাঁড়ায়। শক্তি এবং ক্ষমতার নূতনতর প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠায় এগুলিকে নৈতিক যাথার্থ্যের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু যে মুহূর্তে সেটা উপরোক্ত লক্ষ্যপূরণের পরিপন্থী হয়ে ওঠে, সেই মুহূর্তেই এগুলি হয় পরিত্যক্ত এবং বিসর্জিত। শক্তি ও ক্ষমতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিসাধনের প্রচেষ্টার লক্ষ্য সুনীতি এবং নীতিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা নয়; বরঞ্চ শক্তি ও ক্ষমতার বৃদ্ধির জন্যই অধিকাংশ সময়ে সুনীতি ও নীতিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হয়।'*

অধ্যাপক স্পাইকম্যান-এর এই মত অবশ্য আমেরিকার সাধারণ মনোভাব এবং চিন্তাধারার পরিচায়ক নয়, কিন্তু মার্কিন জনমতের একটা বিশেষ প্রভাবশালী অংশ এই মত পোষণ করে, তা নিঃসন্দেহ। মিস্টার ওয়াল্টার লিপম্যান সমগ্র পৃথিবীকে তিন চারটি শক্তিকেন্দ্রে বিভক্ত করেছেন: অতলান্ত সম্প্রদায়, রাশিয়া, চীন এবং দক্ষিণ এশিয়ার হিন্দু-মুসলিম আধিপত্য। শক্তি নিয়ে দাবাখেলার রাজনীতির

পুনঃপ্রতিষ্ঠা আর সম্ভব নয়, সাম্রাজ্য অন্তর্ভুক্ত এইসব অঞ্চলের জন্য হয়তো আন্তর্জাতিক একটা পরিচালনা ব্যবস্থার সৃষ্টি হবে; অথবা পাশ্চাত্য জাতিদের পুরানো প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের পরিবর্তে শক্তি, স্বাধীনতা ও ক্ষমতা স্থানীয় জনগণের নিকটেই হস্তান্তরিত হবে। যখন এরূপ একটা ধারণার উৎপত্তি হয়েছে এবং আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকা ও সংবাদপত্রে এই মর্মে প্রচারও চলছে, এই অবস্থায় ব্রিটিশ, ফরাসী ও ওলন্দাজদের নিজেদের উপনিবেশ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে জানানো একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যেহেতু এদের মধ্যে কারোও তাদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য হাতছাড়া করার উদ্দেশ্য নেই, উপরন্তু তারা বিশ্বাস করে যে জাপান কর্তৃক অনুসৃত 'কো-প্রস্‌পারিটি স্ফিয়ার'-এর নীতি সমূলে ধ্বংস করতে হলে মালয়, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ফরাসী ইন্দোচীন যথাক্রমে ব্রিটিশ, ওলন্দাজ ও ফরাসী সাম্রাজ্যে পুনর্ভুক্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক, তখন এ সম্বন্ধে তারা মনে যদি কোনো সন্দেহ রাখে তাহলে এর ফলে নিদারুণ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে, এমনকি তাদের মিত্র আমেরিকার কাছে তারা বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারে।"

* এন. জে. স্পাইকম্যান : 'অ্যামেরিকাস স্ট্র্যাটেজি ইন ওয়ার্ল্ড্‌ পলিটিক্‌স্‌'

ব্যাপকতর প্রকাশই হল এটা; এবং এই পরিকল্পনা থেকে বিশ্বশান্তি অথবা বিশ্ব সহযোগিতার প্রতিষ্ঠা যে কিভাবে সম্ভবপর, তা বোঝাও দুষ্কর। আমেরিকায় কঠোর কঠিন বাস্তববাদ এবং অস্পষ্ট একটা আদর্শবাদ ও মনুষ্যত্ববোধের একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণ হয়েছে। ভবিষ্যতে এই দুটোর মধ্যে কোনটা প্রধান হয়ে উঠবে? অথবা এই দুইয়ের সংমিশ্রণে কোন নূতন ভাবধারার সৃষ্টি হবে? অবশ্য সাধারণ জনগণের চিন্তাধারার যে পরিবর্তনই হোক না কেন, পররাষ্ট্রনীতি কর্তৃত্বে-অধিষ্ঠিত বিশেষজ্ঞ-দের একচেটিয়া ক্ষেত্র এবং তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই অতীত ঐতিহ্যের চতুঃসীমানার মধ্যেই মানসিকভাবে আবদ্ধ, এবং নিজ দেশের ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা থাকতে পারে এমন কোনো পরিবর্তন এঁদের কাছে ভীতিপ্রদ। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য একান্ত অপরিহার্য; কারণ এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে কেবল সদিচ্ছা ও কল্পনাপ্রবণতার দ্বারা কোনো জাতিই তার আভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক নীতি গড়ে তুলতে পারে না। কিন্তু সে বাস্তববাদ বড়ই অদ্ভুত যা শুধু অতীতের ফাঁকা খোলস আঁকড়ে বর্তমানের কঠিন বাস্তবতা—যা শুধু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বাস্তবতা নয়, যে বাস্তবতায় অসংখ্য মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা বাসনা জড়িত—উপেক্ষা করে অথবা বুঝতে অস্বীকার করে। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের বাস্তববাদ সাধারণ মানুষের তথাকথিত আদর্শবাদের চেয়ে আরও বেশি কল্পনাশ্রয়ী এবং এর সঙ্গে বর্তমান বা ভবিষ্যতের সমস্যাধারার কোনো সম্পর্কই নেই।

আজ তাই ভূরাষ্ট্রনীতিতে এই ধরনের বাস্তববাদীরা আশ্রয় নিয়েছেন এবং তাঁরা বলেন যে ভূরাষ্ট্রনীতির 'হার্টল্যান্ড' (অন্তর্দেশ), 'রিমল্যান্ড' (প্রান্তদেশ) প্রভৃতি বাঁধা বুলির সাহায্যেই নাকি অসংখ্য জাতির উত্থান পতনের রহস্যের উপর আলোক-পাত করা যায়। ভূরাষ্ট্রনীতির উৎপত্তি হয় ইংলন্ড (না কি স্কটল্যান্ডে?) এবং পরে নাৎসীরা এইটাকেই তাদের জীবনবেদ বলে গ্রহণ করে এবং এটাই তাদের বিশ্ববিজয়ের আশাআকাঙ্ক্ষার পরিপোষক হয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। আংশিক সত্য একটা সম্পূর্ণ মিথ্যার চেয়েও বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর; কারণ যে সত্যের সার্থকতা ফুরিয়ে গেছে, সে সত্য বর্তমানের বাস্তবতা সম্পর্কে মানুষকে অন্ধ করে দেয়। ভূরাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে মিস্টার এইচ্. জে. ম্যাকইন্ডার-এর তত্ত্ব, পরে জার্মানীতে যার আরও চর্চা হয়েছিল, তার মূল ভিত্তি হল: মহাদেশগুলির (এশিয়া ও ইউরোপ) যেসব প্রান্ত মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত সেই প্রান্তসীমানাগুলিতেই সভ্যতার প্রথম বিকাশ হয় এবং মহাদেশগুলির অভ্যন্তরে তাদের 'অন্তর্দেশ' থেকে এই সমস্ত 'প্রান্তিক' সভ্যতার উপর যে আক্রমণধারা পরিচালিত হয়, তা থেকে এদের রক্ষা করা ছিল একান্ত আবশ্যক এবং এই 'অন্তর্দেশই' ছিল ইউরেশিয়ান জাতিকেন্দ্র। এই অন্তর্দেশে যাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, তারাই বিশ্বপ্রভুত্ব করতে সক্ষম হবে। কিন্তু বর্তমানে মানবসভ্যতা শুধু মহাসাগরের প্রান্তসীমানাতেই সীমাবদ্ধ নয়, সভ্যতার বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা আজ বিশ্বব্যাপী। ইতিমধ্যে নূতন গোলার্ধে উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার সভ্যতা বিকাশের ফলে অবস্থার খানিকটা তারতম্য ঘটেছে, এবং

ইউরেশিয়ান 'অন্তর্দেশ'ই বিশ্বপ্রভুত্বের অধিকারী—আজকের দিনে একথা আর খাটে না। নৌশক্তি ও স্থলশক্তির মধ্যে এতদিন যে একটা ভারসাম্য ছিল, বিমান-শক্তির উন্নতিতে সে ভারসাম্যও নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

বিশ্ববিজয়ের স্বপ্নে বিভোর জার্মানী বরাবর অন্যান্য শক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত হবার ভয়ে ভীতিগ্রস্ত ছিল। আর শত্রুশক্তিদের একজোট হওয়ার ভয়ে ভীত ছিল সোভিয়েট রাশিয়া। ইউরোপে রাষ্ট্রশক্তির ভারসাম্য বজায় রাখা এবং অত্যধিক শক্তিশালী কোনো রাষ্ট্রের আবির্ভাবের বিরোধিতাই ছিল ইংলন্ডের অনুসৃত নীতির ভিত্তি। পারস্পরিক ভয়ভীতি এবং দ্বিধা সন্দেহই সমস্ত রাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করেছে; এবং এই থেকেই নানারকম ধর্ষণনীতি ও জটিল কূটনীতির উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধ শেষ হবার পর একেবারে নূতন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। এই যুদ্ধের পর সমগ্র পৃথিবীতে মাত্র দুটি শক্তি বিশ্বশক্তি হিসাবে দাঁড়িয়ে উঠবে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন, এবং একজোট না হতে পারলে অন্যান্য সমস্ত রাষ্ট্র বিশ্বশক্তি হিসাবে অনেক পিছিয়ে পড়বে। এই সমস্ত ঘটনাসম্ভাবনা থেকেই অধ্যাপক স্পাইকম্যান তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত ও উপদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়ে দিয়েছেন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও পরিবেষ্টিত হয়ে পড়বার আশংকা দেখা দিয়েছে, সুতরাং 'প্রান্তীয়' কোনো রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে অবিলম্বে তাদের মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অবশ্যকর্তব্য। এটা যদি সম্ভব নাও হয় তাহলেও যাতে 'অন্তর্দেশ' (অর্থাৎ সোভিয়েট ইউনিয়ন) কোনো 'প্রান্তীয়' শক্তির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে, তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যথেষ্ট সচেষ্ট ও সজাগ থাকতে হবে।

আপাতদৃষ্টিতে এই সমস্ত যুক্তিতর্ক খুবই চতুর এবং বাস্তবদৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত বলে মনে হলেও, আসলে এসব চরম অজ্ঞতারই পরিচায়ক। কারণ সাম্রাজ্যবিস্তার এবং রাষ্ট্রশক্তির ভারসাম্য রক্ষার পুরানো এবং অচল নীতিই হল এর মূলকথা; আর নূতন সংঘাতসংঘর্ষ সৃষ্টিতেই এই নীতির অনিবার্য পরিণতি। যেহেতু পৃথিবী বৃত্তাকার তখন প্রত্যেক দেশই অন্যান্য দেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া অনিবার্য। সুতরাং রাষ্ট্রশক্তির রাজনৈতিক দাবাখেলার চালে এই পরিবেষ্টনের ভীতিকে কাটাবার প্রচেষ্টা করতে গেলে কয়েকটি রাষ্ট্রের একজোট হতে হয়; আর এক দল রাষ্ট্র একজোট হলে, তার বিরুদ্ধে অপর এক দল রাষ্ট্রও একজোট হবে, ফলে তখন আবার রাজ্য বিস্তার ও রাজ্যবিজয়ের প্রশ্ন উঠবে। কিন্তু একটি দেশের সাম্রাজ্য যত বড়ই হোক না কেন, বা তার প্রভাব যত সুদূরবিস্তৃতই হোক না কেন, তার প্রভুত্বের এবং কর্তৃত্বের বাইরে যে দেশগুলি রয়ে যাবে, সেগুলির দ্বারা পরিবেষ্টিত হবার আশংকা তো তার থেকেই যাবে, কারণ বিপক্ষের শক্তি ও ক্ষমতার অভাবনীয় বৃদ্ধিই এই দেশগুলিকে শঙ্কিত করে তুলবে। কাজেই পরিবেষ্টিত হবার আশংকা যদি সত্যিই দূর করতে হয়, তাহলে তার একমাত্র উপায় হল বিশ্ববিজয় বা সমস্ত প্রতি-দ্বন্দ্বীর উচ্ছেদ। বিশ্ববিজয়ের নবতম প্রচেষ্টার চরম ব্যর্থতাই আজ আমাদের চোখের সামনে প্রকট হয়ে উঠেছে। এ থেকে কি শিক্ষালাভ হবে? অথবা জাতিশ্লাঘা এবং

শক্তিমদে উন্মত্ত আরও কেউ বিশ্ববিজয়ের এই চরম সর্বনাশা ক্ষেত্রে আবার ভাগ্যপরীক্ষা করতে অগ্রসর হবে।

বস্তুত বিশ্ববিজয় এবং বিশ্ব সহযোগিতার মধ্যে দ্বিতীয় কোনো বিকল্প নেই। পৃথিবীর পুরানো ভাগবিভাগ এবং রাষ্ট্রশক্তিগুলির শক্তি-ভারসাম্যমূলক রাজনীতি আজ অর্থহীন এবং বর্তমান যুগের পরিস্থিতির সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না, তা সত্ত্বেও তার ধারাক্রম বজায় আছে। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের স্বার্থ এবং কার্যকলাপ আজ তার সীমানা অতিক্রম করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। অপর জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিণতি সম্বন্ধে নির্লিপ্ত থাকতে বা তাকে উপেক্ষা করতেও সে পারে না। সুতরাং পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব হলে পারস্পরিক সংঘর্ষ এবং তাব সংশ্লিষ্ট ফলাফল অনিবার্যভাবেই দেখা দেবে। সমান মর্যাদা ও অধিকার এবং পারস্পরিক মঙ্গল সাধনের সদিচ্ছাই এই সহযোগিতার মূল ভিত্তি, আর প্রয়োজন জীবনযাত্রা এবং সাংস্কৃতিক উন্নতির সাধারণ স্তরে অনুন্নত ও পশ্চাৎপর দেশ এবং জাতিকে উন্নীত হতে সাহায্যদান, জাতিবৈষম্য এবং জাতিপ্রভুত্বের উচ্ছেদসাধন। এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির উপর প্রভুত্বস্থাপন অথবা এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির শোষণ—তাকে যত মধুর নামেই অভিহিত করা হোক না কেন—আজ তা কেউই সহ্য বা ক্ষমা করবে না। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যখন সুখঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে, তখন কোনো জাতিই তার নিজের চরম দারিদ্র্য এবং হীনতার প্রতি উদাসীন থাকবে না। এতদিন তারা পৃথিবীর অন্যত্র কি হচ্ছে না হচ্ছে সে সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল বলেই এ বিষয়ে উদাসীন ছিল।

আপাতদৃষ্টিতেই যদিচ এসব প্রকট হয়ে ওঠে, কিন্তু অতীতের দীর্ঘ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে মানুষের মন ঘটনাপ্রবাহের কত পিছনে পড়ে থাকে, এবং কত শ্লথ-গতিতে সে নিজেকে সেই ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে। আত্মস্বার্থের তাগিদই প্রত্যেক জাতিকে ব্যাপকতর বিশ্বসহযোগিতার পথে ঠেলে দেবে—যদি সে ভবিষ্যৎ বিপর্যয় এবং ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেতে চায়, সকলের স্বাধীনতার ভিত্তিতে নিজের স্বাধীন জীবন গড়ে তুলতে চায়। কিন্তু তথাকথিত 'বাস্তববাদী'র আত্মস্বার্থ, সংস্কার ও নীতির সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ, এবং সে অতীত যুগোপযুক্ত আদর্শ ও সামাজিক রীতিনীতিকেই মানবপ্রকৃতি ও সমাজের শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় আদর্শ হিসাবে দেখে, তারা ভুলে যায় মানবপ্রকৃতি ও সমাজের মত নিত্যপরিবর্তন-শীল আর কিছুই নেই। সুতরাং ধর্মের রীতিনীতি ও ধারণা চিরন্তন হিসাবে রূপায়িত হয়, সামাজিক নিয়ম ও বিধিগুলি হয় জড়ীভূত, যুদ্ধ রূপান্তরিত হয় জৈবিক প্রয়োজনে, সাম্রাজ্য ও প্রভুত্ব বিস্তার হয়ে দাঁড়ায় প্রগতিশীল ও প্রাণবন্ত জাতির বিশেষ অধিকারস্বরূপ, মুনাফাপ্রবৃত্তি হয়ে ওঠে মানুষের সকল সম্পর্কের কেন্দ্র, জাতিকেন্দ্রিকতা অর্থাৎ জাতি-প্রাধান্যে নিষ্ঠা হয়ে ওঠে একটা ধর্মবিশ্বাসস্বরূপ এবং এই জাতি-প্রাধান্য প্রচারিত না হলেও, সেটা অখণ্ডনীয় বলেই গৃহীত হয়ে থাকে। এর মধ্যে কতকগুলি ভাবধারা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য, উভয় সভ্যতায়ই অন্ত-

নিহিত ছিল; এবং এর মধ্যে অনেকগুলিই আছে বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার পটভূমিকায়, এবং এ থেকেই ফ্যাসিজ্‌ম ও নাৎসিজ্‌ম-এর জন্ম হয়। নীতির দিক দিয়ে এই ভাবধারা এবং নাৎসি বা ফ্যাসিস্ট মতবাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই, যদিচ মনুষ্যজীবন এবং মনুষ্যত্বের প্রতি ফ্যাসিস্টদের তাচ্ছিল্য ও উপেক্ষা অনেক বেশি উগ্র। বস্তুত যে মহান মানবতাবোধ ইউরোপের দৃষ্টিভঙ্গিকে দীর্ঘদিন রঞ্জিত করে রেখেছিল, আজ সেখানে সেই মানবতাবোধ এক বিলীয়মান ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত ছিল ফ্যাসিজ্‌মের বীজ। সুতরাং আজ যদি তারা এই অতীত ভাবধারা থেকে মুক্ত হতে না পারে, তবে যুদ্ধজয়ের ফলে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হবে না, এবং সেই অতীত সংস্কার ও খেয়ালখুশিই বজায় থাকবে, এবং আমাদের আবার অতীতের মত ভূতে-খেদানো ভাবে সেই একই চক্রের পরিক্রমণ করতে হবে।

বর্তমান এই যুদ্ধের মধ্য থেকে যে দুটো ব্যাপার সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের বহুল পরিমাণ শক্তি এবং যথার্থ ও সম্ভাব্য সম্পদ্‌বৃদ্ধি। যুদ্ধের নিদারুণ ধ্বংসলীলার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন হয়তো তার প্রাগ্‌যুদ্ধ অবস্থার তুলনায় খানিকটা দরিদ্রই হয়ে পড়েছে, কিন্তু যে বিপুল সম্ভাবনায় সে পরিপূর্ণ তাতে তার পক্ষে দ্রুতগতিতে সকল ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে আরও অগ্রসর হয়ে যাওয়া নিশ্চিত। অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং সামরিক শক্তির দিক দিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে, ইউরোপ বা এশিয়া মহাদেশে ভবিষ্যতে এমন আর একটিও শক্তি থাকবে না। সোভিয়েট ইউনিয়নের কার্যকলাপে ইতিমধ্যেই প্রভুত্ববিস্তারের আকাঙ্ক্ষা লক্ষিত হয়েছে। জার-এর আমলের সাম্রাজ্যের ভিত্তিতেই সে তার এলাকা বিস্তৃত করতে সচেষ্ট। এ-বিষয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন কতদূর অগ্রসর হবে, তা বলা কঠিন। কারণ সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এই বিস্তারের প্রয়োজন হয় না, সে অনায়াসে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারে। কিন্তু অন্যান্য শক্তি ও দ্বিধাসন্দেহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলছে এবং তায় পরিবেষ্টিত হবার পুরানো ভীতি আবার দেখা দিয়েছে। কিন্তু সে যাই হোক, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন করবার কাজেই সোভিয়েটকে এখন বহুদিন ব্যস্ত থাকতে হবে। তবু দেশজয়ের দিক দিয়ে না হোক, অন্যদিক দিয়ে প্রভাববিস্তারের আকাঙ্ক্ষা সোভিয়েট ইউনিয়নের যথেষ্ট আছে। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ আজ সোভিয়েট ইউনিয়নের মত রাজনৈতিক দিক দিয়ে এতখানি সুসংবদ্ধ এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়; যদিচ সেখানকার সাম্প্রতিক কতকগুলি ঘটনা তার পুরাতন ভক্তদের মধ্যে অনেককে রূঢ় আঘাত হেনেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের বর্তমান নেতৃত্ব অবিসংবাদিতভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং সব কিছুই নির্ভর করছে তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে—তারই উপর।

বিপুল উৎপাদন ও সংগঠনক্ষমতা দেখিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র পৃথিবীকে বিস্ময়ান্বিত করেছে। এই যুদ্ধে নিঃসন্দেহে তারা নেতৃস্থানীয় অংশ গ্রহণ করেছে:

অপরদিকে এই যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অন্তর্নিহিত এক প্রক্রিয়ার গতি এত দ্রুত হয়ে উঠেছে যে তা এমন এক সমস্যায় পরিণত হয়েছে যার সমাধানে তাদের সমগ্র বুদ্ধিবিবেচনা এবং কর্মশক্তিকে নিয়োগ করতে হবে। বস্তুত, প্রচলিত অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই, আভ্যন্তরিক বা বাহ্যিক কোনো সংঘাতসংঘর্ষের সৃষ্টি না করেই তারা এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে কি না, তা এখন বলা কঠিন। অনেকেই বলছেন যে আমেরিকা এখন আর নির্লিপ্ত বা বিচ্ছিন্নবাদী নয়। এটা হতে বাধ্য, কারণ অন্যদেশে মাল রপ্তানির উপরেই আমেরিকাকে ক্রমশ অনেকখানি নির্ভর করতে হবে। যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্-সামরিক উৎপাদন-ব্যবস্থার সামান্য একটা দিক মাত্র, যেটা সহজেই উপেক্ষা করা চলত, সেটাই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধকালীন উৎপাদন যখন শান্তি ও পুনর্গঠনের উৎপাদনে রূপান্তরিত হবে, তখন সংঘাতসংঘর্ষ সৃষ্টি না করে আমেরিকা কোথায় এই বিপুল অতিরিক্ত মাল রপ্তানি করবে? কিভাবেই বা যুদ্ধপ্রত্যাগত লক্ষ লক্ষ মার্কিন সৈনিকের জীবিকার ব্যবস্থা করবে? অবশ্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে, এরকম সকল জাতিকেই এই সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে; কিন্তু অন্য কোনো দেশে সমস্যা এত বিরাট ও ব্যাপক নয়। যুদ্ধের কয়েকটা বছরে শিল্পবিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য উন্নতির ফলে মার্কিন শিল্পব্যবস্থার মধ্যে যে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তার ফলে হয় বিপুল পরিমাণে অতিরিক্ত মাল উৎপাদন হবে বা বেকার-সমস্যার উদ্ভব হবে, অথবা এ দুটোরই উদ্ভব হবে যদিচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারীভাবে বেকার-সমস্যা বেআইনী ঘোষণা করেছেন; তাছাড়া এই ধরনের ব্যাপক বেকার-সমস্যা তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করতে বাধ্য। যুদ্ধপ্রত্যাগত সৈনিকদের প্রয়োজনীয় কাজে নিযুক্ত করা সম্পর্কে এবং বেকার-সমস্যা প্রতিনিবৃত্তি-কল্পে ইতিমধ্যেই চিন্তা ও পরিকল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। যদি আমূল কোনো পরিবর্তন সাধিত না হয়, তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এই সমস্ত বিষয় বিশেষ উদ্বিগ্নতারই কারণ হয়ে দাঁড়াবে তো বটেই, এর আন্তর্জাতিক প্রতি-ক্রিয়াগুলিও হবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যাপক উৎপাদন প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি এমন বিচিত্র যে পৃথিবীর মধ্যে শক্তিসম্পদে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী দেশ হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার উৎপাদিত অতিরিক্ত পণ্য বিক্রয়ের জন্য অন্যান্য দেশের উপর নির্ভর করতে হবে। অবশ্য যুদ্ধের পরেই কয়েক বছর ধরে ইউরোপ, চীন এবং ভারতবর্ষে যন্ত্রপাতি ও পণ্যদ্রব্যের যথেষ্ট চাহিদা থাকবে এবং তাতে অতিরিক্ত মাল রপ্তানির দিক দিয়ে আমেরিকার বেশ খানিকটা সুবিধাই হবে। কিন্তু প্রত্যেক দেশই তার নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি সাধনের চেষ্টা করবে, এবং অন্য কোথাও উৎপাদিত হয় না এমন কয়েকটি বিশিষ্ট পণ্যদ্রব্য ছাড়া এক দেশ থেকে আর এক দেশে রপ্তানিযোগ্য পণ্যদ্রব্যের চাহিদা ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে উঠবে। তাছাড়া জনগণের পণ্যদ্রব্যের ব্যবহার-ক্ষমতা তাদের ক্রয়-

ক্ষমতার দ্বারাই পরিচালিত, সুতরাং তা বৃদ্ধি করতে হলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলগত পরিবর্তনও একান্ত অপরিহার্য হয়ে উঠবে। পৃথিবীব্যাপী জীবনযাত্রার স্তর যদি আজ বেশ খানিকটা উন্নীত হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্য এবং পণ্যদ্রব্যের আদানপ্রদানও উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু যদি সেই উন্নতিসাধন করতে হয়, তাহলে উপনিবেশ এবং পশ্চাৎপর দেশসমূহের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উপর থেকে সকল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাধাবন্ধন দূর করা প্রয়োজন। এর অর্থ ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সংঘটন ও নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন।

প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি, বিদেশে মূলধন বিনিয়োগ, লন্ডন শহরের অর্থনৈতিক নেতৃত্ব এবং বিপুল সমুদ্রগামী নৌ-ব্যবসা—এইগুলিই ছিল ইংলন্ডের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি। খাদ্যদ্রব্যের জন্য যুদ্ধের পূর্বে বৃটেনকে শতকরা ৫০ ভাগ আমদানির উপর নির্ভর করতে হত। সাম্প্রতিক খাদ্য উৎপাদনের তীব্র আন্দোলন ও প্রচেষ্টার ফলে এখন হয়তো বৃটেনকে আর আমদানির উপর অতটা নির্ভর করতে হয় না। বৃটেন তার পণ্যদ্রব্যের রপ্তানি, মূলধন বিনিয়োগ, সমুদ্রগামী নৌ-ব্যবসা, মহাজনী কারবার এবং যাকে অভিহিত করা হয় 'অদৃশ্য' রপ্তানি—এই সমস্তের সাহায্যে তার প্রচুর পরিমাণ আমদানি খাদ্যদ্রব্য এবং কাঁচামালের মূল্য পরিশোধ করত। ব্রিটিশ অর্থনীতির একটা প্রধান ও বিশিষ্ট ভিত্তিই ছিল বহির্বাণিজ্য এবং প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি ব্যবসা। ঔপনিবেশিক এলাকায় একচেটিয়া কর্তৃত্ব এবং সাম্রাজ্যের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বন্দোবস্তের সাহায্যেই বৃটেন তার এই অর্থনীতিকে বজায় ও চালু রাখতে পেরেছিল। কিন্তু এই সমস্ত একচেটিয়া কর্তৃত্ব এবং বিশেষ বন্দোবস্ত উপনিবেশগুলির এবং ব্রিটিশশাসিত দেশগুলির স্বার্থের পরিপন্থী, কাজেই অতীতের এ সমস্ত ব্যবস্থাগুলি ঠিক একই অবস্থায় ভবিষ্যতেও বজায় থাকবে কি না সন্দেহ। বৃটেনের বিদেশে বিনিযুক্ত মূলধন বিলুপ্ত হয়ে তার স্থানে বিপুল ঋণই আজ সঞ্চিত হচ্ছে এবং লন্ডন শহরের সেই অর্থনৈতিক আধিপত্যও ঘুচে গেছে। সুতরাং যুদ্ধোত্তর যুগে রপ্তানি বাণিজ্য এবং সমুদ্রগামী নৌ-ব্যবসার উপরই বৃটেনকে আরও বেশি নির্ভর করতে হবে। অপরদিকে, তার অধিক পরিমাণে রপ্তানি বাড়ানোর, এমনকি পূর্বের হারে রপ্তানি বজায় রাখারই সম্ভাবনা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছে। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ সাল, যুদ্ধপূর্ব এই কয়েকটি বছরে গ্রেট বৃটেনের আমদানি বাণিজ্যের (পুনঃ রপ্তানি বাদে) পরিমাণ ছিল গড়পড়তায় ৮৬,৬০,০০,০০০ পাউন্ড। সেই আমদানির মূল্য এইভাবে পরিশোধ করা হয়েছিল:

রপ্তানি	৪৭৮০ লক্ষ পাউন্ড
বিদেশে বিনিযুক্ত মূলধনের লভ্যাংশ ...	২০৩০ ,, ,,
সামুদ্রিক নৌ-বাণিজ্য	১০৫০ ,, ,,
অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার লভ্যাংশ	৪০০ ,, ,,
ঘাটতি	৪০০ ,, ,,
মোট :	৮৬৬০ লক্ষ পাউন্ড

যুদ্ধের ক'বছরে বৃটেন আমেরিকার লেন্ড-লীজ সাহায্য ছাড়াও ভারতবর্ষ, ইজিপ্ট, আর্জেন্টাইন এবং অন্যান্য দেশ থেকে ধারে যে প্রচুর কাঁচামাল ও জিনিসপত্র কিনেছে, সেই ঋণের পরিমাণ আজ এত বিপুল হয়ে উঠেছে যে তার বিদেশে বিনিযুক্ত মূলধন থেকে লভ্যাংশের পরিমাণ ক্রমশই হ্রাস পাবে। লর্ড কীনস্-এর হিসাব অনুযায়ী যুদ্ধের শেষে বৃটেনের এই স্টার্লিং ঋণের পরিমাণ হয়ে উঠবে প্রায় তিনশ' কোটি পাউন্ড। সুদের বাৎসরিক হার যদি শতকরা ৫ ভাগ হিসাবেও ধরা হয় তাহলে প্রতি বছর সুদ বাবদই বৃটেনকে পনেরো কোটি পাউন্ড দিয়ে যেতে হবে। সুতরাং যুদ্ধপূর্ব উপার্জনের গড়পড়তা অনুযায়ী বৃটেনকে প্রতি বছর প্রায় ত্রিশ কোটি পাউন্ড ঘাটতির সম্মুখীন হতে হবে। বৃটেন যদি রপ্তানিবাণিজ্যের দ্রুত বৃদ্ধি এবং অন্যান্য নানাভাবে উপার্জনের গড়পড়তা উন্নত করে এই ঘাটতি পূরণ না করতে পারে, তাহলে ইংলন্ডের জীবনযাত্রার উপস্থিত স্তর অনেকখানি নেমে যেতে বাধ্য হবে। এটাই বৃটেনের যুদ্ধোত্তর নীতি পরিচালনা করবে, এই বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো যদি তার বজায় রাখতে হয়, তাহলে তার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের —শুধু যা না করে উপায় নেই এরূপ সামান্য অদল-বদল করে—সেই সাম্রাজ্যের উপর তার প্রভুত্ব কায়েমী রাখতে সে বাধ্য। ঔপনিবেশিক এবং অন্যবিধ কয়েকটি দেশের সঙ্ঘবদ্ধ একটি গোষ্ঠীর প্রধান অংশীদার হিসাবেই শুধু সে একটি বিশ্ব-শক্তি হিসাবে নেতৃত্ব করতে পারে এবং প্রচুর শক্তিসম্পদে পরিপূর্ণ দুটি বিরাট শক্তি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে সে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে। এই কারণেই বৃটেন আজ তার সাম্রাজ্য বজায় রাখতে চায়, উপরন্তু নূতন নূতন এলাকায়, যেমন শ্যামে, সে তার প্রভাব ও কর্তৃত্ব বিস্তার করতে ব্যগ্র। এই কারণেই আবার আজ তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ডোমিনিয়নগুলির সঙ্গে এবং পশ্চিম ইউরোপের কোনো কোনো ছোটখাট দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করার প্রচেষ্টা হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্রিটিশনীতির লক্ষ্যস্বরূপ। উপনিবেশ এবং অধীন দেশ সম্পর্কে ফরাসী এবং ওলন্দাজরাও ব্রিটিশনীতিরই সমর্থক। ওলন্দাজ সাম্রাজ্যকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 'অনুচর সাম্রাজ্য' আখ্যা দেওয়া চলে, কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ব্যতিরেকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখাই ভার হত।

অতীত আদর্শ ও বিধিনিয়মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, অতীতের চতুঃসীমায় আবদ্ধ ব্যক্তিদের রচিত ব্রিটিশ নীতির এই ধারাগুলি বোঝা খুব সহজ। কিন্তু অতীত সেই উনিশ শতকের অর্থনৈতিক কাঠামো প্রসঙ্গেই বৃটেন আজ অত্যন্ত দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে তার অবস্থা মোটেই ভাল নয়, তার অর্থনীতি যুগোপযোগী নয়, এবং তার বাণিজ্যক্ষমতা অথবা সামরিক শক্তি—এ দুটোর কোনোটাই পূর্ব স্তরে বহাল রাখা সম্ভব নয়। অতীতের অর্থনীতি বজায় রাখার জন্য যেসব উপায় গ্রহণ করার প্রচেষ্টা চলছে সেসব উপায় মূলত দুর্বল, কারণ সেগুলি থেকে সম্ভবত উৎপন্ন হবে অবিরাম সংঘর্ষ, স্থিতিস্থাপকতার অভাব, বৃটেনের কর্তৃত্বাধীন দেশগুলির ভিতর অসন্তোষবৃদ্ধি, ফলে শেষ পর্যন্ত

বৃটেনের ভবিষ্যৎ আরও সংকটাপন্ন হয়ে উঠবে। ব্রিটিশরা যে আজ তাদের জীবনধারণ ও জীবনযাত্রার পুরানো স্তর বজায় রাখতে চেষ্টা করবে, অথবা তা আরও উন্নত করবার চেষ্টা করবে—সেটা খুব সহজবোধ্য; কিন্তু তা করতে হলে বাণিজ্য-রপ্তানির জন্য সংরক্ষিত এলাকা এবং কাঁচামাল ও সস্তা খাদ্য সংগ্রহের জন্য নিয়ন্ত্রণাধীন উপনিবেশ বা অন্যান্য এলাকার উপরই তার সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে। অর্থাৎ ব্রিটিশদের জীবনযাত্রার উন্নত স্তর বজায় রাখার জন্য এশিয়া ও আফ্রিকার কোটি কোটি জনসাধারণকে কোনোক্রমে জীবিকানির্বাহ অথবা তারও নিম্ন স্তরে জীবনযাপন করতে বাধ্য রাখা হবে। ব্রিটিশদের জীবনধারণের মান অবনত হোক, তা কেউ চায় না, কিন্তু এটা ঠিক যে, যে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা মানুষের অধম স্তরে তাদের নামিয়ে রাখে, সে ব্যবস্থা এশিয়া ও আফ্রিকা নিবাসীরা চিরদিন বরদাস্ত করবে না। যুদ্ধপূর্ব বৃটেনে ব্যক্তির বাৎসরিক আয় ও ক্রয়ক্ষমতা গড়পড়তায় ৯৭ পাউন্ড ছিল (আমেরিকায় অবশ্য তা আরও বেশি ছিল); আর ভারতে সেই আয় ছিল মাত্র ৬ পাউন্ড। এরূপ বৈষম্য বরদাস্ত করা যায় না, এবং বস্তুত ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ক্ষীয়মাণ মুনাফা শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিকেও দুর্বল করে তোলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সমস্যা খানিকটা উপলব্ধি করে, সেজন্যই তারা শিল্পবিস্তার ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করে উপনিবেশগুলির জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র। এমনকি ভারতে শিল্পবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আজ বৃটেনও কতকটা সচেতন হয়ে উঠেছে, বিশেষত বাঙলার গত বছরের দুর্ভিক্ষের পরে সেখানে অনেক লোক এ-বিষয়ে রীতিমত উদ্বিগ্নই হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভারতে শিল্পবিস্তার হবে ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রিত, এবং ব্রিটিশ শিল্পস্বার্থের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বজায় রাখাই হল ব্রিটিশ নীতির মূল লক্ষ্য। তবে ভারতবর্ষ এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশের শিল্পায়করণ অনিবার্য, প্রশ্ন শুধু এই যে তার গতি হবে কিরূপ? অবশ্য পুরানো ঔপনিবেশিক অর্থনীতি অথবা বিদেশী নিয়ন্ত্রণের উপস্থিতির সঙ্গে সেটা খাপ খাবে কি না তা সন্দেহজনক।

ব্রিটিশসাম্রাজ্য আজ যেভাবে গঠিত, তাতে একে একটা সম্পূর্ণ ভৌগোলিক সংস্থা বলা যায় না; অর্থনৈতিক বা সামরিক দিক দিয়ে কার্যকরী এক সংস্থাও এটা নয়। একে ঐতিহাসিক এবং ভাবাবেগের ব্যষ্টি হিসাবেই শুধু গণ্য করা যেতে পারে। ভাবাবেগ ও অতীতের যোগসূত্রের মূল্য আছে, কিন্তু অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দাবির সামনে শেষ পর্যন্ত এগুলি টিকে থাকার সম্ভাবনা কম। তাছাড়া, ভাবাবেগের এই বন্ধনও শুধু ব্রিটিশ জাতির সঙ্গে যারা জাতিগত সম্পর্কে জড়িত, সেই কয়টি এলাকা ও জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ভারতবর্ষ অথবা বৃটেনের অধীনে অন্যান্য উপনিবেশগুলি সম্পর্কে এটা খাটে না, বরং সেখানে অবস্থা ঠিক এর বিপরীত। দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কেও খাটে না, অন্তত পক্ষে বোয়ারদের বেলায় নয়। তাছাড়া আজ বৃটেনের প্রধান ডোমিনিয়নগুলিতে এমন কতকগুলি সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটছে, যার ফলে বৃটেনের সঙ্গে তাদের এই পরম্পরাগত যোগসূত্র ক্রমশই ক্ষীণ

হয়ে আসছে। যুদ্ধকালীন অবস্থায় প্রভূত শিল্পবিস্তারের ফলে কানাডা এক প্রতাপশালী রাষ্ট্রশক্তিতে পরিণত হয়েছে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্প্রসারণের সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ, এবং অদূর ভবিষ্যতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা ব্রিটিশ শিল্পস্বার্থের পথ আটকাবে। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যান্ডের অর্থনীতিও ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং তারা আজ উপলব্ধি করছে যে তাদের স্থান আর বৃটেনের ইউরোপীয় চক্রপথে অবস্থিত নয়, তাদের স্থান প্রশান্তমহাসাগরের এশিয়-মার্কিনী চক্রপথে—যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই নেতৃস্থানীয়। সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও ক্যানাডা এবং অস্ট্রেলিয়া ক্রমশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।

মার্কিন-নীতি ও তার প্রভাববিস্তার-প্রচেষ্টার সঙ্গে বৃটেনের ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির কোনো মিল নেই। তার রপ্তানি কারবার স্থাপনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র উন্মুক্ত ক্ষেত্রের প্রয়োজন, এবং অন্য কোনো শক্তি দ্বারা এ ব্যাপারে তাদের সীমাবদ্ধ করা বা নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা তারা সুনজরে দেখবে না। তারা আজ এশিয়ার সর্বত্র শিল্পবিস্তার এবং পৃথিবীর সর্বত্র জীবনযাত্রার হার উন্নত হোক—এই কামনা করে, এর পিছনে কোনো ভাবালুতা নেই, আছে অতিরিক্ত উৎপাদনের দ্রব্যসম্ভার রপ্তানি করার আকাঙ্ক্ষা। কাজেই আমেরিকান এবং ব্রিটিশ রপ্তানি কারবার ও নৌ-ব্যবসায়ের মধ্যে একটা সংঘর্ষ অনিবার্য বলেই মনে হয়। বিমানচলাচলব্যবস্থার দিক দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ বিশ্বপ্রভুত্ব বিস্তার করতে ইচ্ছুক এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের তার অভাব নেই—এই নিয়ে ইংলন্ডে যথেষ্ট আক্রোশের সঞ্চার হয়েছে। আমেরিকা থাইল্যান্ডের স্বাধীনতা স্থাপনের স্বপক্ষে, বৃটেন তাকে তার অর্ধ-উপনিবেশ হিসাবে রাখতে চায়। এই দুই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি—যার মূলে আছে দুই প্রকার অর্থনৈতিক লক্ষ্য—আজ পৃথিবীর সমুদয় ঔপনিবেশিক অঞ্চলকে বেষ্টন করে আছে।

বৃটেন আজ এক অদ্ভুত অবস্থায় অবস্থিত, সেই কারণেই যে ব্রিটিশ নীতির লক্ষ্য তার সাম্রাজ্য ও কমনওয়েলথকে নিবিড়তর বন্ধনে একীভূত করা—তা বোঝা সহজ। কিন্তু কঠোর বাস্তবতা ও বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহের বর্তমান ভাবধারার গতি, ডোমিনিয়নগুলির ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবোধ, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যতন্ত্রের অন্তর্নিহিত বৈষম্য—এ সমস্তই তার এই নীতির বিপক্ষে। বৃটেন যদি আজও অতীতের ভিত্তির উপর নূতন সৌধ রচনা করতে চায়, অতীত যুগের ভাবধারাকে কেন্দ্র করে আজও চিন্তা করতে থাকে, বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য ও একচেটিয়া কর্তৃত্বের স্বপ্নে আজও যদি সে বিভোর হয়ে থাকে—তাহলে বৃটেনের এই নীতি হবে নিতান্ত অদূরদর্শিতা ও বিবেচনাহীনতার পরিচায়ক। অন্য কোনো দেশের পক্ষে হয়তো এই নীতির অনুসরণ ততটা ক্ষতিকর হবে না, যতটা হবে বৃটেনের পক্ষে, কারণ যেসব হেতুর জন্য সে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিল্পপ্রসারের দিক দিয়ে বিশ্বে প্রভূত প্রভাবশালী জাতিতে পরিণত হয়েছিল, আজ সে কার্যকারণগুলি অনুপস্থিত। তা সত্ত্বেও

বৃটেনের এমন কতকগুলি গুণ—যথা সাহস ও সমবেত প্রচেষ্টার অদ্ভুত ক্ষমতা, বৈজ্ঞানিক ও গঠনমূলক দক্ষতা, এবং যে কোনো পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার আশ্চর্য শক্তি—এ সমস্ত গুণের পরিচয় সে অতীতে দিয়েছে এবং আজও দিচ্ছে। এই সব গুণ এবং তার আরও যেসব গুণ আছে, তা একটা জাতিকে সংকট ও বিপদ অতিক্রম করতে অনেকখানি সাহায্য করে। কাজেই আজ যেসব গুরুতর সমস্যার সে সম্মুখীন হয়েছে, সেগুলি সে কাটিয়ে উঠতে পারবে যদি সে তার অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করে আবার এর অর্থনৈতিক ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারে। কিন্তু সে যদি তার পুরানো পথে সাম্রাজ্য-সংযুক্ত হয়েই চলবার প্রচেষ্টা করতে থাকে, তাহলে তার পক্ষে এ সংকটগুলি কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প।

অবশ্য মার্কিন এবং সোভিয়েট নীতির উপরই সব কিছু অনেকখানি নির্ভর করবে, বিশেষত এদের নীতির কতখানি পারস্পরিক সামঞ্জস্য অথবা বৈপরীত্য থাকবে এবং বৃটেনের সঙ্গেও তাদের কতটা মিল থাকবে—সেটাই হবে প্রধান। বিশ্বশান্তি এবং বিশ্বসহযোগিতা সংরক্ষণের জন্য এই তিন বিশ্বশক্তির সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আজ সকলে জোর গলায় অনেক কিছুই বলে, কিন্তু কার্যত দেখা যায় যে যুদ্ধকালীন অবস্থাতেও প্রতি পদে এদের পারস্পরিক ভেদাবিভেদই আত্মপ্রকাশ করছে। ভবিষ্যতে আর যাই নিহিত থাকুক না কেন, এটা ঠিক যে এই যুদ্ধের পরে মার্কিন অর্থনীতির অত্যুগ্র সম্প্রসারণপ্রবণতার ফলাফল হবে প্রায় বিস্ফোরক তুল্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির এই বিস্তার কি একটা নূতন ধরনের সাম্রাজ্যবাদই প্রবর্তন করবে? তা যদি হয়, তাহলে সেটা হবে আর একটা মর্মান্তিক ঘটনা; কারণ ভবিষ্যতের গতি নির্ধারণ করে দেওয়ার মত শক্তি ও সুযোগ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুই-ই আছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ নীতি যদিচ এপর্যন্ত রহস্যাবৃতই রয়েছে, কিন্তু মাঝে মাঝে তার কয়েকটি ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই আত্মপ্রকাশ করেছে। তার সীমান্ত-প্রদেশের নিকটবর্তী অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে তার ইচ্ছা এই যে তাদের মধ্যে বেশির ভাগই তার প্রতি হয় মৈত্রীভাবাপন্ন, নয় তার উপর সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে উঠুক—সোভিয়েট নীতির প্রধান লক্ষ্যই এই। কোনো এক প্রকারের বিশ্বসংগঠন গড়ে তোলবার জন্য যদিচ সে অন্যান্য বিশ্ব-শক্তিগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করছে, তা সত্ত্বেও নিজের সম্পর্কে সে তার শক্তি ও ক্ষমতাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবেই গড়ে তুলতে চায়। আর তা হয়তো অন্যান্য প্রত্যেক জাতিই চায়—অন্ততপক্ষে যতদূর তাদের সাধ্যে কুলায়। বিশ্বসহযোগিতার ভূমিকা হিসাবে এটাকে খুব সন্তোষজনক সূচনা বলা যায় না। রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ে বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যেমন একটা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, সে সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়নের আর অন্যান্য দেশের মধ্যে তা নেই। কিন্তু অন্যদিকে, সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে অন্যান্য সমস্ত দেশের পার্থক্য বেশি গভীর; পরস্পরের

দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তফাৎ অনেক বেশি, এবং যুদ্ধকালীন সহযোগিতার ফলেও তাদের পারস্পরিক দ্বিধাসন্দেহের অবসান হয়নি। এ বৈষম্যগুলি যদি ক্রমশ তীব্রতরই হতে থাকে, তাহলে স্বভাবতই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতাও বৃদ্ধি পাবে এবং তারা সোভিয়েট ইউনিয়ন ও তার দলভুক্ত জাতিগুলির বিপরীতে পরস্পরের সহায়তা কামনা করবে।

ভবিষ্যতের এই চিত্রে এশিয়া এবং আফ্রিকার কোটি কোটি জনতার স্থান কোথায়? নিজেদের অবস্থা ও ভবিতব্য সম্পর্কে আজ তারা ক্রমশই সচেতন হয়ে উঠেছে, সেই সঙ্গে পৃথিবী সম্পর্কেও তাদের চেতনা উদ্দীপ্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক আজ উৎসাহভরে আন্তর্জাতিক ঘটনাপরিস্থিতির ক্রমবিকাশ অনুধাবন করে। তাদের কাছে আন্তর্জাতিক ঘটনাপুঞ্জের প্রত্যেকটি ঘটনা বিচারের অনিবার্য মাপকাঠি হল: এই ঘটনা কি আমাদের মুক্তি ও স্বাধীনতার পথকে উন্মুক্ত করছে? এটা কি এক দেশ কর্তৃক অপর দেশের উপর প্রভুত্ববিস্তারের অবসান করবে? এর ফলে কি আমরা নিজেদের ইচ্ছামত স্বাধীন জীবন গড়ে অপরের সঙ্গে সহযোগিতায় বাস করতে পারব? এই ঘটনা কি প্রত্যেক জাতি এবং সম্প্রদায়ের সামনে সমান অধিকার ও সমান সুবিধার পথ খুলে দেবে? দারিদ্র্য এবং অশিক্ষার সমূল উচ্ছেদসাধন এবং উন্নত জীবনযাপনের অঙ্গীকার কি এই ঘটনায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে? এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণ নিজের নিজের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ; কিন্তু তাদের এই জাতীয়তাবাদ অন্যের উপর প্রভুত্বপ্রতিষ্ঠা অথবা অন্যের ব্যাপারে অযথা হস্তক্ষেপে মোটেই উদ্যত নয়। বিশ্ব সহযোগিতা এবং বিশ্বব্যাপী একটা আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার যে কোনো প্রচেষ্টাকেই তারা সাদরে বরণ করে, তবে তাদের মনে সন্দেহ জাগে—এই আন্তর্জাতিক সংগঠনের মারফৎ পুরানো প্রভুত্বকেই বজায় রাখার এ একটা কৌশল নয় তো? এশিয়া এবং আফ্রিকার বহু সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলের উদ্বুদ্ধ জনতা আজ অসন্তোষ ও বিক্ষোভে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তাদের বর্তমান অবস্থা আর তারা বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নয়। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সমস্যা ও সংকটের রূপ বিভিন্ন; কিন্তু এই বিরাট ভূখণ্ডের সর্বত্রই, চীন এবং ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এবং পশ্চিম এশিয়া ও আরব জগৎ—এশিয়ার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত অন্তঃসলিলার মত একটা ভাবাবেগ, একটা অদৃশ্য যোগসূত্র প্রবহমাণ। এই যোগসূত্রই তাদের সকলকে একসূত্রে গ্রথিত করে রেখেছে।

এক হাজার বছর অথবা তার চেয়েও দীর্ঘদিনব্যাপী সময়ের মধ্যে সমগ্র ইউরোপ যখন চরম বর্বরতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন মানবসভ্যতা এবং মানব আত্মার অগ্রগতির প্রতীকই ছিল এশিয়া। এশিয়াতে তখন ধারাবাহিকভাবে একটির পর একটি চমকপ্রদ সাংস্কৃতিক যুগের প্রবর্তন হচ্ছিল, সভ্যতা ও শক্তি বিকাশের এক একটি বিপুল কেন্দ্র গড়ে উঠছিল। প্রায় পাঁচ শ' বছর আগে ইউরোপীয় সভ্যতা পুনরুজ্জীবিত হয়; শতাধিক বছর ধরে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বিস্তৃত হতে হতে শেষ পর্যন্ত শক্তিসম্পদ ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ইউরোপই বিশ্বে প্রাধান্যলাভ করল।

সভ্যতার এই উত্থানপতনের ইতিহাসের কি কোনো এক গতিচক্র আছে এবং এই চক্রের গতি কি আবার বিপরীতমুখী হয়েছে? সুদূর পশ্চিমে আমেরিকা এবং ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগহীন পূর্ব ইউরোপেই আজ ক্রমশ শক্তি ও ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। সুদূর প্রাচ্যে সাইবিরিয়াতে দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং প্রাচ্যের অন্যান্য দেশও আজ দ্রুত অগ্রগতি ও পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতে কি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে সংঘর্ষ বাধবে, না এই দুইয়ের মধ্যে নূতন এক ভারসাম্য স্থাপিত হবে?

কিন্তু সুদূর ভবিষ্যৎই এসব প্রশ্নের সমাধান করবে, আজ অত দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার প্রচেষ্টার কোনো সার্থকতা নেই। আজকের মত আমাদের শুধু প্রতিদিনকার বহু সমস্যার বোঝাই টেনে যেতে হবে। অন্যান্য আরও অনেক দেশের মত ভারতবর্ষেও এই সমস্ত সমস্যার পিছনে চাপা রয়েছে আসল প্রশ্ন—এ প্রশ্ন শুধু ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় গণতন্ত্র সাদৃশ্য গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেই নয়, সুদূরপ্রসারী সমাজ-বিপ্লবের প্রবর্তনও এর সঙ্গে জড়িত। গণতন্ত্রের ক্রমধারা থেকে এই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের উদ্ভব হয়েছে, সুতরাং যারা এই পরিবর্তনের বিরোধী তারা আজ গণতন্ত্রের যৌক্তিকতা সম্বন্ধেই নানারকম দ্বিধাসন্দেহ প্রকাশ করছে; আর এই দ্বিধাসন্দেহ থেকেই উৎসারিত হচ্ছে ফ্যাসিস্ট ভাবধারা এবং সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সংরক্ষণ। আজকের দিনে ভারতবর্ষে আমাদের সমস্ত সমস্যার মূল উৎস হল একটাই—সমাজ-পরিবর্তনের বিরোধিতা। সাম্প্রদায়িক অথবা সংখ্যালঘু সমস্যা, দেশীয় রাজন্যবর্গ সম্পর্কিত সমস্যা, কায়েমীস্বার্থ, জমিদারী প্রথা, ধর্মগত সম্প্রদায় ও ব্রিটিশ কর্তৃত্ব সংরক্ষণের সমস্যা, অথবা ভারতের শিল্পবিস্তারের সমস্যা—এ সবেরই মূলে আছে ঐ একই কারণ। সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য, সেই কারণেই ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ক্ষেত্রে গণতন্ত্র অনুপযুক্ত ইত্যাদি যুক্তি-জালে ভারতবর্ষে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা চলছে। প্রকৃতির বৈচিত্র্য এবং পার্থক্য সত্ত্বেও, ভারতবর্ষের সমস্যাবলীর সঙ্গে চীন অথবা স্পেন অথবা ইউরোপ এশিয়ার অন্য অনেক দেশের সমস্যার একটা মূলগত সাদৃশ্য আছে। যুদ্ধের মধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নাৎসী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে যে দুর্বার প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, সেই আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের সংঘাতসংঘর্ষের অনেকখানি মিল আছে। পৃথিবীর সর্বত্রই আজ সামাজিক শক্তিপ্রবাহের পুরাতন ভারসাম্যের নড়চড় হয়ে গেছে এবং তার স্থানে যতক্ষণ না নূতন এক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত উত্তেজনা, উপদ্রব ও সংঘর্ষের অবসান হবে না। আর আজকের এই মুহূর্তের এই সমস্ত সমস্যাই আমাদের যুগের মূল ও প্রধান সমস্যার দিকে অঙ্গুলিসংকেত করছে: গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয় কিভাবে সাধিত হবে, কি করে ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং উদ্যোগ বজায় রেখে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে জাতির অর্থনৈতিক জীবনের কেন্দ্রীভূত সমাজতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ এবং পরিকল্পনা সম্ভব হবে।

১৩ : স্বাধীনতা এবং সাম্রাজ্য

ভবিষ্যতের ইতিহাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন অনিবার্যভাবেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। দুটি উন্নত দেশের মধ্যে যত দিক দিয়ে পার্থক্য থাকা সম্ভব তা এদের ভিতর বর্তমান, এমনকি এই দুটি দেশের দোষত্রুটিগুলিও পরস্পর বিপরীত। নিছক একটা রাজনৈতিক গণতন্ত্রের দোষত্রুটিগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিতর প্রকট, অন্যদিকে রাজনৈতিক গণতান্ত্রিকতার অভাবজনিত সমস্ত কুফলই সোভিয়েট ইউনিয়নে উপস্থিত। তা সত্ত্বেও তাদের পরস্পরের মধ্যে আবার অনেক সাদৃশ্যও বর্তমান—যথা প্রাণবন্ত দৃষ্টিভঙ্গি, শক্তিসম্পদের প্রাচুর্য, মধ্যযুগীয় পটভূমিকার অভাব, বিজ্ঞান এবং বাস্তবজীবনে তার প্রয়োগে নিষ্ঠা, শিক্ষা ও জনগণের সুযোগ সুবিধার ব্যাপকতা। উপার্জনের প্রচণ্ড তারতম্য এবং বৈষম্য সত্ত্বেও আমেরিকায় অন্যান্য দেশের মত কোনো কঠিন শ্রেণীবিভাগ গড়ে ওঠেনি এবং জনসাধারণের মধ্যে একটা সাম্যবোধের অনুভূতি বর্তমান। গত বিশ বছরে সোভিয়েট ইউনিয়নে জনগণের মধ্যে ব্যাপক ও বিস্তৃত শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রসার হয়েছে। কাজেই দেখা যায় যে একটা প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সমাজসংগঠন গড়ে তোলার সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ এই দুই দেশেরই প্রচুর পরিমাণে আছে, কারণ অশিক্ষিত ও উদাসীন জনসাধারণের উপর সংকীর্ণ বিদগ্ধগোষ্ঠীর শাসনের ভিত্তিতে তো আর এরূপ সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় না। আবার, শিক্ষা এবং সংস্কৃতিতে অগ্রসর এক জনসাধারণের উপর এই ধরনের সংকীর্ণ বিদগ্ধগোষ্ঠীর প্রভুত্ব বেশিদিন স্থায়ী হতে পারে না।

একশ' বছর আগে সমসাময়িক আমেরিকা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে দ্য ট্যকেভিল্ বলেছিলেন: 'গণতান্ত্রিক আদর্শ একদিকে যেমন মানুষকে বিজ্ঞানচর্চায় প্রণোদিত করতে পারে না, অপরদিকে এই আদর্শ—যেসব লোক বিজ্ঞানচর্চা করে, তাদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দেয়...অসাম্যের অবস্থা যদি স্থায়ী হয়, তার ফলে মানুষ ক্রমেই বিমূর্ত তথ্যের প্রগল্ভ ও নিরর্থক গবেষণার মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখে, যদিচ গণতান্ত্রিক সংগঠন ও সমাজব্যবস্থা মানুষকে বিজ্ঞানের আশু এবং বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকরী ফলগুলির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করে। এই গতিপ্রবণতাই স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী।' এই সময়ের ভিতর আমেরিকা উন্নত ও পরিবর্তিত হয়ে, বহুজাতির সম্মিলনক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু চরিত্রের মূলগত বৈশিষ্ট্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

এসব ছাড়া আমেরিকা এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে আর একটা বৈশিষ্ট্য-গত সাদৃশ্যও আছে। এশিয়া ও ইউরোপ অতীতের যে গুরুভার বহন করে চলেছে, যে বোঝার চাপে তারা নিষ্পেষিত হয়ে আসছে, যেটা তাদের কার্যকলাপ ও সংঘাত-সংঘর্ষকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করে আসছে—সেই বোঝা থেকে এরা দুজনেই সম্পূর্ণ মুক্ত। অবশ্য অন্য সকলের মতই বর্তমান যুগের দুর্বহ বোঝা তারাও

এড়িয়ে যেতে পারে না, কিন্তু অন্যের সঙ্গে যেখানে তারা জড়িত সে ক্ষেত্রে তাদের অতীত অনেক মুক্ত এবং ভবিষ্যতের পথে তাদের যাত্রা অনেক বেশি ভারশূন্য।

ফলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির যেমন অন্য দেশের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ স্থাপনের প্রচেষ্টা অতীত দ্বিধা সন্দেহের পটভূমিকা দ্বারা ব্যাহত হয়, এই দুটি রাষ্ট্রশক্তির ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের সেই দ্বিধা সন্দেহের অবকাশ থাকে না। অবশ্য সোভিয়েট ইউনিয়ন বা আমেরিকার অতীতও যে সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক এবং অম্লান, তা নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজও নিগ্রোজাতি সম্পর্কিত বৈষম্যে জর্জরিত; তাদের বহু-ঘোষিত গণতন্ত্র এবং সাম্যবোধের বিরুদ্ধে এটা একটা জ্বলন্ত অভিযোগ। যে তীব্র পারস্পরিক ঘৃণাবিদ্বেষে পূর্ব ইউরোপের অতীত ইতিহাস ছিল কলঙ্কিত, সোভিয়েট ইউনিয়ন এখনও তা বিলুপ্ত করতে পারেনি এবং বর্তমান যুদ্ধ সে তিক্ততার মাত্রা বাড়িয়ে চলেছে। তবুও অন্য দেশে গিয়ে আমেরিকানরা সহজেই বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে এবং রাশিয়ানরা জাতিবৈষম্যবোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

ইউরোপের অন্যান্য প্রায় সকল জাতিই পারস্পরিক বিদ্বেষ এবং অতীতের সংঘাত-সংঘর্ষ এবং অন্যায়াচারের তিক্ত স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত। এর উপর আবার এদের মধ্যে যেসব রাষ্ট্রশক্তি সাম্রাজ্যবাদী, তারা তাদের অধীন জনগণের তীব্র বিরাগও অর্জন করেছে। সাম্রাজ্যপ্রভুত্বের সুদীর্ঘ ইতিহাসের জন্য ইংলন্ডেরই এই তিক্ততার বোঝা সবচেয়ে বেশি। হয়তো এই কারণেই অথবা কতকগুলি জাতিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য ইংরেজরা স্বভাবতই গম্ভীর এবং উন্নাসিক এবং সহজে তারা অন্যের সঙ্গে বন্ধুত্বস্থাপন করতে পারে না। দুর্ভাগ্যবশত বিদেশে সরকারী প্রতিনিধিদের দিয়েই ইংরাজদের বিচার করা হয়, যারা সাধারণত ইংরাজ জাতির বদান্যতা বা সংস্কৃতির বাহক নয়; এদের উন্নাসিকতার সঙ্গে অনেক সময়ই মিশ্রিত থাকে একটা বকধার্মিকতা। অপরের মনে বিদ্বেষ সঞ্চার করতে এরা সিদ্ধহস্ত। মাসকয়েক আগে ভারতসরকারের জনৈক কর্মকর্তা অন্তরীণে আবদ্ধ গান্ধীজিকে একটি সরকারী চিঠি লিখেছিলেন—এ চিঠি ইচ্ছাকৃত ঔদ্ধত্যের একটা উদাহরণস্বরূপ, এবং বহুলোক এই চিঠি ভারতবাসীর প্রতি এক ইচ্ছাকৃত অবমাননা হিসাবেই ধরে নিয়েছিল—কারণ গান্ধীজিই তো ভারতের মূর্ত প্রতীক।

সাম্রাজ্যতন্ত্রের নূতন একটা যুগসূচনা অথবা আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বা বিশ্বরাষ্ট্র সংঘ—ভবিষ্যতে কোনটা রূপায়িত হবে? দাঁড়ির পাল্লাটা প্রথমটির দিকে ঝুঁকেছে এবং এর সাফাই করার জন্য সেই সব পুরানো যুক্তির অবতারণা করা হচ্ছে—তবে আগের মত সরলভাবে নয়। মানুষের নৈতিক প্রেরণা ও আত্মত্যাগ হীন কার্য সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা হচ্ছে; এবং শাসকগোষ্ঠী মানুষের অন্তরের মহত্ত্ব ও সদ্‌গুণগুলি অসৎ উদ্দেশ্যে খাটাচ্ছে, আর মানুষের মনের ভয়ভীতি, ঈর্ষাবিদ্বেষ এবং বৃথা আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করছে। আগে তারা সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে অনেক বেশি সরল ও অকুণ্ঠিত ছিল। প্রাচীন কালের এ্যাথেন্স সাম্রাজ্য সম্পর্কে থুসিডাইডিস্ লিখেছিলেন: 'নিজেদের বাহুবলে আমরা বর্বরদের বিতাড়িত

করেছি, অথবা আমাদের স্বজাতি স্বজন ও সভ্যতা রক্ষা করার জন্য নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন করেছি সেজন্য আমাদের সাম্রাজ্যে অধিকার আছে—এরূপ কোনো বড়াই করতে আমরা চাই না। আত্মরক্ষার প্রচেষ্টার জন্য মানুষকে যেমন দোষী করা যায় না, একটা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তাই। আমরা যে আজ সিসিলীতে উপস্থিত, নিছক নিজেদের নিরাপত্তা বজায় রাখার উদ্দেশ্য ছাড়া তার আর অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই...ভীতিই আমাদের গ্রীক সাম্রাজ্য আঁকড়ে রাখতে বাধ্য করে, ভীতিই আবার আমাদের এখানে ঠেলে দিয়েছে, যাতে বন্ধুদের সাহায্যে সিসিলীতে সমস্ত ব্যাপার আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।' এ্যাথেন্স উপনিবেশগুলির করপ্রদান প্রসঙ্গে তিনি আবার বলেছেন: 'এরূপ জয়লাভ করা হয়তো আমাদের অন্যায়ই হয়েছে, কিন্তু একে মুক্তি দেওয়াও নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা।'

গণতন্ত্রের সঙ্গে সাম্রাজ্যতন্ত্রের গরমিল, উপনিবেশের উপর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারিতা, সেই সাম্রাজ্যের দ্রুত অবনতি, অনিবার্য পতন—এরই শিক্ষায় পরিপূর্ণ এ্যাথেন্সের ইতিহাস। আজকের দিনেও স্বাধীনতা এবং সাম্রাজ্যের যে কোনো অকুণ্ঠ সমর্থকই থুসিডাইডিস্-এর মত এত চমৎকারভাবে নিজের মতবাদের সমর্থন করতে পারবে না। থুসিডাইডিস্ বলেছেন: "আমরা সভ্যতার অবিসংবাদিত নেতা, আমরা মনুষ্যজাতির পথপ্রদর্শক। আমাদের এই সমাজব্যবস্থা এবং আচারঅনুষ্ঠানই হল মানুষের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদস্বরূপ। আমাদের প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত হওয়া দাসত্ব নয়, সেটা একটা সৌভাগ্য বিশেষ। যে সম্পদ আজ আমরা দান করছি, প্রাচ্যের সমগ্র বিত্ত ঐশ্বর্য দিয়েও তা পরিশোধ করা যায় না। যে সম্পদ ও বিত্তের স্রোত আমাদের দিকে প্রবাহিত, তা দিয়ে আমরা সানন্দে আমাদের কাজ করে যাব, কারণ অন্যেরা যতই চেষ্টা করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত সকলেই আমাদের কাছে ঋণী থাকবে। কারণ বহু কর্মপ্রয়াস ও বহু দুঃখ আয়াসের ভিতর দিয়ে বিধ্বস্ত বহু রণাঙ্গনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা মানবিক শক্তি—যার সঙ্গে মনুষ্যজীবনের রহস্য জড়িত—তার গোপন উৎসের সন্ধান পেয়েছি। বিভিন্ন নামে অভিহিত করে, অন্যেরাও এই উৎসমূল সন্ধান করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু একমাত্র আমরাই তার সন্ধান জেনেছি এবং এই এ্যাথেন্স শহরে তাকে স্থাপন করেছি। আর তাকে 'স্বাধীনতা' নামেই জানি, এবং তা থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছি যে কর্তব্যপালনের ভিতর দিয়ে মানুষ মুক্ত হয়, স্বাধীন হয়। সুতরাং সমগ্র মনুষ্যজাতির মধ্যে যে একমাত্র আমরাই মানুষের হিতসাধন করি, সুযোগসুবিধা দান করি, আত্মস্বার্থের ভিত্তিতে নয়—স্বাধীনতার নিঃশঙ্ক উদারতায়, তাতে কি বিস্ময়ের কোনো কারণ আছে?"

আজকের দিনে গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার কথা যখন জোর গলায় ঘোষিত হয়, কিন্তু মাত্র কয়েকটি দেশের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তখন থুসিডাইডিস্-এর এই বাণী বড় পরিচিত মনে হয়। এর ভিতর সত্যও যতখানি আছে সত্যের অপলাপও ততখানিই আছে। বাদবাকি মনুষ্যজাতি সম্বন্ধে থুসিডাইডিস্-এর সামান্যই জ্ঞান ছিল, তাঁর দৃষ্টি ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর জন্মভূমি

সুবিখ্যাত এ্যাথেন্স শহরের স্বাধীনতার গর্বে তিনি ছিলেন গর্বিত, মানুষের শক্তি ও সুখের উৎসস্বরূপ এই স্বাধীনতার প্রশংসায় তিনি মুখরিত, অথচ অপরেও যে সেই স্বাধীনতা কামনা করতে পারে, সে উপলব্ধি তাঁর ছিল না। স্বাধীনতার একনিষ্ঠ অনুরাগী এ্যাথেন্সই আবার মেলস্ শহর লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে মেলস্-এর সমগ্র সাবালক পুরুষকে হত্যা করে, সমস্ত নারী ও শিশুকে পণ্যের মত বিক্রি করে। থুসিডাইডিস্ যখন এ্যাথেন্সের সাম্রাজ্য ও স্বাধীনতার মহিমাকীর্তনে রত ছিলেন তখনই সেই সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ছিল এবং সেই স্বাধীনতার সমাপ্তি হয়েছিল।

কারণ, অপরের উপর প্রভুত্বপ্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীনতার সমন্বয়সাধন কখনই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। একটা আর একটাকে পরাভূত করবেই এবং সাম্রাজ্যের মহিমা ও গৌরবের শিখরে পেঁছানো এবং তার পতনের মধ্যে সময়ের বিভাগ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। আগের চেয়ে আজকের দিনে স্বাধীনতা অনেক বেশি অবিভাজ্য। পেরিক্লিস তাঁর প্রিয় নগরী এ্যাথেন্স-এর গুণকীর্তনে তাঁর অপূর্ব কাব্য রচনা করার অল্পদিন পরেই এ্যাথেন্স-এর পতন হয় এবং স্পার্টান সৈন্যের দল এ্যাথেন্সের 'এ্যাক্রোপলিস' অধিকার করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর কাব্য আজও আমাদের মনকে অভিভূত করে, কারণ তার প্রতিটি ছত্র অসীম সৌন্দর্যবোধ, অনন্ত জ্ঞান, শঙ্কাহীন স্বাধীনতা এবং অপরিসীম শৌর্যে উচ্ছ্বল—শুধু এ্যাথেন্স-এর পরিপ্রেক্ষিতে নয়, বিশ্বের বৃহত্তম পরিপ্রেক্ষিতেও সেগুলি আজও সমানভাবে প্রযোজ্য। পেরিক্লিস বলেছিলেন: 'সুন্দরের উপাসক আমরা কিন্তু তার বাহুল্যবর্জিত; জ্ঞানের উপাসক আমরা কিন্তু তার নিবীর্যতা বর্জিত। ধনসম্পদ আমাদের কাছে বাগাড়ম্বরের উপাদান নয়, কীর্তিপ্রতিষ্ঠার সুযোগস্বরূপ। দারিদ্র্যকে স্বীকার করতে আমাদের কুণ্ঠা নেই, কিন্তু দারিদ্র্যকে পরাজিত করার নিশ্চেষ্টতাকে আমরা সত্যকার অবনতির লক্ষণ হিসাবে গণ্য করি...আসুন আমরা শক্তি আহরণ করি, সেই পুনরাবৃত্তিদুষ্ট যুক্তি—যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসের পরিচয়দান কি মহান ও সুন্দর, তা থেকে নয়—এই মহানগরীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কর্মব্যস্ত দৃশ্য থেকে; তাকে যত দেখি ততই তার প্রেমে নিমগ্ন হয়ে, এবং এই কথা স্মরণ রেখে যে এই মহানগরীর মহত্ত্বের মূলে আছে অসংখ্য বীরের অসমসাহসিক বীরত্ব, বিজ্ঞজনের অসীম কর্তব্যবোধ, এবং সে কর্তব্য সম্পন্ন করায় সৎ ব্যক্তির নিয়মানুবর্তিতা—সেই সব ব্যক্তির, যারা কোনো এক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হলে, তাদের প্রিয় নগরীকে তাদের সেবা থেকে বঞ্চিত না করে, শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলির স্বরূপ নিজ জীবন বলি দিত। তাদের মর্তদেহ তারা তাদের রাষ্ট্রকে অর্পণ করে প্রতিদানে তারা প্রত্যেকে লাভ করত অমর গৌরব এবং সর্বোৎকৃষ্ট স্মৃতিসৌধ। এই স্মৃতিসৌধ যেখানে তাদের মর্তাবশেষ প্রোথিত সেটা নয়, মানুষের মনে—যেখানে তাদের স্মৃতি চিরনবীন, তাদের কীর্তিকলাপই আবার নূতন করে মানুষকে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে উদ্বুদ্ধ করে। সারা বিশ্বই বিখ্যাত ব্যক্তির স্মৃতিসৌধ-স্বরূপ; এবং তাদের কাহিনী তাদের দেশের মাটির উপর পাথরে খোদাই করা থাকে না—সে কাহিনী সুদূর প্রসারিত হয়ে মূর্ত প্রতীক ব্যতিরেকেই সকল

মানুষের জীবনে গ্রথিত হয়ে বাস করে। জীবনের সুখের উৎস হল স্বাধীনতা, স্বাধীনতার উৎস হল অন্তরের সাহস—শত্রুর আক্রমণ এড়িয়ে না-যাওয়া, এই কথা জেনে তোমার আমার জন্য বাকি আছে শুধু তাদের মহান্ কীর্তি অতিক্রম করা।'*

১৪ : জনসংখ্যার সমস্যা : জন্মহারের ক্রমহ্রাস এবং জাতির ক্রমক্ষয়

যুদ্ধের পাঁচ বছরে প্রচুর পরিবর্তন এবং জনসংখ্যার বিপুল স্থানচ্যুতি ঘটেছে; পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো যুগে ইতিপূর্বে বোধহয় জনসংখ্যার এমন ব্যাপক স্থানচ্যুতি ঘটেনি। এই বিশ্বযুদ্ধে, বিশেষত চীন, রাশিয়া, পোল্যান্ড এবং জার্মানীতে, হতাহত লক্ষ লক্ষ মানুষ ছাড়াও, অসংখ্য নরনারী তাদের স্বদেশ ও স্বগৃহ থেকে উৎপাটিত হতে বাধ্য হয়েছে। সামরিক প্রয়োজন, শ্রমশক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং অনেক ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক জনসংখ্যার অপসারণই ছিল এর কারণ; তাছাড়া শত্রু-সৈন্যের অগ্রগতির সামনেও অসংখ্য নরনারী বাস্তুত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। ইউরোপে তো নাৎসী চন্ডনীতির জন্য যুদ্ধের আগেই এই বাস্তুত্যাগ সমস্যা বিরাট আকার ধারণ করেছিল; কিন্তু যুদ্ধের ক'বছরের মধ্যে যা ঘটেছে তার তুলনায় সেটা অবশ্য কিছুই নয়। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফলাফল ব্যতিরেকেও ইউরোপের এসব পরিবর্তনের মূল কারণ ছিল নাৎসী অনুসৃত সুপরিকল্পিত জনসংখ্যা-উচ্ছেদ নীতি। ইউরোপের অধিবাসী কোটি কোটি ইহুদীকে তারা হত্যা করেছিল, এবং তাদের অধিকৃত দেশগুলির জনসংখ্যার সুসংবদ্ধতা তারা ধ্বংস করেছিল। নাৎসী অগ্রগতির সময়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের বহু লক্ষ নরনারী পূর্বাঞ্চলে সরে গিয়ে উরাল পর্বতমালার দুইদিকে নূতনভাবে বসতি স্থাপন করে এবং এই বসতিগুলি খুব সম্ভবত স্থায়ী হবে। আর অনুমিত হয় যে চীনে প্রায় পাঁচ কোটি লোক তাদের স্থায়ী বাসভূমি থেকে উৎপাটিত হয়েছে। সমস্যা যত বিরাটই হোক স্থানচ্যুত এই লোককে, অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা তখনও জীবিত থাকবে তাদের প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বসতির চেষ্টা যুদ্ধের পরে অবশ্যই হবে। এদের মধ্যে অনেকেই হয়তো তাদের পূর্বগৃহে প্রত্যাগমন করবে, আবার অনেকেই হয়তো তাদের নূতন পরিবেশেই রয়ে যাবে। অপরদিকে, আবার এও সম্ভব যে ইউরোপে ব্যাপক রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে জনসংখ্যার আরও স্থানচ্যুতি বা অদলবদল ঘটবে। কিন্তু যেসব শারীরবৃত্তিক ও জৈবিক পরিবর্তন সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যাকে দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত করছে, সেগুলি এসব ব্যাপারের চেয়ে অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী ও গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প-বিপ্লব এবং আধুনিক শিল্পপদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানের বিস্তারের ফলে ইউরোপে, বিশেষত উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্য ইউরোপে, জনসংখ্যা তীব্রবেগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। এই

* থুসিডাইডিস্ থেকে এই উদ্ধৃতিগুলি এ্যালফ্রেড জিমার্ন রচিত 'গ্রীক কমনওয়েলথ্' (১৯২৪) গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত।

জ্ঞান এখন ইউরোপের পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন অবধি বিস্তৃত হয়েছে; আর তার সঙ্গে এই অঞ্চলের নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি কার্যকারণের ফলে ক্রমশ এখানে জনসংখ্যা আরও আশ্চর্যগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। শিল্পপদ্ধতি-জ্ঞানের ক্রমবিস্তৃতি—শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাসহ পূর্বদিকে অভিযান করে ক্রমশই অগ্রসর হয়ে এশিয়ার বহু দেশেও বিস্তৃত হবে। এই দেশগুলির মধ্যে কয়েকটি, যেমন ভারতবর্ষে আজ জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন দূরে থাক, হ্রাস পেলেই তাদের পক্ষে কল্যাণকর।

এদিকে পাশ্চাত্য ইউরোপে জনসংখ্যার ব্যাপারে ঠিক উল্টোটা ঘটতে শুরু করেছে এবং জন্মহারের ক্রমহ্রাস আজ এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য জন্মহারের এই ক্রমহ্রাসের ধারা আজ প্রায় সমগ্র পৃথিবীতেই প্রকট হয়ে উঠেছে; কেবলমাত্র চীন, ভারতবর্ষ, যবদ্বীপ এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন এই ধারার বিশিষ্ট ব্যতিক্রম। শিল্পোন্নত দেশগুলিতেই আজ এই ধারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বহু বছর আগে থেকেই ফরাসী দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আজ তা ক্রমে হ্রাস হয়ে চলেছে। গত শতাব্দীর অষ্টম দশকেই ইংলন্ডের জন্মহার কমতে শুরু করেছিল, আজ ফরাসী দেশ বাদে সমগ্র ইউরোপের মধ্যে তার জন্মহারের সংখ্যাই সবচেয়ে কম। জার্মানী এবং ইটালীতে হিটলার এবং মুসোলিনি জন্মহারকে উন্নত করার যে চেষ্টা করেছিল, তার ফলাফল হয়েছিল নিতান্ত সাময়িক। দক্ষিণ এবং পূর্ব ইউরোপের (সোভিয়েট ইউনিয়ন বাদে) চেয়ে উত্তর, পশ্চিম এবং মধ্য ইউরোপেই জন্মহারের ক্রমহ্রাস দ্রুততর, কিন্তু সর্বত্রই একই ধারা প্রকট হয়ে উঠেছে। বর্তমান ধারা অনুযায়ী ১৯৫৫ সালেই ইউরোপের (সোভিয়েট ইউনিয়ন বাদে) জনসংখ্যার হার হবে সর্বোচ্চ, তার পর থেকেই আবার তা কমতে থাকবে। এর সঙ্গে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি—যা এই নিম্নগতিকেই তীব্রতর করবে—ধরা হয়নি।

অন্যদিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের জনসংখ্যা আজ দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, এবং সম্ভবত ১৯৭০ সালে তার জনসংখ্যা প্রায় ২৫ কোটিকে ছাড়িয়ে যাবে। যুদ্ধের ফলে সোভিয়েট ইউনিয়নের যেসব ভূমিগত পরিবর্তন হতে পারে, এই সংখ্যায়নে তা ধরা হয়নি। সুতরাং জনসংখ্যার এই দ্রুতবৃদ্ধি এবং শিল্পবিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সাহায্যে সমগ্র ইউরোপ এবং এশিয়ায় সোভিয়েট ইউনিয়ন অনিবার্যভাবেই সব চেয়ে বেশি শক্তিশালী দেশে পরিণত হবে। এশিয়ায় চীন এবং ভারতের শিল্পবিস্তারের উপর অনেক কিছু নির্ভর করবে। উৎপাদন-ক্ষমতাকে উন্নততর এবং সঠিকভাবে সংগঠিত করতে না পারলে, এই দুটো দেশের বিপুল জনসংখ্যা একদিকে তাদের একটা বোঝাস্বরূপ ও অপরদিকে একটা দুর্বলতারই কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ইউরোপে পুরানো ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির ক্রমবিস্তৃতি এবং নূতন প্রভুত্বস্থাপনের দিন ফুরিয়েছে। তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন এবং তাদের কলাকুশলতা ও কার্যদক্ষতার জন্য তারা হয়তো বিশ্বপটভূমিতে এখনও কিছুদিন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকবে, কিন্তু একজোটে সঙ্ঘবদ্ধ না হলে বিশ্বশক্তি হিসাবে তাদের

গুরুত্ব ক্রমেই কমে যাবে। 'উত্তর-পশ্চিম বা মধ্য ইউরোপের অন্য কোনো দেশ যে আবার সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস করবে তা মনে হয় না। শিল্পবিজ্ঞান-সভ্যতা অন্যান্য ক্রমাগ্রসর দেশে বিস্তৃত হওয়ার ফলে তার পাশ্চাত্য প্রতিবেশীদের মত জার্মানীরও আজ বিশ্বপ্রভুত্বের দিন ফুরিয়েছে।'*

শিল্পবিস্তার এবং শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে পাশ্চাত্য জগতের কতকগুলি দেশ ও জাতি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শক্তি ও ক্ষমতার এই উৎসের এক-চেটিয়া অধিকার যে মাত্র কয়েকটি দেশের ভিতর আবদ্ধ থাকবে, তার সম্ভাবনা খুব কম; সুতরাং আজ পৃথিবীর অন্য সমস্ত অঞ্চলের উপর ইউরোপের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভুত্ব ক্রমেই ক্ষয়প্রাপ্ত হবে এবং ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা এই তিনটি মহাদেশের শক্তিকেন্দ্র হিসাবে ইউরোপ আর বেশিদিন থাকবে না। মূলত এই কারণেই ইউরোপের পুরাতন রাষ্ট্রশক্তিগুলি ক্রমশই যুদ্ধসংঘর্ষ এড়াতে চেষ্টা করবে এবং শান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে চিন্তা ও কার্য দুইই করবে। চণ্ডনীতির পরিণাম যখন অপরিহার্য সর্বনাশ, তখন তার আকর্ষণও ক্ষীণ হয়ে আসে। যেসব রাষ্ট্রশক্তির গুরুত্ব সর্বাধিক, অন্যান্য দেশের সঙ্গে সহযোগিতার প্রেরণা তাদের বিশেষ থাকতে পারে না—অবশ্য যদি এরূপ সহ-যোগিতার একটা নৈতিক প্রেরণা তাদের মধ্যে জাগে, সেকথা আলাদা, তবে শক্তির সঙ্গে নৈতিক প্রেরণা খুব কমই সংশ্লিষ্ট থাকে।

জন্মহার সংখ্যার এই ব্যাপক হ্রাসপ্রাপ্তির মূল কারণ কি? ছোটখাট পরিমিত পরিবারের আকাঙ্ক্ষা এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের নানারকম প্রক্রিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রচলন হয়তো একটা কারণ হতে পারে, কিন্তু সকলেই স্বীকার করে যে এর জন্য বিশেষ কোনো পার্থক্য ঘটেনি। উদাহরণস্বরূপ, ক্যাথলিক ধর্মাশ্রয়ী আয়ার্ল্যান্ডে নিশ্চয়ই জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয় না এবং যদিবা হয়, তা নিতান্তই অল্প, কিন্তু দেখা যায় অন্যান্য দেশের অনেক আগে আয়ার্ল্যান্ডেই জন্মহার কমতে শুরু হয়েছিল। পাশ্চাত্যে বিবাহের বয়স ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে; এটাও একটা কারণ। অর্থনৈতিক কার্য-কারণগুলিও হয়তো খানিকটা দায়ী, কিন্তু এটাও তেমন গুরুত্বপূর্ণ কারণ নয়। ধনীদের চেয়ে দরিদ্রের মধ্যে এবং শহরের চেয়ে গ্রামাঞ্চলেই যে প্রজননের হার বেশি, এটা সকলেই জানে। সংখ্যাল্প গোষ্ঠীর পক্ষে জীবনযাত্রার উচ্চ স্তর বজায় রাখা সহজ, ব্যক্তিত্ববাদের ক্রমবিস্তারে গোষ্ঠী ও জাতির গুরুত্ব হ্রাস পায়। অধ্যাপক জে. বি. এস্. হলডেন্ বলেছেন যে, কোনো একটা বিশিষ্ট সমাজব্যবস্থায় যে

* এই উদ্ধৃতি ফ্র্যাঙ্ক ডাব্লিউ. নটেস্টাইন রচিত আমেরিকার 'ফরিন এ্যাফেয়ারস্' পত্রিকার ১৯৪৪ সালের এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত 'পপুলেশন অ্যান্ড পাওয়ার ইন্ পোস্ট-ওয়ার ইউরোপ' প্রবন্ধ থেকে গৃহীত। আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনও (আই. এল্. ও) এ-বিষয়ে ই. এম্. কুলিশার-এর গবেষণা: 'দি ডিসপ্লেসমেন্ট অফ পপুলেশন ইন্ ইউরোপ' (১৯৪৩) প্রকাশ করেছেন।

সমস্ত ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য সচরাচর সমাদৃত হয়ে থাকে, স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী দেখা গিয়েছে যে, সাধারণ লোকদের চেয়ে এই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রজননশক্তি অনেক কম। সুতরাং জৈবিক দিক দিয়ে এই সমস্ত সমাজব্যবস্থার স্থিতিশীলতা কম। বিরাট পরিবারের সঙ্গে সাধারণত নিম্নস্তরের বুদ্ধিবৃত্তি সংশ্লিষ্ট করা হয় এবং অর্থনৈতিক সাফল্যও সাধারণত জৈবিক বা প্রজনন সাফল্যের বিপরীত বলে ধরা হয়।

জন্মহারের এই ক্রমহ্রাসের মূল কারণ সম্বন্ধে এখনও বিশেষ কিছু জানা নেই, যদিচ কতকগুলি অপ্রধান কারণ অনেক সময় উত্থাপিত হয়। অবশ্য এর পিছনে হয়তো কতকগুলি শারীরবৃত্তিক ও জৈবিক কারণ নিহিত আছে—শিল্পোন্নত সম্প্রদায়গুলি যে জীবনযাত্রা অবলম্বন করে এবং যে পরিবেশে বাস করে—সেগুলি হয়তো এর থেকে উৎপন্ন। খাদ্যশক্তির অপ্রাচুর্য, মদ্যাসক্তি, স্নায়ুদৌর্বল্য অথবা মানসিক ও দৈহিক অস্বাস্থ্য—এ সবই প্রজননশক্তিকে প্রভাবিত করে। কিন্তু অপরদিকে দেখা গেছে যে, রোগে আক্রান্ত ও পীড়িত সম্প্রদায়গুলি, যেমন ভারতবর্ষে, খাদ্যাভাব সত্ত্বেও দ্রুতগতিতে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে। আধুনিক জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত, বিচ্ছেদহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সংশ্লিষ্ট দুশ্চিন্তা—এইগুলিই হয়তো প্রজননশক্তিকে দুর্বল করে ফেলে। প্রাণসঞ্চার করে যে মাটি—সেই মাটির সঙ্গে মানুষের যোগ ক্রমেই কমে যাচ্ছে, সেটাও একটা কারণবিশেষ। এমনকি আমেরিকাতেও শহরের চাকুরীজীবী শ্রেণীর চেয়ে গ্রামাঞ্চলের কৃষিকর্মে নিযুক্ত লোকদের প্রজননশক্তি প্রায় দ্বিগুণ।

পাশ্চাত্যে যে আধুনিক সভ্যতা প্রথম বিকশিত হয়, এবং ক্রমশ যা পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত হয়ে পড়ে, যার প্রধান বৈশিষ্ট্যই শহুরে জীবন, সে সভ্যতার আওতায় একটা স্থিতিস্থাপকতাহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে যেটা ক্রমশই জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলে। নানাভিমুখে প্রাণের প্রবাহ সঞ্চারিত হয়, কিন্তু তার শক্তি সহজেই ক্ষীণ হয়ে কৃত্রিমতাদুষ্ট হয় এবং অবশেষে তাতে ভাটা পড়ে যায়। সুতরাং তখন নানারকম উত্তেজকের প্রয়োজন হয়—তাই নিদ্রার জন্য, আমাদের অন্যান্য প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য চাই নানারকম ঔষধপত্র; তাই শরীরের ক্ষতি হলেও আমাদের চাই এমন সব খাদ্য ও পানীয় যা শুধু ক্ষণিকের জিহ্বার তৃপ্তি আর একটা সাময়িক আনন্দ দেয়—তাই সাময়িক একটা উত্তেজনা ও আনন্দানুভূতির জন্য আমাদের চাই আরও কত কি—কিন্তু এই সাময়িক উত্তেজনার পরেই শুরু হয় তার প্রতিক্রিয়া, তখন একটা শূন্যতায় মন ছেয়ে যায়। তার অনেক মহান অভিব্যক্তি ও সত্যকার কীর্তিকলাপ সত্ত্বেও আমরা এমন একটা সভ্যতা গড়ে তুলেছি যার কোথায় যেন মেকিত্ব রয়ে গেছে। আমরা কৃত্রিম সার দিয়ে উৎপন্ন কৃত্রিম খাদ্য আহার করি, আমরা কৃত্রিম ভাবাবেগ বিলাসী, মানুষের সঙ্গে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কও তলিয়ে দেখলে তেমনই ভাসা-ভাসা ঠেকে। বিজ্ঞাপনদাতাই এ যুগের আসল প্রতীক, অবিরাম তীব্র প্রচার দ্বারা সে আমাদের বিভ্রান্ত করে; আমাদের বিবেচনা-শক্তি ভোঁতা করে দিয়ে, সে আমাদের অপ্রয়োজনীয় এবং অনেক

সময় হানিকর সামগ্রী ক্রয় করতে লব্ধ করতে থাকে। এই অবস্থার জন্য আমি কাউকে দোষ দিতে চাই না। আমরা প্রত্যেকেই এই যুগ-প্রসূত, প্রত্যেকেরই এই প্রজন্মগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকট এবং আমরা প্রত্যেকেই তার দোষগুণের অংশীদার। যে সভ্যতার দোষ এবং গুণ স্বীকারে আমি মুক্তকণ্ঠ, অন্য সকলের মতই আমিও তার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ—আমার চিন্তাভাবনা, আচারব্যবহারও তার দ্বারাই প্রভাবিত।

যে সভ্যতার অন্তর্মূলে হল নিবীর্যতা এবং জাতিগত ক্ষয়িষ্ণুতা, সেই আধুনিক সভ্যতার সত্যিকারের গলদ কোথায়? সভ্যতার এই নিবীর্যতার লক্ষণ আজ নূতন নয়, আগেও তা দেখা দিয়েছে এবং মানুষের ইতিহাস তার দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। পতনোন্মুখ রোম সাম্রাজ্যের অবস্থা এর চেয়ে অনেক বেশি মন্দ ছিল। মানবসভ্যতার অন্তঃক্ষয়ের বিবর্তন কি চক্রাবর্তে ঘোরে এবং তার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে আমরা কি তাকে নির্মূল করতে সক্ষম হব? আধুনিক কালের যন্ত্রশিল্পব্যবস্থা অথবা বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই এর একমাত্র কারণ হতে পারে না, কারণ এসবের অস্তিত্ব ব্যতিরেকে পূর্বে বহুবার সভ্যতার ক্ষয়িষ্ণুতা দেখা দিয়েছে। অবশ্য এটাও সম্ভব, যে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে, এমন একটা দৈহিক ও মানসিক পরিবেশের সৃষ্টি করে, যার ভিতর সেই সব কার্যকারণ-গুলির আত্মপ্রকাশ সহজ হয়ে ওঠে। তবে এর যদি কোনো আধ্যাত্মিক কারণ থাকে, যা মানুষের মানস এবং অন্তরাত্মাকে প্রভাবিত করে, তাহলে তা হয়তো আমরা অনু-ভূতি দ্বারা উপলব্ধি করতে বা বুঝতে পারি, কিন্তু তা আমাদের দখলে আনা সম্ভব হবে না। কিন্তু এর মধ্যে একটা বিষয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট: মাটির সঙ্গে, মঙ্গলময়ী ধরিত্রীর সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হলে সেটা উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। আমাদের সমগ্র জীবনী-শক্তির উৎসই হল ধরিত্রী এবং সূর্য, এবং সেই মাটি আর সূর্যের কাছ থেকে যদি আমরা বেশিদিন দূরে সরে থাকি, তাহলে জীবনের প্রবাহে ক্রমশ ভাটা পড়তে থাকে। আধুনিক শিল্পকেন্দ্রিক সম্প্রদায়গুলি মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, কাজেই প্রকৃতিদেবীর আনন্দের ভান্ডার থেকেও তারা বঞ্চিত, মা ধরিত্রীর সংস্পর্শে উচ্ছ্বলিত স্বাস্থ্যের প্লাবনেও তারা আর সিঞ্চিত হয় না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা তারা বলে এবং মাঝে মাঝে সপ্তাহান্তিক অবসরে তারা সে সৌন্দর্যের অন্বেষণে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে সর্বত্র তাদের কৃত্রিম জীবনের জঞ্জাল ছড়িয়ে আসে, কিন্তু তারা না পারে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে, না পারে তার সঙ্গে নিজেদের একীভূত করতে। তাদের কাছে প্রকৃতি হল একটা বস্তু যাকে দেখতে হবে এবং প্রশংসা করতে হবে, কারণ এটাই তারা শিখেছে; তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তারা আবার যে যার স্বাভাবিক আড্ডায় ফিরে আসে। এ যেন কোনো মহাকবি বা মহারচয়িতার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন উদ্দেশ্যে তাঁদের রচনা অনুশীলনের প্রচেষ্টায় ক্লান্ত হয়ে, যাতে এতটুকু মানসিক শ্রমের প্রয়োজন হয় না এমন সব নিজের পছন্দসই নভেল বা ডিটেকটিভ গল্প পড়তে ফিরে আসা। প্রাচীন গ্রীক বা ভারতীয়দের মত এরা প্রকৃতির সন্তান

নয়; স্বল্প পরিচিত দূর আত্মীয়ের গৃহে বিব্রত আগন্তুকের আগমনের মতই তাদের প্রকৃতির সঙ্গে এই সাক্ষাৎ পরিচয়। কাজেই তারা না পারে প্রকৃতির অন্তহীন বৈচিত্র্য ও সম্পদ থেকে আনন্দ আহরণ করতে, না আছে তাদের আমাদের পূর্ব-পুরুষদের মত বেঁচে থাকার গভীর অনুভূতি। সুতরাং প্রকৃতিদেবী যে তাদের সপত্নী-সন্তানের মতই অনাদর করবে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি কিছু আছে?

অবশ্য আদিমযুগের সর্বেশ্বরবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রত্যাবর্তন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; কিন্তু তবু প্রকৃতির রহস্যবৈচিত্র্য আমরা অনুভব করতে পারি, প্রকৃতির প্রাণাবেগে ও সৌন্দর্যের রসে আমরা সিঞ্চিত হতে পারি, প্রকৃতির নিকট প্রাণশক্তি আহরণ করতে পারি, প্রকৃতির গান আমরা শুনতে পারি। সে গান কোনো বিশেষ বিশেষ স্থানেই যে শোনা যায় তা নয়, শোনবার মত কান যদি থাকে—সর্বত্রই আমরা এ গান শুনতে পাব। কিন্তু এও ঠিক যে, এমন কতকগুলি স্থান আছে, যেখানে এ গান আপনা থেকে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে, এবং যে মানুষ এ গান শোনবার জন্যও যায়নি সেও আচমকা এ সঙ্গীতের স্বরলহরীতে বিমোহিত হয়ে যায়। প্রকৃতি ভর করেছেন এমন একটি স্থান হল কাশ্মীর, যেখানে প্রকৃতির সমস্ত শ্রী ও সৌন্দর্য বাসা বেঁধেছে, এবং মানুষের সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি অভিভূত হয়ে যায়।

কাশ্মীরের প্রশংসা করাই আমার এই উচ্ছ্বাসের উদ্দেশ্য নয়, যদিচ কাশ্মীরের প্রতি আমার একটা বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে, এবং তা মাঝে মাঝে আমাকে বিহ্বল করে দেয়; অথবা সর্বেশ্বরবাদের স্বপক্ষে যুক্তি বিস্তার করাও আমার উদ্দেশ্য নয়, যদিচ মানুষের ভিতর খানিকটা সর্বেশ্বরবাদ থাকা তার শরীর মন দুইদিক থেকেই কল্যাণকর। আমার বিশ্বাস যে ধরিত্রী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন যে জীবন তা ক্রমে শুকিয়ে যায়। অবশ্য সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা ঘটা খুবই বিরল এবং প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সংঘটনও সময়সাপেক্ষ। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার প্রধান ত্রুটিই হল এই যে, তা ক্রমশই জীবনরসধারার উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্তর্নিহিত বিত্তকামনা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সব কিছুর উর্ধ্বে ধনৈশ্বর্যের প্রতিষ্ঠা, অসংখ্য মানুষের নিরাপত্তার অভাব ও একটানা মানসিক ক্লান্তি—এই সব কিছু আজ মানুষের মানসিক অস্বাস্থ্য বাড়িয়ে তুলছে এবং মানুষের স্নায়বিক রোগের সূত্রপাত করছে। এর থেকে উন্নততর এবং সুপ্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এই অবস্থার উন্নতি করতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মৃত্তিকা এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষকে আরও ঘনিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত সংযোগ স্থাপন করতে হবে। এর অর্থ অবশ্য পুরানো দিনের সঙ্কীর্ণ তাৎপর্যে দেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন অথবা আদিম যুগের জীবনযাত্রা অভিমুখে পশ্চাদপসরণ নয়। তাতে মঙ্গলের অমঙ্গলের সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু বর্তমান শিল্পসমাজকে এমন ভাবে সুসংগঠিত করা নিশ্চয়ই সম্ভব, যাতে স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই মাটির যোগ বজায় থাকে এবং গ্রামাঞ্চলের সাংস্কৃতিক স্তর উন্নত করা যায়। জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন ও চাহিদা মেটানোর

জন্য গ্রাম এবং শহরকে পরস্পর নির্ভরশীল করতে হবে, যার ফলে উভয় অঞ্চলেই শরীর এবং মনের বিকাশের সব সুযোগ সুবিধা থাকে এবং সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ জীবন গড়ে উঠতে পারে।

এটা যে করা সম্ভব, সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ, যদি অবশ্য লোকে তা করতে চায়। বর্তমানে এই ধরনের ব্যাপক আগ্রহ অনুপস্থিত; পরস্পরকে হানাহানি ছাড়াও আমাদের সমগ্র কর্মশক্তি আজ কৃত্রিম বস্তু এবং আনন্দ-সৃষ্টিতেই বিক্ষিপ্ত। এগুলি সম্পর্কে মূলত আমার কোনো আপত্তি নেই, এবং এর মধ্যে কতকগুলি বেশ বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এগুলির দোষ এই যে এগুলি আমাদের অনেক সময় বৃথা নষ্ট করে, যে সময় সার্থক কাজে লাগানো যেতে পারত; তাছাড়া এগুলি জীবনের পরিপ্রেক্ষিত দর্শনে ভ্রম সৃষ্টি করে। জমির জন্য আজ কৃত্রিম সারের চাহিদা খুব বেড়ে গেছে এবং সম্ভবত সেগুলি কার্যকরীও। কিন্তু আমার কাছে এটাও খুব অদ্ভুত লাগে যে উর্বরতা বৃদ্ধির কৃত্রিম পদ্ধতির উৎসাহে মানুষ আজ স্বাভাবিক সারের কথা ভুলে যায় এবং সেগুলির অপচয় করে, ফেলে দেয়। জাতি হিসাবে একমাত্র চীনই এই স্বাভাবিক সার সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানোর সুবুদ্ধি দেখিয়েছে। অনেক বিশেষজ্ঞদেরও মত এই যে কৃত্রিম সারের সাহায্যে জমির উর্বরতাশক্তি দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু কতকগুলি মূল উপাদানের অভাব ঘটিয়ে তা শেষ পর্যন্ত জমির উর্বরতাকে দুর্বল করে ফেলে, ফলে ক্রমে জমি অনুর্বর হয়ে পড়ে। আমাদের ব্যক্তিজীবনের মত পৃথিবীকেও আমরা দুই দিক থেকে দোহন করছি। বিনা ভ্রূক্ষেপে নিদারুণবেগে আমরা তার সমস্ত ধনসম্পদকে শোষণ করছি, অথচ ফিরিয়ে দেবার বেলায় তাকে দিচ্ছি যৎসামান্য বা কিছুই নয়।

রাসায়নিক গবেষণাগারে আজ যে আমরা প্রায় সমস্ত বস্তুই উৎপন্ন করতে সক্ষম, তার জন্য আমরা গর্বিত। বাষ্পযুগ থেকে বিদ্যুৎশক্তির যুগে অগ্রসর হয়ে আজ আমরা জীবাণু এবং বিদ্যুতাণু পরিকর্ষণের যুগে এসে ঠেকেছি। সমাজবিজ্ঞানের যুগ আমাদের সামনে দৃশ্যমান হয়ে উঠছে এবং আশা করা যায় যে আজ যে সমস্ত সমস্যাসন্দেহে আমরা পীড়িত, এই আগামীযুগ হয়তো তার সমাধান করবে। এও শোনা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে আমরা ম্যাগনিসিয়াম-এ্যালুমিনিয়াম যুগের সম্মুখীন হব এবং এ দুটি ধাতু অপর্যাপ্ত পরিমাণে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এবং কারও এর অভাব বোধ করতে হবে না। রসায়নবিজ্ঞানের নূতন নূতন বিকাশ মানুষের জীবনকেই নূতনভাবে গড়ে তুলছে। মনে হয় আজ আমরা মানুষের শক্তি-সংস্থানের বিপুল বৃদ্ধিসাধনের প্রান্তে এসে পৌঁছেছি, এবং অদূর ভবিষ্যতের দিঙ্‌মণ্ডলও অসংখ্য যুগান্তকারী আবিষ্কারের উদয়রেখায় উদ্ভাসিত।

এই সমস্ত চিন্তাকল্পনা অত্যন্ত সুখকর; কিন্তু তবু একটা সন্দেহ আমার মনে উদয় হয়। শক্তির অভাবে আমরা কষ্ট পাই না, আমরা কষ্ট পাই যেহেতু সে শক্তির আমরা অপব্যবহার করি, ঠিকভাবে তাকে কাজে লাগাই না সেজন্য। বিজ্ঞান আমাদের শক্তি দেয়, কিন্তু সে নিজে থাকে নৈর্ব্যক্তিক, উদ্দেশ্যহীন, এবং আমাদের

যে জ্ঞানের অধিকারী সে করে, সে জ্ঞান আমরা কিভাবে প্রয়োগ করি—সে সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। তার জয়যাত্রার ধারা হয়তো সে বজায় রেখে যেতে পারবে, কিন্তু প্রকৃতিকে সে যদি বেশি উপেক্ষা করে, তাহলে একদিন হয়তো সে প্রকৃতির অতিসূক্ষ্ম পরিশোধ লাভ করবে। বাহ্যিক দিক দিয়ে জীবন বেড়ে উঠতে থাকবে, কিন্তু বিজ্ঞানের অনাবিষ্কৃত কোনো একটা কিছুর অভাবে হয়তো জীবন ভাটার টানে বয়ে চলে যাবে।

১৫ : নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে পুরানো সমস্যা

বর্তমান যুগের মানুষের মন অর্থাৎ আধুনিক যুগের উন্নত মানুষের মনের গড়ন বাস্তব ও কার্যদক্ষ, সামাজিক এবং নৈতিক, নিঃস্বার্থ ও মানবহিতকামী। সমাজের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত, বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত আদর্শবাদ দ্বারাই এই মন প্রভাবিত। যে আদর্শের উদ্দীপনায় এই মন উদ্দীপ্ত, সেটাই হল এ যুগের যুগধর্ম। প্রাচীনদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং চরম সত্যের অনুসন্ধিৎসা এবং মধ্য-যুগীয় ভক্তিবাদ ও রহস্যবাদও এ যুগধর্মে অনুপস্থিত। মনুষ্যত্বের চরম উৎকর্ষই হল এর ধ্যান, সমাজসেবার সাধনাই হল এর ধর্ম। মনোরাজ্যের এই সত্তাবোধ হয়তো অসম্পূর্ণই, কারণ সকল যুগের মানুষের মনই তো তার পারিপার্শ্বিকের দ্বারা সীমাবদ্ধ: সকল যুগেই মানুষ কোনো একটা আংশিক সত্যকেই পরম সত্য বলে ভুল করেছে। সকল যুগের সকল জাতিই মনে করে যে তাদের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি সবচেয়ে প্রকৃষ্ট, অন্ততপক্ষে প্রকৃষ্টতার অত্যন্ত সমীপবর্তী। প্রত্যেক সংস্কৃতিরই বিশেষ কতকগুলি সংজ্ঞা ও তত্ত্ব আছে, যা তার দ্বারাই প্রভাবিত ও সীমাবদ্ধ। যে জাতির জীবন এই সংস্কৃতিধারার দ্বারা পরিপুষ্ট, সে জাতি এই সমস্ত সংজ্ঞা ও তত্ত্বকে নির্বিচারে মেনে নেয় এবং সেগুলি চিরন্তন বলে ধারণা করে। সুতরাং আমাদের এই যুগসংস্কৃতির সৃষ্ট সংজ্ঞা ও তত্ত্বও হয়তো চিরন্তন বা চরম সত্য নয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের জীবনে এগুলির অনস্বীকার্য গুরুত্ব আছে, কারণ সেগুলি আমরা যে যুগে বাস করি সেই যুগেরই চিন্তা ও ভাবধারার প্রতীক। কালদর্শী বা অত্যাশ্চর্য প্রতিভাসম্পন্ন কোনো কোনো ব্যক্তি, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হয়তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং মানবজগৎকে সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিপথে রূপায়িত করতে পারেন; যুগবিশেষের মধ্যে এঁরাই সেই শক্তির প্রতিভূ, যে শক্তির দুর্নিবার তাড়নায় সমাজ এবং যুগ এগিয়ে চলেছে। জাতির মধ্যে বিপুল সংখ্যক লোকই অবশ্য বর্তমান যুগের তত্ত্বোপলব্ধি করতেও অক্ষম—নিষ্প্রাণ অতীতের মূক চতুঃসীমানার মধ্যেই তাদের সমগ্র মানস বন্দী।

অতএব যুগধর্মের শ্রেষ্ঠ এবং মহত্তম আদর্শের সমমাত্রায়ই আমাদের চলতে হবে, যদিচ আমরা সেগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারি অথবা সেগুলিকে জাতীয় প্রতিভা অনুযায়ী রূপায়িত করতে পারি। এই সমস্ত আদর্শাবলীকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত

করা যায় : মনুষ্যত্ববাদ ও বিজ্ঞানবাদ। এ দুটোর মধ্যে একটা আপাত সংঘাতের ভাব রয়েছে বটে, কিন্তু আজ চিন্তাজগতের বিপুল আলোড়ন এবং সকল তথ্য সম্বন্ধে তার প্রশ্নপ্রবণতা—এই দুটি আদর্শবাদের মধ্যেকার পুরাতন ব্যবধান, এবং বিজ্ঞানের বাহ্যিক জগৎ ও অন্তর্নিরীক্ষার অন্তর্জগতের ব্যবধান আজ দূর করে দিচ্ছে। মনুষ্যত্ববাদ এবং বিজ্ঞানবাদের ক্রমবর্ধমান সংশ্লেষণই আজ দেখা দিয়েছে, যার ফলে আজ নূতন একটা বিজ্ঞানসম্মত মনুষ্যবাদের উৎপত্তি হচ্ছে। বিজ্ঞান তথ্য আঁকড়েই থাকে, তবু সে আজ অন্যান্য রাজ্যের প্রান্তদেশে উপস্থিত হয়েছে, অন্ততপক্ষে সেগুলির অস্তিত্ব বিজ্ঞান আজ আর উপেক্ষাভরে অস্বীকার করে না। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় এবং সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা কি অনুভব করতে পারি না পারি, তাই দিয়ে তো আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সীমা নির্ধারণ করা যায় না। গত পঁচিশ বছরে বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। এযাবৎ বিজ্ঞান মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করেই প্রকৃতিকে বিচার করত; কিন্তু স্যার জেমস্ জীনস্-এর ভাষায় আজ বিজ্ঞানের মর্মই হল 'মানুষ প্রকৃতিকে আর তার স্বকীয় সত্তা থেকে ভিন্ন হিসাবে দেখে না।' তারপর আবার সেই পুরাতন প্রশ্ন জাগে—যে প্রশ্নে উপনিষদের চিন্তানায়করাও সমস্যাক্রান্ত হয়েছিলেন: সর্বজ্ঞকে জানার উপায় কি? যে চোখ শুধু বাহ্যিক বস্তু দেখতে পায়, সে চোখ নিজেকে দেখবে কি করে? বহির্জগৎ যদি আমাদের অন্তর্জগতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়, আমরা যা দেখি বা অনুভব করি সেসবই যদি আমাদের মনের একটা প্রক্ষেপণ হয়, এবং ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্বপ্রকৃতি, দেহ, আত্মা, মন, অলৌকিক এবং অন্তর্নিহিত সবই যদি মূলত এক হয়, তাহলে এই সীমাবদ্ধ মন নিয়ে আমরা কি করে এই বিপুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিরপেক্ষভাবে উপলব্ধি করব? বিজ্ঞান আজ এই সব প্রশ্নের সমাধানে অগ্রসর হয়েছে, এবং বিজ্ঞান সেগুলির মর্মভেদ করতে না পারলেও, আজকের দিনের উৎসাহী বৈজ্ঞানিকই অতীত কালের দার্শনিক এবং ধর্মগুরুর প্রতিচ্ছবি। অধ্যাপক এ্যালবার্ট আইনস্টাইন বলেছেন, 'আমাদের এই বস্তুতান্ত্রিক যুগে, বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবকরাই একমাত্র সত্যকার ধার্মিক ব্যক্তি।'*

এইসব যুক্তিতর্কের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠাই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও, শুধু বিশুদ্ধ তথ্যাশ্রয়ী, উদ্দেশ্যহীন বিজ্ঞানই যথেষ্ট নয়, এরূপ একটা আশঙ্কা দেখা যায়। বিজ্ঞান মানুষের জীবনের নানা সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করে, জীবনের আসল মর্মকে কি উপেক্ষা করছে? তথ্য এবং বস্তুর উপর গুরুত্ব আরোপের আধিক্যে মানুষের অন্তরাত্মা আজ নিষ্পিষ্ট; তাই বস্তুজগৎ এবং অন্তর্জগতের সমন্বয় সাধনের একটা ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আজ ক্রমশই পরিলক্ষিত

* পঞ্চাশ বছর আগে বিবেকানন্দ আধুনিক বিজ্ঞানকে সত্যকার ধর্মচেতনার একটি অভিব্যক্তি বলে অভিহিত করেছিলেন, কারণ বিজ্ঞানও একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার দ্বারা সত্যজ্ঞান অর্জনে প্রয়াসী।

হচ্ছে। যে সমস্যার সমাধানে সুপ্রাচীন দার্শনিকেরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, নূতন পরিবেশে, নূতন রূপে সেই প্রশ্নই আজ আবার দেখা দিয়েছে: বহির্জগতের প্রাকৃত জীবনধারার সঙ্গে ব্যক্তির অন্তর্জগতের আত্মিক জীবনধারার সমন্বয় সাধন কি সম্ভব? বর্তমান যুগে চিকিৎসকেরা আবিষ্কার করেছেন যে ব্যক্তিবিশেষ বা একটা বিশিষ্ট সমাজের সামগ্রিক শারীরিক চিকিৎসাতেই রোগ নিরাময় হয় না। মনোবিজ্ঞানের আধুনিকতম উৎকর্ষের জ্ঞানলব্ধ চিকিৎসকেরা আজ দেহের মূল-যন্ত্রঘটিত রোগ অথবা দেহের বৃত্তিঘটিত রোগের পারস্পরিক বৈপরীত্য স্বীকার করেন না, তাঁরা মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণের উপরই বেশি জোর দেন। প্লেটো লিখে-ছিলেন: 'মানুষের দেহ এবং আত্মার চিকিৎসক বিভিন্ন, এটাই রোগ নিরাময়ের প্রধান অন্তরায়, কারণ এই দুই চিকিৎসাই এক এবং অবিচ্ছেদ্য।'

বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে প্রথিতযশা আইনস্টাইন বলেছেন: 'পূর্বের চেয়ে মনুষ্যজাতির ভাগ্য আজ তার নৈতিকশক্তির উপরই অনেক বেশি নির্ভরশীল। একমাত্র আত্মত্যাগ ও সর্বপ্রকার আত্মনিয়ন্ত্রণ দ্বারাই পরিপূর্ণ আনন্দ ও সুখ লাভ করা যায়।' বিজ্ঞান-গর্বে গর্বিত এই আধুনিক যুগ থেকে আইনস্টাইন সহসা আমাদের প্রাচীন দার্শনিকদের যুগে প্রত্যাবর্তন করাতে চান, শক্তিমদলালসা এবং মুনাফাবৃত্তির স্থানে তিনি প্রতিষ্ঠা করাতে চান নিদারুণ ত্যাগের নিস্পৃহতা, ত্যাগের যে নিস্পৃহতার সঙ্গে ভারত চিরপরিচিত। অন্যান্য অনেক বৈজ্ঞানিকই হয়তো তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হবেন না, অথবা যখন তিনি বলেন: 'আমার স্থির বিশ্বাস যে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ মানবজাতিকে অগ্রসর হতে এক বিন্দু সাহায্য করবে না, এমনকি এই সম্পদ একনিষ্ঠ সমাজসেবকদের হাতে কেন্দ্রীভূত হলেও না। একমাত্র মহান ও নির্মল চরিত্রের দৃষ্টান্ত থেকেই উচ্চ আদর্শ ও মহৎ কার্য উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। অর্থ শুধু মানুষের হীন স্বার্থপরতারই প্রশ্রয় দেয় এবং তার অধিকারীকে তা শুধু অজস্র অপচয়েই প্রলুব্ধ করে।'

সভ্যতার মতই সুপ্রাচীন এই প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার উপযোগী কতকগুলি সুযোগসুবিধা বিজ্ঞানের আছে যা থেকে প্রাচীন দার্শনিকেরা বঞ্চিত ছিলেন। বিজ্ঞানের আছে বহুযুগসঞ্চিত জ্ঞানের ভান্ডার আর এমন এক পদ্ধতি যার সার্থকতা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে সব লোক প্রাচীনদের অজ্ঞাত ছিল, সেই লোক বৈজ্ঞানিকেরা আজ দিঙ্‌নির্ণয় করে মানচিত্রীভূত করেছে। এর ফলে মানুষের জ্ঞান প্রসারতা লাভ করেছে এবং বহু বস্তুর রহস্য উন্মাটিত হয়েছে, সেজন্য ধর্মযাজকেরা আর সেসব রহস্যঘটিত ভীতির সুযোগ নিতে অক্ষম। তবে বিজ্ঞানপ্রসূত কতকগুলি অসুবিধাও আছে। সঞ্চিত জ্ঞানের আধিক্যবশত মানুষ আর সামগ্রিকভাবে একটা সংশ্লেষণমূলক নিরীক্ষা করতে পারে না, এবং সে তার কোনো একটা অংশে নিজেকে হারিয়ে ফেলে—সেইটুকুই সে বিশ্লেষণ করে, গবেষণা করে, সেইটুকুরই কিছুটা বুঝতে পারে এবং সমগ্রের সঙ্গে ঐ অংশ-টুকুর যোগসূত্র সে দেখতে পায় না। বিজ্ঞান যে বিপুল শক্তিগুলিকে উন্মুক্ত

করেছে, সেগুলির দুর্নিবার তাড়নেই মানুষকে অভিভূত করে ফেলে, এবং হয়তো তার অনিচ্ছাসত্ত্বেই তাকে ঠেলে নিয়ে যায় কোন অজানা উপকূলে। সঙ্কট-বিপর্যয়ে জর্জরিত, আধুনিক জীবনের তীব্র গতিবেগ নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধানের অন্তরায় সৃষ্টি করে। জ্ঞানই আজ তাড়াহুড়ো ধাক্কাধাক্কির বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে, জ্ঞানের প্রকৃত উপলব্ধির জন্য যে শান্ত, স্থির, নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি অপরিহার্য তা সে আর সহজে খুঁজে পায় না। 'কারণ বিজ্ঞতার অভিব্যক্তি অচঞ্চল, অবিচলিত।'

আমরা হয়তো মানব সভ্যতার এক মহান যুগে বাস করি এবং এই পরম সুযোগলাভের মূল্যও হয়তো আমাদের চুকিয়ে দিতে হবে। কারণ অতীতেও প্রত্যেক মহান যুগই ছিল সংঘাত ও চাঞ্চল্য এবং পুরাতনকে নূতনে পরিবর্তিত করার প্রয়াসে পরিপূর্ণ। অবশ্য চিরন্তন স্থিতিশীলতা বা নিরাপত্তা অথবা পরিবর্তন-হীনতা বলে কিছু নেই, কারণ সে অবস্থায় জীবনেরই পরিসমাপ্তি ঘটতে বাধ্য। যুগজীবনের মধ্যে আমরা বড় জোর একটা আপেক্ষিক স্থিতিশীলতা এবং গতিশীল ভারসাম্য আশা করতে পারি, তার বেশি নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে তার পারিপার্শ্বিকের যে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম, সেইটাই হল জীবন—শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক—সব দিক দিয়েই এই সংগ্রাম চলতে থাকে; এবং সংহার ও সৃষ্টি—মানুষ ও প্রকৃতির এই দুটি রূপ, একটির পাশে অপরটির অবিরাম অভিব্যক্তি হতে থাকে। স্থাণুত্ব নয়, বৃদ্ধি এবং গতিবেগই হল জীবনের ধর্ম—বিরামহীন পরিবর্তনের এক ধারা যার ভিতর স্থিতিশীলতার কোনো স্থান নেই।

আজকের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জগতে শক্তি-ক্ষমতার অন্বেষণ অহরহ চলছে; অথচ সেই শক্তি যখন আয়ত্তাধীন হয়, তখন জীবনের মূল্যবান অনেক কিছুই যেন হারিয়ে যায়। আদর্শবাদের স্থান গ্রহণ করে রাজনৈতিক চাতুর্য ও কুটিলতা; নিঃস্বার্থ সাহসের স্থানে দেখা দেয় ভীরুতা এবং স্বার্থপরতা; সার-বস্তুর পরিবর্তে বাহ্যিক রূপটাই হয়ে ওঠে প্রধান এবং যে শক্তিক্ষমতা অর্জনের জন্য এত ব্যগ্রতা, তাও শেষ পর্যন্ত মানুষের উদ্দেশ্য সফল করতে পারে না। ক্ষমতারও একটা সীমাবদ্ধতা আছে এবং শক্তির প্রয়োগ প্রতিঘাতরূপে প্রত্যাবর্তন করে। দুটোর একটাও মানবাত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, শুধু মানবাত্মাকে সূক্ষ্মতাবর্জিত ও কঠিন করে তুলতে পারে। কনফুসিয়াস বলেছেন: 'সৈন্যবাহিনীর সেনাপতিকে ছিনিয়ে নেওয়া সহজ, কিন্তু অতি অধম যে মানুষ, তারও ইচ্ছাশক্তি ছিনিয়ে নেওয়া অসম্ভব।'

জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন: 'আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে মানুষের চিন্তাধারার মূলগত কোনো পরিবর্তন সাধিত না হওয়া পর্যন্ত, মানবজাতির বর্তমান অবস্থার বিশেষ কোনো উন্নতি ঘটা অসম্ভব।' কিন্তু মানুষের চিন্তাধারার এই পরিবর্তনও তার পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিক থেকেই উদ্ভূত হয় এবং জীবনের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের দুঃখ-বেদনার ভিতর দিয়েই তা সাধিত হয়। অতএব প্রত্যক্ষভাবে চিন্তাধারার এই পরিবর্তন ঘটাবার চেষ্টা করলেও, যে পারি-

পার্শ্বিক থেকে এই চিন্তাধারার উদ্ভব ও প্রসার হয়েছিল তাকেই বিশেষভাবে পরিবর্তন করা বেশি প্রয়োজন। এ দুটো পরস্পর নির্ভরশীল এবং পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত। মানুষের মনোজগতের বিচিত্রতার শেষ নেই, প্রত্যেক মানুষই নিজের মত করে সত্যকে উপলব্ধি করে এবং অপরের দৃষ্টিভঙ্গির কদর করতে অনেক সময়ই তারা পারে না, এবং তা থেকেই সৃষ্ট হয় সংঘাতসংঘর্ষ, আর এই সংঘাত-সংঘর্ষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়েই পূর্ণতর ও অধিকতর একীভূত সত্যের বিকাশ হয়। আমাদের বোঝা উচিত যে একটি সত্যেরও অনেক দিক আছে, এবং সত্যের উপর কোনো বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতির একচেটিয়া দখল নেই। কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রেও তাই। স্থান, কাল বা পাত্রভেদে কর্মশক্তি বা কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন রূপে রূপায়িত হয়ে ওঠে। ভারত ও চীন, এবং অন্যান্য সকল দেশই তাদের নিজস্ব রীতিনীতি অনুযায়ী জীবন গড়ে তুলেছে, সুদৃঢ় ভিত্তির উপর তা প্রতিষ্ঠিত করেছে। আত্মগর্বে স্ফীত হয়ে এরা প্রায় সকলেই ভেবেছিল, এবং এখনও তাদের মধ্যে অনেকে মনে করে যে, জীবনের বিশিষ্ট ধারার মধ্যে তাদের বিশিষ্ট ধারাটাই একমাত্র সঠিক। বর্তমান বিশ্বে ইংলন্ড এবং আমেরিকা তাদের একটা স্বকীয় জীবনধারা গড়ে তুলেছে, এই জীবনধারার প্রভাব আজ বিশ্বব্যাপী; ইংলন্ড ও আমেরিকার অধিবাসীরা তাই মনে করে যে তাদের এই জীবনধারাই জীবনের একমাত্র পথ। কিন্তু এর মধ্যে কোনো একটি জীবনধারাই হয়তো জীবনের সম্পূর্ণ প্রকৃষ্ট পথ নয়, একের কাছে অন্যের কিছু না কিছু শিক্ষণীয় বা গ্রহণীয় আছে। অবশ্য ভারত ও চীনের অনেক কিছুই শিখবার আছে, কারণ তারা উভয়েই স্থাণুত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। অপরদিকে, পাশ্চাত্যই আজ যুগধর্মের প্রতীকস্বরূপ; সে গতিশীল, পরিবর্তনশীল ও প্রাণবন্ত, বৃদ্ধি ও উন্নতির ক্ষমতা তার অন্তর্নিহিত, যদিচ তার ক্ষমতার বিকাশ হয় আত্মধ্বংস ও পর্যায়ক্রমিক নরহত্যার ভিতর দিয়ে।

ভারতে এবং সম্ভবত অন্যান্য দেশেও পর্যায়ক্রমে আত্মগর্ব ও আত্মদুঃখকাতরতার বিকাশ হয়। এ দুটোই অবাঞ্ছিত এবং হীন। জীবনকে বোঝা যায় ভাবাবেগ এবং অনুভূতি দিয়ে নয়, বোঝা যায় নিরুদ্বেগ ও সাহসিকভাবে বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে। জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের সঙ্গে সংযোগহীন হয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবানুভূতির রোমাঞ্চকর পরিবেশে নিজেদের হারিয়ে ফেললে আমাদের চলবে না—ভবিতব্যের দুর্নিবার অগ্রগতি আমাদের অবসরের অপেক্ষা রাখে না। অপরদিকে শুধু বাহ্যিক বস্তুতে নিবিষ্ট হয়ে, মানুষের অন্তর্জীবনের গুরুত্বও আমরা ভুলে থাকতে পারি না। এই দুইয়ের মধ্যে একটা ভারসাম্য, একটা সমন্বয় স্থাপনের প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সপ্তদশ শতাব্দীতে স্পিনোজা লিখেছিলেন: 'মনের সঙ্গে সমগ্র প্রকৃতির যে অবিচ্ছেদ্য যোগ বর্তমান—এ জ্ঞান থেকেই সর্বাধিক মঙ্গল সাধিত হয়...মানুষের জ্ঞান যত বাড়ে, তার মনে প্রকৃতির শক্তি ও নিয়ম সম্বন্ধে ততই বোধ জাগে। মানুষের এই বোধ যত বেশি জাগ্রত হয়, ততই সে নিজের মনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, নিজের সম্বন্ধে নিয়মকানুন সৃষ্টি করতে পারে। প্রাকৃতিক নিয়ম সে যত বেশি বোঝে,

নিরর্থক বস্তুর হাত থেকে ততই সে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। এর সামগ্রিক পদ্ধতিই হল এই।'

আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োজন দেহ এবং আত্মার সমন্বয়; তাছাড়া প্রাকৃতিক জীব ও সামাজিক জীব হিসাবে ব্যক্তির এই দুই সত্তার সমন্বয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: আমাদের পূর্ণবিকাশের জন্য চাই প্রাণশক্তির উদ্দামতার সঙ্গে চিত্তসংস্কৃতির মিলন; লোকসমাজে মানবোচিত ব্যবহার রক্ষা করেও ক্ষমতা চাই সহজ থাকার, যেমন সহজ এই বিশ্বপ্রকৃতি। অবশ্য চরম পরাকাষ্ঠালাভ আমাদের নাগালের বাইরে, কারণ সেখানেই সমাপ্তি। যাত্রার আমাদের শেষ নেই, যে লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে চাই তা ক্রমেই দূরে সরে যেতে থাকে। আমাদের প্রত্যেকের ভিতরই আছে স্বকীয় অসঙ্গতি ও বৈপরীত্যে পরিপূর্ণ অসংখ্য সত্তার সমাবেশ এবং এর প্রত্যেকটিই আমাদের বিপরীত দিকে টানতে থাকে—তার মধ্যে আছে জীবনের প্রতি ভালবাসা, আছে ঘৃণা আর আছে জীবন বলতে যা কিছু বোঝায় তার স্বীকৃতি এবং তার অনেক কিছুর বর্জন। এই পরস্পর বৈষম্যের সমন্বয়সাধন খুবই কষ্টকর; সব সময়ে একটা আর একটাকে ছাপিয়ে উঠছে। লাও-ৎসে বলেছেন :

'আপনারে করি কখনো কখনো সর্ব আবেগ-মুক্ত,
জীবনের গূঢ় রহস্য বুঝিবারে;
কখনো কখনো জীবন ধেয়াই আবেগ-ব্যাকুল চিত্তে,
দেখি, বিচিত্র কত রূপ হতে পারে।'

আমাদের সমগ্র চিন্তা ও বোধশক্তি এবং সমগ্র জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, জীবনের গোপন তথ্য আমরা কমই জানি, শুধু তার রহস্যময় প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে সামান্য আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু তার সৌন্দর্যে আমরা বিমুগ্ধ হতে পারি, শিল্পকলার ভিতর দিয়ে আমরা বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টিক্রিয়ার অনুসরণ করতে পারি। অনন্ত জীবন-প্রবাহের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী আমাদের উপস্থিতি; আমরা হয়তো দুর্বল, ভ্রান্ত মানব, কিন্তু দেবত্বের অমর উপাদানও আমাদের মধ্যে কিছু পরিমাণে বর্তমান। অতএব এ্যারিস্টটলের ভাষায়: 'যে হেতু আমরা নশ্বর মানুষ, সেই কারণে যারা আমাদের শুধু নশ্বর মানবিক চিন্তাই করতে আজ্ঞা করে, তাদের আদেশ আমরা মানব না। যতদূর পারি, আমরা অমরত্বেরই সাধনা করব এবং আমাদের ভিতর যা কিছু সর্বোৎকৃষ্ট, সেই অনুযায়ী জীবনযাপন করার কোনো প্রচেষ্টা থেকেই বিরত হব না।'

১৬ : শেষ কথা

আজ পাঁচ মাস আগে এই লেখা শুরু করেছি। আমার মনের জটিল চিন্তাভাবনাকে প্রকাশ করতে গিয়ে প্রায় হাজার পাতা লেখা শেষ হল। পাঁচ মাস অতীতের মধ্যে

হাতড়ে দেখেছি, অনাগত ভবিষ্যতের দিকে উঁকি দিয়েছি। নিজের মনের ভাবনা-চিন্তার ভারসাম্য রক্ষা করতে চেয়েছি এমন একটা বিন্দুতে যেখানে কালাতীত এসে মিশেছে আজকালের সঙ্গে। এই পাঁচ মাসে পৃথিবীর বুকে অনেক কিছু ঘটে গেছে। সামরিক দিক থেকে দেখতে গেলে মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধবিজয়ের সাফল্য দ্রুতগতিতে এগিয়ে এসেছে। আমার নিজের দেশেও এমন অনেক কিছু ঘটেছে যা আমি কেবল দূর থেকে দেখতে পেরেছি। দুঃখবেদনার স্রোত আমার উপর দিয়ে বয়ে গেছে ক্ষণ-কালের জন্য, কিছুটা হাবুডুবু খেয়ে আবার যেন শক্ত মাটিতে পা দিয়েছি। এই নানাবিধ জল্পনাকল্পনাকে ভাষার মধ্যে রূপ দিতে গিয়ে ক্ষুরধার বর্তমান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি, স্বেচ্ছাবিচরণ করতে চেয়েছি দূর অতীত কিংবা অনাগত ভবিষ্যতের সুদূরবিস্তারী প্রান্তরে।

কিন্তু এই নিরুদ্দেশযাত্রার একটা কোনো সমাপ্তি আছে নিশ্চয়। অন্য কোনো কার্যকরী যুক্তি যদি নাও থাকে—এমন একটা কার্যকরী বাধা আছে যা অস্বীকার করা চলে না। বহুকষ্টে, অনেক আয়াসে আমি যেটুকু কাগজ যোগাড় করতে পেরে-ছিলাম, তা প্রায় ফুরিয়ে এল। আর বেশি কাগজ পাওয়া সহজ হবে না।

ভারতের সন্ধান—কি পেয়েছি আমি সন্ধান করে? আমার পক্ষে এটা ভাবাই ধৃষ্টতা যে আমি তার অবগুণ্ঠন মোচন করে দেখতে পাবো ভারতের বর্তমান রূপটা কেমন, সুদূর অতীতেই বা তার চেহারা কেমন ছিল। আজকের ভারত হল চল্লিশ কোটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত পৃথক পৃথক নর নারী, কারো সঙ্গে কারো মিল নেই, সবাইকার চিন্তাভাবনার জগৎ আলাদা। আজকের দিনের পক্ষে একথা যদি সত্য হয়, তাহলে তো সহজেই বোঝা যায় বহুবর্ষব্যাপী অতীতের অসংখ্য ব্যক্তি-বিশেষকে জানতে পারা কত কঠিন। তবে তাদের মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য বন্ধন ছিল এবং এখনও আছে। ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সমগ্র ভারতের একটা নিজস্ব সত্তা আছে, বহুবৈচিত্র্যের মধ্যে তার একটা সাংস্কৃতিক ঐক্য আছে। আপাত-দৃষ্টিগোচর না হলেও একটা অলক্ষ্য অথচ এমন সুদৃঢ় গ্রন্থি আছে যার বেষ্টনীর মধ্যে পরস্পরবিরোধী অনেক কিছু এই ভারতে একত্র বাঁধা পড়েছে। বারম্বার অভিভূত হলেও ভারতের আত্মিক তেজ কেউ পরাভূত করতে পারেনি। বিজয়োন্মত্ত দাম্ভিক শাসনকর্তার হাতের ক্রীড়নক হয়েও ভারত আজও অদম্য ও অপরাজেয়।

পুরাতন কালের উপাখ্যানের মত এদেশের মধ্যে এমন কিছু একটা আছে যা ধরা-ছোঁয়ার অতীত, কি একটা কুহক যেন এ-দেশের মনকে আদিহীন কাল থেকে অধিকার করে আছে। এ যেন একটা কাহিনী, একটা কল্পনা যা স্বপ্নের মতো অবাস্তব, মায়ার মত ক্ষণস্থায়ী। অথচ এ-দেশ খুব প্রত্যক্ষভাবে সত্য, নিকট বর্তমানে তার সান্নিধ্য অনুভব করছি, এর প্রভাব আমাদের সমস্ত দেহমন বিধৃত করে রয়েছে। এক একবার প্রবেশ করি অন্ধকার সংকীর্ণ পথে... সৃষ্টির আদিতম গাঢ়তম তমিস্রার ছোঁওয়া লেগে গা যেন ছম ছম করে। তারপরে অন্ধকার সরে যায়, আলো-ঝলমল দিনের আলোর উত্তাপে সারা দেহে আরামের ছোঁওয়া লাগে। মাঝে মাঝে

মনে হয় এ-দেশ যেন একটা জরাজীর্ণ বৃদ্ধার মতো, বুড়োবয়সের ভীমরতির দরুন কেমন একটু যেন অস্বাভাবিকভাবে একগুঁয়ে। এ'কে দেখে লজ্জা ও ঘৃণার উদ্রেক হয়—সম্ভ্রমের ভাব আসে না যেন মাঝে মাঝে। কিন্তু সব কিছু দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও এই বুড়িটিকে ভাল না বেসে থাকা যায় না; ইনি যে আমাদের অতিবৃদ্ধা প্রপিতামহী! যেখানেই থাকি না কেন, অদৃষ্ট আমাদের যে কোনো অবস্থার সম্মুখীন করুক না কেন, আমরা যে এ'রই সন্তান—সেকথা ভুলি কি করে? গৌরবে, অকৃতার্থতায় এই জননী জন্মভূমি যে আমাদেরই অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশে আছেন। তাঁর গভীর দৃষ্টিতে যুগযুগব্যাপী দুঃখ বেদনা ও আনন্দ উত্তেজনার ভাব প্রতিফলিত। প্রত্যেক সন্তান এই জননীর কাছে অনুরাগবন্ধনে বাঁধা অথচ প্রত্যেকেই হয়তো ভিন্ন ভিন্ন কারণে। কেউ কেউ আছে হয়তো অকারণেই এ'কে ভালোবাসে। বিচিত্ররূপা এই দেশমাতৃকার বিচিত্র প্রকাশ তাঁর অগণিত সন্তানের কাছে। যুগে যুগে এই জননী কত মহামানব কত মহীয়সী নারীর জন্ম দিয়েছেন; পুরাতন ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখেও পরিবর্তনশীল কালের সঙ্গে তাল রেখে অগ্রসর হয়েছেন। এই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শিকড় তাঁর আহরণ করেছে রসসম্পদ অতীতের তলা থেকে, অথচ তিনি শাখা-প্রশাখা মেলে দিয়েছিলেন বর্তমানের আলোকে, ফুল ফুটিয়েছিলেন অনাগত ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে। তিনি তাঁর আপন ব্যক্তিত্বের মধ্যেই যেন প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয় সাধন করেছিলেন। তাঁর একটি লেখায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ভারতকে আমি ভালবাসি সত্য। কিন্তু দেশপুজোর মত পৌত্তলিকতা আমার নেই। অদৃষ্টক্রমে এই দেশের মাটিতে জন্মেছি বলেই যে ভারতকে আমি ভালোবাসি—তা নয়। ভারত নানা সংঘাতের মধ্যে, যুগ যুগ ধরে মহাসাধকদের প্রাণবন্ত বাণী বহন করে এসেছে, সারা পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য সেই মন্ত্র রক্ষা করে এসেছে। ভারতকে আমি ভালোবাসি—এই জন্য।' এই ধরনের কথা আরো অনেকে হয়তো বলবেন। আবার কেউ কেউ দেশের প্রতি তাঁদের ভালোবাসার কারণ ব্যাখ্যা করবেন হয়তো অন্য ধরনে।

পুরাতন কালের সেই মোহাচ্ছন্ন ভাবটা যেন কেটে যাচ্ছে, ভারত যেন তার সুদীর্ঘ সুষুপ্তির শেষে জাগ্রতচৈতন্যে বর্তমানকে ভালো করে একবার দেখে নিতে শুরু করেছে। যতই সে বদলাক না কেন, ভারতের সেই পুরাতন মায়া আজও তার সন্তানদের আকৃষ্ট করে। বাইরের পোশাকটাই বদলাতে পারে, কিন্তু তার অন্তরের সম্পদ হরণ করতে পারে এমন শক্তি কারো নেই। সেই তার সাধনার সম্পদ এই প্রতিহিংসাপরায়ণ লোভকুটিল জগতের মধ্যেও ভারতকে সত্য শিব ও সুন্দরের পথে অবিচলিত রাখবে।

আজকের পৃথিবী নানা দিক দিয়ে উন্নতি লাভ করেছে সত্য। কিন্তু যত বড়ো গলা করেই সে আজ বলুক না যে মানুষকে সে ভালবাসে, একথা অস্বীকার করার জো নেই যে আজকের পৃথিবীর ভিত্তিই হল ঘৃণার উপর, হিংসার উপর—প্রেমের উপর নয়। যুদ্ধ ও হানাহানি মানুষকে সত্য ও মনুষ্যত্বের পথ থেকে বিচ্যুত করে।

ঘটনাচক্রে কখনও কখনও যুদ্ধবিগ্রহ দুর্নিবার হয়ে ওঠে সত্য—কিন্তু হিংসা যে উত্তরাধিকার রেখে যায় তার ফলাফল কল্পনা করতে গেলেও গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে। শুধু প্রাণনাশ নয় (মানুষ তো মরবেই) তার সঙ্গে যে পাপটা আসে তা প্রাণনাশের চেয়েও সাংঘাতিক। যুদ্ধের নামে নির্বিচারে যে ঘৃণা ও মিথ্যাচারের প্রচার-কার্য অনবরত চলতে থাকে, তার ফলে এইসব হেয় জঘন্য মনোবৃত্তি লোকের গা-সহা দৈনন্দিন অভ্যাসে গিয়ে দাঁড়ায়। ঘৃণা ও বিসম্বাদের পাথেয় নিয়ে জীবনের পথ চলা কেবলমাত্র বিড়ম্বনা নয়, সাংঘাতিক ক্ষতিকরও বটে। মানুষের শক্তিকে এইসব রিপু খর্ব করে, মানুষের মনকে এমনভাবে বিকৃত করে দেয় যে তার পক্ষে সত্য উপলব্ধি করা অসম্ভব হয়ে যায়। খুব দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে হয় আজকের দিনে ভারতেও এই ঘৃণা ও বৈরিভাব দেখা দিয়েছে। অতীতের লাঞ্ছনা ও বর্তমানের অপমান আমরা ভুলতে পারছি না। একটি পুরাতন ও আত্মসম্মানশীল জাতির প্রতি বহুবর্ষব্যাপী এই লাঞ্ছনার কথা, ভারতের পক্ষে ভুলে যাওয়া সহজ নয়। সুখের বিষয় ভারতের লোক ঘৃণা পুষে রাখতে চায় না, অপরের ভালটা সহজেই বুঝে নিতে চায়।

স্বাধীনতা এসে যখন ভবিষ্যতের নানা নূতন দিক খুলে দেবে, অব্যবহিত অতীতের গ্লানি ও ব্যর্থতা যখন দূর হয়ে যাবে—তখন ভারত নিজেকে আবার নূতন করে পাবে। গভীর আত্মপ্রত্যয়ে সে অগ্রসর হয়ে চলবে সামনের দিকে। পুরাতন ঐতিহ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ভারত নব নব দেশ ও জাতির কাছ থেকে নূতন নূতন শিক্ষা গ্রহণ করবে ও সবার সঙ্গে সহযোগিতা করবে। আজ একদিকে সে প্রাচীন আচারে অন্ধবিশ্বাসী ও অপর দিকে নির্বিচারে বিদেশী হাবভাব অনুকরণেই ব্যস্ত। এ দুটোর কোনোটাতেই তার শান্তির আশ্বাস নেই; কোনোটাই তাকে জীবনের দিকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে দিতে পারবে না। এটা তো বোঝাই যাচ্ছে যে ভারতকে আজ তার প্রাচীনতার খোলস ত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে হবে এবং আধুনিক যুগের জীবন ও কর্মধারায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে। অপর দিকে এও সত্যি যে সত্যিকার আত্মিক কিংবা সাংস্কৃতিক উন্নতি অনুকরণের দ্বারা সম্ভবপর হতে পারে না। জনসাধারণ থেকে কিংবা জাতীয় জীবনের উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন মুষ্টিমেয় কয়েকজন এই অনুকরণের নেশায় মেতে থাকতে পারে। সত্যকার সংস্কৃতি, বহির্জগৎ থেকে যতই প্রেরণা আহরণ করুক না কেন, একেবারে দেশজ জিনিস, দেশের জন-সাধারণের উপরই এর ভিত্তি। বিদেশের মানদণ্ড দিয়ে সব যদি আমরা পরিমাণ করে দেখতে যাই, তাহলে শিল্প তথা সাহিত্য দেশের জীবনধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে মৃতকল্প হতে বাধ্য। ক্ষুদ্র রুচিবাগীশ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ সংস্কৃতির যুগ আজ আর নেই। আজ সর্বজনসাধারণের কথা ভাবতে হবে, আজকের দিনের সংস্কৃতি হল জনসাধারণের সংস্কৃতি। এ-সংস্কৃতি অতীতের ধারা অক্ষুণ্ন রাখবে, তাকে গভীর করে নানা দিকে চালনা করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন প্রেরণা ও নব-যুগের সৃষ্টিধর্মকে রূপায়িত করবে।

প্রায় একশ' বছর আগে এমার্সন তাঁর স্বদেশীয় আমেরিকাবাসীদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন তারা যেন ইউরোপের অনুকরণ না করে, সাংস্কৃতিক দিক থেকে খুব বেশি করে ইউরোপের উপর নির্ভর করতে যেন না যায়। তিনি চেয়েছিলেন নূতন জাতি হিসাবে আমেরিকানরা যেন তাদের নূতন দেশের প্রাণপ্রাচুর্য থেকে প্রেরণা আহরণ করে, যেন বার বার তাদের ইউরোপীয় অতীতের দিকে ফিরে না তাকায়। এমার্সন এক জায়গায় বলেছেন, 'আমাদের পরমুখাপেক্ষী থাকার যুগ আজ অতীতে পর্যবসিত হতে চলেছে—অপর দেশের শিষ্যত্ব করার দিন ফুরিয়ে এল। যেসব লক্ষ লক্ষ লোক আমাদের চতুর্দিকে জীবনের অভিযানে যাত্রা শুরু করেছে, তাদের পরের উচ্ছিষ্ট অন্নে পরিপুষ্ট করা চলবে না। অনেক ঘটনা ঘটে, অনেক কাজ করা হয় যা কীর্তিত হতেই হবে, যা আপনার গান আপনিই গেয়ে যায়। ভাল ও মন্দ সম্বন্ধে মনের একটা নিজস্ব মানদণ্ড আছে যা আচার কিংবা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না; সেই স্বতঃস্ফূর্ত বিচারবুদ্ধি থেকে বিকশিত হয়ে উঠবে ভদ্রতার নূতন আদর্শ, সৃষ্ট হবে নবতর কার্যপদ্ধতি, নির্মিত হবে নূতন সৃষ্টির ভাষা।' অন্যত্র 'আত্মকর্তৃত্ব' শীর্ষক আর একটি রচনায় এমার্সন লিখেছেন, 'আত্মসংস্কৃতির অভাবে আজ শিক্ষিত আমেরিকানরা দেশভ্রমণ নামক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, ইতালি, ইংলন্ড ও ইজিপ্ট তাদের কাছে আজ দেববিগ্রহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইংলন্ড, ইতালি ও গ্রীস আজ যদি আমাদের মানসনেত্রে বরণ্যে হয়ে দেখা দেয়, তাহলে মনে রাখতে হবে এইসব দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন যাঁরা, তাঁরা অনর্থক দেশভ্রমণ করতে যাননি। স্বদেশকে পৃথিবীর মেরুদণ্ড জ্ঞান করে তাঁরা সেখানকার শক্তি বৃদ্ধি করে গেছেন। প্রকৃত মনুষ্যত্ব যদি আমরা না হারিয়ে ফেলি, তাহলে আমরাও বুঝতে পারব আমাদের আপন ঠাঁই হল স্বদেশ। আত্মা তো বেঘোরে ঘুরে মরে না। জ্ঞানী যাঁরা তাঁরা নিজেদের আশ্রয় পরিহার করেন না। প্রয়োজনের তাগিদে কিংবা কর্তব্যের খাতিরে যদি বা কখনও তিনি ঘর ছেড়ে বাইরে অথবা বিদেশে যান, তবু ঘর যেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলে। যেখানেই তিনি যান না কেন, তাঁর প্রশান্ত মুখ দেখে মানুষ বুঝতে পারে যে তিনি এসেছেন প্রচারক পরিব্রাজকের মত জ্ঞান ও ধর্মের বাণী বহন করে। নগরে শহরে তিনি ঘুরে বেড়াবেন, নানা লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করবেন সম্রাটের মত—অনধিকার প্রবেশকারী কিংবা দীনতম সেবকরূপে নয়।'

ওই প্রবন্ধেরই আরেক জায়গায় এমার্সন লিখেছেন, 'মানুষের মন যদি স্বদেশাভিমুখী হয়, যদি সে স্বদেশে যা দেখেছে কিংবা জেনেছে তার চেয়ে বৃহত্তর কিংবা মহত্তর কিছু দেখবার কিংবা জানবার নেশায় বিদেশে না পাড়ি দেয়, তাহলে সে মানুষ সারা পৃথিবী ঘুরুক না। শিল্পচর্চা, শিক্ষার্জন, পরহিতব্রত প্রভৃতি যে-কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এই ধরনের মানুষ পৃথিবী পরিক্রম করতে পারে—এইরকম দেশভ্রমণ নিয়ে আমি আপত্তি করব তেমন সঙ্কীর্ণমনা আমি নই। যে-লোক নিছক আমোদ পাবার জন্যে বিদেশ যায়, যা তার নিজের মধ্যে নেই সেইরকম একটা কিছু সংগ্রহের লোভে বাইরে হাত বাড়ায়, সে-লোক তার নিজের সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

পুরাতনের ধ্বংসাবশেষের মত সে তরুণ বয়সেই জরাগ্রস্ত হয়ে যায়। থীবস, পালমিরা প্রভৃতি ঐতিহাসিক জায়গায় গিয়ে তার নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি ও মননশক্তি এইসব জায়গার মতই প্রাচীন ও প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়ে পৌছায়। তার দেশভ্রমণ হল যেন ধ্বংসাবশেষের কাছে ধ্বংসাবশেষের যাওয়া।

'এইপ্রকার দেশভ্রমণের নেশা একপ্রকার মানসিক বিকারের লক্ষণ বিশেষ, মানুষের সমস্ত মননশক্তি এই ব্যাধির দ্বারা প্রভাবিত হয়...আমরা অনুকরণপ্রবণ হয়ে উঠি... আমাদের গৃহনির্মাণপদ্ধতিতে বিদেশী রুচির ছাপ পড়তে থাকে...আমাদের সিন্দুকে পেটিকায় বিদেশী বিলাসসামগ্রী ও বিদেশের আভরণ পুঞ্জীভূত হতে থাকে... আমাদের মতামত, রুচি, কর্মশক্তি—সব কিছুই যেন দূর বিদেশ এবং ততোধিক সুদূর অতীতকে নির্ভর করে তাদেরই পিছনে খঞ্জের মতো চলতে থাকে। মানুষের স্রষ্টা মন যেখানে উন্মেষিত হয়েছে সেখানেই সুন্দর শিল্পকলার সৃষ্টি করেছে। শিল্পী তাঁর নিজের মনেই সুন্দরের আদর্শকে রূপায়িত করেছেন। বিশেষ কোনো কাজ, বিশেষ কোনো পদ্ধতির সাহায্যে সম্পূর্ণ করার জন্য সে তার নিজের চিত্ত-বৃত্তিকে নিয়োজিত করেছে...নিজের উপর দাবি কর, নকল করতে যেও না। সারা জীবন ধরে চর্চা করার ফলে যে-শক্তির উদ্ভব হয় তাই দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করা যায় সম্পূর্ণভাবে অন্যের থেকে ধার-করা বিদ্যা কখনোই পূর্ণায়ত্ত হতে পারে না।'

ভারতবাসীদের পক্ষে স্থান ও কালের দূরত্ব অনুসন্ধান করতে বিদেশে যাওয়া বাতুলতামাত্র। সে দূরত্ব আমরা ঘরে বসেই অনুভব করতে পারি। বিদেশ যদি যেতে হয় তাহলে সে কেবল বর্তমানকে আবিষ্কারের জন্য। এ-সন্ধান বাঞ্ছনীয়, কারণ দূরে দূরে থাকার অর্থই হল পিছিয়ে পড়া ও জীর্ণদশাগ্রস্ত হওয়া। এমার্সন-এর সময়কার জগৎ এখন বদলে গেছে, পুরাতন ব্যবধান গেছে ভেঙে এবং জীবনের উপর ক্রমশ আন্তর্জাতিকতার প্রভাব এসে পড়ছে বেশি করে। এই আগন্তুক আন্তর্জাতিকতার জগতে আমাদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে। তা করতে গেলে দেশ বিদেশ ঘুরতে হবে, অপর লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে হবে, তাদের কাছ থেকে শিখতে হবে এবং তাদেরও বুঝতে হবে। সত্যকার আন্তর্জাতিকতা নোঙরবিহীন নৌকার মত লক্ষ্যহারা কিছু নয়, এই পৃথিবীর মাটিতেই তার শিকড় রয়েছে, কল্পনার আকাশে নয়। জাতীয় সংস্কৃতি থেকেই এর উদ্ভব। এই আন্তর্জাতিকতা টিকতে পারে যদি পৃথিবীর সর্বত্র স্বাধীনতা ও সাম্যভাবের সঙ্গে সঙ্গে পরস্পর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। তবু একথা মানতেই হবে যে এমার্সন যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে-ছিলেন তা আজকের দিনে আমাদের পক্ষেও সত্য। আপনাকে পুরোপুরি জেনে তবে বাহিরকে জানবার যে নির্দেশ তিনি দিয়ে গেছেন তা তখনকার দিনের মত আজও সত্য। অবাহূত অনধিকার প্রবেশকারীদের মত যাওয়া আমাদের চলবে না; আমরা যাব, যোগ দেব এই পৃথিবীব্যাপী অভিযানে যদি অন্যেরা আমাদের ভাই বলে, নিজেদের সমান বলে আহবান করে। অনেক দেশ আছে, বিশেষ করে ব্রিটিশ আওতায়, যারা আমাদের স্বদেশবাসীদের লাঞ্ছনা করতে উৎসুক। তাদের সঙ্গে

আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এখনকার মত বিদেশী শাসনের জোর-করে-চাপানো জোয়াল ও তার আনুষঙ্গিক বোঝা আমাদের হয়তো বইতে হবে। কিন্তু এ থেকে মুক্তিলাভের দিন আগত ঐ! আমাদের এ-দেশ তুচ্ছ দেশ নয়। আমাদের জন্মভূমি ও স্বাজাতি নিয়ে, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে, আমরা গৌরব অনুভব করি। এই গর্ব যেন পুরাতনঘেঁষা ভাববিলাসে মাত্র পর্যবসিত না হয়; অপরকে পরিহার করার মত সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি কিংবা ধর্ম বা আচরণাদি সম্বন্ধে অবজ্ঞা যেন আমাদের মন অধিকার না করে বসে। আমাদের নিজেদের দুর্বলতা বা ত্রুটি সম্বন্ধে আমরা সর্বদা যেন সজাগ থাকি—এইসব দুর্বলতা ও ত্রুটি পরিহার করার জন্য আমাদের চেষ্টা সতত যেন উদ্যত থাকে। অনেকটা রাস্তা চলতে হবে আমাদের—অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছি। এই পথটুকু অতিক্রম করতে পারলে তবেই আমরা অন্যান্য উন্নত জাতির মত সভ্যতা ও প্রগতির পুরোভাগে আমাদের বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারব। মন্থরভাবে চলা আর চলবে না। এগিয়ে যারা গেছে, দ্রুতগতিতে তাদের ধরে ফেলতে হবে। সময় নেই, পৃথিবীও বসে নেই। অতীতে ভারতবর্ষ তার দেশ ও জাতিগত প্রকৃতি অনুসারে অন্যান্য সংস্কৃতিকে আহ্বান করেছে ও আত্মীভূত করেছে। আজ এই সমন্বয় প্রচেষ্টা আরও বেশি করে প্রয়োজন। আজ আমরা এগিয়ে চলেছি আগামী কালের 'এক-জাগতিকতার' দিকে—যেখানে জাতীয় সংস্কৃতি ও ভাবধারা সমস্ত মানব জাতির বৃহত্তর সাধনার মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। যেখানেই সন্ধান করা যাক, সেখান থেকেই জ্ঞান ও বিদ্যা, বন্ধুত্ব ও সৌভ্রাত্র আমাদের আজ আহরণ করে নেওয়া উচিত। সর্বমানবের কল্যাণকর্মে ব্রতী হয়ে আমাদের অপর সাধারণ সকলের সঙ্গেই সহযোগিতা করতে হবে। কিন্তু আমরা অপরের দয়াদাক্ষিণ্যের প্রত্যাশী আর থাকব না। এইভাবে যদি আমরা সমস্ত দেশের মন তৈরি করতে পারি, তাহলে আমরা ভারত ও এশিয়াখণ্ডের উপযুক্ত সন্তান হয়েও সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত বিশ্বমানবরূপে পরিগণিত হতে পারি।

আমাদের এই প্রজন্মে ভারত তথা বিশ্বে বহু সংকট দেখা দিয়েছে। আমার যারা সমসাময়িক তাদের আরো কিছু দিনের জন্য বোঝা বইতেই হবে। তারপর আমাদের যুগ যখন ফুরিয়ে যাবে তখন আসবে নূতন আগন্তুক। তারাও তাদের জীবিতকালে এই বোঝা বয়ে যাত্রাপানে আরও খানিকটা এগিয়ে যাবে। এই যে স্বল্পস্থায়ী অন্তর্বর্তী কালটুকু গেল—সে সময়টা আমরা কি যথোচিত কাজে লাগাতে পেরেছি? পেরেছি কি না জানি না। পরবর্তী কালের লোকেরা তা বিচার করবে। কি মানদণ্ডে সফলতা বিফলতা মাপ করা যায় আমি জানি না। আমরা স্বেচ্ছাক্রমে যে-জীবন নির্বাচন করে নিয়েছি সে-জীবনের কঠিন দুঃখ নিয়ে অনুযোগ করা চলে না। আর সত্যিই কি জীবনসংগ্রাম আমাদের পক্ষে খুব বেশি কষ্টদায়ক হয়েছে? তারাই তো ভাল করে বাঁচতে শিখেছে যারা সাহস করে দাঁড়াতে পেরেছে জীবন শিখরের প্রত্যন্ত প্রদেশে যার নিচেই হল মৃত্যুর অতল কালো অন্ধকার। তারাই সত্য করে বাঁচতে পারে যারা মৃত্যুভয় তুচ্ছ করেছে। ভুলত্রুটি আমরা অনেক করেছি হয়তো,

কিন্তু অন্তরের গ্লানি এবং ভীরুতার লজ্জা থেকে নিজেদের বাঁচাতে পেরেছি এই আমাদের যথেষ্ট সান্ত্বনা। ব্যক্তিগতভাবে সেইটুকুই আমাদের গৌরব।

"মানুষের পরমতম সম্পদ হল তার জীবন। এই বাঁচবার অধিকার একবার বই দুবার আসবে না। সুতরাং এমন করে বাঁচতে হবে যেন কাপুরুষতার ধিক্কার নিয়ে তিলে তিলে অনুশোচনায় মরতে না হয়। এমনভাবে বাঁচতে হবে যেন বৎসরের পর বৎসর উদ্দেশ্যবিহীন বিভ্রান্তি তাকে দগ্ধে দগ্ধে না মারতে পারে। বাঁচতে হবে এমনভাবে যাতে সে বলতে পারে—'আমার সমস্ত জীবনের সবখানি শক্তি নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছি পৃথিবীর মহত্তর আদর্শের পিছনে। সে-আদর্শ আর কিছুই নয়-মানবজাতির মুক্তি।' "—লেনিন।

পুনশ্চ

এলাহাবাদ : ২৯শে ডিসেম্বর : ১৯৪৫। ১৯৪৫ সালের মার্চ এপ্রিল মাসে কারারুদ্ধ কংগ্রেস সভ্যদের তাঁদের স্ব স্ব প্রদেশের জেলে প্রেরণ করা হয়। কংগ্রেস-এর কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যেরা ছিলেন আমেদনগর দুর্গের কারাশিবিরে বন্দী। এই কারাশিবিরের মেয়াদ এবার ফুরাল, দুর্গ ফিরিয়ে দেওয়া হল সম্ভবত মিলিটারী কর্তৃপক্ষের হাতে। ২৮শে মার্চ গোবিন্দবল্লভ পন্থ, নরেন্দ্র দেব ও আমি—আমরা তিনজন আমেদনগর দুর্গ ত্যাগ করে নৈনি কেন্দ্রীয় কারাগারে নীত হই। এইখানে আমাদের পূর্বপরিচিত কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়—এ'দের মধ্যে ছিলেন রফি আহমদ কিদোয়াই। ১৯৪২ সালের আগস্টে ধৃত হবার পর এই প্রথম ১৯৪২ সালের ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ জানতে পেলাম। নৈনির অনেকে আমাদের পরে ধৃত হয়েছিলেন, তাঁদের কাছেই এই সব খবর পাওয়া গেল। নৈনি থেকে আমাদের তিনজনকে নিয়ে যাওয়া হল বেরীলির নিকটবর্তী ইজ্জৎনগরের কেন্দ্রীয় কারাগারে। শারীরিক অসুস্থতার কারণে এই সময় গোবিন্দবল্লভ পন্থ মুক্তি লাভ করলেন। এই ইজ্জৎনগর জেল-এর একটি ব্যারাকে নরেন্দ্রদেব ও আমি দুই মাসের অধিককাল একত্র অতিবাহন করেছি। জুন-এর গোড়ার দিকে আমাদের আলমোড়া পাহাড়ের জেল-এ স্থানান্তর করা হয়—দশ বছর আগে এই জেল-এর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল। ১৫ই জুন আমাদের দুজনকেই মুক্তি দেওয়া হয়—১৯৪২ সালের আগস্ট থেকে গণনা করলে সেদিনটা ছিল আমদের কারাবাসের ১,০৪১তম দিন। এইভাবে আমার নয় দফা এবং সবচাইতে দীর্ঘমেয়াদী কারাজীবন সম্পূর্ণ হয়।

তারপর সাড়ে ছয় মাস কেটে গেছে, কারাকক্ষের নিভৃত জীবন থেকে আমি এসে পড়েছি জনতার মধ্যে, কর্মব্যস্ততা এবং অবিরাম সফরের আবর্তে ঘুরে বেড়াচ্ছি। স্বগৃহে কেবলমাত্র একটি রাত্রির মত বাস করে আমি ঝটিতি এসে গেছি বোম্বাই শহরে—কংগ্রেসের কর্মপরিষদে যোগ দেবার জন্য। তারপরেই আবার যেতে হয়েছে ভাইসরয়ের আমন্ত্রণক্রমে আহূত সিমলা কনফারেন্সে। এই দ্রুত পট-পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে যেন মানিয়ে নিতে পারছি না সহজে। যদিচ সব কিছুই পরিচিত, বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের সঙ্গ যদিচ ভাল লাগছিল, তবু কেমন যেন নিজেকে বহিরাগত বিদেশীর মত মনে হচ্ছিল। এই অস্বস্তি থেকে মুক্তি পাবার জন্য মন উৎসুক হয়ে উঠেছিল, দৃষ্টি চলে গিয়েছিল সুদূরের তুষারশুভ্র পর্বতরাজির দিকে।

সিমলার কাজ শেষ হবার সঙ্গেই আমি কালবিলম্ব না করে চলে গেলাম কাশ্মীর। উপত্যকা অঞ্চলে না থেকে সোজা চলে গেলাম উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণী ও গিরিবর্ম্মের দিকে। কাশ্মীরে একটা মাস কাটিয়ে আবার ফিরে এলাম জনতার মধ্যে, আবার সেই প্রাত্যহিক জীবনের উত্তেজনা ও একঘেয়েমি।

ধীরে ধীরে গত তিন বছরের ঘটনাবলী আমার মনে রূপ পরিগ্রহ করল। অন্যাদের মত আমিও বুঝতে পারলাম যে এই তিন বছরে যা ঘটে গেছে তা আমাদের কল্পনার চাইতে ঢের বেশি। আমার দেশের লোকের কাছে এই তিন বছর ছিল চরম দুঃখের—সবাইকার মুখের উপর যেন এই বেদনার ছাপ সুস্পষ্ট। দেশের হাওয়া বদলে গেছে—বাইরের আপাতস্তব্ধতার তলায় তলায় অনেক দ্বিধা সন্দেহ, অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা জমেছে। হতাশার সঙ্গে একটা যেন চাপা অভিযোগ, একটা অক্ষম ক্রোধের ভাব যেন গুমরে মরছে। আমাদের মুক্তি ও তৎপরবর্তী ঘটনার ফলে একটা পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিল, উপরে উপরে একটা যে শান্তভাব ছিল তা আর রইল না। নিথর সরোবরের জল যেন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। দেশের বুকের উপর দিয়ে একটা প্রচণ্ড উত্তেজনার ঢেউ বয়ে গেল। তিন বছরের স্তব্ধতার বাঁধ হঠাৎ গেল ভেসে। এই ধরনের স্বাধীনতার স্পৃহায় উন্মত্ত জনতা আমি পূর্বে কখনও দেখিনি। যুবক যুবতী বালক বালিকা—সকলেই যেন একটা কিছু করবার উৎসাহে উদ্দীপ্ত। প্রেরণা রয়েছে মনে অথচ তারা ঠিক স্পষ্ট যেন জানে না কি তাদের করতে হবে।

যুদ্ধ শেষ হল, নূতন যুগের প্রতীকমূর্তি হয়ে এল আণবিক বোমা। এই নিদারুণ মারণাস্ত্রের ব্যবহারে, এবং শক্তিপ্রাধান্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাজনীতির কদর্য প্রকাশে, মানুষের ভুল বোঝার অবকাশ আর রইল না। সেই সনাতন সাম্রাজ্যতন্ত্র এখনও চালু রয়েছে। ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীনের ব্যাপারে এই বিভীষিকাগ্রস্ত আধুনিক ইতিহাসের ছবি আরও যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল। এই দুই দেশের স্বাধীনতা-লাভেচ্ছু দেশভক্ত জনসমূহকে প্রশমিত করার জন্য ভারতীয় সৈন্যসামন্তকে নিয়োগ করা হয়েছিল। এই লজ্জাকর ব্যাপারে আমাদের সমস্ত মন যেন তিক্ত হয়ে উঠল, নিজেদের অকৃতার্থতা ও অসহায়তার কথা স্মরণ করে মনের মধ্যে একটা নিষ্ফল আক্রোশ উঠল জমে। দেশের সমস্ত মন গেল বিষিয়ে, মেজাজ গেল বিগড়ে।

যুদ্ধের সময় ব্রহ্মদেশ ও মালয়ে যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ (আই. এন. এ) গঠিত হয় তার কথা ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল, তার ফলে দেশের মনে একটা অভূতপূর্ব উদ্দীপনা প্রকাশ পেল। সামরিক আদালতে এই ফৌজের কয়েকজন লোকের বিচার দেশের সর্বত্র একটা প্রচণ্ড সাড়া জাগিয়ে তুলল, তাঁরা যেন ভারতের মুক্তিযুদ্ধের প্রতীকস্বরূপ হয়ে পরিচিত হলেন। উপরন্তু ভারতের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়গুলির একতার প্রতিভূরূপে তাঁরা সর্বত্র স্বীকৃত হলেন—কারণ, এই ফৌজে হিন্দু মোশলেম শিখ খৃষ্টান নির্বিশেষে বহু সৈন্য যোগদান করেছিল। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান আজাদ হিন্দ্ ফৌজ যদি করে থাকতে পারে, তাহলে আমরাই বা পারব না কেন—এইরূপ চিন্তা অনেকের মনে উদিত হল।

ভারতে সাধারণ নির্বাচন আসন্ন, ভোটাভুটির ব্যাপার স্বভাবতই মানুষকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু নির্বাচনদ্বন্দ্ব তো অচিরেই শেষ হবে—তারপর? আগামী বৎসর আবার আসবে ঝড়ঝঞ্ঝা, দ্বন্দ্বসংঘাত—এক স্বাধীনতার ভিত্তিতেই ভারতে শান্তি ফিরে আসতে পারে—নতুবা শান্তির আশা সুদূর।